ম্যাথিউ হেনরী কমেন্ট্রি

(Matthew Henry Commentary)

মথি লিখিত সুসমাচারের টীকাপুস্তক

Commentary on the Gospel of Matthew

Part 1 : Matthew Chapter 1-12

১ম অংশ : মথি ১-১২ অধ্যায়

ম্যাথিউ হেনরী কমেন্ট্রি

মথি লিখিত সুসমাচারের উপর লিখিত
ম্যাথিউ হেনরীর টীকাপুস্তক

১ম অংশ

মথি ১ - ১২ অধ্যায়

প্রাথমিক অনুবাদ : রবিন সরকার

সম্পাদনা : পাষ্টর সামসুল আলম পলাশ (M.Th.)

ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (আইবিসি) এবং বিব্লিক্যাল এইড্‌স ফর চার্চেস এন্ড ইনস্টিটিউশন্স ইন বাংলাদেশ (বাচিব)

Matthew Henry Commentary in Bengali

The Gospel According to Matthew

Primary Translator : Robin Sarker

Editor: Pastor Shamsul Alam Polash (M.Th.)

Translation Resource:

1. Matthew Henry Commentary (Public Domain)
2. Matthew Henry's Commentary (Abbreviated Version in One-Volume)

Copyright © 1961 by Zondervan, Grand Rapids, Michigan

Published By:

International Bible Church (IBC) and Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB)

House # 12 Road # 4, Sector # 7

Uttara Model Town

Dhaka 1230, Bangladesh

https://www.ibc-bacib.com

মথি লিখিত সুসমাচার

ভূমিকা

১. বাইবেলের দ্বিতীয় অংশে রয়েছে আমাদের প্রভু ও পরিত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের নতুন নিয়ম; তাই একে 'নতুন চুক্তি' বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু যখন পৃথিবীতে থাকাকালীন যীশু খ্রীষ্টের করা বিভিন্ন কাজ, তাঁর দেওয়া শিক্ষা সর্বোপরি তাঁর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে বলা হয় তখন তাকে 'সাক্ষ্য' বলাই শ্রেয়। আর এই নতুন নিয়ম অনেকটা উইলের মতো। সাধারণত উইলে আমরা যেমনটা দেখি এটি সেরকম নয়। উইলে একাধিক পক্ষ থাকে, থাকে আবশ্যিক পালনীয় শর্তাবলি। উইল আইনসম্মত হলে, ভূসম্পত্তির মালিকানা উইলে বর্ণিত ব্যক্তির ওপর বর্তায়। নির্ঝঞ্ঝাট, উৎকৃষ্ট উইল হলে নতুন মালিককে সম্পত্তি নিয়ে কোন ঝামেলা পোহাতে হয় না। উপরন্তু তিনি পেয়ে যান সম্পত্তির ওপর অবাধ কর্তৃত্বের অধিকার। পক্ষান্তরে যীশু খ্রীষ্ট যে উইল মানুষের জন্য করে গেছেন তা নিঃশর্ত, পাপ থেকে মুক্তির নিশ্চয়তাযুক্ত– যা তাঁর মৃত্যুর পর অসীম শক্তিতে কার্যকর হতে শুরু করে (ইব্রীয় ৯:১৬, ১৭)। এই শাস্ত্র আমাদের সেই অনুগ্রহের কথাই বলে যার দ্বারা আমরা যীশু খ্রীষ্টকে আমাদের প্রভু ও পরিত্রাণকর্তা হিসেবে পাবার অধিকার লাভ করি। আর যীশু খ্রীষ্টকে প্রভু হিসেবে স্বীকার না করলে পরিত্রাণকর্তা হিসেবে তাঁর কাছ থেকে আমরা কোন ধরনের দয়া লাভের প্রত্যাশা করতে পারি না। এটাই হচ্ছে 'নতুন নিয়ম' যা চির নতুন, যা সময়কে অতিক্রম করে যায় এবং যার আবেদন কখনো ফুরায় না।

মোশি যে ব্যবস্থা নিয়ে এসেছিলেন তার সাথে খ্রীষ্টের এই নতুন নিয়মের এটাই হচ্ছে মৌলিক পার্থক্য। ব্যাখ্যায়, নতুনত্বে, শিক্ষা ও দর্শনে নতুন নিয়ম স্বতন্ত্র, কালোত্তীর্ণ। নতুন নিয়মে অন্তর্ভুক্ত পুস্তকসমূহ শুধু মানুষের কাছে ঈশ্বরের অনুগ্রহের পরিত্রাণের আবিষ্কৃত সত্যের কথাই বলে না, উপরন্তু এটি বিশ্বাসীদের জন্য কার্য সাধনের বিশেষ উপায়। যেমন, কী করে বিশ্বাসীরা নিজেদের মাঝে ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পারেন, অবিশ্বাসীদের কাছে পরিত্রাণের সুখবরই বা কীভাবে পৌঁছে দেয়া যায়– সে সম্পর্কে সঠিক দিক-নির্দেশনাও এই পুস্তকসমূহে বিবৃত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ঈশ্বরের ভালবাসার সর্বোচ্চ প্রকাশরূপে যাকে আমরা বন্ধু হিসেবে পেয়েছি তাঁর শেষ ইচ্ছে বা নতুন নিয়মের কথা কতটা মনোযোগ ও আনন্দসহকারে আমরা পাঠ করব এবং সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ করব– তা সুগ্রন্থিত এই পুস্তকসমূহে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। আমাদের মাঝে মহিমাধন্য পরিত্রাণকর্তার উপস্থিতির কথা, তাঁর অসীম রহস্যের বিষয়ে জানতে এই মহামূল্যবান নতুন নিয়ম আমাদের কতই না সাহায্য করে!

খ্রীষ্টের এই নতুন নিয়ম মূলত লিখেছেন অন্যরা (আমরা এমন কোন তথ্য-উপাত্ত পাইনি যার দ্বারা মনে হতে পারে যে, যীশু খ্রীষ্ট-ই নতুন নিয়মের লেখক)। যদিও তিনি নিজেই তা নিবেদন করেছেন। তাঁর মৃত্যুর আগের রাতে বারোজন সাক্ষীর সামনে ভোজ গ্রহণের সময় তিনি নিজেই তাতে স্বাক্ষর করে সীলমোহরাঙ্কিত করে তা প্রকাশ করেছেন। ভবিষ্যত-সুনামের কথা ভেবে কেবলমাত্র পরবর্তী কয়েক বছরের জন্য এই পুস্তকসমূহ লেখা হয়নি; এমনকি যীশুর অসামান্য আত্মত্যাগের স্মরণার্থেও (পারপাচুয়াম রেই) নয়। যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যুতে মানুষের পরিত্রাণের বিষয়টির ফয়সালা হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে তাঁর এই ত্যাগের মাঝে নিহিত মানুষের মুক্তির বারতাই নতুন নিয়ম হিসেবে কার্যকর ও

নিশ্চিত সত্যরূপে ঘোষিত হতে থাকে। লূক নতুন নিয়মের অপর পুস্তকটি লেখার আগে থেকেই তা নিশ্চিত বিশ্বাসযোগ্যতার জন্যে জনশ্রুত ও পরিচিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু লূক যখন চূড়ান্ত সত্যতা, প্রত্যক্ষদর্শিতার নিরিখে তা লিপিবদ্ধ করলেন তখন তা মৌখিক-ব্যক্তিনিষ্ঠা থেকে হয়ে উঠলো বস্তুনিষ্ঠ। আর এই লেখাগুলোই একসময় জায়গা করে নিল 'নতুন নিয়মে'– যা 'সম্পূর্ণ নতুন নিয়ম' *(টেস কায়নেস ডায়াথেকেস হাপান্তা)* অথবা 'এক মলাটে সবগুলো খণ্ড' শিরোনামে অনেক গ্রীক নকলে আগেই গ্রন্থিত হয়েছিল। সেখানে মানুষের পরিত্রাণের বিষয়টি নিশ্চিতকল্পে ঈশ্বরের সব নির্দেশের উল্লেখ ছিল (প্রেরিত ২০:২৭)। প্রভুর ব্যবস্থার মতো খ্রীষ্টের এই নতুন নিয়মও স্বয়ংসম্পূর্ণ; তাই এতে কোন কিছু যোগ করার আবশ্যকতা নেই। আমাদের কাছে যখন এরকম একটি সম্পূর্ণ 'নতুন নিয়ম' রয়েছে তখন ভিন্ন কিছু করার বা এর বাইরে অন্য কিছুর দিকে তাকাবার কোন যৌক্তিকতা নেই।

২. আমাদের কাছে রয়েছে সুসমাচারের চারটি পুস্তক। পাপের দাসত্ব থেকে মানুষকে মুক্ত করার লক্ষ্যে খ্রীষ্টের পৃথিবীতে নেমে আসার আনন্দের সংবাদ বা সুখবরই হচ্ছে সুসমাচার। সন্দেহ নেই, স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে এ যাবৎ আসা সব সংবাদের মধ্যে এটিই সেরা। ঈশ্বরের স্বর্গদূতের রাখালদের কাছে ঠিক এরকমটাই *(ইভানজেলিজমাই হিমিন)* বলেছিলেন, আমি তোমাদের জন্য এক আনন্দের সংবাদ, সুসমাচার এনেছি (লূক ২:১০)। এ সম্পর্কে ভাববাদীরা অনেক আগেই বলেছিলেন, যিশাইয় ৫২:৭, ৬১:১। সেই ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছিল যে খ্রীষ্টের দিনে সুসমাচার প্রচার করা হবে। প্রাচীন ইংরেজি (ওল্ড স্যাক্সন) শব্দ 'গসপেল'– এর (বাংলায় এর স্থলে আমরা 'সুসমাচার' ব্যবহার করেছি) ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে গডস্ স্পেল বা ঈশ্বরের কথা। ঈশ্বর তাঁর অসাধারণত্বের কারণে 'মহানুভব' *(দিউস অপটিমাস)* বলে কথিত; বোধকরি সে কারণেই 'গসপেল'– এর মানে দাঁড়ায় সুসংবাদ বা ভাল কথা। 'স্পেল' বা 'কথাকে' আরও ভালভাবে বোঝাবার জন্য আমরা এর স্থলে 'জাদুমন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করতে পারি। ব্যাপারটাকে রূপক হিসেবে সদুদ্দেশ্যে দেখাই ভাল। স্পেল বা কথা অনেকটা জাদুমন্ত্রের মতো ঘুরে ঘুরে কাজ করে থাকে। তা যেমন আত্মাকে শান্ত করে তোলে, তেমনি আবার প্রশংসা ও ভালবাসার ভরিয়ে দেয়। সে কারণেই যা ভালবাসা পাবার যোগ্য তাকেই আমরা মোহনীয় বলে থাকি। এই অভিধা তাই সুসমাচারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে সাপুড়েও মোহনীয় ভঙ্গিতে বুদ্ধিদীপ্ততার সাথে সাপ ধরে থাকে– সেই সাপ বধির হলেও (গীত ৫৮:৪, ৫)। আমাদের পরিত্রাণকর্তার ভালবাসা ও সৌন্দর্যের কাছে অন্য সব ধরনের আকর্ষণ, মোহাবিষ্টতা ম্লান হয়ে যায়।

নতুন নিয়মের পুরোটাই হচ্ছে সুসমাচার। এর মাঝে পৌলের লেখাও রয়েছে। তিনি নিজে একে তাঁর সুসমাচার বলেছেন; এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে তিনিও এই সুসমাচার- প্রচারকদের একজন ছিলেন।

যাহোক, হৃদ্যতার সাথে অন্যের কাছে গ্রহণযোগ্য ও প্রণিধানযোগ্য করে সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে আমরাও একে নিজের বলে দাবি করতে পারি! কিন্তু আমাদের উদ্ধারকারীর সত্য ঘটনা মূলত যে চারটি শাস্ত্রে সুবিন্যস্ত হয়েছে সেগুলোকেই আমরা সুসমাচার বলে থাকি। সুসমাচারের লেখকেরা ছিলেন আত্মিক অনুপ্রেরণাপ্রাপ্ত প্রচারকারী। তাঁরা পৃথিবীর অন্য সব লেখকের মতো ছিলেন না; সুসমাচার লেখার জন্য তারা আহ্বান

লাভ করেছিলেন। যেমনটা শিষ্যেরা প্রচার কাজে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে আহ্বানপ্রাপ্ত হয়েছিলেন (ইফিষীয় ৪:১১)। তিনি কাউকে প্রেরিত এবং কাউকে প্রচারক হিসেবে নিযুক্ত করলেন।

এর প্রয়োজন ছিল; এই ঘটনার সাথে খ্রীষ্ট-তত্ত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এবং এই তত্ত্ব তাঁর জন্ম, জীবন, আশ্চর্য কাজ, মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সুসমাচার-লেখকেরা তাঁদের লেখার উপজীব্য করেছিলেন যীশু খ্রীষ্টের জীবনের আশ্চর্য কিন্তু সত্য ঘটনাসমূহকে; ফলে তা আরও স্বচ্ছ এবং নিজ শক্তিমত্তায় ভাস্বর হয়ে উঠেছিল। ঘটনার কার্যকারণের নিরিখে আবিষ্কৃত সত্য সবসময়ই গ্রহণযোগ্য কারণ প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি-প্রকৃতির বাইরের কোন কিছুই আমাদের কাছে ঠিক বোধগম্য হয়ে ওঠে না। প্রকৃতির নিয়মে বিনির্মিত ইতিহাস তাই শ্রেষ্ঠ দর্শন। ঠিক সে কারণেই পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়ম উভয় পুস্তকই চমৎকার সত্যের বাহক– যে সত্য ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। শুরুর দিকে সুসমাচারের চারটি পুস্তক আদি মণ্ডলী কর্তৃক বিশ্বস্ততা সহকারে গৃহীত হয়। বিশ্বাসীরা যখন একসাথে মিলিত হতেন তখন তারা তা পড়তেন। লেখক জাস্টিন মার্টায়ার এবং আইরেনেইয়াস– এর কাছ থেকে আমরা এ বিষয়ে জানতে পারি। লেখকদ্বয় খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের প্রায় একশো বছরেরও বেশি সময় পরে পৃথিবীতে ছিলেন। তারা ঘোষণা করেন যে মণ্ডলী সে সময় সুসমাচারের চারটি পুস্তকই গ্রহণ করেছিল।

সুসমাচারের চার লেখককে সে সময়ে যিনি একমলাটে গ্রন্থভুক্ত করেন তিনি হচ্ছে টার্টিয়ান। তিনি এই শাস্ত্রের নাম দিয়েছিলেন 'চার খণ্ডে সুসমাচার'। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে মূলত ভিন্ন পেশাজীবী সম্প্রদায়ের (জেলে) পিতর, থোমা এবং ফিলিপ প্রমুখের অধীনে সুসমাচার সুবিন্যস্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। তারা মণ্ডলীর মধ্যস্থতায় এই অসাধারণ কাজে হাত দেননি। এমনকি মণ্ডলীর কাছ থেকে ন্যূনতম কৃতিত্বের দাবিও তারা করেননি। স্বভাবতই মণ্ডলীও তাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানায়নি। ড. হুইটবি এ সম্পর্কে একটি কারণ দর্শিয়েছেন যে কেন আমরা এই লিপিবদ্ধ নথির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করব। আর তা হল, লোকমুখে বংশপরম্পরায় চলে আসা কাহিনীর কোন ভিত্তি থাকে না। অনেক কিছুই হারিয়ে যায়, আবার অনেক মুখরোচক মিথ্যা গাল-গল্পে তা ভরে যায়। তাই চোখে দেখা কিংবা প্রত্যক্ষ করা কোন সত্য ঘটনাকে টিকিয়ে রাখতে ঐতিহ্যিগত প্রথাই যথেষ্ট নয়; উপরন্তু এর পরতে পরতে অনিশ্চয়তার ছাপ শেষ পর্যন্ত থেকেই যায়। এক্ষেত্রে বলা যায় যীশু খ্রীষ্টের কথা। তিনি পৃথিবীতে থাকাকালীন এমন অনেক স্মরণীয়, আশ্চর্য কাজ করেছিলেন যা লেখা হয়নি (যোহন ২০:৩০; ২১:২৫)। ঐতিহ্যিগত প্রথা সেই ঘটনাগুলোকে সংরক্ষণ করতে পারেনি। ফলে সে সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। শুধুমাত্র যা লেখা হয়েছিল তা-ই টিকে আছে, বাকিরা হারিয়ে গেছে। সেজন্যে আমরা এই নিশ্চিত-সত্য সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর ও তা পালন করতে পারি– কারণ তা ঈশ্বরের অনুগ্রহপুষ্ট; আমাদের জন্য তাঁর অনুগ্রহ।

৩. সুসমাচারের প্রথম খণ্ডের লেখক মথি। তাঁর জন্ম এক যিহূদী পরিবারে। পেশাজীবনে তিনি ছিলেন একজন কর আদায়কারী। যীশু খ্রীষ্ট তাকে আহ্বান করলে তিনি তার অফিস থেকে উঠে আসেন এবং তাঁকে অনুসরণ করেন। সে-ই শুরু, এরপর থেকে তিনি সবসময় শিষ্য হিসেবে প্রভু যীশুর পাশেই ছিলেন। যোহনের বাপ্তিস্ম দেওয়ার সময় থেকে যীশুকে তুলে নেওয়া পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এই মথি (প্রেরিত ১:২১, ২২)। সুসমাচারের এই খণ্ডে তিনি যা লিখেছেন তা তার নিজেরই প্রামাণ্য অভিজ্ঞতালব্ধ সাক্ষ্য। খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের প্রায় আট বছর পর তিনি এই পুস্তকটি লিখেন। প্রাচীন অনেক

ভূমিকা

পণ্ডিতের ধারণা ছিল মথি এই পুস্তকটি লিখতে হিব্রু কিংবা সিরিয়াক ভাষার দারস্থ হন। কিন্তু তাদের সেই ধারণা ভুল প্রমাণ করেন ড. হুইটবি। নতুন নিয়মের অন্যান্য অংশের মত মথি পুস্তকটিও সন্দেহাতীতভাবেই গ্রীক ভাষায় লেখা– একথা এখন প্রমাণিত ও সত্য। নতুন নিয়ম গ্রীক ভাষায় লেখা হলে যিহূদীদের কিংবা হিব্রুভাষী অধ্যুষিত সমসাময়িক মণ্ডলী বা রাজ্যের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকবে কিনা– এই ভাবনার চেয়েও লেখকদের মনে একটা মহৎ উদ্দেশ্য কাজ করেছিল। আর তা হল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সুসমাচার ছড়িয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে পৃথিবীর মানুষের কাছে যে ভাষা ছিল প্রসিদ্ধ, চর্চিত হতো সর্বত্র– সেই প্রচলিত গ্রীক ভাষাতেই নতুন নিয়ম লেখা হয়েছিল। হতে পারে হিব্রু ভাষায়ও এই পুস্তকটির অনুবাদ বের হয়েছিল, মথি একাধারে গ্রীক এবং হিব্রু দু'ভাষাতেই তা প্রকাশও করেছিলেন। হতে পারে যিহূদিয়া ছেড়ে অযিহূদীদের কাছে প্রচার করতে যাবার সময়ই তিনি প্রথমে যিহূদীদের জন্য এবং পরে অযিহূদীদের জন্য তাঁর লেখা সুসমাচার পৃথক দুই ভাষায় রচনা করেছিলেন। ঈশ্বরের অসীম আশীর্বাদে এই পুস্তকখানি আমরা আমাদের বোধগম্য ভাষায় পেয়েছি।

মথি লিখিত সুসমাচার
অধ্যায় ১

সুসমাচারের এই খণ্ডের শুরুতেই রয়েছে যীশু খ্রীষ্টের বংশ-তালিকা, জন্মের কাহিনী। এছাড়াও পৃথিবীতে তাঁর আগমনের কারণ, তিনিই যে সেই প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট, দায়ূদ-সন্তান, অনাড়ম্বরভাবে কুমারীর গর্ভে তাঁর জন্ম হবে– যাঁর সম্পর্কে পূর্ববর্তী ভাববাদীরা ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন– সে সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ছবি এই খণ্ডে বিবৃত হয়েছে। অব্রাহাম থেকে শুরু করে বিয়াল্লিশ প্রজন্মে তিন ভাগে (অব্রাহাম থেকে দায়ূদ পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ, দায়ূদ থেকে বাবিলে বন্দি করে নিয়ে যাবার সময় পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ এবং বাবিলে বন্দিত্বের পর থেকে খ্রীষ্ট পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ) খ্রীষ্টের বংশ-তালিকার বিস্তৃতি (১-১৭ পদ)। অপরদিকে ১৮-২৫ পদে আমরা দেখতে পাই কী করে মরিয়ম পবিত্র আত্মার শক্তিতে গর্ভবতী হলেন, কীভাবে তিনি যোষেফের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শাস্ত্রে উদ্ধৃত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা দিলেন– তার আশ্চর্য সত্য কাহিনী। অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে আমাদের মহিমাপূর্ণ পরিত্রাণকর্তার জীবনের কথা এখানে লেখা হয়েছে যেন কারও মনে ন্যূনতম সন্দেহের উদ্রেক না হয়। এখানে বর্ণিত প্রভু যীশুর জীবন-কাহিনী তাই অবিসংবাদিতার এক চমৎকার উদাহরণ।

মথি ১:১-১৭ পদ

এই বংশ-তালিকা আমাদের পরিত্রাণকর্তার বিষয়েই বলে, দেখুন,

১. এর শিরোনাম। এটি যীশু খ্রীষ্টের বংশ-তালিকা (অথবা বংশ-প্রজন্মের হিসাব, হিব্রু '*সেফার*' শব্দটি দিয়ে কখনো কখনো এই তালিকাকে বোঝানো হয়) যা আমাদের তাঁর পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে জানায় এবং তাঁর জন্মের কাহিনীকে বর্ণনা করে। এটি পয়দায়েশেরই একটি অংশ। পুরাতন নিয়ম শুরুই হয়েছে পৃথিবীর প্রজন্মের পরিচয় দিয়ে। ঠিক সেরকমভাবেই বংশ-বর্ণনার মাধ্যমে নতুন নিয়মের সূচনা হয়েছে। কিন্তু এর তাৎপর্য আরও মহিমামণ্ডিত; কারণ পুরাতন নিয়ম যেখানে মানুষের বংশ-বর্ণনা করেছে সেখানে নতুন নিয়ম বর্ণনা করে সেই মহান স্রষ্টার বংশ-তালিকা যিনি নিজেই এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। যাঁর শুরু পুরানো দিন থেকে, অনন্তকাল থেকে (মীখা ৫:২)। তাঁর আত্মিক সত্তার বংশ-তালিকা সম্বন্ধে কেউ বলতে না পারলেও মানুষ হিসেবে কাল পূর্ণ হলে এক নারীর গর্ভে তিনি আসলেন। আর তাঁর সেই মানবীয় বংশ-পরিচয়ের কথাই এখানে বিবৃত হয়েছে।

২. এর মূল উদ্দেশ্য। এই বংশ-তালিকাটি অনন্ত কিংবা অপ্রয়োজনীয় নয়। মানুষের মাঝে যাঁরা মহান তাদের কথা যেভাবে দম্ভের সাথে উচ্চারণ করা হয়– এটি তেমন নয়। প্রাচীন বংশানুক্রম তাহলে কীসের ভিত্তিতে প্রয়োজনতুল্য হয়ে ওঠে? সাধারণত সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণাদি সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যাস নিশ্চিত করা গেলে, তবেই সেই বংশানুক্রম গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে যৌক্তিক হয়ে ওঠে। যীশু খ্রীষ্টের বংশ-তালিকাটি যেভাবে বিন্যস্ত হয়েছে তা প্রমাণ করে যে তিনি অব্রাহাম ও দায়ূদের বংশধর। অব্রাহাম ও দায়ূদের কাছে

ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তার মাঝে খ্রীষ্টের আসবার বিষয়টিও সুস্পষ্ট ছিল। একথা বলাই যায় যে ঈশ্বর খ্রীষ্টের আগমন বিষয়ক প্রতিজ্ঞাটি এমন দু'জনের কাছে করেছিলেন যাঁরা এই প্রতিজ্ঞার প্রতি ছিলেন বিশ্বস্ত, আস্থাবান এবং নতুন যুগস্রষ্টা। ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞায় অব্রাহাম ও তাঁর বংশকে অপরিমেয় অনুগ্রহের কথা বলেছিলেন। পক্ষান্তরে দায়ূদ ও তাঁর বংশকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিটি ছিল রাজত্বকেন্দ্রিক। অব্রাহামের সন্তান হিসেবে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে যেমন সমস্ত জাতি দয়া পাবে ঠিক তেমনি দায়ূদের সন্তান হিসেবে তিনি সমস্ত বংশের ওপরে রাজত্ব করবেন। অব্রাহামের কাছে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল যে খ্রীষ্ট তাঁর বংশ থেকেই আসবেন (আদি ১২:৩; ২২:১৮); এবং দায়ূদের সম্বন্ধেও বলা হয়েছিল যে, খ্রীষ্ট তাঁর বংশে আসবেন (২ শমূয়েল ৭:১২; গীত ৮৯:৩; ১৩২:১১ এবং আরও অনেক জায়গায়)। দায়ূদের এবং অব্রাহামের সন্তান হিসেবে যীশু-ই যে সেই প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট তা এই বংশ-তালিকা এবং তাঁর সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিভিন্ন জায়গায় উদ্ধৃত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ ঘোষণা করে। যীশু যদি দায়ূদ এবং অব্রাহামের সন্তান না হতেন তাহলে তিনিই যে সেই খ্রীষ্ট তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ থাকত। তদানিন্তন সময়ে বংশ-তালিকা সংরক্ষণের জন্য নিযুক্ত সরকারি বিভাগের নথিপত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী যীশুর বংশ-তালিকা যে ভ্রান্ত নয় তা এখন প্রমাণিত ও সত্য। যিহূদীরা তাদের বংশ-তালিকা সংরক্ষণে খুবই সাবধানি ছিল; যেহেতু তারা প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্টের অপেক্ষা করছিল তাই তারা তাদের পূর্বপুরুষের সেই তালিকা রক্ষণাবেক্ষণে ছিল যথেষ্ট নিয়মতান্ত্রিক। কিন্তু খ্রীষ্ট যখন আসলেন তখন তারা সে বিষয়ে বিস্মৃত হল, গুলিয়ে ফেলল সবকিছু। ঘুরে ফিরে তখন একটি প্রশ্নই কেবল আসছিল, পৃথিবীর কেউ কি আইনগতভাবে প্রমাণ করতে পারেন যে, তিনি অব্রাহামের সন্তান? কিংবা দাউদের? যদিও যিহূদীদের এই বোধ পুরোহিত বা রাজা হিসেবে খ্রীষ্টের আগমনের সাফল্যকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করতে পারেনি। বরং তাঁর সম্পর্কে বলা সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীরই তিনি পূর্ণতা দিয়েছিলেন। বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই অনেকে তাঁকে প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট হিসেবে পেয়েছিল, আবার অনেকেই তা হারিয়েছিল। এতে করে যীশু খ্রীষ্টের কিছুই এসে যায় না। তাঁর হারাবার কিছু ছিল না। দায়ূদের সন্তান হিসেবেই খ্রীষ্ট যিহূদী সমাজের কাছে কথিত ও প্রার্থিত ছিলেন; তাই যীশুকে যারা খ্রীষ্ট হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তারা তাঁকে দায়ূদের সন্তান হিসেবেই সম্বোধন করেন (১৫:২২; ২০:৩১; ২১:১৫)। জাগতিকভাবে খ্রীষ্ট ছিলেন দায়ূদ ও অব্রাহামের সন্তান। কিন্তু প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্টের গৌরবান্বিত রূপ শুধু এতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি সেই দায়ূদের সন্তান ছিলেন যিনি মহান রাজা এবং সেই অব্রাহামের সন্তান ছিলেন যিনি অনেক জাতির পিতা। সুসমাচার-লেখক সেই নিগূঢ় সত্য উদ্‌ঘাটনে এখানে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

খ্রীষ্টকে দায়ূদ এবং অব্রাহামের সন্তান সম্বোধনের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন যে ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞার প্রতি বিশ্বস্ত এবং তিনি তাঁর প্রতিটি কথাই রাখেন। এই প্রতিজ্ঞাটি ঠিক সেরকমভাবেই বাস্তবায়িত হয়েছে।

(ক) যদিও তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়ন করতে একটা দীর্ঘ সময় নিয়েছেন; যেমন– অব্রাহামের কাছে ঈশ্বর যখন প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তার এক পুত্রের মাধ্যমে গোটা পৃথিবী দয়া লাভ করবে তখন তিনি ভেবে বসলেন যে ঈশ্বর বুঝি তাঁর ঔরসজাত সন্তানের কথাই বলেছেন। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, সেই প্রতিজ্ঞাত সন্তানের দেখা পেতে পৃথিবীকে অব্রাহামের পর বিয়াল্লিশ প্রজন্ম এবং প্রায় দু'হাজার বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ঈশ্বর

কখনো কখনো তাঁর অনেক আগে করা প্রতিজ্ঞার বাস্তবায়ন করেন অনেক পরে। মনে রাখুন, ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে দীর্ঘ সময় নিলেও তা কখনো দুর্বল হয়ে পড়ে না। যদিও অনেক সময় আমরা তা না বুঝে ধৈর্য হারিয়ে ফেলি; কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত দয়া পেতে আমাদের তাঁর প্রতিজ্ঞার ওপর আস্থা রাখতে হবে। কারণ তিনি তা অবশ্যই পূরণ করবেন।

(খ) কখনো কখনো ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা অনেককে নিরাশ করে তোলে। অব্রাহাম ও দায়ূদের সন্তান যীশু খ্রীষ্ট যিনি স্বর্গীয় মহিমায় ভাস্বর, তিনি এমন একটি সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন যখন অব্রাহামের বংশধরেরা রোমান শাসনের ভারী জোয়াল টানতে টানতে ক্লান্ত ও নিরাশ হয়ে পড়েছিল। সে সময় যীশু খ্রীষ্ট এসেছিলেন শুকনো ভূমিতে সতেজ চারার মতো আশা জাগিয়ে। মনে রাখুন, ঈশ্বর তাঁর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে এমন একটি সময় বেছে নেন যখন সবকিছু বিরুদ্ধে চলে যায়, যা কখনো কখনো অসম্ভব মনে হয়।

৩. ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নের একটি ধারা আছে। বংশাবলি শাস্ত্রে যেমনটা আমরা বংশ-তালিকা প্রর্বতনের বিষয়ে দেখি তেমনটি আমরা অব্রাহামের ক্ষেত্রেও দেখে থাকি যে তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞার যে ছবিটা আঁকা হয়েছিল তা ক্রমশ নিচের দিকে বিস্তৃত হয়ে ফলপ্রসূ হয়ে উঠেছে।

(১) বংশ-তালিকার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে আমরা সুনির্দিষ্ট কয়েকটি দিক সম্পর্কে জানতে পারি: এখানে একটা অবাক করা ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় যে যীশু খ্রীষ্টের পূর্বপুরুষরা ছিলেন তাঁদের ভাইদের মধ্যে কনিষ্ঠ । যেমন- অব্রাহাম নিজেও ছিলেন কনিষ্ঠ ভ্রাতা, এভাবে যাকোব, যিহূদা, দায়ূদ প্রমুখ। এই ঘটনাসমূহ ছিল খ্রীষ্ট সম্পর্কে এক পূর্বাভাস যে তিনি পৃথিবীর রাজপুত্রের মতো আসবেন না; সেটা যেমন জ্যেষ্ঠতার ব্যাপারে সত্য তেমনি আড়ম্বড়তা বা জাঁকজমকের ক্ষেত্রেও সত্য। এছাড়াও খ্রীষ্ট যে ঈশ্বরের নিরূপিত সময়ে গৌরবের সঙ্গে ঈশ্বরের ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে আসবেন, প্রশংসা ও সম্মানের ভাগী হবেন সে সম্পর্কেও উপরোক্ত ঘটনাসূত্র আমাদের অবগত করে।

(২) যাকোবের ছেলেদের মাঝে এখানে বেছে নেয়া হয়েছে শুধু যিহূদাকে: 'যাকোবের ছেলে যিহূদা ও তার ভাইয়েরা'। এখানে যিহূদার অন্য ভাইদের সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। এমনকি অব্রাহামের অন্য ছেলে কিংবা ইসহাকের ছেলে এষৌর বিষয়েও এখানে উল্লেখ করা হয়নি; যদিও যাকোবের বারো ছেলের মাঝে যিহূদাকেই যীশু খ্রীষ্টের পূর্বপুরুষরূপে গণ্য করা হয় তবুও এখানে তাদের উল্লেখ আছে; কারণ তারা ঈশ্বরের ব্যবস্থার অংশী ছিলেন (প্রেরিত ৭:৮)। যারা এই তালিকায় বাদ থেকে গেছে তারা ঈশ্বরের মহাপরিকল্পনার বাইরে ছিল। আর এর অন্তর্নিহিত কারণ ছিল বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়া ইস্রায়েলের সেই বারো গোষ্ঠীকে উৎসাহিত করা, যেন তারা একই লক্ষ্যে খ্রীষ্টের বিষয়ে চিন্তা করতে পারে। এভাবেই যিহূদার সাথে তাদের যেমনটা রয়েছে সেরকম একটি সম্পর্ক খ্রীষ্টে গড়ে তুলতে পারে।

(৩) যিহূদার অন্য ভাইদের ক্ষেত্রে যেমনটা দেখা যায় অনুরূপভাবে যিহূদার জমজ সন্তান পেরস ও সেরেহ উভয়ের নাম এখানে বিবৃত হয়েছে। যদিও পেরস ও সেরহের মাঝে পেরসই যীশু খ্রীষ্টের পূর্বপুরুষ ছিলেন। পেরস ও সেরহের জন্ম রূপক হিসেবে ভবিষ্যতের একটা ছবি আমাদের কাছে তুলে ধরে। মায়ের গর্ভ থেকে সেরহ প্রথম হাত

বের করেন যে কারণে তিনি বড়, কিন্তু তিনি হাত ভেতরে টেনে নিলে পেরস বের হয়ে আসল। ঠিক তেমনি যিহূদী-মণ্ডলী সেরহের মতো অগ্রজ হলেও একসময় অবিশ্বাসের কারণে তাদের হাত গুটিয়ে নেয়। অপরদিকে অযিহূদী-মণ্ডলী পেরসের মতো সমস্ত বাধা ভেঙে তার জন্মের অধিকার নিয়ে সদর্পে এগিয়ে যেতে থাকে। যেমনটা লেখা আছে রোমীয় ১১:২৫,২৬ পদে "অযিহূদীদের সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বেশিরভাগ ইস্রায়েল সন্তানদের অন্তর কঠিন হয়েই থাকবে। আর যখন সেরহের জন্ম হবে তখন গোটা ইস্রায়েল জাতি পরিত্রাণ পাবে।"

(৪) বংশ তালিকায় যে চারজন স্ত্রীলোকের কথা উল্লেখ আছে তাদের মাঝে দু'জন ইস্রায়েল সমাজে ছিলেন আগন্তুক। রাহব ছিলেন কেনানীয় এবং রুত মোয়াবীয়। যীশু খ্রীষ্টের জন্য গ্রীক কি যিহূদী সেটা কোন ব্যাপার ছিল না; সে কারণেই এই দুই বিজাতীয় স্ত্রীলোক খ্রীষ্টের বংশ-তালিকায় যুক্ত হয়ে গৌরবের ভাগী হয়েছিলেন। বাকি দু'জন অর্থাৎ তামর ও বৎশেবা ছিলেন ব্যভিচারিণী; সাধারণ দৃষ্টিতে যা ছিল আমাদের প্রভুর জন্য অবিশ্বাস্য। এই অবিশ্বাস শুধু একারণেই নয় যে, তাদের মধ্য দিয়ে যীশু খ্রীষ্টের বংশের ধারা প্রবাহিত হয়েছে, উপরন্তু তাদের কথা কোনো রাখঢাক ছাড়াই বংশ-তালিকায় এসেছে।

এই ঘটনা এক অনুপম সত্যকে তুলে ধরে যে, যীশু খ্রীষ্ট 'পাপী মানুষ'– এর জন্য এই পৃথিবীতে এসেছিলেন (রোমীয় ৮:৩)। যারা তাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়েছিল, তাদের এমনকি সবচেয়ে নিকৃষ্ট পাপীকেও তিনি গ্রহণ করে তাঁর সহভাগিতা দিলেন। মনে রাখুন, যাদের গায়ে অপবাদ থাকে তাদের কিংবা তাদের বংশগরিমা নিয়ে আমরা উচ্চকিত হই না; কারণ সেগুলো কোন কাজে আসে না; শুধুমাত্র যা প্রশংসার যোগ্য, সেরা সে-সবই উচ্চকিত গলায় কথিত হয়ে থাকে। আমাদের প্রভুর নিজের ক্ষেত্রেও এমনটাই ঘটেছিল। 'শলোমন, দায়ূদ এবং উরিয়ের বিধবা স্ত্রীর সন্তান'– এ কথা উল্লেখ করার মাধ্যমে দায়ূদ যে পাপ করেছিলেন তার প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করে (ড. হুইটবির মতে)। কিন্তু অনুতাপ করার মাধ্যমে দায়ূদের কাছে ঈশ্বরের করা প্রতিজ্ঞার বাস্তবায়নে সব বাধা দূরীভূত হল। ঈশ্বর অনুতপ্ত দায়ূদকে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে এই নারীর (বৎশেবা) মধ্য দিয়েই তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার পথে এগিয়ে যান।

(৫) যদিও বংশ-তালিকায় উল্লিখিত ব্যক্তিদের মাঝে অনেকেই রাজা ছিলেন তবুও শুধুমাত্র দায়ূদের নামের আগেই 'রাজা' উপাধি ছিল (৬ পদ); কারণ ঈশ্বর তাঁর কাছে রাজত্বের চুক্তি এবং তাঁর বংশেই যে খ্রীষ্ট তাঁর অনন্তকালীন রাজত্বের গোড়াপত্তন করতে আসবেন সেই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এই খ্রীষ্ট সম্পর্কে এই কথাও বলা হয়েছিল যে তিনি তাঁর পিতা দায়ূদের সিংহাসনে বসবেন (লূক ১:৩২)।

(৬) যিহূদার বংশ-তালিকায় যোরাম ও ঊষিয়ের মাঝে তিনটি নাম অনুল্লিখিত আছে: অহসিয়, যোয়াশ ও অমৎসিয়; ঊষিয় কিন্তু সরাসরি যোরামের ছেলে নয়, পর্যায়ক্রমে যোরামের ছেলে অহসিয়, অহসিয়ের ছেলে যোয়াশ, যোয়াশের ছেলে অমৎসিয় এবং অমৎসিয়ের ছেলে-ই এই ঊষিয়। যেহেতু এখানে বলা হয়েছে যোরামের ছেলে ঊষিয়, তাই বুঝে নিতে হবে যে যোরামের পরবর্তী প্রজন্ম হিসেবে ঊষিয়কে সমান্তরাল বংশধর হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। হিব্রু ভাষায় বিষয়টিকে এভাবেই দেখানো হয়েছে। যেমনটা হিষ্কিয়কে বলা হয়েছিল যে, সেই সন্তানেরা যারা তাঁর বংশে জন্ম নেবে তাদের বাবিলে নিয়ে যাওয়া

হবে। সে কারণেই তাঁর কাছ থেকে কয়েক প্রজন্মকে অপসারণ করা হয়েছিল। এই তিন প্রজন্ম– পিতার অনুক্ত থেকে যাওয়াটা কোন ভুলের ফলাফল নয় কিন্তু খুব সম্ভব বংশ-তালিকায় তাদের অনুপস্থিতি নিয়ে সুসমাচার-লেখক ভেবেছিলেন। তিনি হয়তো চেয়েছিলেন যেন যারা এই বংশ-তালিকায় প্রকৃত অর্থেই যোগ্য তাদেরই তিনি রাখবেন। আর কার্যত করেছিলেনও তাই। আবার অনেকে এরকমও বলে থাকেন, তাদের এই না থাকাটা প্রকৃতই ছিল মথির চিন্তা-প্রসূত। আবার মনে রাখার সুবিধার্থেও তিনি এরকমটা করে থাকতে পারেন। যে কারণে তিনি খ্রীষ্টের পূর্বপুরুষদের 'তিন-চৌদ্দ'তে বিন্যাস করেছেন। হয়তো একারণেই এর প্রয়োজন হয়েছিল যে সেই সময়টাতে সেই তিনের পালা শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং আর কেউ এর জন্য উপযুক্ত ছিলেন না যারা ছিল সমসাময়িক অভিশাপপ্রাপ্ত অথলিয়ের সন্তান; যারা দায়ূদের ঘরে আহাবের মতো মূর্তিপূজা করতে শুরু করেছিল। ফলে তাদের অসাধুতার কারণে তাদের পরিবার এবং তৃতীয়-চতুর্থ প্রজন্মকেও শাস্তির ভাগী হতে হয়েছিল। তিনজনের মধ্যে দুজনই ছিলেন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী এবং জীবন্ত ঈশ্বর এ কারণে এই পৃথিবীতেই তাদের শেষ অবস্থা এমন করেছিলেন যা দেখে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীরা ভয়ে আঁতকে উঠবে। তিনি তাদের প্রতি তাঁর অসন্তুষ্টির প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন এভাবে: কবরে যাওয়ার আগে এদের প্রত্যেককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল।

(৭) সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে এখানে রাজাদের মধ্যে ভালো-মন্দের এক অদ্ভুত মিশেল দৃষ্টিগোচর হয়। এদের কেউ কেউ ছিলেন ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ভাল এবং কেউ কেউ তাদের কাজ দিয়ে কিনেছেন ঈশ্বরের অভিশাপ (৭, ৮ পদ)। এর কয়েকটি উদাহরণ দেখুন: দুষ্ট রহবিয়াম জন্ম দিয়েছিলেন দুষ্ট অবিয়কে; অবিয়ের ছেলে আসা আবার ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী চলতেন; এই আসার ছেলে যিহোশাফট সদাপ্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁর ছেলে যোরাম কিন্তু আবার তার পিতার দেখানো পথে না হেঁটে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন। ঈশ্বরের দয়া রক্তের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় না যতক্ষণ না কেউ নিজে পাপের দাসত্ব বরণ করে। কেউ যদি ঈশ্বরের দয়া লাভ করে তবে তা ঈশ্বরের প্রতি তার অবিচল বিশ্বাসের জন্যই হয়; অপরদিকে কেউ সেই দয়া তার নিজের পাপের কারণেই হারিয়ে থাকে।

(৮) ১১ এবং ১২ পদে বাবিলে বন্দিত্বের উল্লেখ একটি সন্ধিক্ষণ হিসেবে পরিগণিত হয়। সবদিক মেনে নিয়ে এখানে এক আশ্চর্য বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, যিহূদীরা বাবিলে তাদের বন্দিত্বের কারণে অন্যান্য জাতির মতো নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেনি। এর কারণ হয়তো এটাই যে, তাদের নিয়ে ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা ছিল তা পূরণে তাদের কিছুটা পরিশুদ্ধ হয়ে আসার প্রয়োজন ছিল। কারণ খ্রীষ্ট যে তাদের মধ্য দিয়ে আসবেন– তেমনটাই ঈশ্বরের পরিকল্পনা ছিল। যে কারণে এই লোকেদের মৃতসাগর অবধি পার হতে হয়েছিল। তাদের এই বন্দিত্বের মাঝে ধ্বংস নয় বরং ঈশ্বরের দয়ারই প্রমাণ মেলে। আর সেই দয়া ছিলেন খ্রীষ্ট নিজেই (যিশাইয় ৬৫:৮,৯)। একজন কিন্তু ইস্রায়েলের বন্দিদশায় থেকেও খ্রীষ্টের নিমিত্তে এক নিরাপদ আশ্রয় দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন দানিয়েল। যিনি সেই অবস্থায়ও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের দৃষ্টি রেখে ইস্রায়েলের ভবিষ্যত মুক্তির বিষয়টি অনুধাবন করেছিলেন (দানিয়েল ৯:১৭)।

(৯) এখানে ১১ পদে বলা হয়েছে 'যোশিয়ের ছেলে যিকনিয় এবং তার ভাইয়েরা'; যিকনিয়ের দ্বারা এখানে যোশিয়ের প্রথম সন্তান যিহোয়াকিমের কথাই বোঝায়; কিন্তু ১২

পদে আমরা দেখতে পাই যিকনিয়ের ছেলে শলটিয়েল; এই যিকনিয় ছিলেন সেই যিহোয়াকিমের ছেলে যাকে বাবিলে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং যেখানে শলটিয়েলের জন্ম হয় বলে ড. হুইটবি মনে করেন। যখন যিকনিয় সম্পর্কে লেখা হয় যে তিনি নিঃসন্তান ছিলেন– তখন তা এ কথাকেই সমর্থন করে। যিরমিয় ২২:৩০ পদে তার সম্পর্কে বলা হয়েছে 'তার বংশে কেউ সফল হতে পারবে না'। শলটিয়েলের ছেলে হিসেবে বংশ-তালিকায় সরুব্বাবেলকে দেখানো হয়েছে; কিন্তু মূলত শলটিয়েল পদায়ের জন্ম দেন এবং সেই পদায়ের ছেলেই হচ্ছেন সরুব্বাবেল (১ বংশাবলি ৩:১৯)। এর আগেই আমরা দেখেছি যে, কখনো কখনো নাতিকেও ছেলে হিসেবে ডাকা হয়েছে। পদায়-এর ব্যাপারটাও সেরকমই। তিনি তার পিতার জীবদ্দশায় মারা যান। ফলে তার জায়গায় তার ছেলেকে শলটিয়েলের ছেলে হিসেবে দেখানো হয়েছে।

(১০) যিহূদীদের বংশ-তালিকা ছিল পুরুষ-প্রতিনিধিত্বমূলক। যীশু খ্রীষ্টের বংশ-তালিকায় যোষেফই ছিলেন এর সর্বশেষ সংযোজন, মরিয়ম নন; যোষেফকে মরিয়মের স্বামী হিসেবে বেছে নেয়ার ফলে যিহূদীদের নিয়ম কিংবা বংশ-তালিকা দুই-ই অক্ষুণ্ন থাকল (১৬ পদ)। যীশুর বংশ-তালিকায় যোষেফকে মরিয়মের স্বামী হিসেবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু এই যোষেফের সাথে যীশুর কোন শারীরিক বা রক্তের সম্পর্ক ছিল না; ঈশ্বর দায়ূদের কাছে তারই বংশে খ্রীষ্টের আসবার বিষয়ে যে প্রতিজ্ঞা তা পূরণ করতে যোষেফকে বেছে নিয়েছিলেন। এই ঘটনা আরেকটি সত্যকেই আমাদের সামনে তুলে ধরে যে, দায়ূদের বংশে প্রতিশ্রুত খ্রীষ্টের আগমন এবং রাজ্য প্রতিষ্ঠা পৃথিবীর নিয়মে হয়নি; বরং তা ছিল অনেক গৌরবে পূর্ণ।

(১১) বংশ-তালিকায় সবগুলো ধারা যেন এক সাথে যীশু খ্রীষ্টের সাথে এসে মিলে গেল (১৬ পদ)। ইনিই তিনি যাঁর সম্পর্কে সবাই অত্যন্ত আগ্রহভরে অপেক্ষা করছিল, যিনি ছিলেন সবার কাছেই পরম প্রার্থিত; যাঁর দিকে বিভিন্ন গোষ্ঠীপিতারাও তাকিয়েছিলেন যে, তিনি এসে তাদের কথিত রাজ্যে নিয়ে যাবেন। ফলে তারা তাদের সন্তানদের বিষয়েও আশাবাদী হয়ে উঠতে চাইতেন যে, হয়তো বা এদেরই মধ্য থেকে খ্রীষ্ট আসবেন! আর তাদের এনে দেবেন অনেক সম্মান ও গৌরব। ঈশ্বরের অশেষ আশীর্বাদে আমাদের এখন আর তাদের মতো সংশয় ও অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে থাকতে হচ্ছে না, যেমনটা যীশুর পূর্বপুরুষরা ছিলেন। কিন্তু আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি যে, ইস্রায়েলের সেই রাজাদের বা ভাববাদীদেরও খ্রীষ্ট সম্পর্কে ভাসা ভাসা জ্ঞান ছিল। তারা মূল বিষয়টি ধরতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আমরা যদি ভুল না করি তবে সেই সম্মান আমরা পেতে পারি যা পেতে সেই গোষ্ঠীপিতারা আগ্রহী ছিলেন। কারণ যীশু নিজেই সে বিষয়ে বলেছেন যে, যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে তারাই তাঁর সাথে ঘনিষ্ট আত্মিক সম্পর্ক তৈরিতে সক্ষম হয়। যে সম্পর্ক যীশুর বংশ-তালিকায় থাকা ব্যক্তিদের চেয়েও অনেক মহান ও গৌরবের (১২:৫০)।

যীশুকে 'খ্রীষ্ট' বলা হয়; যার মানে 'অভিষিক্ত'। এ নামেই তাঁর কথা ঘোষণা করা হয়েছিল; হিব্রুতে বলা হয় 'মেসাইয়া'। তাঁকে বলা হয় খ্রীষ্ট যিনি আমাদের রাজা (দানিয়েল ৯:২৫) এবং কখনো তাঁকে বলা হয়েছে 'ঈশ্বরের সেই খ্রীষ্ট' (গীত ২:২)। পুরাতন নিয়মে আমরা কতগুলো অভিষেক করার ঘটনা দেখি: দায়ূদ– যিনি রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছিলেন (১ শমূয়েল ১৬:১৩), ঠিক সেভাবে হারোণ পুরোহিত হিসেবে (লেবীয় ৮:১২), ভাববাদী হিসেবে ইলিশায় (১ রাজাবলি ১৯:১৬) এবং যিশাইয়কে অভিষেক করা হয়

(যিশাইয় ৬১:১)। এদের প্রত্যেকেই ঈশ্বরের সেই খ্রীষ্টের কথা ঘোষণা করেছিলেন। সবচেয়ে গৌরবের ব্যাপার হল যে খ্রীষ্ট উপরের সবগুলো পদের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন। যে কারণেই তাঁকে খ্রীষ্ট বলে ডাকা হয়; তাঁকে তাঁর পূর্বেকার অভিষিক্ত ব্যক্তিদের চেয়ে অনেক বেশি তেল দিয়ে অভিষিক্ত করা হয়। তাঁর নামে যারা অভিষেকপ্রাপ্ত তাদের তাই খ্রীষ্টিয়ান বলে ডাকা হয় কারণ তারা খ্রীষ্টের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর ইচ্ছা পালনের জন্য অভিষেক লাভ করেছে।

পরিশেষে খ্রীষ্টের বংশ-তালিকার শেষে আমরা গোটা তালিকার একটি সংক্ষিপ্ত কথন দেখতে পেলাম (পদ ১৭), যেখানে স্মরণীয় কালকে চিহ্নিত করে বিয়াল্লিশ পুরুষকে তিনভাগে সংক্ষেপিত করা হয়েছে। প্রথম চৌদ্দ পুরুষে অব্রাহাম থেকে বংশ-তালিকা বিস্তৃত হয়ে কীভাবে তা দায়ূদ পর্যন্ত এল তা দেখা যায়, অর্থাৎ প্রথম চৌদ্দ পুরুষে উঠে এল দায়ূদের পরিবার। একে যদি সকাল বলে ধরি তবে মধ্যাহ্নে অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাগে তা প্রস্ফুটিত হয়ে ঔজ্জ্বল্য ছড়ালো। এবং তৃতীয় ভাগে আমরা দেখি যা ধীরে ধীরে পশ্চিমাকাশে সূর্যের ঢলে পড়ার মতো করে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে লাগল। শেষাবধি পূর্বের সেই শৌর্য, ক্ষমতা, বিত্ত হারিয়ে যা এক কাঠমিস্ত্রির পরিবারে গিয়ে ঠেকল; যেখান থেকে খ্রীষ্ট তাঁর ইস্রায়েলীয় লোকদের জন্য পূর্ণ মহিমায় আগের সবার চেয়ে আরও বেশি করে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন।

মথি ১:১৮-২৫ পদ

মানুষের বেশে খ্রীষ্টের পৃথিবীতে নেমে আসার যে রহস্য তা আমাদের সীমিত বোধ দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। একে বুঝতে হলে ভালবাসতে হবে; সন্দেহ দ্বারা এই রহস্য কেবল ঘনীভূতই হবে। যেমন আমরা জানি না কী করে মায়ের গর্ভে মানুষের দেহ গঠিত হয়, কী করে সেই শিশুদের ভেতরে জীবন-বায়ু প্রবেশ করে (উপদেশক ১১:৫)। বরং এর চেয়ে এটা বোঝা সহজ যে, ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহের শক্তিতে খ্রীষ্টকে একজন কুমারী নারী, মরিয়মের গর্ভে বড় করে তুলেছিলেন। কারণ তিনি তা পারেন। দায়ূদ যখন মায়ের গর্ভে তাঁর বেড়ে ওঠার বিষয়টি চিন্তা করে সদাপ্রভুর প্রশংসা করছিলেন তখন তিনি প্রকারান্তরে খ্রীষ্টের এই পৃথিবীতে নেমে আসার একটা ছবিই তুলে ধরেছিলেন; যে কী করে তিনি পবিত্র আত্মার শক্তিতে জন্মলাভ করবেন (গীত ১৩৯:১৩-১৬)। এখানে এমন কিছু ঘটনার বিবরণ রয়েছে যা লূকের লেখা সুসমাচারে নেই; এমনকি সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনাও মথি এখানে করেছেন। যেমন:

ক. আমাদের প্রভুর মা, মরিয়ম যোষেফের বাগদত্তা ছিলেন। তার সাথে যোষেফের বিয়ের ঠিক হয়েছিল। পুরোপুরি বিয়ে না হলেও যাকে সে সময় নিশ্চিতভাবেই বিয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ বলে ধরা হতো। এই চুক্তির মাধ্যমে নারী ও পুরুষ পরস্পর বৈবাহিক-বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা কী তা বোঝা সাপেক্ষে বিয়ের প্রস্তুতি গ্রহণে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিজ্ঞা করতেন। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে এই প্রতিজ্ঞা করা হতো বলে তা খুবই পবিত্র ছিল। দ্বিতীয় বিবরণ ২০:৭ পদে আমরা এক ব্যক্তিকে দেখি যিনি একজন নারীর সাথে বিবাহের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েও তাকে গ্রহণ করেননি। খ্রীষ্ট একজন কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যিনি আরেকজনের বাগদত্তা ছিলেন। আমরা এখানে দেখতে পাই যে,

(১) বৈবাহিক সম্পর্কের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার জন্য এবং মরিয়ম যাতে লোকদের

সামনে লজ্জায় না পড়েন সেজন্য যোষেফ তাকে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। কারণ হচ্ছে যোষেফ নিজের জায়গায় পরিষ্কার থাকার জন্যই সে কাজ করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন এসে যায় যে, এ ঘটনার দায়ভার কার উপর বেশি বর্তাতো যখন মরিয়ম তাঁর বাগদত্তা ছিলেন?

(২) ঈশ্বরের অনুগ্রহধন্য কুমারীর কৃতিত্ব রক্ষার জন্য অন্যভাবেও কাজটি করা যেত। বিয়ের মাধ্যমে মরিয়মের এ ব্যাপারটি রক্ষা পেল এবং মানুষের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠলো। একজন প্রাচীন বিজ্ঞ মানুষ এ সম্পর্কে বলেন, 'যীশুর বিষয়ে যেমনটা বলা হয়েছিল যে 'এই-ই কি সেই কাঠমিস্ত্রির ছেলে নয়?' এর জায়গায় 'এই-ই কি সেই বেশ্যার ছেলে নয়?' বলাটা হতো খুবই স্বাভাবিক।"

(৩) সেই আশীর্বাদে ধন্য কুমারীর এমন একজনের প্রয়োজন ছিল যিনি তাঁর তারুণ্যে ভরা দিনগুলোতে, একাকীত্বে, যাত্রাপথে তাঁকে সঙ্গ দেবেন এবং এমন একজন সঙ্গী হবেন যাঁর কাছে বিভিন্ন প্রয়োজনে যাওয়া যায়। ব্যাপারটা এমন যে যোষেফ তাঁর স্ত্রীকে হারিয়েছেন কারণ যীশু খ্রীষ্টের ভাই বলে যাদের উদ্দেশ করা হয়েছে তারা ছিলেন যোষেফের আগের পক্ষের স্ত্রীর সন্তান (১৩:৫৫)। এ নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। যোষেফ ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ পক্ষান্তরে মরিয়ম ছিলেন সতী। যেহেতু বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসীর বিশ্বাসের পথ চলায় অনেক ভিন্নতা রয়েছে, তাই বিয়ে করার জন্য একজন বিশ্বাসী যেন তার মতো বিশ্বাসীকেই খুঁজে নেন। কারণ বিয়ের মাধ্যমে যে সম্পর্ক তৈরি হয় তা অপ্রতিবন্ধক করে তোলার জন্য এবং এই বিয়েতে ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্যই তা করা জরুরি। কারণ ঈশ্বর চান না বিশ্বাসীদের কেউ অবিশ্বাসীদের সঙ্গে অসম জোয়ালীতে কাঁধ দিক। এই উদাহরণ থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, তাড়াহুড়ো না করে অনেক ভেবেচিন্তে আমরা যেন বৈবাহিক সম্পর্কে প্রবেশ করি এবং বিবাহের জন্য চুক্তিবদ্ধ হতেও যেন আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা কী তা জানার চেষ্টা করি। তাই, ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না।

খ. মরিয়ম যোষেফের সাথে মিলিত হবার আগেই প্রতিজ্ঞাত সন্তান গর্ভে ধারণ করেছিলেন যা ছিল আসলে পবিত্র আত্মারই আশ্চর্য কাজ। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সারার পূর্বেই মরিয়ম গর্ভবতী হবার ফলে যোষেফের সাথে তাঁর বিয়ে অনেক বিলম্বিত হয়; যদিও তিনি যোষেফের বাগদত্তা হবার পরই গর্ভে সন্তান আসার বিষয়টি বুঝতে পারেন। সম্ভবত মরিয়ম তার আত্মীয়া ইলিশাবেতের বাড়িতে তিন মাস কাটিয়ে আসার পরই এই ঘটনাটি ঘটেছিল (লূক ১:৫৬)। তখনই তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে তিনি গর্ভবতী আর যোষেফও সে ব্যাপারে জানতে পারলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে অবজ্ঞা করেননি; কারণ তিনি ঈশ্বরের পরিকল্পনার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন।

মনে রাখুন, খ্রীষ্ট যখন কারও ভেতরে আসেন তখন তা বাইরে থেকেও বোঝা যাবে; এই 'খ্রীষ্ট-দর্শন' সম্ভব হয় ব্যক্তির কাজের মধ্য দিয়ে; যা মানুষের সামনে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করে তোলে। ঈশ্বরের অনুগ্রহধন্য এই কুমারী নারী যে কি ভীষণ পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিলেন তা বুঝতে আমাদের এখন বিন্দুমাত্রও অসুবিধে হয় না। তিনি নিজে জানতেন যে এটা স্বর্গীয় আশ্চর্য কাজে হয়েছে, কিন্তু মানুষের সামনে তা কীভাবে প্রমাণ করা সম্ভব? তাঁকে তো তখন অসতী হিসেবে সমাজে পরিচিত হতে হবে!

মনে রাখুন, কেউ উন্নতি করলে অনেকে তাদের কথা দিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলে।

আমরা আবার এটা পছন্দও করি। কারণ আমরা সবসময় অন্যদের কাছ থেকে ভাল ব্যবহার প্রত্যাশা করি। কিন্তু অনেক সময় মহৎ বা বড় কিছু করলে নিন্দা-সমালোচনারও মুখোমুখিও হই যা আমাদের গায়ে কাঁটার মতো, হাড়ে ছুরির মতো বিঁধে। পৃথিবীর প্রথম নারী হবার বংশধরের আর কোন নারীকেই মরিয়মের মতো এমন প্রতিকূল পরিস্থিতির সামনে পড়তে হয়নি। সহ্য করতে হয়নি এমন নিন্দা-বিদ্রুপ যা তিনি নিজে করেননি। যদিও আমরা শাস্ত্রের কোথাও এর কোন উল্লেখ দেখতে পাই না; কিন্তু এ কথা মনে রাখতে হবে যে তিনি সতী, নির্দোষ ছিলেন বিধায় সবকিছু সহজভাবে নিজের মাঝে চেপে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। এই গুণের কারণেই ঈশ্বর তাঁকে ধার্মিক হিসেবে তাঁর মহা পরিকল্পনার অংশী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

মনে রাখুন, যারা নিজেদের বিবেককে পরিষ্কৃত রাখে ঈশ্বর তাদের পুরস্কৃত করেন; নিজেদের সম্পর্কে গর্বভরে আলোচনা করা থেকে যারা বিরত থাকে এবং ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে ঈশ্বর নিজেই তাদের সম্মানিত করার ভার তুলে নেন। শুধু যে তিনি তাদের পাপ থেকে পরিষ্কৃত করেন তা-ই নয় বরং তিনি তাদের দুপুরের সূর্যের মতো প্রকাশ্যে সম্মানিত করেন।

গ. ঘটনার আকস্মিকতায় যোষেফ হতোবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তখন মরিয়মকে বিয়ে করার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। ভাবতে মোটেও অসুবিধা হয় না যে যোষেফ মানসিকভাবে কতটা হতাশ, সমস্যায় জর্জরিত হয়েছিলেন। যাঁকে তিনি বিয়ে করার জন্য তাঁর বাগদত্তা হিসেবে বেছে নিলেন, তাঁর এভাবে গর্ভবতী হয়ে পড়াটা মেনে নিতে মানুষ হিসেবে যোষেফের স্বভাবতই কষ্ট হওয়ার কথা। যে নারী এরকম পাপের সাথে জড়িত তার সাথে একই ছাদের নিচে তিনি কীভাবে বাস করবেন! আর কীভাবেইবা তাকে নিজের স্ত্রী হিসেবে মেনে নেবেন! 'এই কি সেই মরিয়ম?' যোষেফ তখন ভাবতে বসলেন, 'যাকে ভাল বলে জানি সে কীভাবে এমনতর প্রতারণা করল! যাঁকে নিয়ে আশার স্বপ্ন বুনলাম সে কী করে এমন হতাশার চাবুক ছুঁড়ে মারল!" ভাবতে ভাবতে তাঁর অসুস্থ হয়ে পড়ার যোগাড়। যে মরিয়মকে তিনি সতী বলে জানতেন তাঁর গর্ভবতী হয়ে পড়ার খবর শুনে তিনি নিজেকে বঞ্চিত, প্রতারিত ভাবার প্রয়াস পেয়ে ঠিক করলেন যে, মরিয়মকে তিনি ত্যাগ দেবেন। কারণ এরকম একটি মেয়েকে নিয়ে সারা জীবন সংসার করাটা অসম্ভব। তাঁকে ক্ষমা করাটাতো আরও গর্হিত কাজ। একদিকে নিজেকে প্রতারিত ভেবে মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিলেন; অন্যদিকে মরিয়মের প্রতি ভালবাসার দরুন আরও মুষড়ে পড়েছিলেন। ভালবাসা ও ঈর্ষার এক চরম দ্বন্দ্ব তাই যোষেফের মনে আপনা থেকেই কাজ করতে থাকে।

লক্ষ্য করুন,

(১) যোষেফ মরিয়মের অবস্থার চরম প্রকাশের কথা চিন্তা করে তা এড়িয়ে যেতে উদ্যত হয়েছিলেন। তিনি তাঁকে লোকের সামনে লজ্জায় ফেলতে চাইলেন না। তিনি হয়তো তা-ই করতেন কারণ ব্যবস্থা মতে বাগদত্তা স্ত্রীলোক যদি ব্যভিচার করতো তবে তাকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হতো (দ্বিতীয় বিবরণ ২২: ২৩, ২৪)। কিন্তু তিনি চাইলেন না যে ব্যবস্থা অনুযায়ী মরিয়মের উপর এই ব্যবস্থা গৃহীত হোক বা মরিয়ম ব্যভিচার করার অপরাধে পাথরের আঘাতে মৃত্যুবরণ করুক। যদিও তাঁর জানার উপায় ছিল না যে মরিয়ম দোষী কি নির্দোষ ছিলেন; আর প্রকৃতপক্ষে মরিয়ম দোষী ছিলেন কি না সেটা তার পক্ষে

জানাও সম্ভব ছিল না। মরিয়মের ব্যাপারে যোষেফ যে অবস্থান নিলেন তা পুরাতন নিয়মে বর্ণিত যিহূদার নেয়া পদক্ষেপের চেয়ে কতটা ভিন্ন তা যিহূদার এই কথাতেই বোঝা যায়, 'ওকে বের করে এনে পুড়িয়ে ফেলা হোক' (আদি ৩৮: ২৪)। বস্তুত যিহূদাও যোষেফের মতো একই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সেখানে ছিলেন তার ছেলের স্ত্রী তামর; আর এখানে যোষেফের বাগদত্তা মরিয়ম। মরিয়মের ক্ষেত্রে যোষেফ যা করেছিলেন তা যিহূদার চেয়ে বহুগুণে ভাল ছিল– এ কথা ভাবতেও ভাল লাগে। আমাদের বিচার কাজে কিংবা বিরূপ সমালোচনায় যদি যোষেফের মতো সুচিন্তিত পর্যবেক্ষণের ছাপ থাকত তাহলে তা অবশ্যই ক্ষমাপূর্ণ এবং আরও সহনশীল হতো। সে সময় মরিয়মকে শাস্তির সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়ার মানে হতো লজ্জা-মৃত্যুতে লোকদের সামনে তার দৃষ্টান্ত হয়ে যাওয়া। ব্যবস্থা মতে এরকম শাস্তি দেয়ার বিধান ছিল এই কারণে যে, যারা তা প্রত্যক্ষ করবে তারা যেন সাবধান হয়ে যায়। এ ধরনের কাজ করার কথা তারা যেন ভুলেও ভাবতে না পারে তাই এ ধরনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ছিল সবার জন্য একটা সতর্কবাণী। যা দেখে সবাই ভয়ে শিউরে উঠবে আর তাদের কেউই প্রত্যক্ষ করা শাস্তি নিজের ঘাড়ে নিতে চাইবে না।

রক্ষণশীল, ব্যবস্থা পালনে কঠোর ব্যক্তিরা যোষেফের এই সরলতার জন্যে হয়তো ভর্ৎসনা করতে চাইবেন; কিন্তু এখানে যোষেফ সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তা মনে করে দেখুন, কারণ 'তিনি ছিলেন ধার্মিক এবং ভাল মানুষ' যে কারণে তিনি ঈশ্বরের সেই ক্ষমাশীলতার গুণ দেখাতে পেরেছিলেন। যোষেফ শেষ পর্যন্ত তো একজন মানুষই ছিলেন; যে কারণে তিনি মরিয়মকে লোকের সামনে লজ্জায় ফেলতে চাননি। ঈশ্বর যেভাবে আমাদের ক্ষমা করেন সেভাবেই তিনিও মরিয়মকে ক্ষমা করলেন; কারণ ঈশ্বরের শিক্ষা তাঁর মাঝে ছিল। ব্যবস্থা মতে একজন নিরাপরাধ কুমারী যার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে সে যদি অনিচ্ছায় কারও দ্বারা ধর্ষিত হয় তবে তাকে কিছুই করা হতো না (দ্বিতীয় বিবরণ ২২:২৬)। এরকম দয়াযুক্ত নিয়ম-কানুনের কথা যোষেফ জানতেন; বোধকরি সে কারণেই এই ঘটনায় তাঁর এরকম প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। অন্য আর একটি কারণ হতে পারে যে, তিনি চাইছিলেন যেন তাঁর চরিত্রের যে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি রয়েছে তা অটুট থাকে। এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে যোষেফ আমাদেরই মতো একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন। মনে রাখুন, অনেক সময় আমরাও এরকমটা করতে উদ্যত হই। জীবনে আমরাও এমন অনেক পরিস্থিতির মুখোমুখি হই; কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে আমরা নিজেদের আরও ভদ্র, নিষ্কলঙ্ক প্রমাণে সচেষ্ট হয়ে উঠি। প্রথমে তাদের দিকে সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তার মঙ্গল কামনা করি, পরে দোষারোপে অন্যদেরও ছাড়িয়ে যাই। ব্যবস্থার কঠোরতা কখনো কখনো অবিচারের চূড়ান্ত হয়। বিবেকের যে আদালত যা ব্যবস্থার কাঠিন্যকে সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করে তাকেই আমরা ন্যায়বিচার বলি। যারা দোষী বলে সাব্যস্ত হয় এমনকি সে যে অপরাধ করেছে তা যদি ক্ষমার অযোগ্যও হয় তবে তার উপর ভারি শাস্তির বোঝা না চাপিয়ে তাকে যদি আত্মকথনের-অনুতাপ করার সুযোগ দেয়া হয়, ভাল হবার পথ প্রদর্শন করে পরামর্শ দেয়া হয় তবে তার ভেতরের ভাল মানুষটাকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব হয়। কারণ অন্যায়– পরবর্তী শাস্তির কথা মনে করে হলেও সে তখন নিজেকে সংযত রাখতে শিখবে।

(২) যোষেফ একটি সহজ সমাধানের পথ খুঁজেছিলেন। কারণ গর্ভবতী মরিয়মের শেষ অবস্থা উপনীত হওয়ার আগেই তিনি তাকে গোপনে ছেঁড়ে দিতে চাইলেন। এই ছেড়ে

দেয়ার ক্ষেত্রে তাকে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হতো তা হল– দু'জন সাক্ষীর সামনে মরিয়মের হাতে ত্যাগপত্র তুলে দিয়ে নিজেদের মাঝেই ঘটনাটি চাপা দেওয়া। একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে, যিনি মোশির ব্যবস্থার বিষয়ে ভালভাবে জানতেন তিনি মরিয়মকে বিয়ে না করেই তাঁকে ছেড়ে দেয়ার সমাধান খুঁজলেন। এই কাজ করতে তিনি যতটা সম্ভব গোপনীয়তা বজায় রাখতে চাইলেন। কারণ তিনি মরিয়মকে লোকদের সামনে লজ্জায় ফেলতে চাননি। মনে রাখুন, বুদ্ধিদীপ্ততার সাথে কোন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে তাকে সমাজের মানুষের নিন্দার হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব। ফলে সমাজ অনাগত এক অপরাধীর হাত থেকে বেঁচে যেতে পারে। জ্ঞানীদের কথা, তাদের কাজ সবই নীরবে হয়ে থাকে। খ্রীষ্ট নিজেও কারও সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হননি, কাঁদেনওনি। খ্রীষ্টীয় ভালবাসা এবং খ্রীষ্টীয় বিচক্ষণতার দ্বারা পাপের বহুমুখী কদর্য প্রকাশকে আড়াল করা যায় এবং এর দ্বারাই একেবারে দূরের অনাত্মীয়কেও পাপের খাদে পতন থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

ঘ. যোষেফের এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা স্বর্গ থেকে পাঠানো এক বার্তায় কেটে গেল (২০, ২১ পদ)। তিনি যখন কী করবেন তা মনস্থ করতে পারছিলেন না তখন ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহের শক্তিতে যোষেফকে দিক-নির্দেশনা দিলেন; তার করণীয়কে অনেক সহজ করে দিলেন। মনে রাখুন, যারা কোনো বিষয় নিয়ে আত্মোপলব্ধি করে, নিজের মনের সাথে শলা -পরামর্শ করে, তারা অবশ্যই ঈশ্বরের কাছ থেকে দিক-নির্দেশনা পাবে। ঈশ্বর অবশ্যই তাদের সহায় হবেন যারা একটি বিষয়ে সুচিন্তিত পর্যবেক্ষণের দৃষ্টি মেলে ধরে। যখন যোষেফ নিজের মনের সাথে পরামর্শ করে নিজেকে লোকসানের খাতায় ফেলে নিজের মর্জি মতো ব্যবস্থা গ্রহণে মন স্থির করলেন ঠিক তখনই ঈশ্বর তার জন্য পরামর্শ পাঠালেন।

মনে রাখুন, ঈশ্বর তাঁর লোকদের জন্য তখনই প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পাঠান যখন তারা হতবুদ্ধি, হতোদ্যম হয়ে পড়ে। মানুষ যা চিন্তাও করতে পারে না সেরকম সহজ এবং আনন্দদায়ী সমাধান একমাত্র ঈশ্বরই দিতে পারেন। যোষেফের কাছে ঈশ্বরের নির্দেশনা সেই স্বর্গদূত নিয়ে এসেছিলেন যিনি মরিয়মের কাছে যীশুর জন্মের সুসংবাদ দিয়েছিলেন; আর তিনি হচ্ছেন গাব্রিয়েল। স্বর্গদূতরা যাঁরা ঈশ্বরের আদেশ পালনে সর্বদা নিয়োজিত থাকেন, সেই তাঁদেরই একজনের দ্বারা মানুষ এখানে পুনরায় সম্মানিত হল। আদমের পাপের ফলে মানুষ ঈশ্বরের কাছে থাকার যে অধিকার হারিয়েছিল, সে সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়ায় স্বর্গদূতের কার্যক্রম মানুষকে উদ্দীপিত করল। ঈশ্বর কত মহান যে, তিনি একটি অদৃশ্য উপায়ে মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্ক রক্ষার জন্য, মানুষের কাছে তাঁর বার্তা পাঠানোর জন্য, স্বর্গদূতদের ব্যবহার করে এক ধরনের যোগাযোগ-সম্বন্ধ রক্ষা করেছিলেন। আমরা এই বিষয়ে নিশ্চিত যে, তারা সবাই পরিচলনার আত্মাপ্রাপ্ত– যারা সব সময় ভাল কাজ করেন। প্রভুর এই স্বর্গদূত যোষেফের ঘুমের সময় স্বপ্নে দেখা দিলেন যেভাবে ঈশ্বর অনেক সময় বংশপিতাদের সাথে কথা বলেছিলেন। এ সময়টাতেই আমরা সবচেয়ে নীরব, বিন্যস্ত থাকি; সে সময় কোন স্বর্গীয় ইচ্ছা জানার পক্ষে সহায়ক হয় কারণ আমরা তখন কিছু গ্রহণ করার জন্য সবচেয়ে ভাল অবস্থায় থাকি। ঈশ্বরের আত্মা শান্ত জলের ওপর দিয়ে যান। সন্দেহ নেই যে এই স্বপ্নে যোষেফ নিশ্চিতভাবেই বুঝেছিলেন, তিনি যা শুনছেন তা স্বয়ং ঈশ্বরেরই কথা; মস্তিষ্কের মিথ্যে কল্পনা নয়।

এখন,

১. যোষেফ মরিয়মকে বিয়ে করার জন্য নির্দেশনা পেয়েছেন। স্বর্গদূত তাকে 'দায়ূদের

বংশধর যোষেফ' সম্বোধন করায় তিনি দায়ূদের সাথে তাঁর সম্পর্কের বিষয়ে ভাবলেন এবং স্বভাবতই তিনি খ্রীষ্টের সাথে তাঁর আশ্চর্য সম্পর্কের সংবাদ গ্রহণে মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে পেরেছিলেন; কারণ সবাই জানতো যে, খ্রীষ্ট দায়ূদের বংশে আসবেন। যারা ক্ষুদ্র, সমাজের চোখে বড় মাপের মানুষ নন তারা অনেক সময় বিরাট সম্মান পেয়ে গেলে তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকেন না; তারা তা রেখে আসতে চান; খ্রীষ্ট যে যোষেফেরই বাগদত্তা মরিয়মের গর্ভে জন্ম নেবেন তা শুনে যোষেফের ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটাই তো ছিল স্বাভাবিক। এক দরিদ্র কাঠমিস্ত্রি তখন ভাবতে লাগলেন, 'যোষেফ, তুমি তো খুবই সাধারণ ছিলে। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনার অংশী হিসেবে তোমাকে যখন বেছে নিয়েছেন, তখন অবশ্যই তুমি মূল্যবান। নিজেকে তুচ্ছ মনে কোরো না; কারণ দায়ূদের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা তোমার মধ্য দিয়েই বাস্তবে রূপ লাভ করতে যাচ্ছে।' আমরা তাই প্রত্যেক প্রকৃত বিশ্বাসীকে বলতে পারি, 'অব্রাহামের সন্তান, কোন ভয় নেই কারণ ঈশ্বর আপনাকে তাঁর সন্তানের অধিকার দিয়েছেন। ভুলে যাবেন না আপনার জন্ম, নতুন জন্মের গুরুত্ব কতখানি।' স্বর্গদূত যোষেফকে যেমন বলেছিলেন, 'মরিয়মকে বিয়ে করতে ভয় পেও না' ঠিক সেভাবে আপনিও বলুন। যোষেফ আসলে মরিয়মকে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে ভয় পেয়েছিলেন কারণ তিনি সন্দেহ করেছিলেন যে, ব্যভিচারের কারণেই মরিয়ম গর্ভবতী হয়েছেন; তাই তিনি তাকে গ্রহণ করে অনাহুত পাপ কিংবা নিন্দা বয়ে আনতে চাননি। কিন্তু ঈশ্বর তাকে বলেছিলেন, 'ভয় পেও না, কারণ এ সন্তান পবিত্র আত্মার অলৌকিক প্রকাশ।' যোষেফ হয়তো মরিয়মের কাছ থেকে পবিত্র আত্মার এই কাজের বিষয়ে আগেই শুনেছিলেন; এমনকি ইলিশাবেৎ তাঁর সম্পর্কে মরিয়মকে যা বলেছিলেন তা-ও তিনি শুনে থাকতে পারেন (লূক ১:৪৩)। ইলিশাবেৎ মরিয়মকে 'প্রভুর মা' বলে সম্বোধন করায় যোষেফ হয়তো তার সীমিত বোধে মরিয়মের এই মহিমান্বিত রূপ সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলছিলেন। ফলে মরিয়মকে বিয়ে করতে ভয় পাচ্ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর সব ভয় দূর হয়ে গেল এই কথায়, 'মরিয়মকে বিয়ে করতে ভয় পেও না'। মনে রাখুন, সন্তুষ্টির সাথে কোন কাজ করতে গিয়ে যাবতীয় ভয়, সন্দেহের অবসান হওয়াটা ঈশ্বরের দয়ারই কাজ।

২. যোষেফকে এই পবিত্র সত্যের বিষয়ে জানানো হয়েছিল যে, তাঁর বাগদত্তা মরিয়ম পবিত্র আত্মার শক্তিতে গর্ভবতী হয়েছেন। ফলে এ নিয়ে যোষেফের মনে আর কোন সন্দেহের অবকাশ রইল না। তিনি মরিয়মকে বিয়ে করার ব্যাপারে নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক আলাপ-আলোচনা থেকে নিজেকে বিরত রাখলেন, কারণ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যেখানে তাঁকে সেই সত্যের বিষয়ে বলছেন, তখন তাঁর মনে সততার বিষয়ে ন্যূনতম 'খণ্ডযুদ্ধের'ও আর অবকাশ রইল না। তাঁকে দু'টি বিষয়ে বলা হয়েছিল:

ক) মরিয়মের গর্ভে যে সন্তান এসেছে তা পবিত্র আত্মার শক্তিতেই হয়েছে; পৃথিবীর কোন মানুষের দ্বারা হয়নি। পবিত্র আত্মা– যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালনা করেন সেই তিনিই এখানে পৃথিবীর মানুষের ত্রাণকর্তার তত্ত্বাবধান করছেন। যেমনটা প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল ঠিক সেইভাবে তিনি খ্রীষ্টের দেহের আদল গড়ে চলেছেন। ইব্রীয় ১০:৫ পদে আমরা দেখি 'কিন্তু আমার জন্য একটা দেহ তুমি তৈরি করেছ'। খ্রীষ্ট এক নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন (গালাতীয় ৪:৪) এবং তিনি সেই দ্বিতীয় আদম যিনি স্বর্গ থেকে এসেছিলেন (১ করিন্থীয় ১৫:৪৭)। তিনি ঈশ্বরের পুত্র এবং তিনি ধন্য এবং তাঁকে গর্ভে ধারণ করায় তাঁর

মা মরিয়মকেও 'সমস্ত স্ত্রীলোকদের মধ্যে ধন্যা' বলে অভিহিত করা হয় (লূক ১:৪২)। প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের পরিবারে খ্রীষ্টের অত্যন্ত সাধারণ জন্মের ফলে তিনি মানবীয় প্রবৃত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। ফলে তাঁর পক্ষেও দুর্নীতি, অনিয়মে গা ভাসিয়ে দেয়াটা হতো স্বাভাবিক; কিন্তু এখানেই আমরা ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাই। দৈহিকভাবে খ্রীষ্ট একশো ভাগ মানুষ হলেও স্বভাবে তিনি ঈশ্বর-ই রইলেন। এর একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে মরিয়মের গর্ভে তাঁর জন্ম স্বাভাবিক নিয়মে হয়নি। ইতিহাসে আমরা এমন কয়েকজনকে দেখতে পাই যারা ঐশ্বরিক শক্তিতে গর্ভধারণ করেছিলেন বলে মিথ্যে দাবি তোলেন; যেমন আলেক্সান্দারের মা। বস্তুত তার দাবি অনুযায়ী সে রকম কিছু আসলেই ঘটেনি। কিন্তু আমাদের প্রভুর মা মরিয়মের ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল তা ধ্রুব সত্য। তাঁর সম্পর্কে করা 'ধন্যা' সম্বোধনটির আসলেই তুলনা নেই। আমরা কোথাও এমনটা দেখতে পাই না যে মরিয়ম তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর যে অনুগ্রহের কাজ করেছিলেন সে জন্য নিজেকে 'ধন্যা' বলে দাবি করেছেন। বরং তিনি তাঁর হৃদয়ে তা গেঁথে রেখেছিলেন, উপরন্তু আমরা দেখতে পাই যে স্বর্গদূতই তাঁকে এই অভিধা দিয়ে পাঠান। যারা বিনম্র এবং নিজেদের করা ভাল কাজের জন্য গৌরবের পেছনে ছোটে না ঈশ্বরই তাদের গৌরবান্বিত করেন।

খ) মরিয়মের যে ছেলে হবে তিনি সমস্ত মানুষকে তাদের পাপ থেকে পরিত্রাণ করবেন (২১ পদ)। এবং এই কাজের মাধ্যমেই মরিয়ম যে ঈশ্বরের মহান পরিকল্পনার অংশী হয়েছেন তার প্রকাশ ঘটবে।

গ) মরিয়মের ছেলেকে এক মহান নাম দেওয়া হল: 'তুমি তাঁর নাম যীশু রাখবে, কারণ তিনি সমস্ত মানুষকে পাপ থেকে পরিত্রাণ করবেন'। পুরাতন নিয়মে বর্ণিত 'যিহোশূয়' আর 'যীশু' একই নাম, গ্রীক ভাষা-কাঠামোর কারণে দু'টো নামের কিঞ্চিত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সত্তরজনের মধ্য থেকে বেছে নেয়া 'যিহোশূয়'কে 'যীশু'-ও বলা হতো (প্রেরিত ৭:৪৫; ইব্রীয় ৪:৮)। পুরাতন নিয়মে এই নামে দু'জনকে পাওয়া যায় যাঁরা খ্রীষ্টের গৌরবান্বিত বৈশিষ্ট্যের আংশিক অধিকারী ছিলেন। কেনান দেশে পদার্পণের সময় যিহোশূয় বনি ইস্রায়েলীয়দের নেতা ছিলেন; আর অন্যজন– যিহোশূয় বাবিলের বন্দিদশা থেকে ফিরে আসার পর ইস্রায়েলীয়দের মহাপুরোহিত ছিলেন (সখরিয় ৬:১১,১২)। খ্রীষ্ট ছিলেন সেই যিহোশূয় যিনি আমাদের পরিত্রাণদানে নেতৃত্ব দেন; তিনি সেই যিহোশূয় যিনি আমাদের সমস্ত কাজের মহা-পুরোহিত। প্রথমজন যেমন মোশির পরে এসেছিলেন তেমনি খ্রীষ্টও মোশির পরে এসে আমাদের সেই পরিত্রাণ দিলেন যা কখনো ব্যবস্থা পালনের দ্বারা সম্ভব হতো না; তাঁর আসবার ফলে ব্যবস্থা শক্তিহীন হয়ে পড়ল। যিহোশূয়কে মূলত হোশেয় নামে ডাকা হতো কিন্তু মোশি তাঁর নামের আগে 'যিহোবা' নামের প্রথম সিলেবল (একেবারে প্রথম শব্দাংশটি) অর্থাৎ 'ইয়াহ্' শব্দটি বসিয়ে দেয়ায় তাঁর নাম হল যিহোশূয় (গণনা ১৩:১৬ পদ)। আর তিনি এই কাজ করেছিলেন কারণ খ্রীষ্ট– যিনি আসছেন তাঁকেই যিহোবা বলা হবে। কারণ প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট ছাড়া আর কেউ তো মানুষের জন্য পরিত্রাণের নিশ্চয়তা নিয়ে আসেননি। তাই একমাত্র তিনিই এই নামের যোগ্য।

ঘ) খ্রীষ্টের 'যীশু' নামকরণের মূল যে কারণ তা হচ্ছে, তিনি তাঁর লোকদের পাপ থেকে পরিত্রাণ করবেন; লোক বলতে এখানে শুধুমাত্র যিহূদীদেরই কথা বলা হচ্ছে না উপরন্তু পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যারা তাঁকে হৃদয়ে গ্রহণ করবে তিনি তাদের প্রত্যেককে পাপের বন্দিদশা থেকে মুক্ত করবেন। ঈশ্বর যাঁদের মনোনীত করে রেখেছেন তাঁরা এবং

যারা স্বেচ্ছায় খ্রীষ্টের কাছে আসবে তারাই এই পরিত্রাণ পাবে। খ্রীষ্ট যিহূদীদের মধ্য দিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তারা তাঁকে গ্রহণ করেনি। তিনি সেই রাজা– যিনি তাঁর প্রজাদের রক্ষা করেন এবং তিনি ইস্রায়েলের পুরানো দিনের সেই বিচারক যিনি তাঁর লোকদের পরিত্রাণ দেন– যা দিতে ব্যবস্থা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। মনে রাখুন, যারা খ্রীষ্টের, তাদের তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করেন এবং নিজের মৃত্যু দ্বারা পাপের বিরুদ্ধে অর্জিত বিজয় দ্বারা তিনি তাদের পাপের সমস্ত শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেন। খ্রীষ্ট তাঁর লোকদের তাঁর অনুগ্রহধন্য আত্মার শক্তিতে পাপের রাজ্য থেকে বের করে আনেন। তীত ২:১৪ পদে আছে, 'যীশু খ্রীষ্ট আমাদের জন্য নিজের জীবন দিয়েছিলেন যেন সমস্ত পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করতে পারেন এবং তাতে এমন এক দল লোককে শুচি করতে পারেন যারা কেবল তাঁরই হবে এবং যারা অন্যদের উপকার করতে আগ্রহী হবে'। খ্রীষ্ট তাঁর লোকদের জন্য এমন এক পরিত্রাণের ব্যবস্থা করে রেখেছেন যা দ্বারা সমস্ত পাপ এবং পাপের যে শাস্তি তার চির অবসান হয়। এই লোকদের তিনি রাখালের মতো পালন করেন (প্রকাশিত বাক্য ১৪:৪)। তাই যারা তাদের পাপ থেকে ফিরে আসবে এবং নিজেদের খ্রীষ্টের কাছে উৎসর্গ করবে তাদের তিনি সেই মহান পরিত্রাণ দেবেন যেন লোকেরা তাঁর পরিবারের সদস্য হয় (রোমীয় ১১: ২৬)। এই সেই প্রতিজ্ঞাত পরিত্রাণ যার জন্য পৃথিবী শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রতীক্ষায় ছিল।

ঙ) এর মাধ্যমে শাস্ত্রের কথা পূর্ণ হল। যীশুর জন্মের বিষয়ে এত বিস্তারিতভাবে মথির মতো অন্য সুসমাচার-লেখকেরা লিখেননি। পুরো ঘটনাকে পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত, সাবলীল বর্ণনা সন্দেহাতীত ভাবেই অন্যদের চেয়ে তাঁকে আলাদা করেছে। বিশেষ করে যখন তিনি যিহূদীদের মাঝে থেকে লিখছেন। এখানে যীশুর জন্মের মধ্য দিয়ে পুরাতন নিয়মে খ্রীষ্ট সম্পর্কে বর্ণিত সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা পেল। কারণ যীশু-ই সেই খ্রীষ্ট যাঁর আসবার কথা ছিল এবং যাঁর সম্পর্কে পূর্বেকার ভাববাদীরা বলেছিলেন। ফলে আমাদের আর অন্য কারও দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই। যীশুর জন্মের মধ্য দিয়ে শাস্ত্রের যে কথা পূর্ণ হল তা আমরা যিশাইয় ৭:১৪ পদে দেখতে পাই। এখানে ঈশ্বর রাজা আহসকে প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্টের বিষয়ে একটি চিহ্ন দিলেন যা হচ্ছে, 'একজন কুমারী গর্ভবতী হবে;' যেখানে ভাববাদী ঈশ্বরের লোকদের সনহেরিবের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার বিষয়ে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের উৎসাহিত করছেন এবং তাদের দৃষ্টিকে খ্রীষ্টের প্রতি নিবদ্ধ করতে নির্দেশনা দিচ্ছেন যে, যিনি যিহূদীদের মাঝে আসবেন এবং যাঁকে দায়ূদের গৃহ বলা হবে। তখন তা সহজেই অনুমেয় ছিল যে, যদিও সেই লোকেরা এবং সেই গৃহ যন্ত্রণা পাচ্ছিল তবুও তাদের একজনকেও ঈশ্বর ভুলে যাননি। তিনি চাননি যে তার প্রজারা ধ্বংস হয়ে যাক। তিনি তাদের জন্য সত্যিকারের এক অনুগ্রহের কথা ভেবে রেখেছিলেন। পুরাতন নিয়মে বিবৃত ঈশ্বরের সেই মুক্তি হচ্ছে খ্রীষ্টের মাধ্যমে তাঁর পরিত্রাণের ব্যবস্থা। ঈশ্বর যদি মহৎ কিছু করবেন বলে পরিকল্পনা করে থাকেন তবে তা যে পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়িত হবে তা কত না নিশ্চিত।

এখানে ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে অনেকটা ফিরে দেখার মতো করে– যা সবার মনোযোগ এবং সম্ভ্রম আনয়নে যথেষ্ট কার্যকর; কারণ আমরা এখানে ঈশ্বরের রহস্যপূর্ণ কাজের বিষয়ে দেখছি, পড়ছি যীশু খ্রীষ্টের জন্মের বিষয়ে– যা কোন মতভেদ তৈরি করে না, যা মহান এবং মানুষের বেশে ঈশ্বরের এই পৃথিবীতে নেমে আসার নিশ্চিত সত্যের

বর্ণনাকারী।

১. খ্রীষ্ট একজন কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন এটা ছিল একটা চিহ্ন। একজন কুমারী গর্ভবতী হবে আর তাঁর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট পৃথিবীতে আসবেন। 'আলমাহ' শব্দটি দ্বারা সেই কুমারীর নিজের সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার কথা প্রকাশ করা হয়; যে কথাটা মরিয়ম স্বর্গদূতের সাথে তাঁর কথোপকথনের সময়ে বলেছিলেন, 'আমি তো একজন কুমারী' (লূক ১: ৩৪)। এই চিহ্নটি সত্যিকার অর্থেই ছিল অসাধারণ; যেরকমটা পৃথিবীর আর কারও জন্যেই দেওয়া হয়নি। খ্রীষ্ট সম্পর্কে শুরু থেকেই বলে আসা হচ্ছিল যে তিনি কুমারীর গর্ভে জন্ম নেবেন; যখন বলা হল যে তিনি হবেন নারীর বংশধর; তখন তার মানে দাঁড়ায়, তিনি কোন পুরুষের মাধ্যমে আসবেন না। কুমারীর গর্ভে খ্রীষ্টের জন্মের কারণ এই নয় যে তার জন্ম হতে হবে অলৌকিক, অসাধারণভাবে; বরং এই জন্য যে তিনি হবেন নিষ্পাপ, খাঁটি ও পাপের কোন লজ্জা তাঁর মাঝে থাকবে না। খ্রীষ্টের জন্ম হবে এক নারীর গর্ভে, কোন রাণী বা রাজকন্যার গর্ভে জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবের মাধ্যমে নয়। এখানে ব্যবহৃত 'কুমারী' শব্দটি আমাদের নিজেদের পবিত্র রাখতে শিক্ষা দেয়, নিজেদের সমস্ত কামনা-বাসনাকে ত্যাগ করে আমরা যাতে এই নশ্বর পৃথিবীতে থেকেও নিজেদের কলঙ্কমুক্ত রাখতে পারি সেই শিক্ষাই পাই। মরিয়ম যেভাবে তাঁর দেহে যীশুর উপস্থিতিতে ধন্যা হয়েছিলেন তেমনি আমরাও যেন আমাদের হৃদয়ে যীশুকে পাওয়ার জন্য নিজেদের পরিষ্কার রাখি।

২. এই চিহ্নের মধ্য দিয়ে সেই সত্যই প্রতিভাত হয়ে ওঠে যে যীশু ঈশ্বরের পুত্র এবং মানুষ ও ঈশ্বরের মাঝে মধ্যস্থতাকারী; তিনি মানুষের মাঝে ঈশ্বর বা ইম্মানূয়েল; এ কারণে তাঁর নাম 'ইম্মানূয়েল' রাখতে স্বর্গদূত নির্দেশ দিয়েছিলেন; এবং যখন এ কথা বলা হয় যে, তাঁকে এই নামে ডাকা হবে তার মানে হচ্ছে তিনি আমাদের ধার্মিকতার ঈশ্বর। 'ইম্মানূয়েল' নামটি চিত্রিত করে যে ঈশ্বর আমাদের সাথে আছেন; এই নাম রহস্যমণ্ডিত হলেও তা অমূল্য; ঈশ্বর আমাদের মাঝে মানুষের বেশে নেমে আসলেন যেন আমাদের সাথে তাঁর হৃত সহভাগিতা পুনরায় স্থাপিত হয়; তিনি তাঁর চুক্তি ও যীশুর দেওয়া পরিত্রাণের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে যান। যিহূদীরা ঈশ্বরকে জানতো এমন এক ছায়ারূপে যিনি করুবের মধ্যে বাস করেন; ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের এই অসম্পূর্ণ ধারণার কারণে তাদের পক্ষে কল্পনাও করা সম্ভব হয়নি যে কী করে ঈশ্বর মানুষের বেশে আসবেন! ঈশ্বর এবং মানুষের মাঝে শান্তি ও যোগাযোগ স্থাপনে ঈশ্বরের গৃহীত পদক্ষেপ কত মহৎ! কারণ সম্পূর্ণ দুই ভিন্ন প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারীর মাঝে যীশু কত সুন্দরভাবে যোগসূত্রতা স্থাপন করেন! এর দ্বারা তিনি নিজেকে এক অব্যতিক্রমী রেফারি হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। তিনি তার দু'হাত বাড়িয়ে উভয়কে ধরে রেখেছেন যেমনটা তিনি একাধারে মানুষ ও ঈশ্বর দুই-ই ছিলেন। দেখুন পৃথিবীর সবচেয়ে গভীরতম রহস্য এবং সর্বাঙ্গীণ অনুগ্রহকে– যা চিরকালীন। প্রকৃতির আলোতে আমরা দেখি, ঈশ্বর আমাদের অনেক উপরে; যখন আমরা ব্যবস্থার আলোতে দেখি, তখন ঈশ্বর যেন আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন; কিন্তু সুসমাচারের আলোতে যখন আমরা তাঁকে দেখি, তিনি 'ইম্মানূয়েল', তিনি আমাদের সাথেই আছেন– আমাদের নিজেদের প্রকৃতি ও আগ্রহের কেন্দ্ররূপে। এখানে আমাদের ত্রাণকর্তা আমাদের জন্য অনুমোদন করেছেন ভালবাসা। খ্রীষ্টের 'ইম্মানূয়েল' নামের সাথে আমরা সুসমাচারে উল্লিখিত মণ্ডলী তুলনা করতে পারি (যিহিষ্কেল ৪৮:৩৫)। যিহোবা সাম্মাহ– সদাপ্রভু এখানে আছেন, তত্ত্বাবধানকারী ঈশ্বর আমাদের সাথে

আছেন।

তাই এই কথা এখন নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যীশুকে 'ইম্মানূয়েল নামে ডাকা হবে' এই ভবিষ্যদ্বাণীটি বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্যগত দিক দিয়ে পূর্ণতা পেয়েছে, যেমনটা বলা যায় তাঁর 'যীশু' নামের ক্ষেত্রেও। তিনি যদি 'ইম্মানূয়েল' বা আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর না হতেন তবে তিনি 'যীশু' বা আমাদের পরিত্রাণকর্তার হতে পারতেন না; কারণ ঈশ্বর যদি মানুষের বেশে আমাদের মাঝে নেমে না আসতেন তবে আমাদের জন্য পরিত্রাণ পাওয়াটা কখনো সম্ভবপর হতো না। তিনি প্রথমে পৃথিবীতে নেমে আসলেন তারপর তার মৃত্যুর মাধ্যমে পাপের বিরুদ্ধে অর্জিত বিজয় নিয়ে মানুষের সাথে ঈশ্বরের যোগাযোগ-সম্বন্ধ ঘটিয়ে দিলেন। ঈশ্বরের সাথে এই যোগাযোগ আমাদের জন্য যেমন আনন্দের তেমনি এই যোগাযোগ রক্ষা করে চলাটাও আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

চ) যোষেফ স্বর্গীয় নির্দেশের বাধ্য হলেন (২৪ পদ)। তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠে স্বপ্নে দেখা প্রতিটি কথা নিয়ে ভাবলেন। তারপর ঈশ্বরের স্বর্গদূত তাঁকে যা করতে বলেছিলেন তাই করলেন। যদিও এর সাথে তাঁর আগের আবেগ এবং ঠিক করে রাখা করণীয়ের দ্বন্দ্ব ছিল তবুও তিনি সবকিছু একপাশে হটিয়ে দিয়ে মরিয়মকে বিয়ে করলেন। তিনি তা করতে দেরি করলেন না কারণ তিনি যে স্বর্গীয় দর্শন পেয়েছিলেন, তার প্রতি বিশ্বাসে বাধ্য হয়েছিলেন। সদাপ্রভুর কাছে তাঁর বাধ্যতা প্রশ্নের সম্মুখীন হয় এমন কোন কাজ যেমন সময়ক্ষেপণ, অযথা চিন্তা-ভাবনা– তা তিনি করলেন না। তিনি আনন্দের সাথেই সেই কাজ করেছিলেন। বর্তমানে আমরা এরকম অস্বাভাবিক নির্দেশনা প্রত্যাশা করি না। কিন্তু যখন আমরা কোন বিষয়ে সংশয়াচ্ছন্ন হই, করণীয় ঠিক করতে দিশে পাই না তখন তিনি বিভিন্ন উপায়ে আমাদের সাথে এর 'সমাধান' নিয়ে কথা বলেন। যেমন নিয়মানুগ করণীয় সম্পর্কে সূত্র তুলে দিয়ে, বিবেকের বিতর্ক দ্বারা, বিশ্বস্ত বন্ধুদের পরামর্শ দ্বারা তিনি আজও আমাদের সাহায্য করে চলেছেন। এর প্রতিটির দ্বারা স্বাভাবিক লিখিত নিয়ম ব্যবহারে আমরা নিশ্চিতভাবেই আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজে সাফল্য লাভ করে থাকি। যোষেফের মতো আমাদেরও উচিত নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তে তাঁর সেই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে যাওয়া।

ছ) স্বর্গীয় প্রতিজ্ঞা পূর্ণতা পেল (২৫ পদ)। সময় পূর্ণ হলে মরিয়ম তাঁর প্রথম ছেলের জন্ম দিলেন। এই ঘটনার ব্যাপ্তি আরও বিস্তৃত (লূক ২:১)। মনে রাখুন, পবিত্র আত্মার কোন পরিকল্পনা বৃথা যায় না। তাই মরিয়ম নির্দিষ্ট সময়ে সন্তান প্রসব করলেন। শারীরবৃত্তীয় বিভিন্ন কারণে মাঝে মাঝে অনাহুত গর্ভপাতের ঘটনা ঘটলেও খ্রীষ্টের ক্ষেত্রে সেরকম কিছু হবার কোন আশংকাই ছিল না, কারণ স্বয়ং পবিত্র আত্মা তাঁর দেহের আদল গড়েছেন। খ্রীষ্ট যেসব কাজ করবেন তা ঈশ্বর তখনই শুরু করে দিয়েছিলেন; যা ঈশ্বরের অনুগ্রহধন্য তা গৌরবান্বিত চেহারায় প্রকাশিত হবেই হবে।

এখানে আরও লক্ষ্য করা যায়,

১. যোষেফ যদিও তাঁর বাগদত্তা মরিয়মকে বিয়ে করেছিলেন তবুও তিনি সন্তানের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত তাঁর সাথে মিলিত হলেন না। আমাদের প্রভুর মায়ের চিরকালীন সতীত্ব নিয়ে অনেক কথা, অনেক আলোচনা হয়েছে: এটিকে অবজ্ঞা করার জন্যে যেরমি হালভিডিয়াসের উপর রাগান্বিত ছিলেন। এ বিষয়ে নিশ্চিত করে শাস্ত্র থেকে প্রমাণ করার কিছু নেই। ড. হুইটবি শাস্ত্রের সেই পদের বিষয়ে ভাবতে বলেন যেখানে বলা হয়েছে, 'প্রথম সন্তান জন্মের আগে যোষেফ মরিয়মের সাথে মিলিত হলেন না' এর মানে দাঁড়ায় যে

পরবর্তীতে যীশুর জন্ম হবার পর যোষেফ মরিয়মের সাথে ব্যবস্থামতো বৈবাহিক জীবন যাপন করেছেন (যাত্রা ২১:১০)।

২. খ্রীষ্ট ছিলেন প্রথম সন্তান; এবং শাস্ত্রের ভাষা অনুযায়ী তারপরে মরিয়মের আর কোন ছেলে-মেয়ে ছিল না। খ্রীষ্ট শুধু আগে জন্মগ্রহণ করার কারণেই যে 'প্রথম সন্তান' বলে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তা নয় বরং তিনি ছিলেন প্রতিটি সৃষ্টির 'প্রথম জাত' অর্থাৎ সবকিছুর আগেই তিনি ছিলেন এবং তিনি অনেক ভাইয়ের মাঝে প্রথমে জন্মেছেন যেন তিনি সবার মাঝ থেকে নিজের পছন্দমতো লোকদের বেছে নিতে পারেন।

৩. যোষেফ ঈশ্বরের নির্দেশমতোই ছেলের নাম 'যীশু' রাখলেন। ঈশ্বর এই শিশুকে আমাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে মনোনয়ন ও নিয়োগ দিয়েছিলেন; যে কারণে তাঁর নাম 'যীশু' রাখা হল। আমরা অবশ্যই তাঁকে আমাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করব এবং পরিত্রাণকর্তা হিসেবে তাঁর নিয়োগ লাভের বিষয়টি চিন্তা করে আমরা তাঁকে যীশু, আমাদের ত্রাণকর্তা বলে ডাকব।

মথি লিখিত সুসমাচার
অধ্যায় ২

এই অধ্যায়ে আমাদের পরিত্রাণকর্তার শৈশব বর্ণিত হয়েছে; এখানে আমরা দেখতে পাই কত ছোট থাকতেই আমাদের পরিত্রাণকর্তার দুঃখভোগের পালা শুরু হয়েছিল। এ ছাড়া সমস্ত ধার্মিকতা পূর্ণ করার কাজ শুরুর আগেই তাঁর মধ্য দিয়ে কীভাবে ধার্মিকতার বাক্য পূর্ণতা পেল– সে বিষয়েও আমরা এখানে দেখতে পাই।

১. অধীর আগ্রহে পণ্ডিতরা খ্রীষ্টের খোঁজ করেন (১-৮ পদ)।
২. তাঁকে খুঁজে পেয়ে তাঁদের শ্রদ্ধায় মাথা অবনত সম্মান জ্ঞাপন (৯-১২)।
৩. হেরোদের নিষ্ঠুরতার বলি হওয়া থেকে বাঁচতে খ্রীষ্টের মিশর গমন (১৩-১৫ পদ)।
৪. বৈৎলেহমে নির্মম শিশু-হত্যা (১৬-১৮ পদ)।
৫. মিশর থেকে খ্রীষ্টের স্বদেশে ফেরা (১৯-২৩)।

মথি ২:১-৮ পদ

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ওপর যা ঘটেছিল তা তাঁর বিনম্রতার একটা ছবিই আমাদের সামনে তুলে ধরে; কারণ তিনি ছিলেন সব জাতির কাঙ্ক্ষিত জন। যদিও এই পৃথিবীতে তাঁর আগমন খুব অল্পই প্রত্যক্ষ করেছিল এবং কারও কারও মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিল তবুও একথা অনায়াসে বলে ফেলা যায়, তাঁর জন্ম হয়েছিল অনেকটা নিভৃতে, অনাড়ম্বর পরিবেশে: খ্রীষ্ট এখানে নিজেকে নিঃস্ব প্রতিপন্ন করলেন এবং সব ধরনের যশ-খ্যাতি থেকে নিজেকে বিযুক্ত রাখলেন। ঈশ্বরের পুত্রের পৃথিবীতে নেমে আসার মুহূর্তটি কেমন হবে তা চিন্তা করতে গিয়ে যে কেউ এমনটাই ভাববেন যে, দিকে দিকে আনন্দ-উৎসবের ধুম পড়ে যাবে, সেই সাথে তাঁর পায়ের কাছে মূল্যবান রাজদণ্ড-সোনার মোহর এনে রাখা হবে; শুধু তাই নয়, পৃথিবীর সব মহান, প্রতাপশালী রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁর পায়ের ওপর এসে পড়বেন; আর বলবেন, 'আমাকে তোমার দাস করে নাও!" খ্রীষ্ট সম্পর্কে যিহূদীদের ঠিক এমনটাই প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু আমরা এখানে দেখি যে খ্রীষ্টের আগমন তাদের এই পৃথিবীজাত প্রত্যাশা মাফিক হয়নি; তিনি পৃথিবীতে আসলেন কিন্তু পৃথিবী তাঁকে চিনল না। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর নিজ জাতির লোকদের কাছে আসলেন কিন্তু তারা তাঁকে অস্বীকার করল। নিজেকে অবনত করার মধ্য দিয়ে যীশু ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানালেন; কারণ পাপের মধ্য দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অবজ্ঞা করে তাঁকে অসম্মানিত করেছিল; তাই তিনি নিজেকে অস্বীকার ও তুচ্ছ জ্ঞান করলেন; এবং মূর্তিমান ঈশ্বরের যে সম্মান প্রাপ্য তা নিতে রাজি হলেন না। তবুও মানুষ হিসেবে জন্মলাভের মাধ্যমে তাঁর নিজেকে নীচু করার যে দৃষ্টান্ত তা কিন্তু মাঝ আকাশে গৌরবে ভাস্বর হয়ে জ্বলজ্বল করতে থাকল। এ বিষয়ে শাস্ত্রে লেখা আছে, "তাঁর তেজ আলোর মত, তাঁর হাত থেকে কিরণ বের হয়; ঐ স্থান তাঁর পরাক্রমের অন্তরাল।" (হবক্কুক ৩:৪)। কিন্তু একথা বড় লজ্জার যে, সেই আলো পৃথিবীর কাছে তো বটেই যিহূদীদের কাছেও দুর্বোধ্য ঠেকেছিল; এ উদাহরণ একগুঁয়ে যিহূদীদের জন্য চরম নির্বুদ্ধিতার, পৃথিবীকেন্দ্রিক হয়ে

পড়ারই পরিচায়ক।

খ্রীষ্টের জন্মের সুসংবাদের প্রথম প্রচারকেরা ছিল রাখাল; মূলত মেষপালের দেখাশোনা করাই ছিল যাদের প্রধান কাজ (লূক ২:১৫)। খ্রীষ্টের গৌরবান্বিত জন্মের বিষয়ে তারা যা শুনেছিল এবং নিজ চোখে দেখে ছিল তা গিয়ে সবার কাছে বলতে লাগল; আর তাদের কথা শুনে সবাই বিস্ময়াভিভূত হল (লূক ২:১৭-১৮ পদ)। এরপর শিমিয়োন এবং হান্না পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় খ্রীষ্টের পৃথিবীতে আসবার কারণ এবং তাঁর কাজের বিষয়ে বললেন (লূক ২:৩৮)। খ্রীষ্ট সম্পর্কে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী পর্যালোচনা করে কেউ এমনটা ভাবতে পারেন যে, খ্রীষ্ট অবশ্যই যিহূদা ও যিরূশালেমের বাসিন্দা হবেন। যিহূদীরাও ঠিক এমনটাই ভেবেছিল, ফলে তারা তাদের সমস্ত মনোযোগ, আগ্রহ কেবল নির্দিষ্ট স্থানের ওপরই নিবদ্ধ করেছিল। কিন্তু দেখা যায় যে, জন্মের দুই বছর সময়ের পর খ্রীষ্ট তাঁর নিজ বাসভূমে ফিরে আসেন এবং বাস করতে শুরু করেন। কিন্তু তিনি-ই যে খ্রীষ্ট, মহিমান্বিত একজন তা কেউ ধরতে পারল না। মনে রাখুন, যারা গৌরব হারাবে বলে মনস্থ করে বসে আছে কোন কিছুতেই তাদের জাগানো যায় না। যিহূদীরা এক্ষেত্রে যে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছিল তা সত্যিই অকল্পনীয়। তবে তার চেয়েও অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, কথিত অনেক খ্রীষ্টানরাও আজ ঠিক সেই ভুলটিই করছে! আসুন, এবারে একটু পর্যবেক্ষণ করা যাক,

ক. খ্রীষ্ট সম্পর্কে অনুসন্ধানের সময়ের দিকে লক্ষ্য করুন। হেরোদ (তিনি ছিলেন একজন 'ইডোমিট' বা ইদোমীয়; এষৌর বংশধর) তখন যিহূদিয়া প্রদেশের রাজা। এই হেরোদ ছিলেন রোমান প্রধান শাসনকর্তা আগস্ত এবং এন্টোনিয়াসের মনোনীত রাজা। চাতুর্য ও নিষ্ঠুরতার জন্য যার কুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল; তবুও তাঁকে 'মহান হেরোদ' বলে ডাকা হতো। তাঁর রাজত্বের পঁয়ত্রিশতম বছরে খ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর এই জন্মবার্তা নিয়ে এসেছিল যে, যিহূদার রাজদণ্ড এবং বিচার-দণ্ড এখন সরিয়ে নেয়া হল; কারণ শিলো এসেছেন এবং সব জাতি এখন তাঁর আদেশ মানতে প্রস্তুত হয়েছে; এই পণ্ডিতেরা যাঁর সাক্ষী (আদি ৪৯:১০)।

খ. এই পণ্ডিতেরা কারা এবং কী উদ্দেশ্যে তাদের এই আগমন– সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। এখানে তাদের পরিচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে 'পণ্ডিত'। এ স্থলে গ্রিক শব্দ 'মগোই' ব্যবহৃত হয়েছে যার মানে 'ম্যাগি' বা 'ম্যাজিসিয়ান'; বাংলায় 'জাদুকর'; অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যিনি তার কাজে যথেষ্ট দক্ষ এবং নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে পাণ্ডিত্যের অধিকারী। এরা মূলত পার্সিয়ানদের মাঝে 'ধর্মীয় সম্প্রদায়' বলে সুবিদিত ছিল। দর্শন চর্চা, জ্যোতির্বিদ্যা এবং নিজ ধর্মের পুরোহিতীয় কাজই ছিল এদের ধ্যানজ্ঞান। এমন নয় যে তারা বিজাতীয় একজনকে তাদের রাজা হিসেবে পেতে চেয়েছিল। অন্যভাবে দেখলে, তারা বেআইনি শিল্পকলার চর্চা করতো; 'জাদুকর' অভিধাটি তাদের ক্ষেত্রে 'একপ্রকার' পাণ্ডিত্যের সূচক হিসেবে পরিগণিত হলেও শাস্ত্রে শিমোন (প্রেরিত ৮:৯,১১) এবং ইলুমার (প্রেরিত ১৩:৬) ক্ষেত্রে 'জাদুকর' শব্দটি আক্ষরিকভাবে নেতিবাচক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যীশু খ্রীষ্টের উদ্দেশে পুবের পণ্ডিতদের শ্রদ্ধাবনত সম্মান জ্ঞাপন এবং তাদের উপাসনা উৎসর্গ শয়তানের সমস্ত ক্ষমতার বিরুদ্ধে খ্রীষ্টের সর্বজয়ী রূপকেই বর্ণনা করে। এই ঘটনা ছিল ভবিষ্যতের একটা ছবি– যা খ্রীষ্টের অমিত গৌরবের কাছে শয়তানের শক্তিহীন হয়ে পড়ার প্রত্যাশিত সূচনার দিকেই নির্দেশ করে এবং এ-ও বলে দেয় যে 'এ তো কেবল শুরু'। আর যখন সেই পণ্ডিতেরা এমনকি শিশু খ্রীষ্টের প্রতি আনুগত্য দেখালেন এবং তাঁর উপাসনা করলেন তখন

প্রকৃত অর্থেই তা অন্ধকার-শক্তির বিরুদ্ধে খ্রীষ্টের বিজয়ের ট্রফিটি অনেক উর্ধ্বে তুলে ধরল; যা শয়তানের পরাজয়ের কালেরও সূচনা করল। যাহোক, শিশু খ্রীষ্টের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে সেই 'এক প্রকার' পণ্ডিতেরা প্রকৃতপক্ষেই সত্যিকারের পণ্ডিতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন– একথা তো এখন বলাই যায়।

তবে এ সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত যে,

১. তাঁরা ছিলেন অযিহূদী অর্থাৎ ইস্রায়েলীয় সমাজের বাইরের লোক। যিহূদীরা খ্রীষ্টকে তাঁর প্রাপ্য সম্মানটুকু দেয়নি কিন্তু এই বিজাতীয়, পূর্বদেশের তিনজন পণ্ডিত খ্রীষ্টকে খুঁজে বের করেছিলেন। মনে রাখুন, অনেক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন লোকও তাদের একেবারে চোখের সামনে কী ঘটছে সে সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ বনে যায় (দেখুন ৮:১১, ১২)। খ্রীষ্টকে পণ্ডিতদের দেওয়া সম্মান আমাদের এই নিশ্চিত 'ভবিষ্যৎ প্রাপ্তি'র কথা বলে যে, যারা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করবে তারা তাঁর নৈকট্যের সুযোগ লাভ করবে।

২. তাঁরা ছিলেন বিজ্ঞ, মেধাবী। তারা বিভিন্ন ধরনের জটিল শিল্পকলা যেমন: জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শনশাস্ত্রের চর্চা করতেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, একজন মেধাবী, সুপণ্ডিত অবশ্যই একজন ভাল খ্রীষ্টীয় হবেন কারণ খ্রীষ্টকে জানার মধ্য দিয়েই জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে।

৩. তাঁরা পূর্বদেশ থেকে এসেছিলেন; যে দেশ ছিল কুসংস্কারে পূর্ণ আর যার অধিবাসীরা মায়াবিদ্যা চর্চার জন্য সুবিদিত ছিল (যিশাইয় ২:৬)। পূর্বদেশ বলতে মূলত আরবকে বোঝানো হতো (আদি ২৫:৬) এবং তার অধিবাসীদের বলা হতো পূর্বদেশীয় (বিচারকর্তৃকগণ ৬:৩)। আরবীয়রা রাজা দায়ূদ এবং তাঁর পুত্র শলোমনকে যেভাবে সম্মান দেখাত তা এই পণ্ডিতেরাও যীশুর প্রতি দেখাল। যীশুকে দেওয়ার জন্য তারা নিজেদের দেশ থেকে প্রথামত মূল্যবান উপহার সামগ্রীও নিয়ে এসেছিল। যিথ্রো এবং ইয়োব পূর্বদেশীয় ছিলেন। তাদের সম্পর্কে এর বেশি আর বলতে চাচ্ছি না। কথার জের ধরে রমিশ মণ্ডলীর কথা এসে যায়– যারা ভ্রান্ত এক উপকথায় বিশ্বাসী। তারা মনে করে, এই তিন পণ্ডিত তাদেরই পূর্বসূরী (যদিও একজন প্রাচীন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন যে সংখ্যাটা চৌদ্দ)। তারা এ-ও মনে করে যে, এঁরা ছিলেন রাজা; আর যেহেতু তারা বলেন– এরা কবরে শায়িত আছেন তাই তাঁদেরকে 'কলেনের রাজা' বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। নিজেদের জ্ঞানী প্রমাণ করার জন্য আমরা অবশ্যই শাস্ত্রে যা লেখা আছে তার বাইরে যাব না।

গ. খ্রীষ্টকে খুঁজে পেতে পণ্ডিতেরা যার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তা অবশ্যই আলোচনার দাবি রাখে। তাঁরা তাঁদের দেশের আকাশে এমন এক অসাধারণ 'তারা' দেখতে পেয়েছিলেন যা এর আগে কখনো দেখা যায়নি। এই অনন্য চিহ্ন দেখে, বিভিন্ন ধরনের বিচার-বিশ্লেষণ করে তাঁরা অনুধাবন করতে সমর্থ হলেন যে, যিহূদিয়ায় এমন একজন জন্মেছেন যিনি অসাধারণ। একথা আগেই বলা হয়েছে যে, সেই পণ্ডিতেরা জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে তাঁরা সেই সম্পূর্ণ নতুন ও অসাধারণ তারাটির মানে খুঁজে বের করলেন। প্রকৃতপক্ষে সেই তারাটি তাঁদের এক অসাধারণ কিছুর সন্ধান দিয়েছিল। মনে রাখুন, ঈশ্বর তাঁর গড়া প্রকৃতির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন অসাধারণ চিহ্নের ব্যবহারে আমাদের অনেক সময় তাঁর ইচ্ছা বুঝতে সাহায্য করেন। যেমনটা আমরা খ্রীষ্টের ক্ষেত্রে দেখতে পাই। যিহূদী রাখালেরা খ্রীষ্টের জন্মের বিষয়ে জানতে পেরেছিল ঈশ্বরের স্বর্গদূতের মাধ্যমে; অপরদিকে পূর্বদেশীয় পণ্ডিতেরা তা

জেনেছিলেন তারা দেখে। এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে যে, রাখালেরা ও পণ্ডিতেরা তাঁদের নিজ নিজ ভাষায়-ই খ্রীষ্টের জন্মের সুসংবাদ পেয়েছিল। অনেকে মনে করেন, খ্রীষ্টের জন্মের পর রাতের বেলায় রাখালেরা তাদের চারপাশে যে আলোর বিচ্ছুরণ দেখতে পেয়েছিল তা আর পণ্ডিতদের দেখা তারার আলো একই ব্যাপার। কিন্তু এই বক্তব্য সহজে মেনে নেওয়া যায় না, কারণ পণ্ডিতেরা দেশে থাকতে যে তারা দেখে বের হয়েছিলেন তা পরে আকাশের সবচেয়ে জ্বলজ্বলে তারায় পরিণত হল। সেই তারা-ই তাদের পথ দেখিয়ে খ্রীষ্ট যেখানে জন্মেছিলেন সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। পুবের দেশগুলোর মূর্তিপূজাকারীরা আকাশের তারাগুলোকে 'স্বর্গের নিমন্ত্রণকারী' বলে পূজা করতো। তারা আকাশের এই তারা-গ্রহগুলোকে নিজেদের দেবতারূপে পৃথক পৃথক নাম দিয়েছিল। আমোষ ৫:২৬ পদে আমরা তারা-দেবতা কীয়ূনের উল্লেখ দেখতে পাই। এভাবে এতদিন যে তারাগুলো ভুল-ভ্রান্ত উদ্দেশ্যে অনূদিত হয়েছিল তা আজ পণ্ডিতদের খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে যাবার মাধ্যমে সদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হল। এর মাধ্যমে অবিশ্বাসীদের দেবতা আমাদের সদাপ্রভুর দাস হল। অনেকে মনে করেন, এই অজ্ঞাত তারাটিকে দেখে তাদের হয়তো বিলিয়মের করা এই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা মনে পড়ে গিয়েছিল, 'যাকোবের বংশে একটি তারা উত্থিত হবে; ইস্রায়েল জাতির মাঝ থেকে উত্তোলিত হবে একটি রাজদণ্ড (গণনা ২৪: ১৭)।'

বিলিয়মও ছিলেন এই পণ্ডিতদের মতো জ্ঞানী এবং একই অঞ্চলের লোক। আবার অনেকে বলেন, পণ্ডিতেরা তাঁদের এই কৌতূহলী অনুসন্ধান-পর্ব সেরে দেশে ফিরে গেলে এ নিয়ে সেখানে একটা হইচই মতো পড়ে যায়। স্বভাবতই তাদের প্রচারকৃত সংবাদে অনেকে কৌতূহলী-উৎসবমুখর হয়েছিল; যদিও সে সময় কয়েকজন বিখ্যাত রাজা বেঁচে ছিলেন। টাসিটাস তার ইতিহাস গ্রন্থে (লিব. ৫) এর উল্লেখ করেছেন– "অনেকের মনে এই বিশ্বাস বিরাজ করছে যে, অনেক অনেকদিন আগে পুরোহিতেরা তাদের লেখার মাধ্যমে এমন এক সময়ের কথা বলে গিয়েছিলেন যখন পুবের শক্তি প্রবলতর হবে এবং যাঁর মাধ্যমে তা ঘটবে তিনি আসবেন যিহূদিয়া থেকে; আর তিনি হবেন রাজত্ব ও সম্মানের অধিকারী।" সুয়েতোনিয়াস-ও 'ভেসপাসিয়ানের জীবনী গ্রন্থে' এ বিষয়ে বলেছিলেন। ফলে এই অসাধারণ ব্যক্তি পূর্বদেশের লোকদের কাছে অনূদিত হয়েছিলেন 'রাজা' হিসেবে। আমরা তাই ধরে নিতে পারি যে, অনাগত রাজার বিষয়ে শুনে সেই লোকদের মনে অদ্ভুত এক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল; যদিও তারা সেই 'অসাধারণ ব্যক্তি'র সঠিক পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন, তবুও যে তারা আকাশে উদিত তারা দেখে খ্রীষ্টের জন্মের স্বর্গীয় বারতা বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন– তা ঈশ্বরের অনুপ্রেরণাদায়ী আত্মারই কাজ।

ঘ. এবারে আমরা দেখব, কীভাবে পণ্ডিতেরা এই অনুসন্ধান কাজ চালিয়েছিলেন। নতুন এক রাজার খোঁজ করতে এই পণ্ডিতেরা পূর্বদেশ থেকে যাত্রা করে যিরূশালেমে পা রাখেন। যিহূদীদের রাজাকে খুঁজতে তাঁরা যিরূশালেমে কেন? এর উত্তরে বলতে হয়, সে সময় যিরূশালেম ছিল প্রধান নগরী; প্রচুর লোকের সমাগম-স্থল। পণ্ডিতেরা যদি একথা ভাবতেন, "যদি সত্যি সত্যিই কোন রাজা জন্মগ্রহণ করেন তবে তো আমরা আমাদের নিজ দেশে বসেই তা শুনতে পাব; আর তখন সেই রাজাকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান জানানোর পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যাবে" তবে তা কিছুমাত্র দোষের হতো না। কিন্তু সেই প্রতীক্ষিত রাজাকে দেখার জন্য তাঁরা এতই অধীর হয়ে ছিলেন যে তাদের আর তর সয়নি; ফলশ্রুতিতে এক দীর্ঘ পথযাত্রার ধকল সয়েও তাঁরা সম্মুখে অগ্রসর হয়েছিলেন। মনে রাখুন, যারা মনেপ্রাণে

খ্রীষ্টকে জানতে চায়, নিজের মাঝে তাঁর উপস্থিতি অনুভব করতে আন্তরিক ইচ্ছা পোষণ করে, তাদের কাছে জাগতিক পরিশ্রম কিংবা বিপদের ভয় খুবই তুচ্ছ ব্যাপার বলে পরিগণিত হয়। কাজেই, প্রভুকে অনুসরণ করলে আমরা যে তাঁকে জানতে পারব– তা তো অব্যর্থ সত্য, পরম প্রাপ্তির প্রেরণা।

পণ্ডিতদের প্রশ্নটি ছিল, 'কোথায় সেই রাজা যিনি জন্মলাভ করেছেন?' তাঁরা কিন্তু এরকম বলেননি যে, 'এখানে কি মহান কেউ জন্মেছেন? (এর কারণ, তাঁরা খ্রীষ্টের জন্মের বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন বিধায় এমন আত্মবিশ্বাসের সাথে একথা বলতে পেরেছিলেন; তাঁদের বলার ধরণই প্রমাণ করে যে এ বিষয়ে তাঁদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না) কিন্তু তাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন, 'তিনি কোথায় জন্মেছেন?' মনে রাখুন, খ্রীষ্টকে জানতে হবে ভালভাবে, ভাসা ভাসা ভাবে জানলে চলবে না। তাঁরা খ্রীষ্টকে 'যিহূদীদের রাজা' বলে সম্বোধন করেছিলেন। যিহূদীদের এই রাজা ছিলেন সেই প্রতিজ্ঞাত 'খ্রীষ্ট' যিনি সমস্ত ইসরাইলের আত্মিক পরিচালক ও রক্ষাকর্তা।

খ্রীষ্ট যে জন্মেছেন– সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মনে কোন সন্দেহ না থাকায় কারও কাছ থেকে প্রত্যাশিত উত্তর না পেয়ে কিংবা যিরূশালেমের লোকেরা যে তাঁদের নতুন রাজাকে নিয়ে উৎসবে মেতে উঠছে না– তা দেখেও তাঁরা হতাশ হননি। বরং তাঁরা প্রতিটি ঘরে ঘরে গিয়ে সেই একই প্রশ্ন করেছিলেন; যদিও কারও কাছ থেকেই তাঁরা তাঁদের কাঙ্ক্ষিত উত্তরটুকু পাননি। মনে রাখুন, আজও খ্রীষ্ট পৃথিবীতে এরকম অবহেলার মুখোমুখি হচ্ছেন– যা আমাদের জানা নেই। সবচেয়ে অবাক করা তথ্য হচ্ছে যে, অনেক মণ্ডলীতেও খ্রীষ্ট সেই একই ব্যবহার পেয়ে যাচ্ছেন। তারা মনে করে, এই মণ্ডলী, এই মতবাদ তাদের খ্রীষ্টের দিকে চালিত করছে কিন্তু বাস্তবিকই তারা খ্রীষ্টের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। যিরূশালেমের মেয়েদের মতোই তারা বলে, 'আমার হৃদয় যে হরণ করেছে তাঁকে দেখেছ?' কিন্তু এটাতো দিনের আলোর মতোই সত্য যে তারা ঈশ্বরের দেওয়া জ্ঞানে চলছে না। যাহোক, দ্বারে দ্বারে গিয়ে পণ্ডিতেরা বিভিন্ন জনের কাছে জানতে চাইছেন, 'যিহূদীদের যে রাজা জন্মেছেন তিনি কোথায়?' এই করতে গিয়ে তাঁরা অবধারিতভাবেই কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন, 'আপনারা তাঁর খোঁজ করছেন কেন?' তাঁরা তখন তাঁদের দেশ, পরিচয় দিয়ে সেই অত্যাশ্চর্য তারার বিষয়টি বললেন। এরপর তাঁদের দিকে প্রশ্নের বাণ ছুটল, 'তাঁকে খুঁজে আপনাদের লাভ? যিহূদীদের রাজার সাথে পূর্বদেশের লোকদের কী সম্বন্ধ থাকতে পারে?' পণ্ডিতদের কাছে এইসব প্রশ্নের উত্তর তৈরিই ছিল, 'আমরা তাঁর উপাসনা করতে এসেছি।' এর সঙ্গে তাঁরা হয়তো যুক্ত করেছিলেন যে, সেই নতুন রাজার জন্মের বিষয়ে নিশ্চিতভাবে জেনেই তাঁরা এসেছেন যেন সময় মতো তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান ও সমর্থন জানানো যায়। মনে রাখুন, যাদের মনে খ্রীষ্টকে জানার প্রচণ্ড তাড়না অনুভূত হয় তারা খ্রীষ্টের সেই মহাজ্ঞান লাভ করবে; আর সেই জ্ঞান যেন একমাত্র তাঁর উপাসনা-কাজেই ব্যবহৃত হয়– সেটাই ঈশ্বর চান। আমরা কি আমাদের হৃদয়ে খ্রীষ্টের সেই জ্বলজ্বলে তারাটি দেখেছি? আসুন, আমরা তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান, সৎ কাজ উপহার দিতে সচেষ্ট হই।

৬. আমরা এখন জানি যে পণ্ডিতদের কাছ থেকে সারা যিরূশালেমে নতুন এই রাজার জন্মের সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল। এবারে আমরা দেখব, পণ্ডিতদের অনুসন্ধানের বিষয়টি জানার পর সেখানকার লোকদের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। যিহূদীদের নতুন রাজার জন্মের

সংবাদ যখন রাজা হেরোদের কাছে গিয়ে পৌঁছল তখন তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন (৩ পদ)। এই উদ্বিগ্নতা যে রাজত্ব, ক্ষমতা হারানোর আশংকাজাত তা বলাই বাহুল্য। উল্লেখ্য, হেরোদ পুরাতন নিয়মে বর্ণিত খ্রীষ্টের বিষয়ে অবগত ছিলেন; শুধু তাই নয়, শাস্ত্রে খ্রীষ্টের আসবার সময় সম্পর্কে ভাববাদীরা যা বলে গিয়েছেন সে সম্পর্কেও তিনি ছিলেন সম্যক অবগত। কিন্তু নিজের রাজত্বকে আরও দীর্ঘস্থায়ী আর নিজেকে সফল রাজা হিসেবে দেখতে পেয়ে হেরোদ অহংকারী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি এই ভেবে আশাবাদী হতে শুরু করেছিলেন যে, ভাববাদীদের বলা এসব প্রতিশ্রুতি, ভবিষ্যদ্বাণী শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। ফলে শাস্ত্রের সব কথা ভ্রান্ত প্রমাণিত হবে; আর তার রাজত্ব কোনদিন শেষের মুখ দেখবে না। সে কারণেই রাজার জন্মের খবরে তিনি এতোটাই ক্রোধান্বিত, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। নিজের চোখে রাজত্ব-বধের ছবিটা দেখতে পেয়ে মনে মনে ভেবেছিলেন, 'হে রাজা, এই তোমার আসবার সময় হল!' মনে রাখুন, লালসাপূর্ণ অন্তর শাস্ত্রের শিক্ষা, সাবধান-বাণীকেও অবজ্ঞা করে।

খ্রীষ্টের জন্মের সংবাদ পেয়ে ইদোমীয় হেরোদ ক্ষিপ্ত, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেও কিছু সংখ্যক লোক যারা ইস্রায়েলের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের অপেক্ষায় ছিল তারা কিন্তু আনন্দিত হয়েছিল। এখানে আমরা দেখতে পাই, যিরূশালেমের অন্য সবাই হেরোদের উদ্বিগ্নতায় নিজেরাও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের এই উদ্বিগ্নতার মূলে ছিল অজ্ঞতা ও নিজেদের স্বার্থচিন্তা। তারা হয়তো ভেবেছিল, নতুন এই রাজার আবির্ভাবে তাদেরকে নিশ্চিত গৃহযুদ্ধের মুখোমুখি হতে হবে; যার ফলে বিনষ্ট হবে দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা। এ ছাড়াও তারা বুঝে উঠতে পারছিল না, নতুন এই রাজা কী আইন নিয়ে আসবেন, কোন্ আদর্শের ভিত্তিতে দেশ চালাবেন; শেষে তাদের নিঃস্ব হতে হয় কিনা! এরকম অনেকগুলো দ্বন্দ্ব, পরস্পর বিরোধী চিন্তা তাদের মাথায় এসে ঘুরপাক খাচ্ছিল। যে কারণে তারা নতুন এই রাজার আবির্ভাবকে স্বাগত জানায় নি; উপরন্তু হেরোদের প্রতি তাদের আনুগত্য আরও ঢেলে দিয়েছিল। মনে রাখুন, ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে গৌরবময় স্বাধীনতা লাভের চেয়ে অনেকেই বোকার মতো পাপের গোলামিতে শৃঙ্খলিত থাকাকেই শ্রেয় জ্ঞান করে। এর একটি কারণ হচ্ছে, তারা সবসময় বর্তমান নিয়েই বেশি ভাবিত। ফলে চোখের সামনে কোন বাধা, সমস্যা দেখতে পেলে খ্রীষ্টকে হৃদয়ে আহ্বান জানাতে বিপর্যস্ত বোধ করে। খ্রীষ্টের রাজ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা থেকে হেরোদ এবং যিরূশালেমের লোকেরাও ঠিক এভাবেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। তারা ভেবেছিল, খ্রীষ্ট হয়তো জাগতিক ক্ষমতা লাভে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়বেন; অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় নাক গলাবেন। কিন্তু আকাশে যে তারা দেখে পণ্ডিতেরা খ্রীষ্টের খোঁজে সুদূর পূর্বদেশ থেকে যিরূশালেমে এসে পা রেখেছিলেন সেই তারা কিন্তু খ্রীষ্টের স্বর্গ-রাজ্যের কথাই ঘোষণা করেছিল; যে রাজ্য ক্ষমতাকেন্দ্রিক জাগতিক রাজনীতি থেকে একেবারেই বিযুক্ত। মনে রাখুন, পৃথিবীর মানুষেরা ও রাজারা খ্রীষ্টের রাজ্যের বিরোধিতা করেছিল এই কারণে যে, তারা সে রাজ্য সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ছিল। আর এই অজ্ঞতার দায়ভার সম্পূর্ণরূপে তাদের নিজেদেরই।

চ. প্রধান পুরোহিত ও ধর্ম-শিক্ষকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সূত্র পণ্ডিতদের অনুসন্ধান-কাজকে সফল করে তুলতে সাহায্য করেছিল (৪-৬ পদ)। কেউ যখন যিহূদী-রাজার অবস্থান সম্পর্কে বলতে পারছিল না তখন রাজা হেরোদ নিজেই উদ্যোগী হলেন। তিনি সব প্রধান পুরোহিত ও ধর্ম-শিক্ষককে ডেকে পাঠালেন। এই পুরোহিতরা ছিলেন মূলত শিক্ষক–

যারা সবসময় ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত থাকতেন। অপরদিকে ধর্ম-শিক্ষকরা ছিলেন ব্যবস্থার চর্চাকারী; যাদের ঠোঁটে সবসময় জ্ঞানপূর্ণ কথা লেগেই থাকত। বিভিন্ন শিক্ষা, উদ্ভূত সমস্যার সমাধান খোঁজার জন্য লোকেরা তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত (মালাখি ২:৭)। খ্রীষ্ট যে বৈৎলেহমে জন্মগ্রহণ করবেন– সে কথা তখন প্রায় সবাই জানতো (যোহন ৭:৪২); কিন্তু হেরোদ লোকদের মতামত জেনে তা নিজের পক্ষে নিয়ে আসার জন্য একটি পরামর্শসভা ডাকলেন। প্রহসনমূলক এই সভা আহ্বানের মাধ্যমে তিনি সবাইকে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন যে, রাজা হিসেবে তিনিই সবার প্রথম পছন্দ, কোন অনাহূত রাজার এখানে প্রয়োজন নেই। আর তিনি কাদের ডেকেছিলেন! সবাই পুরোহিত এবং ধর্ম-শিক্ষক– এর মতো যিহূদী সমাজের প্রতিনিধিত্ব ও নেতৃত্বদানকারী পদে আসীন। নতুন রাজার সংবাদে গোটা রাজ্যে যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ও গুমোট হাওয়া বইছিল তা দূর করতে ডাকা এই পরামর্শসভায় রাজা হেরোদ তাঁর সভাসদদের উদ্বিগ্নতা দেখে খুব প্রীত হলেন। তবুও সিংহাসনকে নিষ্কন্টক করতে তিনি তাদের কাছে জানতে চাইলেন, পুরাতন নিয়মমতে খ্রীষ্ট কোথায় জন্মগ্রহণ করবেন। সাদা চোখে দেখলে হেরোদের করা এই প্রশ্নকে নির্দোষ, ভাল মনে না করার কোন কারণ নেই; কিন্তু আমরা জানি যে, অনেক নির্দোষ প্রশ্নের ভেতরেও অনেক সময় অত্যাসন্ন দোষের ছাপ লেগে থাকে। হেরোদের করা সেই প্রশ্নটিরও উদ্দেশ্য ছিল দূরভিসন্ধিমূলক। তিনি পরিষদের সামনে সেই প্রশ্নটি করেছিলেন তাঁর ভবিষ্যৎ দুষ্কর্মের বৈধতা লাভের নিমিত্তে।

হেরোদের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য পুরোহিত ও ধর্ম-শিক্ষকদের সময়ক্ষেপণের কোন কারণ ছিল না। ফলে কোন প্রকার মতদ্বৈধতা ছাড়াই তারা উত্তরে খ্রীষ্টের জন্মস্থান হিসেবে বৈৎলেহমের নাম বললেন। যে বৈৎলেহেমকে বলা হতো দায়ূদ-নগর এবং যা ছিল যিহূদিয়া প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। এখানে 'যিহূদিয়া প্রদেশ'– এর কথা নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছিল যেন কেউ এই বৈৎলেহমের সাথে সবূলূন– এর বৈৎ-লেহমকে গুলিয়ে না ফেলে (যিহোশূয় ১৯:১৫)। বৈৎলেহেমকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যেত 'রুটির ঘর' হিসেবে। খ্রীষ্ট, যিনি স্বর্গ থেকে নেমে আসা সত্যিকারের মান্না, তাঁর জন্মের জন্য আসলেই এই বৈৎলেহেম নগর ছিল আদর্শ; কারণ মানুষকে আখেরী জীবনদানের উদ্দেশ্যেই তো তাঁর এই ধূলিমলিন পৃথিবীতে নেমে আসা। ধর্ম-শিক্ষক ও পুরোহিতেরা তাদের উত্তরের প্রমাণ হিসেবে দাখিল করেছিলেন পুরাতন নিয়মের মীখা শাস্ত্রের ৫:২ পদ। যেখানে খ্রীষ্ট সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, যিহূদার হাজার হাজার গ্রামগুলোর মধ্যে বৈৎলেহেম যদিও ছোট এবং জায়গা হিসেবেও তা কারও পছন্দের নয় তবুও তার মধ্য থেকে এমন একজন আসবেন যিনি হবেন সবার থেকে মহান। মূলত এই মহামানবের আগমনেই বৈৎলেহেম সম্মানিত হয়েছিল; যার কাছে অন্যান্য নগরের জনসংখ্যা কিংবা সেগুলোর রাজাদের জাঁকজমক, আনুষ্ঠানিকতার বহর খুবই তুচ্ছ বলে প্রতিভাত হয়। সমগ্র যিহূদিয়ার মধ্যে বৈৎলেহেমকে তার ক্ষুদ্রত্বের কারণে গোণায় না ধরলেও গীত ৮৭:৬ পদে এই নগরকে ইস্রায়েলের মধ্যে সবার উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, জাতিদের তালিকাবদ্ধ করার সময় সদাপ্রভু বলবেন, 'তিনি (খ্রীষ্ট) সিয়োনে জন্মেছেন'। তাই এই স্থান থেকেই যিহূদীদের রাজা-শাসনকর্তা আসবেন বলে শাস্ত্রে উদ্ধৃত হয়েছে। মনে রাখবেন, খ্রীষ্টকে যারা তাদের জীবনের পরিচালনার ভার দিতে আগ্রহী, খ্রীষ্ট শুধুমাত্র তাদেরকেই তাদের পাপ থেকে পরিত্রাণ করেন।

বৈৎলেহেম ছিল দায়ূদের নগর। রাজা দায়ূদই ছিলেন এই নগরের একমাত্র গৌরব। তাই দায়ূদের পুত্রেরও তো সেখানেই জন্মগ্রহণ করার কথা। বৈৎলেহমের দরজার কাছে একটি বিখ্যাত কূয়া ছিল– যার জল খেতে রাজা দায়ূদ আকুল হয়েছিলেন (২ শমূয়েল ২৩:১৫)। খ্রীষ্টে আমরা শুধু সেই জীবন রুটিই পাই না, উপরন্তু জীবন জলের পেয়ে থাকি; রাজা দায়ূদের মতো আমাদেরও তাই সেই জল পান করার জন্য আকুল হওয়া উচিত। যাহোক, এখানে লক্ষ্য করার মতো একটি ব্যাপার রয়ে গেছে; আর তা হচ্ছে, যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে যিহূদীরা এবং অযিহূদীরা কীভাবে জানতে পেরেছিল। অযিহূদীরা খ্রীষ্টের জন্মের সময়ের বিষয়ে জেনেছিল তারা দেখে, পক্ষান্তরে যিহূদীরা খ্রীষ্টের জন্মস্থান সম্পর্কে জেনেছিল শাস্ত্র দেখে। এর ফলে দু'টি ভিন্ন জাতির মধ্যে তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে উভয়ে উপকৃত হয়েছিল।

মনে রাখুন, এভাবে আমরা আমাদের জানা বিষয়গুলো অন্যদের সাথে শেয়ার করার মাধ্যমে নিজেরাও অনেক অজানা তথ্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠি। এই প্রক্রিয়া আমাদের জ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। মানুষ পণ্য বেচাকেনা, অর্থের লেনদেনের মাধ্যমে সম্পদশালী হয়ে ওঠে। তাই আমরা যখন আমাদের জানা বিষয়গুলো অন্যদের জানাই প্রত্যুত্তরে অন্যরাও তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের অর্জিত জ্ঞান আমাদের সাথে শেয়ার করতে তৈরি হয়ে যায়। হয়তো কখনো কখনো আমাদের জানা বিষয়গুলো ভুল বলে প্রমাণিত হবে, আমরা হাসির পাত্রেও পরিণত হতে পারি, তবুও আমাদের এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে যেতে হবে; কারণ এর ফল সুদূরপ্রসারী এবং জ্ঞান অর্জনে তা এক অনুপম উপায়বিশেষ।

ছ. নিজের সিংহাসনকে নিষ্কণ্টক করতে রাজা হেরোদ এক দূরভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনা আঁটলেন (৭, ৮ পদ)। এখানে লক্ষণীয় যে, রাজা হেরোদ ছিলেন বৃদ্ধ; পঁয়ত্রিশ বছরের দেশ শাসনের অভিজ্ঞতাপুষ্ট। কিন্তু এতদিনের অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ হয়েও তিনি নিজেকে বিচক্ষণ প্রমাণ করার বদলে সদ্য জন্মানো রাজার প্রতি ঈর্ষামিশ্রিত ক্ষোভ থেকে এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। চিরদিন রাজা হিসেবেই থেকে যাওয়ার যে লোভ তাকে গ্রাস করেছিল তা জন্ম দিল এক হীনম্মন্য পরিকল্পনার। খ্রীষ্টের কাছে রাজত্ব ও রাজমুকুট হারাবার চিন্তায় হেরোদের স্বাভাবিক বিবেচনাবোধও তখন লোপ পেয়েছিল; ফলে তিনি এ বিষয়ে একেবারেই বিস্মৃত হয়েছিলেন যে, খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া বা তাঁর প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধাচরণ করা প্রকারান্তরে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণারই নামান্তর। যে কারণে রাজা হেরোদকে আমরা রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপরায়ণ এক রক্তপিপাসুতে পরিণত হতে দেখি; যিনি খ্রীষ্টের রক্তে নিজের রাজত্বকে স্থায়ী রূপ দিতে সহিংস হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর এই দম্ভ যে কতটা আত্মঘাতী ও ভয়ংকর তা তিনি বুঝতে অক্ষম ছিলেন। ফলশ্রুতিতে তাঁর এই ক্রোধের সাথে চতুরতা মিলে জন্ম দিল এক তীব্র শ্লেষপূর্ণ ষড়যন্ত্রের।

এবারে লক্ষ্য করুন, **১.** রাজা হেরোদ তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কী প্রকার ছল–চাতুরীর আশ্রয় নিলেন (৭,৮ পদ)। খ্রীষ্টের জন্মের ব্যাপারটা নিয়ে কী করা যায় সে বিষয়ে সলা-পরামর্শ করার জন্য তিনি পণ্ডিতদের একান্তে ডাকলেন। এক্ষেত্রে তিনি উন্মুক্ত আলোচনা থেকে বিরত থাকতে চাইলেন, কারণ তিনি ভীত ও ঈর্ষান্বিত ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন পণ্ডিতদের সাথে তাঁর কথোপকথনের বিষয়বস্তু লোকদের কানে গেলে তা বিপদের কারণ হতে পারে; উপরন্তু তা হয়তো তাঁর গৌরব-শৌর্য হানি করবে। পাপীরাও তাদের নিজেদের ভীতির কারণে এরকম উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে। পণ্ডিতদের কাছ থেকে

হেরোদ খ্রীষ্টের জন্মের বিষয়ে আনুপুঙ্খ জেনে নিয়েছিলেন; তারপর তাঁদের বৈৎলেহমে পাঠিয়েছিলেন আরও অনুসন্ধান করে খ্রীষ্টের 'উদ্দেশ' জানতে। 'আমিও যেন গিয়ে তাঁর উপাসনা করতে পারি'– হেরোদের এই উক্তিকে পণ্ডিতরা খুশিমনে নিয়েছিলেন। হেরোদ যদি তাঁদের কাছে এই ছলটুকু না করতেন তবে তাঁরা অবশ্যই একে সন্দেহের চোখে দেখতেন। মনে রাখুন, কখনো কখনো অনেক দুষ্কৃতিকারীও পবিত্রতার মুখোশ পরে ভণ্ডামির আশ্রয় নিয়ে থাকে। যেমনটা আমরা দেখি অবশালোমের ক্ষেত্রে; যিনি তার পিতা দায়ূদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে পবিত্র ব্রতের শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

২. লক্ষ্য করুন, হেরোদ পণ্ডিতদের বিশ্বাস করেছিলেন; এ ছাড়া নিজের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে সেই পণ্ডিতদের সাথে কাউকে পাঠালেন না বা তাঁরা কোথায় যান, কী করেন– তা দেখে আসার জন্য কোনো গোয়েন্দা পাঠালেন না। অথচ বৈৎলেহেম ছিল যিরূশালেম থেকে মাত্র সাত মাইল দূরে। হেরোদ নিজের ক্ষমতার প্রতি অবিচল আস্থাবান ছিলেন; ফলে পণ্ডিতদের যীশু খ্রীষ্টের খোঁজে পাঠিয়ে দিয়েই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন যে তাঁরা তাকে অবশ্যই সেই শিশুটির খোঁজ জানাবেন। কিন্তু পণ্ডিতেরা তাকে বোকা বানিয়েছিলেন। তাঁদের এই অপ্রত্যাশিত অসহযোগিতায় হেরোদ মূঢ়, হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। শিশুটিকে হত্যা করার যে 'সহজসাধ্য' পরিকল্পনা তাঁর মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তা চরম মার খেল। ঈশ্বর যেভাবে হেরোদের পরিকল্পনাকে বিফল করে দিয়েছিলেন মণ্ডলীর ধ্বংসকামীদের ক্ষেত্রেও তিনি এখন ঠিক তেমনটাই করছেন। 'খুব সহজেই মণ্ডলীর বিনাশ সাধন সম্ভব'– এই বোধের প্রয়োগে মণ্ডলী ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের চোখ তিনি অন্ধ করে দেন। ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে যাকে ইচ্ছা ঊর্ধ্বে তোলেন আর বিরোধিতাকারীদের বোকা বানান।

মথি ২:৯-১২ পদ

এখানে আমরা পূর্বদেশীয় পণ্ডিতদের সদ্যজাত যিহূদী– রাজার উদ্দেশ্যে বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে দেখি। কিন্তু তাঁদের সাথে আর কেউ ছিল না– এটা দেখে আমাদের অবাক হতে হয়। কারণ শহরের, উপাসনা গৃহের কিংবা সাধারণ মানুষের এই নতুন রাজাকে দেখার জন্য কৌতূহলবশত পণ্ডিতদের পিছু পিছু আসাটা খুবই স্বাভাবিক ছিল। বিচারের দিনে দক্ষিণ দেশের রাণী এবং পূর্বদেশীয় পণ্ডিতেরা সেই লোকদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে এবং তাদের দোষারোপ করবে; কারণ তারা তাদের পরিত্রাণকর্তাকে সম্মান জানাতে পাশের শহরটিতে যেতেও অনাগ্রহী ছিল। খ্রীষ্টের বিষয়ে সাধারণ্যে এই ঔদাসীন্য লক্ষ্য করে পণ্ডিতেরা বোধকরি হতাশ হয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা রাজার অনুসন্ধান-কাজ চালিয়ে যেতে নিরস্ত হননি। সেই পণ্ডিতদের মতো আমরাও কি অনেক দূর থেকে যিহূদী-রাজাকে সম্মান জানাতে এসেছি; আর একগুঁয়ে যিহূদীদের মতো অন্যরাও কি আমাদের সাথে সেই ব্যবহারটুকু করছে যা যিহূদীরা খ্রীষ্টের সাথে করেছিল? মনে রাখুন, আমরা অবশ্যই খ্রীষ্টের সাথে আমাদের সহভাগিতা অক্ষুণ্ন রাখব; যদি একা হয়ে যাই তবুও। অন্যরা কী করল– তা না দেখে আমরা আমাদের সদাপ্রভুর সেবা করব। কারণ অন্যরা আমাদের সাথে স্বর্গে যেতে রাজি না হলেও আমরা তো আর তাদের সাথে দোযখে যেতে পারি না। এবারে দেখুন,

ক. কীভাবে পণ্ডিতেরা সেই পূর্বদৃষ্ট তারাকে অনুসরণ করে খ্রীষ্টের অবস্থান খুঁজে পেলেন (৯, ১০ পদ)।

১. ঈশ্বর কত মহান উপায়ে তাদের অনুসন্ধান-কাজে নির্দেশনা দিলেন। প্রথমবার 'তারা' দেখে পণ্ডিতেরা জানতে পারলেন যে নতুন রাজাকে কোথায় খুঁজতে হবে। তারপর কিন্তু সেই তারাটি আর দেখা যায়নি। কারণ এরপরের কাজ ছিল খুবই সহজ– নির্দেশিত পথে অনুসন্ধান চালানো। পণ্ডিতেরাও তাঁদের কাঙ্ক্ষিত রাজাকে খুঁজে পেতে স্বাভাবিক নিয়মেই এগিয়ে গেলেন। মনে রাখুন, যেখানে স্বাভাবিক নিয়মেই কাজ হাসিল করা যায় সেখানে অসাধারণ সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে না। যাহোক, পুব আকাশে উত্থিত তারা দেখে পণ্ডিতেরা দূরের পথে পাড়ি দিয়ে যিরূশালেমে এসে পৌঁছালেন। কিন্তু বৈৎলেহমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার আগে তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন না, কীভাবে সেই প্রার্থিত রাজার খোঁজ পাওয়া যাবে। ফলে তাঁদের বিশ্লেষণী ক্ষমতা এখানে এসে হার মানল; কিন্তু বিশ্বাসে তাঁরা তখনও অবিচল ছিলেন। যিনি তাঁদের পথ দেখিয়ে এ পর্যন্ত এনেছেন সেই ঈশ্বরের প্রতি তাঁরা আস্থাবান ছিলেন; তাঁরা জানতেন যে তিনি কখনো তাঁদের ছেড়ে যাবেন না। আর দেখুন, পুব আকাশে দেখা সেই তারাটি তাঁদের পথ দেখাতে আবার উত্থিত হল।

মনে রাখুন, আমরা যদি আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হই তবে ঈশ্বর আমাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে সাহায্য করে থাকেন; আমরা হয়ে উঠি দক্ষ, সমর্থ। যেটা আমাদের নিজেদের দ্বারা কখনো হয়তো সম্ভব হতো না। তাই, অর্পিত দায়িত্ব পালনে মনোনিবেশ করার এখনই উপযুক্ত সময়; নিজের সামর্থ্য, দুর্বলতা নিয়ে ভাববেন না। কারণ আপনাকে সাহায্য করার জন্য সদাপ্রভু আপনার সাথেই আছেন। ঈশ্বরের সাহায্য তারাই পায় যারা সক্রিয়। যে তারাটি দেখে পণ্ডিতেরা খ্রীষ্টকে খুঁজতে যাত্রা শুরু করেছিলেন তা মাঝের দিনগুলোতে দেখা না গেলেও এবার যখন পণ্ডিতদের সাহায্যের প্রয়োজন পড়ল তখন পুনরায় তা দেখা দিল। পণ্ডিতেরা যে অন্ধকার-দেবতার পূজা করতেন তার জায়গায় তারা সত্যিকারের ঈশ্বরের স্বর্গীয় আলোর স্বরূপ দেখতে পেলেন। এ-সবই ছিল ঈশ্বরের পরিকল্পনা। ইস্রায়েল জাতিকে একটি আগুনের থাম পথ দেখিয়ে প্রতিজ্ঞাত দেশে নিয়ে গিয়েছিল। আর এখানে একটি তারা পণ্ডিতদের সেই প্রতিজ্ঞাত শিশুর কাছে নিয়ে গেল। যাঁকে বলা হয় ভোরের উজ্জ্বল তারা (প্রকাশিত বাক্য ২২: ১৬)। যারা মনেপ্রাণে ঈশ্বরকে খোঁজে তাদের তিনি কখনো ছেড়ে যান না, উপরন্তু তাদের কাছে তাঁর মহিমা প্রকাশিত হয়। পণ্ডিতদের জন্য সেই তারাটি ছিল তাঁদের মাঝে ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রমাণ; কারণ তিনি আলো এবং তিনি তার লোকদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যান। মনে রাখুন, আমরা যদি আমাদের দৃষ্টি ঈশ্বরের প্রতি নিবদ্ধ করি তবে তিনি আমাদের পরিচালনা করবেন ও পথ দেখাবেন। আর কখনো তিনি আমাদের তাঁর চোখের আড়াল হতে দেবেন না (গীত ৩২:৮) । যারা খ্রীষ্টকে অন্বেষণ করে তাদের হৃদয়েও এরকম এক একটি উজ্জ্বল তারা উত্থিত হয়; ঈশ্বর তাদের সাহায্য করেন; আর খ্রীষ্টের দিকে নির্দেশ করে বলেন, 'ইনিই সেই পথ, তোমরা এঁর অনুসরণ কর' ২ পিতর ১:১৯)।

২. পণ্ডিতেরা কতটা আনন্দের সাথে ঈশ্বরের নির্দেশনা অনুসরণ করেছিলেন তা আমরা এখানে দেখতে পাই (১০ পদ)। পুনরায় সেই তারাটিকে দেখতে পেয়ে পণ্ডিতেরা আনন্দে আত্মহারা হলেন। এ থেকে তাঁরা বুঝলেন যে তাঁরা কোন বঞ্চনার শিকার হননি এবং তাঁদের দীর্ঘ পথযাত্রা বৃথা যায়নি। তাঁদের এ আনন্দ ছিল লক্ষ্যের কাছাকাছি যেতে

পারার আনন্দ। তখন তাঁরা বুঝতে পারলেন যে ঈশ্বর তাঁদের সাথে আছেন। কারণ তাঁদের মাঝে ঈশ্বরের উপস্থিতির স্বাক্ষর ও তাঁর সাহায্যস্বরূপ সেই তারাটি ছিল। আর ঈশ্বর তাদেরই সাহায্য করেন, তাদেরই মাঝে নিজেকে প্রকাশ করেন– যারা তার মূল্য দিতে জানে এবং তা নিয়ে আনন্দ করতে জানে। ঠিক সে কারণেই যিরূশালেমে যীশুর খোঁজ করতে গিয়ে অন্যদের কাছে হাসির পাত্র হবার পরও তাঁরা স্বাভাবিক থাকতে পেরেছিলেন; কোনোমতেই নিরস্ত হননি। যিরূশালেমের লোকেরা যখন তাঁদের যিহূদী-রাজার সন্ধান-কাজকে 'উঁচুদরের বোকামো' আখ্যা দিয়ে তাঁদের প্রতি হেসেছিল তখন তাঁরা সেই অব্যাখ্যাত আনন্দের কারণেই সেই লোকদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি উপহার দিতে পেরেছিলেন। আমরা মানুষের কাছ থেকে খুব অল্প আবার ঈশ্বরের কাছ থেকে খুব বেশি প্রত্যাশা করতে পারি না। পূর্ব আকাশে উদিত তারার কল্যাণে পণ্ডিতদের মাঝে যে আনন্দের সৃষ্টি হয়েছিল তা ঈশ্বরের গৌরবান্বিত রূপকেই তুলে ধরে। আনন্দ উৎসারণের কি আশ্চর্য মাধ্যম! আর দেখুন, ঈশ্বর সেই লোকদের মাঝে নিজেকে প্রকাশ করলেন– যারা দীর্ঘদিন দাসত্বের আত্মার অধীনে প্রলোভন ও মন্দ কাজে ডুবে ছিল; যে দাসত্ব তাদের কখনো কিছু পেতে দেয়নি। আর এখন তারা নিজেদের মাঝে 'গ্রহণের আত্মা'– এর অস্তিত্ব অনুভব করতে শুরু করল। তাঁদেরকে ঘিরে যা ঘটেছিল– তা পর্যবেক্ষণ করে তাঁরা বুঝতে সমর্থ হল যে তাঁরা ঈশ্বরের সন্তান। মন্দতা-অন্ধকার থেকে যে আলো তাদের বের করে আনল তা জীবিতকে মৃতের স্পর্শের বাইরে নিয়ে যায়। গেয়ে ওঠে জীবনের জয়গান। পণ্ডিতেরা যে দ্রুতই প্রভু যীশুর দর্শন পেতে আশাবাদী ছিল তার কারণ ছিল এই– তারা সেই 'ধার্মিকতার পুত্র', 'ভোরের তারা'-কে দেখেছিল।

মনে রাখুন, যা আমাদের খ্রীষ্টের দিকে নিয়ে যায় তা আমাদের জন্য নিশ্চিতভাবেই আনন্দের উপলক্ষ হবে। পণ্ডিতদের কাছে খ্রীষ্টের অবস্থান বর্ণনা করার জন্য আকাশে এই তারাটির আবির্ভাব ঘটেছিল। যার ফলে পণ্ডিতেরা সেই অভূতপূর্ব উদযাপনের সাক্ষী হতে পেরেছিলেন এবং সে সংবাদ অনেকের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঈশ্বর এখানে সেই লোকদের মাধ্যমে তাঁর ওয়াদা সম্পন্ন করলেন যারা তাঁর ইচ্ছামতো কাজ করতে আগ্রহী ও আনন্দিত ছিল (যিশাইয় ৬৪:৫)। আর পণ্ডিতেরা ঈশ্বরের নির্দেশের বাধ্য থেকে তাঁর পরিকল্পনাকে সফল করে তুলতে সক্রিয়া ভূমিকা রেখেছিলেন। যারা সদাপ্রভুকে খোঁজে তারা আনন্দ করুক (গীত ১০৫:৩)। মনে রাখুন, ঈশ্বর কখনো কখনো তাঁর ইচ্ছামতো কাজ করতে আগ্রহী নতুন প্রাণকে তাঁর ভালবাসার দান দিয়ে সাহায্য করে থাকেন কিন্তু তার আগে তিনি তাদের পরীক্ষা করে দেখতে চান, সমস্যা-প্রতিকূলতা এলে তারা তাঁর পথে কতটা অবিচল থাকে।

খ. খ্রীষ্টকে খুঁজে পাবার পর পণ্ডিতদের যে অনুভূতি হয়েছিল এবং তাঁরা যেভাবে তাঁদের অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন– তা খুবই তাৎপর্যমণ্ডিত ঘটনাবিশেষ। একথা আমরা অনায়াসে ভেবে নিতে পারি যে, খ্রীষ্টকে তারা এরকম একটি জীর্ণ ঘরে আবিষ্কার করে খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন। কারণ তাঁদের প্রত্যাশা ছিল, নিশ্চিতভাবেই কোনো ধরনের জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে তাঁকে পাওয়া যাবে। তাঁদের এই চিন্তা হওয়াটা ছিল খুবই স্বাভাবিক। নতুন রাজাকে খুঁজে পেতে তাঁদের যেসব ঘটনার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তা থেকে তাঁদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, খ্রীষ্ট রাজবাড়ি না হোক নিদেনপক্ষে কোন অভিজাত পরিবারে তো জন্মাবেন! কিন্তু খ্রীষ্টকে খুঁজে পেয়ে তাঁদের সেই চিন্তা উধাও

হয়ে গিয়েছিল; শীঘ্রই তাঁরা সম্মানের সাথে নতুন রাজার সামনে জানুপাতিত হলেন।

তবে একথা ঠিক যে নতুন রাজার জন্মের উদ্‌যাপনকে ঘিরে পণ্ডিতদের প্রত্যাশা ছিল আকাশছোঁয়া। খ্রীষ্ট যে ঘরে জন্মেছিলেন এবং তাঁর শিশুদেহের পাশে উপবিষ্ট তাঁর মা মরিয়মের আভিজাত্যহীন চেহারা দেখে পণ্ডিতেরা হয়তো ভেবেছিলেন, ইনিই কি সমস্ত পৃথিবীর পরিত্রাণকর্তা? ইনিই কি যিহূদীদের রাজা? কিংবা পুরো পৃথিবীর? তবুও শেষ পর্যন্ত যে পণ্ডিতেরা আশ্বস্ত হতে পেরেছিলেন তার কারণ তাঁরা সদাপ্রভুর মহিমা দেখতে পেয়েছিলেন; তাঁদের বিশ্বাস ছিল, সদাপ্রভুই তাঁদের পরিচালিত করে এই শিশুটির সামনে নিয়ে এসেছেন। ফলে তাঁদের মন থেকে সমস্ত দ্বিধা দূর হয়েছিল। হ্যাঁ, ইনিই সেই পরিত্রাণকর্তা; তিনি যদিও ধনী তবুও আমাদের কারণে দরিদ্রের বেশে পৃথিবীতে নেমে এসেছেন।

যাহোক, পণ্ডিতেরা তাঁদের বিজ্ঞতা দিয়ে পর্দার অন্তরালের বিষয়টি বুঝতে সমর্থ হয়েছিলেন। মানুষের অবহেলায় জন্ম নেওয়া এই শিশুটি যে ঈশ্বরের মহিমার কথা ঘোষণা করছে এবং স্বয়ং ঈশ্বরই যে তাঁর পিতা– সে বিষয়ে পণ্ডিতেরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিলেন। তাঁরা কখনো ঘূর্ণাক্ষরেও একথা ভাবেননি যে তাদের সফর, অনুসন্ধান ব্যর্থ হয়েছে। দীর্ঘ অনুসন্ধান শেষে তাঁরা যখন সেই শিশুটিকে দেখতে পেলেন তখন তাঁদের আনন্দ, ভক্তি আর বাঁধ মানতে চাইলো না। তাঁরা সেই শিশুটির সামনে জানুপাতিত হলেন এবং দেশ থেকে আনা উপহার তাঁকে নিবেদন করলেন।

১. তাঁরা সেই শিশুটির সামনে জানুপাতিত হলেন এবং তাঁর উপাসনা করলেন। এই সম্মান তাঁরা হেরোদকে জানাননি। কারণ শাস্ত্রে আমরা এ ব্যাপারে কোন উল্লেখ দেখি না। রাজা হেরোদের রাজক্ষমতা, পদমর্যাদা অবশ্যই সম্মানের দাবি রাখে; যেহেতু শাস্ত্রে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই, তাই আমরা ধরে নিতে পারি যে, পণ্ডিতেরা এই শিশুটিকে যে ধরনের সম্মান প্রদর্শন করলেন তা তাঁরা রাজা হেরোদের প্রতি করেননি। আর শিশুটির উদ্দেশ্যে পণ্ডিতেরা যে ভঙ্গিতে সম্মান জানিয়েছিলেন তা সাধারণত কোন রাজার উদ্দেশ্যে নয় বরং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যেই করা হয়ে থাকে। মনে রাখুন, যারা খ্রীষ্টকে পায় তারা তাঁর উদ্দেশ্যে জানুপাতিত হয় ও তাঁর উপাসনা করে। তাদের সবকিছুর ভার তারা খ্রীষ্টের উপর তুলে দেয়। ইনিই আমাদের সদাপ্রভু, আমরা তাঁর উপাসনা করব। যে লোকেরা খ্রীষ্টের কাছে নিজেদের সমর্পণ করে তারা প্রমাণ করে যে তাদের জ্ঞান খাঁটি। যদি তারা নম্র হয় এবং প্রভু যীশুর সত্যিকারের উপাসনায় নিজেদের নিবেদিত রাখে তবে তারা খ্রীষ্টকে, নিজেদের এবং তাদের প্রকৃত করণীয় সম্বন্ধে জানতে পারবে।

২. পণ্ডিতেরা তাঁদের উপহার খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে রাখল। পূর্বদেশীয় প্রথানুযায়ী, লোকেরা তাদের রাজাকে সম্মান জানানোর জন্য রাজার সামনে উপঢৌকন রাখত। যেমনটা আমরা দেখি গীত ৭২:১০ পদে, 'সীবা দেশের রাজারা খ্রীষ্টকে তাঁর পাওনা উপহার দিক।' এ ছাড়াও যিশাইয় ৬০:৬ পদে রয়েছে, 'তারা সাবা দেশ থেকে আনবে সোনা ও খোশবু ধূপ নিয়ে আর ঘোষণা করবে সদাপ্রভুর গৌরব।'

মনে রাখুন, আমাদেরও উচিত প্রথমে নিজেদের অন্তরকে খ্রীষ্টের কাছে সমর্পণ করা। আমরা যদি তা করতে প্রস্তুত থাকি তবে আমরা অবশ্যই তাঁর অংশরূপে বিবেচিত হব। হ্যাঁ, আমরা আমাদের দেহ-মনের সবটুকু তাঁর কাছে নিবেদন করার মাধ্যমে নিজেদের আরও দামি, মূল্যবান করে তুলতে পারি। কোন উপহার কিংবা জাগতিক কোন কিছু তাঁকে

কখনো সন্তুষ্ট করতে পারে না যতক্ষণ না আমরা তাঁর কাছে নিজেদের উৎসর্গ করি। হেবলের কথা মনে করে দেখুন, ঈশ্বর তাঁকে আগে থেকেই পছন্দ করতেন। কারণ হেবল তাঁর দেহমন ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করেছিলেন। তারপরেই না ঈশ্বর তাঁর উৎসর্গ গ্রহণ করেছিলেন। পণ্ডিতেরা খ্রীষ্টকে যে উপহার প্রদান করেছিলেন তা হল সোনা, লোবান ও গন্ধরস। এই উপহার মরিয়ম ও যোষেফের সে সময়কার দরিদ্রাবস্থায় পরম স্বস্তি যুগিয়েছিল। পণ্ডিতদের আনা এই উপহার সামগ্রী ছিল তাঁদের নিজেদের দেশের। মহান ঈশ্বর আমাদের যেভাবে সাহায্য করেন আমাদেরও উচিত তাঁকে সেই মতো সম্মান করা। অনেকে পণ্ডিতদের এই উপহার সামগ্রীর মাঝে প্রতীকী শিক্ষা খুঁজে পান। তাঁরা খ্রীষ্টকে সোনা দিয়েছিল যেমনটা একজন রাজাকে দেওয়া হয়ে থাকে; অপরদিকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পবিত্র ধূপ জ্বালানোর বিষয়টিকে মাথায় রেখে খ্রীষ্টকে ঈশ্বর জ্ঞান করে লোবান দেওয়া হয়েছিল। সবশেষে গন্ধরস যা মানুষের মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মূলত এই গন্ধরস তখন মৃতদেহ সুবাসিত রাখার জন্য ব্যবহৃত হতো। এই গন্ধরস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, খ্রীষ্ট মানুষের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করবেন।

গ. খ্রীষ্টকে সম্মান জ্ঞাপন করে পণ্ডিতেরা কীভাবে স্বদেশের পথ ধরেছিলেন তা দেখুন (১২ পদ)। রাজা হেরোদ তাঁদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তাঁরা নিজ দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার আগে খ্রীষ্টের খোঁজ দিয়ে যান। পণ্ডিতেরা হয়তো তাই করতেন যদি না ঈশ্বর তাঁদের সাবধান করে দিতেন। কারণ তাঁদের মনে হেরোদের বিষয়ে ন্যূনতম সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তাঁরা তো আর জানতেন না হেরোদ মনে মনে কী ভীষণ মন্দ পরিকল্পনা এঁটেছিলেন! তাঁরা পৃথিবীর কদর্য রূপ সম্পর্কেও ভাবেননি। ফলে অনেকটা সরলমনেই তাঁরা তাঁর কাছে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু স্বর্গীয় সদাপ্রভু তো সব জানতেন! আর তিনিই তো জানেন, কী করে মন্দতার শক্তিকে দূরীভূত করতে হয়। আমরা এখানে এমনটা পড়ি না যে, পণ্ডিতেরা হেরোদকে তাঁর কাছে ফিরে যাবার ব্যাপারে কোন কথা দিয়েছিলেন। যদি তাঁরা তা করতেন আর ঈশ্বর তাঁদের অনুমতি দিতেন তবে হয়তো ঘটনা ভিন্ন দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আমরা দেখি যে, ঈশ্বর তাঁদের হেরোদের কাছে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেননি। ঈশ্বর জানতেন হেরোদ খ্রীষ্টকে মারার জন্য কী ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা সাজিয়েছিলেন; তাই তিনি পণ্ডিতদের হেরোদের কাছে ফিরে যেতে নিষেধ ও সাবধান করে দিলেন। হ্যাঁ, ঈশ্বর স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁদের কাছে এই সাবধানবাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন।

অনেকে মনে করেন, পণ্ডিতেরা হয়তো ঈশ্বরের কাছে পরামর্শ-সাহায্য চেয়েছিলেন আর তাই তাদের জন্য ঈশ্বরের এই উত্তর। মনে রাখুন, যারা সতর্কতার সাথে জীবন যাপন করে এবং পাপ থেকে দূরে থাকে তারা যদি ঈশ্বরের কাছে নির্দেশনা চায় তবে ঈশ্বর তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করে থাকেন। ঈশ্বর পণ্ডিতদের যিরূশালেমে কিংবা হেরোদের কাছে ফিরে না যেতে সাবধান করে দিয়েছিলেন। ঠিক তেমনিভাবে যারা খ্রীষ্টকে জানতে আগ্রহী কিন্তু খ্রীষ্টকে জানার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ বা মাধ্যম তাদের নেই, তারা নিজেদের চোখেই খ্রীষ্টের অসাধারণত্বের স্বরূপ দেখতে পাবে। যাহোক পণ্ডিতেরা ভিন্ন এক রাস্তায় দেশের পথ ধরলেন। নিজ দেশের লোকদের কাছে এই অনন্য সত্যের বিষয়ে বলতে তারা বোধকরি খুবই উত্তেজিত হয়েছিলেন। কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার আমাদের অবাক করে যে, এই পণ্ডিতদের সম্পর্কে আমরা পরে আর কিছুই শুনতে কিংবা জানতে পাই না। এ ছাড়া পরবর্তীতে তাঁরা খ্রীষ্টের কাছে আর গিয়েছিলেন কিনা তারও কোন উল্লেখ শাস্ত্রে

অনুপস্থিত। পণ্ডিতেরা এই অসাধারণ অনুসন্ধান-যাত্রার একেবারে শেষে এসেও এক অনন্য নিশ্চয়তার বাক্য শুনেছিলেন। খ্রীষ্টকে রক্ষা করার জন্যই যে ঈশ্বর তাঁদের হেরোদের কাছে যেতে বারণ করেছেন তা বুঝতে পেরে তাঁরা আরও চমৎকৃত হলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, 'এই শিশু অবশ্যই স্বর্গ থেকে এসেছে।' শুরুর মতো পণ্ডিতদের শেষটাও হল তাই মনে রাখার মতো।

মথি ২:১৩-১৫

এখানে আমরা হেরোদের নিষ্ঠুরতা থেকে বাঁচতে খ্রীষ্টের মিশরে পালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে দেখি। পণ্ডিতেরা খ্রীষ্টের অনুসন্ধানের ফলাফল হেরোদকে না জানিয়ে স্বদেশের পথ ধরায় হেরোদ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। ফলে তিনি চূড়ান্ত ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছিলেন। আর সেই রোষাণল থেকে শিশু যীশুকে বাঁচাতেই ঈশ্বর তাঁর স্বর্গদূতের মাধ্যমে যোষেফের কাছে বার্তা পাঠালেন। এর আগ পর্যন্ত ঈশ্বর নিভৃতে খ্রীষ্টের হেফাজত করছিলেন। পণ্ডিতেরা শিশু খ্রীষ্টকে যে সম্মান দেখিয়েছিলেন তা ছিল অভূতপূর্ব; যদিও আমরা পরবর্তীতে খ্রীষ্টকে তাঁর নিজের জাতির লোকদের মাঝে সম্মানিত হতে দেখি তবুও শুরু হিসেবে তা ছিল অসাধারণ।

এবারে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যাক,

ক. ঈশ্বর যোষেফের কাছে নির্দেশনা পাঠালেন যেন তিনি যীশু ও তাঁর মাকে নিয়ে মিশরে পালিয়ে যান। এর সাথে তিনি 'কেন পালিয়ে যেতে হবে' তার কারণটিও জানিয়ে দেন (১৩ পদ)। তার আগ পর্যন্ত যোষেফ শিশুটির আসন্ন বিপদ ও কীভাবে তা এড়ানো যাবে– সে বিষয়ে পুরোপুরি অন্ধকারে ছিলেন। কিন্তু মহান ঈশ্বর তাঁর স্বর্গদূতের মাধ্যমে যোষেফের কাছে উভয় জিজ্ঞাসারই উত্তর দেন। এভাবে তিনি আগেও যোষেফের জন্য নির্দেশনা পাঠিয়েছিলেন (১:২০ পদ)। খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্কে জড়ানোর আগে যোষেফ কিন্তু এভাবে স্বর্গদূতের মাধ্যমে কোন নির্দেশনা পাননি। মনে রাখুন, যারা বিশ্বাসে খ্রীষ্টের সাথে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলে তারাও স্বর্গের সাথে এই ধরনের যোগাযোগ এবং বন্ধন পেতে সমর্থ হয় যা পূর্বে তাদের পক্ষে কোন মতেই সম্ভব ছিল না।

১. যোষেফকে এখানে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে জানানো হল: হেরোদ এই শিশুটিকে মেরে ফেলার জন্য তাঁর খোঁজ করবে। মনে রাখুন, ঈশ্বর মণ্ডলীর শত্রুদের বিভিন্ন নিষ্ঠুর পরিকল্পনা এবং প্রচেষ্টা সম্পর্কে অবগত আছেন। যিশাইয় ৩৭:২৮ পদে আমরা দেখি ঈশ্বর সন্হেরীবকে বলছেন 'আমার বিরুদ্ধে তোমার রাগ সম্পর্কে আমি অবগত আছি'। ঈশ্বরের মহিমাধন্য যীশু কত আগেভাগেই বিপদের সম্মুখীন হলেন! সাধারণত লোকে বয়স বাড়ার সাথে সাথে পরিশ্রম, বিপদ-আপদের সাথে ধীরে ধীরে পরিচিত হয়ে ওঠে; শিশু অবস্থায় যেটা ভাবাই যায় না। কিন্তু এখানে আমরা দেখি যে শিশু যীশুর জীবন এবং দুঃখভোগের শুরু হয়েছিল একই সাথে, অনেকটা হাত ধরাধরি করে। কারণ ভাববাদী যিরমিয়ের মতোই তাঁরও জন্ম হয়েছিল লড়াইয়ের মধ্যে (যিরমিয় ১৫:১০)। মায়ের গর্ভে থাকতেই তাঁকে বেছে নেওয়া হয়েছিল (যিরমিয় ১:৫)। খ্রীষ্ট হচ্ছেন মণ্ডলীর মাথা আর মণ্ডলী হচ্ছে তাঁর দেহ। আমার সাথে বলুন, 'বেড়ে ওঠার সময় থেকেই অনেকে আমাকে কষ্ট দিয়েছে'; আর সেই সাথে খ্রীষ্টের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করুন– শুধু স্বীকারোক্তিতেই নয়, উপরন্তু

কাজেও তার প্রমাণ দিন। ফরৌণের নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছিল ইব্রীয় শিশুরা; অপরদিকে এক বিরাট লাল ড্রাগন জন্মাবার অপেক্ষায় থাকা মানব-শিশুকে খেয়ে ফেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে (প্রকাশিত বাক্য ১২:৪)।

২. যোষেফকে জানানো হল কীভাবে এই বিপদ এড়ানো যাবে; শিশুটিকে নিয়ে মিশরে পালিয়ে যাও। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের প্রতিও এরকম নির্দেশ দিয়েছিলেন: 'কোন গ্রামের লোকেরা তোমাদের ওপর নির্যাতন করলে পালিয়ে অন্য গ্রামে চলে যেও' (১০:২৩ পদ)। খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করতেই এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। যেহেতু সেই নিরূপিত সময় তখনও আসেনি, তাই নিজের নিরাপত্তার জন্য তাঁকে মিশরে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। সে কারণেই অবধারিতভাবে ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থার অংশ হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে পৃথিবীর নিয়মের বেষ্টনীতে পড়তে হয়েছিল। তিনি পালিয়ে মিশরে গেলেন। কিন্তু মিশরে কেন? যেখানে এই দেশটি মূর্তিপূজা, অত্যাচার আর ঈশ্বরের লোকদের বিরুদ্ধাচরণের জন্য কুখ্যাত ছিল! এই দেশেই ইস্রায়েলীয়রা চারশ বছর দাসত্ব করে গেছে; এখানেই ইস্রায়েলীয় শিশুদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। রামার চেয়ে তো আরও বেশি গুণে এই দেশটি শিশু যীশুর জন্য অনিরাপদ ছিল! 'বুকফাটা কান্নার আওয়াজে রামার আকাশ ভারি হয়ে উঠেছে; রাহেলা কাঁদছে তার সন্তানদের জন্য, সে কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না'। তবুও পবিত্র শিশু যীশুকে আশ্রয়ের খোঁজে সেই মিশরেই যেতে হয়েছিল। মনে রাখুন, ঈশ্বরের সৃষ্ট এই পৃথিবীর সব স্থানই তো তাঁর; তিনি তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিজ ইচ্ছামতো যে কোন স্থানকে বেছে নেন: তবে কখনো কখনো পৃথিবী স্ত্রীলোককে সাহায্য করে থাকে (প্রকাশিত বাক্য ১২:১৬)। ঈশ্বর যিনি সমাজচ্যুতদের জন্য আশ্রয়-শহর হিসেবে মোয়াবকে বেছে নিয়েছিলেন, তিনিই এখন তাঁর পুত্রের আশ্রয়ের জন্য মিশরকে মনোনীত করলেন। এই ঘটনার সম্ভাব্য কারণগুলো ঠিক কী হতে পারে– তা নিয়ে এবারে একটু আলোচনা করা যাক:

(১) হতে পারে ঈশ্বর এই ঘটনার মধ্য দিয়ে যোষেফ ও মরিয়মের বিশ্বাসের পরীক্ষা নিতে চাইলেন। তিনি দেখতে চাইলেন, মিশরে আত্মগোপনের সময় তাদের মনে এই চিন্তা আসে কিনা, 'আমাদের যেমনটা বলা হয়েছে সেই অনুযায়ী এই শিশু যদি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র হয়ে থাকেন তবে হেরোদের মতো একটা নগণ্য মানুষের কাছ থেকে নিজেকে বাঁচাবার আর কোন পথই কি খোলা ছিল না? ঈশ্বরের স্বর্গদূতদের আহ্বান করে তিনি কি পারতেন না নিজের নিরাপত্তা বিধান করতে? জ্বলন্ত ছোরা হাতে কারুবরাও কি এই জীবনগাছের সুরক্ষা দিতে অপারগ? কিংবা চাইলেই কি তিনি হেরোদকে আঘাত করে মেরে ফেলতে পারতেন না? তাহলে তো আর আমাদের এভাবে পালাতে হয় না।' যোষেফ ও মরিয়মকে একটু দেরিতে এই কথা জানানো হয়েছিল যে 'খ্রীষ্ট হবেন ইস্রায়েল জাতির গৌরব এবং তাঁর কারণে ইস্রায়েল ভূখণ্ড শীঘ্রই উত্তপ্ত হয়ে উঠবে।' কিন্তু আমরা এখানে যোষেফ ও মরিয়মকে ঈশ্বরের নির্দেশের বাধ্য থাকতে দেখি; কোন ওজর আপত্তি তারা করেননি। তাদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিল যে, এই শিশুটিই ঈশ্বরের পুত্র। যদিও তারা খ্রীষ্টের রক্ষণাবেক্ষণের সময় কোন চিহ্ন-কাজ দেখেননি উপরন্তু তাঁর সবকিছুই ছিল সাধারণ, তবুও তারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে বাধ্য ছিলেন। ঈশ্বরের গৌরবধন্য কুমারী মরিয়মের স্বামী মনোনীত হওয়ায় যোষেফ লাভ করেছিলেন অসাধারণ এক সম্মান; কিন্তু পৃথিবীর আর সব সম্মানিত ব্যক্তিদের মতো তার জীবন সমস্যাহীন, মসৃণ ছিল না। খ্রীষ্টের

কারণে প্রাপ্ত সেই সম্মান বয়ে বেড়ানোর জন্য যোষেফকে যথেষ্টই কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। যোষেফকে বলা হল শিশুটি ও তাঁর মাকে নিয়ে মিশরে পালিয়ে যেতে।

এখানে আমরা দেখতে পাই ঈশ্বর মরিয়ম ও শিশু যীশুর পাশে দাঁড়ানোর জন্য কত সুন্দরভাবে যোষেফকে আগে থেকেই মনোনীত করে তাদের সাথে এক অনন্য সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছিলেন। পণ্ডিতদের কাছ থেকে উপহার হিসেবে পাওয়া সেই সোনা এখন তাদের যাত্রাপথের ব্যয় নির্বাহ করল। ঈশ্বর তাঁর লোকেরা কী ধরনের সমস্যায় পড়তে যাচ্ছে তা আগে থেকেই দেখতে পান; এবং সেই অনুযায়ী তিনি তার লোকদের কাছে সাহায্য পাঠান। তিনি অবিরত তাঁর লোকদের সাহায্য, পথের নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। যেমনটা তিনি যোষেফকে বলেছিলেন, 'আমি না বলা পর্যন্ত সেখানেই থেকো।' তাই যোষেফ তাঁর স্ত্রী, শিশু সন্তানসহ মিশরে পালিয়ে গেলেন; আর অপেক্ষায় থাকলেন কখন ঈশ্বরের কাছ থেকে পরবর্তী নির্দেশ আসে। এভাবেই ঈশ্বর তাঁর ওপর লোকদের নির্ভরতার নিরিখে তাদের সাহায্য করে থাকেন।

(২) এই ঘটনাটি আমাদের প্রভু যীশুর চরিত্রের নম্রতাপূর্ণ দিকটি তুলে ধরে। তাঁর জন্মের সময় যেমন বৈৎলেহমের কোথাও তাঁর জন্য কোন খালি ঘর পাওয়া যায়নি, তেমনি তাঁর আত্মগোপনের জন্যও সমগ্র যিহূদিয়ায় কোন নিরিবিলি-নিরাপদ ঘর পাওয়া গেল না। তাই তাঁকে পৃথিবীস্থ কেনান দেশ ছেড়ে অন্যত্র নির্বাসনে যেতে হয়েছিল; যেমনটা আমরা আমাদেরও পাপের কারণে স্বর্গীয় কেনান দেশ থেকে পৃথিবীতে নির্বাসিত হয়েছিলাম। আমরা, আমাদের শিশুরা যদি কখনো কোন সমস্যার মধ্যে পড়ে তখন আমরা শিশু খ্রীষ্টকে যে সমস্যার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল তা স্মরণ করতে পারি। এর ফলে, আমরা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনা উপলব্ধি করতে সক্ষম হব এবং তাঁর সাথে নতুন করে হৃদ্যতা স্থাপনে সমর্থ হব।

(৩) শিশু খ্রীষ্টের মিশর-গমন যিহূদীদের প্রতি ঈশ্বরের অসন্তুষ্টির কথা বলে; কারণ যিহূদীরা খ্রীষ্টের জন্মের ব্যাপারে তেমন গা করেনি। তাই, যে যিহূদীরা খ্রীষ্টকে অবজ্ঞা করেছিল তাদের অজ্ঞানতার দরুন খ্রীষ্ট নিভৃতে মিশরে চলে গেলেন। আমরা এখানে অযিহূদীদের প্রতি তাঁর আনুকূল্যের এমন একটা ছবি দেখতে পাই যা ভবিষ্যতেও দেখা গিয়েছিল। প্রেরিতেরা যখন যিহূদীদের কাছে সুসংবাদ নিয়ে গিয়েছিলেন তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল; পরে অযিহূদীদের কাছে সেই সুসংবাদ নিয়ে গেলে অযিহূদীরা তা সাদরে গ্রহণ করেছিল। যিহূদিয়া থেকে মিশরে যাবার পর খ্রীষ্ট যদি মিশরের কাছ থেকে আতিথ্য পেয়ে থাকেন তবে মিশর সম্বন্ধে শাস্ত্রের এই কথা তো অবশ্যই পূর্ণতা পায়, 'আমার প্রজা মিশর আশীর্বাদযুক্ত হোক' (যিশাইয় ১৯:২৫ পদ)।

গ. যোষেফ ঈশ্বরের নির্দেশের বাধ্য হয়েছিলেন (১৪ পদ)। আসন্ন যাত্রাপথে মরিয়ম এবং শিশুটির ওপর দিয়ে যে মাত্রাতিরিক্ত ধকল যাবে কিংবা অত্যাসন্ন সীমাহীন দুর্ভোগের ধাক্কা তারা সইতে পারবে কিনা– এ নিয়ে যোষেফ মোটেও ভাবিত হন নি; বরং কোন প্রকার ওজর-আপত্তি দর্শানো থেকে নিজেকে বিরত রাখার মাধ্যমে ঈশ্বরের নির্দেশের প্রতি বাধ্য থাকলেন। তিনি এমন কিছু করলেন না যা দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি তার অবাধ্যতার চিহ্ন ফুটে উঠে। মিশরের ঠাণ্ডা আবহাওয়া, সঞ্চয়ের জীর্ণ অবস্থা– এত প্রতিকূলতার মধ্যেও যোষেফ সেই অনিশ্চয়তাময় ভবিষ্যতের দিকে এগুতে ভয় পেলেন না। এ ছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নেও তিনি সময়ক্ষেপণে রাজি হলেন না; তিনি তখনই উঠে, যে

রাতে ঈশ্বরের নির্দেশ এসে পৌঁছল, সেই রাতেই মিশরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। মনে রাখুন, ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা প্রমাণে আমাদেরও নির্দেশ পাবার সাথে সাথেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত। অব্রাহাম যেভাবে ঈশ্বরের নির্দেশের বাধ্য হয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন যোষেফও তেমনি ঈশ্বরের নির্দেশের প্রতি বাধ্য থেকে বৈৎলেহেম ছেড়ে মিশরের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালেন (ইব্রীয় ১১:৮)। যাত্রাপথে সম্বল বলতে যোষেফ ও তাঁর স্ত্রীর বলার মতো কিছু ছিল না। ফলে তাঁদের জাগতিক অর্থ-সম্পদের প্রতি মোহ, পিছুটান ছিল না। কারণ অর্থ-প্রাচুর্য চটজলদি কোন যাত্রার সিদ্ধান্ত নিতে দেয় না উপরন্তু নানা প্রতিবন্ধকতা, ওজর-আপত্তির মুখে ঠেলে দেয়। ধনীদের সাথে গরীব মানুষের এটাও একটা পার্থক্য যে ধনীরা যেখানে যায় সেখানেই স্থায়ী হয়ে বসার পর্যাপ্ত সুবিধা, সামাজিক সমর্থন, প্রচুর বন্ধু পেয়ে যায়; অপরদিকে গরিবেরা তাদের যা সহায়-সম্বল আছে তা-ই নিয়ে যে কোন 'ত্যাগের' জন্য প্রস্তুত থাকে। তাদের বলার মতো কোন সামাজিক বন্ধন, পিছুটান, স্বার্থ, মোহ থাকে না।

'যোষেফ শিশুটি ও তাঁর মাকে নিয়ে...'– এই কথা প্রসঙ্গে অনেকে মন্তব্য করেন যে এখানে শিশুটির কথা প্রথমে বলা হয়েছে কারণ তিনিই মুখ্য ব্যক্তি, তারপর তাঁর মায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষণীয় যে, মরিয়মকে কিন্তু এখানে 'যোষেফের স্ত্রী' হিসেবে বলা হয়নি, বরং নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে 'শিশুটির মা'। এর দ্বারা যোষেফের সাথে যীশুর সত্যিকারের যে সম্পর্ক তার ইঙ্গিত স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। যাহোক, এই যোষেফ মিশরে গিয়েছিলেন ঈশ্বরের নির্দেশে, হেরোদের নিষ্ঠুরতা থেকে শিশু যীশুকে বাঁচানোর স্বার্থে। শাস্ত্রে আমরা আরও একজন যোষেফকে দেখতে পাই, যাকে তাঁর ভাইয়েরা বিক্রি করে দিয়েছিল; আর পরে তিনি মিশরে তাঁর আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিলেন।

মিশরের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কথা মাথায় রেখে আমরা ধরে নিতে পারি, মিশরের ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান জানাতে খ্রীষ্টকে স্বাভাবিক নিয়মে মিশরের ধর্মধামে যেতে হয়েছিল। আর পূর্বে করা ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী (প্রভু যীশু মিশরে আসবেন এবং তাঁর উপস্থিতিতে মিশরের দেব-দেবীরা স্থানচ্যুত হবে' যিশাইয় ২১:১) তখন এক অদৃশ্য শক্তির ইশারায় মিশরের সমস্ত দেবদেবী স্ব স্ব স্থান থেকে উল্টে পড়ে গিয়েছিল। হেরোদের মৃত্যু পর্যন্ত যোষেফ শিশু যীশু ও মরিয়মকে নিয়ে মিশরে অবস্থান করলেন। অনেকে মনে করেন, সময়টা সাত বছর; আবার অন্যরা মনে করেন, ঠিক অতটা নয়। সেখানে তারা মিশরের দেব-দেবীর মন্দির, তাদের সেবা ও সান্নিধ্য থেকে নিজেদের সন্তর্পণে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। ঈশ্বর তাঁদের সেখানে পাঠিয়েছিলেন যেন তাঁরা মিশরীয়দের অনুগ্রহ পান; কিন্তু নিজের বিশ্বাস, অস্তিত্বকে বিকিয়ে না দেন। যদিও তাঁরা ঈশ্বরের মন্দির থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলেন তবুও তাঁরা আশ্বস্ত ছিলেন এই ভেবে যে, তাঁদের সাথেই তো আছেন ঈশ্বরের জীবন্ত মন্দির। ঈশ্বরের আদেশের বাধ্য থাকার দরুন তাঁরা অবিশ্বাসীদের সাথে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। এত কিছু সত্ত্বেও তারা ঈশ্বরের প্রতি অনুগত থেকে পাপ করা থেকে বিরত ছিলেন। যা আমাদের জন্য হতে পারে অনুকরণীয় উদাহরণবিশেষ। অনেক পাপী-অবিশ্বাসী পরিবেষ্টিত হয়ে থাকার পরও যদি আমরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে সমর্থ হই তবেই না আমরা বিশ্বাসের চ্যালেঞ্জে সত্যিকারের বিজয় অর্জনে সক্ষম হই। সত্যিই, বিশ্বাসীদের জন্য এ এক অনন্য পরীক্ষা।

ঘ. তাদের মিশর গমনের ফলে শাস্ত্রের এই যে কথা, 'মিশর থেকে আমি আমার

পুত্রকে ডেকে এনেছিলাম' (হোশেয় ১১:১)– তা পূর্ণ হবার প্রয়াস পেল। সুসংবাদ-লেখকদের মধ্যে একমাত্র মথিই খ্রীষ্টের বিষয়ে পুরাতন নিয়মে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, সেসবের পূর্ণতা সাপেক্ষে প্রচুর উদ্ধৃতি টেনেছেন। এর একটি বড় কারণ হচ্ছে যে, তাঁর লেখা সুসংবাদ যিহূদীদের মাঝে প্রথম প্রকাশিত হয়। ফলে উদ্ধৃতির পর্যাপ্ত ব্যবহার সুসংবাদের ভিত্তি এবং যিহূদীদের মাঝে এর গ্রহণযোগ্যতা নিঃসন্দেহে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। পুরাতন নিয়মে ভাববাদীর মাধ্যমে করা এই ভবিষ্যদ্বাণী সন্দেহাতীতভাবেই মিশর থেকে ইস্রায়েলের স্বাধীনতার বিষয়ে বলা হয়েছিল। ইস্রায়ে, যাকে ঈশ্বর তাঁর প্রথম ছেলে বলে অভিহিত করেছিলেন, সেই প্রথম ছেলের মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভের কথাই মূলত শাস্ত্রের এই অংশটি ঘোষণা করে। দেখুন, যাত্রা৪:২২। কিন্তু এখানে, মথির লেখা সুসংবাদে সেই উদ্ধৃতিটি খ্রীষ্ট, যিনি মণ্ডলীর মাথা, তাঁর ক্ষেত্রে উপমা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

মনে রাখুন, শাস্ত্রের বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা রয়েছে। কিন্তু তা অবশ্যই হতে হবে গঠনমূলক, সদুদ্দেশ্য-প্রসূত এবং কার্যত সুব্যাখ্যা। প্রতিদিনই ঈশ্বর তাঁর শাস্ত্রের কথা পূর্ণ করে চলেছেন। শাস্ত্রের ব্যাখ্যা গণ্ডিবদ্ধ নয় বরং তা সুবিস্তৃত এবং অনেক ঘটনা-কার্যকারণকে সুগ্রন্থিত করে। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক শাস্ত্রের এই অংশটি, "ইস্রায়েল যখন শিশু তখন আমি তাঁকে ভালবাসলাম, আর এই ভালবাসার দরুন তাকে কিছুকালের জন্য দুঃখভোগ করতে মিশরে পাঠালাম; কিন্তু যেহেতু আমি তাকে ভালবাসি তাই নির্দিষ্ট সময়ে আমি আবার তাকে মিশর থেকে বের করে আনলাম'। যিহূদীরা যখন শাস্ত্রের এই অংশটি পড়বে তখন তারা তাদের অতীতের দিকে তাকাবে; হ্যাঁ, ঈশ্বর তাদের মিশর থেকে এভাবেই বের করে এনেছিলেন। কিন্তু যখন শাস্ত্রের মনোযোগী, সত্যিকারের পাঠক বা ব্যাখ্যাকারী তা পড়বেন তখন তিনি শুধু অতীতের দিকেই তাকাবেন না বরং সামনের দিকেও তার দৃষ্টিকে প্রসারিত করবেন, কারণ 'যা হয়ে গেছে তা আবার হবে, যা করা হয়েছে পুনরায় তা করা হবে' (উপদেশক ১:৯)। একটি বক্তব্য কোন অবস্থায় কীভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে; যদিও আমরা জানতে পারলাম যে শাস্ত্রের কোন কথার কার্যকারিতা যেমন হারায় না, তেমনি শাস্ত্রে উল্লিখিত কোন ঘটনার প্রতিফলন যে দেখা যাবে না কিংবা সেই ঘটনাটিই যে আর ঘটবে না তা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারে না। এখানে যেমন নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে 'আমি আমার পুত্রকে মিশর থেকে ডেকে আনলাম'।

লক্ষ্য করুন, এখানে কিন্তু বলা হয়নি 'আমি তাকে', বরং পরিষ্কারভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে 'আমি আমার পুত্রকে'। সে কারণেই খ্রীষ্টের ক্ষেত্রে এই উদ্ধৃতিটি ব্যবহৃত হয়েছে। মনে রাখুন, ঈশ্বরের সন্তানদের মিশরে থাকার অভিজ্ঞতা নতুন নয়। ইস্রায়েল জাতির লোকেরা দীর্ঘ চার'শ বছরেরও বেশি সময় মিশরে দাস হিসেবে ছিল। কিন্তু যোষেফ, শিশু যীশু ও তাঁর মায়ের মিশর গমন একটু অন্যরকম। তাঁরা মিশরে দাস হিসেবে অবস্থান করছেন না; তাঁরা জানেন যে, সময় হলেই তাঁরা আবার মিশর থেকে স্বদেশে ফিরে আসবেন। তাঁরা হয়তো কিছুকালের জন্য মিশরে আত্মগোপন করে আছেন কিন্তু তাঁর স্থায়িত্ব বেশি দিনের নয়। ঈশ্বরই সবকিছু নির্বাচন করেন। কারণ খ্রীষ্টের শিশু-প্রকৃতি গড়ে উঠল মিশরে। আর মিশর ছিল এমন একটি দেশ যার প্রায় সব বাসিন্দাই ছিল দেবদেবীর উপাসক। কিন্তু খ্রীষ্ট যে অন্যরকম; তাঁর আত্মিক বৃদ্ধি যে আলাদা ছিল– সেই বৈপরীত্যই কিন্তু তাঁকে বিশেষায়িত করেছিল। এজন্য তাঁকে ঘিরে বোধকরি অনেক প্রশ্নের উন্মেষ

ঘটেছিল। অবশ্যই ধার্মিকতার সূর্য আঁধারে ঢাকা দেশ থেকে উত্থিত হবেন! সম্মুখের বিরল সম্মানের দিকে এগুবার জন্য ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে মিশর থেকে বের করে এনেছিলেন। আর এখানে খ্রীষ্টকে তিনি ডেকে আনবেন তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য। মানুষকে পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ, খ্রীষ্টও যে পরবর্তীতে গৌরবোজ্জ্বল শিরোপা হাতে তুলে নেবেন– সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ তো নেই, অবাক হবারও কিছু থাকবে না।

মথি ২:১৬-১৮

এখানে লক্ষণীয়,

ক. হেরোদের কাছে নতুন রাজার অবস্থান সম্পর্কে কিছুই না জানিয়ে পণ্ডিতদের চলে যাওয়ায় ভীষণ রেগে গিয়ে হেরোদ বৈৎলেহেম ও তার আশপাশের দুই বছর ও তার কম বয়সী সব শিশুকে হত্যার আদেশ দিলেন। হেরোদ সেই পণ্ডিতদের জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি তাদের ফিরে আসার ব্যাপারে অত্যন্ত আশাবাদী ছিলেন। সেটা তাঁর অপেক্ষার ধরণ দেখলেই বোঝা যায়। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, ওদের বোধহয় কোথাও দেরি হচ্ছে, পা চালিয়ে আসতে পারছে না, খুবই ধীর। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে পণ্ডিতরা অবশ্যই আসবে; তাঁদেরকে আসতেই হবে। এই বিশ্বাস ছিল মূলত তাঁর পদমর্যাদাগত অহংকার-প্রসূত। তাঁর আদেশ (অনুরোধের সুরে বলা যদিও) অমান্য করার দুঃসাহস এই পণ্ডিতেরা দেখাবে না– সে বিষয়ে তাঁর মনে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। কিন্তু দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পরও যখন পণ্ডিতেরা আসলেন না তখন তিনি নিজেই তাদের খুঁজে আনার জন্য লোক পাঠালেন। আর সেই লোকেরা ফিরে এসে তাঁকে জানালেন, পণ্ডিতেরা ভিন্ন রাস্তা ধরে তাদের দেশে চলে গেছেন। একথা শুনে তাঁকে চরম বোকা বানানো হয়েছে ভেবে তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গেলেন। হেরোদের এই ক্রোধান্ধ হয়ে পড়ার অবশ্য আরেকটি কারণ ছিল, বোধকরি সেটাই মূল কারণ যে, পণ্ডিতেরা তাঁর চেয়ে সেই নতুন রাজার দিকেই বেশি আগ্রহী ও পক্ষপাতী ছিল। এই কথা ভেবে হেরোদ সেই নতুন রাজার প্রতি আরও ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠলেন। নিজের সক্ষমতা, অস্তিত্ব ও আমিত্বের ওপর আঘাত আসায় রাজা হেরোদ আরও বেপরোয়া ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠলেন। মনে রাখুন, যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অপরাধের উপস্থিতি সে যদি বাধা পায় তবে তা আরও ভয়ঙ্কর রূপে প্রকাশিত হয়; আর ফুলে ফেঁপে ওঠা এই অপরাধ তখন পাপে পূর্ণ উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহৃত হয়।

খ. রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য হেরোদ যে কতটা ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারেন তা আমরা এই ঘটনার মাধ্যমে দেখতে পাই। সহিংসতা ছড়াতে জটিল সব কূটচাল চালতে তিনি যে সিদ্ধহস্ত তার প্রমাণ হল যিহূদী-রাজাকে মেরে ফেলার জন্য তাঁর নেওয়া সহিংস উদ্যোগ। এক্ষেত্রে তিনি যদি ব্যর্থ হতেন অর্থাৎ নির্মম শিশুহত্যা থেকে তাঁকে নিরস্ত করা হতো, তাহলে বোধহয় তিনি আরও উগ্র হয়ে উঠতেন। ফলশ্রুতিতে ইস্রায়েলের লোকদের মাঝে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দিতেও তিনি কুণ্ঠিত হতেন না।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে হেরোদ ছিলেন একজন ইদোমীয়। ফলে তিনি ছিলেন হাড়ে হাড়ে ইস্রায়ে-বিদ্বেষী। পুরাতন নিয়মে আমরা দেখি ইদোমীয় দোয়েগকে, যে লোক দায়ূদের প্রতি ক্ষোভ থেকে সদাপ্রভুর পুরোহিতদের খুনে হাত রাঙিয়েছিল। এখানে অবাক

হবার মতো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় যে, হেরোদ যাদেরকে নির্মম শিশুহত্যার কাজে নিয়োগ করেছিলেন তাদের কেউই এই অমানবিক কাজের বিরোধিতা করেনি; অবশ্য একথা তো জানাই যে, দুষ্ট লোক সবসময় দুষ্টদের নিয়েই কাজ করে। ছোট্ট শিশুরা সবসময়ই অন্যের ওপর বেশি মাত্রায় নির্ভরশীল; বেঁচে থাকার জন্যই তাদের যে বিশেষ সুরক্ষার প্রয়োজন হয় তা শুধুমাত্র মানুষের তৈরি নিয়ম-আইনের কারণেই নির্ধারিত হয় না; উপরন্তু মানবপ্রকৃতিও শিশুদের জন্য বংশ পরম্পরায় এই সুরক্ষাপদ্ধতি সংরক্ষণ করে থাকে। তবুও এই শিশুরা, যাদের কিছুই করার ক্ষমতা ছিল না– তারা হেরোদের ক্রোধের বলি হল।

হেরোদকে আমরা এখানে নীরোর সাথে তুলনা করতে পারি। শিশুদের এই অসহায় মৃত্যু আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, দুর্বলতা, অসহায়ত্ব, করুণার্দ্র চাহনি চূড়ান্তভাবে নিরাপত্তাদানে অক্ষম। হেরোদ তাঁর রাজ্যে হত্যা, নিপীড়নের জন্য কুখ্যাত ছিলেন; এটা বেশিদিন আগের কথা নয় যখন তিনি পুরো সানহেদ্রিন, বিচারকদের বেঞ্চ ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। কিন্তু একথা তো আমরা সবাই জানি, যে একবার রক্তের স্বাদ পেয়েছে সে তো আর কিছুই মানবে না শুধু রক্তপান ছাড়া! তাই হেরোদ যতই নিপীড়ন, হত্যায় হাত রাঙান, ততই তার মাথায় হত্যা, খুনের নেশা চেপে বসত। এই শিশুদের ক্ষেত্রে হেরোদ ঠিক সেই কাজটিই করেছিলেন। তিনি যে শিশুদের হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তাদের বয়স ছিল দুই ও তার কম। অপরদিকে হেরোদের নিজের বয়স ছিল প্রায় সত্তর বছর। ফলে এটা তো পরিষ্কার যে এই শিশুদের দ্বারা তাঁর রাজত্বের ন্যূনতম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে যাওয়া হেরোদের মাথায় তখন এসবের কিছুই খেলেনি। তিনি সেই অসহায় শিশুদের ওপর খড়্গহস্ত হলেন। এমন নয় যে তিনি তাঁর সন্তানদের প্রতি গভীর মমত্ববোধ থেকে তাদের জন্য সিংহাসন নিষ্কণ্টক রাখতে চেয়েছিলেন; কারণ আমরা দেখি যে, তিনি নিজের দুই ছেলেকে (আলেক্সজাণ্ডার, আরিস্তবুলাস) হত্যা করেছিলেন। এরপর রইল আন্তিপাতের, কিন্তু শিশুদের হত্যা করার নির্দেশ দেবার পাঁচ দিন আগে সেই ছেলেকে নিজের মুখে হত্যার নির্দেশ দেন। ফলে একথা তো নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, হেরোদ পুরোপুরি নিজের পাশবিকতা, লালসা এবং ব্যক্তিক অহং চরিতার্থ করতেই এ ধরনের পৈশাচিক খুনে মেতে ওঠেন। তবে তার এই নিষ্ঠুর, নির্দয় খেলা কোন সমর্থ মানুষের বিরুদ্ধে ছিল না, ছিল অসহায় ছোট্ট শিশুদের বিপক্ষে।

লক্ষ্য করুন, হেরোদের এই হত্যাযজ্ঞের বিস্তৃতি কত দূর পর্যন্ত ছিল,

১. দুই বছর এবং তার কম বয়সী সব শিশুকে তিনি হত্যার নির্দেশ দিলেন। এটা সহজেই অনুমেয় ছিল যে, যীশুর বয়স সে সময় এক বছরও হয়নি, তবুও হেরোদ দুই বছর ও তার কম বয়সী সব শিশুকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। বোধকরি হেরোদ নিশ্চিত হতে চাইলেন যে একটা শিকারও যেন ফসকে না যায়। তিনি একটিবারের জন্যও ভাবলেন না যে, এতে কত নির্দোষ শিশু মারা যাবে; উপরন্তু দোষী কি নির্দোষ কাউকেই তিনি পালানোর বা বেঁচে থাকবার অধিকারটুকুও দিলেন না।

২. তিনি বৈৎলেহেম ও তার আশপাশের দুই বছর বা তার কম বয়সী সব পুরুষ সন্তানকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। নৃশংসতার এই মাত্রা আসলেই সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল (উপদেশক ৭:১৭)। ঘৃণা হচ্ছে লাগামহীন ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ; আর এর সাথে যদি অসদুদ্দেশ্য, বেআইনি ক্ষমতার যোগ ঘটে তবে তা নিষ্ঠুরতার চরম উদাহরণ সৃষ্টিতে পারঙ্গম। এখন আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কেন ঈশ্বর এই নির্মম হত্যাকাণ্ড

ঘটতে দেখেও নীরব থাকলেন। বিষয়টি অনুধাবনের জন্য আমাদের অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ঈশ্বরের ইচ্ছা, তাঁর কার্যপদ্ধতি নিয়ে চিন্তা করতে হবে। জন্মলাভের পর থেকে মানুষের ভেতর ধীরে ধীরে বিবেচনাবোধ জাগ্রত হতে আরম্ভ করে। এরই ধারাবাহিকতায় একসময় সে ভাল-খারাপের তারতম্য বুঝতে শেখে। তার মানে এই নয় যে, সে তার বোধ উদয়ের আগে বেপাপ ছিল। কারণ শাস্ত্রে আমরা পড়ি যে, একজনের অবাধ্যতার কারণে মানুষের ভেতর পাপ প্রবেশ করে, ফলে তার সাথে পরিচয় ঘটে মৃত্যুর। কিন্তু আমরা নিজেদের পাপের জন্য সেই প্রথম মানুষের ওপর সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা আত্মতুষ্টি লাভ করতে পারি না। এর কোন সুযোগ নেই। যেমন আমরা একথাও বলতে পারি না যে, এই শিশুরা ইস্রায়েলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাপী ছিল। এর কারণ, তাদের এই দুঃখভোগ ছিল বিশেষ এক উদ্দেশ্যে।

ঈশ্বরের বিচার সুগভীর। শিশুদের যে রোগ-ব্যাধি হয় তা প্রমাণ করে যে তাদের ভেতর পাপের উপস্থিতি রয়েছে। খ্রীষ্টের কারণে যে শিশুরা মৃত্যুবরণ করেছিল তারা ছিল 'শহীদ'। একবার ভাবুন তো, খ্রীষ্ট এবং তাঁর রাজ্যের বিরুদ্ধে কতকটা আগে-ভাগেই দুঃখভোগের এই পেয়ালা নেমে এসেছিল! খ্রীষ্ট যে বলেছিলেন, 'একথা মনে কোরো না আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি.. বরং মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে এসেছি' (মথি ১০:৩৪,৩৫ পদ)– তার প্রমাণ কিন্তু খ্রীষ্টের জন্য সাক্ষ্যমরের মৃত্যুবরণকারী এই শিশুরাই। এর দ্বারা প্রভু যীশু এক অপ্রতিরোধী আত্মসাক্ষ্য দিলেন। তিনি যখন মায়ের গর্ভে ছিলেন তখন তাঁকে প্রত্যক্ষ করে ইলিশাবেতের শিশুপুত্র যোহন মায়ের গর্ভে নেচে উঠেছিলেন; আর এখন, দুই বছর বয়সী সেই শিশুরা, যারা কিনা তাঁরই সমসাময়িক, তারা তাঁর জন্মের ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করল অন্য রকমভাবে। নিজেদের তাজা রক্ত ঝরিয়ে। বৈৎলেহেম ও তার আশপাশের শিশুরা সেই মহামানবের জন্য রক্ত দিল যিনি পরবর্তীতে তাদের জন্য, সমস্ত পাপীদের জন্য রক্ত ঝরাবেন। এই শিশুরা ছিল সাক্ষ্যমরদের অভিজাত বাহিনীর অগ্রবর্তী সৈনিক। হ্যাঁ, যদিও তারা মণ্ডলীতে বাপ্তিস্ম গ্রহণের সুযোগ পায়নি তবুও তারা নিশ্চিতভাবেই স্বর্গে মহান ঈশ্বরের কাছ থেকে সেই পুরস্কার লাভ করবে যা তারা এই পৃথিবীতে হারিয়েছিল; কারণ তারা রক্ত ঝরিয়েছিল খ্রীষ্টের জন্য। 'সেই শিশুরা যারা মায়ের দুধ খেত তারা ঈশ্বরের কাছে সম্মানিত হবে'; আর তা না হওয়ার কোন কারণও নেই; যেহেতু আমাদের ঈশ্বর মহান, দয়ায় পূর্ণ।

গ্রীক মণ্ডলীসমূহে একথা প্রচলিত যে নিহত সেই শিশুদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দ হাজার; কিন্তু এটা একেবারেই অসম্ভব। আমি মনে করি, সে সময়কার জনসংখ্যার নিরিখে পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় নগরেও যদি সপ্তাহান্তে দুই বছর ও তার কম বয়সী পুরুষ শিশুদের সংখ্যা গণনা করা হয় তবে তা চৌদ্দ হাজারের চৌদ্দ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ এক হাজার ছাড়াবে না। এখানেই ঐতিহ্যগত ইতিহাস সংরক্ষণ পদ্ধতির ব্যর্থতা ফুটে ওঠে। এটা আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকে যে, যোসেফাস (যিহূদী ইতিহাসবিদ) এই ঘটনাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন; যদিও তিনি মথির অনেক পরে খ্রীষ্টের সমসাময়িক ইতিহাস লিখেছিলেন। আর এটা বোধকরি একারণেই হয়েছিল যে তিনি খ্রীষ্টীয় ইতিহাসের আনুপুঙ্খ তুলে আনতে চাননি, কারণ তিনি ছিলেন একজন ঈর্ষাকাতর যিহূদী। কিন্তু এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ইতিহাসের কোথাও যদি কোন অসত্য তথ্য থাকত তবে তিনি সানন্দে তার প্রতিবাদ করতেন। শুধু তাই নয়, খ্রীষ্টের বিষয়ে লেখা ইতিহাস যদি তার আগেই সত্যতার

সাথে লিপিবদ্ধ না হতো তবে তিনি তার বিকৃতি ঘটানোর সুযোগ পেয়ে যেতেন।

অন্যদিকে ম্যাক্রোবিউস (এই লেখক খ্রীষ্টীয় ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না) আমাদের জানান, 'সম্রাট আগস্ত যখন হেরোদের নির্মম শিশুহত্যা, এমনকি নিজ সন্তান হত্যার বিষয়ে শুনলেন তখন তিনি এই বলে পরিহাস করলেন 'হেরোদের সন্তান হয়ে জন্মানোর চেয়ে হেরোদের কুকুর হয়ে জন্মানোও ভাল' এবং পুরো বিষয়টিকে পাশ কাটিয়ে হেরোদের ওপরই সবকিছু ছেড়ে দিলেন। সে সময়কার রীতি অনুযায়ী একটা কুকুরকে হত্যার ব্যাপারেও কড়া নিষেধাজ্ঞা ছিল, কিন্তু হেরোদ তাঁর খুনের মনোবৃত্তির ফল তাঁর ছেলেকেও দিলেন। তিনি তাঁর ছেলেকে মেরে ফেললেন। অনেকে মনে করেন, বৈৎলেহমের এক দাই-এর কাছে তাঁর একটি ছোট ছেলে ছিল; অন্যরা বলেন, বৈৎলেহমের শিশুহত্যা এবং হেরোদের ছেলে আন্তিপাতেরের মৃত্যু– এ দু'টি ঘটনা অবশ্যই একসাথে ঘটেনি। ভুলে এই দু'টি ঘটনাকে অনেকে গুলিয়ে ফেলছেন। কিন্তু রোমান মণ্ডলীতে নির্মম এই শিশুহত্যার (এই শিশুদের তারা বলে থাকে 'পবিত্র নির্দোষ') ঘটনাকে স্মরণ করার জন্য ক্যালেন্ডারের একটি দিন বেছে নেওয়া হয়েছে। শিশুদের স্মরণ করতে গিয়ে যদিও-বা হেরোদও আলোচনায় উঠে আসেন তবুও তারা তাদের পূর্বপুরুষদের (যারা ভাববাদীদের কবর গেঁথেছেন) দেখানো পথেই হাঁটছে। এক্ষেত্রে বোধকরি তারাও একই কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

শিশুহত্যার মাধ্যমে হেরোদ ভেবেছিলেন খ্রীষ্টের বিষয়ে পুরাতন নিয়মের সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যে প্রমাণ করা গেল। অনেকে এই ঘটনায় 'টাইমিং'-এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ঈশ্বর খ্রীষ্টকে রক্ষায় সময়ানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার ফলেই হেরোদ পণ্ডিতদের কাছে বোকা বনে যাওয়ার শোধ তুলতে গিয়ে আরও বড় বোকামি করলেন। পুরাতন নিয়মে করা ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ করে খ্রীষ্ট বৈৎলেহমে জন্মগ্রহণ করলেন। তারপর হেরোদের আক্রোশ থেকে বাঁচতে তাঁকে নিয়ে তাঁর বাবা-মা মিশরে আত্মগোপন করলেন। এদিকে বৈৎলেহেম ও তার আশপাশের দুই বছর বা তার কম বয়সী সব শিশুকে হত্যা করা হয়েছে শুনে হেরোদ মনে মনে ভাবছিলেন যে, তিনি পুরাতন নিয়মের সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যে প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, পুব আকাশের তারার নির্দেশনা, নতুন রাজার প্রতি পণ্ডিতদের ভক্তি– সব কিছুকেই তিনি হারিয়ে দিতে পেরেছেন; নতুন রাজার কবল থেকে তিনি পেরেছেন দেশকে মুক্ত করতে; মৌচাকে আগুন ধরিয়ে দিয়ে রাণী মৌমাছিকে তিনি মেরে ফেলেছেন। এখন আর কে আছে খ্রীষ্ট হবার! হেরোদের এই দম্ভোক্তি শুনে একজন কিন্তু ঠিকই স্বর্গ থেকে হেসেছিলেন। হ্যাঁ, ঈশ্বর হেরোদের মূর্খতা দেখে হেসেছিলেন। মানুষের অন্তর যত মন্দ, ধূর্ত আর কৌশলে পূর্ণ পরিকল্পনাই করুক না কেন ঈশ্বর তা অবশ্যই জানবেন। আর তাঁর বাক্যকে যে চ্যালেঞ্জ জানায় তার দৌড় যে কত দূর তা তো তাঁর জানাই আছে।

গ. এখানে শাস্ত্রের যে কথা পূর্ণ হওয়ার বিষয়ে বলা হয়েছে (১৭,১৮ পদ) তা পুরাতন নিয়মের যিরমিয় ৩১:১৫ পদ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে– 'রুকফাটা কান্নার আওয়াজে রামার আকাশ ভারি হয়ে উঠেছে'। ভাববাদী যিরমিয়ের করা এই ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্য তাঁর সময়েই পূর্ণ হয়েছিল। সম্রাট নবূষরদন যিরূশালেম ধ্বংসের পরে সব বন্দীকে রামায় পাঠিয়ে দেন (যিরমিয় ৪০:১) এবং সেখানে তারা সম্রাটের সন্তুষ্টি বিধানে মৃত্যু ও দাসত্বকে বরণ করে নিল। তাদের সেই কান্না তখন বৈৎলেহেম (এ দু'টি নগরের একটি পড়েছিল যিহূদার

এলাকায় এবং অপরটি বিন্ইয়ামীনের এলাকায়। মূলত এই দু'টি শহরের মাঝখানের দূরত্ব খুব বেশি নয়) পর্যন্ত শোনা গিয়েছিল। আর এবার সেই ভবিষ্যদ্বাণীটি আবার পূর্ণ হল হেরোদের হাতে নির্দোষ শিশুদের মৃত্যুর কারণে। শাস্ত্রের এই কথা মূলত কয়েকটি দিক থেকে পূর্ণ হয়েছিল:

১. শোকের স্থান। বৈৎলেহেম থেকে রামা পর্যন্ত কান্নার আওয়াজ শোনা গিয়েছিল। হেরোদের নিষ্ঠুরতার কারণে বৈৎলেহমের আশপাশের নগরও বাদ যায় নি; এমনকি বিন্ইয়ামীনের এলাকা কিংবা রাহেলার সন্তানেরাও হেরোদের নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছিল। অনেকে মনে করেন 'রাহেলা' বলতে প্রতীকী অর্থে এখানে বৈৎলেহমের কথা বোঝানো হয়েছে। কারণ যাকোবের স্ত্রী রাহেলা এই বৈৎলেহমে মৃত্যুবরণ করেন ও কবরপ্রাপ্ত হন। রাহেলার সমাধিকে নির্দেশ করে তাই এখানে বৈৎলেহমের কথাই বলা হয়েছে (আদি ৩৫:১৬,১৯; পর্বের সাথে তুলনা করুন, ১ শমূয়েল ১০:২)। রাহেলা তার মৃত সন্তানদের জন্য শোকে মূহ্যমান: রাহেলা যাকে জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান তার নাম ছিল 'বিনোনী'- যার অর্থ, আমার দুঃখের সন্তান। নিহত শিশুদের মায়েরা ছিল রাহেলার মতো, এদের অনেকেই ছিল রাহেলার বংশধর। অনেকটা প্রতীকী অর্থে নিজ সমাধি নিয়ে রাহেলাও তাদের পাশেই ছিলেন। আর তাই এখানে তাদের সম্মিলিত ক্রন্দনকে বর্ণনা করা হয়েছে– 'রাহেলা কাঁদছে'।

২. কান্নার ব্যাপকতা। 'বুকফাটা কান্নার আওয়াজে রামার আকাশ ভারি হয়ে উঠেছে' একথা দ্বারা তীব্র শোকানুভূতি প্রকাশ করা হয়েছে। মিশরে প্রথম সন্তানের মৃত্যুর পরও ঠিক এরকম আকাশ ভারি করা কান্না শোনা গিয়েছিল। আর এখানে ছোট সন্তানের মৃত্যুতে সেই আহাজারি। তীব্র শোকে আচ্ছন্ন হয়ে গেলে মানুষ এমনটাই করে। এই ঘটনা ছিল আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি তারই প্রতিবিম্ব। আমরা এখানে প্রতিনিয়ত দুঃখ, আহাজারি, নিপী-ড়িতের বাঁধভাঙা ক্রন্দন প্রত্যক্ষ করি। এই শোকের প্রকাশও একেকজনের ক্ষেত্রে একেক রকম। আমাদের জীবনের পথগুলো যেন এক গভীর কান্নার উপত্যকা। শিশুহারা সেই মায়েদের কান্না উচ্চগ্রামে পৌঁছেছিল কারণ তাদের সামনে সান্ত্বনা লাভের কোন পথই খোলা ছিল না। ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহে এই পৃথিবীতে এখন আর কোন শোক-পরিতাপের অবকাশ নেই। যে শোক মূলত পাপের হাত ধরে মানুষের মাঝে এসেছিল তা এখন কার্যত অচল। খ্রীষ্টে আমাদের কোন শোক নেই। তিনিই আমাদের চিরস্থায়ী সান্ত্বনা। জাগতিক যে দুঃখভোগ আমাদের জীবনে এসে থাকে তা কেবল আমাদের পরীক্ষার জন্যই। সন্তান হারিয়ে সেই মায়েরা কিছুতেই সান্ত্বনা পাচ্ছিল না, এই কারণে যে তাদের সন্তানেরা আর নেই, তারা মারা গেছে। হ্যাঁ, তাদের অনিঃশেষ শোকের একটা অজুহাত ছিল যে, 'তারা নেই'। কিন্তু খ্রীষ্টে যেহেতু আমাদের অজুহাত দেবার কোন সুযোগ নেই, তাই আনন্দের সাথেই আমাদেরকে সেই দুঃখভোগ মেনে নিতে হবে। শিশুহারা সেই মায়েরা কাঁদছিল, কারণ তারা জানতো যে, তাদের সন্তানেরা আর নেই। কিন্তু আমরা জানি যে তারা হারিয়ে যায় নি; পৃথিবী থেকে চলে যাওয়া মানেই হারিয়ে যাওয়া নয়। তারা অবশ্যই আছে; আর যদি আমরা ভুলে যাই যে, 'তারা আছে' তবে আমরা আর কিছুতেই সান্ত্বনা পেতে পারি না (১ থিষলনীকীয় ৪:১৩)।

বৈৎলেহেমবাসীর এই দুঃখভোগকে অনেকে বিচারের দিনের সাথে তুলনা করেন যখন তারা খ্রীষ্টকে অবজ্ঞা করার জন্যে বিচারের সামনে আনীত হবে। কারণ তারা খ্রীষ্টের জন্মে

আনন্দে উদ্বেলিত হয়নি, কেবল নিজেদের সন্তানদের জন্য কেঁদেছে। রাখালেরা তাদের কাছে খ্রীষ্টের জন্মের যে সুসংবাদ বয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাতে তারা কেবল আশ্চর্য হয়েছিল কিন্তু সেই রাখালদের, তাদের সংবাদকে স্বাগত জানায়নি।

নির্মম শিশুহত্যার ঘটনা প্রসঙ্গে এখানে উদ্ধৃত শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণীটি খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে অনেকের তোলা প্রশ্নটিকে আরো জোরালো করে তোলে, 'খ্রীষ্ট, যিনি ইস্রায়েলের পরিত্রাণকর্তা, তিনি কি এই শোকের সাথে পরিচিত হতে পারতেন না?' হ্যাঁ, কারণ এটা অনেক আগে বলা হয়েছিল এবং শাস্ত্রের কথাকে অবশ্যই পূর্ণ হতে হবে। অন্যদিকে, আমরা যদি এই ভবিষ্যদ্বাণীর আরও গভীরে তাকাই তাহলে দেখতে পাব যে, রামার এই কান্না খ্রীষ্টের দেওয়া পরিত্রাণের আনন্দের কাছে অনেক ম্লান হয়ে যায়। 'তোমার কাজ পুরস্কৃত হবে এবং তোমার দিকে আশা থাকবে'। কারণ তাদের মাঝে যে শিশু জন্মেছেন তিনি তাদের সমস্ত দুঃখ মুছে দেবেন।

মথি ২:১৯-২৩

এখানে আমরা খ্রীষ্টের মিশর থেকে ইসরাইলে ফেরার ঘটনাটি দেখি। খ্রীষ্ট মিশরে গিয়েছিলেন আশ্রয়ের জন্য; তার এই প্রবাস জীবন খুব একটা দীর্ঘায়িত হয়নি। তিনি আবার ফিরে আসলেন নিজ দেশে। যেহেতু খ্রীষ্ট পৃথিবীতে এসেছিলেন ইস্রায়েলের হারানো মেষদের জন্য। সে কারণেই তাঁকে মিশর থেকে ফিরতেই হতো। লক্ষ্য করুন,

ক. হেরোদের মৃত্যুই খ্রীষ্টের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে ত্বরান্বিত করেছিল। নির্বিচারে শিশুদের হত্যা করার পর তার ওপর স্বর্গীয় দণ্ড নেমে আসতে বেশিদিন সময় লাগেনি। অনেকে মনে করেন, হেরোদের মৃত্যুটা প্রত্যাশিতই ছিল কারণ তিনি ঈশ্বরের প্রতি যে বিরোধিতা করেছিলেন, যে অমানবিক হত্যায় হাত রাঙিয়েছিলেন তার দ্বারা তিনি সদাপ্রভুর ক্রোধ নিজের ওপর ডেকে এনেছিলেন। ঈশ্বর মন্দ লোকদের কাজের ফল এই পৃথিবীতেই দেন। 'তোমরা কেন মানুষকে ভয় করছ? তারা তো মরে যাবে' (যিশাইয় ৫১:১২,১৩)। মন্দ লোকদের মৃত্যুতে শুধুমাত্র যে তাদের ঘৃণা ও হিংসার মৃত্যু ঘটে (উপদেশক ৫১:৬) এবং হাঙ্গামা করার সুযোগবঞ্চিত হয় (ইয়োব ৩:১৭) তা নয় বরং তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তিও পায়। সে কারণেই হেরোদ তাঁর পাপের সাজা এত দ্রুত পেলেন।

তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে ইতিহাসবিদ যোসেফাস যা লিখেছেন তা সত্যিই ভয়ংকর (অ্যান্টিক. ১৭. ১৪৬-১৯৯); হেরোদকে এক কঠিন অসুখে পেয়েছিল। এই রোগ তাঁর ভেতরটাকে পুড়িয়ে ফেলে; সে সময়ে হেরোদ যে কষ্ট পাচ্ছিলেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তিনি খুব মাংস খেতেন, তাঁর গেঁটে বাত, পেটের পীড়া, শোথরোগ ছিল। আর অকস্মাৎ এসব রোগ খুব বেড়ে গেল। তাঁর গা দিয়ে সে সময় এমন দুর্গন্ধ ছড়াতো যে কেউ তাঁর কাছে ঘেঁষতে পারতো না। তিনি এতটাই আবেগপ্রবণ এবং অধীর ছিলেন যে অসুখের তীব্রতায় একাকী কষ্ট পেতে লাগলেন। এসময় মানসিকভাবেও তিনি বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। ইতিপূর্বে করা সমস্ত নিন্দনীয় কাজের কথা একে একে তাঁর মনে পড়ে যেতে লাগল। তাঁর নৃশংসতা তাঁকে এতটাই অসহিষ্ণু করে তুলেছিল যে, তিনি পাইকারি খুনে হাত রাঙিয়েছিলেন– যা এর আগে কেউ করেনি। তিনি তাঁর নিজ সন্তানকে মেরে ফেলার

আদেশ দিয়েছিলেন; এছাড়াও তিনি অনেক সম্ভ্রান্ত, ভাল মানুষকে জেলে পুরেছিলেন। হেরোদের মানসচক্ষে সেই হত্যা, অপকর্ম তখন দুঃস্বপ্নের মতো হানা দিতে লাগল। মৃত্যু তাঁর এত কাছে জেনেও তিনি তাঁর কুপথ থেকে ফিরলেন না; উপরন্তু যাদের তিনি বন্দী করেছিলেন, তাঁর মৃত্যু হয়ে গেলেও সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মৃত্যুদণ্ড যেন কার্যকর করা হয় অসুস্থ অবস্থায় সেই আদেশ দিয়ে গেলেন। যদিও তাঁর মৃত্যুর পর তা কার্যকর হয়নি।

দেখুন, যীশু খ্রীষ্ট এবং তাঁর অনুসারীদের ওপর নির্যাতনকারী ও শত্রুরা কেমন প্রকৃতির হয়ে থাকে। হেরোদের মতোই কেউ কেউ খ্রীষ্টের শিক্ষা, তাদের অনুসারীদের বিরোধিতা করতে এমন নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেছিল যা গোটা মানব সমাজেরই বিরুদ্ধাচরণ করে; যেমন– নীরো এবং ডোমিটান।

খ. এখানে আমরা যোষেফের কাছে ইসরাইলে ফিরে যাবার স্বর্গীয় নির্দেশ এবং সেই নির্দেশের প্রতি যোষেফের বাধ্যতার বিষয়ে দেখি (১৯-২১ পদ)। ঈশ্বর যোষেফকে মিশরে পাঠিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি ততদিনই ছিলেন যতদিন পর্যন্ত না সদাপ্রভুর কোন নির্দেশ আসে। মনে রাখুন, আমাদের জীবনের প্রতিটি গন্তব্যের ক্ষেত্রে আমরা যেন ভাবি যে ঈশ্বর আমাদের সাথে আছেন এবং আমাদের সামনের পথটি মসৃণ, বাধাহীন। তাঁর নির্দেশ ছাড়া আমাদের এক পা-ও ফেলা উচিত নয়। যোষেফের কাছে যে নির্দেশ এসেছিল তা একজন স্বর্গদূত নিয়ে এসেছিলেন। মনে রাখুন, ঈশ্বরের সাথে যদি আমাদেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে, তবে আমরা যেখানেই যাই না কেন তা নিশ্চিতভাবেই অটুট থাকে। পৃথিবীতে এমন কোন জায়গা নেই যা ঈশ্বরের দৃষ্টির বাইরে। যোষেফের কাছে স্বর্গদূত এসেছিলেন মিশরে আর যিহিষ্কেলের কাছে এসেছিলেন তাঁর বাবিলে থাকার সময়ে; আবার যোহনের কাছে পাটম দ্বীপে।

এখন,

১. স্বর্গদূত যোষেফকে হেরোদের মৃত্যুর বিষয়টি অবগত করলেন: 'যারা শিশুটিকে মারতে চেয়েছিল তারা মারা গেছে' কিন্তু শিশু যীশু জীবিত আছেন। নির্যাতিত ঈশ্বর ভক্তরা কখনো কখনো তাদের ওপর নির্যাতনকারীদের কবর মাড়িয়ে যান। মণ্ডলীর বিরুদ্ধে যে ঝড় আসে, সেই ঝড়ে ঝড়-আমদানিকারীরাই উড়ে যায়। 'তারা মারা গেছে'– হেরোদ ও তাঁর ছেলে আন্তিপাতেরের মাঝে যদিও এক ধরনের ঈর্ষামিশ্রিত সম্পর্ক ছিল তবুও নতুন রাজাকে হত্যার অন্বেষণ, হত্যাচেষ্টা– সবই এক বিন্দুতে মিলে গিয়েছিল। যদি হেরোদ প্রথমে নিজের ছেলে আন্তিপাতেরকে হত্যা করে তাঁর পরে নিজে মারা গিয়ে থাকেন তবে এখানে যা বলা হয়েছে তা ঠিকঠাক মিলে যায়; এবং সদাপ্রভু তাঁর বিচার– যা তিনি সম্পন্ন করেন তার দ্বারা তিনি হয়তো বুঝেছিলেন যে, আন্তিপাতেরও তাঁর পিতার মতো উগ্র, নৃশংস এক রাজায় পরিণত হয়ে উঠবেন।

২. তিনি যোষেফকে কী করতে হবে তা জানালেন। যোষেফ এবারও ঈশ্বরের নির্দেশের বাধ্য থেকে কোন দ্বিরুক্তি, বিলম্ব না করে ইসরাইলে রওনা হয়ে গেলেন। তিনি ঈশ্বরের নির্দেশের বিপরীতে কোন অজুহাত দেখাননি। যাত্রাপথের নানা রকম সমস্যা, হুট করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাবার ঝক্কি– এরকম কোন কারণই তিনি প্রদর্শন করলেন না। যদিও দেখানোর মতো অজুহাত তার হাতে ছিল যে, হেরোদের যখন মৃত্যু হল তখন ছিল শীতের শুরু। ঈশ্বরের লোকেরা তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী চলে; তিনি যেখানে যেতে বলেন, যেখানে অবস্থান করতে বলেন– সবই তারা কোন অজুহাত না দেখিয়ে মেনে

থাকে। এই পৃথিবীকে আমরা মিশরের প্রবাস-জীবনের সাথে তুলনা করতে পারি। এই পৃথিবীর দুঃখ-কষ্ট, সমস্যা, প্রতিকূলতা, দাসত্বপূর্ণ কেনান দেশ, যেখানে আমাদের বাড়ি, যেখানে আমাদের নিশ্চিন্ত বিশ্রাম সেখানে যেতে যেন আমরা সবসময় প্রস্তুত থাকি। আর ঈশ্বর ডাকামাত্রই যেন আমরা সাড়া দিয়ে বলতে পারি, হ্যাঁ, সদাপ্রভু, আমি প্রস্তুত।

গ. এখানে ২২ ও ২৩ পদে আমরা যোষেফকে দেওয়া ঈশ্বরের আরও নির্দেশনার বিষয়ে দেখি যে তিনি ইস্রায়েলের কোথায় গিয়ে বাস করবেন। কিন্তু এই নির্দেশ তো ঈশ্বর যোষেফকে আগের নির্দেশের সাথেই দিয়ে দিতে পারতেন। তবে কেন তিনি দু'বারে তা দিলেন? এর কারণ হচ্ছে ঈশ্বর তাঁর লোকদের পর্যায়ক্রমে নির্দেশ দিয়ে থাকেন, যেন তারা তাঁর নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করে, তাঁর কথা শোনার জন্য ব্যগ্র হয়; ঈশ্বর তাঁর লোকদের নির্দিষ্ট মাত্রায় নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। এই নির্দেশনা যোষেফ স্বপ্নে পেয়েছিলেন; এর আগেও তিনি স্বর্গদূতদের মাধ্যমে ঈশ্বরের নির্দেশ পেয়েছিলেন। ঈশ্বর শিশু যীশুর মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছার বিষয়টি যোষেফের কাছে বলতে পারতেন, কিন্তু আমরা দেখতে পাই তিনি তা করেননি। এর কারণ ঈশ্বর চেয়েছিলেন যীশু যেন স্বাভাবিক নিয়মে তাঁর ভাইদের মতোই বেড়ে ওঠেন। শিশু অবস্থায় যীশু শিশুরা যা করে তাই করতেন, তাদের মতো কথা বলতেন এবং যেভাবে শিশুরা জ্ঞানে-বুদ্ধিতে বেড়ে ওঠে সেভাবেই তিনি বেড়ে ওঠেন। সে সময় তিনি তাঁর অসীম ক্ষমতা ও জ্ঞানের প্রকাশ ঘটাননি।

১. ঈশ্বর যোষেফকে যিহূদিয়ায় না যাওয়ার নির্দেশ দেন (২২ পদ)। যোষেফ হয়তো ভেবেছিলেন যে খ্রীষ্ট যেহেতু বৈৎলেহমে জন্মেছেন তাই তাঁকে নিয়ে বোধহয় বেথেলহেমেই যেতে হবে। হ্যাঁ, তিনি এ নিয়ে ভাবিত ছিলেন, কারণ তিনি শুনেছিলেন যে হেরোদের মৃত্যুর পর তাঁর স্থলে আর্খিলায় রাজা হয়েছেন। এই আর্খিলায় তাঁর পিতা হেরোদের মতো পুরো রাজ্য পাননি, তাঁর রাজত্বের সীমানা ছিল যিহূদিয়া পর্যন্ত। খ্রীষ্ট ও তাঁর মণ্ডলীর বিরুদ্ধবাদীদের কী দশা হয় দেখুন! যদিও আমরা এখানে দেখি যে, একজন চলে গেলেও সেখানে নতুন আরেক শত্রুর আবির্ভাব ঘটেছিল। এই আর্খিলায়ের কারণে যোষেফ শিশু যীশুকে নিয়ে যিহূদিয়ায় গেলেন না। মনে রাখুন, ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের কখনো বিপদের মুখে ঠেলে দেন না। কিন্তু অনেক সময় পরীক্ষার কারণে, তাঁর গৌরব প্রকাশের জন্য অনেক বিশ্বাসী প্রাণ দেন; আর সেই প্রাণ তাঁর কাছে অমূল্য; যেমন অমূল্য আমাদের ঈশ্বরের গৌরব।

২. যোষেফকে গালীলে যেতে বলা হল (২২ পদ)। ফিলিপ তখন গালীল শাসন করছিলেন, যিনি শান্ত ও নীরব স্বভাবের ছিলেন। মনে রাখুন, ঈশ্বরের এই নির্দেশ আমাদের বলে যে, তাঁর লোকেরা কোন প্রতিকূলতাকে ভয় পাবে না ও নীরবে পিছু হটবে না। এখানে আমরা দেখি দু'জন শাসনকর্তার একজন ছিলেন উগ্র মেজাজের আর অন্যজন্য শান্ত স্বভাবের। নাসরত ছিল পাহাড়ের ওপর অবস্থিত একটি গ্রাম। ভৌগোলিকভাবে গালীলের অবস্থান ছিল দক্ষিণে, গালীল আর যিহূদিয়ার মাঝে ছিল সামেরিয়া; গালীলের যে গ্রামে যোষেফ যীশু ও তাঁর মাকে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই নাসরত গ্রামটি ছিল পাহাড়ের ওপর, এটি ছিল সবূলুনের একেবারে কেন্দ্রে। এখানেই আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মায়ের বাড়ি, এখানেই যীশু তাঁর গর্ভে আসেন। যোষেফও এই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন (লূক ১:২৬, ২৭) । তাঁরা নিজেদের পরিচিত পরিবেশে ফিরে গিয়েছিলেন যেখানে তাদের আত্মীয়-স্বজন, চেনাজানা মানুষেরা ছিল এবং সেই স্থানটিই ছিল তাদের থাকার জন্য সবচেয়ে আদর্শ স্থান।

এখানেই শিশু যীশু বেড়ে উঠতে লাগলেন। যে কারণে আমাদের ত্রাণকর্তাকে বলা হয় 'নাসরীয়'। এ কারণে পরবর্তীতে যিহূদীরাও ভুল করেছিল যে নাসরত থেকে কি ভাল কিছু আসতে পারে?

এরকমটা ঘটল যেন তাঁর সম্বন্ধে ভাববাদীরা যা বলে গিয়েছিলেন তা পূর্ণ হয়, 'তাঁকে নাসরীয় বলা হবে'। তাঁর এই 'নাসরীয়' নামের বিষয়ে ভাববাদীরা আরও যা বলে গিয়েছিলেন সেগুলো একবার লক্ষ্য করা যাক,

(১) যিনি এত সম্মান ও গৌরবের অধিকারী, প্রাথমিক অবস্থায় তাঁকে 'নাসরীয়' ছাড়া আর কোন কিছু দ্বারা অভিহিত করা হয়নি। এই কথার মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব বা রহস্য ছিল যে খ্রীষ্ট হবেন,

(ক) এমন একজন ব্যক্তি যিনি শাখাস্বরূপ (যিশাইয় ১১:১)। 'নাসরত' শব্দটি দ্বারা এখানে শাখা অথবা নাসরত গ্রামকে চিত্রিত করে। সেই গ্রাম থেকে তিনি যে উপাধি পেলেন তার মাধ্যমে তিনি নিজেকে সেই শাখা রূপে ঘোষণা করলেন।

(খ) তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে তিনি মহান নাসরীয় হবেন। তিনি তাদের মতো হবেন যারা নাসরীয় হিসেবে অনেক সুনামের ভাগী হয়েছিলেন (বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে শিমশোনের কথা, বিচারকর্তৃকগণ ১৩:৫) এবং যোষেফ– যাঁকে তার ভাইয়েরা নাসরীয় বলে ডাকতেন (আদি ৪৯: ২৬)। এ ছাড়া আমরা দেখি যে, খ্রীষ্ট নাসরীয় হবেন বলেই ঈশ্বর 'নাসরীয়'দের জন্য কতগুলো কঠোর অনুশাসন পাঠিয়েছিলেন (গণনা ৬:২ এবং অন্যান্য)। এমন নয় যে খ্রীষ্ট নাসরীয়ের কঠোর অনুশাসন মেনেছেন কারণ তিনি মৃতদেহ ছুঁয়েছিলেন এবং আঙ্গুর রস খেয়েছিলেন। কিন্তু তা শ্রেষ্ঠ ত্বের দিক দিয়ে খ্রীষ্ট তাঁর 'নাসরীয়' অভিধাকে সম্মানিত করেন। কারণ তিনি ব্যক্তিগতভাবে পাক ছিলেন এবং ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে তিনি আমাদের জন্য জীবন দিয়েছিলেন। তাঁর আত্মত্যাগ ছিল অনেকটা শিমশোনের মতো। 'নাসরীয়' এমন এক নাম যা নিয়ে আমরা আনন্দিত হতে পারি। তাঁকে জানার জন্যও এই নাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(২) অন্যদিকে তাঁর এই 'নাসরীয়' নামটি ছিল অবজ্ঞা ও অবহেলার পাত্র। যাদের 'নাসরীয়' বলে ডাকা হতো সমাজে তারা ঘৃণিত ছিল। তাদের কাছ থেকে কোন ভাল কিছু আশা করা যেতো না। যাকে সম্মান দেখানোটাও মূর্খতার নামান্তর বলে তদানীন্তন সমাজে প্রচলিত ছিল। শয়তান প্রথমে যীশুর এই 'নাসরীয়' নামের অর্থের দিকে ইঙ্গিত করে তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করতে উদ্যত হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে লোকদের ক্ষেপিয়ে তোলে। যীশুর এই নামের দরুন পরবর্তীতে তাঁর অনুসারীদেরও এই নামে ক্ষেপানো হতো। এটা কোন নির্দিষ্ট ভাববাদীর মাধ্যমে বলা হয়নি বরং অনেক ভাববাদী ই এই কথা বলে গেছেন যে, লোকেরা তাঁকে অবজ্ঞা করবে এবং প্রত্যাখ্যান করবে (যিশাইয় ৫৩:২, ৩)। তারা এও বলে গেছেন যে, তিনি একটা পোকামাত্র; কোন মানুষ নন এবং তিনি তাদের ভাইদের কাছে বিজাতীয় লোক হিসেবে আবির্ভূত হবেন। তাই, ধর্মের কারণে আমাদের দিকে তেড়ে আসা কোন নামই এখন আর আমাদের কাছে অসহ্যকর মনে হবে না কারণ আমাদের প্রভু নিজেও এরকম একটি নামের ভাগী হয়েছিলেন 'নাসরীয়'।

মথি লিখিত সুসমাচার
অধ্যায় ৩

এই অধ্যায়ের শুরুতে আমরা বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কাজের সাথে পরিচিত হই; যদিও ইতোমধ্যেই আমরা সুসমাচারে প্রবেশ করেছি তবুও প্রকৃতপক্ষে এখান থেকেই আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের শুরু (মার্ক ১:১)। পিতরও এ বিষয়ে সম্মত হয়ে বলেন, মূলত যোহনের বাপ্তিস্মদানের সময়েই যীশু খ্রীষ্ট দৃশ্যপটে আসেন; প্রথমে যোহন, পরে একে একে সবাই তাঁর সান্নিধ্যলাভে ধন্য হয়। এখানে আমরা দেখতে পাই,

১. বাপ্তিস্মদাতা যোহনের দৃপ্ত সূচনা (১ পদ);
   (ক) তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহের বাণী প্রচার করেন (২ পদ);
   (খ) তাঁর মাধ্যমে শাস্ত্রে উদ্ধৃত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতালাভ (৩ পদ);
   (গ) তাঁর জীবন-যাপন (৪ পদ); তাঁর কাছে অনেক লোক আসল এবং নিজেদের সমর্পণ করল (৫, ৬ পদ);
   (ঘ) ফরীশী ও সুদ্দুকীরা তাঁর কাছে বাপ্তিস্ম নিতে আসলে তাদের উদ্দেশ্যে বলা তাঁর কথা (৭-১০ পদ) এবং খ্রীষ্টের বিষয়ে তাঁর প্রচার (১১, ১২ পদ);
২. এর অব্যবহিত সময় পর ধার্মিকতার সূর্য– যীশু খ্রীষ্ট উদিত হলেন;
   (ক) তিনি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবনত যোহনের কাছ থেকে বাপ্তিস্ম নিলেন (১৩-১৫ পদ);
   (খ) ঈশ্বরের আত্মা তাঁর উপর নেমে আসলেন এবং স্বর্গ থেকে একটি স্বর শোনা গেল (১৬, ১৭ পদ)।

মথি ৩:১-৬

যোহনকে আমরা এখানে প্রচার করতে ও বাপ্তিস্ম দিতে দেখি; তাঁর এই কাজ– যা ছিল সুসমাচার-দিবসের অসাধারণ সূচনা– তা কিন্তু ঈশ্বর অনেক আগেই পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন।

ক. যোহন যে সময়ে দৃশ্যপটে আবির্ভূত হলেন সেই সময়ের প্রতি লক্ষ্য করুন। 'পরে' বা 'সেই সময়ে' (১ পদ)– 'অনেক পরে,' 'দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর'– যেহেতু আগের অধ্যায়েই আমরা যীশু খ্রীষ্টের শৈশবের বর্ণনা দেখেছি, সে কারণে মাঝের দীর্ঘ সময়ের যে ব্যবধান তা এই 'পরে' শব্দটি দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। 'সেই সময়ে'– পুরাতন নিয়মে এই শব্দবন্ধ দ্বারা ঈশ্বরের নিরূপিত সময়ের কথা বোঝানো হয়েছে। তাই এখানে বলা যায় যে, খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারের শুরুর জন্য ঈশ্বর 'সেই সময়'– এর কথা অনেক আগেই ভেবে রেখেছিলেন। এখন, দানিয়েলের বলে যাওয়া সাত বছরের শেষ সময় অথবা বলা চলে মাঝামাঝি– যখন খ্রীষ্ট তাঁর অনুগ্রহের চুক্তি নিয়ে অনেকের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছেন (দানিয়েল ৯:২৭)।

খ্রীষ্ট শীঘ্রই লোকদের সামনে আবির্ভূত হবেন। যোহন এবং খ্রীষ্ট-উভয়ের জন্মের পূর্বেই তাঁদের গৌরবময় কাজের বিষয়ে বলা হয়েছিল। ফলে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে ছোট

থাকতেই তাদের মাঝে স্বর্গীয় ক্ষমতার অসাধারণ উপস্থিতি দেখতে পাবার কথা। কিন্তু কার্যত আমরা তা দেখি না, কেবল মন্দিরে বারো বছরের শিশু যীশুর সাথে ধর্মনেতাদের কথোপকথনটুকুই দেখা যায়, যা ব্যতিক্রম। এ ছাড়া তাঁদের দু'জনের বিষয়ে আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না, না শৈশবের না কৈশোরের। তাঁদের উপস্থিতির প্রমাণ মিলল ত্রিশ বছরের পরিণত বয়সে। উভয়ের জীবনের একটা দীর্ঘ সময় অনুল্লেখ থেকে যাওয়ায় এ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারি না। বলা চলে, এ বিষয়ে আমাদের জানাটা অতি অস্পষ্ট, ধোঁয়াশাচ্ছন্ন। শৈশবে তাঁদের বাহ্যিক চেহারা অন্য শিশুদের চেয়ে খুব একটা আলাদা ছিল না; না তাঁদের চুলের স্টাইলে, না কথাবার্তায়; অপ্রাপ্ত বয়সে খ্রীষ্টের সাথে একজন চাকরের অমিলের চেয়ে মিলই ছিল বেশি, যদিও তিনি ছিলেন পৃথিবীর সবার প্রভু। আর এমনটা ঘটেছিল এটা দেখানোর জন্য যে,

১. ঈশ্বর এমন কি যখন তিনি ইস্রায়েলের পরিত্রাণকর্তা হিসেবে কাজ করছেন তখনও তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখছেন (যিশাইয় ৪৫:১৫)। 'সদাপ্রভু যে এই জায়গায় আছেন সেটা আমি বুঝতেই পারি নি' (আদি ২৮:১৬)। 'আমাদের দেয়ালের পেছনে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখছেন' (শলোমন ২:১৯)।

২. খ্রীষ্টের কার্যক্ষেত্র এবং তত্ত্বাবধানের প্রতি বিশ্বাসে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আমরা তাঁর ক্ষমতার প্রকাশ দেখতে পাই; কিন্তু ব্যক্তি-খ্রীষ্ট এ থেকে ছিলেন আশ্চর্য ব্যতিক্রম। তিনি তাঁর ক্ষমতাকে নির্দিষ্টকৃত সময় পর্যন্ত গোপন রেখেছিলেন। সর্বোপরি খ্রীষ্ট ছিলেন মনুষ্যপুত্র; মানুষের ভূমিকায় পৃথিবীতে নেমে আসা ঈশ্বর; এ পর্যন্ত আমরা তাঁকে ভাববাদী হিসেবে প্রচার করতে, বিভিন্ন চিহ্ন-কাজ করতে দেখি নি; তাঁর পরিচয় তাই এখনও অবিবৃত; যখন তিনি তাঁর কাজ শুরু করবেন তখন আমরা এ সম্পর্কে অবশ্যই জানতে পারব।

৩. যোহন এবং খ্রীষ্ট– দু'জনেই যোগ্য, পরিণত হওয়া সত্ত্বেও জাগতিকতার বিচারে ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবিত ছিলেন না। যেমন তারা কোন ভাল চাকরি জোটানোর চেষ্টা করেন নি; এর কারণ এটাই যে তাঁরা জানতেন যে তাঁদের ভবিষ্যত আগে থেকেই স্থির হয়ে আছে; তাঁরা তাঁদের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা সম্বন্ধে জানতেন। চারিত্রিক দিক দিয়ে তাঁরা ছিলেন ভদ্র, নম্র এবং আগ্রহী শ্রোতা। বেশি বলে অন্যের কাছে জ্ঞান জাহির করার চেয়ে তাঁরা ধৈর্য ধরে অন্যদের কথা শোনাটাকেই বেশি প্রাধান্য দিতেন।

বাপ্তিস্মদাতা যোহনের জন্মের বিষয়ে সুসমাচার-লেখক মথি কিছুই উল্লেখ করেননি। অন্যদিকে আমরা লূককে দেখি সে বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দিতে। মথির লেখায় যোহনকে পাওয়া যায় একেবারে পরিণত বয়সে। মেঘ থেকে বহুকাল পর এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ার মতোই তাঁকে মরু এলাকায় প্রচাররত অবস্থায় দেখা গেল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মালাখির পর প্রায় তিনশো বছরেরও বেশি সময় ধরে পৃথিবীতে কোন ভাববাদী আসেন নি। এ সময় ঈশ্বরের বাক্য বলতে, পাপের অন্ধকার জগত থেকে মানুষকে সতর্ক করতে কোন ভাববাদী ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রেরিত হননি। সে কারণেই একজন ভাববাদীর জন্য পৃথিবীর এই সতৃষ্ণ প্রতীক্ষা। তাই যখন যোহন এলেন তখন যেন বহুকাল ধরে জমা মেঘ থেকে একফোঁটা বৃষ্টি ধরণীর বুকে নেমে এল। ভাববাদী হিসেবে যোহন অত্যন্ত প্রার্থিত ও আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন, সেজন্যে তাঁর সম্পর্কে মালাখি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পুরাতন নিয়মে তাঁর লেখা শাস্ত্রে উল্লেখ করে গেছেন, 'আমি আমার সংবাদদাতাকে পাঠাচ্ছি' (মালাখি ৩:১)।

খ. যোহনকে এখানে প্রথম দেখা গেল যিহূদিয়ার মরুভূমিতে। 'মরুভূমি' বললেই চোখের সামনে যেরকম খটখটে-রৌদ্রতপ্ত-জনমানবহীন জায়গা ভেসে ওঠে এটি ঠিক সেরকম ছিল না। যিহূদিয়ার এই মরুভূমিতে লোকালয় ছিল; তবে একটু দূরে দূরে। জনসংখ্যার ঘনত্ব অত বেশি ছিল না। এখানকার মাঠ, আঙ্গুরের বাগানগুলো ছিল জনবিচ্ছিন্ন– যা অন্যান্য অঞ্চলের ঠিক বিপরীত। মোট ছয়টি মরু-শহর (বৈৎ আরবা, মিদ্দীন, সকাখা, নিব্‌শন, লবণ-নগর ও ঐন-গদী) ও তার আশপাশের গ্রাম নিয়ে গঠিত যিহূদিয়ার এই মরু-অঞ্চল (যিহোশূয় ১৫:৬১, ৬২)। তাই এটা এখন পরিষ্কার যে, যোহন রুক্ষ, নিষ্প্রাণ মরুভূমিতে গিয়ে প্রচার করেননি। তিনি প্রচার করেছিলেন এসব শহর ও গ্রামের লোকদের কাছে। এই অঞ্চলের লোকদের কাছে তাঁর প্রচার করার কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁর জন্ম হেব্রোনে। আর লোকদের কাছে প্রকাশ্যে প্রচার করার আগ পর্যন্ত জীবনের বেশির ভাগ সময় তিনি এই মরু-অঞ্চলে কাটিয়েছেন। এর আগে এখানে তিনি ঈশ্বরের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কাজ নিয়ে গভীর চিন্তা ও ধ্যানে নিমগ্ন থেকেছেন। এমনকি তিনি যখন ইস্রায়েলের সামনে প্রকাশ্যে ঈশ্বরের অনুগ্রহের বিষয়ে প্রচার করতে আরম্ভ করলেন, তখন লোকেরা দেখল তিনি কতটা চমৎকারভাবে তাঁর কাজে দক্ষ হয়ে উঠেছেন। অতঃপর মরুভূমিতে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মুখে ঈশ্বরের বাক্য শোনা গেল।

মনে রাখুন, স্বর্গীয় অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা অর্জনে পৃথিবীর কোন অঞ্চলই দুর্গম নয়। উপরন্তু স্বর্গের সাথে ঈশ্বরের লোকদের যে চমৎকার, নিবিড় সম্পর্ক– তা পৃথিবীর সবচেয়ে দূরবর্তী-কোলাহলমুক্ত স্থানেও সমানভাবে অটুট থাকে। যিহূদিয়ার এই মরু-অঞ্চল সম্পর্কে অনেক আগেই রাজা দায়ূদ বলে গিয়েছিলেন (গীত ৬৩ অধ্যায়)। এই সেই মরু-অঞ্চল– যার তুলনা করতে গিয়ে তিনি ঈশ্বর ও তাঁর মাঝে বজায়কৃত 'মধুর সম্পর্ক'– এর উদাহরণ টেনেছেন (হোশেয় ২:১৪)। ঈশ্বর মোশিকে এক মরুভূমিতে তাঁর ব্যবস্থা তুলে দিয়েছিলেন; পুরাতন নিয়মের মতো ইস্রায়েল জাতির লোকেরা যোহনের মাধ্যমে নতুন নিয়মও প্রথমে মরুভূমিতেই পেল। আর ঈশ্বরই যোহনকে সেখানে নিয়ে গেলেন এবং বলে দিলেন কী করতে হবে (দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:১০)।

বাপ্তিস্মদাতা যোহন ছিলেন পুরোহিত হারোণের বংশধর; ফলে যিহূদীদের নিয়মানুযায়ী জন্মগতভাবেই তিনি পুরোহিতের অধিকার লাভ করেছিলেন; তবুও সমাজ-ঘরে নয়, তাঁকে আমরা দেখি যিহূদিয়ার মরু-অঞ্চলে প্রচাররত অবস্থায়। অপরদিকে খ্রীষ্ট যদিও পুরোহিত হারোণের বংশধর ছিলেন না তবুও আমরা তাঁকে প্রায়ই সমাজ-ঘরে শিক্ষাদানরত অবস্থায় আবিষ্কার করি; আর তিনি সেখানে এমন লোকের মতো শিক্ষা দিতেন যার প্রকৃতই অধিকার আছে। অবশ্য এ বিষয়ে আগেই বলা হয়েছিল যে, 'তোমরা যে প্রভুর খোঁজ করছ তিনি হঠাৎ তাঁর গৃহে আসবেন,' তাঁর সংবাদদাতা নয় (মালাখি ৩:১)। কারণ সংবাদতাকে পাঠানো হয়েছিল কেবল প্রভুর পথ প্রস্তুত করার জন্য।

সুসমাচারের শুরুটা হল অযিহূদী অধ্যুষিত মরু-অঞ্চলেই। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে যিশাইয় ভাববাদীর মাধ্যমে বলা এক অনন্য ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা পায়, 'আমি মরুভূমিতে চিরহরিৎ দারুবৃক্ষ লাগাব।' ফলে 'মরুভূমি পরিণত হবে উর্বর জমিতে' (যিশাইয় ৩২;১৫) এবং 'মরুভূমি আনন্দ করবে' (যিশাইয় ৩৫:১, ২)। হিব্রু থেকে গ্রীক ভাষায় অনূদিত পুরাতন নিয়মের প্রাচীন অনুবাদ সেপ্টুয়াজিন্ট যোহনের প্রচারের স্থানটিকে আরও নির্দিষ্ট

করে বলে 'জর্ডানের মরুভূমি'। রমিশ মণ্ডলীর অনেকে নিজেদের 'সন্ন্যাসী' বলে দাবি করে; শুধু তাই নয়, তারা যোহনকে অনুকরণের চেষ্টা করে। কিন্তু শাস্ত্র আমাদের এ সম্বন্ধে সাবধান করে দেয়, "কেউ যদি বলে, 'খ্রীষ্ট মরুভূমিতে,' তোমরা বাইরে যেয়ো না" (২৪:২৬)। অন্যদিকে আমরা এক বিদ্রোহী খুনিকে দেখি যে তার চার হাজার অনুসারীকে মরুভূমিতে নিয়ে গিয়েছিল (প্রেরিত ২১:৩৮)।

গ. যোহনের প্রচার। তিনি এই প্রচার-কাজকেই জীবনের প্রধান ও একমাত্র কাজ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি আসলেন, কারও সাথে লড়াই-বিতর্কে অবতীর্ণ হলেন না কেবল প্রচার করে যেতে লাগলেন (১ পদ)। তাঁর প্রচার ছিল খ্রীষ্টের রাজ্য সম্পর্কিত; এ সেই রাজ্য যা তিনি 'সন্নিকট' বলে ঘোষণা করেছিলেন।

১. তিনি সবাইকে পাপ থেকে মন ফেরানোর আহ্বান জানাচ্ছেন– 'পাপ থেকে মন ফেরাও' (২ পদ)। তিনি যিহূদিয়ায় যাদের মাঝে প্রচার করছিলেন, তারা ছিল যিহূদী। তাদের মাঝে ধর্মীয় পেশায় নিয়োজিত ফরীশী ও সুদ্দুকীরাও ছিল। তাদের এই উপস্থিতির কারণ, তারা পাপ দ্বারা নিজেদের কলুষিত করেছিল, ফলে তাদেরও পাপ থেকে মন ফেরানোর প্রয়োজন ছিল। এখানে লক্ষণীয় যে, যোহন যিরূশালেমে প্রচার করেন নি; বরং তিনি প্রচার করার জন্য যিহূদিয়ার মরু-অঞ্চলের সাধারণ লোকদের বেছে নিলেন। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করার ফলে এই লোকেরা নিজেদেরকে শহুরে পাপ-অসারতা-প্রলোভন থেকে নিরাপদ মনে করতো। তবুও তারা নিজেদের পাপ সম্পর্কে চেতনা পেয়েছিল; কিন্তু পাপমুক্তির জন্য তাদের করণীয় কিছুই ছিল না। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কাজ ছিল মানুষকে তাদের পাপ থেকে মন ফেরাতে বলা– 'নিজের সম্পর্কে ভাব,' প্রথমবারে করা ভুল সম্পর্কে 'দ্বিতীয়বার ভাব,' 'নিজের পথ সম্পর্কে ভাব,' 'মন পরিবর্তন কর,' 'নিজের দোষের দিকে তাকাও'; 'আরও একবার ভাব'; তারপর 'সঠিক সিদ্ধান্তটি নাও'। মনে রাখুন, যারা প্রকৃতই অনুতপ্ত হয় তারা ঈশ্বর এবং খ্রীষ্টের বিষয়ে, পাপ ও পবিত্রতা, এই জাগতিক পৃথিবী ও বিচারের সম্বন্ধে ভাবতে সমর্থ হয়। তারা তখন পাপের কবলে থাকাকালীন যা তারা হারিয়েছে, যে ক্ষতি তাদেরকে স্বীকার করতে হয়েছে এবং তারা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সে সম্পর্কে নতুন করে ভাবার অবকাশ পায়। 'মন পরিবর্তন' সার্বিকভাবে চলার পথটাকেও বদলে দেয়। যারা তাদের ভুলের জন্য দুঃখিত হয় তারা পরবর্তীতে তা না করার ব্যাপারে যথেষ্টই সাবধান থাকে। ঈশ্বরের আদেশের বাধ্যতার জন্য নিজের পাপ সম্পর্কে চেতনা লাভ করা, অনুতাপ করা একটি অত্যাবশ্যকীয় কাজ (প্রেরিত ১৭: ৩০)।

আমরা এখানে লক্ষ্য করি, খ্রীষ্টের সুসমাচার গ্রহণে লোকেরা পাপ থেকে মন ফেরানোর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিল। তাদের সেই অনুতপ্ত হৃদয়ই ছিল তাদের যোগ্যতা, যা তাদের কাছে খ্রীষ্টের সুসমাচারকে আরও ঘনিষ্ট করে তুলেছিল। মানুষের হৃদয় যদি ভাল কাজ করে যেতে থাকে এবং তা প্রকৃতই নিষ্কলঙ্ক থাকে তবে কোন দুঃখ-যন্ত্রণা ছাড়াই সে স্বর্গীয় সান্ত্বনা লাভ করে। রোগ-ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভের জন্য রোগীকে যেমন দৈহিক ব্যথা-কষ্ট সহ্য করতে হয় তেমনি স্বর্গীয় সান্ত্বনা পেতে অনুতাপের মাধ্যমে পাপীদের একপ্রকার আত্মিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। দেহের কোথাও যন্ত্রণাদায়ী ফোঁড়া উঠলে যেভাবে তা শনাক্ত করে কেটে ফেলা হয়, সেভাবে পাপীকেও প্রথমে তার পাপ স্বীকার করতে হয়। তার আত্মিক দেহে যে রোগ বাসা বেঁধেছে সেই পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তাকে বলতে হয়– আমি রোগে আক্রান্ত, আমার নিরাময়ের

প্রয়োজন। আর একমাত্র ঈশ্বরই পারেন মানুষকে পাপের কবল থেকে আরোগ্য করতে।

২. যোহন তাঁর আহ্বানকে আরও জোরালো করার জন্য যে কারণ দর্শিয়েছিলেন তা হচ্ছে, স্বর্গ-রাজ্য কাছে এসে গেছে। পুরাতন নিয়মে আমরা দেখি ভাববাদীরা লোকদের তাদের পাপের বিষয়ে সতর্ক করছেন। লোকদের কাছে ভাববাদীদের পাপ থেকে মন ফেরানোর এই আহ্বানকে জড়িয়ে ছিল ইস্রায়েল জাতির নিরাপত্তার বিষয়টি। এর মাঝে কোন নতুনত্ব ছিল না; কারণ ভাববাদীদের প্রচারকৃত অনুতাপের বাণী লোকদের চিরাচরিত নিয়ম-কানুনের দিকেই ঠেলে দিত। তারা ধারাবাহিকভাবে পাপ করা এবং সেই পাপের জন্য উৎসর্গ দেওয়ার মাধ্যমে প্রচলিত ব্যবস্থার দিকেই বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এখন যোহন যদিও সেই একই আহ্বান জানাচ্ছেন তবুও তার কারণ কিন্তু ভিন্ন। তাঁর এই আহ্বান ছিল সুসমাচারের বিষয়ে। যোহনের উদাত্ত আহ্বানে লোকেরা এখন তাদের নিজেদের পাপের বিষয়ে ভাবার অবকাশ পেল। পুরাতন নিয়মের সময় পাপ থেকে মন ফেরানোর ব্যাপারটা যেমন সামাজিক এবং রাজনৈতিক কারণ সংশ্লিষ্ট হতো এই আহ্বান তা থেকে অনেকটা ভিন্ন, স্বতন্ত্র ছিল। পূর্বেকার ভাববাদীদের আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সার্বজনীনভাবে ইস্রায়েল জাতির লোকদের পাপ থেকে অনুতাপ করতে দেখি। কিন্তু এখানে প্রত্যেকে পৃথক পৃথকভাবে নিজেদের পাপ সম্পর্কে চিন্তা করার প্রয়াস পেল। 'পাপ থেকে মন ফেরাও কারণ স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট;' খ্রীষ্টের সুসমাচারের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেখতে পাওয়া গেল। এই অনুগ্রহ বিশ্বাসীকুলের জন্য স্বর্গ-রাজ্যের সূচনা করল। যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু ও তাঁর পুনরুত্থানের মাধ্যমেই এই স্বর্গ-রাজ্যের গোড়াপত্তন। এই রাজ্যের সর্বময় কর্তা হচ্ছেন খ্রীষ্ট। আমরা অবশ্যই তাঁর প্রতি অনুরক্ত হব এবং তাঁর রাজ্যের বাসিন্দা হতে আন্তরিক হব। খ্রীষ্টের রাজত্ব স্বর্গের, এই পৃথিবীর নয়। এটি হচ্ছে আত্মিক রাজ্য। স্বর্গ থেকে আসা এই রাজ্যের লক্ষ্যও নিশ্চিতভাবেই স্বর্গের দিকে। যোহন প্রচার করছিলেন যে, খ্রীষ্টের সেই রাজ্য কাছে এসে গেছে; যেন তা আমাদের প্রত্যেকের দুয়ারে তার উপস্থিতির জানান দিচ্ছে। আমাদের কাছে খ্রীষ্টের রাজ্যের আগমন পবিত্র আত্মার বর্ষণের মতো এবং তা ঈশ্বরের অনুগ্রহধন্য সুসমাচারের স্বয়ংসম্পূর্ণতার কথাই ঘোষণা করে। এখন,

(১) পাপ থেকে মন ফেরানোর জন্য এ এক মহান প্ররোচনা। স্বর্গীয় অনুগ্রহ পাপীদের অন্তঃকরণ চূর্ণ করে। পাপের ফলে মানুষের ভেতরে যে অপরাধবোধ জাগ্রত হয় সেটাই তাকে তার পাপের সম্বন্ধে ভাবতে সাহায্য করে। সুসমাচারের শুরুতে আমরা যে অনুতাপের বাণী সম্বন্ধে দেখি তা খ্রীষ্টের ভালবাসা, আশা, ক্ষমা ও দয়ার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। মানুষ ঈশ্বরের দয়ার অপব্যবহার করলেও ঈশ্বর কিন্তু তা দেখিয়ে চলেছেন। তাঁর এই দয়ার প্রতিফলনে পাপীর হৃদয় নতজানু ও সমর্পিত হয়। তার ভেতরে এই বোধ জাগ্রত হয়– কতটা অভাজনের মতো আমি ঈশ্বরের প্রকৃত অনুগ্রহ, তাঁর নিয়ম এবং তাঁর রাজ্যের বিরুদ্ধে পাপ করেছি!

(২) 'অনুতাপ' আমাদের জন্য এক মহান উৎসাহবিশেষ। ''অনুতাপ কর, এর ফলে তোমার পাপ ক্ষমা করা হবে। ঈশ্বরের পথে চলার জন্য মন স্থির কর, ফিরে চল তাঁর কাছে, আর তিনি খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে তোমাকে তাঁর অনুগ্রহের পথে পরিচালিত করবেন"– ঈশ্বরের এই ক্ষমার ঘোষণা পাপের কারণে পালিয়ে থাকা লোকদের আবিষ্কার করতে এবং তাদের নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়। আর এভাবে আমরা ভালবাসার বন্ধনে

অনেকের সাথে একীভূত হই।

ঘ. যোহনের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতালাভ (৩ পদ)। যোহনই সেই ব্যক্তি যাঁর সম্পর্কে যিশাইয়ের ভবিষ্যদ্বাণীর শুরুর অংশে বলা হয়েছিল। এটি মূলত সুসমাচার-কেন্দ্রিক এবং তা সুসমাচারের সময় এবং সুসমাচারের অনুগ্রহের বিষয়টিকে নির্দেশ করে; দেখুন যিশাইয় ৪০:৩, ৪। যোহন সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে,

১. 'মরুভূমিতে একজন উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানাচ্ছে'। যোহন ১:২৩ পদে আমরা দেখি যে, যোহন নিজেই দাবি করেছেন, 'আমিই সেই কণ্ঠস্বর'। হ্যাঁ, ঈশ্বর যোহনের কাছে প্রকাশ করেছিলেন যে তিনিই সেই কণ্ঠস্বর। ঈশ্বরের বাক্য তাঁর নিজ মহিমা দ্বারাই সবার কাছে গৃহীত হয় (১ থিষলনীকীয় ২:১৩); তা পৌলই বলুন আর আপল্লোই বলুন, তাঁরা তো কেবল কণ্ঠস্বর। কিন্তু এখানে সুস্পষ্টভাবে যোহনকে কণ্ঠস্বর বলে উল্লেখ করা হয়েছে, 'মরুভূমিতে একজন উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানাচ্ছে'– যা এখন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। খ্রীষ্টকে বলা হয়েছে 'বাক্য' যা স্বতন্ত্র ও নির্দিষ্টরূপে উচ্চারিত– তা আরও বেশি শিক্ষাপূর্ণ। 'কণ্ঠস্বর' হিসেবে যোহন লোকদের জাগিয়ে তুলছেন এবং তারপর খ্রীষ্ট 'বাক্য' হিসেবে তাদের শিক্ষা দেবেন। যেমনটা আমরা দেখি প্রকাশিত বাক্য ১৪:২ পদে। জলের স্রোতের শব্দ যেমন মিউজিক হিসেবে একটি গানকে আরও সুশ্রাব্য করে তোলে, তেমনি 'কণ্ঠস্বর' হিসেবে যোহনের 'বাক্য' খ্রীষ্টকে লোকদের কাছে গ্রহণযোগ্যরূপে প্রকাশে ব্রতী হয়েছেন। অনেকে বলেন যে, শিমশোনের মা কখনো আঙ্গুর-রস খেতেন না, তবুও শিমিয়োন শক্তিশালী দৈহিক আকার লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। অনুরূপভাবে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বাবা সখরিয় ঈশ্বরের কথা বিশ্বাস করেননি বলে যদিও বোবা হয়ে গিয়েছিলেন তবুও তাঁরই ঔরসজাত সন্তান যোহন উদাত্ত কণ্ঠের অধিকারী হতে পেরেছিলেন। আর বোবা পিতার সন্তানের এরকম উদাত্ত কণ্ঠ লাভ ঈশ্বরের ক্ষমতার মহিমাই প্রকাশ করে, মানুষের নয়।

২. যোহনকে আমরা এমন এক ব্যক্তি হিসেবে দেখি যিনি সদাপ্রভুর পথ প্রস্তুত করছেন এবং তাঁর রাস্তা সোজা করছেন। অবশ্য তা তাঁর জন্মের আগেই বলা হয়েছিল যে, তিনি সদাপ্রভুর জন্য একদল লোককে প্রস্তুত করবেন (লূক ১:১৭)। খ্রীষ্টের অগ্রদূত হিসেবে তিনি খ্রীষ্টের রাজ্যের কথা ঘোষণা করবার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন এমন একজন– যাঁর মাঝে খ্রীষ্টের রাজ্যের পরিচয় মেলে। খ্রীষ্টের আগমনী সংবাদের ঘোষক হিসেবে নকিবদের মতো কোন রাজকীয় পোশাক তিনি গায়ে চাপাননি; কিন্তু অত্যন্ত সাধারণ পোশাকে কেবল একজন সন্ন্যাসীর মতো তিনি লোকদের সামনে আবির্ভূত হলেন। বর্তমানকালে আমরা যেমন দেখি তেমনি তখনও কোন সম্মানিত ব্যক্তি আসার আগে অফিসারদের রাস্তা ফাঁকা করার জন্য পাঠানো হতো; তাই যোহন এসেছিলেন যেন তিনি সদাপ্রভুর পথ প্রস্তুত করতে পারেন।

(১) যোহন তার প্রজন্মের লোকদের প্রস্তুত করেছিলেন। সে সময় সাধারণ যিহূদী থেকে শুরু করে উপাসনা কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি পর্যন্ত সবাই সীমার বাইরে চলে গিয়েছিল। ধর্মভীরুতা তখন প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে দাঁড়িয়েছিল; ধর্মীয় মূল্যবোধ তখন আকুণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। পূর্বপুরুষদের রীতি-নীতি, প্রবীণদের নিয়ম-কানুন ঈশ্বরের বাক্য ও শিক্ষাকে অনেকাংশেই গ্রাস করে ফেলেছিল। ফরীশী ও ধর্মনেতারা যদিও ঈশ্বরের ব্যবস্থার বিষয়ে জানতো এবং সরকারের বিভিন্ন মহলে তাদের প্রভাব ও যাতায়াত ছিল তবুও তারা নিজেদের লাভের দিকটা বেশি বুঝত। তাদের পোশাকী ধর্মচর্চা ছিল পৃথিবীর

ইতিহাসে ন্যাক্কারজনক ভণ্ডামি। লোকেরা সাধারণভাবেই তাদের কাছ থেকে পাওয়া সুবিধার জন্য খুশি ছিল। তারা গর্ব করতো তাদের আত্মবিশ্বাসী কথাবার্তা ও ন্যায্যতা নিয়ে। এই আত্মবিশ্বাস, ন্যায্যতা তারা অর্জন করেছিল স্বঘোষিত ধার্মিকতার দ্বারা পাপকে আড়াল করে। তাদের এই লোকদেখানো ধার্মিকতা এবং বিনম্রতার বাহার সত্ত্বেও তাদের পবিত্র ভূখণ্ড সম্প্রতি রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে একটি প্রদেশে পরিণত হয়েছে; কারণ তারা ছিল আদপেই ঔদ্ধত্য। মালাখির সময়ে তারা যেমন উগ্র ও ঔদ্ধত্য ছিল, তা তখনও বর্তমান। তারা আগের মতোই একগুঁয়ে রয়ে গেছে এবং ঈশ্বরের বাক্যের বিরোধিতা করার দিক দিয়েও অন্য সবাইকে হার মানিয়েছে। এখন যোহন এই পাহাড় সমান প্রতিবন্ধকতাগুলোকে সমান করার জন্যই কণ্ঠস্বর হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। তাদের আত্মম্ভরীতাকে নিচু করার এবং তাদের পাপের বিষয়ে চেতনাদানের কাজটি তিনি তুলে নিলেন যাতে করে খ্রীষ্টের শিক্ষা, মতবাদ মানুষের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য এবং কার্যকরী হয়।

(২) তাঁর প্রচারকৃত অনুতাপ ও বিনম্রতার বাণীর উপযোগিতা এখনও শেষ হয়ে যায়নি। বিশেষ করে সদাপ্রভুর পথ প্রস্তুত করার জন্য, পাপীদের তাঁর কাছে নিয়ে আসার জন্য এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মনে রাখুন, খ্রীষ্টের জন্য আত্মিক পথ প্রস্তুতের কাজটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দায়ূদের সন্তানকে স্বাগত জানাতে এর কোন বিকল্প নেই (২ শমূয়েল ১৯:১৪)। কারণ খ্রীষ্টের সাথে আত্মিক সম্পর্ক তৈরিতে পাপ চিহ্নিতকরণ ও নিজেদের ধার্মিকতার দৈন্যদশার বিষয়ে অনুধাবন করার চেয়েও অনুতপ্ত ও বিনম্র হওয়া, সর্বোপরি খ্রীষ্টকে হৃদয়ে স্বাগত জানাতে আগ্রহী হওয়াটাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য হওয়া উচিত। যারা এই পথকে বেছে নেবে তাদের জীবন থেকে পাপের কারণে প্রাপ্য আঘাত মুছে যাবে; নিজেদের সম্পর্কে তারা যে উঁচু ধারণা পোষণ করতো তা জানুপাতিত হবে এবং তারা খ্রীষ্টের প্রতি বাধ্যতায় বিমুগ্ধ হবে। ফলে, তাদের সামনে খ্রীষ্টের আগমনের দ্বার খুলে যাবে। চিরকাল স্থায়ী এই দ্বারের বিপরীতে সমস্ত ক্ষয়িষ্ণু, অল্পকাল স্থায়ী দ্বারগুলো ভেঙে যাবে। পাপ ও শয়তানের পথ বাঁকা, তাই খ্রীষ্টের জন্য তৈরিকৃত পথটি অবশ্যই সোজা হবে (ইব্রীয় ১২:১৩)।

ঙ. যোহনের পরিধেয় বস্ত্র, জীবন-যাপনের দিকে লক্ষ্য করুন (৪ পদ)। যারা খ্রীষ্টকে জাগতিক রাজা হিসেবে প্রত্যাশা করেছিল তারা ভেবেছিল যে তাঁর অগ্রদূতের আগমন অবশ্যই জাঁকজমকের সাথে ঘটা করে হবে; অর্থাৎ তাঁর বেশভূষা হবে দামি ও চিত্তাকর্ষক। কিন্তু তাদের এই চিন্তা ছিল মূল ভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন; কারণ তাঁর সম্পর্কে একথা বলা হয়েছিল যে তিনি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মহান হবেন; অথচ সেই লোকেরা ধরেই নিয়েছিল যে তিনি পৃথিবীর দৃষ্টিতে মহান হবেন। প্রকৃতপক্ষে তাদের এই চিন্তার মূলে ছিল স্বর্গীয় জ্ঞানের অনুপস্থিতি এবং সবকিছুকে জাগতিকতার বিচারে মাপার অমূলক প্রবণতা। খ্রীষ্টের ক্ষেত্রেও আমরা তাদের অনুরূপ ধারণা পোষণ করতে দেখি। লোকেরা ভেবেছিল খ্রীষ্টের রাজ্য হবে এ জগতের। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর রাজ্য ছিল স্বর্গের। তাঁর চেহারায় এমন কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না যা মানুষকে মুগ্ধ করতে পারে, না সৌন্দর্যের দিক থেকে, না দেহ-সৌষ্ঠবের দিক থেকে। আর খ্রীষ্টের সেই আত্মিক রাজ্যের বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করেছিল সমাজের নিচুতলার মানুষেরা। তারা তাঁর সেই আত্মিক রাজ্যের প্রতি বিশ্বাসে বাধ্য থেকে নিজেরা সম্মান ও আনন্দের ভাগী হয়েছিল, যা নিতে অন্যরা প্রত্যাখ্যান করেছিল।

১. যোহনের পরিচ্ছদ ছিল খুবই সাধারণ। তিনি উটের লোম এবং চামড়ার কোমর-বাঁধনি পরতেন। পরিধেয় হিসেবে তিনি ধর্ম-শিক্ষকদের মতো লম্বা আলখাল্লা কিংবা রাজ-সভাসদদের মতো রেশমি কাপড় বেছে নেননি। বরং তিনি তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য মতো গ্রামের সাধারণ গৃহস্থের পোশাকে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন। মনে রাখুন, ঈশ্বর আমাদের যে অবস্থায় যে স্থানে রেখেছেন তাতেই যেন আমরা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারি। যোহন এই সাজ-পোশাক বেছে নিয়েছিলেন,

(১) এটা দেখানোর জন্য যে যাকোব এই জগতের বিত্ত-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নিজে সহজ-সাধারণ জীবন যাপন করতেন। অথচ তাঁর নামেই একটি মহান জাতির আবির্ভাব ঘটেছিল। যাদের হৃদয় নম্র তারা তাদের পোশাক-পরিচ্ছদের আড়ম্বরতাকে এড়িয়ে চলে। আভিজাত্য, জাঁকজমকের প্রতি তারা কখনো আত্মসমর্পণ করে না। নিজেদের সাজ-পোশাকের মধ্য দিয়ে তারা কখনো নিজের অবস্থাকে জাহির করতে চায় না। আর লোকেরা তাদের এই সহজ-সাধারণ জীবন-যাপন দেখে তাদের সম্পর্কে কী ভাবল তাতে তাদের কিছুই এসে যায় না।

(২) যোহনের সাধারণ জীবন-যাপনের পেছনে আরেকটি কারণ হচ্ছে তিনি ছিলেন ঈশ্বরের ভাববাদী; আগেকার ভাববাদীরা বিবাগী লোকের মতো লোমের পোশাক পরতেন (সখরিয় ১৩:৪); তাঁর সাজপোশাক আমাদের এলিয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়; এলিয় সম্পর্কে বলা হয় 'লোমশ-মানব'; (অনেকে অবশ্য 'লোমশ' শব্দটি দ্বারা তাঁর পরিধেয় বস্ত্রের দিকে ইঙ্গিত করেন) শাস্ত্রে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তাঁর গা লোমে ভরা ছিল আর কোমরে ছিল চামড়ার কোমর-বাঁধনি' (২ রাজাবলি ১:৮)। লোকেরা যদিও তাঁকে 'ইলিয়াস' বলে ভেবেছিল তবুও নিজের কঠোর সংযমী জীবন নিয়ে তাঁর কোন হীনম্মন্যতা ছিল না।

(৩) তাঁর সাজপোশাকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ সুস্পষ্ট। যদিও তাঁর কোমর-বাঁধনি ততটা আকর্ষণীয় ছিল না যেমনটা তখনকার দিনে সবাই পরতেন; কিন্তু তা ছিল শক্ত, চামড়ার তৈরি। সদাপ্রভু যখন আসবেন তখন যারা কোমরে শক্ত কাপড় জড়িয়ে থাকবে তারা হবে খুবই ভাগ্যবান; কারণ তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করবে (লূক ১২:৩৫; ১ পিতর ১:১৩)।

২. তিনি যে খাবার খেতেন তা ছিল খুবই সাধারণ; তাঁর খাদ্যতালিকায় ছিল ফড়িং ও বনমধু; এমন নয় যে তিনি জীবনে অন্য কোন খাবার চোখেও দেখেন নি; কিন্তু এটা ছিল তাঁর নিত্যদিনকার খাবার। তিনি যখন মরু এলাকায় ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও শিক্ষার বিষয়ে ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন তখন থেকেই এই খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে শুরু করেন। ফড়িং হচ্ছে একপ্রকার উড়ুক্কু জীব, পোকা বিশেষ। খাবার হিসেবে তা খুবই উপাদেয়; মোশির আইন-কানুনে তা খাবার বিধান রয়েছে (লেবীয় ১১:২২); খাওয়ার আগে এর কিছু অংশ হালকা করে পরিষ্কার করে নিতে হয়; পরিমাণে কম বলে তা সহজেই হজম হয়; বৃদ্ধাবস্থায় ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে আসা শরীরে অবশ্য ঘাসফড়িং বা ফড়িং সহ্য হয় না, হজমের সমস্যা হয় (উপদেশক ১২:৫)। বনমধু হচ্ছে মানুষের কোন প্রকার তত্ত্বাবধান ছাড়াই এক প্রকার খাবার, যা গাছে কিংবা পাথরের খাঁজে জমা হয়। সাধারণত মৌমাছির বাসা থেকে এ মধু আহরণ করা হয়। যোহন বনমধু খেতেন– এর দ্বারা বোঝা যায় যে তিনি সেই মধু জমিয়ে খেতেন; তাঁর এই পরিমিত খাদ্যাভ্যাসের কারণে লোকেরা তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, 'ওকে ভূতে পেয়েছে'। বাস্তবিকই যোহন খাওয়া-দাওয়াকে সবকিছুর ওপরে

প্রাধান্য দেননি। শাস্ত্রে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে 'তিনি এসে খাওয়া-দাওয়া করেন নি' (১১:১৮ পদ)। অন্যদের মতো কৌতূহলবশত, নিয়ম রক্ষার জন্য, এমনকি লোকদের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্যও তিনি পানাহারে নিজেকে ব্যস্ত রাখেননি। জাগতিক বিষয়-আশয়, ভোগবাদী মানসিকতা থেকে তিনি নিজেকে বিযুক্ত রাখতে পেরেছিলেন, কারণ তিনি সর্বদা আত্মিক বিষয় নিয়ে ধ্যান করার মাঝেই ব্যস্ততাপূর্ণ সময় কাটাতেন। কদাচিৎ সময় মিলে গেলে তিনি খাবারের জন্য উঠতেন। এখন–

(১) যোহন লোকদের কাছে পাপের জন্য অনুতাপের যে বাণী প্রচার করেছিলেন তার মাঝে অনুতাপ-পরবর্তী জীবনধারা কেমন হবে সে বিষয়েও স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। মনে রাখুন, যারা লোকদের পাপ থেকে মন ফেরাতে বলবে তাদেরকে আদপেই নিজেদের জীবন -যাপনের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে; তাদেরকে হতে হবে সংযমী; নিজেকে দমনে রাখার ক্ষেত্রে তারা হবে যত্নবান। এক্ষেত্রে অবশ্য তাদের পৃথিবীর মানুষের কাছ থেকে পাওয়া অবজ্ঞা, বঞ্চনার মুখোমুখি হতে পারে; কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নিজ চর্চার প্রতি যত্নবান হতে সচেষ্ট থাকবে। এভাবে বাপ্তিস্মদাতা যোহন তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে তিনি যে সময়ে ও যে স্থানে বাস করতেন তার দোষগুলো তুলে ধরতে সমর্থ হলেন; আর তাঁর জীবন-যাপনের উদাহরণ তাঁর প্রচারকে আরো জোরালো করে তুলেছিল; তাঁর সাথে কাটানো প্রতিটি দিনই ছিল উপবাসর দিনগুলোর মতো।

(২) তাঁর সহজ-সাধারণ জীবন যাপন সবার কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল যে তিনি এসেছেন খ্রীষ্টের অগ্রদূত হিসেবে; এই চর্চার মাধ্যমে তিনি এটাই দেখালেন যে, তিনি স্বর্গ-রাজ্য সম্পর্কে জানেন এবং তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কেও অভিহিত আছেন। মনে রাখুন, যারা স্বর্গীয় ও আত্মিক আনন্দ লাভ করেছে, তারা সেই স্বর্গীয় জ্ঞানের মাঝে আনন্দে মেতে থাকতে এবং তাতে নিবিষ্ট থাকতে মনোযোগী হবে; আর তাদের এই জানাটা অবশ্যই বিশেষ কিছু, কারণ তারা যা জেনেছে সেটাই জগতের সবকিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ । লোকদের কাছে এই উদাহরণটি রাখার মাধ্যমে তিনি খ্রীষ্টের জন্য পথ প্রস্তুত করলেন। মনে রাখুন, হৃদয়ে স্বর্গ-রাজ্যের উপস্থিতির চাইতে মনোযোগ দেওয়ার মতো আর কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নেই। জগতের জ্ঞান অসার, আর তা প্রয়োজনীয় শান্তি-স্বস্তি দিতে পারে না। যারা আত্মায় দরিদ্র তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করুক।

চ. এখানে ৫ পদে আমরা দেখতে পাই যে, কোন্ লোকেরা তাঁর কাছে আসল; তখন যিরূশালেম এবং গোটা যিহূদিয়ার লোকেরা তাঁর কাছে আসল। শহরাঞ্চল থেকে শুরু করে দেশের প্রতিটি জায়গা থেকে ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব, ফরীশী ও সাধারণ যিহূদীরা দলে দলে তাঁর কাছে আসতে লাগল। বিভিন্ন শ্রেণী-পেশা-বয়স-এলাকার মানুষ মিলে সেখানে এক বিচিত্র সম্মিলনের জন্ম দিয়েছিল। যোহন যে স্বর্গ-রাজ্যের বিষয়ে প্রচার করছেন তা শুনে এই লোকেরা তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। তারা মিলিয়ে দেখতে চাইছিল যোহন সম্পর্কে শোনা কথাগুলো সত্য কিনা।

১. যোহনের জন্য এই ঘটনা ছিল অভূতপূর্ব সম্মানের। কারণ লোকের সমাগম ছিল প্রচুর এবং তারা তাঁকে প্রাপ্য সম্মান দেখিয়েছিল। মনে রাখুন, যারা প্রকৃতই নম্র, নিজ স্বার্থের বিষয়ে ভাবে না, উপরন্তু পৃথিবীর কাছে একপ্রকার মৃত বলে পরিগণিত হয় এবং ঈশ্বরের নির্দেশের বাধ্য থেকে সংযমী জীবন যাপন করেন, তারা মানুষের কাছ থেকে এই পৃথিবীতেই এমন সম্মান লাভ করবে যা তারা কল্পনাও করতে পারে না। তাদের এই

সত্যিকারের সম্মানের কাছে জগতের সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা ম্লান হয়ে যায়। অন্যরা নিজেদের স্বার্থে কাজ করে যে সম্মান লাভ করে তা এর কাছে ছায়ামাত্র।

২. মানুষের এই সমাগম যোহনকে ভাল কিছু করে দেখাবার এক চমৎকার সুযোগ এনে দিয়েছিল; শুধু তাই নয়, এর দ্বারা এটা সবার কাছে প্রমাণিত হয়েছিল যে ঈশ্বর তাঁর সাথে আছেন। লোকেরা এখন জোরের সাথে একযোগে স্বর্গ-রাজ্যে ঢুকতে শুরু করল (লূক ১৬:১৬)। ভোরের গর্ভ থেকে যেভাবে শিশির ঝরে (গীত ১১০:৩) অনেকটা সেভাবেই যেন এই লোকেরা খ্রীষ্টের সুসমাচারের চেতনা-সঙ্গীত রচনা করছে; অগণিত মানুষের এই সম্মিলন প্রকৃতপক্ষে এক অসাধারণ দৃশ্য রূপায়িত করেছিল।

৩. অনেক লোকের সমাগম এক মহান প্রত্যাশার মুখোমুখি হবার সময়কে নির্দেশ করে। হ্যাঁ, সে সময় এসে গেছে, এবার সব প্রতীক্ষার অবসান হবে। সাধারণ্যে এই ভাবনা তখন ঘুরে বেড়াচ্ছিল যে, ঈশ্বরের রাজ্য সত্বর প্রকাশ পাবে (লূক ১৯:১১); এবং অনেকে যোহনকে দেখে, তাঁর তেজদীপ্ত প্রচার শুনে, আর তা যে ফরীশী– ধর্ম-শিক্ষকদের চেয়ে আলাদা তা বুঝতে পেরে, তাঁকে 'খ্রীষ্ট' ভেবেছিল (লূক ৩:১৫)। খ্রীষ্টের জন্য প্রতীক্ষাই লোকদের তাঁর কাছে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

৪. যোহনের কাজে যারা উপকৃত হয়েছিল তারা তাঁর প্রচারের কথা শুনতে ছুটে গিয়েছিল। মনে রাখুন, যারা সত্যিকারভাবে ঈশ্বরের বাক্য সম্পর্কে জানতে চায়, তাদের কাছে যদি কেউ সেই বাক্য পৌঁছে না-ও দেয় তবুও তারা শোনার জন্য আগ্রহী হবে এবং যথাস্থানে ছুঁটে যাবে। আর যারা ঈশ্বরের অনুগ্রহের বিষয়ে জানতে পায় তাদের কাছে এই জগত-সংসারের মায়া তুচ্ছ বলে পরিগণিত হয়। তারা তখন ঈশ্বরের রাজ্যে সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলতে আত্মিক দিক দিয়ে সচেষ্ট থাকে।

৫. এখানে একটি উপলক্ষকে কেন্দ্র করে অনেক লোকের সমাগম দেখতে পাওয়া যায়; আর তা হচ্ছে তারা যোহনের কাছে বাপ্তিস্ম নিচ্ছিল। তারপরও অল্প লোকই শেষ পর্যন্ত তাঁর সাথে লেগে ছিল; যিহূদিয়া এবং যিরূশালেমে খ্রীষ্টের শীতল অভ্যর্থনাই যার প্রমাণ। মনে রাখুন, অনেক আগ্রহী শ্রোতার মাঝে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসী হিসেবে অল্প লোককেই খুঁজে পাওয়া যায়। নিছক কৌতূহল, অভিনব কিছু প্রত্যক্ষ করার বাসনা এবং বৈচিত্র্যের কারণেও অনেক লোক প্রচার শুনতে আসে কিন্তু ওই পর্যন্তই; তারা তাদের জীবনে তা কাজে লাগায় না (যিহিষ্কেল ৩৩:৩১,৩২)।

ছ. একটি অনুষ্ঠান, যা তাঁর অনুগামীদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল (৬ পদ)। যারা তাঁর প্রচার শুনে নিজেদের পাপ স্বীকার করল তিনি তাদের যর্দন নদীতে বাপ্তিস্ম দিলেন। এখানে লক্ষণীয় যে, লোকেরা তাদের পাপ স্বীকার করেছিল এবং খ্রীষ্টের রাজ্য যে সন্নিকট তা বিশ্বাস করেছিল।

১. লোকেরা তাদের পাপ স্বীকারের মাধ্যমে পরীক্ষিত হয়েছিল; যোহনের কাছে তারা একটা সাধারণ স্বীকারোক্তি দিয়েছিল যে, হ্যাঁ, তারা পাপ করেছে এবং এর ফলে তারা ঈশ্বরের কাছে দোষী পরিগণিত হয়েছে। এখন তাদের সেই পাপ থেকে পরিষ্কৃত হওয়া জরুরি। অপরদিকে, ঈশ্বর-যাঁর কাছে কিছুই লুকানো নেই– তাঁর কাছে লোকেরা যেসব পাপ করেছে তা নির্দিষ্ট করে স্বীকার করল। যিহূদীরা নিজেদের ন্যায্যতা প্রমাণের বিষয়ে শিক্ষা পেয়েছিল; অবশ্য তা ছিল কড়া অনুশাসন-বেষ্টিত। কিন্তু যোহন এখানে তাদের শিক্ষা দিলেন নিজেদের অভিযুক্ত করার বিষয়ে, নিজেদের দোষী সাব্যস্ত করতে। তদানীন্তন

যিহূদী সমাজে পাপের জন্য উৎসর্গ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করা হতো। বছরে একবার গোটা ইস্রায়েল জাতির পাপের জন্য একটি সাধারণ স্বীকারোক্তি প্রদান করা হতো। কিন্তু যোহন প্রত্যেককে নিজের নিজের পাপের সম্পর্কে ভাবতে এবং তা স্বীকার করতে শিক্ষা দিলেন। হৃদয়ে মহামারীর ন্যায় যে পাপ-রোগ বাসা বেঁধেছে তা থেকে আরোগ্য লাভের জন্য তিনি তাদের নিজ পাপ থেকে ফিরতে আহ্বান জানালেন। মনে রাখুন, যারা নিজেদের পাপের জন্য প্রকৃতই অনুতপ্ত হয় এবং নিজেদের ধার্মিকতারূপে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয় তারা প্রতিশ্রুত শান্তি এবং ক্ষমা লাভ করবে। পাপের কারণে তারা নিজেদের ওপর যে শাস্তি ডেকে এনেছিল তা খ্রীষ্টের দেওয়া শান্তি ও ক্ষমায় দূরীভূত হবে (১ যোহন ১:৯)।

২. স্বর্গ-রাজ্যের সুফল এখান কাছে এসে গেছে। বাপ্তিস্ম নেওয়ার মাধ্যমে তারা এর প্রাপ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হল। যোহন তাদের জলে বাপ্তিস্ম দিলেন; ঈশ্বর যে তাদের পাপ থেকে পরিষ্কৃত করেছেন এ ছিল তারই প্রতীকী ঘটনা। যিহূদীদের কাছে এটা ছিল খুবই স্বাভাবিক ঘটনা; বিশেষভাবে যারা যিহূদী ধর্মে আসতে চাইতো এবং যাদের তক্‌ছেদ করা হয়নি তাদেরকে এ ধরনের বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে হতো। আর এখানে আমরা দেখতে পাই যে সেই যিহূদীরা ধার্মিকতার ধর্ম গ্রহণে এগিয়ে এসেছে।

অনেকে মনে করেন, বাপ্তিস্মের এই অনুষ্ঠানের সাথে প্রখ্যাত ধর্মগ্রহণকারীদের আনুষ্ঠানিকতার মিল রয়েছে। এই ধর্মে বাপ্তিস্মদানের মাধ্যমেই একজনকে নিজেদের লোক বলে ডাকা যেত। যোহনের বাপ্তিস্মদানের বিষয়ে খ্রীষ্ট প্রশ্ন করেছিলেন, 'বাপ্তিস্মদানের অধিকার যোহন কোথা থেকে পেয়েছিলেন– স্বর্গ থেকে না মানুষের কাছ থেকে?' খ্রীষ্ট এর মাধ্যমে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে সেই বাপ্তিস্ম ছিল মানবীয়, কারণ তারা স্বর্গীয় পরিকল্পনার বিষয় বোঝেনি এবং তা অনুসরণ করে নি; যোহন এ বিষয়ে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টের বাপ্তিস্ম ছিল স্বর্গীয় এবং তা অন্য সব বাপ্তিস্ম থেকে আলাদা, স্বতন্ত্র ছিল। লোকেরা কেবল মন পরিবর্তন করেই যোহনের কাছ থেকে বাপ্তিস্ম নিয়েছিল (প্রেরিত ১৯:৪)। মোশির সাথে এক হবার জন্য মেঘ ও সমুদ্রের মাঝে ইস্রায়েল জাতির লোকদের বাপ্তিস্ম হয়েছিল (১ করিন্থীয় ১০:২)। আচারানুষ্ঠান নির্ভর ব্যবস্থা শুচি বা বাপ্তিস্মের কথা বলে (ইব্রীয় ৯:১০); কিন্তু যোহনের বাপ্তিস্ম ছিল সংশোধনমূলক নিয়মবিশেষ– যা পাওয়া যায় বিশ্বাস ও অনুতাপের দ্বারা।

এখানে বলা হয়েছে যে, যোহন যর্দন নদীতে তাদের বাপ্তিস্ম দিলেন। এই নদী যিহূদীদের মাঝে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল, কারণ এর মাঝ দিয়েই তারা পথ করে গিয়েছিল এবং নামানও এখানে সুস্থতা লাভ করেছিলেন। যদিও এখানে যর্দন নদীর উল্লেখ আছে, তবুও যোহন বোধকরি প্রথমে এই নদীতে লোকদের বাপ্তিস্ম দেন নি; যখন তিনি দেখলেন অগণিত লোক তাঁর কাছে বাপ্তিস্ম নিতে ছুটে আসছে তখন তিনি লোকদের নিয়ে যর্দন নদীতে যান। বাপ্তিস্মদানের মাধ্যমে তিনি লোকদের পবিত্র জীবন-যাপনের প্রতিজ্ঞায় বাঁধলেন; লোকেরা তাদের নিজেদের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে এই কাজকে বেছে নিয়েছিল। মনে রাখুন, স্বর্গীয় অনুগ্রহের শক্তিতে করা পাপের স্বীকারোক্তি সর্বদাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার জন্ম দেয়। আর এই প্রতিজ্ঞার মূলে থাকে স্বর্গীয় অনুগ্রহের চিরকালীন উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ।

মথি ৩:৭-১২

পাপ থেকে মন ফেরানোর জন্য লোকদের কাছে যোহনের আহ্বানের মাঝে খ্রীষ্টের রাজ্যের কাছে আসার সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়; শুধু তাই নয়, পাপ থেকে মন ফেরানোর পর নিজেদের জীবনকে আমূল বদলে ফেলার শিক্ষাও তার এই প্রচারে উপস্থিত। আর এটাই হচ্ছে মূল বিষয়: নিজেদের পাপ শুধু মুখে স্বীকার করলেই হবে না, নিজেদের জীবনে পাপের উপস্থিতিকে বিদায় জানাতে হবে। অর্থাৎ নিজেদের জীবন দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে, হ্যাঁ পাপ থেকে এখন আমি মুক্ত।

লক্ষ্য করুন,

১. যেসব ফরীশী ও সুদ্দুকী তাঁর কাছে বাপ্তিস্ম নিতে এসেছিল, যোহন তাদের উদ্দেশ্যে এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন (৭ পদ)। কিন্তু অন্যদের কাছে 'পাপ থেকে মন ফেরাও, কারণ স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট' বলাটাকেই তিনি যথেষ্ট মনে করলেন। যখন তিনি দেখলেন ফরীশী ও সুদ্দুকীরা তাঁর কাছে আসছে তখন তিনি তাদের কাছে এ বিষয়ে আরও বিশদ করে বলার, নিজেকে আরও ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বোধ করলেন। যিহূদীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনটি সম্প্রদায়ের মাঝে দু'টি হচ্ছে এই ফরীশী ও সুদ্দুকী। অপর সম্প্রদায়টি হচ্ছে এসেনস (মূল গ্রীক শব্দ 'এসেনয়'; এর মানে 'পবিত্র ব্যক্তি'। খ্রীষ্টের সময়ও যিহূদীদের মাঝে এদের সক্রিয় উপস্থিতি ছিল, যদিও নতুন নিয়মে এ বিষয়ে দেখতে পাওয়া যায় না। ইতিহাসবিদ যোসেফাস এবং ফিলোর লেখায় এদের সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। সংখ্যায় এরা ছিল প্রায় চার হাজার; এদের অধিকাংশই দলবদ্ধ হয়ে বাস করতো; কেউ কেউ বিভিন্ন শহরে বসত গড়ে তুলেছিল)। এই এসেনস সম্প্রদায় মূলত নিজেদেরকে গুরুত্বপূর্ণ কাজে সম্পৃক্ত রাখত। যিহূদীদের মাঝে ফরীশীরা ছিল গোঁড়া প্রকৃতির; তারা বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে নিজেদের ব্যস্ত রাখত। তখনকার দিনে তারা যিহূদীদের মন্দির থেকে পাওয়া ক্ষমতা ও পূর্বপুরুষদের নিয়মের যথেচ্ছ ব্যবহারে অনেক সময় স্বপ্রণোদিত হয়ে এমনকি ঈশ্বরের নির্দেশকে অমান্য করতেও কুণ্ঠিত হতো না। ফলে তারা যখন যোহনের কাছে বাপ্তিস্ম নিতে আসল তখন তা অনেকের কাছেই অদ্ভুত লেগেছিল; কিন্তু একথা সত্য যে তারা তাঁর কাছে অনেকটা কৌতূহলবশত 'দেখি কী হয়' এই ধারণা থেকে এসেছিল; যারা যোহনের কথা শুনেছিল তাদের সবাই কিন্তু বাপ্তিস্ম নেয়নি, কেউ কেউ নিয়েছিল; এ বিষয়ে আমরা খ্রীষ্টের কাছ থেকেই শুনি, 'সাধারণ লোকেরা ও কর আদায়কারীরা যোহনের প্রচার শুনে তাঁর কাছে বাপ্তিস্ম নিয়ে ঈশ্বরকে ন্যায়বান বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু ফরীশীরা ও ধর্ম-শিক্ষকরা তাঁর কাছে বাপ্তিস্ম না নেওয়ার মাধ্যমে নিজেদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছাকে হেয়জ্ঞান করেছিল' (লূক ৭:২৯, ৩০)।

মনে রাখুন, আদেশ জারির ফলে অনেককে পাওয়া গেলেও তা অনেকেরই সেই ক্ষমতাকে মেনে নিতে অনীহা থাকে। এখন লক্ষণীয় যে, যোহন তাদেরকে কী বলে সম্বোধন করলেন; একটু আগেই লোকেরা তাদের সম্পর্কে যোহনের বক্তব্য শুনেছে। আর এখানে আমরা দেখি যোহন তাদের পরিষ্কার ভাষায় 'সাপের বংশধর' বলে সম্বোধন করলেন (৭ পদ)। সততা ও ন্যায্যতার জোরেই যোহন তখনকার দিনে প্রভাবশালী এ দুই সম্প্রদায়ের লোকদের এমনটা বলতে পেরেছিলেন।

২. তিনি যেভাবে জোরের সাথে ফরীশী ও সুদ্দুকীদের ভণ্ডামির বিষয়ে উল্লেখ করলেন তা লক্ষণীয়। খুবই সোজাসাপ্টা কথায় তাদের স্বরূপ তিনি এমন একজনের মতো বলে

ফেললেন যার কথা বলার অধিকার আছে। হ্যাঁ, তাঁর কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যে লোকদের কিংবা শিক্ষিত ফরীশী, সুদ্দুকীদের কাছ থেকে কোন চ্যালেঞ্জ বা ভয়ের সম্মুখীন হলেন না, তার কারণ পবিত্র আত্মা তাঁর সাথে ছিলেন; এবং তিনি তাঁর শক্তিতেই কথা বলছিলেন।

ক. এখানে যোহনের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, জাগরূক রূপটিই পরিষ্কার চিত্রায়িত হয়। তিনি তাদের পদবীর জন্য প্রাপ্য সম্মানটুকু দিলেন না কিংবা তাদের শিক্ষক বলেও সম্বোধন করলেন না।

১. উল্টো তিনি তাদের 'সাপের বংশধর' বলে সম্বোধন করলেন; খ্রীষ্টও তাদের সেই একই অভিধা দিয়েছিলেন (১২:৩৪ পদ)। তারা ছিল সাপের মতো ধূর্ত, খোলস বদলের ক্ষেত্রে সিদ্ধহস্ত আর বিষাক্ত। তাদের মন ঘৃণা ও বৈরী মনোভাবে আচ্ছন্ন ছিল; প্রকৃত অর্থেই তারা ছিল সাপের বংশধর; কারণ আত্মিক দিক থেকে শয়তানই ছিল তাদের পিতা। সাপের পুরো স্বভাব-চরিত্র তারা আত্মস্থ করেছিল। এরাই অব্রাহামের বংশধর বলে নিজেদের গর্বিত মনে করতো; কিন্তু যোহন তাদের পরিষ্কার দেখিয়ে দিলেন, যারা প্রকৃতপক্ষে তারা সাপেরই বংশধর (তুলনা করুন আদি ৩:১৫ পদ); শয়তানই তাদের পিতা (যোহন ৮:৪৪)। সাপের গোষ্ঠী হিসেবে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এদের সবাই ছিল এক; যদিও ফরীশী ও সুদ্দুকীদের মাঝে সাম্প্রদায়িক বিভেদ, শত্রুতা ছিল তবুও মন্দতার দিক দিয়ে তারা ছিল একাট্টা। মনে রাখুন, যারা মন্দতার দিকে ঝুঁকে আছে তারা সাপের বংশধর; যদিও তা মেনে নিতে তাদের আপত্তি আছে। খ্রীষ্টকে আমরা দেখি যে তিনি পরিষ্কার চোখে আঙ্গুল দিয়ে এদের দোষ দেখিয়ে দিতেন। তিনি তাদের আসল চরিত্র উন্মোচন করে তাদের ভণ্ডামি ফাঁস করে দিয়েছিলেন।

২. যোহন এখানে তাদের এক বিপদ-সঙ্কেতের বিষয়ে উল্লেখ করে জানতে চান, 'ঈশ্বরের কাছ থেকে যে শাস্তি নেমে আসছে তা থেকে পালাতে তোমাদের কে বুদ্ধি দিয়েছে?' তাঁর একথার দ্বারা এটাই বোঝা যায় যে তারা আসন্ন ক্রোধের অধীনে কঠিন বিপদের মধ্যে ছিল। আর সেকারণেই তারা আরও বেশি করে পাপে নিজেদের নিমজ্জিত করছিল (ফরীশীরা ধর্মের দোহাই দিয়ে আর সুদ্দুকীরা ধর্মের বিপরীতে বিভিন্ন বিবৃতি, ব্যাখ্যা তৈরির মাধ্যমে পাপ করে যাচ্ছিল)। তারা হয়তো নিজেদের সুবিধার্থেই কোন আশ্চর্য ঘটনার প্রত্যাশা করেছিল। এখানে তাদের উদ্দেশ্যে যোহন যে উক্তিগুলো করেছিলেন তা খুবই গুরুত্ব বহন করে– 'কে তোমাদের এখানে এনেছে?' 'কার বুদ্ধিতে তোমরা এখানে এসেছ?' 'তোমাদের মনে কীসের ভয় স্বর্গ-রাজ্যের বিষয়ে অনুসন্ধান করতে এখানে হাজির করেছে?' মনে রাখুন,

(১) এখানে এক ক্রোধের কথা বলা হয়েছে। ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য যারা তখন শাস্তি ভোগ করছিল তাদের থেকে এটি ছিল একেবারেই ভিন্ন– যা ভবিষ্যতে নেমে আসছে।

(২) পাপ থেকে পালিয়ে যাবার বিষয়ে যোহন যা বলেছেন, তা আমাদের প্রত্যেকের বেলায়ই খাটে।

(৩) এটা ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহ যে আমরা পাপ থেকে স্বচ্ছতার সাথে পালিয়ে আসতে পেরেছি; চিন্তা করুন, 'কে আমাদের' সাবধান করেছে?' ঈশ্বর আমাদের সাবধান করেছেন, যিনি আমাদের ধ্বংসে আনন্দ পান না। তিনি আমাদের তাঁর বাক্য এবং তাঁর

দেওয়া বিবেচনাবোধ দ্বারা পাপের বিষয়ে সতর্ক করে দেন।

(৪) কিন্তু তাঁর এই সাবধানবাণীতে অনেকে আঁতকে ওঠে। কারণ তারা তাদের নিরাপত্তা, নিজেদের বিষয়ে ভাল ধারণা নিয়ে চিন্তা করতেই ভালবাসে।

খ. এখানে ৮ পদে আমরা একটি চমৎকার নির্দেশনা ও পরামর্শ দেখি; "তোমরা যে পাপ থেকে মন ফিরিয়েছ নিজেদের জীবনে তার প্রমাণ দেখাও। তোমাদের জীবনে যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহের ফল দেখতে পাওয়া যায়; সদাপ্রভুর প্রতি ভয় তোমাদের জীবনকে পবিত্রতার দিকে চালিত করুক" অথবা "পাপ স্বীকারের মাধ্যমে তোমরা যে বাপ্তিস্ম নিয়েছ তার দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে তোমাদের জীবনে কাজ করতে দাও; কারণ পাপ থেকে নিষ্কৃতি পেতেই তো তোমরা মন পরিবর্তন করে বাপ্তিস্ম নিয়েছ।" নিজেদের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিফলন দেখানোটাই হচ্ছে এর ফল। শেকড়ের সাথে যুক্ত থাকার মাধ্যমে গাছ যেমন ফলবতী হয়ে ওঠে, তেমনি ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতা অক্ষুণ্ন রাখার মাধ্যমে নিজেদের জীবনে ভাল ভাল কাজ দেখা যায়। এর এটাই হচ্ছে মন পরিবর্তন করার ফল।

মনে রাখুন, যারা মন পরিবর্তন করার মর্মার্থ অনুধাবন করতে সমর্থ হয় তাদের কাজ অবশ্যই ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করবে এবং এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হবে যে, সেই ব্যক্তি প্রকৃতই পাপ থেকে ফেরার জন্য মন পরিবর্তন করেছে; কারণ সে আর পাপের পথে ফিরবে না। তারা সেই কাজই করবে যা প্রকৃত অনুতাপকারীরা ও বাপ্তিস্ম প্রাপ্ত ব্যক্তিরা করে থাকে। সত্যিকারের মন পরিবর্তন মানুষকে নম্র করে। নিজের সম্পর্কে কখনো সে উঁচু ধারণা পোষণ করে না; এ ছাড়াও সে ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং নিজের জীবনে সেই অনুগ্রহের কাজের জন্য কৃতজ্ঞ থাকবে। আর পাপকে এড়িয়ে চলার জন্য সে থাকবে খুবই সজাগ যেন কেউ তাকে তার কোন কাজের জন্য দোষী সাব্যস্ত করতে না পারে।

গ. এখানে ৯ পদে তাদের সতর্ক করা হয়েছে যেন তারা তাদের বংশগরিমার বিষয়ে গর্ব না করে; কারণ অব্রাহামের সন্তান বলে নিজেদের পরিচয় দেবার সুযোগ তারা নিজেদের পাপের মাধ্যমে হারিয়েছিল। 'আর এই ভেবে মনে মনে আত্মতুষ্টি পাবার কোন কারণ নেই যে তোমরা অব্রাহামের বংশের লোক' (৯ পদ)। মনে রাখুন, নিজের মনের সাথে কথোপকথন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ তা বিবেচনাবোধকে হয় জাগ্রত রাখে, নতুবা বিব্রত করে। ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে যারা নিজেদের অন্তর পূর্ণ করে এবং হৃদয়ে খ্রীষ্টের উপস্থিতি প্রত্যাশা করে, তারা প্রকৃতই কার্যকর চিন্তা ও কথায় বিবেচনাবোধকে জাগ্রত করে। অকার্যকর চিন্তাকারী লোকেরা পাপ করার পর মনে মনে সেই কাজের পেছনে যুক্তি দাঁড় করাতে এবং ব্যবস্থাপন্থীদের মতো নামে মাত্র অন্তর থেকে পাপ ধুয়ে ফেলে (যিরমিয় ৪:১৪)। এই অমূলক আত্মকথন কখনো কাউকে তার পাপ থেকে নিবৃত্ত করতে সাহায্য করে না; বাস্তবিকই তা তাকে রক্ষাও করতে পারে না। তাই যোহনের বলা কথাকে এভাবে বলা যায় যে, 'এমনটা ভেবে মনকে প্রবোধ দিয়ো না' বা 'মনের ভেতর এই চিন্তা লালন করে তুমি যদি নিশ্চিন্ত নিদ্রায় যাও তাহলে বুঝতে হবে তুমি বোকার স্বর্গে বাস করছো।'

মনে রাখুন, আমরা নিজের মনে যা বলি সে সম্পর্কে ঈশ্বর সম্যক অবগত। যে কথা আমরা মুখে বলতে ভয় পাই তা যদি আমরা মনে মনে বলি তবে তা হবে আমাদের অধার্মিকতারই পরিচায়ক; কারণ আমরা পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে পাপ করছি। মনের ভেতর এই ভ্রান্ত বিশ্বাস, ধারণা পোষণ করার মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদেরই বঞ্চনা করি। তা কখনো বাইরে প্রকাশ না পেলেও আমরা যে ভণ্ডামি করছি, পাপকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সে সম্পর্কে

তো আমরা জানিই। অনেকে ধ্বংসকারী মিথ্যাকে গোপন করে। অথচ তা কিন্তু তাদের মনে আছে এবং জিহবায় এসে আটকে আছে। আর তারা এই কাজটি করে কারণ তারা তা স্বীকার করতে লজ্জা বোধ করে। এই শয়তানি কাজের মূল প্ররোচক কিন্তু শয়তানই। যোহন সে বিষয়েই তার প্রচারে আলোকপাত করেছেন,

১. তারা মনে মনে এটাই ভাবছিল যে, 'অব্রাহাম আমাদের পিতা; অযিহূদীদের মতো আমরা তো পাপী নই। পাপের অনুতাপ তো তাদেরই করা উচিত। কিন্তু আমরা যিহূদী, পবিত্র জাতি, ঈশ্বর নিজে আমাদের বেছে নিয়েছেন, তাহলে কেন আমাদের মন পরিবর্তন করতে হবে?' মনে রাখুন, যে কথা আমরা মুখে প্রকাশ করতে পারি না তা আমাদের কোন কাজে আসে না। 'মনে মনে এই ভেবে আত্মতুষ্টি পাবার কোন কারণ নেই যে তোমরা অব্রাহামের বংশধর' কারণ:

(ক) 'তোমরা নিজেদের পাপে নিজেদেরই কলুষিত করেছ, যে কারণে এখন তোমাদের মন পরিবর্তন করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তোমরা যদিও সত্যি অব্রাহামের সন্তান হতে তবে ঈশ্বর অব্রাহামের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং নিজেদের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে সব মন্দতাকে দূরে সরিয়ে দিতে'।

(খ) তোমরা এই জন্যে অব্রাহামের সন্তান নও, যেহেতু তোমাদের মন কলুষিত হয়ে পড়েছে, যে কারণে তোমাদের এখন মন পরিবর্তন করার কথা খেয়াল হয়েছে। একথা ভেব না যে পাপ থেকে মন পরিবর্তন করলেই তোমরা ঈশ্বরের ক্রোধ ও বিচারের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। আর অব্রাহামের সন্তান– শুধুমাত্র এই কারণে ঈশ্বর যে তোমাদের অনুগ্রহ করবেন সে কথা ভুলেও ভেবো না'। মনে রাখুন, আমরা যদি নিজেরা ভাল না হই তবে কারও সাথে কোন প্রকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই আমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে না। এমনকি আমাদের জন্ম যদি কোন ধর্মভীরু পরিবারেও হয় বা ধর্মতত্ত্বের ওপর প্রচুর পড়াশোনাও আমাদের থাকে, তবুও তা আমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করা থেকে বাঁচাতে পারে না। তাই, এমন কারও সাথে মিশুন, এমন বন্ধুদের সান্নিধ্যে আসুন, যারা ঈশ্বরকে সর্বাগ্রে স্থান দেয়; তাদেরকে আপনার জন্য প্রার্থনা করতে বলুন, প্রয়োজনে তাদের কাছে পরামর্শ চান। এর দ্বারা আপনি নিজেকে পরিষ্কার রাখার প্রয়াস পাবেন; যে পাপের জন্য আমরা মন পরিবর্তন করেছি তা যদি আমরা আবার করতে থাকি তবে মন পরিবর্তন করার প্রকৃত কোন মূল্য থাকে না। আমরা আত্মিকভাবে অব্রাহামকে আমাদের পিতা হিসেবে পেয়েছি। ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে যে অনুগ্রহের চুক্তিটি করেছিলেন তার দ্বারাই এটা সম্ভব হয়েছে। তাঁর সন্তান হিসেবে আমরা তাঁর থাকবার জায়গা হই এবং তাঁর সাথে একই সহভাগিতায় থাকার সুযোগ লাভ করি (যিরমিয় ৭:৪)। মনে রাখুন, সাধারণ লোকেরা জাগতিক সম্মান ও সুবিধা লাভের আশায় স্বর্গীয় সম্মানকে বিসর্জন দিয়ে মণ্ডলীর সদস্যপদের জন্যই বেশি আকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকে। ফলে স্বর্গীয় সম্মানের খুব অল্পই তারা পায়।

২. তারা কেমন মূর্খের মতো এই ধরনের ভিত্তিহীন ভাবনা ভাবতে পেরেছিল যে, অব্রাহামের বংশধর হিসেবে তারাই পৃথিবীতে ঈশ্বরের একমাত্র জাতি! আর এ কারণে ঈশ্বর তাদের কখনো বিযুক্ত করবেন না; কারণ তা করলে তিনি ও তাঁর মণ্ডলী লসের খাতায় পড়ে যাবে যে! যোহন তাদের এরকম যুক্তিহীন ভাবনাকে উদ্দেশ্য করেই তীর্যক সমালোচনা করেছেন। তিনি তাই তীব্র শ্লেষের সাথে এভাবে বলেছিলেন, 'তোমাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে

(তোমরা অবশ্য নিজেদের মনে মনে বলে থাক), ঈশ্বর চাইলে এই পাথরগুলো থেকে অব্রাহামের বংশধর উৎপন্ন করতে পারেন। যোহন এখন লোকদের যর্দন নদীর অন্য পাড়ে বেথানিয়ায় লোকদের বাপ্তিস্ম দিচ্ছেন (যোহন ১:২৮)। এই সেই নদী যা ইস্রায়েলের সন্তানেরা পার হয়ে গিয়েছিল এবং সেখানে বারো বংশের জন্য বারোটি পাথর দিয়ে নির্মিত একটি স্মারকস্তম্ভ রয়েছে, যা যিহোশূয় নির্মাণ করেছিলেন (যিহোশূয় ৪:২০)। যোহন যে সেই পাথরগুলোর দিকে ইঙ্গিত করেই বলেছিলেন যে, ঈশ্বর চাইলে এই পাথরগুলো থেকেই অব্রাহামের বংশধর উৎপন্ন করতে পারেন তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তা যদি না-ও হয় তবে হয়তো তিনি যিশাইয় ৫১:১ পর্বের দিকে নির্দেশ করে, এই কথা বলেছিলেন; যেখানে লেখা আছে 'যে পাথর থেকে তোমাদের কেটে নেওয়া হয়েছে'। যে ঈশ্বর ইসহাককে পাথর থেকে তুলেছিলেন, তিনি চাইলে প্রয়োজনবোধে তা আবার করতে পারেন, তাঁর কাছে অসম্ভব বলে কিছুই নেই।

অনেকে মনে করেন, যোহন সেখানে উপস্থিত বিজাতীয় সৈন্যদের প্রতি ইঙ্গিত করে যিহূদীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে, ঈশ্বর অযিহূদীদের মধ্য থেকেই তাঁর মণ্ডলী গড়বেন; এবং ঈশ্বর অব্রাহামের আশীর্বাদয় তাদের পরিপূর্ণতা দেবেন। এভাবে আমাদের প্রথম বাবা -মা যখন ঈশ্বরের আদেশ পালনে ব্যর্থ হল, তখন ঈশ্বর তাদের ত্যাগ করে, তাদের মৃত্যুর স্বাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি; বরং পাথর থেকে অন্য আদম-হবাকে বেছে নিলেন। অথবা এভাবেও ভাবা যেতে পারে, 'তোমাদের মতো পাপে আসক্ত, কঠিন-মনা, খটখটে লোকের চেয়ে এই পাথরগুলোই বরং অব্রাহামের বংশধর হিসেবে বেশি উপযুক্ত।'

মনে রাখুন, এখানে যদিও দেখা যায় যে, পাপের কারণে সিয়োনের লোকেরা তাদের গৌরব হারিয়েছে; এবং যোহনের কথা তার দিকেই ইঙ্গিত করছে তবুও তা সিয়োনের লোকদের জন্য এক আশার বাণীও শুনিয়ে দেয় যে, যিহূদীদের বর্তমান প্রজন্ম যাই করুক না কেন ঈশ্বর কিন্তু তাদের মধ্য দিয়েই তাঁর মণ্ডলী নির্মাণ করতে চান; যদি তারা ব্যর্থ হয় তবেই ঈশ্বর অযিহূদীদের দিকে মনোযোগ দেবেন এবং তাদের অনেক বেশি করে আশীর্বাদ করবেন (২১:৪৩; রোমীয় ১১:১২ প্রভৃতি)।

ঘ. যোহন ফরীশী ও সুদ্দুকীদের এক ভয়ের সংবাদ দিলেন। তিনি তাদের সাথে বাকি সবাইকেও সাবধান করে দিলেন যে, মন পরিবর্তন করার ফল তাদের জীবনে দেখা না গেলে কি ভয়ংকর শাস্তি তাদের জন্য অপেক্ষা করছে (১০ পদ)। "এখন নিজেদের দিকে তাকাও। স্বর্গ-রাজ্য নিকটে এসে গেছে; কী করবে, মনস্থির কর।" যোহন তাদের প্রতি এই কথাই বলেছিলেন,

১. তোমাদের বিচার কত শক্ত ও সংক্ষিপ্ত, তা দেখ। গাছের গোড়াতে কুড়াল লাগানোই আছে। অর্থাৎ তোমাদের ওপর ঈশ্বর খড়্গ-হস্ত হয়েই আছেন। এখন তোমাদের জীবনে ভাল ফল দেখাতে যদি তোমরা ব্যর্থ হও তাহলে তিনি আর অপেক্ষা করবেন না, তা তোমরা যতই বাপ্তিস্ম নাও, আর অনুতপ্ত হও। এখন তোমরা এটা ভেবে বোসো না যে, তিনি আর অপেক্ষা করবেন; তাঁর বিচার খুব দ্রুতই তোমাদের ওপর নেমে আসবে। ঈশ্বর তাঁর গৌরব প্রকাশ করবার জন্য সময়ক্ষেপণ করেন না। "দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি"। তাই তোমরা প্রস্তুত হও; কারণ সুযোগ আর খুব বেশি অবশিষ্ট নেই।

২. "তোমরা যদি নিজেদের বদলে না ফেল, জীবনে ফল দেখাতে ব্যর্থ হও, তবে এটা

জেনো ঈশ্বরের কঠোর আঘাত তোমাদের ওপর নেমে আসছে।" এটা বলেই দেওয়া হয়েছে যে গাছের গোড়ায় কুড়াল লাগানোই আছে। এ কথার দ্বারা এটাই বোঝা যায় যে, ঈশ্বর তাঁর ঘোষণার প্রতি খুবই নিষ্ঠাবান। তিনি যা বলেন তার অন্যথা করেন না। এখানে যেমন বলা হয়েছে 'প্রত্যেক গাছের গোড়ায়'। সেই গাছ যতই সম্মান এবং উপহারে ঠাসা থাকুক, জাগতিক কাজ-কর্মে যতই তা সতেজ থাকুক, যদি তা মন পরিবর্তন করার ফল দেখাতে না পারে, তবে ঈশ্বর দ্বিরুক্তি না করে তা কেটে ফেলবেন। তারপর ঈশ্বর সেগুলোকে নিয়ে শিখা অনির্বাণে ফেলবেন। যে যন্ত্রণা, যে কষ্টভোগের কোন তুলনা নেই, শুরু নেই, শেষ নেই। ফলহীন গাছ তো জ্বালানিরই উপযুক্ত। সম্ভবত এই কথার দ্বারা রোমানদের হাতে যিরূশালেমের ধ্বংসের চিত্রের দিকেই নির্দেশ করা হয়েছে। এরকম বিচার এর আগে কখনো ইস্রায়েল জাতির লোকদের উপর আসেনি। যেভাবে কচ করে গাছ কেটে ফেলা হয়, শিকড় উপড়ে ফেলে তা খণ্ড খণ্ড করা হয়– এই ধ্বংস-কাণ্ড ছিল অনেকটাই সেরকম। সেই লোকদের জন্য এই বিচার ছিল সত্যিকার অর্থেই কঠিন, দুঃসহ অভিজ্ঞতা; এই পতন, ধ্বংসকে এড়ানোর কোন উপায় ছিল না। যারা তাদের কৃতকর্মের জন্য দুঃখিত হয়নি এবং পাপের পথ থেকে ফেরেনি, তারা বরণ করেছিল নির্মম মৃত্যুকে। ঈশ্বর এই ঘটনার মাধ্যমে সেই কথিত ঘনায়মান গজবই বর্ষণ করলেন। যা ছিল ভয়ঙ্কর ও চূড়ান্ত শাস্তিবিশেষ।

৬. যোহন অবশেষে খ্রীষ্টের বিষয়ে বললেন। মূলত যাঁর বিষয়ে বলবার জন্যই তাঁর এই প্রচার-কাজ। খ্রীষ্টের বিষয়ে যারা প্রচার করেন, তারা নিজেদের নয় খ্রীষ্টের কথাই বলেন। এখানে আমরা দেখতে পাই,

১. ক্ষমতা ও সম্মানের দিক দিয়ে খ্রীষ্ট যোহনের চেয়ে ক্ষমতাবান। দেখুন, তিনি কত অর্থপূর্ণভাবে খ্রীষ্টের বিষয়ে বলছেন, যেন তিনি খ্রীষ্টকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছেন (১১ পদ)। "আমি তোমাদের জলে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি কিন্তু যিনি আসছেন, তিনি আমার চেয়েও ক্ষমতাবান।" মনে রাখুন, ধর্মীয় আচারাদি পালনের মাধ্যমে তারা তাদের শাসক-দের চেয়ে আলাদা কিছু বা ভাল বলে নিজেদের মেলে ধরতে সক্ষম হয়নি। তারা কেবল চিহ্নের খোঁজ করতো। তাই খ্রীষ্ট সম্পর্কে যোহনের বলা কথাটা মূলত তাদের উদ্দেশেই নির্দিষ্ট করে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার জন্যই বলা হয়েছে (১ করিন্থীয় ৩:৬; ২ রাজাবলি ৪:৩১): 'যিনি আমার পরে আসছেন তিনি আমার চেয়েও ক্ষমতাবান'। যদিও যোহন নিজেও এলিয়ের আত্মা ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন; যদিও তিনি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অনেক মহান ছিলেন তবুও তিনি নিজেকে খ্রীষ্টের সামনে একেবারে ক্ষমতাশূন্য, অক্ষম হিসেবে নিজেকে নত করেছিলেন; 'কারণ আমি তাঁর জুতা বহনেরও যোগ্য নই'। তিনি এই কথার মধ্য দিয়ে বলতে চেয়েছেন যে,

(১) খ্রীষ্টের সাথে তার কোন তুলনাই চলে না। মনে রাখুন, খ্রীষ্টের বাণী যারা প্রচার করেন তাদের জন্য এটা অত্যন্ত আশার কথা যে খ্রীষ্ট তাদের চেয়ে মহান, ক্ষমতাবান। কারণ তারা যা করতে চেয়েও ব্যর্থ হয় তা তিনি অবশ্যই করতে সক্ষম। খ্রীষ্টের শক্তি তাদের দুর্বলতাকে আড়াল করে রাখে।

(২) তিনি খ্রীষ্টের জুতা বহনেরও যোগ্য নন এই কথার দ্বারা তিনি কতটা অর্থপূর্ণভাবে নিজেকে খ্রীষ্টের সাথে তুলনা করা থেকে বিরত রাখলেন! মনে রাখুন, যারা ঈশ্বরের লোক হবে, তারা বিনয়ী হবে এবং নিজেদের অক্ষম বলে নিচু করবে; তারা মানুষের কাছে অপ-মানিত হতে কুণ্ঠিত হবে না। এর দ্বারাই তাদের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট প্রকাশিত হন; খ্রীষ্টকে সব-

ার কাছে পৌঁছে দেবার জন্য তারা কোন কিছু হতে বা কোন কিছু হারাতে দ্বিধা বোধ করবে না।

২. যোহন এখানে তাদের আকাঙ্ক্ষিত খ্রীষ্টের জন্য প্রস্তুত করছেন, তিনি তাদের কাছে ব্যক্ত করছেন খ্রীষ্টের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য। যখন বলা হল যে, যোহন খ্রীষ্টের সংবাদদাতা হবেন (মালাখি ৩:১,২) তখন তা এ কথাও বলে যে, যাঁকে তোমরা খুঁজছো তিনি হঠাৎ করে পরিশুদ্ধকারীর মতো আসবেন (৩ পদ) এবং ইলিশায় আসবার পর সেই দিনটা আসবে যা চুলার আগুনের মতো জ্বলবে (মালাখি ৪:১)– যাঁর বিষয়ে যোহন ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছেন। খ্রীষ্টের আসবার ফলে যে পার্থক্য তৈরি হবে তা নিরূপিত হবে,

(১) তাঁর অনুগ্রহযুক্ত ক্ষমতাপূর্ণ কাজের মাধ্যমে; 'তিনি তোমাদের বাপ্তিস্ম দেবেন' অবশ্য তোমাদের সবাইকে নয়, কেউ কেউ এই সুযোগ লাভ করবে, তিনি তাঁর পবিত্র আত্মা ও আগুনে বাপ্তিস্ম দেবেন। মনে রাখুন,

(ক) খ্রীষ্টই কাউকে পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দিতে পারেন। যোহন খ্রীষ্টের যে বাপ্তিস্মের বিষয়ে বলেছিলেন তা খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের দিয়েছিলেন (প্রেরিত ১:৫)। আর তিনি তা করেছিলেন তাঁর অনুগ্রহের জন্য, শিষ্যদের চাওয়ার প্রত্যুত্তরে (লূক ১১:১৩; যোহন ৭:৩৮,৩৯; প্রেরিত ১:১৬)।

(খ) যাঁরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম নেয় তারা আগুনেও তা নিয়ে থাকে; প্রকাশিত বাক্যে এ বিষয়ে আমরা দেখতে পাই যে, ঈশ্বরের সাতটি আত্মা আগুনের সাতটি বাতিদানের বেশে দেখা গেল (প্রকাশিত বাক্য ৪:৫)। সেই আগুন কি জ্বলছে? যেহেতু সেই আত্মা হচ্ছে আলোর আত্মা, তাই তা কি চারপাশ উষ্ণ করে তুলছে? তাদের হৃদয় কি এতে পুড়ে যায়নি? এটা কি শেষ হয়ে যাচ্ছে? বিচারের আত্মা আগুনের মতো করে এসে তাদের ভেতরের সমস্ত মন্দতা কি পুড়িয়ে ফেলেনি? এই আগুন কি সবকিছুকে নিজের মতো করে তৈরি করছে না? এবং এটা কি সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে? তাই, পবিত্র আত্মা হৃদয়কে খাঁটি, পবিত্র করে তোলে এবং স্বর্গের দিকেই এর সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে। খ্রীষ্ট বলেন, 'আমি পৃথিবীতে এসেছি আগুন জ্বালাতে' (লূক ১২:৪৯)।

(২) যোহন এখানে ১২ পদে খ্রীষ্টের বিচারের চূড়ান্ত অবস্থার বিষয়ে বলছেন, 'কুলা তাঁর হাতেই আছে।' খ্রীষ্ট ভাল ও মন্দ নিরূপণে সিদ্ধহস্ত; কারণ তাঁর মাঝে রয়েছে স্বর্গীয় জ্ঞান, প্রজ্ঞা। যিনি সত্যিকারের আলোতে সবাইকে দেখতে পান; এবং লোকদের বিচার করার ক্ষমতাও যাঁর হাতে ন্যস্ত হয়েছে। যিনি সেই বিচার করবেন, সেই খ্রীষ্টের হাতে কুলা রয়েছে (যিরমিয় ১৫:৭)। খ্রীষ্টকে এখন আমরা দেখি পরিশুদ্ধকারীরূপে। লক্ষ্য করুন,

(ক) যে মন্দির দেখা যায় তা খ্রীষ্টের; হে আমার লোকেরা, তোমাদের তো ফসলের মতো মাড়াই করা হয়েছে (যিশাইয় ২১:১০)। সে সময় মণ্ডলীর মতো ঘরে ফসল মাড়াই করা হতো।

(খ) গম থেকে তুষ বের করে নেওয়ার জন্য ফসল মাড়াই করা হতো। সত্যিকারের বিশ্বাসীরা হচ্ছেন গমের মতো– যা কাজে লাগে এবং মূল্যবান; কিন্তু যারা ভণ্ড তারা হচ্ছে তুষের মতো যা হালকা, ফাঁকা, অপ্রয়োজনীয়– মোটকথা যাকে বাহুল্য বলে গণ্য করা হয়। ভাল-মন্দের এই মিশেল থেকেই খ্রীষ্ট তাঁর কুলা দ্বারা তুষ অর্থাৎ ভণ্ডদের থেকে গম মানে খাঁটি, পবিত্রজনদের আলাদা করবেন।

(গ) সেই দিনটি আসছে যখন ফসল মাড়াই করবার জায়গাকে বিশুদ্ধ করা হবে এবং

যেদিন গম আর তুষকে আলাদা করা হবে। এর কিছু কিছু অবশ্য ঈশ্বর এই পৃথিবীতেই সম্পন্ন করে থাকেন; বাবিলের বন্দীত্ব থেকে ঈশ্বর যেভাবে ইস্রায়েলকে বের করে আনলেন সে বিষয়ে ভাবুন (প্রকাশিত বাক্য ২৮:৪)। কিন্তু এটা হচ্ছে বিচারের দিনে ঈশ্বরের পার্থক্য নিরূপণের মহান দিন। যেদিন ঈশ্বর কেবল কাজ দেখবেন (১ করিন্থীয় ৩:১৩) এবং তাঁর লোকদের খুঁজে নেবেন (২৫:৩২,৩৩ পদ)। সেদিন চিরকালের জন্য পাপী ও ধার্মিক লোকদের আলাদা করা হবে।

(ঘ) স্বর্গ হচ্ছে সেই শস্যাগার যেখানে খ্রীষ্ট ফসল থেকে গম বেছে নিয়ে জমা করবেন, যেখান থেকে কারও হারিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। তিনি সেখানে পরিপক্ক ফল হিসেবেই তাদের জমা করবেন। মৃত্যুর মাধ্যমে লোকেরা একত্রিত হয়। স্বর্গে ধার্মিকেরা একসাথে থাকবে এবং কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না; কারণ সেখানে তারা নিরাপদে থাকবে। তাদেরকে বেশিদিন পাপী প্রতিবেশীদের সংস্পর্শে থাকতে হবে না, শীঘ্রই তাদের আলাদা করা হবে। তাদেরকে নিশ্চিতভাবেই আগুনে পোড়ানো হবে না (১৩:৩০ পদ); বরং তাদের স্বর্গের শস্যাগারে রাখা হবে।

(ঙ) নরক হচ্ছে লোভী আগুনের মতো। তুষ অর্থাৎ সেই ভণ্ডদের, অবিশ্বাসীদের সেই শিখা অনির্বাণে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে তারা চিরকাল ধরে ধ্বংস হতে থাকবে। তাই আমাদের সামনেই রয়েছে বেছে নেওয়ার সুযোগ– অনন্তমৃত্যু অথবা অনন্তজীবন, ভাল কিংবা মন্দ। সিদ্ধান্ত আমাদেরই, কারণ আমরা এখন শস্যক্ষেত্রে আছি; কিন্তু নিশ্চিতভাবেই ফসল মাড়াইয়ের জন্য একদিন আমাদের একত্রিত করা হবে।

মথি ৩:১৩-১৭

আমাদের প্রভু যীশু এই গালীলেই তার শৈশব থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত (অর্থাৎ ত্রিশ বছর) পুরোটা সময় কাটিয়েছেন। এই জায়গাতেই তিনি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়ে তাঁর শিষ্যদের দেখা দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন এক দীর্ঘ অমারাত্রির পর ধার্মিকতার সূর্য গৌরবের সাথে উদিত হলেন। সময় পূর্ণ হলে পর তিনি তাঁর কাজ শুরু করলেন। এখানে লক্ষণীয় যে তিনি তা করার জন্য যিরূশালেমকে বেছে নিলেন না (যদিও অনুমান করা হয়ে থাকে যে তিনি অন্যদের মতো সেখানে তিনটি উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন), কিন্তু বেছে নিলেন সেই স্থানটিকে যেখানে যোহন বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন। কারণ যোহনের কাছে খ্রীষ্টের প্রতীক্ষায় থাকা লোকেরা আশ্রয় নিয়েছিল। যোহনই ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি খ্রীষ্টকে স্বাগত জানাতে প্রতীক্ষা করছিলেন। যোহন যীশু খ্রীষ্টের চেয়ে বয়সে ছয় মাসের বড় ছিলেন। তাই ধরে নেয়া যায় যে, তিনি খ্রীষ্টের দৃশ্যপটে আবির্ভাবের ছয় মাস আগে থেকেই তাঁর কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি যর্দন ও তার আশপাশের লোকদের তাঁর প্রচারের মাধ্যমে খ্রীষ্টের জন্য প্রস্তুতে এই সময়টা ব্যয় করেছিলেন। তার বয়সে এ রকম কাজ এর আগে আর কেউই করে দেখাতে পারেনি। খ্রীষ্ট বাপ্তিস্ম নেবার জন্য গালীল থেকে যর্দন নদীর ধারে আসলেন; এ থেকে আমরা ঈশ্বরের আদেশের বাধ্য থাকার জন্য আরও পরিশ্রমী এবং কষ্টসহিষ্ণু হবার শিক্ষা পাই। ঈশ্বরের রাজ্যের কাছাকাছি হওয়ার জন্য অনেক দূরের পথ পাড়ি দিতেও আমাদের যেন কোন আপত্তি না থাকে। কারণ যারা খোঁজ করে তারা পায়।

এখন, খ্রীষ্টের বাপ্তিস্ম গ্রহণের ঘটনাটিকে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাই,

ক. খ্রীষ্ট যোহনের কাছে বাপ্তিস্ম নিতে আসলেন। কিন্তু যোহন বিনম্রতার সাথে তা দিতে অস্বীকৃতি জানালেন (১৪, ১৫ পদ)। খ্রীষ্ট এখানে যোহনের কাছে বাপ্তিস্ম নেওয়ার মাধ্যমে নিজেকে নিচু করলেন; কারণ মন পরিবর্তন করার মতো কোন পাপ তিনি করেননি। মনে রাখুন, খ্রীষ্ট যখন এর অব্যবহিত সময়ের পর প্রচার করছিলেন তখন তিনি বিনম্রতার বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন। নিজের এই ঘটনার দৃষ্টান্ত তো তখন সবার চোখে ভাসছিল। তিনি সবাইকে, বিশেষভাবে যারা তাঁর পক্ষে কাজ করবে তাদের বিনম্রতার শিক্ষা দিয়েছিলেন। খ্রীষ্ট সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এখানে নিজেকে নিচু করলেন। মনে রাখুন, যারা সম্মান পেতে আগ্রহী তাদের অবশ্যই নিজেদের নিচু করতে হবে। এর দ্বারা খ্রীষ্ট যোহন এক মহান সম্মান দান করলেন; একটু আগেই যোহন খ্রীষ্ট সম্পর্কে যা বলেছিলেন তার প্রতিদান তাঁর এই কাজের মাধ্যমেই তাঁকে দিলেন। যারা ঈশ্বরকে প্রাপ্য সম্মান দেয় তিনিও তাদের সম্মানিত করেন। এবারে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দেখব,

১. যোহন যীশুকে বাপ্তিস্ম দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন (১৪ পদ)। যোহন তাঁকে নিরস্ত করতে চাইলেন, যেমনটা পিতর করেছিলেন। খ্রীষ্ট যখন পিতরের পা ধুইয়ে দিতে যাচ্ছিলেন তখন তিনি অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন (যোহন ১৩:৬,৮)। মনে রাখুন, অধস্তনদের প্রতি খ্রীষ্টের সম্মান জ্ঞাপনের ব্যাপারটা অবাক করে দেওয়ার মতো। যা দেখে তাঁর শিষ্যরাও গভীর সমস্যায় পড়ে যেত। যারা খ্রীষ্ট সম্পর্কে জানে না, তারাই তার ইচ্ছার অনর্থ করে তা বাস্তবায়ন করতে বাধা দেয়। খ্রীষ্ট সম্পর্কে অন্ধকারে থাকার কারণেই তারা তখন তাঁর কাজে বাধা দিতে উদ্যত হয়। যোহন হয়তো চিন্তা করেছিলেন যে খ্রীষ্টের দেওয়া এই সম্মান এত মহান যে তিনি তা ধারণ করতে পারবেন না। এবং তিনি তা খ্রীষ্টকে বললেনও; যেমনটা তার মা খ্রীষ্টের মায়ের কাছে বলেছিলেন (লূক ১:৪৩): 'আমার প্রভুর মা আমার কাছে এসেছেন এ কেমন করে সম্ভব হল!' যোহনের নাম তখন দিকে দিকে ছড়িয়ে গিয়েছিল এবং তাঁকে সবাই ভাববাদী বলে সম্মান করতো। সেই তিনি কত নম্র হলেন! মনে রাখুন, যারা তাদের নাম-যশের বিপরীতে অনবরত নিজেদের নিচু করেই যেতে থাকেন তাদের জন্য ঈশ্বর এক অভূতপূর্ব সম্মান আলাদা করে রাখেন।

(১) যোহন নিজে খ্রীষ্টের কাছে বাপ্তিস্ম নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন, 'আমারই তো আপনার কাছে বাপ্তিস্ম নেওয়া উচিত'। যোহনের বলা সেই বাপ্তিস্ম ছিল পবিত্র আত্মা এবং আগুনের, খ্রীষ্টের বাপ্তিস্ম যেমনটা ছিল (১১ পদ)।

(ক) যদিও যোহন মায়ের গর্ভে থাকতেই পবিত্র আত্মায় পূর্ণ ছিলেন (লূক ১:৫) তবুও তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, তাঁকেও সেই বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম নেওয়া প্রয়োজন। মনে রাখুন, যাদের মাঝে ঈশ্বরের আত্মা অনেক বেশি পরিমাণে থাকে, তারা তা আরও পেতে আগ্রহী হয় এবং খ্রীষ্টের কাজে তা কাজে লাগাতে সচেষ্ট হয়।

(খ) যোহনের বাপ্তিস্ম নেবার প্রয়োজন ছিল কারণ তিনিও নারীর গর্ভে জন্মেছেন এবং এর মাধ্যমে তাঁর মাঝে অব্রাহামের অন্যান্য বংশধরদের মতোই পাপের বীজ প্রবেশ করেছিল; যদিও তাঁর জন্ম ছিল এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। মনে রাখুন, খাঁটি আত্মা সর্বদাই তাঁর দোষ খুঁজে পেতে সচেষ্ট থাকে এবং তা পরিষ্কার করতেও তৎপর হয়।

(গ) খ্রীষ্টের কাছ থেকে তাঁর বাপ্তিস্ম নেওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল। এই বাপ্তিস্ম কেবল খ্রীষ্টই আমাদের দিতে পারেন যা অন্য কেউ দিতে পারে না। খ্রীষ্টের কাছ থেকে বাপ্তিস্ম

নেওয়ার জন্য সবারই সতৃষ্ণ ইচ্ছা থাকা প্রয়োজন।

(ঘ) সাধারণ লোকদের সামনে যোহন একথা বলেছিলেন– যারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করতে উদগ্রীব হয়েছিল; এই লোকেরা তাঁকে ভাববাদী বলে মানতো আর তাদের সামনেই তিনি একথা বললেন যে, যীশুর কাছে তাঁর বাপ্তিস্ম নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

(চ) যোহন ছিলেন খ্রীষ্টের অগ্রদূত এবং তারপরও তিনি বলেছেন যে, তার বাপ্তিস্ম নেওয়া প্রয়োজন। মনে রাখুন, এমনকি এই লোকেরা, যারা খ্রীষ্টের আগে জন্মেছিল তারা তার ওপর নির্ভর করেছিল, তার কাছ থেকে বাপ্তিস্ম নিয়েছিল এবং তার ওপর তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল।

(ছ) এই যোহনই একটু আগে লোকদের বাপ্তিস্মের বিষয়ে বলছিলেন, আর এখন তিনি কতটা অনুভবের সাথে খ্রীষ্টকে বলছেন, 'আমার আপনার কাছ থেকে বাপ্তিস্ম নেওয়া প্রয়োজন'। মনে রাখুন, খ্রীষ্টের প্রচারকেরা যখন প্রচার করেন তখন যেন ব্যাপারটা এমন হয় যে তারা নিজেদের কাছেই প্রচার করছেন; আর অন্যদের বাপ্তিস্ম দেওয়ার সময় নিজেদের আত্মা কতটা সমৃদ্ধ হল সে বিষয়ে চিন্তা করেন। খ্রীষ্টের কাজ করার জন্য প্রথমে নিজেকে রক্ষা করা জরুরি– বদলে যাও, বদলে দাও (১ তিমথীয় ৪: ১৬)।

(২) খ্রীষ্ট তার কাছে বাপ্তিস্ম নেবেন এটা ভাবতেই তিনি বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন, যা তার কথাতেই পরিষ্কার বুঝা যায়, 'আমার কাছে?' যীশু, যিনি নিষ্পাপ, তিনিই একজন পাপীর কাছ থেকে বাপ্তিস্ম নেবেন; তা-ও পাপীরা যেভাবে নেয় সেভাবে, এমনকি পাপীদের সামনে? এটা কীভাবে সম্ভব? একে আমরা কী বলে আখ্যায়িত করব? মনে রাখুন, আমাদের কাছে খ্রীষ্টের আগমনটাই তো মহা বিস্ময়ের।

২. যোহনের এই কথার প্রত্যুত্তরে যীশু বললে, 'ঈশ্বরের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এইবার এরকমই হোক। খ্রীষ্ট যোহনের বিনম্রতাকে গ্রহণ করেছিলেন, প্রত্যাখ্যানকে নয়। তিনি তার নিজের মতো করে এই প্রক্রিয়াকে বেছে নিয়েছিলেন যদিও আমাদের কাছে তা খুব আশ্চর্য লাগে; আমরা তা বুঝে উঠতে পারি না, কোন কারণও দেখাতে পারি না। দেখুন,

(১) যীশু খ্রীষ্ট কীভাবে তা করার জন্য যোহনকে অনুপ্রাণিত করলেন; 'এইবার এমনটাই হোক'। যোহন যে তাঁর কাছে বাপ্তিস্ম নিতে চেয়েছেন তিনি কিন্তু তা দিতে অস্বীকৃতি জানান নি; যদিও তিনি তাঁর কাছ থেকেই বাপ্তিস্ম নিলেন। মনে রাখুন, সময়ে সবকিছুই সুন্দর দেখায়। কিন্তু এখন কেন? তবু কেন?

(ক) খ্রীষ্ট নিজেকে নিঃস্ব, নিচু করলেন, কোন সম্মান তিনি নিতে চাইলেন না। আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করতে মানুষের বেশে পৃথিবীতে তাঁর আগমন সত্ত্বেও তিনি ছিলেন নিষ্পাপ; ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ীই তিনি বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন, পাপ থেকে পরিশুদ্ধ হওয়ার জন্য নয়।

(খ) যোহনের বাপ্তিস্মদানের বিষয়টি এখন আলোতে এল। এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে ঈশ্বরের পরিকল্পনাই ছিল এমন। খ্রীষ্ট যোহনের কাছে বাপ্তিস্ম নিলেন কিন্তু তাঁর পবিত্র আত্মা ও আগুনে তাঁর বাপ্তিস্ম তাঁর শিষ্যেরা অনেক পরে পেয়েছিল (প্রেরিত ১:৫)। ঈশ্বরের-নিরূপিত সময় বলেই এবারে এমনটি ঘটলো এবং এর দ্বারা যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তারা হয়েছিল উদ্দীপিত। মনে রাখুন, যারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেছে তাদের শান্তিপূর্ণ, ধার্মিকতার জীবনই অন্যদের কাছে সর্বোৎকৃষ্ট প্রচার। যেটা আমরা আমাদের

প্রভুর জীবনে দেখি। আমাদের অনুরূপ কাজ করা উচিত। খ্রীষ্টের কাছ থেকে 'এবার এমনটাই হোক' শুনে যোহন তাঁকে বাপ্তিস্ম দিতে সম্মত হলেন।

(গ) 'এইবার,' কারণ খ্রীষ্ট এখন লোকদের দেখা দিতে যাচ্ছেন এবং তাঁর জন্য এটাই সুবর্ণ সুযোগ (যোহন ১:৩১-৩৪)। এভাবে তিনি ইস্রায়েলের জন্য একটি ইশতেহার তৈরি করবেন এবং স্বর্গীয় বিস্ময় দ্বারা চিত্রিত হবেন। কারণ নিজেকে নম্র করার মাধ্যমে তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন তা ছিল সত্যিই আশ্চর্যের।

(২) খ্রীষ্ট যোহনের কাছ থেকে বাপ্তিস্ম নেওয়ার পেছনে যে কারণটি ব্যক্ত করলেন তা এই: 'ঈশ্বরের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য।' মনে রাখুন,

(ক) খ্রীষ্ট আমাদের জন্য যা কিছু করেছিলেন তার সবই ছিল অনুগ্রহে পূর্ণ (ইব্রীয় ২:১০; ৭:২৬)। আমরা তাঁর সেই কাজ সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়ন করব কেবল জানার জন্য বা বিস্ময়াভিভূত হওয়ার জন্য নয়, বরং সেরকমটা হওয়ার জন্য। এটা আমাদের প্রয়োজন, এটা চাপিয়ে দেওয়ার কিছু নয়; কারণ সেই জীবন ভালবাসায় পূর্ণ; আর তা আমাদের জন্য ভাল বলে আমাদেরকে তা লোকদের স্বীকৃতি পেতে সাহায্য করে।

(খ) আমাদের প্রভু যীশুর দৃষ্টি ঈশ্বরের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিকে নিবদ্ধ ছিল যা (ড. হুইটবি এটি ব্যাখ্যা করেছেন) তাঁকে স্বর্গের সমস্ত ক্ষমতা পেতে সাহায্য করবে এবং যার দ্বারা তিনি দেখাতে সমর্থ হয়েছিলেন যে ঈশ্বরের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিনি কতটা নিষ্ঠ, একাগ্র। যোহনকে নিজের আগে পাঠিয়ে তিনি তাঁর অপরিসীম প্রজ্ঞার প্রমাণ দিয়েছিলেন। খ্রীষ্ট প্রায়শই যোহন ও তাঁর কাজের বিষয়টি সম্মানের সাথে উল্লেখ করেছেন। কারণ তিনি নিজেও তাঁর কাছে বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন; যদিও তিনি নিজেই ছিলেন শ্রেষ্ঠ বাপ্তিস্ম দাতা। এভাবেই যীশু তাঁর প্রথম পদক্ষেপটি রাখলেন; তারপরেই লোকদের শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। তাঁর প্রচারকদেরও অবশ্য সেই একই নিয়ম অনুসরণ করা উচিত। খ্রীষ্ট এইভাবেই ঈশ্বরের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যোহনের কাছে বাপ্তিস্ম নিলেন। তিনি জলে বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন যেমনটা তাঁর শিষ্যদেরও করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর দ্বারা তিনি এই ঘটনাকে সম্মান জানালেন এবং সবার কাছে এর মাহাত্মকে তুলে ধরলেন। খ্রীষ্ট যোহনের কাছ থেকে বাপ্তিস্ম নিলেন কারণ তা ছিল স্বর্গীয় নিয়োগ; কিন্তু তিনি ফরীশীদের হাত ধুয়ে ফেলাকে গ্রহণ করেননি, কারণ তা ছিল লোকদেখানো নিয়মমাত্র। তিনি তাঁর শিষ্যদের এই রকম কাজ করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আর এই কারণেই যোহন খ্রীষ্টের ইচ্ছামতো তাঁকে বাপ্তিস্ম দিতে সম্মত হয়ে-ছিলেন। যে বিনয়ের কারণে তিনি প্রথমে খ্রীষ্টকে বাপ্তিস্ম দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, খ্রীষ্টের কাছ থেকে পাওয়া সেই একই বিনম্রতার কারণে তিনি পরবর্তীতে তাঁর এই আবেদনে সাড়া দিলেন। মনে রাখুন, আমরা যেন কখনো বিনয়ের ভান না করি; কারণ তা করলে আমরা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে পারব না।

খ. এখানে ১৬ এবং ১৭ পদে আমরা দেখি যে তা কত গাম্ভীর্যের সাথে স্বর্গীয় অনুগ্রহে সিক্ত হল; প্রকাশিত হল ঈশ্বরের গৌরব; 'যীশু যখন বাপ্তিস্ম নিয়ে জল থেকে উঠে আসছিলেন'। অন্যরা যেখানে বাপ্তিস্ম নেওয়ার সময় সেখানে পাপ স্বীকারের জন্য অপেক্ষা করছিল (৬ পদ) সেখানে তিনি সত্বর জল থেকে উঠে আসলেন; যেমনটা আমরা পড়লাম। তিনি জল থেকে, নদীর কিনারা থেকে উঠে আসলেন। আর সেই জলে মুখ ও মাথা (যোহন ১৩:৯) ধৌত করে তিনি সোজা উঠে আসলেন। এখানে যদিও তাঁর পোশাকের সম্পর্কে

কোন কিছু উল্লেখ করা হয়নি, তবুও এটা তো ঠিক যে, যদি তিনি খালি গায়ে বাপ্তিস্ম নিতেন তবে তার উল্লেখ থাকত। তিনি এমন একজনের মতো করে জল থেকে উঠে আসলেন যিরি তাঁর কাজ শুরু করতে চলেছেন। নষ্ট করার মতো সময় তাঁর ছিল না; ঈশ্বরের ইচ্ছা বাস্তবায়নে তাঁর সময়নিষ্ঠা ও একাগ্রতা এখানে পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে।

তিনি যখন জল থেকে উঠে আসছিলেন তখন সবগুলো কৌতূহলী চোখ তাঁর উপর নিবদ্ধ হয়ে ছিল, আর তখন–

১. যেভাবে মূল্যবান কিছু আবিষ্কার করা হয় ঠিক সেভাবে 'তাঁর সামনে আসমান খুলে গেল'। কারণ তিনি ছিলেন সত্যিই মূল্যবান কিছু। আর এটা ঘটেছিল–

(ক) খ্রীষ্টকে তাঁর কাজের দিকে অগ্রসর হতে উৎসাহিত করার জন্য ঈশ্বর তাঁর গৌরবের স্মারক হিসেবে, যে গৌরব ও সম্মান তাঁরই। স্বর্গ নিজেকে উন্মুক্ত করে তাঁকে গ্রহণ করল এবং তাঁরই কাছে নিজেকে নিবেদন করল। পৃথিবীতে তাঁর কাজ সমাধা করে খ্রীষ্ট এখন সেখানেই অবস্থান করছেন।

(খ) যেন আমরা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার জন্য, তাঁর কাছে নিজেদের সমর্পণ করতে উৎসাহিত হই। মনে রাখুন, কেবল খ্রীষ্টের মধ্য দিয়েই স্বর্গ মানব-সন্তানের জন্য অবমুক্ত হল। পাপ মানুষকে ঈশ্বরের সহভাগিতা থেকে বঞ্চিত করে মানুষের সাথে স্বর্গকে বিচ্ছিন্ন করেছিল, কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর বিশ্বাসীদের জন্য সেই স্বর্গের দরজা খুলে দিলেন। স্বর্গীয় আলো এবং ভালবাসায় পৃথিবীর মানুষ সিক্ত হল। খ্রীষ্ট তাঁর পবিত্রতায় আমাদের পবিত্র করলেন; সে কারণেই আমাদের পবিত্র জীবন যাপনে আরও যত্নবান হতে হবে। ঈশ্বর আমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তার প্রতিদানে আমাদের তাঁকে ভাল কাজ উপহার দিতে হবে; আর যীশু খ্রীষ্টের দ্বারাই আমরা তা করতে সক্ষম হই, তাঁকে ছাড়া আমরা কিছুতেই ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ সম্বন্ধ রাখতে পারি না। কারণ তাঁর পা পৃথিবীতে আর মাথা স্বর্গে। খ্রীষ্ট বাপ্তিস্ম নেওয়ায় স্বর্গ খুলে গেল। এই ঘটনা আমাদের এই শিক্ষা দেয়, যেন আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা বাস্তবায়নে সব সময় তাঁকেই গুরুত্ব দেই। তাঁর সাহায্য কামনা করি।

২. 'তিনি পবিত্র আত্মাকে কপোতের ন্যায় তাঁর উপর নেমে আসতে দেখলেন'। খ্রীষ্ট এটা দেখেছিলেন (মার্ক ১:১০); যোহন তা দেখেছিলেন (যোহন ১:৩৩,৩৪); এবং এটা অনুমিত যে সেখানে দণ্ডায়মান সবাই তা প্রত্যক্ষ করেছিল। এর মাধ্যমে লোকদের সামনে খ্রীষ্টের অভিষেক উদযাপিত হল। লক্ষ্য করুন,

(১) তিনি দেখলেন ঈশ্বরের আত্মা নেমে আসলেন ও তাঁর উপর বসলেন। সৃষ্টির শুরুতে ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে ঘোরাফেরা করছিলেন (আদি ১:২)। কিন্তু এখানে নতুন সৃষ্টির শুরুতে খ্রীষ্ট, ঈশ্বর হিসাবে, তাঁর আত্মা গ্রহণ করবার যে প্রয়োজন ছিল তা নয় কিন্তু তাঁর উপর আত্মা নেমে আসবেন সেই কথা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল বলে তিনি নেমে এসেছেন (যিশাইয় ১১:২)।

এখানে যে কারণে আত্মা নেমে এসেছিলেন: (ক) তিনি একজন ভাববাদী হবেন; আর ভাববাদীরা সব সময়েই ঈশ্বরের আত্মার সাহায্যে কথা বলে থাকেন। খ্রীষ্ট তাঁর ভাববাদী পদের কাজ করে থাকবেন। এটা হয়েছিল তাঁর ঈশ্বর সত্ত্বার কারণে নয় কিন্তু পবিত্র আত্মার অভিষেকের কারণে। (খ) তিনি মণ্ডলীর প্রধান বা মস্তক হবেন; তাঁর উপর আত্মা নেমে এসেছিল কারণ যেন সমস্ত বিশ্বাসীগণ তাঁর মধ্যে দিয়ে তা লাভ করেন; তাঁর অনুগ্রহে, দান হিসাবে, সান্ত্বনাদানকারী হিসাবে বিশ্বাসীগণ তা লাভ করে। তিনি মানুষের জন্য দান গ্রহণ

করেছেন যেন তিনি বিশ্বাসীদের দান দিতে পারেন।

(২) পবিত্র আত্মা তাঁর ওপর কপোতের ন্যায় নেমে আসলেন; সত্যিকারের কপোতই তাঁর ওপর নেমে এসেছিল, না এটা কেবল একটা দর্শন ছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। লূক ৩:২২ পদে আমরা দেখি যে, পবিত্র আত্মা কপোতের আদলে আসলেন। পবিত্রতার প্রতীক সেই কপোত খ্রীষ্টের ওপর নেমে এসেছিল কারণ সেখানে 'পবিত্রতার ভার' বহনের যোগ্য আর কেউ ছিল না, কেবল তিনি ছাড়া। তাঁর সম্মানেই স্বর্গ খুলে গেল এবং তাঁকে সম্মান জানাতে, তাঁর পবিত্রতার কথা ঘোষণা করতে পবিত্র আত্মা কপোতের ন্যায় তাঁর ওপর নেমে আসলেন।

(ক) খ্রীষ্টের আত্মা কপোতের ন্যায় শুভ্র, যা পবিত্র; তা কোন হৃদয়হীন সাধারণ কপোত নয় (যিহোশূয় ৭:১১)। পবিত্র আত্মা কপোতের ন্যায় আসলেন, তিনি ঈগলের ন্যায় আসলেন না। এই কপোত ছিল রাজকীয়, নিখুঁত এবং নিষ্কলুষ। শ্বেত-শুভ্র কপোতের আদলে আসাটাকেই পবিত্র আত্মা বেছে নিলেন। এর দ্বারা আমরা যীশু খ্রীষ্টের আত্মিক পবিত্রতাই ঘোষিত হয়েছিল: তিনি কাঁদলেন না, কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হলেন না; যেমনটা প্রত্যেক খ্রীষ্টানরই হওয়া উচিত। কপোতের একটি বিশেষত্ব হচ্ছে তার চোখ; যেমনটা খ্রীষ্টের বিষয়ে বলা হয়েছিল, 'তাঁর চোখ স্রোতের ধারের একজোড়া কপোতের ন্যায়' এবং ঈশ্বরের মণ্ডলী সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছিল 'তোমার চোখ দু'টো কপোতের ন্যায়' (শলোমন ৫:১২; ১:১৫ এবং ৪:১)। কপোত সাধারণত কাতর স্বরে ডেকে থাকে (যিশাইয় ৩৮:১৪)। 'কপোত' খ্রীষ্টের পবিত্রতার স্বরূপ এবং তিনি যে তাঁর সন্তানদের জন্য উতলা হয়ে ভাবেন– সেটাই মূর্ত করে তোলে।

(খ) যিহূদী সমাজে পাখিদের মধ্যে একমাত্র কপোতকেই উৎসর্গের জন্য নেওয়া হতো (লেবীয় ১:১৪) এবং খ্রীষ্টও ঈশ্বরের চোখে নির্দোষ, নিষ্কলুষ ছিলেন যাঁর কথা তাঁর ওপর নেমে আসা কপোত ঘোষণা করে।

(গ) কপোতকে আমরা দেখি আনন্দের সংবাদদাতা হিসেবে। নোহের সময় এই কপোতই বন্যার জল নেমে যাওয়ার সংবাদ এনে দিয়েছিল। তাই খ্রীষ্টে আমাদের যে অপরিসীম আনন্দ রয়েছে, তাঁর মধ্য দিয়েই যে আমরা ঈশ্বরের কাছে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ পাই - সেই সুখবরের সংবাদবাহক হিসেবেই 'কপোত' খ্রীষ্টের ওপর নেমে এসেছিল। স্বর্গ থেকে ভেসে আসা এরপরের কথাতেই যা আরও মূর্ত হয়ে ওঠে।

৩. খ্রীষ্টের ওপর কপোতের নেমে আসার ঘটনাটিকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে স্বর্গ থেকে একটি আওয়াজ ভেসে এল। সেখানে যারা উপস্থিত ছিল তারা যে এই কথাটি শুনতে পেয়েছিল– তা ভাবার মতো কারণ আমাদের হাতে রয়েছে। পবিত্র আত্মা কপোতের ন্যায় খ্রীষ্টের ওপর নেমে আসার মাধ্যমে যে ইশতেহার ঘোষিত হয়েছিল তা পিতা-ঈশ্বরের কণ্ঠস্বরে নতুন এক মাত্রা পেয়ে পরিপূর্ণতা পেল। পুরাতন নিয়মে আমরা দেখি যে ঈশ্বর যখন মোশিকে ব্যবস্থা দিচ্ছিলেন তখন লোকেরা কিছু দেখতে না পেলেও একটা আওয়াজ শুনেছিল (দ্বিতীয় বিবরণ ৪:১২); এবং এভাবেই ঈশ্বরের সেই সুসমাচারের বাণী স্বর্গ থেকে ভেসে এল। ঈশ্বরের একথা তো সুসমাচারই, কারণ ঈশ্বর যে এখানে খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর সন্তুষ্টির বিষয়টি প্রকাশ করেছিলেন। কোন দ্বিধা, জড়তা সেই কণ্ঠে ছিল না, বরং তা ছিল নিশ্চিন্ত, সত্য ও পূর্ণ মূল্যায়ন– স্বর্গীয় অভিব্যক্তি।

(১) এখানে আমরা দেখতে পাই, ঈশ্বর খ্রীষ্টকে কতটা নিজের বলে স্বীকার

করেছিলেন, 'ইনিই আমার প্রিয় পুত্র। লক্ষ্য করুন,

(ক) ঈশ্বর এখানে খ্রীষ্টকে নিজের সন্তান বলে আখ্যায়িত করেছেন। খ্রীষ্ট ছিলেন ঈশ্বরের আত্মিক পুত্র, যা রচিত হয়েছিল আত্মার প্রজন্ম দ্বারা; তিনি তাঁর পিতার সাথে পৃথিবী সৃষ্টির আগে থেকেই ছিলেন (কলসীয় ১:১৫; ইব্রীয় ১:৩)। খ্রীষ্টকে ঈশ্বর তাঁর পুত্র বলে সম্বোধন করেছিলেন কারণ তিনি পবিত্র আত্মার কুদরতিতে ঈশ্বরের পরিকল্পনায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন (লূক ১:৩৫)। কেবল এইটুকুতেই সব বলা হল না; তিনি ঈশ্বরের পরিকল্পনার বাস্তবায়নকারী হিসেবে এই পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন, যেন মানুষকে পাপের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা যায়। তিনি ঈশ্বরের সাথে কাজের সূত্রেও পিতা-পুত্রের সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন। ঈশ্বরই ছিলেন খ্রীষ্ট-সম্পর্কিত সমস্ত পরিকল্পনার কারিগর (হিতোপদেশ ৮:৩০)। তিনি খ্রীষ্টকে প্রথমজাত সন্তানের মতো করে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন (গীত ৮৯:২৭)।

(খ) ঈশ্বরের সাথে তাঁর সম্পর্কের গভীরতার বিষয়টিও 'প্রিয় পুত্র' সম্বোধনে প্রকাশ পায় (কলসীয় ১:১৩)। খ্রীষ্টের সাথে তিনি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ (যোহন ১:১৮)। তিনি খ্রীষ্টের সামনে সবসময় আনন্দিত ছিলেন (হিতোপদেশ ৮:৩০)। কিন্তু আলাদাভাবে তিনি ঈশ্বরের সাথে মানুষের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। আক্ষরিক অর্থেই তিনি ছিলেন ঈশ্বরের প্রিয় পাত্র, যাঁর ওপর ঈশ্বর সন্তুষ্ট ছিলেন (দেখুন যিশাইয় ৪২:১)। এর কারণ খ্রীষ্ট ঈশ্বরের অনুগ্রহের চুক্তিকে বাস্তবায়ন করবেন (যোহন ১০:১৭; ৩:৩৫)। দেখুন, ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার প্রকাশ হিসেবে তাঁর সন্তানকে পাঠালেন। যিনি নিজেকে উৎসর্গ করে আমাদের ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক গড়ার সুযোগ করে দিলেন।

(২) দেখুন, ঈশ্বর আমাদেরকে নিজের করে নেওয়ার জন্য কতটা ব্যগ্র তা আমরা খ্রীষ্টকে এই পৃথিবীতে পাঠানো থেকে বুঝতে পারি। যারা তাঁর কাছে আসে, যারা প্রকৃতই তাঁর, তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। পাপের কারণে মানুষের ঈশ্বরের কাছ থেকে যে ক্রোধ পাওনা হয়েছিল তা এখন খ্রীষ্টের মাধ্যমে দূরীভূত হয়েছে (ইফিষীয় ১:৬)। খ্রীষ্ট সম্বন্ধে ঈশ্বর এই ঘোষণার মাধ্যমে খ্রীষ্টকে দেওয়া তাঁর সর্বময় কর্তৃত্বের কথা ব্যক্ত করলেন। আর কেউ নেই যার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের কাছে যেতে পারি; কেবল খ্রীষ্টই আছেন, যিনি মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যস্থতাকারী (যোহন ১৪:৬)। তাঁর মাধ্যমেই আমাদের সমস্ত আত্মিক উৎসর্গ গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে; আর এই উৎসর্গ ঈশ্বরের কাছে খুবই মূল্যবান (১ পিতর ২:৫)। খ্রীষ্ট ছাড়া আমরা এমন ঈশ্বরকে দেখি যিনি আগুন জমা করে রাখেন কিন্তু খ্রীষ্টে আমরা তাঁকে মমতাপূর্ণ পিতা হিসেবে পাই। এটাই হচ্ছে পুরো সুসমাচারের সারকথা; ঈশ্বর স্বর্গ থেকে খ্রীষ্ট সম্পর্কে বলেছেন যে, ইনিই আমার প্রিয় পুত্র– তা প্রকৃতই সত্য, বিশ্বাস্য; আমরা তাঁর ওপর আস্থা রাখব যাঁর উপর ঈশ্বর সন্তুষ্ট বলে মূল্যায়ন করেছেন। খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমেই আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে একথা বলতে পারি যে, 'ইনিই আমাদের পরিত্রাণকর্তা, যিনি আমাদের মুগ্ধতাকে ছাপিয়ে গিয়েছেন। তাঁর প্রতি আমাদের সন্তুষ্টির কোন সীমা-পরিসীমা নেই।'

মথি লিখিত সুসমাচার
অধ্যায় ৪

বাপ্তিস্মদাতা যোহন খ্রীষ্টকে তাঁর চেয়ে 'মহান' আখ্যা দিয়ে বলেছিলেন যে, তাঁর সামনে তিনি নিস্প্রভ এবং তাঁর পথ প্রস্তুত করার জন্যই তাঁর আসা। খ্রীষ্ট যেন তাঁর কাজ শুরু করতে পারেন সেজন্য যোহন আগে থেকেই তাঁর কাজের ক্ষেত্র গুছিয়ে নিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে একদিকে যেমন খ্রীষ্ট তাঁর কাজ শুরু করলেন তেমনি অপরদিকে যোহন তার কাজ থেকে অব্যাহতি নিলেন। কারণ তিনি তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। এখন খ্রীষ্টের পালা। খ্রীষ্টকে দেওয়া যোহনের বাপ্তিস্ম ও সাক্ষ্যের পরের ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণ করলে আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত হই। কারণ এরপরের ভাগে শুধুই যীশু খ্রীষ্ট; উদিত সূর্যের ক্রমশ এগিয়ে যাওয়া আর ভোরের তারার নিস্প্রভ পশ্চাদ যীশুরণ। এই প্রমাণিত সত্যকে প্রত্যক্ষ করে আমরা নতুন একটি অধ্যায়ে প্রবেশ করেছি, যেখানে খ্রীষ্টের এগিয়ে যাবার বিষয়েই বলা হয়েছে;

১. তাঁকে পাপে ফেলার জন্য শয়তানের চেষ্টা; দেহের কামনা, সাংসারিক বিষয়ে অহংকার এবং চোখের লোভ– এই তিনটি মৌলিক বিষয়কে উপজীব্য করে তাঁর উদ্দেশ্যে শয়তানের ছুঁড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জ; প্রত্যুত্তরে শয়তানকে সমুচিত উত্তর দিয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রেই খ্রীষ্টের গৌরবের সাথে উৎরে যাওয়া (১-১১ পদ)।
২. যীশু খ্রীষ্ট লোকদের শিক্ষা দিতে শুরু করলেন; শিক্ষাদানের জন্য তিনি যেসব স্থান বেছে নিলেন (১২-১৬ পদ) এবং যে বিষয়ে তিনি প্রচার করলেন (১৭ পদ)।
৩. খ্রীষ্ট যাঁদের তাঁর শিষ্য হতে আহ্বান করলেন– পিতর, আন্দ্রিয়, যাকোব ও যোহন (১৮-২২ পদ)।
৪. অনেক রোগী তাঁর হাতে সুস্থ হল (২৩, ২৪ পদ) এবং খ্রীষ্টের শিক্ষায় ও তাঁর আরোগ্যদায়ী হস্তে নিজেদের ঋদ্ধ ও সুস্থ করতে তাঁর সামনে বিপুল জনতার উপস্থিতি (২৫ পদ)।

মথি ৪:১-১১

মানুষ ও সাপের শত্রুতা চিরন্তন। যুগ যুগ ধরে চলে আসা এই দ্বৈরথে কখনো মানুষ জয়ী হয়েছে, কখনো সাপ। বিষাক্ত সাপের ছোবলে মানবসন্তান কখনো যন্ত্রণায় কাতরিয়েছে, আবার কখনো তীব্র আক্রোশে থেঁতলে দিয়েছে সাপের মাথাটিকেই। সাপের সাথে মানুষের চিরশত্রুতার এই ইতিহাসকে উপজীব্য করে এক বিখ্যাত গল্প আপনাদের সামনে পরিবেশন করছি। মানবসন্তান মিখায়েল সাপেরই এক ভয়ংকর প্রজাতি ড্রাগনের মুখোমুখি হয়েছে। একে সাক্ষাত সাপ বললেও মোটেই অত্যুক্তি হয় না! হাতাহাতি লড়াইয়ের এক পর্যায়ে ড্রাগনের প্রলোভনে সাড়া দিয়ে মিখায়েল তার পায়ে বিষাক্ত ছোবল খেয়ে বসেছে; সে অপেক্ষা করছে কখন এই বিষ সারা শরীরে ছড়িয়ে যাবে। ভীষণ ভয়ে তার চোখমুখ শুকিয়ে আসছে। অপরদিকে ড্রাগনও শান্তিতে নেই। 'মানবসন্তানকে

কামড়েছি' বলে কোথায় সে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করবে– তা না। থেঁতলে যাওয়া মাথা নিয়ে সে কেবল তার দেহ, লেজ প্রচণ্ড আক্ষেপে মোচড়ামুচড়ি করছে। মিখায়েল তার মাথাটা একেবারে চূর্ণ করে দিয়েছে! এই কাহিনীতে উভয় পক্ষেরই ক্ষতি স্বীকার করার যে বার্তা আমরা পাই, তা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দিয়েছিলেন। পৃথিবীতে তিনি কেবল বিজয়ী হতেই এসেছিলেন। নিজের বিজয় নিশ্চিত করাটাই তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল না উপরন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে অক্ষত রাখতেও তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের জন্য শয়তানের বিরুদ্ধে এই আরাধ্য বিজয় এনে দিয়েছিলেন। খ্রীষ্টের ওপর নেমে আসা শয়তানের প্রলোভনের ঘটনাটিকে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাই:

ক. ঘটনার সময়: 'তখন' শব্দটির ওপর এখানে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। খ্রীষ্টের সামনে স্বর্গ খুলে যাওয়ার এবং তাঁর ওপর পবিত্র আত্মার নেমে আসার কিছু পরেই আমরা তাঁকে প্রলোভনের মুখোমুখি হতে দেখি। এরই মাঝে তিনি ঘোষিত হয়েছেন 'ঈশ্বরের পুত্র' ও 'পৃথিবীর পরিত্রাণকর্তা' হিসেবে। ফলে তিনি 'তখন' শয়তানের প্রলোভন মোকাবেলায় পুরোপুরি প্রস্তুত। মনে রাখুন,

১. ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমরা যে পরিত্রাণ এবং স্বর্গীয় দয়া লাভ করেছি, তা আমাদের বিভিন্ন প্রলোভনের মুখোমুখি হওয়া থেকে নিবৃত্ত করে না। উপরন্তু

২. ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা থেকে নিরস্ত করতে শয়তান অনেক সময় বিভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে বাধা প্রদান করে থাকে; যেমনটা আমরা পৌলের ক্ষেত্রে দেখি; তৃতীয় আসমানে অবস্থান করেও সেই শয়তান পৌলকে বাধা দিতে তার এক সাগরেদ, ইলুমাকে পাঠিয়েছিল যেন তিনি শাসনকর্তা সের্গিয়– পৌলকে ঈশ্বরের বাক্যের বিষয়ে না বলেন।

৩. ঈশ্বর তাঁর লোকদের শয়তানের সমস্ত পরীক্ষার ওপর বিজয়ী হতে সাহায্য করেন। তিনি তাদের প্রলোভন মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় শক্তি জোগান এবং তাদের আত্মিকভাবে প্রস্তুত করে তোলেন। এর ফলে ঈশ্বরের লোকেরা প্রলোভনের সম্মুখীন হওয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত হয়েই থাকে; কারণ তারা জানে যে প্রলোভনের সময় ঈশ্বরই তাদের রক্ষা করবেন এবং সান্ত্বনা জোগাবেন।

৪. ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া সন্তানের অধিকার আমাদের শয়তানের বিরুদ্ধে প্রলোভনে জয়ী হওয়ার সাহস জোগায়। পবিত্র আত্মা যদি আমাদের ভেতরে বাস করেন তাহলে তিনি আমাদের শয়তানের সমস্ত প্রচেষ্টার সমুচিত উত্তর দিতে সাহায্য করেন। আর এর অন্যথা হলে, অর্থাৎ পবিত্র আত্মা যদি আমাদের সাথে না থাকেন এবং যদি আমরা মন্দ -আত্মা দ্বারা পরিচালিত হই, তবে শয়তানের অপেক্ষাকৃত দুর্বলতম প্রচেষ্টার বিপরীতেও আমরা গুঁড়িয়ে যাব।

খ্রীষ্ট কখন প্রলোভনের মুখোমুখি হলেন– যখন তিনি যোহনের কাছ থেকে বাপ্তিস্ম নিয়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে তাঁর পুত্রত্বের ঘোষণা এবং তাঁর প্রতি ঈশ্বরের সন্তুষ্টিজনিত স্বীকারোক্তি গ্রহণ করে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন 'তখন'। মনে রাখুন, ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভের মাধ্যমে আমরা শয়তানকে আমাদের পরীক্ষা করার আহ্বান জানাই। আমাদের মাঝে যদি ঈশ্বরের আত্মা থাকেন তবেই আমরা এ থেকে নিজেদের সুরক্ষাদানে সক্ষম হই। যেহেতু শয়তানের কাছ থেকে প্রতি মুহূর্তে আক্রমণ আসার সম্ভাবনা রয়েছে, সে কারণেই ঈশ্বরের লোকেরা তাদের সুরক্ষার ঢাল বা সত্যের আত্মাকে আরও বেশি করে

নিজেদের জীবনে কাজ করার সুযোগদানে সচেষ্ট হবে। কারণ তা না হলে শয়তান তার প্রলোভনের অস্ত্র দ্বারা বিশ্বাসীকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না। যীশু খ্রীষ্ট যখন লোকদের ইস্রায়েল জাতির লোকদের সামনে নিজেকে উপস্থাপন করতে শুরু করলেন, 'তখন' শয়তানের প্রলোভন তাঁর সামনে এল– যা তাঁর একাকী থাকাকালীন আসেনি। মনে রাখুন, যারা কেবল ভালই নয় উপরন্তু প্রতিটি পদক্ষেপে যারা ঈশ্বরের ইচ্ছামতো চলতে সচেষ্ট শয়তান তাদের প্রতি তীব্র ঘৃণা পোষণ করে থাকে। তার এই ঘৃণার প্রকাশ কিন্তু আবার একেকজনের কাছে একেক রকম। সবাই যে এক-অভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তা নয় বরং যারা বিশ্বাসে খুবই শক্তিশালী, শয়তান তাদের জন্য আরও কঠিন প্রলোভন নিয়ে আসে। এ বিষয়ে যীশু খ্রীষ্টের উপদেশটি শুনুন (উপদেশক ২:১), 'সন্তানেরা প্রভুর সেবা করতে এসেছ বলে তোমরা নিজেদেরকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত কর।' তাই, তরুণ বিশ্বাসীদের জন্য কী অপেক্ষা করে আছে ও তাদের কীসের মুখোমুখি হতে হবে তা জানুক; এবং তা মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিক।

খ. এখানে আমরা লক্ষ্য করি যে, যীশু খ্রীষ্ট মরুভূমিতে শয়তানের প্রলোভনের মুখোমুখি হয়েছিলেন; এই মরুভূমির ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা না হলেও ধারণা করা হয় যে, খ্রীষ্ট সিনাই মরুভূমিতেই শয়তানের আনীত পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন; কারণ এখানেই মোশি ও এলিয় চল্লিশ দিন উপবাস রেখেছিলেন; আর বন্য জন্তু সম্পর্কে এখানে যেমনটা বলা হয়েছে তা এই মরুভূমির সাথে মিলে যায় (মার্ক ১:১৩) । বাপ্তিস্ম নেবার পর খ্রীষ্ট কিন্তু যিরূশালেমে ফিরে গেলেন না; স্বভাবতই সেখানে গিয়ে তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি মরুভূমিতে কিছুদিন একাকী থাকাকেই বেছে নিলেন। ঠিক সেভাবে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পর আমাদেরও কিছু সময়ের জন্য নিভৃতে, একাকী সময় কাটানো উচিত। তা না হলে আমরা হয়তো বৈষয়িক চিন্তা-ভাবনা, মানবীয় আচরণের মাঝে মিশে গিয়ে 'কী পেয়েছি' সে সম্পর্কে বিস্মৃত হতে পারি। খ্রীষ্ট মরুভূমিতে গেলেন,

১. নিজের সুবিধার জন্য। ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য নীরব ধ্যান খুবই কার্যকরী। নিভৃতে সময় কাটানোর ফলে ধ্যানের মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে সমর্থ হই। এমনকি যাদেরকে সবচেয়ে সক্রিয় দায়িত্ব পালনের জন্য আহ্বান করা হয়েছে তাদেরও ধ্যানের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সাথে অর্থপূর্ণ সময় কাটানো উচিত। এ ছাড়াও যারা মানুষের কাছে ঈশ্বরের বিষয়ে বলতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে না তারাও এরকম নীরবে সময় কাটানোর মাধ্যমে একাকী নিজের মনে চর্চা করতে পারেন। খ্রীষ্ট যখন লোকদের সামনে ঈশ্বরের বিষয়ে শিক্ষা দিতে আসবেন তখন তাঁর সম্পর্কে এমনটা বলা হবে না যে, 'তিনি দীর্ঘদিন দেশের বাইরে ছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়িয়ে এখন তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন,' বরং বলা হবে, 'তিনি মরুভূমিতে নিজের সাথে এবং ঈশ্বরের সাথে কথোপকথন সেরে আসলেন।'

২. তিনি শয়তানকে একটা সুযোগ দিলেন যেন সে তাঁকে পরীক্ষা করতে পারে। মনে রাখুন, উত্তম হৃদয়ের কাছে নির্জনতা যদিও বন্ধুর মতো তবুও শয়তান এই নির্জনতাকেই তার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করতে জানে। যারা ঈশ্বরের সাথে সময় কাটাতে ও নিজেদের সমস্ত পাপ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে নির্জনতাকে বেছে নেয়, তারা যে আত্মিক শত্রুর কাছ থেকে নিরাপদ ও নিষ্কলুষ থাকবে– এমনটা বলা যায় না। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট

নির্জনতাকে বেছে নিলেন,

(১) নিজের বিজয়কে আরও বর্ণাঢ্য করে তোলার জন্য; তিনি তাঁর শত্রুকে সামনে আসার এবং ইচ্ছামতো তাঁকে পরীক্ষা করার সুযোগ দিলেন। তিনি শয়তানকে বোধকরি এ কারণেই সুযোগ দিয়েছিলেন যেহেতু তিনি পৃথিবীর রাজা হওয়াটাকে কিছুই মনে করলেন না। কিন্তু তিনি আমাদের প্রভু হলেন; আর তাই তাঁর কাছে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত যেন তিনি আমাদেরকে শয়তানের সমস্ত প্রলোভনের বিরুদ্ধে জয়ী হতে এবং মন্দ পথ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করেন।

(২) নিজের পবিত্র ও বিনম্র রূপকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য; কারণ আমরা দেখি যে, শয়তান তাঁকে তাঁর শক্তিমত্তার বিষয়ে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। এ বিষয়ে আগেই বলা হয়েছিল, 'আমি একাকী আঙ্গুর-রস করবার গর্তে পড়লাম,' আর কাউকে পেলাম না যে সাহায্য করবার জন্য এসে দাঁড়ায়। বলার অপেক্ষা রাখে না, খ্রীষ্ট শয়তানের পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড়াতে বিন্দুমাত্র সময়ক্ষেপণ করলেন না; আর অপ্রস্তুতও হলেন না।

গ. এবারে আমরা শয়তানের প্রলোভন মোকাবেলায় খ্রীষ্টের প্রস্তুতির বিষয়ে দেখব।

১. পবিত্র আত্মা তাঁকে শয়তানের প্রলোভনের মুখোমুখি হতে চালিত করলেন। অর্থাৎ খ্রীষ্ট তাঁর কাজের দ্বারা শয়তানের প্রলোভনকে ডেকে আনেননি। এই পবিত্র আত্মাই কপোতের রূপ ধরে তাঁর ওপর নেমে এসেছিলেন এবং তাঁকে বিনম্র ও সাহসী করে তুলেছিলেন। মনে রাখুন, এ বিষয়ে আমাদের যত্নবান হওয়া উচিত যেন আমরা নিজে থেকে, নিজেদের কৃতকর্মের জন্য প্রলোভনের সামনে না পড়ি। কিন্তু যদি ঈশ্বর চান এবং আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিক ঘটনার কার্যকারণ পর্যালোচনা করে বুঝতে সমর্থ হই যে, এই প্রলোভন আমাদের পরীক্ষার জন্যই তখন যেন আমরা হতবুদ্ধি না হয়ে আমাদের সুরক্ষার আবরণকে দ্বি-স্তরে রূপ দিই। প্রভুতে সুদৃঢ় বিশ্বাস ও নির্ভরতায় আমাদের নিজেদের শক্তিশালী করে তুলতে হবে। শয়তানের প্রলোভন মোকাবেলায় আমাদের একমাত্র প্রভুর ওপরই নির্ভর করতে হবে; কিন্তু যদি আমরা নিজেদের শক্তিমত্তার ওপর নির্ভর করি তবে নিশ্চিতভাবেই পরাজয়ের সম্মুখীন হই। কারণ তখন ঈশ্বরের আত্মা আমাদের ছেড়ে চলে যান। আর এর মাধ্যমে আমরা শয়তানকে আমাদের জীবনে পরীক্ষা করার জন্য আগ বাড়িয়ে আমন্ত্রণ জানাই। আবার যখন ঈশ্বর আমাদের পরিচালিত করেন তখন আমরা নিশ্চিত হই যে পরীক্ষার সময়েও তিনি আমাদের বিজয়ী হতে সাহায্য করবেন। তিনি আমাদের এমন বিজয় দান করবেন যা অমূল্য-অসাধারণ।

পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টকে শয়তানের প্রলোভনের সামনে দাঁড়াতে প্ররোচিত করেছিলেন; কিংবা এভাবেও বলা যায় যে, খ্রীষ্ট স্বেচ্ছায় শয়তানের প্রলোভনের মুখোমুখি হতে এগিয়ে গেলেন। অন্যরা যেখানে নিজেদের অন্তরের কামনা-বাসনার দ্বারা প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে (যাকোব ১:১৪) এবং নিজেদের জীবনে শয়তানকে কাজ করার আমন্ত্রণ জানায়, সেখানে আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট নিরুদ্বিগ্ন মনে, নির্ভয়ে লড়াকুর মতো শয়তানের প্রলোভনের মুখোমুখি হলেন; কারণ তিনি জানতেন এই লড়াইয়ে তিনিই জিতবেন, যেহেতু তিনি পবিত্র, নিষ্কলুষ ছিলেন।

এবারে আমরা দেখব কেন খ্রীষ্ট শয়তানের প্রলোভনের মুখোমুখি হয়েছিলেন:

(১) অধস্তনের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ এবং বিনয় জ্ঞাপনের এ এক অনুপম দৃষ্টান্ত। প্রলোভন গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়, কাঁটার আঘাতের মতো বিঁধে এবং তা মেজাজকে উগ্র

করে তোলে– সর্বোপরি যাকে কঠিন এক দুঃখভোগ বলা চলে। খ্রীষ্ট তাঁর বিনম্রতার কারণে এই প্রলোভনের সামনে নিজেকে নিবেদন করেছিলেন। এভাবেই তিনি পাপের কারণে মানুষের ওপর নেমে আসা দুঃখভোগের ভাগী হলেন।

(২) শয়তানকে বিভ্রান্ত করে দেওয়ার জন্য এই প্রলোভন ছিল একটা উপলক্ষ। কারণ লড়াই-ই যদি না থাকে তবে তাতে কীভাবে বিজয়ের শুভবার্তা থাকে! খ্রীষ্ট প্রলোভনের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন কারণ তিনি জানতেন যে এই লড়াইযে শেষ পর্যন্ত জিত তাঁরই হবে। শয়তান প্রথম মানুষ আদমকে প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে জয়যুক্ত হয়েছিল কিন্তু দ্বিতীয় মানুষ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট উল্টো তাকেই সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করে তাকে শেষ হাসিটুকুও হাসতে দেননি।

(৩) খ্রীষ্টের ওপর নেমে আসা প্রলোভনের এই ঘটনাটি বিশ্বাসীদের আশ্বস্ত করে তোলে যে, যদিও শয়তান অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত ও বিপজ্জনকভাবে প্রলোভন নিয়ে আসে তবুও সে অজেয় নয়। শয়তান যদি সশস্ত্র সৈনিক হয় তবে আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রীষ্ট শক্তিমান সেনাপতি। এটা ভেবে আমরা আশ্বস্ত হই যে, খ্রীষ্ট প্রলোভনের মুখে পড়ে দুঃখভোগ করেছিলেন কিন্তু পাপকে প্রশ্রয় দেন নি; তিনি শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হতে পেরেছিলেন। এখন আমরা এই ভেবে ভরসা পেতে পারি যে, খ্রীষ্ট তাঁর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন পরীক্ষার সময়ে আমাদের কী রকম অবস্থার ভেতর দিয়ে যেতে হয়; ফলে তিনি আমাদের সঙ্কটময় মুহূর্তে প্রয়োজনীয় সাহায্যদানে এগিয়ে আসতে পারেন। অর্থাৎ ঠিক কোন সময় আমাদের কী রকম সাহায্যের প্রয়োজন-তা তিনি বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারেন (ইব্রীয় ২:১৮; ৪:১৫)। কিন্তু খ্রীষ্ট যে সেই প্রলোভনের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন তা ভেবে আমরা ভীষণ উৎসাহিত হতে পারি। তিনি প্রলোভনের মুখে পড়েও আমাদের জন্য বিজয় ছিনিয়ে আনলেন। শুধুমাত্র এ কারণেই যে আমরা উদ্দীপিত হই তা নয়, উপরন্তু আমাদের চিরশত্রু শয়তানের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টের এই বিজয় যে আমাদেরও বিজয়ীর বেশে উপস্থাপন করে– সেটাও আমাদের জন্য বড় রকমের প্রাপ্তি। কেবলমাত্র খ্রীষ্টের মধ্য দিয়েই আমরা শয়তানের বিরুদ্ধে জয় লাভ করতে পারি।

২. খ্রীষ্ট উপবাস রেখেছিলেন। কোন লড়াইয়ে নামার আগে রেসলাররা যেমন কঠিন অনুশাসনের মাঝে নিজেকে বেঁধে ফেলে তিনিও তেমনি কঠিন নিয়ম মেনে চল্লিশ দিবারাত্রি উপবাস রেখেছিলেন (১ করিন্থীয় ৯:২৫)। যদিও তিনি খাঁটি, পবিত্র ছিলেন এবং সংযমের চর্চা করার জন্য তার এরকম উপবাস রাখাটা আবশ্যক ছিল না তবুও তিনি দীর্ঘ এক মাসেরও বেশি সময় ধরে কিছু না খেয়ে ছিলেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি কঠোরভাবে নিয়ম মেনে চলার দিক দিয়ে অন্য সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন। এর সমান্তরালে পুরাতন নিয়মে আমরা কেবল মোশি ও এলিয়ের উদাহরণই দেখতে পাই। বাপ্তিস্মদাতা যোহন এলিয় হিসেবে আসলেন, কিন্তু কোন চিহ্ন-কাজ করলেন না। তবে যীশুর সম্পর্কে এক সত্য সাক্ষ্য দিলেন (যোহন ১০:৪১)। আর সেই সম্মান খ্রীষ্টের জন্যই গচ্ছিত ছিল। রিপু দমনের জন্য খ্রীষ্টের উপবাস রাখার কোন প্রয়োজন ছিল না (তাঁর মনে দমন করার মতো কোন মন্দ অভিলাষ ছিল না); তবুও তিনি উপবাস রেখেছিলেন,

(১) যেন তাঁকে এমন একজনের মতো দেখায় যাকে সবাই ছেড়ে গেছে; যার খোঁজ কেউ রাখে না। তিনি এ জায়গায় নিজেকে নম্র করেছিলেন।

(২) যেন শয়তান তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য কিছুটা এগিয়ে থেকে আদর্শ সুযোগ লাভ

করতে পারে। এটা তিনি করেছিলেন এই কারণে যেন শয়তানের ওপর তাঁর বিজয় আরও বর্ণাঢ্য, তাৎপর্যপূর্ণ হয়।

(৩) যেন তিনি উপবাসর অন্তর্নিহিত পবিত্র শিক্ষাকে আমাদের জন্য উপস্থাপন করতে পারেন। ঈশ্বর যে কারণে মানুষকে উপবাস রাখার জন্য আহ্বান করেছিলেন– তা তারা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল। উপবাসর মূল শিক্ষাকে বাদ দিয়ে মানুষ মূলত নিয়ম-অনুশাসনকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছিল। ঈশ্বরের শিক্ষাকে বাদ দিয়ে অর্থহীন উপবাস রাখার যে প্রচলিত নিয়ম তদানীন্তন সমাজে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, খ্রীষ্ট তাঁর এই উপবাস রাখার মাধ্যমে সেই অযৌক্তিক নিয়মের বিরুদ্ধেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। ক্ষুধাকে অগ্রাহ্য করে প্রার্থনাকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে খ্রীষ্ট পরীক্ষার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন। যারা নিষ্ঠার সাথে ব্যবস্থা মেনে অনেক বন্ধু এবং অন্যের কাছ থেকে সাহায্য পেতে আগ্রহী তারা উপবাস রাখার মাধ্যমে সান্ত্বনা পেতে পারেন; কারণ এ রকম উপবাস তাদের ভাববাদীর রেখেছিলেন। একজন মানুষের বেঁচে থাকার জন্য রুটির প্রয়োজন, সেই সাথে নিজের জীবনকে পবিত্র রাখার মাধ্যমে স্বর্গীয় মানুষ হয়ে ওঠাও জরুরি। আর এ দু'টো কাজেরই সমন্বয় সাধনের জন্য পবিত্র আত্মার নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

খ্রীষ্টের উপবাস রাখার ঘটনাকে নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করে পোপের অনুসারীরা ভস্ম বুধবার থেকে পুনরুত্থান দিবসের আগের দিন পর্যন্ত (খ্রীষ্টের দুঃখভোগের কথা স্মরণ করে) উপবাস রাখে। তাদের এই কাজ একেবারেই অপ্রয়োজনীয়; ভ্রান্ত শিক্ষাপ্রসূত। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের জীবনে পুনরায় সেই ব্যবস্থাকেই রাজত্ব করতে দিচ্ছে। চল্লিশ দিন ধরে উপবাস রাখার সময়ে খ্রীষ্টের ক্ষুধা পায়নি। কারণ এ সময় তিনি ঈশ্বরের সাথে কথোপকথনে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। জাগতিক খাবারের স্থলে স্বর্গীয় খাবারের অবস্থিতি তাঁর সমস্ত ক্ষুধাবোধকে দূর করে দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর ক্ষুধার্ত হওয়ার ঘটনাটি প্রমাণ করে তিনি রক্তমাংসের একজন মানুষ ছিলেন। তিনি আমাদের আত্মায় শক্তিশালী করার জন্য এবং আরাধ্য বিজয় দান করার জন্যই দুর্বল মানবীয় প্রবৃত্তিকে ধারণ করেছিলেন। মানুষের সমস্ত কার্যক্রম যেহেতু ক্ষুধাকে জয় করার জন্যই এবং এর ফলেই আমরা নিজেদের পাপে জড়িয়ে ফেলি, তাই একে মানবীয় প্রবৃত্তি থেকে কখনই আলাদা করে ফেলা সম্ভব নয়। সে কারণেই খ্রীষ্ট ক্ষুধার্ত হয়েছিলেন।

ঘ. খ্রীষ্টের সামনে শয়তান যে প্রলোভনসমূহ নিয়ে এসেছিল তা লক্ষ্য করুন। শয়তান তার প্রলোভনের মাধ্যমে খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করাতে চেয়েছিল; যেন তিনি মানুষের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন, আর মানুষও যেন কোনদিনও পাপের কবল থেকে মুক্তি না পায়। এখন, সেই প্রলোভনসমূহ যে প্রকারই হোক না কেন তার লক্ষ্য ছিল খ্রীষ্টকে দিয়ে

১. ঈশ্বরকে নির্দয় প্রমাণ করা,

২. তাঁর ক্ষমতাকে অস্বীকার করা এবং

৩. তাঁর সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করা।

কারণ শয়তান খ্রীষ্টের কাছে নিজেকে ঈশ্বরের চেয়ে দয়ালু, ক্ষমতাবান এবং সম্মানিত বলে পরিগণিত করতে চেয়েছিল। প্রলোভনসমূহের মাঝে প্রথম দু'টিকে আপাত দৃষ্টিতে নির্দোষ পরামর্শ বলে ভ্রম হয়; কারণ তা ছিল চাতুর্য মেশানো। অপরদিকে তৃতীয় প্রলোভনে শয়তান খ্রীষ্টকে তার কাছে পৃথিবীর সম্মান ও গৌরব চাইতে বলল। অর্থাৎ শয়তান সরাসরি

কাজের কথা বলল, 'আমিই তোমাকে দিতে পারি এই রাজত্ব, এই সম্মান'। প্রথম দু'টি প্রলোভন ছিল কৌশল ও চাতুর্যে পূর্ণ; যার উত্তর দেওয়ার জন্য কঠিন প্রজ্ঞার প্রয়োজন ছিল; আর শেষের শক্ত প্রলোভনকে আছড়ে ফেলার জন্য প্রয়োজন ছিল সুদৃঢ় প্রত্যাখ্যানের শক্তি; বলার অপেক্ষা রাখে না যে শয়তানের সমস্ত কৌশল, চাতুর্য, ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা খ্রীষ্টের পবিত্র, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মূর্তির সামনে পরাজয়ে লুটিয়ে পড়েছিল।

১. শয়তান খ্রীষ্টের কাছে ঈশ্বরের দয়াবান রূপকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চেয়েছিল এবং খ্রীষ্টের ভেতরে তাঁর পিতা সম্পর্কে এই ধারণা ঢুকিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছিল যে তিনি খ্রীষ্টের দেখাশোনা করতে সমর্থ নন।

(১) দেখুন কীভাবে খ্রীষ্টের সামনে শয়তান পরীক্ষা নিয়ে আসল (৩ পদ); 'তখন শয়তান তাঁর কাছে আসল।' মনে রাখুন, দিয়াবল প্রলোভন নিয়ে আসে কারণ সে শয়তান বা মন্ত্রণাকারী; যারা আমাদের পাপের পথে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টায় লিপ্ত তারা শয়তানের পথেই চলে এবং তার কাজ-আচরণ দ্বারা নিজেকে সাজায়; এক কথায় তারা শয়তানের অনুচর হিসেবে কাজ করে চলেছে। যেভাবে শয়তান আমাদের আদি পিতা-মাতাকে পাপের পথে নিয়ে গিয়েছিল সেভাবে আজও সে এবং পৃথিবীতে তার অনুচরেরা আমাদের প্রতিও ঠিক সেই কাজটিই করে চলেছে। 'শয়তান তাঁর কাছে আসল' দর্শনযোগ্য চেহারা নিয়ে। গেৎশিমানি বাগানে খ্রীষ্ট যখন শোকে কাতর হয়েছিলেন তখন সে যে রূপ নিয়ে এসেছিল তেমন রূপ নিয়ে নয়; কোন ভীতিকর-ভয়ানক চেহারা নিয়েও সে আসেনি। শয়তান তার ইচ্ছে অনুযায়ী আলোতে পূর্ণ স্বর্গদূতের রূপ ধারণ করতে পারতো; সে এবারে যীশু খ্রীষ্টের কাছে সেই রূপ নিয়েই আসল এবং ভাল, বুদ্ধিমান ও অভিভাবক স্বর্গদূত রূপে সে খ্রীষ্টকে ভোলাতে চাইলো।

খ্রীষ্টকে পরীক্ষা করতে গিয়ে শয়তান যে চাতুর্যের আশ্রয় নিয়েছিল সেদিকে একবার দৃষ্টি দিন; শয়তান তার প্রলোভনকে অব্যর্থ করে তুলতে সে সময় খ্রীষ্টের চাহিদা-প্রয়োজনকে কাজে লাগিয়েছিল। কারণ সে জানতো যে খ্রীষ্ট ক্ষুধার্ত এবং তাঁর খাবারের প্রয়োজন। (ক) যেহেতু খ্রীষ্ট ক্ষুধা বোধ করছিলেন সেহেতু তাঁর পক্ষে প্রয়োজনীয় খাবারের ব্যবস্থা করাটাই ছিল স্বাভাবিক; মানুষ হিসেবে এটাকেই তাঁর সর্বাগ্রে প্রাধান্য দেওয়ার কথা। আর শয়তান এই সুযোগে খ্রীষ্টের ক্ষুধাজনিত দুর্বল মুহূর্তটিকে কাজে লাগাতে চাইলো। সে তাঁকে উপযাচক হয়ে পরামর্শ দিল যেন তিনি পাথরকে রুটি হয়ে যেতে বলেন। মনে রাখুন, শয়তান আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার নিরিখে তার প্রলোভনগুলোকে সাজায়। সে সবসময়ই আমাদের অভাববোধ, দারিদ্র্য প্রভৃতি থেকে এক ধরনের বাড়তি সুযোগ নেওয়ার তালে থাকে। বৈশিষ্ট্যগত দিক দিয়েই শয়তান তার চাতুর্যপূর্ণ প্রলোভনের মাধ্যমে আমাদের কোনঠাসা করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকে; সে যথেষ্টই ধূর্ত এবং তার ঘৃণ্য পরিকল্পনাগুলো সে আমাদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করে থাকে। সে কারণেই তার পরীক্ষা মোকাবেলায় নিজেদের তৈরি করতে আমাদের যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হবে। খ্রীষ্ট যখন ক্ষুধার্ত হলেন– তা-ও আবার মরুভূমিতে, যেখানে খাদ্যের সংস্থান রীতিমত দুআত্মা ব্যাপার– তখনই শয়তান তাঁকে পরীক্ষা করল। মনে রাখুন, শয়তান মানুষকে তার পথে নিয়ে যেতে, ঈশ্বরের সাথে মানুষের যোগাযোগ সম্বন্ধকে ছিন্ন করতে এবং ঈশ্বরের প্রতি মানুষের বিশ্বাসকে দুর্বল করে দিতে 'দারিদ্র্য' ও 'চাহিদা'– এ দু'য়ের সন্নিবেশনে প্রলোভন সাজিয়ে থাকে। আর এই প্রলোভনে সাড়া না দেওয়ার কাজটি খুবই কঠিন। 'ক্ষুধার রাজ্যে

পৃথিবী গদ্যময়'– এই কথার সার্থকতা এখানেই যে মানুষ তার ক্ষুধা ও চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতেও কুণ্ঠিত হয় না। কারণ সুতীব্র প্রয়োজন কোন নিয়মের ধার ধারে না। যারা নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে সচেষ্ট থাকে তারা সর্বদাই 'দারিদ্র্য' কিংবা 'অভাব'– কে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের পথে স্থির থাকতে না পারার জন্য অজুহাত হিসেবে তা ধোপে টেকে না। কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছেমতো চলাকেই সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিতে হয়। আগূর (হিতোপদেশ ৩০ অধ্যায় দেখুন) তার বিচক্ষণতা দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে দারিদ্র্য এবং আতিশয্য দুই-ই প্রলোভনকে স্বাগত জানায়; তাই তিনি দারিদ্র্য দূর করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, 'গরীব হলে আমি হয়তো চুরির দিকে ঝুঁকবো।' সেজন্য যারা সহজ দর্শনে ঈশ্বরের পথে চলতে আগ্রহী তাদের শয়তানের প্রলোভনের বিরুদ্ধে জয়ী হবার জন্য আরও সতর্ক ও পরিশ্রমী হওয়া প্রয়োজন। তাদেরকে বিভিন্ন প্রলোভনের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিতে হবে। কারণ পাপে বেঁচে থাকার চেয়ে না খেয়ে মরে যাওয়াও ভাল। (খ) খ্রীষ্টকে একটু দেরিতে 'ঈশ্বরের পুত্র' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল; শয়তান এখানে তাঁর মনে ঈশ্বরের পুত্রত্বের বিষয়ে সন্দেহ ঢোকাবার চেষ্টা করেছিল, 'তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও।' এমন নয় যে শয়তান ঈশ্বরের পুত্রের পৃথিবীতে আসবার বিষয়ে জানতো না কিংবা খ্রীষ্টই ঈশ্বরের পুত্র সে বিষয়ে তার মনে সংশয় ছিল; বরং এ বিষয়ে সে নিশ্চিত ছিল যে, ইনিই তিনি। সে খ্রীষ্টের 'ঈশ্বরের পুত্র' পরিচয়টিকে প্রশ্নবিদ্ধ করার মাধ্যমে তাঁকে দিয়ে নিজের ইচ্ছের বাস্তবায়ন ঘটাতে চেয়েছিল। দুর্বিনীতের মতো সে কারণেই সে খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে তাঁর ক্ষমতা প্রকাশে প্রলুব্ধ করেছিল।

প্রথমে, "তোমার বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় এই প্রশ্নটি সামনে এসে যাচ্ছে যে, তুমি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র কি না। যদি তুমি সত্যিই তা হতে তবে তো তোমার অমন ক্ষুধার্ত থাকার কথা নয়। ঈশ্বরের পুত্রের কোন কিছুর অভাব নেই। এমন কঠিন পরিস্থিতি কি তাঁকে মানায়? ঈশ্বর যদি সত্যিই তোমার পিতা হতেন তাহলে তিনি তোমার ক্ষুধার্ত অবস্থা দেখেও চুপ করে থাকতেন না; যেখানে বনের সব পশুই তাঁর (গীত ১: ১০, ১২)। হ্যাঁ, এটা সত্যি যে স্বর্গ থেকে এই কথা শোনা গিয়েছিল যে 'ইনিই আমার প্রিয় পুত্র'; কিন্তু আমি বলছি, নিশ্চিতভাবেই এটা ভুল ছিল; আর তুমি সেটাকেই বিশ্বাস করে নিজের পরিচয় বলে গণ্য করে বসে আছ। আরে, তোমার কথা অনুসারে যদি আমাকে মানতেও হয় যে, ঈশ্বরই তোমার পিতা, তবে তো তুমি আমার সাথে এ বিষয়ে একমত হবে যে, পিতা হিসেবে তিনি যথেষ্টই ব্যর্থ এবং নিষ্ঠুর!" মনে রাখুন,

১. ঈশ্বরের লোকদের পরীক্ষা করবার সময়ে শয়তান তাদের সাথে ঈশ্বরের পিতা ও সন্তানের যে 'পরিচয়'– তাকেই লক্ষ্যবস্তু বানায়; যেন তারা ঈশ্বরের সাথে তাদের যোগাযোগ সম্বন্ধ, তাঁর কাজ এবং তাঁর ওপর নির্ভরতাকে বিসর্জন দেয়। পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের মাঝে থেকে সায় দেন যে, 'হ্যাঁ, এরা ঈশ্বরের সন্তান'; কারণ তিনি কঠিন, কষ্টকর পরিস্থিতিতেও বিশ্বাসীদের সান্ত্বনা দেন। অপরদিকে মন্দ-আত্মা যে কিনা সবসময় বিশ্বাসীদের দোষ খুঁজে বেড়ায়, সুযোগ পেলেই সে বিশ্বাসীদের মনে ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্কের বিষয়ে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকে।

২. ঈশ্বরের লোকদের পরীক্ষা করার জন্য শয়তান তাদের দুর্বল মুহূর্তকে বেছে নেয়, যখন তারা দুঃখার্ত, কষ্টকর অবস্থার মাঝে থাকে। মানুষের চাহিদা এবং তাদের ওপর চেপে

বসা দুঃসহ চাপকে ইস্যু বানিয়ে সে তাদের সামনে ঈশ্বরের পুত্রত্বের ঝা যীশু ছবিটাকে প্রদর্শনের মাধ্যমে বিভ্রান্ত করতে চায়। কিন্তু যারা ঈশ্বরের ভালবাসার দেখা পেয়েছে তারা শত সমস্যা, প্রতিকূলতার মাঝেও তাঁর প্রতি বিশ্বাসে অবিচল থাকে। কারণ তারা জানে যে ঈশ্বর তাদের কতটা ভালবাসেন। এ ধরনের প্রলোভনের বিপরীতে কী বলতে হয় তা তারা জানে; তাদের পবিত্র দায়িত্ব থেকেই একথা বলতে পারে যে, "তিনি যদি আমাকে মেরে ফেলেন কিংবা না খাইয়ে রাখেন তবুও আমি তাঁকে অস্বীকার করব না। বরং তাঁর প্রতি আমার বিশ্বাসের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেব এবং তাঁকে ভালবাসব যেমনটা একজন বন্ধুকে ভালবাসা যায়। এ ছাড়া তিনি যদি কখনো আমার বিরুদ্ধেও দাঁড়ান তবুও তাঁর ওপর থেকে আমার নির্ভরতার পরিমাণ এতটুকুও কমে যাবে না।"

৩. শয়তান ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তিমূলকে কাঁপিয়ে দিতে সচেষ্ট থাকে। শুধু তাই নয়, সে ঈশ্বরের বাক্যের সত্যতা নিয়েও প্রশ্ন তোলে। যেমনটা সে আমাদের প্রথম পিতা আদম ও মা হবাকে করেছিল, 'ঈশ্বর কি সত্যিই এমনটা বলেছেন?' শয়তান তার এ কথার মাধ্যমে এটাই বোঝাতে চেয়েছিল, নিশ্চিতভাবেই ঈশ্বর তা বলেননি। যেমনটা আমরা এখানে দেখি যে শয়তান বিশ্বাসীদের মনে এই বলে সন্দেহের বীজ ঢুকিয়ে দিতে চায় যে, 'ঈশ্বর কি প্রকৃতই বলেছেন যে তোমরা তাঁর সন্তান?' অর্থাৎ শয়তানের বক্তব্যে এটাই মূর্ত হয়ে ওঠে যে ঈশ্বর নিশ্চয়ই এ রকম বলেন নি; আর তিনি যদি তা বলেও থাকেন তবে ভুল বলেছেন। ঈশ্বরের বাক্যের সত্যতা নিয়ে আমাদের মনে প্রশ্ন দেখা দিলে শয়তান আমাদের হৃদয়ে তার অবারিত প্রবেশকে নিশ্চিত করে। কারণ ঈশ্বরের সত্য কথনের বিরোধিতা করা, তাঁকে প্রশ্নবিদ্ধ করাই তার কাজ; সে মিথ্যার পিতা যে!

৪. শয়তান ঈশ্বরের লোকদের পরীক্ষা করার জন্য তাদের মনে ঈশ্বর সম্পর্কিত গভীর ভাবনাকেও কাজে লাগিয়ে থাকে। শয়তানের ছলনায় ভুলে অনেকে এ-ও ভাবতে শুরু করে দেয়– 'যদি ঈশ্বর নিষ্ঠুর হতেন!', 'ঈশ্বর কি সব সময়ই তাঁর লোকদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন?', 'তিনি কি তাঁর লোকদের কাছে করা প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যেতে পারেন না?', 'তাঁর-ও তো ভুল হতে পারে!' শয়তান আমাদের আদি পিতা-মাতাকে এই বলে ভুলিয়েছিল যে, ঈশ্বর চান না মানুষ তাঁর চেয়ে জ্ঞানী হয়ে উঠুক, সে কারণেই তিনি তাদের জ্ঞানদায়ী গাছের ফল খেতে বারণ করেছেন। অর্থাৎ শয়তান ঈশ্বর সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা তাদের মনে ঢুকিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিল যে 'তিনি ঈর্ষাকাতর'। এখানেও আমরা শয়তানকে সেই কৌশলেরই দারস্থ হতে দেখি। সে খ্রীষ্টকে বলতে চেয়েছিল যে, ঈশ্বর তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজের স্বার্থে তাঁকে ছেড়ে অন্যত্র অবস্থান নিয়েছেন। খ্রীষ্ট ক্ষুধার্ত হয়েছেন দেখে যদি তাঁকে কেবলমাত্র মানুষ হিসেবেও বিবেচনা করা হয় তবে এই প্রশ্নটি আসা স্বাভাবিক যে, কেন তিনি নিজেকে মানুষের উর্ধ্বে, ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে স্বীকার করলেন না; যেখানে তিনি কোন ধরনের ক্ষুধাবোধ ছাড়াই একাধারে চল্লিশ দিন উপবাস রাখলেন?

দ্বিতীয়ত, "তুমি যে ঈশ্বরের পুত্র এখন তার প্রমাণ দেখানোর সময় এসেছে। যদি তোমার মাঝে ঈশ্বরের ক্ষমতা থাকে তবে তোমার সামনে থাকা এই পাথরগুলোকে রুটি হয়ে যেতে বল' (৩ পদ)। বাপ্তিস্মদাতা যোহন যে বলেছিলেন ঈশ্বর চাইলে পাথর-খণ্ড থেকেও অব্রাহামের বংশধর উৎপন্ন করতে পারেন– সেই কথার সূত্র ধরে তোমাকে বলছি, যদি তোমার মাঝে ঈশ্বরের সেই ক্ষমতা থেকে থাকে তবে তো তুমি অনায়াসে এই

পাথরগুলো থেকে খাবার তৈরি করতে পার! তাই, দেরি না করে এক্ষুণি এই পাথরগুলোকে রুটি হয়ে যেতে বল।" লক্ষ্য করুন, শয়তান কিন্তু এখানে বলেনি যে, তোমার পিতার কাছে প্রার্থনা কর যেন তিনি পাথরগুলোকে রুটিতে পরিণত করেন; কিন্তু সে তাঁকে আদেশ করেছিল; কারণ সে চেয়েছিল খ্রীষ্ট যেন ঈশ্বরের ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করে নিজেই ক্ষমতা প্রদর্শনে উদ্যত হওয়ার মাধ্যমে ঈশ্বরের পরিকল্পনার বাইরে যান। শয়তানের মাঝে কোন প্রকার নম্রতার বালাই নেই। নিজের বিজয় নিশ্চিত করার জন্য সে নম্র হওয়ার ভান করে মাত্র। সে সবসময়ই ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাসীদের নির্ভরতাকে স্থানচ্যুত করে হাস্যকর, ক্ষয়িষ্ণু স্বনির্ভরতার দিকে তাদের চালিত করার জন্যই সবসময় চেষ্টা করে থাকে।

(২) দেখুন, কীভাবে খ্রীষ্ট শয়তানের এই প্রলোভনকে প্রত্যাখ্যান করলেন এবং তার বিরুদ্ধে জয়ী হলেন।

(ক) খ্রীষ্ট শয়তানের ইচ্ছেমতো কাজ না করে তাকে নিরস্ত করলেন। অর্থাৎ তিনি পাথরগুলোকে রুটি হয়ে যেতে বললেন না। এর কারণ এ-ই নয় যে তিনি তা করতে অসমর্থ ছিলেন বা তাঁর সেই ক্ষমতাই ছিল না। খ্রীষ্ট তা অবশ্যই পারতেন; যার প্রমাণ আমরা পরবর্তীতে জলকে আঙ্গুর রসে পরিণত করার ঘটনার মাঝে দেখতে পাই। কিন্তু ঠিক এই সময়ে তিনি তা করলেন না। কেন করলেন না? কারণ খ্রীষ্টের বুঝতে বাকি ছিল না যে, শয়তান তাঁকে দিয়ে তার নির্দেশমতো কাজ করিয়ে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নিয়ে যেতে চাইছে। অপরদিকে খ্রীষ্টের নিজেকে প্রমাণের কোন দায় ছিল না। যদিও সাদাচোখে এই কাজকে মন্দ বলে মনে হয় না, তবুও এর ভেতরের বিপজ্জনক দিকটিই খ্রীষ্টকে শয়তানের ইচ্ছের বিরুদ্ধে যেতে উৎসাহিত করেছিল। তিনি খুব শীঘ্রই ঘাসের ওপর সাপের বিচরণ সম্বন্ধে সতর্ক হয়েছিলেন; ফলে শয়তানের কথামতো কাজ করে ঈশ্বরের ইচ্ছার বাস্তবায়নকে অসম্ভব করে তুললেন না। কথোপকথনের প্রথম পর্যায়ে আমরা শয়তানকে খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে স্বর্গ থেকে ভেসে আসার ঘোষণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে দেখি। এর মাধ্যমে সে খ্রীষ্টের ওপর আনীত পরীক্ষাকে আরও কঠিন করে তুলতে হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, শয়তান খ্রীষ্টকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল যে ঈশ্বর তাঁর প্রতি যথেষ্ট যত্নবান নন; অথবা হলেও তিনি তাঁর প্রতি অন্যায় আচরণ করছেন। তৃতীয়ত, শয়তান খ্রীষ্টকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছিল যেন তিনি নিজেই নিজের ভার তুলে নেন।

(খ) খ্রীষ্ট শয়তানের প্রলোভনের উত্তর দিতে তৈরিই ছিলেন (৪ পদ); জবাবে তিনি বললেন, 'শাস্ত্রে এই কথা লেখা আছে'। এখানে লক্ষ্য করার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে খ্রীষ্ট শাস্ত্রের কথা দ্বারা শয়তানের প্রলোভনের উত্তর দিলেন এবং তাকে পরাস্ত করলেন। নিজে ঈশ্বরের বাক্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি সেখানে মোশির শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি টানলেন। এর দ্বারা তিনি ঈশ্বরের পুস্তকসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন; যা আমাদের জন্য এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্তবিশেষ। খ্রীষ্ট শাস্ত্র থেকে ঈশ্বরের বাক্য উদ্ধৃত করার মাধ্যমে শয়তানকে জানিয়ে দিলেন যে তিনি ঈশ্বরের বাক্যের প্রতিটি শব্দ এবং তার প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত আছেন। অনেক সময় শয়তানের অনুসারীদেরকেও শাস্ত্র সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখতে দেখা যায়; শাস্ত্রে এ সম্পর্কে লেখা আছে, 'শয়তানও ঈশ্বরের বাক্য বিশ্বাস করে কিন্তু তাতে স্থির থাকে না'। খ্রীষ্ট যেভাবে শয়তানের প্রলোভনকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সেভাবে আমরাও আমাদের দিকে তেড়ে আসা বিভিন্ন প্রলোভনকে 'ঈশ্বরের বাক্য' দ্বারা পরাস্ত করতে পারি। ঈশ্বরের বাক্য হচ্ছে পবিত্র আত্মার ছোরা; শয়তানের

বিরুদ্ধে জয়ী হতে বিশ্বাসীদের এই অস্ত্রহাতে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। রাজা দায়ূদ যে ছোরা দিয়ে জালুতের মাথা কেটে নিয়েছিলেন, তার জায়গায় আমরা আমাদের পবিত্র আত্মার ছোরাটিকে কল্পনা করতে পারি। কারণ পবিত্র আত্মার এই ছোরা দিয়েই আমরা শয়তানের প্রলোভনকে পরাস্ত করতে সমর্থ হই। শয়তানের বিরুদ্ধে আত্মিক যুদ্ধে পবিত্র আত্মার ছোরা বা ঈশ্বরের বাক্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র আর দ্বিতীয়টি নেই।

শয়তানের প্রলোভনের জবাবে খ্রীষ্ট দ্বিতীয় বিবরণ শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি টেনেছিলেন– যা দ্বিতীয় আদেশের দিকে নির্দেশ করে। মোশির মাধ্যমে ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতির লোকদের কাছে যে ব্যবস্থা পাঠিয়েছিলেন তা পালনে তারা আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ছিল না। ব্যবস্থা পালন করার বদলে তারা এর আনুষ্ঠানিক দিকটিকেই স্বাগত জানিয়েছিল। ফলে পুরোহিতদের দ্বারা বিভিন্ন উৎসর্গ ও নিজেদের পরিশুদ্ধিকরণেই তারা ব্যাপৃত থেকেছিল। আর এটা তো প্রমাণিত সত্য যে, এসব মানবীয় আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের দ্বারা শয়তানকে পরাজিত করা যায় না। তদানীন্তন যিহূদী সমাজের পাশাপাশি বর্তমান খ্রীষ্টীয় সমাজের জন্যও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য যে, জলে বাপ্তিস্ম নেওয়া ও গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে রাখা শয়তানের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার নিশ্চয়তা দেয় না। বরং যারা ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি বাধ্যতায়-বিশ্বাসে তাঁর অনুগত থাকে, তাঁর পথে চলে– কেবল তারাই শয়তানের পরীক্ষার বিরুদ্ধে জয়লাভ করে।

খ্রীষ্ট শয়তানের প্রলোভনের উত্তর দিতে দ্বিতীয় বিবরণ ৮:৩ পদ কে বেছে নিয়েছিলেন। ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতির লোকদের খাবারের জন্য 'মান্না' পাঠিয়েছিলেন। তিনি তা করেছিলেন যেন ইস্রায়েল জাতির লোকেরা তাঁর সেই শিক্ষা আরও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে যে, মানুষ কেবল রুটিতেই বাঁচে না। খ্রীষ্ট তাঁর নিজের বেলায় এই শিক্ষার প্রয়োগ ঘটালেন। ইস্রায়েল ছিল ঈশ্বরের সন্তান– যাকে তিনি মিশর থেকে বের করে এনেছিলেন (হোশেয় ১১:১), খ্রীষ্টও তা-ই ছিলেন (২:১৫ পদ); সে সময় ইস্রায়েল জাতির লোকেরা মরুভূমিতে ছিল, আর এখন খ্রীষ্ট এমনও হতে পারে সেই একই মরুভূমিতে অবস্থান করছেন। এখন প্রথমত, শয়তান খ্রীষ্টের 'ঈশ্বরের পুত্র' পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল কারণ তিনি উপবাস রাখার মাধ্যমে দুঃখভোগ করছিলেন। শয়তান তাঁর কাছে ইস্রায়েল জাতির প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেছিল যে, তারাও ঈশ্বরের সন্তান ছিল কিন্তু নিজেদের অন্যায় ব্যবহারের দ্বারা তারা ঈশ্বরকে বিরক্ত করে তুলেছিল (প্রেরিত ১৩:১৮)। আর সে কারণেই ঈশ্বরের কাছ থেকে তাদের উদ্দেশ্যে দুঃখভোগ নেমে আসল (দ্বিতীয় বিবরণ ৮:৫)। এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে শয়তান খ্রীষ্টকে বলতে চেয়েছিল, 'পিতা যেভাবে তার সন্তানকে শাসন করেন সেভাবেই হয়তো ঈশ্বর তোমাকে শাসন করছেন। তা না হলে কেন তোমার এই দুঃখভোগ!' সত্যিকারভাবেই সন্তান হিসেবে খ্রীষ্ট ঈশ্বরের বাধ্য ছিলেন।

দ্বিতীয়ত, শয়তান ঈশ্বরের সাথে খ্রীষ্টের বিশ্বাস ও ভালবাসার সম্পর্কে ফাটল ধরাতে চেয়ে বলেছিল, "ইস্রায়েল জাতির লোকেরা যেমন তাদের প্রয়োজনের সময় ঈশ্বরের দ্বারস্থ হয়েছিল, তেমনি তোমাকেও এখন তাঁর দ্বারস্থ হতে হবে। আচ্ছা, তুমিই বল, ইস্রায়েল জাতির লোকদের সাথে কি তোমার কোন তুলনা চলে! তারা তো এমনও বলেছিল, 'কোথায় ঈশ্বর?' 'তিনি কি আমাদের মাঝে আছেন?' 'তিনি কি এই মরুভূমিতে আমাদের সামনে টেবিল ভর্তি খাবার সাজিয়ে দিতে পারেন?' 'তিনি কি আমাদের জন্য রুটি জোগাড় করে দিতে পারেন?' তোমাকেও যদি রুটির জন্য ঈশ্বরের সাহায্য চাইতে হয় তবে তোমার

সাথে তাদের আর কি পার্থক্য থাকল?"

তৃতীয়ত, খ্রীষ্টের যখন ক্ষুধা পেল এবং তাঁর যখন খাবারের প্রয়োজন তখনই শয়তান তাঁর কাছে প্রলোভন নিয়ে এল; ইস্রায়েল জাতির লোকেরা যখন মরুভূমিতে ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছিল তখন ঈশ্বর তাদের জন্য 'মান্না' পাঠিয়েছিলেন। তিনি এর মাধ্যমে ইস্রায়েল জাতির লোকদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন যে, তিনি তাদের যত্ন নেন; তাঁর লোকদের প্রয়োজনের বিষয়েও তিনি অবগত আছেন। ঈশ্বরের সন্তানেরা যখন তাঁকে ডাকে, তিনি তখনই তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। চতুর্থত, শয়তান খ্রীষ্টকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছিল যেন তিনি নিজেই নিজের খাবারের ব্যবস্থা করেন। সে বলেছিল, 'কী দরকার ঈশ্বরের কাছে চাওয়ার? হ্যাঁ, মানুষ যে রুটিতে বাঁচে না– তার সত্যতা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু মনে করে দেখ, ইস্রায়েল জাতির লোকেরা রুটি না পেলেও চল্লিশ বছর মান্না খেয়ে বেঁচেছিল।' এটা সত্যি যে, ঈশ্বর যেভাবে পৃথিবীকে সাজিয়েছেন তাতে করে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই মাটি থেকে তার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য উৎপন্ন করতে পারে (ইয়োব ২৮:৫); কিন্তু তিনি যদি চান তবে মানুষ খাদ্যের প্রতি অতিমাত্রায় নির্ভরশীল না হয়েও বেঁচে থাকতে পারে– তাঁর মুখের প্রতিটি কথার দ্বারা। ঈশ্বরের বাক্যই মানুষকে সঠিক জীবনের স্বাদ বুঝতে সাহায্য করে। মানুষের বেঁচে থাকাটা তখন সার্থক হয়ে ওঠে কারণ ঈশ্বরই তখন তার জীবনের কর্তা হন। তিনিই তাকে তাঁর ইচ্ছেমতো চলতে সাহায্য করেন।

ঈশ্বর যদি দয়া না করেন তবে আমরা জীবন ধারণের জন্য যে খাবারের ওপর নির্ভর করি তা খেয়ে আমাদের তৃপ্তি আসে না (হগয় ১:৬, ৯; মীখা ৬:১৪)। এর কারণ, জীবনের জন্য খাদ্যের ভূমিকা যেমন অপরিহার্য তেমনি খাদ্যের জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রয়োজনীয়তাও অগ্রগণ্য। তাই, আমরা যদি আমাদের খাবারের জন্য ঈশ্বরের দয়া কামনা করি তবেই সেই খাবার আমাদের পরিপূর্ণরূপে তৃপ্ত করে। ঈশ্বর মোশি ও এলিয়কে দীর্ঘ সময় কোন খাবার ছাড়াই বাঁচিয়ে রেখেছিলেন; এই মাত্র আমরা পড়লাম যে, স্বয়ং যীশু খ্রীষ্টও চল্লিশ দিন যাবত কিছুই খাননি। ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতির লোকদের জন্য স্বর্গ থেকে স্বর্গদূতদের খাবার 'মান্না' পাঠিয়েছিলেন; তিনি এলিয়ের কাছে দাঁড়কাকের মাধ্যমে খাবার পাঠিয়েছিলেন, পরবর্তীতে তিনি সেই এলিয়ের মাধ্যমে বিধবার ময়দার পাত্রকে বাড়িয়ে তুলেছিলেন; কাজেই খ্রীষ্টের সেই পাথরগুলোকে রুটি হয়ে যাবার কথা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। তিনি জানতেন যে, ঈশ্বর তাঁকে কোন এক উপায়ে বাঁচিয়ে রাখবেন। যেমনটা তিনি তাঁর ক্ষুধা পাবার আগের চল্লিশ দিন তাঁকে সাহায্য করেছিলেন।

মনে রাখুন, ঈশ্বরের দয়া ছাড়া আমরা বেঁচে থাকতে পারি না। তাই তাঁর অনুগ্রহের প্রাচুর্যকে অস্বীকার করে আমরা যেন নিজেদের মতো করে বেঁচে থাকার চেষ্টা না করি, সেদিকে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। ঈশ্বরের ওপর নির্ভরতার জীবন যাপনই আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। কী করে আমরা তা করতে সমর্থ হব– সেই শিক্ষা গ্রহণে আমাদের আগ্রহী হতে হবে। যখন কোন শস্যক্ষেত্রে পর্যাপ্ত আবাদ হয় না, চাহিদা মতো মাংসের জোগান পাওয়া যায় না; অর্থাৎ বেঁচে থাকার জন্য দরকারি সব সংস্থান আমাদের হতাশ করে, তখনও যেন আমরা প্রভুতে আনন্দ করি। সে সময় আমরা যেন কখনো নিজেদের মতো করে পদক্ষেপ না ফেলি, কারণ এতে করে আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলে যেতে পারি। তার চেয়ে আমরা যেন তাঁর সামনে হাঁটু পাতি এবং আমাদের নিয়ে তাঁর

পরিকল্পনাকে আমাদের জীবনে কাজ করতে দিই। যে খাবার তিনি আমাদের দিয়েছেন, হতে পারে তা অপ্রতুল তবুও আমরা তার জন্য তাঁকে প্রার্থনায় ধন্যবাদ জানাব। শয়তানের প্রথম প্রলোভনের জবাবে খ্রীষ্ট যা করেছিলেন তা থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, ঈশ্বর ছাড়া আর কারও উপরে আমাদের খাবারের জন্য নির্ভর করা চলবে না। যদিও আমাদের চাহিদা অসীম তবুও আমরা যেন প্রভুর ওপর বিশ্বাস রাখি আর ভাল কাজে জীবন কাটাই (গীত ৩৭:৩)। 'যিহোবা যিরি' কোন না কোনওভাবে আমাদের প্রয়োজন মেটাবেন। পাপে প্রচুর অর্থ-বিত্তের মাঝে জীবন কাটানোর চেয়ে দরিদ্র অবস্থায় ঈশ্বরের ইচ্ছেমতো চলা অনেক ভাল। কারণ পাপের ফল মৃত্যু আর আমাদের প্রভুর অনুগ্রহের ফল অনন্ত জীবন।

২. শয়তান খ্রীষ্টকে তাঁর পিতার ক্ষমতা এবং সুরক্ষাদানের বিষয়টি স্বীকার করতে প্রলুব্ধ করল। দেখুন, শয়তান তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কতটা অবিচল, অবিশ্রান্ত; বিরামহীনভাবে তার কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। একটা কৌশল কোনভাবে মার খেয়ে গেলে কত দ্রুত আরেক ফন্দি আঁটে।

এখন, খ্রীষ্টের প্রতি শয়তানের দ্বিতীয় প্রলোভনের দিকে লক্ষ্য করা যাক,

(ক) সেই প্রলোভনটি কী ছিল এবং কীভাবে খ্রীষ্ট তা নস্যাত করে দিয়েছিলেন– এবারে আমরা সে বিষয়েই দেখব। শয়তান যখন দেখল যে, খ্রীষ্ট তাঁর পিতার পরিচালনা এবং যত্নের প্রতি আস্থাশীল তখন সে তার দ্বিতীয় প্রলোভনে খ্রীষ্টের সেই আস্থাকেই ব্যবহার করল। ঈশ্বর তাঁর পুত্রের নিরাপত্তার প্রতি অবশ্যই যত্নবান হবেন– এই বোধকে কাজে লাগিয়ে সে তার তূণ থেকে দ্বিতীয় তীরটি বের করল। মনে রাখুন, প্রলোভনের বিরুদ্ধে জয়ী হলেই যে আমরা শয়তানের আওতার বাইরে চলে যাই তা নয়। বরং আমরা আরও কঠিন বিপদের মাঝে পতিত হই। ডানে-বাঁয়ে সবদিকেই আমাদের জন্য বিপদ তার সর্বগ্রাসী রূপ নিয়ে ওত পেতে থাকে। যে কোন মুহূর্তেই আমরা পথভ্রষ্ট হতে পারি। ছিন্ন হতে পারে পবিত্র আত্মার সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাই এই ভয় শয়তানের প্রলোভনে সাড়া দিয়ে পবিত্র আত্মার সান্নিধ্য হারানোর ভয়। কারণ পবিত্র আত্মার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার চেয়ে ক্ষতিকর, হতাশাজনক আর কিছুই হতে পারে না। অনেকে এই ভেবে গা-ছাড়া ভাব দেখান যে, খ্রীষ্ট তাদের পাপ থেকে বিরত রাখতে আন্তরিক, ফলে তিনি তাদের পাপ করা থেকে ঠেকিয়ে রাখবেন। এই বিশ্বাসের চর্চার মাধ্যমে তারা নিজেদের মনে যুক্তি তৈরি করে যে, তারা যদি পাপ করেই ফেলে তবে খ্রীষ্টই তাদের সেই পাপ থেকে মুক্ত করবেন। লক্ষ্য করুন, এভাবে লোকেরা যখন স্বধর্মে ঈর্ষান্বিত হতে শুরু করে তখন শয়তান তাদের বিবেচনা বোধকে অসাড় করে দিয়ে ধোঁকা দেওয়ার জন্য পা বাড়ায় এবং তাদের অহংকারের জায়গায় মোক্ষম আঘাত হানতে তৈরি হয়। এই প্রলোভনে আমরা দেখি,

১. শয়তান কীভাবে তাঁর কাছে সেই প্রলোভন উপস্থাপন করল। সে খ্রীষ্টকে যিরূশালেমে নিয়ে গেল। এক্ষেত্রে সে কিন্তু খ্রীষ্টকে জোর করে নি; কিংবা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও নিয়ে যায়নি। খ্রীষ্ট হয়তো পায়ে হেঁটে মন্দিরের চূড়ায় গিয়ে উঠেছিলেন অথবা হয়তো বাতাসে করে (যদিও তা নিশ্চিত করে বলা যায় না) সেখানে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। যেভাবেই হোক তিনি উপাসনা গৃহের চূড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন। লক্ষ্য করুন, শয়তানকে পরাজিত করার জন্য খ্রীষ্ট নিজের দুঃখভোগকে আমলে না নিয়ে শয়তানকে তার পরীক্ষা-কাজ চালিয়ে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। এখানেই খ্রীষ্টের সহিষ্ণুতার প্রমাণ মেলে।

পরবর্তীতে তিনি তাঁর দুঃখভোগ এবং মৃত্যুতেও ঠিক একই রকম অসীম ধৈর্য দেখিয়েছিলেন। নিজের দুঃখভোগ এবং মৃত্যু পর্যন্ত দেখিয়ে যাওয়া খ্রীষ্টের সেই ধৈর্যের কাছে শয়তানের সমস্ত ক্ষমতা, চাতুরী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। খ্রীষ্টকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল তার কাছে শয়তানের ক্ষমতা কেবল ছায়া বলেই পরিগণিত হয়। একথা ভেবে আমরা উদ্দীপিত হই যে, খ্রীষ্ট তাঁর ওপর শয়তানের ক্ষমতাকে খর্ব করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অবশ্য সেভাবে তিনি আমাদের বিপরীতে শয়তানের ক্ষমতাকে পুরো মাত্রায় খর্ব করেননি, কেবল সীমাবদ্ধ করেছেন; কারণ তিনি আমাদের অন্তরের বিষয়ে জানেন! দ্বিতীয়ত, শয়তানের চাতুর্যের কথা ভেবে অবাক হতে হয়, কারণ সে খ্রীষ্টকে পরীক্ষা করার জন্য মন্দিরকে বেছে নিয়েছিল। সে এমন একটি জায়গাকে বেছে নিয়েছিল যেখানে যিরূশালেমের সবচেয়ে বড় জমায়েত অনুষ্ঠিত হতো। যাকে 'পুরো পৃথিবীর আনন্দ' বলে অভিহিত করা হতো সেই জগদ্বিখ্যাত, পৃথিবীর বিস্ময় সৃষ্টিকারী মন্দিরের ওপরে নিয়ে গিয়ে শয়তান খ্রীষ্টকে তাঁর ক্ষমতা প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ করতে চাইলো। সে চাইলো খ্রীষ্ট একবার ভুল করুন। শয়তান তাঁর সামনে এই প্রলোভন নিয়ে আসল যেন তিনি মন্দিরের চূড়ার ওপর থেকে লাফ দিয়ে পড়ার মাধ্যমে সবার কাছে নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে প্রমাণ করেন। বাস্তবিকই এই প্রলোভন অত্যন্ত কঠিন ছিল কারণ এই জায়গাটি মরুভূমির মতো জনশূন্য ছিল না, উপরন্তু কোন আশ্চর্য কাজ হলে অনেকের চোখের সামনেই তা ঘটতো; আর তা করার জন্য এই পবিত্র মন্দিরের চেয়ে উৎকৃষ্ট স্থান দ্বিতীয়টি ছিল না।

লক্ষ্য করুন, ১. যিরূশালেমকে এখানে 'পবিত্র নগরী' বলে অভিহিত করা হয়েছে। যিরূশালেমের শাব্দিক অর্থ 'শান্তির নগরী' হলেও মূলত এর ভাব এবং চর্চাগত জায়গা থেকেই একে 'পবিত্র' বলে বিশেষায়িত করা হয়েছে। 'ইস্রায়েল জাতি'কে যেমন ঈশ্বর পৃথিবীর অন্য সব জাতির মধ্য থেকে বেছে নিয়েছিলেন, তেমনি যিরূশালেম নগরীকেও তিনি অন্য সব নগরী থেকে শ্রেষ্ঠ ত্বের মর্যাদা দান করেছিলেন। পবিত্র শাস্ত্রের অনেক জায়গায় আমরা এই নগরীব উল্লেখ দেখতে পাই। ঈশ্বরের ভাববাদীদের পদচারণায় মুখ-রিত এই নগরী ইস্রায়েল জাতির ধর্মীয় ও জাতিগত তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছিল। মনে রাখুন, পৃথিবীতে 'পবিত্র' বলে এমন কোন স্থান নেই যেখানে গিয়ে আমরা নিজেদের শয়তান কিংবা তার প্রলোভন থেকে নিরাপদ ভাবতে পারি। পবিত্র এদন বাগানে থেকেও প্রথম মানুষ শয়তানের প্রলোভনের মুখে পড়েছিল; আর এখানে আমরা দ্বিতীয় মানুষ, খ্রীষ্ট যীশুকে পবিত্র নগরীতেই শয়তানের প্রলোভনের সম্মুখীন হতে দেখি। তাই, সর্বত্র-সবসময় আমরা যেন শয়তানের প্রলোভনের বিষয়ে সজাগ-সতর্ক থাকি; কারণ জাগতিকতার বিচারে 'পবিত্র' বলে বিবেচিত কোন স্থানে শয়তান আরও বেশি করে তার প্রলোভনের জাল বিছাতে সক্ষম। সেখানে শয়তান মানুষের মনকে অমূলক আত্মবিশ্বাস ও গর্ব দিয়ে সহজেই নিজের দিকে টেনে নিতে পারে; কারণ মানুষের নির্ভরতা তখন ঈশ্বরের ওপর থেকে সরে গিয়ে পবিত্র স্থানের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি আমাদের জন্য স্বর্গের যিরূশালেমে অপেক্ষা করছেন। একমাত্র সেই পবিত্র আত্মিক নগরীতেই আমরা শয়তানের সব প্রলোভন-পরীক্ষা থেকে নিরাপদ; কারণ অশুচি কোন কিছুই সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না।

২. 'সে খ্রীষ্টকে মন্দিরের চূড়ার ওপর দাঁড় করাল।' যোসেফাসের বর্ণনামতে এই চূড়া ছিল অনেক উঁচুতে– যেখান থেকে নিচের দিকে তাকালে স্বভাবিকভাবেই মাথা চক্কর দিয়ে

উঠতো। মনে রাখুন, উপাসনা গৃহের উঁচু স্থানকে শয়তান তার প্রলোভন সাজানোর জন্য বেছে নিতে আগ্রহী– আমার একথা অবশ্য উঁচু পর্বের বিষয়েই বলা। পৃথিবীর বিভিন্ন ক্ষেত্রের উঁচু পদসমূহে আসীন হওয়ার জন্য মানুষের আগ্রহ লক্ষ্য করার মতো। সবাই বড় পদে আসীন হতে চাইলেও অনেকে ঠিক বুঝতে চান না যে, তিনি সেই পর্বের যোগ্য কি না, বা তার চেয়েও যোগ্যতর কেউ আছে কি না।

(১) উঁচু পদসমূহ বরাবরই পিচ্ছিল। এখানে সর্বজনগ্রাহ্য ও দায়িত্ববান হিসেবে টিকে থাকাটা খুবই কঠিন। যারা এইসব পদে আসীন, শয়তান সহজেই তাদের দিকে তার প্রলোভনের তীর বাগিয়ে ছুঁটে আসে। ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতায় যারা নিজেদের নিচু করে তাদেরকে উঁচুতে, সম্মানের জায়গায় বসানো হবে; কিন্তু যারা শয়তানের ইচ্ছামতো চলে এবং নিজেদের উঁচু করে ঈশ্বর অবশ্যই তাদের সেই সম্মান কেড়ে নেবেন।

(২) অনুরূপভাবে মণ্ডলীর উঁচু পদসমূহের বিষয়ে বলা যায় যে, এতে আসীন ব্যক্তিরা শয়তানের প্রলোভনের প্রথম সারির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন। এক কথায় যাকে বলা যায় 'বিপজ্জনক'। এসব পদে নিযুক্ত ব্যক্তিরা যেহেতু ঈশ্বরের আহ্বান ও তালন্ত পেয়েছেন এবং মানুষের কাছেও তারা অনেক শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত– ফলে শয়তান তাদেরকে নিজ দলভুক্ত করার জন্য তাদের পদমর্যাদাজাত অহংকারকেই ব্যবহার করে থাকে। সে কারণেই তাদের সবসময় ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতায় বিনয়ীভাব লালন করতে হবে। তা না হলে শয়তান অবধারিতভাবে তাদের দোষী সাব্যস্ত করার মওকা পেয়ে যাবে। তাই, যারা মণ্ডলীর উঁচু পদে কর্মরত আছেন বিশ্বাসে তাদের আরও দৃঢ় হতে হবে।

(খ) শয়তান খ্রীষ্টকে যা বলেছিল, 'তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে' এই পৃথিবীর সামনে নিজেকে দেখাও এবং তোমার সাথে ঈশ্বরের সম্পর্কের বিষয়টি প্রমাণ করতে 'লাফ দিয়ে নিচে পড়'; প্রথমত, তাহলে লোকদের কাছে প্রমাণ হয়ে যাবে যে তুমি ঈশ্বরের পুত্র; কারণ এখান লাফ দেবার ফলে তুমি তো আর আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছ না! নিশ্চিতভাবেই ঈশ্বর তোমার জন্য বিশেষ সুরক্ষার ব্যবস্থা করে রাখবেন। ফলে এই আশ্চর্য কাজ দেখে লোকেরা তোমার সব কথা মেনে নেবে। তারা বুঝতে পারবে যে, এটা ঈশ্বরেরই কাজ (লুস্ত্রা শহরে পৌল একজন খোঁড়া লোককে সুস্থ করলে লোকেরা ঠিক এভাবেই বলেছিল, 'দেবতারা মানুষ হয়ে আমাদের মাঝে নেমে এসেছেন')। ট্র্যাডিশন থেকে জানা যায়, জাদুকর শিমোন এরকম উঁচু স্থান থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে, তার মাঝে ঈশ্বরের ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু অচিরেই তার এই দাবি ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়; আর দুঃখজনকভাবে সে মারাত্মক আহত হয়। দ্বিতীয়ত, 'শুধু তাই নয়, পুরো যিরূশালেম তোমাকে কৃতজ্ঞতা ভরে গ্রহণ করবে; তোমার এই আশ্চর্য কাজ দেখে লোকেরা নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারবে যে, স্বর্গ থেকে যাঁর আসবার কথা, তুমিই সেই খ্রীষ্ট। তারা যখন দেখবে যে, শাস্ত্রের কথামতোই প্রভু হঠাৎ তাঁর ঘরে এসে উপস্থিত হয়েছেন তখন তাঁরা সহজেই তোমার কথা শুনতে প্রস্তুত হবে' (মালাখি ৩:১)।

লক্ষ্য করুন, শয়তান এখানে বলেছিল, 'লাফ দিয়ে নিচে পড়'; কিন্তু সে তাঁকে নিচে ফেলে দিল না, যদিও চূড়ার ওপর থেকে নিচে ফেলে দেওয়ার জন্য কেবল একটা ছোট্ট ধাক্কাই যথেষ্ট ছিল। মনে রাখুন, শয়তানের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ; খ্রীষ্টকে প্রলুব্ধ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলেও বেঁধে দেওয়া গণ্ডির বাইরে তার যাওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। তবুও যদি শয়তান খ্রীষ্টকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দিত (ধরে নিই, তাকে সেই বিশেষ

মুহূর্তটির জন্য খ্রীষ্টকে নিচে ফেলে দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হলো) তবে তার কোন লাভ হতো না; কারণ তা কেবল খ্রীষ্টের দুঃখভোগ বলেই বিবেচিত হতো; কোন পাপের দায় তাঁর কাঁধে চাপানো যেত না। মনে রাখুন, আমাদের জীবনে যেসব সমস্যা আসে তা আমাদের কৃতকর্মের ফল হিসেবেই আসে। শয়তান আমাদের ওপর জোর খাটাতে পারে না; সে কেবল প্রলুব্ধ করে যায়। সে বলে, 'নিচে নামো, কিচ্ছু হবে না, আরে নামো তো'। সে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে প্রলুব্ধ করে যায়। যারা তার ডাকে সাড়া দিয়ে নিচে নেমে যায়, তাদের অজুহাত হয় ভিত্তিহীন। কারণ শয়তান তার ওপর জোর খাটায়নি, সে কেবল প্ররোচিত করেছে। তাই, আমাদের উচিত শয়তানের প্ররোচনায় পা না দিয়ে, নিজেদের পাপের আঘাত থেকে রক্ষা করা; মহান ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তিনি আমাদের তাঁর অনুগ্রহে পাপ থেকে পরিত্রাণ করেছেন। কোন শক্তিই আর আমাদের আঘাত করতে পারবে না (হিতোপদেশ ৯:১২)।

(গ) শয়তান এখানে যেভাবে পুনরায় শাস্ত্রের পদ উদ্ধৃত করে গেল তা লক্ষণীয়; কারণ পবিত্র শাস্ত্রে এই কথা লেখা আছে, 'ঈশ্বর তাঁর স্বর্গদূতদের তোমার সম্বন্ধে আদেশ দেবেন'। কিন্তু শৌলকে কি এখানে ভাববাদীদের অন্তর্ভুক্ত করা হল? তাৎক্ষণিকভাবে শয়তান কি শাস্ত্রের পদ মুখস্থ বলে যেতে পারল? তাও আবার সপ্রতিভ প্রাঞ্জল উপস্থাপনায়? দেখে যা মনে হচ্ছে, ঘটেছেও ঠিক তাই, হ্যাঁ সে শাস্ত্র সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখে। মনে রাখুন, ঈশ্বর এবং তাঁর লোকদের বিরোধিতাকারীদের মুখ থেকে শাস্ত্রের বিভিন্ন অংশের উদ্ধৃতি শুনে অবাক হবার কিছু নেই। শাস্ত্রের ওপর তাদের ভাল দখল থাকতে পারে; কিন্তু যেহেতু তাদের উদ্দেশ্য, অভিলাষ মন্দ তাই তারা যে পুস্তকী জ্ঞান অর্জন করেছে তা-ই তাদের দুঃখভোগ এবং ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। শয়তান খ্রীষ্টের সাথে কথা বলার সময় কখনো বিরক্ত বোধ করতো না; এর প্রমাণ আমরা পরবর্তীতে পাই যখন সে উপযাচক হয়ে খ্রীষ্টকে বলেছিল, 'আমি জানি তুমি কে'। শয়তান খ্রীষ্টকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ার জন্য প্রলুব্ধ করেছিল; সে হয়তো ভেবেছিল যে, তিনি নিজেই নিজের হন্তারক হবেন; আর তার সাথে ঈশ্বরের সব পরিকল্পনার দুঃখজনক ইতি ঘটবে। খ্রীষ্ট যে বিশেষ উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে এসেছিলেন তাকে সে ঈর্ষার চোখে দেখতো। ফলে সে তাঁকে এই বলে উৎসাহিত করতে চাইলো, 'লাফ দাও, ভয় কীসের! ঈশ্বরের স্বর্গদূতরা তো তোমাকে রক্ষা করবার জন্য রয়েছেনই।' শয়তান গীত ৯১:১১ পদ থেকে উদ্ধৃত করেছিল, 'তিনি তাঁর স্বর্গদূতদের তোমার সম্বন্ধে আদেশ দেবেন'। এই উদ্ধৃতিতে,

প্রথমত, এক দিকে দিয়ে কথাটা ঠিক ছিল। এটা সত্য যে ঈশ্বর বিভিন্ন সময়ে তাঁর ভাববাদীদের রক্ষা করবার জন্য স্বর্গদূতদের ব্যবহার করেছিলেন। দিয়াবল এটা তার অভিজ্ঞতা থেকেই জানত; এ কারণে তাকে বেশ কয়েকবার তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যর্থ হতে হয়েছিল। ইয়োবের বিষয়ে ঈশ্বরের কাছে অনুযোগ করার সময় সে এ বিষয়ে পরিষ্কার উল্লেখ করেছিল (ইয়োব ১:১০)। সে যে 'বেড়া' দিয়ে ইয়োবকে ঘিরে রাখার দিকে ইঙ্গিত করেছিল তা-ই ঈশ্বরের স্বর্গদূতদের সাহায্য, যা পরবর্তীতে শয়তান ভেঙে ফেলে ইয়োবকে পরীক্ষা করার জন্য এগিয়ে গিয়েছিল। শয়তান স্বর্গদূতদের সাহায্যের বিষয়ে খ্রীষ্টকে যা বলেছিল তা একদিক দিয়ে ঠিক ছিল। কারণ ভাববাদীদের মধ্য দিয়ে, ভাববাদীদের উদ্দেশ্যে বলা সব প্রতিজ্ঞার লক্ষ্যই তো খ্রীষ্ট। এই প্রতিজ্ঞাটি 'তাঁর সব হাড় তিনিই রক্ষা করবেন, একটিও ভাঙা হবে না' (গীত ৩৪:২০) পরবর্তীতে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা

পেয়েছিল (যোহন ১৯:৩৬)। খ্রীষ্টের নিমিত্তে স্বর্গদূতরা ধার্মিকদের পাহারা দেন (প্রকাশিত বাক্য ৭: ৫, ১১)।

দ্বিতীয়ত, এর মাঝে একটা মস্ত গলদ রয়ে গিয়েছিল; শয়তান তার নিজের প্রয়োজনেই এই প্রতিজ্ঞার বিকৃত ব্যবহারের প্রয়াস চালিয়েছিল; কারণ এই প্রতিজ্ঞার অন্তর্নিহিত অর্থ এবং বিভিন্ন সময়ে এর প্রয়োগ সে নিজেই চাক্ষুস করেছিল; তবুও সে তা করেছিল কারণ ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞার প্রতি হয়তো সে চরম ঘৃণা লালন করতো। এখানে দেখুন,

১. সে এর ব্যবহারিক বিকৃতি ঘটিয়ে রীতিমত অন্যায় একটি কাজ করতে উৎসাহী হয়েছিল। এখন আমরা দেখব, কীভাবে সে এই প্রতিজ্ঞার অপপ্রয়োগ করেছিল। আমরা প্রতিজ্ঞাটি দেখি, 'তারা তোমাকে ধরবেন;' কিন্তু কীভাবে? আমরা যদি ঈশ্বরের পথ থেকে সরে যাই, নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন না করি তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই আমরা ঈশ্বরের দেওয়া সুরক্ষা থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিই। যেহেতু শাস্ত্রের এই কথা প্রলোভনকারীর বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে, তাই এটা আশা করা অবশ্যই উচিত হবে না যে শয়তান একটা আস্ত বোকা, সে নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারতে চলেছে। শয়তান এখানে অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্তভাবে তার প্রলুব্ধ-কথনের প্রয়োগ দেখিয়েছে। কারণ খ্রীষ্ট যদি শয়তানের কথা শুনে নিচে লাফিয়ে পড়েন তবে তো তিনি ঈশ্বরের পথ থেকে সরে গিয়ে ঈশ্বরের সুরক্ষা ব্যবস্থা হারাবেন! শয়তানের ইচ্ছের বাস্তবায়ন ঘটালে ঈশ্বরের কাছ থেকে সব সুরক্ষা-সাহায্যের পথ আপনাতেই বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের শাস্ত্রের গভীর সত্য আবিষ্কারের জন্য আরও মনোযোগী এবং ঈশ্বরের সাহায্যের প্রত্যাশী হতে হবে। কারণ তা না করলে, শাস্ত্রের বিভিন্ন অংশের অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা আমাদের কাছে অজ্ঞাতই থেকে যাবে। তাই আমাদের বিরয়া শহরের যিহূদীদের মতো প্রতিদিন পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত (প্রেরিত ১৭:১০-১২)।

২. শয়তান এই প্রতিজ্ঞাকে নিজের স্বার্থে ভুল প্রয়োগ করার প্রয়াস চালিয়েছিল– যা ছিল একটি গর্হিত কাজ। পাপকর্মকে সমর্থন দেওয়ার জন্য শাস্ত্রের কোন অংশকে ব্যবহার করলে তাকে বলা হয় অপব্যাখ্যা। যারা শাস্ত্রের মানে ঘুরিয়ে বলে তারা নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনে (২ পিতর ৩:১৬)। সত্যের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিজ্ঞাকে শয়তান খ্রীষ্টের ক্ষেত্রে স্বর্গীয় সুরক্ষার দিকে ইঙ্গিত করে ব্যবহার করার মাধ্যমে এর অপব্যাখ্যা করেছিল। মনে রাখুন, ঈশ্বরের অনুগ্রহকে স্বেচ্ছাচারীর মতো ব্যবহার করে মানুষের পাপে পতিত হওয়াটা নতুন কিছু নয়। কিন্তু ঈশ্বরের অসীম ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে আমরা কি পাপেই পড়ে থাকব? শয়তানের ইচ্ছেমতো নিজেদের পাপের অন্ধকারে এই আশায় নিমজ্জিত করব যে ঈশ্বরের স্বর্গদূতরা আমাদের রক্ষা করবেন? ঈশ্বর আমাদের তা করতে নিষেধ করেন।

(১) এবারে আমরা দেখব, খ্রীষ্ট কীভাবে এই পরীক্ষাতেও জয়ী হলেন। তিনি শয়তানকে পূর্বেকার মতো এই বলে নিরস্ত করলেন 'শাস্ত্রে একথা লেখা আছে'। যদিও শয়তান শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকে নিজের মতো করে চালিয়ে দিয়েছিল তবুও তিনি সেই শাস্ত্র থেকেই উদ্ধৃত করলেন (দ্বিতীয় বিবরণ ৬:১৬), 'তুমি তোমার সদাপ্রভু ঈশ্বরকে পরীক্ষা করবে না'। এর মানে এই নয় যে, সে কারণেই তুমি আমাকে পরীক্ষা কোরো না; এর মানে, 'তাই আমি আমার পিতাকে পরীক্ষা করব না'। এখানে লক্ষণীয় যে, শাস্ত্রের যে অংশ থেকে খ্রীষ্ট উদ্ধৃতি টানলেন (দ্বি. বি. ৬:১৬) সেখানে বহুবচনে বলা হয়েছিল- 'তোমরা';

আর এখানে তিনি বললেন একবচনে– 'তুমি'। মনে রাখুন, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাসমূহ আমাদের কাছে ভিন্ন আবেদন তৈরি করে যখন আমরা নিজেদের এর উদ্দেশ্য কর্তারূপে চিন্তা করি। শয়তান বলেছিল, 'শাস্ত্রে একথা লেখা আছে', অনুরূপভাবে খ্রীষ্টও বলেছিলেন, 'শাস্ত্রে একথা লেখা আছে'; তার মানে এই নয় যে, শাস্ত্র স্ববিরোধী বক্তব্য দেয়। ঈশ্বর এক, তাঁর বাক্যও এক; এবং তাঁর মনে দ্বন্দ্বের স্থান নেই। ওটা ছিল প্রতিজ্ঞা; আর এটা হচ্ছে শিক্ষা। যে কারণে শাস্ত্র থেকেই এর ব্যখ্যা ও প্রয়োগের স্থান নির্ধারণ করা উচিত। এটা তো স্বীকৃত সত্য যে, শাস্ত্রই হচ্ছে শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকারী। তাই, যারা ঈশ্বরের বাক্যের ব্যখ্যা করতে উদ্যত হবেন তাদেরকে বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে এবং নিজেদের জীবনে তার প্রয়োগ ঘটানোর মাধ্যমেই তা করতে হবে (রোমীয় ১২:৬)।

খ্রীষ্ট যদি মন্দিরের চূড়া থেকে লাফিয়ে পড়তেন তবে তা হতো ঈশ্বরকে পরীক্ষা করার সমতুল্য। (ক) কারণ যা নিশ্চিত, প্রমাণিত তার নিজেকে প্রমাণের দায় নেই। খ্রীষ্ট জানতেন যে ঈশ্বর তাঁর পিতা; তিনি তাঁর প্রতি যত্নবান। এরই মাঝে তিনি তাঁর স্বর্গদূতদের খ্রীষ্টকে দেখাশোনা করার আদেশ দিয়ে রেখেছেন। তাই এই প্রামাণ্য বিষয়কে নতুন করে প্রমাণ করতে উদ্যত হওয়ার মানে হতো ঈশ্বরকে পরীক্ষা করা; যেমনটা ফরীশীরা খ্রীষ্টের কাছে স্বর্গীয় চিহ্ন দেখতে চেয়ে করেছিল। খ্রীষ্ট সেই ফরীশীদের এ ব্যাপারে নিরস্ত করে বলেছিলেন যে, তাদের মন কঠিন বলেই তারা কেবল চিহ্নের খোঁজ করে; অথচ পৃথিবীতেও তাদের বোঝার জন্য অনেক চিহ্ন রয়েছে। (খ) খ্রীষ্ট যে মহান কাজ করার জন্য আহূত হয়েছিলেন তার তুলনায় এটা ছিল খুবই তুচ্ছ। অর্থাৎ খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পরিকল্পনার বাইরে যাননি। ঈশ্বরের দেখানো পথের বাইরে যাওয়ার মানেই হচ্ছে তাঁর সাথে সব প্রকার সম্পর্কের অবসান। হ্যাঁ, তিনি আমাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা, নিরাপত্তা দানের বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমরা নিজে থেকে তাঁর পথের বাইরে গিয়ে বিপন্ন বোধ করলে তাঁর সাহায্য প্রত্যাশা করব। আমরা যদি তা করি তবে সেটা ঈশ্বরকে পরীক্ষা করার মতোই গর্হিত কাজ। কারণ ঈশ্বর তাঁর অসীম অনুগ্রহে আমাদের তাঁর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ করে দিয়েছেন। তিনি আমাদের উৎসাহ দেন, ভালবাসেন তা কেবল তাঁর বাধ্য হয়ে চলার জন্যই। কিন্তু আমরা যদি তাঁকে পরীক্ষা করি তবে তিনি অসন্তুষ্ট, ব্যথিত হন। ঈশ্বরের পথে চলার কথা বলে তাঁকে পরীক্ষা করাটা বাস্তবিকভাবেই স্ববিরোধী কাজ। আর এর মাধ্যমে আমরা এটাই প্রমাণ করি যে আমরা তাঁকে সম্মান দিতে জানি না। মনে রাখুন, আমরা যেন কখনো ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার বাইরে গিয়ে নিজেদের জন্য না ভাবি।

৩. এবারে আমরা শয়তানের তৃতীয় পরীক্ষার বিষয়ে দেখব– যা ছিল মূর্তিপূজার মতো জঘন্য। সে তার এই পরীক্ষায় পৃথিবীর রাজত্ব এবং গৌরবকে ব্যবহার করেছিল। লক্ষ্য করুন, (১) শয়তান কীভাবে খ্রীষ্টের কাছে এ বিষয়টি উত্থাপন করেছিল (৮, ৯ পদ)। তার এই পরীক্ষাটি ছিল মন্দতায় পূর্ণ; এই মন্দতা সে তার শেষ পরীক্ষার জন্যই জমিয়ে রেখেছিল। মনে রাখুন, শাস্ত্রে আমরা অনাকের বংশধরদের বিষয়ে দেখি; তাদের দেখে অনেকে ভয় পেত; এবং ঈশ্বরের ভাববাদীর কাছে শেষ বাধা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। আমাদের জীবনেও অনেক সময় এরকম 'অনাকের বংশধর'– এর খোঁজ মেলে। কিন্তু সেই বাধার কাছে নতজানু হয়ে পালিয়ে আসার ফল খুবই মারাত্মক। আমাদের জীবনে যে ধরনের পরীক্ষাই আসুক না কেন আমরা যেন তা উতরে যেতে আগ্রহী থাকি এবং শুধু কথায় নয়, কাজেও আমাদের তার প্রমাণ দিতে হবে। আমাদের শয়তানের সব চালাকির

বিরুদ্ধে শক্ত হয়ে আত্মিক যুদ্ধসাজ পরিধান করতে হবে।

খ্রীষ্টের কাছে শয়তানের নিয়ে আসার প্রলোভনের তৃতীয়টি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা পাই,

(ক) সে খ্রীষ্টকে পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য দেখাল। এবারে সে খ্রীষ্টকে একটা উঁচু পর্বতে নিয়ে গেল; নিজের প্রলোভনকে আরও জোরালো করে তোলার জন্য সে মন্দিরের চূড়া থেকে আরও উঁচু স্থানকে বেছে নিল– যেমন আমরা বিলিয়মের সাথে বালাকের কথোপকথনের বেলায় দেখি। শয়তান এখানে জায়গা বদল করল। তৃতীয় পরীক্ষাটি করবার জন্য সে মন্দিরের উচ্চতাকে যথেষ্ট মনে করল না। সে খ্রীষ্টকে– যাঁর আদেশ বা-তাসও শোনে– বাতাসের গতি-প্রকৃতির বাইরে আরও উঁচুতে নিয়ে যেতে চাইলো। সেখানে নিয়ে গিয়েই সে খ্রীষ্টকে তার রাজত্ব দেখাতে চাইলো। কেউ কেউ বলেন, এই পর্বতের অবস্থান ছিল যর্দনের অপরদিকে; তাদের এই কথার পেছনে যুক্তি হচ্ছে পরীক্ষার পর খ্রীষ্টকে এখানেই দেখা গিয়েছিল (যোহন ১:২৮, ২৯)। ধারণা করা হয়, এটাই সেই 'পিসগা' পর্বত যেখান থেকে ঈশ্বর মোশিকে গোটা কেনান দেশ দেখিয়েছিলেন। যদিও খ্রীষ্ট তখন যিহূদার আশপাশের জাঁকজমকহীন রাজ্যগুলো সম্পর্কে জানতেন, তবুও এটা তো সত্য যে, তিনিই পুরো পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন এবং সব কিছু তাঁরই শাসনাধীন। খ্রীষ্ট এদিক দিয়ে এগিয়ে ছিলেন। শয়তান চেয়েছিল খ্রীষ্ট এখনও পর্যন্ত যা দেখেননি পৃথিবীর সেই সব রাজ্য-জাঁকজমক দেখিয়ে তাঁকে বিভ্রান্ত করে দিতে। সে তা করতে মেঘের বায়োস্কোপ ব্যবহার করেছিল। একটা ল্যান্ডস্কেপের ভেতরে সে পৃথিবীর রাজ্য, তাদের জাঁকজমক, তাদের শাসনকাজ, সম্মান-শ্রদ্ধা গ্রহণের ভঙ্গিমা-সব কিছুর এক অপূর্ব বিন্যাস উপস্থাপন করেছিল। হ্যাঁ, শয়তান তা পারত; সে রঙের খেলায়, প্রাণবন্ত জাদুকরি ক্ষমতায় মানুষকে বিভ্রান্ত করতে সিদ্ধহস্ত। খ্রীষ্টকে সে পৃথিবীর রাজ্যসমূহ ও রাজাদের শৌর্য দেখাতে তাদের প্রাসাদ, সাজানো বাগান, দাসদাসী, অনুগত প্রজাদের একটা বিশ্বাসযোগ্য চিত্র তৈরি করেছিল। এরকম চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে শয়তান খ্রীষ্টের সাথে এক ধরনের রসিকতা করেছিল; কিন্তু খ্রীষ্ট যদিও তার এই ধোঁকাবাজি ধরতে পেরেছিলেন তবুও তিনি তাকে তার পালা শেষ করার জন্য সুযোগ দিচ্ছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে তিনি শয়তানের বিরুদ্ধে এক বর্ণাঢ্য বিজয় অর্জন করতে চলেছেন। তিনি কেবল ধৈর্য ধরে শয়তানের নিয়ে আসা এই দুঃখভোগ সহ্য করছিলেন।

তাই শয়তানের প্রলোভনের দিকে লক্ষ্য করুন; প্রথমত, খ্রীষ্টকে প্রলুব্ধ করার জন্য সে যে দৃশ্য দেখিয়েছিল তা ছিল মায়া, দাম্ভিকতায় পূর্ণ। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য শয়তান যা দেখায় তা কিন্তু সত্যিকারের রূপ নয়, বরং সে অনেকটা রঙচঙে আকর্ষণীয় করে তা উপস্থাপন করে। এ বিষয়টি আমরা এদন বাগানে মানুষ যখন প্রথম পাপ করল তখনও দেখতে পাই (আদি ৩:৬)। সেজন্যেই দেখার বিষয়ে আমাদের যথেষ্টই থাকতে হবে এবং ঈশ্বরের কাছে সবসময় প্রার্থনা করতে হবে যেন তিনি আমাদের চোখকে জাগতিক মোহগ্রস্ততা থেকে রক্ষা করেন। দ্বিতীয়ত, শয়তান তার প্রলোভনকে জাগতিক গরিমা দিয়ে পূর্ণ করে; মানুষকে প্রলুব্ধ করতে সে জাগতিক বিষয়-আশয়কে বেছে নেয়। দেহের কামনা, চোখের লোভ এবং সাংসারিক বিষয়ে অহংকার– এগুলোকেই শয়তান তার পরীক্ষার উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। তৃতীয়ত, যারা বিশ্বাসে দুর্বল শয়তান তাদের এভাবেই মিথ্যে লোভ দেখিয়ে ভোলাবার পাঁয়তারা করে। পাপ, দুঃখভোগ এবং মৃত্যুকে

আড়াল করে সে মানুষকে রঙচঙে, গৌরবে পূর্ণ অবস্থানে নিয়ে যাবার লোভ দেখায়; ফলে মানুষ তার এই ভণ্ডামি ধরতে না পেরে ঈশ্বরের পথ থেকে সরে গিয়ে নিজের ধ্বংস ডেকে আনে; হারায় সত্যিকারের জীবন ও গৌরব। চতুর্থত, মানুষ গভীরভাবে চিন্তা না করে বোকার মতো শয়তানের প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে, কারণ তার কাছে শয়তানের প্রলোভনগুলো অনেক প্রাণবন্ত, মোহনীয় মনে হয়। বৈষয়িক অহংকার খুবই খারাপ ব্যাপার, কারণ লাবনের বংশধরদেরও আমরা যাকোবের গৌরবময় অবস্থা দেখে হিংসা করতে দেখি।

(২) এবারে দেখুন, শয়তান খ্রীষ্টকে কী বলেছিল (৯ পদ), 'তুমি যদি মাটিতে পড়ে আমার উপাসনা কর তবে এসব জাঁকজমক আমি তোমাকে দেব'। শয়তানের প্রতিশ্রুতির বিষয়টি ভাবুন,

'এসব জাঁকজমক আমি তোমাকে দেব'। আগের দু'টি প্রলোভনে পরাজিত শয়তান প্রত্যক্ষ করেছিল খ্রীষ্ট তার কথামতো প্রমাণ করতে পারেননি যে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র। ফলে এবারে সে তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে তার বশ্যতা স্বীকার করতে বলল, 'শোনো, ঈশ্বর যে তোমার পিতা তা তো প্রমাণ করতে পারলে না; আসলে হয়তো তাঁর সাথে তোমার সেরকম সম্বন্ধ নেই। তার চেয়ে এক কাজ কর, আমার বশ্যতা স্বীকার করে নাও, তাহলে আমি তোমার ভার গ্রহণ করে তোমার সব চাহিদা মেটাবো।' মনে রাখুন, ঈশ্বরের লোকদের বিপথে নিয়ে যাবার জন্য শয়তান যে কথাটি বলে ঘায়েল করে থাকে, তা হচ্ছে 'এর সব কিছুই আমি তোমাকে দেব'। এখন কথা হল এই 'সবকিছুটা' কী? আসলে তা কেবল একটা জাদুর ছবি মাত্র– যার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। যারা তার ছলনায় ভোলে, শয়তান তাদের উচিত পুরস্কার হিসেবে 'বঞ্চনা'ই উপহার দিয়ে থাকে। একেবারে শয়তানের মতো কাজ! মনে রাখুন, অনেকে শয়তানের দেখানো ভবিষ্যতের ছবি সম্বন্ধে গভীরভাবে না ভেবে শুধুই ঠকে যায়। শয়তানের কপট প্রলোভনে ভুলে তারা কেবল শয়তানের দ্বারাই বঞ্চনার শিকার হয় না বরং নিজেরাও নিজেদের বঞ্চনা করে। 'পৃথিবীর সব রাজ্য খ্রীষ্টের হবে'– বহু আগেই ঈশ্বর এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। শয়তান এবারে তাঁর সামনে পরামর্শদাতা স্বর্গদূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। অনেকটা উপযাচক হয়েই সে ঈশ্বরের সেই প্রতিশ্রুতির বিষয়ে পরামর্শদানে উদ্যত হল। মনে রাখুন, ঈশ্বর আমাদের জন্য যেসব প্রতিজ্ঞা করেছেন তার বিষয়ে আমরা যেন কখনো শয়তানের কাছ থেকে কোন পরামর্শ গ্রহণ না করি। কারণ তা করলে সে আমাদের ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্কের অবসান ঘটাবে।

দ্বিতীয়ত, শয়তানের সেই শর্তটা কেমন ছিল? 'তুমি যদি মাটিতে পড়ে আমার উপাসনা কর'; কি জঘন্য, কি দুঃসাহস! নতুন দেবদেবী কিংবা ভূতদের উদ্দেশ্যে দেওয়া উপাসনা শয়তানই পেত, কারণ তারা সদাপ্রভু নয়; ফলে শয়তানকে এই পৃথিবীর অধিকর্তারূপে বিবেচনা করা হয় (২ করিন্থীয় ৪:৪; ১ করিন্থীয় ১০:২০)। খ্রীষ্ট যখন ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে প্রচার করার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন তখনই শয়তান তার ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে সানন্দে খ্রীষ্টকে প্ররোচিত করতে চাইলো। বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনাকারী অ যিহূদীরা যে খ্রীষ্টের কাছে আসবে এটা ভেবে শয়তান উদ্বিগ্ন হল। সে তার অনুসারীদের হারাতে চাইলো না। এখন আমাদের কাছে এটা পরিষ্কার যে, শয়তানের আনা কোন্ প্রলোভনটি সবচেয়ে নিকৃষ্ট। মনে রাখুন, ঈশ্বরের লোকদের সামনে অযাচিতভাবেই পাপের

প্রলোভন আসতে পারে, বিশেষ করে যখন তারা চারপাশের বিভিন্ন অসংগতি যেমন হত্যা, খারাপি, দুর্নীতির ঘটনাগুলো প্রত্যক্ষ করে। সেই ঘটনাগুলো তাদের মনে ছাপ ফেললেও তারা যদি তা মন থেকে গ্রহণ করে, নিজেদের ভেতরে তাকে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে তারা নিজেদের রক্ষা করতে সমর্থ হয়। তাদের সামনে এই যে প্রলোভন তা কিন্তু তাদের পাপের কারণে আসে না; ভেবে দেখুন শয়তান খ্রীষ্টকে তার উপাসনা করতে বলেছিল!

(২) খ্রীষ্ট কীভাবে শয়তানের এই প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তা দেখুন। তিনি শয়তানকে ধমক দিয়ে তার কাছ থেকে দূর হয়ে যেতে বললেন; তিনি শয়তানের কথামতো কাজ করতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকৃতি জানালেন।

(ক) খ্রীষ্ট ঘৃণা ও ধমকের সুরে শয়তানকে সামনে থেকে দূর হয়ে যেতে বললেন। আগের দু'টি প্রলোভনে কিছুটা হলেও মার্জিত ভাব ছিল, কিন্তু এবারেরটি এতই ঘৃণ্য আর নিকৃষ্ট যে খ্রীষ্ট সাথে সাথেই তা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। আমাদের কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুও যদি বলে যে, 'চল, আমরা গিয়ে দেবদেবীর উপাসনা করি' তবে তাদের কথায় যেন আমরা কান না দিই এবং তাদের যেন আমরা দৃষ্টান্তমূলক উত্তর দিই (দ্বিতীয় বিবরণ ১৩: ৬, ৮)। কিছু প্রলোভন থাকে যা খুবই প্রকাশ্য, বোঝাই যায় যে তা আমাদের মন্দতার দিকে নিয়ে যাবে, তখন যেন আমরা তাদের এই বলে প্রত্যাখ্যান করি, 'শয়তান, এখান থেকে দূর হয়ে যাও; এরকম মানসিকতা নিয়ে তুমি আমার সাথে থাকতে পারবে না'। আগের প্রলোভনদ্বয়ে শয়তান যা বলেছিল খ্রীষ্ট তা শুনেছিলেন এবং তাকে সুযোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু এবারে যখন সে পরিষ্কার ভাষায় সরাসরি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কথা বলে বসল তখন তিনি আর চুপ থাকতে পারলেন না। তিনি তাকে দূর হয়ে যেতে আদেশ করলেন। মনে রাখুন, এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, ঈশ্বরের সম্মান ও ধার্মিকতার বিরুদ্ধে গেলে ঈশ্বর ভয়ঙ্করভাবে রেগে যান। শুধু তাই নয়, ঈশ্বরকে যা রাগিয়ে তোলে সেই সব ঘৃণ্য কাজকে আমাদেরও কায়মনে ঘৃণা করা উচিত, তাহলে আমরা তা থেকে নিজেদের বিরত রাখতে পারব। মনে রাখুন, শয়তানের প্রলোভন থেকে নিজেদের বিরত রাখতে সেসবের বিষয়ে কোন আলোচনা কোথাও হচ্ছে দেখলে আমরা যেন তাতে কান না দিই।

(খ) খ্রীষ্ট শয়তানকে শাস্ত্র থেকে একটি উদ্ধৃতিদানের মাধ্যমে নিরস্ত করলেন। মনে রাখুন, আমাদের জীবনে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা ও বাক্যের উপস্থিতিই শয়তানের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আমাদের স্থির থাকতে সাহায্য করে। এজন্য পাপের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। শয়তানকে প্রত্যাখ্যান করতে খ্রীষ্ট খুবই প্রয়োজনীয় এবং পরিষ্কার একটি বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন (দ্বিতীয় বিবরণ ৬: ১৩ এবং ১০:২০), 'তুমি কেবল তোমার সদাপ্রভু ঈশ্বরকে ভয় করবে ও তাঁরই উপাসনা করবে।' খ্রীষ্ট আলোতে পূর্ণ স্বর্গদূতের বেশে থাকা শয়তানকে উপাসনা করতে স্বীকার করলেন না; বরং তিনি তাকে মনে করিয়ে দিলেন কে উপাসনা পাবার যোগ্য। মনে রাখুন, শয়তানের প্রলোভনকে প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে আমাদের ভাষ্য যেন অস্পষ্ট না হয়; আমরা যেন পরিষ্কার ভাষায় তার বিরুদ্ধে বলতে পারি, যেন আমাদের মাঝে বিন্দুমাত্র দুর্বলতা, ওজর-আপত্তির লেশ না থাকে। আমাদের ত্রাণকর্তা এখানে চিরন্তন সত্য-সিদ্ধ এক মৌলিক আদেশের বিষয়ে বললেন। মনে রাখুন, একমাত্র ঈশ্বরই উপাসনার যোগ্য। তিনি তাঁর কোন সৃষ্টিকে তাঁর গৌরবের ভাগ দিতে ইচ্ছুক নন। তাঁর পুত্রকে সম্মান জানানোর মাঝে মানুষ মূলত তাঁকেই সম্মান জানায়। খ্রীষ্ট ঈশ্বরের

সমান এবং তিনি ঈশ্বরের মাঝে থাকলেও তিনিও ঈশ্বরের প্রাপ্য উপাসনা চান না। একমাত্র ঈশ্বরেরই উপাসনা করা উচিত। খ্রীষ্ট তাঁর উক্তির মাধ্যমে ধর্মীয় উপাসনার দিকেই নির্দেশ করেছেন যেমনটা তিনি নিজেই ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতায় করেছিলেন। প্রথমত, নিজেকে নম্র করার মাধ্যমে তিনি নিজেকে ঈশ্বরের নিয়মের অধীন হিসেবে প্রকাশ করেছিলেন। ঈশ্বর হিসেবে যদিও তিনিই উপাসনা পেয়ে থাকেন তবুও মানুষ হিসেবে তিনি ঈশ্বরের উপাসনা করেছিলেন; উভয়ই ব্যক্তিগতভাবে এবং প্রকাশ্যে। নিজেকে ঈশ্বরের বাধ্য করার মাধ্যমে তিনি আমাদেরও প্রথমে ঈশ্বরের বাধ্য হতে শিক্ষা দেন। এভাবেই তাঁর মধ্য দিয়ে সমস্ত ধার্মিকতা পূর্ণ হয়। দ্বিতীয়ত, এর মাধ্যমে তিনি এটাও দেখাতে চাইলেন যে, ধর্মীয় উপাসনার মানে হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি চিরকালীন বাধ্যতা। যদিও তিনি উপাসনার স্থান বা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মচর্চার অসম্পূর্ণতার কথা বলেছেন; তবুও তিনি এই বিষয়ে পরিষ্কার শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, ঈশ্বরকে আত্মায় ও সত্যে উপাসনা করতে হবে। অর্থাৎ একমাত্র ঈশ্বরই উপাসনা পাবার যোগ্য।

ঙ. আমরা এখানে (১১ পদে) শয়তানের সাথে খ্রীষ্টের এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের সমাপ্তি দেখতে পাই। ঈশ্বরের সন্তানদের যদিও অনেক পরীক্ষার মোকাবেলা করতে হয়, তবুও এটা তো সত্যি যে, ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের সহ্যের অতিরিক্ত পরীক্ষার সামনে ফেলেন না (১ করিন্থীয় ১০:১৩)। যেহেতু সময়টা ভাল নয়, তাই বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে আসা সেই পরীক্ষা আমাদের কাছে কঠিন বলে মনে হয়।

১. খ্রীষ্টের কাছে পরাজয় স্বীকার করে শয়তান তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। খ্রীষ্ট এর দ্বারা আরও সম্মানিত ও গৌরবান্বিত হলেন। 'এখান থেকে দূর হও'– তাঁর এই কথার অন্তর্নিহিত শক্তিতে পরাস্ত হয়ে শয়তান বিদায় নিয়েছিল। শয়তানের এই চলে যাওয়াটা ছিল তার জন্য সত্যিই লজ্জাজনক; শয়তান তার প্রলোভনগুলোকে যতটা বুদ্ধিদীপ্ততা, প্রচেষ্টা দ্বারা সাজিয়েছিল খ্রীষ্ট ততোধিক পরাক্রমে শয়তানকে একরাশ লজ্জা, ব্যর্থতার হতাশা উপহার দিয়েছিলেন। যাহোক, শয়তানের যে প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল তা ছিল খুবই মারাত্মক। সে খ্রীষ্টকে পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যের লোভ দেখিয়েও যখন ভোলাতে পারল না তখন সে খ্রীষ্টের আত্মিক শক্তিমত্তার বিষয় অনুধাবনে সচেষ্ট হল। সে তাঁকে 'মানুষের চেয়েও উর্ধ্বে' দেখতে পেল। যে প্রলোভনে পৃথিবীর মানুষ সহজেই তার কাছে নতি স্বীকার করেছে, সেই প্রলোভন খ্রীষ্টের কাছে বিফল হয়েছে– এটা ভেবে সে নিরস্ত হয়ে পরাজয় স্বীকার করে শেষ পর্যন্ত দ্বন্দ্বক্ষেত্র ত্যাগ করল। কারণ সে বুঝতে পেরেছিল যে এরকম প্রলোভন যাঁকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারে না তিনি আর কোন প্রলোভনেই পরাজয় স্বীকার করবেন না।

মনে রাখুন, শয়তানের প্রচেষ্টা আমাদের কাছে প্রতিহত হলে সে চলে যায়। কিন্তু আমাদের তখন নিজেদের অন্তরকে ভালভাবে পাহারা দিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যেন শয়তান আর ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। 'রূতকে তাঁর সিদ্ধান্তে দৃঢ় থাকতে দেখে তাঁর শাশুড়ি নওমী তাঁর সাথে আর কথা বলতে এগুলেন না'। শয়তান যখন খ্রীষ্টকে ছেড়ে চলে গেল তখন সে নিজেকে পরাজিত রূপে আবিষ্কার করল; তার প্রচেষ্টা বিফল হওয়ায় খ্রীষ্টের গোড়ালির আঘাতে নিজের মস্তক চূর্ণ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি অনুধাবন করতে সমর্থ হল। ফলে খ্রীষ্টকে ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া তার ভিন্ন উপায় ছিল না; খ্রীষ্টের সাথে কিছুতেই না পেরে সে লড়াইয়ের মাঠ থেকে বিদায় নিল। মনে রাখুন, শয়তান ঈশ্বরের

লোকদের শত্রু, তবে সে এখন পরাজিত; আমাদের ত্রাণকর্তা তাকে হারিয়ে দিয়েছেন। আমরা এই মহাবিজয় তাই উদ্‌যাপন করতে পারি।

২. শয়তানের চলে যাওয়ার পর 'ঈশ্বরের স্বর্গদূতরা এসে তাঁর সেবা করতে লাগলেন'। তারা এসেছিলেন দৃশ্যমান চেহারা নিয়ে, যেমনটা আমরা শয়তানের বেলায় দেখেছিলাম। শয়তান যখন খ্রীষ্টকে পরীক্ষায় ফেলার চেষ্টা করছিল এই স্বর্গদূতরা তখন একটু দূরে দাঁড়িয়ে তা লক্ষ্য করছিলেন। তারা অপেক্ষা করছিলেন কখন শয়তান খ্রীষ্টের শক্তির কাছে পরাজিত হয়ে বিফল মনোরথে চলে যায়, আর খ্রীষ্ট লাভ করেন অসাধারণ, বর্ণিল বিজয়। পরবর্তীতে আমরা মিখাইল ও তাঁর স্বর্গদূতদের ড্রাগন ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখি। এটা ভাবার কোন কারণ নেই যে, খ্রীষ্ট তাদের ছাড়া কিছু করতে পারেন না বা তাদের সাহায্য তাঁর প্রয়োজন; বরং তিনিই যে তাদের বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়ে সম্মানিত করেছেন এটা পরিষ্কার বোঝা যায়। একজন স্বর্গদূতের ওপর তাঁর খাবার সরবরাহের ভার থাকলেও এখানে আমরা অনেক স্বর্গদূতের উপস্থিতির বিষয়টি দেখি। তারা এটা করেছিলেন যেন খ্রীষ্টে তাদের আনুগত্য প্রদর্শিত হয় এবং তারা তাঁর আদেশ তামিল করতে পারেন। গভীরভাবে লক্ষ্য করুন,

(১) পাপে পূর্ণ এই পৃথিবীতে অনেক সমস্যা, প্রতিবন্ধকতার সাথে ঈশ্বরের প্রিয় বিশ্বাসীদের ও মণ্ডলীগুলোকে লড়াই করতে হচ্ছে। কিন্তু পবিত্র পৃথিবীতে প্রবেশ করার পর পরই ঈশ্বরের আশীর্বাদের আত্মা ঈশ্বরের বিশ্বাসীদের সেবায় নিয়োজিত হবেন। শয়তানের সাথে লড়াইয়ের সূত্র ধরে আমাদের সাথে স্বর্গদূতদের এক অপূর্ব যোগাযোগ তৈরি হয়।

(২) খ্রীষ্টের বিজয়ের অংশী হয়ে তাঁর সাফল্যে উদ্ভাসিত হতে স্বর্গদূতরা ঈশ্বরের গৌরব করতে করতে, খ্রীষ্টের বিজয়-সঙ্গীত গাইতে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন। অশুভ ড্রাগনকে গর্তে ফেলে দেবার পর যেভাবে উদাত্ত কণ্ঠে বিজয়ের গান ধ্বনিত হয়েছিল (প্রকাশিত বাক্য ১২:৯, ১০), সেভাবেই তাঁরা খ্রীষ্টে আনন্দ উল্লাস করতে লাগলেন। কারণ এখন প্রভুতে পরিত্রাণ এবং শক্তি এসেছে। (৩) স্বর্গদূতরা খ্রীষ্টকে শুধু খাবারই নয় উপরন্তু তিনি যা চাইলেন সবকিছু দিয়ে তার সেবা করল। এখানে আমরা খ্রীষ্টের কর্তৃত্বপূর্ণ আচরণ এবং বিনম্রতার এক আশ্চর্য সাম্য দেখতে পাই। তিনি যেমন মানবীয় দুর্বলতাকে মেনে নিয়ে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতায় ক্রুশীয় মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন, তেমনি ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতা প্রয়োগে তিন দিনের দিন মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছিলেন। শয়তানের পরীক্ষা মোকাবেলার সময় তিনি দুর্বল, ক্ষুধার্ত ছিলেন, কিন্তু তার বিদায়ের পর তিনি তাঁর স্বর্গীয় ক্ষমতায় স্বর্গদূতদের তাঁর প্রয়োজন মেটাতে আদেশ দিলেন। এভাবে মনুষ্যপুত্র স্বর্গদূতদের মাধ্যমে পাঠানো খাবার খেয়েছিলেন যেরকমটা আমরা এলিয়ের বেলায় দেখি; মরুভূমিতে ঈশ্বরের একজন স্বর্গদূত তাকে খাবার সরবরাহ করতেন (১ রাজাবলি ১৯:৪, ৭)। মনে রাখুন, অনেক সময় ঈশ্বরের লোকদের বিভিন্ন প্রয়োজন নিয়ে দুঃখভোগ করতে দেখা যায়; কিন্তু তাঁদের জন্য সান্ত্বনার বিষয় হচ্ছে যে ঈশ্বরের তাঁদের প্রয়োজনের বিষয়ে জানেন; প্রয়োজনে তিনি তাঁর লোকদের প্রয়োজন মেটাতে স্বর্গদূতদের পাঠিয়ে দেবেন; কারণ তিনি তাঁর লোকদের ভালবাসেন। 'সদাপ্রভুর ওপর বিশ্বাস রাখ এবং ভাল কাজ কর' তাহলে তিনি তোমার প্রয়োজনীয় খাবার জোগাবেন (গীত ৩৭:৩)।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর খ্রীষ্টের জন্য স্বর্গীয় সাহায্য এল, (ক) কারণ তিনি যেন তাঁর সমাগত কার্যক্রমের জন্য উৎসাহিত হন। এর মাধ্যমে তিনি শয়তানের শক্তির

মুখোমুখি হওয়ার সময় তাঁর পাশে স্বর্গীয় ক্ষমতার উপস্থিতির বিষয়ে নিশ্চিত হতে পেরেছিলেন। (খ) যেন এর মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপনে উৎসাহী হই; কারণ খ্রীষ্ট নিজে পরীক্ষায় আনীত হয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে তা কতটা কষ্টদায়ক; ফলে তিনি জানেন, ঠিক কী রকম সহযোগিতা আমাদের প্রয়োজন। তাই এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি যে, তিনি আমাদের দরকারি সব সাহায্য নিয়ে আমাদের মহান মল্কিষেদকের মতো আসবেন, যিনি যুদ্ধফেরত অব্রাহামের সাথে দেখা করেছিলেন। খ্রীষ্ট এখানে যেভাবে স্বর্গদূতদের তাঁর প্রয়োজন মেটানোর জন্য আদেশ দিয়েছিলেন সেভাবে তিনি আমাদের জন্যও স্বর্গদূতদের আদেশ দেবেন।

মথি ৪:১২-১৭

এখানে আমরা খ্রীষ্টের গালীলে প্রচার-কাজের বিষয়ে দেখতে পাই। মানুষকে পাপ থেকে পরিত্রাণদানের জন্যই তিনি এই পৃথিবীতে এসেছিলেন; পরিত্রাণ পাবার কথা তিনিই প্রথম বলেন (ইব্রীয় ২:৩)। খ্রীষ্ট যেভাবে মানুষের পরিত্রাণের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন সেভাবে আমাদেরও পরিত্রাণের বিষয়ে সবার কাছে প্রচার করার জন্য আন্তরিক হতে হবে।

অপর তিন সুসমাচার-লেখকের মাঝে যোহনের লেখায় খ্রীষ্টের জীবন বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে; সেখানে তিনি এমন কতগুলো ঘটনার উল্লেখ করেছেন যা অপর তিন সুসমাচারে পাওয়া যায় না। যেমন খ্রীষ্টের পরীক্ষা এবং গালীলে তাঁর প্রচারের মাঝে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ এখানে দেখতে পাওয়া যায়। তাঁকে উদ্দেশ্য করে যোহন যখন বললেন, 'ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশিশু'– তখন মাত্রই খ্রীষ্ট শয়তানকে পরাজিত করে ফিরছেন (যোহন ১:২৯)। এরপর তিনি উদ্ধার-পর্বের সময় যিরূশালেমে গেলেন (যোহন ২ অধ্যায়), নীকদীমের সাথে কথোপকথনে মিলিত হলেন (যোহন ৩ অধ্যায়); তারপর তাঁকে দেখা গেল সামেরীয় নারীর সাথে (যোহন ৪ অধ্যায়); এরপরই তিনি গালীলে ফিরে আসেন এবং প্রচার করতে শুরু করেন। কিন্তু মথি খ্রীষ্টের গালীলে প্রচারের ঘটনাটি দিয়েই তাঁর কাজের আরম্ভের কাহিনী শুরু করেছেন; কারণ গালীল ছিল তার আবাসস্থল। লক্ষ্য করুন,

ক. সেই সময়ের প্রতি, যখন খ্রীষ্ট 'যোহনকে জেলখানায় বন্দি করে রাখা হয়েছে' শুনে গালীলে চলে গেলেন (১২ পদ)। মনে রাখুন, প্রভু যীশুর কানে দুঃখার্ত বিশ্বাসীদের কান্না পৌঁছায়। যোহন জেলে আছেন শুনেও খ্রীষ্ট কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন না; তিনি সবকিছুকে ঈশ্বরের পরিকল্পনা মতো ঘটতে দিলেন। তিনি তখন স্মরণ করলেন তাঁর লোকদের জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা বাকি আছে। ভেবে দেখুন,

১. 'যোহন জেলে' শুনেও তিনি শহরের দিকে অগ্রসর হলেন না। এর কারণ যোহন খ্রীষ্টের পথ প্রস্তুত করার জন্য পর্যাপ্ত সময় পেয়েছিলেন; এবং তিনি তা সার্থকভাবে কাজেও লাগিয়েছিলেন। হতে পারে যে ঈশ্বর চাইলেন না খ্রীষ্ট এবং যোহন দু'জন একই সাথে কাজ করে যান; এতে করে লোকেরা হয়তো দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়তো। খ্রীষ্টের উজ্জ্বল উত্থানে যোহন যে ক্রমশ নিস্প্রভ হয়ে পড়বেন– এটা তো প্রত্যাশিতই। উভয়ে একসাথে কাজ করতে থাকলে লোকদের মাঝে কেউ বলবে 'আমি যোহনের', আবার অন্য কেউ বলবে,

'আমি খ্রীষ্টের'। ফলে এক ধরনের দ্বন্দ্বমুখর পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। যোহন ছিলেন খ্রীষ্টের অগ্রদূত, প্রতিদ্বন্দ্বী নন। পুবের আকাশে সূর্য উঠলে চাঁদ-তারা যেমন নিস্প্রভ হয়ে পড়ে তেমনি যোহনের লোকদের কাছে পাপ থেকে মন ফেরানোর এবং খ্রীষ্টের আগমনের বিষয়ে প্রচার করার মাধ্যমে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করেছিলেন। তার-পর তিনি তাঁর কাজ অব্যাহতি নিলেন। 'তাদের সাক্ষ্য দেওয়া শেষ হলে পর নরক থেকে একটা জন্তু উঠে এসে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে এবং তাদের পরাজিত করে হত্যা করবে' (প্রকাশিত বাক্য ১১:৭)।

২. 'যোহন জেলে'– একথা শোনার অব্যবহিত সময় পর তিনি যে শহরে গিয়েছিলেন তা কেবল নিরাপত্তা বিধানের জন্য নয়, বরং তিনি সেখানে গিয়েছিলেন যোহনের প্রস্তুতকৃত ক্ষেত্রে নিজের গৌরব প্রকাশের জন্য; যদিও যিহূদিয়ায় সে সময় ফরীশীরা যোহনের শত্রু হেরোদের চেয়েও খ্রীষ্টের জন্য চরম শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। মনে রাখুন, ঈশ্বরের সাক্ষ্য, পরিচালনা কখনো আমাদের ছেড়ে যায় না; যেমন তিনি সবসময় তাঁর মণ্ডলীকে পরিচালনা দান করেন। তিনি যদি কাউকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন তবে একথা নিশ্চিত যে তিনি তাঁর গৌরব প্রকাশার্থেই শীঘ্র আরেকজনকে তুলবেন। বর্তমানে তিনি আমাদের মাঝে পবিত্র আত্মার মাধ্যমে কাজ করছেন। 'আমার দাস মোশি মারা গেছে', যোহন জেলে বন্দি; কিন্তু তাতে কি, যিহোশূয়র ন্যায় যীশু তো তাঁর কাজ শুরু করেছেন!

খ. লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট গালীলে প্রচার করছিলেন; সে সময় গালীলকে প্রত্যন্ত অঞ্চল বলে ধরা হতো; যিরূশালেম থেকে অপেক্ষাকৃত নিচুতে অবস্থিত এই অঞ্চলকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকেরা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতো; ভৌগোলিকভাবেই এখানকার মানুষজন হৃষ্টপুষ্ট হতো; সামরিক বাহিনীর সদস্য হিসেবে যাদের কোন তুলনা ছিল না, কিন্তু মার্জিত, ভদ্রলোক কিংবা মেধাবীদের জন্য এই অঞ্চল মোটেই সুবিধের ছিল না। কিন্তু খ্রীষ্ট এখানেই তাঁর সুসমাচার প্রচারের কাজ শুরু করেছিলেন। এই ঘটনার দ্বারা আমরা খ্রীষ্টের বিনম্রতার আরেকটি অনন্য উদাহরণ প্রত্যক্ষ করি। আসুন, একটু পর্যবেক্ষণ করা যাক,

১. আবাসস্থল হিসেবে খ্রীষ্ট গালীলকে বেছে নিয়েছিলেন; যেখানে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন সেই নাসরতকে নয়; ১৩ পদে এ বিষয়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে। অবশ্য নাসরত ছেড়ে আসার পেছনে সুনির্দিষ্ট কারণও ছিল: 'তারা যীশুকে গ্রামের বাইরে তাড়িয়ে নিয়ে গেল' (লূক ৪:২৯)। খ্রীষ্ট কিন্তু প্রথমে নাসরতকেই বেছে নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু সেখানকার লোকেরা তাঁর সেই শিক্ষা গ্রহণ করেনি। তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তাঁর প্রতি রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিল; ফলে খ্রীষ্ট নাসরত ছেড়ে চলে আসেন। আসার আগে সেখানে তিনি তাঁর পায়ের ধুলা ঝেড়ে এসেছিলেন, যেন তা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়; কারণ তারা তাঁর শিক্ষা শুনতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। নাসরতই প্রথম অঞ্চল যেখানকার লোকেরা যীশুকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, পরে তিনিও তাদের প্রত্যাখ্যান করেন। মনে রাখুন, খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে নাসরতবাসী ঈশ্বরের অনুগ্রহকেও প্রত্যাখ্যান করেছিল। খ্রীষ্ট যেখানে বিরূপ ব্যবহার পেয়েছেন সেখানে তিনি বেশি দিন থাকেননি। অস-ুখী নাসরত! তারা ঈশ্বরের দিন দেখার সুযোগ পেয়েও হারিয়েছে; খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি হারিয়েছে।

কিন্তু খ্রীষ্ট সাগর পারের কফরনাহূম শহরে গেলেন। গালীলের একটি শহর এই কফরনাহূম; নাসরত থেকে যদিও তা অনেক দূরে অবস্থিত। আশ্রয় গ্রহণের জন্য উপযোগী

এই শহর ছিল গালীল সাগরের (একে গিনেষরৎ হ্রদ বলেও ডাকা হতো) উত্তর পশ্চিম তীরে; যর্দন নদী ও গালীল সাগরের মিলিত স্থান থেকে আড়াই মাইল উত্তরে এর অবস্থান। এখানে নপ্তালি গোষ্ঠী বাস করতো; অবশ্য সবূলুনদের এলাকার সাথে এর সীমান্ত সম্পর্ক ছিল। খ্রীষ্ট সাগর পার থেকে এই জায়গাতেই এসেছিলেন। অনেকে মনে করেন, তাঁর পিতা যোষেফ এখানে কিছুকালের জন্য বসবাস করেছিলেন; সেখানে তার একটি ছোট্ট ঘর ছিল। আবার অন্যরা মনে করেন, তিনি শিমোন পিতরের বাড়িতে থাকতেন; যাহোক, তিনি এখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করেননি। ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশার্থে তিনি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন; কিন্তু কফরনাহূমকে তিনি তাঁর কাজের কেন্দ্রস্থল হিসেবে ব্যবহার করতেন; তিনি যে সামান্য বিশ্রাম নিতেন তা এখানেই। এই জায়গাটাকে তিনি নিজের করে নিয়েছিলেন, যদিও ব্যক্তিগতভাবে তিনি কোন জায়গা ক্রয় করেননি, কেবল মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই হিসেবে তিনি একে বেছে নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাই যে, এখানকার লোকেরা তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিল এবং নাসরতের চেয়েও এখানে অনেক বেশি হারে আদৃত-আপ্যায়িত হয়েছিলেন। মনে রাখুন, কেউ খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করলেও অন্যরা তাঁকে অবশ্যই স্বাগত জানাবে। খ্রীষ্ট নাসরত ছেড়ে আসায় কফরনাহূম আনন্দিত হয়েছিল। যীশুকে তাঁর নিজ গ্রামের লোকেরা প্রত্যাখ্যান করলেও তিনি গৌরবান্বিত হতে চলেছেন। "আর তুমি, কফরনাহূম, সেই সময় এখন উপস্থিত; তোমাকে যে স্বর্গ পর্যন্ত উঁচুতে তোলার কথা বলা হয়েছে তা বাস্তবায়ন করতে যিনি তোমার বুকে এসেছেন, তাঁর শিক্ষা শুনে তা পালন করতে আগ্রহী হও।"

২. খ্রীষ্টের কফরনাহূমে আসার ফলে ভাববাদী যিশাইয়র মধ্য দিয়ে বলা যে কথা পূর্ণ হয়েছিল সে বিষয়ে আমরা দেখি ১৪-১৬ পদে। এখানে যিশাইয় ৯:১, ২ পদ উদ্ধৃত হয়েছে, একটু ভিন্নভাবে। সুসমাচার লেখক এখানে ভাববাদীর বলা কথার শেষের অংশটির প্রতি জোর দিয়েছেন– যা মূলত স্বাধীনতার বিষয়েই বলা হয়েছিল। সেখানে আশা প্রকাশ করা হয়েছিল যে, অন্ধকারের পরাধীনতায় আবদ্ধ দেশগুলো (প্রথমবার এরা পরাধীনতা বরণ করে বিনহদদের কাছে; ১ রাজাবলি ১৫:২০ এবং দ্বিতীয়বার আসিরীয়দের কাছে; ২ রাজাবলি ১৫:২৯) স্বাধীনতার আলো দেখতে পাবে। কিন্তু সুসমাচার লেখক এখানে সেই জাগতিক স্বাধীনতার স্থলে 'সুসমাচারের আলো'কে স্থাপন করেছেন। খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রত্যাখ্যানকারী যিহূদী জাতির অবস্থা হবে আরও ভয়াবহ (দেখুন যিশাইয় ৮:২১, ২২); যদিও যিশাইয় ভাববাদী একটি ভিন্ন বোধ থেকে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীটি করেছিলেন (৯:২ পদ) তবুও এটা তো সত্যি যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, ভিন্ন সময়েও শাস্ত্রের কথা পূর্ণ হয়ে থাকে। আর সুসমাচার লেখক এখানে যিশাইয়র করা ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয় স্তবকটি নিয়েছিলেন– যা পর-াধীনতার অন্ধকারে থাকা দেশগুলোর স্বাধীনতার আলো দেখতে পাবার বিষয়ে বলা হয়েছিল; আর এখানে তিনি সেই স্বাধীনতা বলতে চিরস্থায়ী আত্মিক স্বাধীনতার বিষয়েই নির্দেশ করেছেন।

এখানে যে জায়গার বিষয়ে বলা হয়েছে তা লক্ষ্য করুন (১৫ পদ)। সবূলুনকে সবাই চিনতো সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল হিসেবে। এজন্য জায়গাটা প্রসিদ্ধ ছিল। একে বলা হতো 'জাহাজের তীর্থস্থান'; যে কিনা দিন-রাত জাহাজের আসা-যাওয়ায় ব্যস্ত থাকতো (আদি ৪৯:১৩; দ্বি.বি. ৩৩:১৮)। অন্যদিকে নপ্তালি সম্পর্কে শাস্ত্রে বলা হয়েছিল, 'সে ভাল কথা উপহার দেবে' (আদি ৪৯:২১) এবং 'সে অনুগ্রহ লাভে ধন্য হবে' (দ্বি.বি. ৩৩:২৩); কারণ

তার মধ্য থেকেই সুসমাচার প্রচারের কাজের সূচনা হবে। সেই সুসমাচার বাস্তবিকই ভাল কথা এবং তা ঈশ্বরের অনুগ্রহ বয়ে আনে। যর্দনের অন্য পারের এলাকাগুলোতে আমরা খ্রীষ্টকে অনেক সময় প্রচার করতে দেখি। বাকি রইল অযিহূদী অধ্যুষিত গালীল। অযিহূদীরা এখানকার উঁচু এলাকাকে আবাসস্থল হিসেবে বেছে নিয়েছিল। সেখানে অবশ্য যিহূদীরা বাস করতো। আত্মিকভাবে দরিদ্র গালীলের অযিহূদীরা খ্রীষ্টের সুসমাচারের আলো দেখতে পাবে– এতে ঈশ্বরের অনুগ্রহেরই প্রকাশ ঘটে। খ্রীষ্ট কফরনাহূমে আসলে এসব এলাকার লোকেরা সুসমাচারের বিষয়ে জানতে পেল। এর ফলে বাস্তবিকই এই লোকদের কাছে ঈশ্বরের ধার্মিকতার সূর্য– মহাজ্যোতি প্রকাশিত হলেন।

এখন, এসব এলাকার লোকদের সম্পর্কে কী বলা হয়েছে তা দেখুন,

(ক) 'যারা অন্ধকারে বাস করে' তারা খ্রীষ্টের সুসমাচার শুনতে পেল (১৬ পদ); মনে রাখুন, যারা খ্রীষ্টকে জানেনি তারা অন্ধকারের বাসিন্দা; বলা চলে তারা নিজেরাই 'অন্ধকার বিশেষ'। শুধু তাই নয়, তারা মৃত্যুর ছায়া এবং রাজত্বের অধীন। তাদের মুখে সবসময় অন্ধকার খেলা করে যায়। 'ঘন অন্ধকার' বলতে এখানে কঠিন বিপদাপন্ন, পাপের অন্ধকারে ছেয়ে যাওয়া ভূমির কথা বোঝানো হয়েছে। আরও নির্দিষ্ট করে বলা যায় এখানকার মানুষজন এমন রোগীর মতো যে সুস্থ হতে চায় না; জাগতিকতার বিচারে তারা হয়তো মৃত ছিল না, কিন্তু আত্মিকভাবে তারা ছিল মৃত, যারা বাস করে 'মৃত্যুর ছায়াময় উপত্যকায়'। ব্যবস্থার বিচারে তারা পুরোপুরিভাবে অভিশপ্ত– মৃত না হলেও তার কাছাকাছিই ছিল এদের অবস্থান। এই ভয়াবহ অন্ধাকারাচ্ছন্ন জীবন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তাদের কোন চেষ্টাও ছিল না; মূলত তারা এই অন্ধকারকে ভালবেসে ফেলেছিল। নিজেদের জীবনে তারা আলোর চেয়ে অন্ধকারকেই অধিক মাত্রায় কাজ করতে দিয়েছিল। তারা ইচ্ছাকৃতভাবেই অন্ধ ছিল। তাদের যে দুঃখজনক অবস্থা তা বর্তমানেও অনেক জাতি ও দেশের মাঝে বিরাজমান। তারা যাতে সুসমাচারের বিষয়ে জানতে পারে সেজন্য অনেক প্রার্থনা করা হচ্ছে; গৃহীত হচ্ছে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ। কিন্তু যারা সুসমাচারের আলোর মাঝে থেকেও অন্ধকারকে প্রশ্রয় দেয়, তাদের অবস্থা সেই জাতি ও শহরগুলোর চেয়েও করুণ। যারা অন্ধকারের বাসিন্দা তাদের তো তাও সুসমাচারের আলোতে নিজেদের আলোকিত করার সম্ভাবনা অপেক্ষা আছে; কিন্তু যারা সুসমাচারের আলোতে থেকেও অন্ধকারের দিকে ঝুঁকে আছে তারা আসলে অন্ধ। তাদের চোখ খোলার আশু সম্ভাবনা নেই। আমরা যারা সেই আলো পেয়েছি তারা কি সেই আলোতে পৃথিবীর তাবৎ অন্ধকারে থাকা মানুষকে আলো দান করতে পারছি?

(খ) খ্রীষ্ট যখন সেই অন্ধকারের বাসিন্দাদের জন্য সুসমাচার নিয়ে আসলেন তখন তা তাদের জন্য কত না উদ্দীপনা বয়ে এনেছিল! আঁধারে ও মৃত্যুর রাজত্বে বাসকারী সেই লোকদের জন্য সেটা ছিল চমৎকার এক সুযোগ। মনে রাখুন, খ্রীষ্টের সুসমাচারের আলো যে স্থানে, যে আত্মায় দেখা যাবে সেখানে অবশ্যই আলোর বহিঃপ্রকাশ ঘটবে (যোহন ৩:১৯, লূক ১:৭৮, ৭৯)। আলো আবিষ্কার করে, পথ দেখায়– তাই সুসমাচার হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট আলো।

'মহা জ্যোতি' বলতে এখানে সুসমাচার প্রকাশিত হওয়ার বিষয়ে বলা হয়েছে; এটা কোন মোমের আলো নয়। বরং তা সূর্যের সমান তেজে আপন শক্তিতে এগিয়ে যায়। ব্যবস্থার টিমটিমে আলোর সাথে এই মহানূরের কোন তুলনা চলে না; কারণ ঈশ্বরের

অনুগ্রহে পাওয়া পরিত্রাণের সুসমাচার অনেক শক্তিশালী, বিপুল আলোকশক্তির অধিকারী। এই মহাজ্যোতি অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তা জ্বলেও দীর্ঘ সময় ধরে; মানুষকে সঠিক পথনির্দেশ করতে এই মহানূরের কোন বিকল্প নেই। সুসমাচারের এই আলো সবসময় বাড়তে থাকে। একজনের কাছ থেকে আরেকজন– এভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে যায়। যারা অন্ধকারে বাস করে, তারা সেই মহাজ্যোতি দেখতে পাবে; আরও বেশি করে। সুসমাচারের রাজ্য অনেকটা গুচ্ছ হয়ে থাকা শস্যবীজের মতো অথবা ভোরের আলোর মতো; শুরুতে যা ছোট মনে হয় কিন্তু ধীরে ধীরে তা অর্থপূর্ণভাবে চারদিকে জানান দিয়ে বাড়তে থাকে।

লক্ষ্য করুন, সেই আলো তাদের কাছে প্রকাশিত হল; যদিও লোকেরা এই আলোর সন্ধান করে নি; তবুও তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে নিরূপিত সময়ে সুসমাচারের আলো দেখতে পেল। যতক্ষণ না তা তাদের কাছে প্রকাশিত হল, ততক্ষণ তারা এর বিষয়ে অজ্ঞ ছিল। কিন্তু এমন একজনের মাধ্যমে তারা সুসমাচার পেল, 'যিনি সকালকে আদেশ দেন এবং ভোরকে তার পথ দেখিয়ে দেন যেন পৃথিবীর কিনারা ধরে দুষ্টদের সেখান থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেন' (ইয়োব ৩৮:১২, ১৩)।

(গ) তিনি যে কথা বলে প্রচার করছিলেন: 'সেই সময় থেকে', অর্থাৎ গালীলে, সবূলুন ও নপ্তালিদের এলাকায় তাঁর আগমনের সময় থেকেই তিনি প্রচার-কাজ শুরু করলেন। এর আগে তিনি যিহূদিয়ায় প্রচার করেছিলেন এবং অনেককে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন (যোহন ৪:১); কিন্তু তাঁর সেই প্রচার-কাজ এখনকার মতো এত জোরেসোরে, এত জনসম্পৃক্ত ছিল না; আর এই প্রচার-কাজ যদিও অনেক মহান তবুও প্রতি পদে পদে এতে অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়; অগ্রগতি হয় অনেক ধীরে, পর্যায়ক্রমে।

যোহন যে বিষয়ে প্রচার করছিলেন, 'পাপ থেকে মন ফেরাও, কারণ স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট' (৩:২ পদ) তা খ্রীষ্টের প্রচারের বিষয়বস্তুর সাথে মিলে যায়। খ্রীষ্ট যে কথা বলে প্রচার করছিলেন তা ছিল সমস্ত প্রচারের সারকথা)। তাঁর প্রচারের বিষয়বস্তু, লোকদের আহ্বান জানাবার প্রক্রিয়া– সবই ছিল যোহনের মতো। এর পেছনে যে কারণটি বিদ্যমান তা হচ্ছে, পৃথিবীতে সুসমাচার একটিই; তাই যারা সুসমাচার প্রচার করেন তাদের ভাষ্যও যে একই হবে তা তো জানা কথাই; এমনকি 'স্বর্গ থেকে কোন স্বর্গদূতের আলাদা সুসমাচার প্রচার করেন না' (গালা ১:৮)। সবাই এই একটি সুসমাচারই প্রচার করেন, কারণ তা চিরকালীন। 'ঈশ্বরকে ভয় কর' এবং পাপ থেকে মন ফেরাবার মাধ্যমে 'তাঁর প্রশংসা কর' (প্রকাশিত বাক্য ১৪:৬, ৭)। ঠিক একই বিষয়ে প্রচার করার মাধ্যমে এখানে অগ্রজ প্রচারক যোহনের প্রতি খ্রীষ্ট অভূতপূর্ব সম্মান দেখিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি দেখালেন যে যোহন ছিলেন তাঁর অগ্রদূত; এবং তিনিই তাঁকে তাঁর আগে পথ প্রস্তুত করবার জন্য পাঠিয়েছিলেন। এভাবে ঈশ্বর তাঁর সংবাদদাতার বিষয়ে বলা কথা পূর্ণ করেছিলেন (যিশাইয় ৪৯:২৬)। পাপ থেকে মন ফিরিয়ে লোকেরা জীবনে কোন ফল দেখাতে পেরেছে কি না– তা দেখার জন্য খ্রীষ্ট তাঁর অগ্রবর্তীদের মতো আসলেন (২১:৩৭)। খ্রীষ্টের সাথে ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও লোকদের কাছে প্রচার করার জন্য তিনি কোন স্বর্গীয় বিষয় বেছে নেন নি; বরং তিনি বেছে নিলেন সেই পুরানো কথা 'মন পরিবর্তন কর, কারণ স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট'।

(ক) খ্রীষ্ট জোরালোভাবে পাপ থেকে মন ফেরানোর বিষয়ে প্রচার করতে পেরেছিলেন কারণ তিনি তাঁর জীবনে তা প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। প্রচারকারীদেরকে এই বিষয়টি লক্ষ্য

রাখতে হবে। প্রচারের কৌশল, উপস্থাপন ভঙ্গি, বুদ্ধিদীপ্ততা– প্রভৃতি নিয়ে তাদের বেশি মাথা ঘামানোর কিংবা আত্মপ্রসাদে ভোগার কোন কারণ নেই; এর চেয়ে নিজেদের জীবনে তার বাস্তব প্রয়োগ দেখাতে হবে, তবেই তা সবার কাছে আরও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে। কারণ আমাদের দৃষ্টি থাকা উচিত উপরে ঈশ্বরের দিকে; মানুষের কাছে প্রশংসা লাভের প্রতি নয়। এখানে আমরা দেখি, যোহন খ্রীষ্টের পথ প্রস্তুত করেছিলেন আর খ্রীষ্ট নিজেই নিজের পথ প্রস্তুত করতে উদ্যত হলেন। লোকদের পাপ থেকে মন ফেরানোর আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর উদ্দিষ্ট পথ প্রস্তুত করলেন। কেউ যদি তার জীবনে খ্রীষ্টের ইচ্ছার বাস্তবায়ন ঘটায় তবে সে পূর্ণাঙ্গভাবে খ্রীষ্টের প্রচারের বিষয়ে জানতে পারে (যোহন ৭: ১৭)।

(খ) তিনি যেখানে যেতেন সেখানেই এ বিষয়ে প্রচার করতেন। তিনি বা তাঁর শিষ্যেরা যখন প্রচার করতেন তখন লোকেরা নতুন কিছু শুনতে চাইতো; তাদের আগ্রহের কেন্দ্রে ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষা। পাপ থেকে মন ফেরানোর বিষয়ে শোনার চেয়ে তারা অভিনব শিক্ষা শুনতেই বেশি উৎসুক হতো। মনে রাখুন, পূর্বের প্রচারকৃত বিষয় শিক্ষা দেবার সময় তা আরও নিবিষ্টভাবে বলতে ও শুনতে হবে; যেন তা লোকদের নতুনভাবে উদ্দীপিত করতে পারে। পৌল প্রথমবারে যে বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন সে বিষয়ে বার বার বলতেন এবং তা কখনো হতো চোখের জলের সঙ্গে (ফিলিপীয় ৩:১, ১৮)।

(গ) তিনি তাঁর সুসমাচার হিসেবে তা প্রচার করলেন; 'মন পরিবর্তন কর, নিজের দিকে তাকাও এবং পাপের পথ ত্যাগ করে ঈশ্বরের ইচ্ছেমতো চল'। মনে রাখুন, খ্রীষ্ট এখন এন পরিবর্তনের আহ্বান জানানোর মাধ্যমে সুসমাচার প্রচার শুরু করলেন। তিনি বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মতো দুঃখার্তভাবে প্রচার করছিলেন না বরং আনন্দের সঙ্গে, অধিকারের সঙ্গে লোকদের কাছে এন পরিবর্তনের বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে শোনা কথা লোকদের কানে যেন মধু বর্ষণ করল। তিনি তাঁর এই আত্মবিশ্বাসী প্রচারের মাধ্যমে লোকদের মাঝে এক প্রকার আশ্বাস পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন; কারণ তিনি জানতেন তিনি তাদের কী দিতে যাচ্ছেন।

(ঘ) প্রচারের কারণও একই ছিল; 'স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট'; কেবল বলার জন্যই বলা– ব্যাপারটা এমন নয়; বরং তা যে পুরোপুরিভাবে একেবারে কাছে এসে গেছে সেটাই ব্যক্ত করছিল। খ্রীষ্টের স্বর্গে আরোহণের পর পবিত্র আত্মার নেমে আসার মাধ্যমেই একথার পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটেছিল। যোহন যখন 'স্বর্গ-রাজ্য কাছে এসে গেছে' বলে প্রচার করেছিলেন তখনও তা কয়েক বছর দূরে ছিল; কিন্তু এখন এ বিষয়ে খ্রীষ্টের প্রচার হল আরও জোরালো, কারণ স্বর্গ-রাজ্য সত্যিই খুব কাছে এসে গিয়েছিল। এখন পরিত্রাণ পাবার সময় কাছে এসে গেছে (রোমীয় ১৩:১১)। আমরা যেন যথাযথভাবে দ্রুততার সাথে আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করি, কারণ খ্রীষ্টের দিন এগিয়ে আসছে (ইব্রীয় ১০:২৫)।

মথি ৪:১৮-২২

প্রচার-কাজ শুরুর সাথে সাথে খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরও বেছে নিলেন; যারা এখন শ্রোতা হিসেবে তাঁর শিক্ষা শুনবে, পরে নিজেরাই তা প্রচার করবে; তারা খ্রীষ্টের করা বিভিন্ন চিহ্ন-কাজের সাক্ষী হবে এবং পরে সে বিষয়ে সবার কাছে সাক্ষ্য দেবে। এই অংশে আমরা

প্রথমবারের মতো তাঁর প্রচার-কাজের সঙ্গী হবার জন্য শিষ্যদের আহ্বান জানাতে দেখি।

খ্রীষ্টের শিষ্য গ্রহণের ঘটনাটি ছিল:

১. কার্যকর আহ্বানের দৃষ্টান্ত। প্রচার করার সময় তিনি সবার প্রতি অভিন্ন আহ্বান জানিয়েছিলেন কিন্তু এখানে তিনি তাদেরকেই বিশেষভাবে আহ্বান করলেন যাদেরকে তাঁর পিতা তাঁর কাছে দিয়েছেন। এখানে আমরা খ্রীষ্টের অনুগ্রহের ক্ষমতা ও তাঁর অব্যর্থ আহ্বানের বিষয়ে দেখি যে, তাঁর আহ্বানে সেই লোকেরা দ্বিরুক্তি না করেই সাড়া দিয়েছিল, কারণ তাদেরকে তাঁর শিষ্য হবার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল। তারা খ্রীষ্টকে চিনতে পেরেছিল যা পৃথিবী পারেনি।

২. কর্মক্ষেত্রে নিয়োগদানের এক অনন্য উদাহরণ। শিক্ষক হিসেবে স্কুল স্থাপনের লক্ষ্যে খ্রীষ্ট প্রথমে তাঁর সহশিক্ষকদের নিয়োগ দিলেন– যারা তাঁর কাজে সাহায্য করবে। তিনি এখন মানুষকে বিভিন্ন দায়িত্ব ও দক্ষতা দিতে শুরু করলেন যেন এর মধ্য দিয়ে সমস্ত মানুষ ঈশ্বরের সত্যের বিষয়ে জানতে পারে। এটা ছিল মণ্ডলীর প্রতি খ্রীষ্টের তত্ত্বাবধানের শুরুর ঘটনা।

এবারে পর্যবেক্ষণ করা যাক,

ক. কোথায় তাদের আহ্বান করা হল: গালীল সাগরের পারে, খ্রীষ্ট সেই পার দিয়ে হাঁটার সময় তাদের দেখতে পেলেন। উল্লেখ্য যে, কফরনাহূমের অবস্থান ছিল গালীল সাগরের কাছে। এই গালীল সাগরের বিষয়ে যিহূদীরা বলতো, যদিও ঈশ্বরের চোখে তাঁর সৃষ্ট সাতটি সাগরই সমান ছিল, তবুও 'গিনেষরৎ'-কে অবশ্যই তিনি বিশেষ সম্মান দান করেছেন; যিহূদীদের এই কথা যেন খ্রীষ্টের মাধ্যমে পূর্ণতা পেল। তিনি এই সাগরকে (একে 'তিবিরিয়া' সাগরও বলা হয়) তাঁর উপস্থিতি ও চিহ্ন-কাজের মাধ্যমে সম্মানিত করেছিলেন। এখানে, এই সাগর পারে তিনি ঈশ্বরের বিষয়ে গভীর ধ্যানে সময় কাটাতেন; যেমনটা ইসহাক গভীর চিন্তায় সময় কাটানোর জন্য মাঠকে বেছে নিয়েছিলেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট কিন্তু তাঁর শিষ্যদের আহ্বান জানাবার জন্য হেরোদের কোর্টে (সমর্থ, অভিজাত ব্যক্তিকে ডাকার জন্য) কিংবা যিরূশালেমে (ইমাম, ধর্ম-শিক্ষকদের তাঁর শিষ্য করার জন্য) গেলেন না; বরং এই গালীল সাগরের পার থেকেই তিনি তাঁর শিষ্যদের আহ্বান করলেন। এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, খ্রীষ্ট যা দেখতে পেতেন তা অন্যরা দেখতে পেত না। পিতর ও আন্দ্রিয় যে কার্যকর, শক্তিশালী আহবানে সাড়া দিয়েছিলেন সেই একই আহ্বানে হানন, কাইয়াফা সাড়া দেন নি; যদিও ঈশ্বরের কাছে কোন কিছুই অসম্ভব নয়; তবুও এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা খ্রীষ্টের বিনম্র উপস্থিতি এবং কথোপকথনের বিষয়টি দেখতে পাই। তিনি পৃথিবীকে দেখালেন, ঈশ্বর তাঁর কাজের জন্য দরিদ্রদের বেছে নিয়েছেন। গালীল ছিল খুবই প্রত্যন্ত অঞ্চল; স্বাভাবিকভাবেই এখানকার বাসিন্দারা সভ্য সমাজের বাইরে ছিল; তারা যে ভাষায় কথা বলতো তা পরিশীলিত ছিল না; তাদের কথায় অনেকেই তাদের ভুল বুঝত। তিনি তাঁর শিষ্য হিসেবে গালীলের পার থেকে যাদের বেছে নিয়েছিলেন তাদের কোন বিশেষত্ব বা অগ্রাধিকার ছিল না; তবুও তিনি তাদের তাঁর রাজ্যের গুরুদায়িত্বের ভার দেবার জন্য বেছে নিয়েছিলেন; এভাবে অশিক্ষিত লোকদের বেছে নেবার মাধ্যমে তিনি পৃথিবীর জ্ঞানীদের লজ্জা দিলেন; বললেন, 'দেখ, এদের মাধ্যমেই ঈশ্বরের সত্যিকারের জ্ঞান প্রকাশিত হবে'।

খ. তাদের পরিচয় আমরা এখানে দেখতে পাই: পিতর ছিলেন আন্দ্রিয়ের ভাই; এবং

যাকোব ও যোহনের পরস্পর ভাই ছিলেন। খ্রীষ্ট প্রথমে আন্দ্রিয়-পিতরকে এবং পরে যাকোব-যোহনকে আহ্বান করলেন। যদিও তারা আগে থেকেই খ্রীষ্টকে অনুসরণ করছিলেন (যোহন ১:৪০, ৪১); কিন্তু এখন তারা সত্যিকার অর্থেই তাঁর অনুসারী হলেন। মনে রাখুন, খ্রীষ্ট অপেক্ষাকৃত দরিদ্রদের তাঁর শিষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। আগে তারা যোহনের শিষ্য ছিলেন কিন্তু এখন খ্রীষ্টের হলেন। মনে রাখুন, যারা নিজেদের জীবনে এন পরিবর্তনের শিক্ষাকে কাজে লাগায় তারা অবশ্যই বিশ্বাসের আনন্দ লাভ করবে। তাদের সম্পর্কে আমরা আরও দেখি যে,

১. তারা পরস্পর ভাই ছিলেন (পিতর-আন্দ্রিয় ও যাকোব- যোহন)। মনে রাখুন, এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, তারা পরস্পর আত্মীয়তার বন্ধনে (রোমীয় ৯:৩) আবদ্ধ এই লোকেরা খ্রীষ্টের শিষ্য হবার সুযোগ লাভ করেছিলেন। তাই, খ্রীষ্টে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে একটি পরিবার ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে।

২. তারা জেলে ছিলেন। আর জেলে হিসেবে–

(১) তারা ছিলেন দরিদ্র, তাদের যদি মোটামুটি ধরনের কোন ব্যবসা বা সম্পত্তি থাকতো তবে জীবন ধারণের জন্য খরস্রোতা নদীর মধ্যে তাদের মাছ ধরে বেড়াতে হতো না। ধনী হলে তারা অবসর সময়ে শখের বশে মাছ ধরতেন। মনে রাখুন, খ্রীষ্ট গরীবদের হেয় জ্ঞান করেন নি; সে কারণে আমাদেরও তা করা থেকে বিরত থাকা উচিত; খ্রীষ্ট গরীবদের সুসমাচার প্রচারের জন্য বেছে নিয়েছিলেন; এর ফলে বিভিন্ন প্রকার সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে তারা আক্ষরিক অর্থেই খ্রীষ্টের কাজের জন্য নিজের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন; লাভ করেছিলেন বিরল সম্মান।

(২) তারা ছিলেন অশিক্ষিত। ফলে মোশির শাস্ত্র পড়ার সুযোগ তাদের হয়নি। মনে রাখুন, যারা অন্যদের সামনে নিজেদের জ্ঞানকে জাহির করে না; এবং ঈশ্বরের বিষয়ে জানতে আগ্রহী হয়, ঈশ্বর তাদের তাঁর অনুগ্রহের উপহারস্বরূপ বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ করে তোলেন। খ্রীষ্টের এই অশিক্ষিত লোকদের তাঁর রাজ্য বিস্তারের কাজের জন্য বেছে নেয়ার মানে এই নয় যে, তিনি সম্পূর্ণ অযোগ্য লোকদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার দিতে সম্মত হলেন এবং পরোক্ষে সমর্থনও করলেন; কারণ প্রভুর কাজ করার জন্য তারা তখনও কোন অসামান্য জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জন করেননি। বরং এর মাধ্যমে খ্রীষ্ট দেখালেন যে, ব্যক্তির স্বাভাবিক দক্ষতা ও জ্ঞানই ধীরে ধীরে চর্চার মাধ্যমে বেড়ে ওঠে, যদি সে ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হয়।

(৩) তারা ব্যবসায়ী ছিলেন; সেই অর্থে না হলেও তারা গায়ে খেটে নিজেদের খাবারের সংস্থান করতেন। মনে রাখুন, যারা পরিশ্রমী, খ্রীষ্ট তাদের পছন্দ করেন; কারণ তাদের এই পরিশ্রম তাদের আত্মিক জীবনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। ঈশ্বর যখন মোশিকে আহ্বান করলেন তখন তিনি ভেড়া চড়াতেন; অপরদিকে তিনি যখন দায়ূদকে বেছে নিলেন তখন সেই দায়ূদ ছিলেন মেষ পালক; এখানে আমরা খ্রীষ্টের শিষ্যদেরও প্রায় কাছাকাছি রকমের কাজে নিয়োজিত অবস্থায় আহ্বান লাভ করতে দেখি। অকর্মণ্য লোকেরা ঈশ্বরের আহ্বান পাবার চেয়ে শয়তানের পরীক্ষায়ই বেশি মাত্রায় আনীত হয়।

(৪) জেলেদের মাঝে তাঁরা অকুতোভয়, পরিশ্রমী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। জেলেদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাঁরা অসীম ধৈর্য, ঠাণ্ডা মাথার অধিকারী ছিলেন। মাছ ধরার জন্য তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। ফলে তাদের মাঝে কাজের প্রতি

নিবিষ্টভাব দৃঢ়ভাবে গড়ে উঠেছিল। মনে রাখুন, যারা অকুতোভয়, কঠোর পরিশ্রম করতে জানে তারাই খ্রীষ্টের শিষ্য হবার উপযুক্ত। খ্রীষ্টের সত্যিকারের যোদ্ধারা নিশ্চিতভাবেই কঠোর অধ্যবসায়ী হয়ে থাকেন।

গ. খ্রীষ্ট যখন তাদের আহ্বান করলেন তখন পিতর এবং আন্দ্রিয় মাছ ধরার কাজে ব্যস্ত ছিলেন; অপরদিকে যাকোব ও যোহন তাদের জাল ঠিক করছিলেন– যা তাদের পরিশ্রমী রূপটিকেই ফুটিয়ে তুলেছিল। কারণ তারা তাদের বাবার কাছ থেকে নতুন জাল কেনার জন্য টাকা চাইতে যাননি, বরং সেই পুরানো জালটিকেই কাজের উপযুক্ত করতে ঠিকঠাক করছিলেন। এখানে অন্যরা হলে যা করতো তা না করে, তারা নিজেদের সেই প্রয়োজনীয় জালটিকে মেরামত করার মাধ্যমে কাজের প্রতি, এর অনুষঙ্গের প্রতি তাদের ভালবাসাকেই প্রকাশ করেছিলেন। তাদের এই কাজ সত্যিই প্রশংসা পাবার যোগ্য। যাকোব ও যোহন তাদের পিতার সাথে থেকে তার কাজে সাহায্য করায় নিবেদিত ছিলেন। মনে রাখুন, যখন আমরা দেখি যে সন্তানেরা তাদের পিতা-মাতার প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করছে, তখন তা আমাদের কত না আনন্দ দেয়! লক্ষ্য করুন,

১. তাদের সবাই যার যার কাজে নিয়োজিত ছিলেন, কেউ বসে ছিলেন না। মনে রাখুন, খ্রীষ্টের কাছে আসার পর আমাদের নিজেদের কাছে এই প্রশ্ন করা প্রয়োজন, 'আমি কি খ্রীষ্টে আছি?'; তারপর নিজেদের মনের কাছে জিজ্ঞেস করা উচিত 'আমি কি আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করছি?'

২. তারা ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকাকালে খ্রীষ্টের আহ্বান পেয়েছিলেন। দু'জন মাছ ধরছিলেন এবং বাকি দু'জন তাদের জালখানা মেরামত করছিলেন। মনে রাখুন, খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার কাজে যারা আহ্বান পেয়েছেন, তাদেরকে সবসময়ই কোন না কোন কাজে ব্যস্ত থাকা উচিত। হতে পারে তা শিক্ষাদান কিংবা অধ্যয়ন। প্রচার কাজের জন্য অবসর সময়ে নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার কাজেও মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

ঘ. তিনি তাদের যে কথা বলে আহ্বান করলেন তা আমরা ১৯ পদে দেখতে পাই; 'আমার পেছনে আস, আমি তোমাদের মানুষ ধরার জেলে করব'। এর আগে তারা সাধারণ উম্মতের মতো তাঁর পেছনে পেছনে গিয়েছিলেন (যোহন ১:৩৭); কিন্তু এখন তারা খ্রীষ্টের সত্যিকারের শিষ্য হবার আহ্বান পেলেন। খ্রীষ্টের আন্তরিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে তারা তাঁর পেছনে পেছনে যাবার প্রয়াস পেলেন। মনে রাখুন, যারা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার আহ্বান লাভ করেছে তাদের উচিত সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর পেছনে পেছনে চলা। আর তাঁকে অনুসরণ করার মানেই হচ্ছে মানুষের কাছে পরিত্রাণের সুসমাচার পৌঁছে দেওয়া। লক্ষ্য করুন,

১. খ্রীষ্ট তাদেরকে কী বলেছিলেন; 'আমি তোমাদের মানুষ ধরার জেলে করব;' খ্রীষ্ট তাদেরকে তাদের আগের কাজের দিকে নির্দেশ করে তাঁর মহান কাজের বিষয়ে বলেছিলেন। খ্রীষ্টের এই আহ্বান পাওয়া অবধি তারা 'জেলে'ই রয়ে গেল। নতুন কোন অভিধা খ্রীষ্ট তাদের দিলেন না। এর ফলে, শিষ্যরা খ্রীষ্টের মুখ থেকে নতুন কাজের কথা শুনে কেটে পড়তে চাইলেন না। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হলেন না। খ্রীষ্ট তাদের আশ্বস্ত করলেন যে, যে কাজে তারা দক্ষ সেই একই কাজ তাদের করতে হবে; তবে তার ধরন, লক্ষ্যবস্তুটাই যা আলাদা। খ্রীষ্ট স্বভাবতই তার স্বর্গীয় কাজের বিষয়ে বলতে জাগতিক কাজের প্রসঙ্গ টেনেছিলেন। এর ফলে আমরা বুঝতে পারি, ঈশ্বর তাঁর স্বর্গীয় বিষয় প্রকাশ

করার জন্য জাগতিক উপলক্ষকে বেছে নেন। দায়ূদ পশু চড়াতেন; সেই অবস্থা থেকেই ঈশ্বর তাকে তাঁর জাতিকে লালন-পালন করার জন্য রাজা হিসেবে বেছে নিলেন। মনে রাখুন,

(১) ঈশ্বরের বাক্য প্রচারকেরা মানুষ ধরার জেলের মতো; তারা ধ্বংস করার চেয়ে রক্ষা করার দিকেই বেশি মনোযোগী হয়। লোকদের খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসার পর তাদের একজনও যেন বিপথে না যায় সেদিকেই তাদের লক্ষ্য থাকে। তারা এই কাজ করবে কেবল মানুষকে খ্রীষ্টের দেওয়া পরিত্রাণদানের জন্য, নিজেদের সমৃদ্ধি কিংবা সম্মানের জন্য নয়। 'তারা তোমাদের দেখাশোনা করে' (ইব্রীয় ১৩:১৭) এবং 'তারা তোমাদের সুখ-সমৃদ্ধি নয় বরং তোমাদের খ্রীষ্টের জন্য জয় করতে চায়' (২ করি ১০:১৪, ১৬)।

(২) খ্রীষ্ট তাদের মানুষ ধরার জেলে করার কথা বলেছিলেন। আমরা জানি যে, একমাত্র তিনিই কাউকে তাঁর কাজের জন্য যোগ্য করে তুলতে, আহ্বান জানাতে, দায়িত্ব দিতে এবং লোকদের তাঁর জন্য জয় করার নির্দেশ দিতে পারেন। খ্রীষ্টের সাহায্য-শক্তি-প্রণোদনা ছাড়া তাঁর রাজ্যের জন্য কাজ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

২. খ্রীষ্টের আহ্বান পেয়ে তারা তৎক্ষণাৎ কোন প্রকার দ্বিরুক্তি না করে একান্ত বাধ্যতায় তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন। খ্রীষ্টকে তারা তাদের নেতা হিসেবে মেনে তাঁর পেছনে পেছনে গেলেন। মনে রাখুন,

(১) খ্রীষ্ট তাঁর কাজের জন্য যাকে বেছে নেন নিশ্চিতভাবেই সে হয় যোগ্যতা সম্পন্ন এবং সেই কাজের উপযুক্ত।

(২) যারা খ্রীষ্টের বিষয়ে প্রচার করতে চায় তাদেরকে প্রথমে খ্রীষ্টের বিষয়ে ভালভাবে জানতে হবে। আমরা যদি তাঁকে ভাল করে না-ই জানি, তবে কেমন করে আমরা লোকদের তাঁর কাছে নিয়ে আসতে পারি?

(৩) যারা খ্রীষ্টের সান্নিধ্য পেতে চায় তাদেরকে অবশ্যই তাঁর প্রতি বাধ্যতায় নিজেদের তাঁর হাতে তুলে দিতে হবে। প্রেরিতেরা তাদের কাজের জন্য প্রস্তুত ছিলেন; কারণ তারা সবসময় তাঁর সঙ্গী ছিলেন; 'তিনি যেখানে যেতেন তারাও তাঁর সাথে সেখানে যেতেন (প্রেরিত ১:২১)। খ্রীষ্টের সাথে থেকে তারা যে শিক্ষা-নির্দেশনা পেয়েছিলেন তার সাথে অন্য আর কোন জ্ঞানের বা প্রস্তুতির তুলনা চলে না। মোশির সাথে থেকে তাঁর কাজ দেখে যিহোশূয়ও নিজেকে একজন যোগ্য নেতা হিসেবে তৈরি করতে পেরেছিলেন।

(৪) সেই মাছেরা অর্থাৎ যাদেরকে খ্রীষ্টের কাছে আনা হয়েছে, তাদেরকে খ্রীষ্টের দেখিয়ে দেওয়া পথে বিশ্বস্ততার সাথে ঐকান্তিক বাধ্যতায় চলতে হবে। খ্রীষ্ট-প্রচারকদের একজন মহান পিতা; তাই প্রচারকদের খ্রীষ্টের মতোই দৃঢ়তার সাথে কাজ করে যেতে হবে।

ঙ. এখানে আমরা খ্রীষ্টের আহ্বানের সার্থকতার বিষয়ে দেখি। পিতর এবং আন্দ্রিয় তাদের জাল ফেলে দিয়ে তাঁকে অনুসরণ করলেন (২০ পদ); আর যাকোব ও যোহন তৎক্ষণাৎ তাদের নৌকা এবং বাবাকে ছেড়ে খ্রীষ্টের পেছনে পেছনে গেলেন (২২ পদ)। মনে রাখুন, যারা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতে আগ্রহী তাদের পৃথিবীর মায়াকে ত্যাগ করে আসতে হবে। তাই, প্রত্যেক খ্রীষ্টানকে জগতের সমস্ত আকর্ষণ পরিত্যাগ করা আবশ্যক। খ্রীষ্টের জন্য তাদের এমনকি পিতা-মাতাকে পর্যন্ত ত্যাগ করতে হবে (লূক ১৪:২৬); তারা অবশ্যই তাদের পিতা-মাতাকে ভালবাসবে কিন্তু খ্রীষ্টের চেয়ে কম। খ্রীষ্টের প্রতি তাদের আগ্রহ পৃথিবীর আর সবকিছুর চেয়ে বেশি হবে। যারা খ্রীষ্টের রাজ্য বিস্তারের কাজের জন্য

বিশেষ আহ্বান পেয়েছে, তাদেরকে পুরোপুরিভাবে আত্মিক জীবন যাপন করতে হবে; যেন নিজেদের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে প্রভুর হাতে তুলে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের মাঝে প্রভুর ইচ্ছার বাস্তবায়ন হয়। এখন,

১. এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের তাঁর অনুগ্রহের ক্ষমতায় নির্ভর করতে বলেন। তাঁর বাক্য কত শক্তিশালী ও কার্যকর! তিনি বলেন, আর তা হয়ে যায়। সেই একই ক্ষমতায় খ্রীষ্ট মৃত লাসারকে আহ্বান করেছিলেন আর সে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে কবর থেকে বেরিয়ে এসেছিল; খ্রীষ্টের এই ক্ষমতা আমাদের তাঁর আহ্বানের প্রতি আন্তরিক হতে সাহায্য করে (গীত ১১০:৩)।

২. খ্রীষ্টের আহ্বানে শিষ্যদের সাড়াদানের ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর প্রতি বাধ্য হতে শিখি। মনে রাখুন, খ্রীষ্টের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর ইচ্ছামতো নিজেদের পরিচালিত করাই তাঁর বিশ্বস্ত অনুসারীদের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। সেই শিষ্যরা তাদের জীবিকা, পরিবার কিংবা সদ্য পাওয়া দায়িত্বের কঠিন দিকগুলোর কথা তুলে কোন আপত্তি প্রদর্শন করেননি। অব্রাহাম যেভাবে কোথায় যেতে হবে তা না জেনেই ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন ঠিক সেভাবেই শিষ্যরা খ্রীষ্টের বাধ্য হলেন এবং তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন। অব্রাহাম কিংবা যীশুর এই শিষ্যরা কোথায় যেতে হবে তা না জানলেও কেন যাচ্ছেন সে বিষয়ে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ ছিলেন। তাঁরা জানতেন তাঁদের কী করতে হবে। যাকোব ও যোহন তাঁদের পিতাকে ছেড়ে আসলেন: শাস্ত্রে তাঁদের পিতা সিবদিয় খ্রীষ্টকে অনুসরণ করেছিলেন কি না সে বিষয়ে কিছু বলা হয় নি; কিন্তু আমরা তাদের মা, শালোমীর বিষয়ে দেখি যে, তিনি খ্রীষ্টের একজন খাঁটি অনুগামী ছিলেন। সন্দেহ নেই, সিবদিয় খ্রীষ্টে বিশ্বাসী ছিলেন; তবে খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্য হবার জন্য যুবাদের বেছে নিয়েছিলেন। কারণ যৌবন হচ্ছে শেখার এবং পরিশ্রম করার উপযুক্ত সময়। জীবনকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্য এই বয়সটাই হচ্ছে আদর্শ।

মথি ৪:২৩-২৫

ক. খ্রীষ্ট কতটা উদ্যমের সাথে যিহূদীদের সমাজ-ঘরসহ গালীল প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করে বেরিয়েছেন; 'তিনি গালীল প্রদেশের সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে যিহূদীদের সমাজ-ঘরগুলোতে শিক্ষা দিতে এবং ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে প্রচার করতে লাগলেন'। লক্ষ্য করুন,

১. খ্রীষ্ট লোকদের কাছে স্বর্গী-রাজ্যের বিষয়ে প্রচার করলেন। তিনি সেই স্বর্গীয় অনুগ্রহ, গৌরবের কথা প্রচার করতে লাগলেন যা নিকটে এসে গেছে। তিনি ঘোষণা করলেন সেই রাজ্যের কথা যা পৃথিবীর আর সব রাজ্যের মতো ক্ষণস্থায়ী নয়। সুসমাচার হচ্ছে সেই রাজ্যের প্রবেশপত্র। যেখানে কি না রাজা নিজেই তাঁর পাপী প্রজাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে, তাঁর রাজ্যের প্রবেশাধিকার দিতে সম্মতি প্রদান করেছেন। যারা এই প্রবেশপত্র গ্রহণ করে রাজার ইচ্ছার প্রতি নিজেদের বাধ্যতা দেখাবে এবং সেই স্বপ্নের রাজ্যে প্রবেশ করতে এগিয়ে আসবে, তারা এক অর্থে নিজেদেরই সম্মানিত করে। এটাই সুসমাচার। খ্রীষ্ট নিজেই সেই সুসমাচার; এবং আমরা তাঁকেই সেই সুসমাচার প্রচার করতে দেখি যেন তা আরও বিশ্বাসযোগ্য, গ্রহণীয় হয়ে ওঠে।

২. তিনি যিহূদীদের ভিন্ন ভিন্ন সমাজ-ঘরে শিক্ষা দিলেন; হ্যাঁ, তিনি সেখানে শিক্ষা দিলেন এমন একজনের মতো যার অধিকার আছে। সেখানে তিনি উন্মুক্ত স্থানে জোরের সাথে তাঁর শিক্ষা দিতেন; সে সময় তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসত জ্ঞানপূর্ণ কথাবার্তা (হিতোপদেশ ১:২১)। এই জায়গাগুলো মূলত ধর্মীয় উপাসনার জন্য নির্ধারিত ছিল। সেখানে মোশির শাস্ত্র পাঠ করা হতো; ফলে, লোকেরা এখানে শাস্ত্র শিক্ষা লাভের জন্য প্রস্তুত হয়ে আসতো। খ্রীষ্ট হয়তো এ কারণেই লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচারের জন্য যিহূদীদের এসব সমাজ-ঘরকে বেছে নিয়েছিলেন।

৩. খ্রীষ্ট গালীল প্রদেশের সব জায়গায় গিয়ে সুসমাচার প্রচার করতে এবং শিক্ষা দিতে লাগলেন। তিনি সবার কাছে স্বর্গ-রাজ্যের বিষয়ে বলেছিলেন। তিনি নিশ্চিতভাবেই সবার কাছে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন যেন তারা তাঁকে অনুসরণ করে। সব লোকের কাছে যাওয়ার মাধ্যমে খ্রীষ্টের বিনম্রতারই প্রতিফলন ঘটেছিল। তিনি সবার কাছে গিয়েছিলেন যেন একজনও বিনষ্ট না হয়; ঈশ্বরের অনুগ্রহের ভাগী হওয়া থেকে বাদ পড়ে না যায়; তাঁর এই কাজের মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে, তাঁর অনুগ্রহ কত মূল্যবান। সে সময় গালীলে প্রায় দুইশোরও বেশি শহর ও গ্রাম ছিল; তাই, খ্রীষ্ট গালীলের সর্বত্র পরিভ্রমণ করেছিলেন বলতে আমরা বুঝি যে তিনি এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঘুরে বেরিয়েছেন। এ কাজে তাঁর কোন কষ্ট ছিল না; কারণ তিনি সেই জায়গাগুলোতে গিয়েছিলেন মহৎ কাজ করার জন্য। প্রচারক হিসেবে খ্রীষ্টের মতো একাগ্র, কষ্টসহিষ্ণু কাউকে এর আগে দেখা যায়নি। তিনি এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে ছুটে বেরিয়েছিলেন কেবল পাপী মানুষকে ঈশ্বরের অনুগ্রহে সিক্ত করার জন্য। প্রচারকদের কাছে এ এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত; সর্বত্র, সবসময় খ্রীষ্টের সুসমাচারের বিষয়ে প্রচার করে বেড়াতে হবে।

খ. এখানে আমরা প্রত্যক্ষ করি কী অসীম ক্ষমতায় রোগীদের সুস্থ করেছিলেন। তিনি কেবল প্রচার করেই বেড়াননি উপরন্তু লোকদের সুস্থও করেছেন। রোগীদের সুস্থ করার মাধ্যমে তাঁর নাম এবং ঈশ্বরের গৌরব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি লোকদের শিক্ষা দিলেন এবং সুস্থ করলেন। এখন লক্ষ্য করুন,

১. তিনি সব ধরনের রোগ নিরাময় করলেন। 'তিনি তাদের সবাইকে সুস্থ করলেন'। এসব রোগীর অনেকে চিকিৎসকের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, তারা সেই নিরাময় করতে পারেননি। ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করার জন্য খ্রীষ্ট সেই রোগীদের সুস্থ করলেন। তাঁর বাক্য আরোগ্যকারী মহৌষধ।

খ্রীষ্ট সব ধরনের রোগীকেই সুস্থ করেছিলেন। মোটামুটি ধারণা লাভের জন্য সেই রোগসমূহকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি, 'নসন': যেমন অন্ধত্ব, পঙ্গুত্ব, জ্বর, উদরাময় এরকম আরও অনেক রোগ; 'মালাকিন': নিস্রাব, ক্ষয়রোগ, গায়ে ব্যথা; 'বাসানওস': গেঁটে বাত, পাথর, ভগ্ন স্বাস্থ্য– এ জাতীয় সব প্রকার রোগ। খ্রীষ্ট এসব রোগের প্রতিটিই নিরাময় করেছিলেন। তাঁর কাছে এর কোনোটাই কঠিন বলে মনে হয়নি। কেবল তাঁর মুখের কথাতেই রোগীরা সুস্থ হয়ে গিয়েছিল।

এখানে আমরা নির্দিষ্টভাবে তিনটি রোগের উল্লেখ দেখতে পাই; বড় ধরনের দৈহিক প্রতিবন্ধকতা বলে বিবেচিত 'পক্ষাঘাত,' ভয়াবহ মানসিক রোগ 'মৃগী' এবং দৈহিক-মানসিক উভয় প্রকার ব্যাধি হিসেবে রহস্যময় এক রোগ বলে বিবেচিত 'ভূতগ্রস্ততা'। খ্রীষ্ট এর সবই নিরাময় করেছিলেন; কারণ তিনি শারীরিক ও আত্মিক রোগের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক।

২. এর কী প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল– এবারে আমরা সে বিষয়ে দেখব। খুব সহজেই যে ডাক্তার বিন্দুমাত্র ব্যথা না দিয়ে, বসিয়ে না রেখে ত্বরিৎ রোগ ভাল করে দেন; তাও আবার কোন ফি না নিয়ে; ভাবুন তো তার কপালে কী ঘটতে পারে! হ্যাঁ, তাঁর কাছে শীঘ্রই বহু লোকের সমাগম ঘটল। সবাই তাঁর কাছে ছুটে আসতে লাগল। 'গালীল, দেকাপলি, যিরূশালেম, যিহূদিয়া এবং যর্দনের অন্য পার থেকে অনেক লোক যীশুর কাছে আসতে লাগল।' কেবল যিহূদীদের এলাকা থেকেই নয় বরং পার্শ্ববর্তী দেশ-জাতির লোকেরা তাঁর কাছে সমবেত হতে লাগল। খ্রীষ্টের বিষয়ে একজনের কাছ থেকে আরেকজন– এভাবে খুব দ্রুত সবাই জানতে এবং তাঁর সুসমাচার গ্রহণে নিজেদের প্রস্তুত করতে পেরেছিল।

মনে রাখুন, খ্রীষ্টের যে সুসমাচার আমরা পেয়েছি তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতে আমাদের আকাঙ্ক্ষী হওয়া উচিত। সীবা দেশের রাণী শলোমনের খ্যাতির কথা শুনে তাঁকে দেখার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। 'এস, দেখে যাও খ্রীষ্ট কী করছেন'– এই উদ্বুদ্ধকরণ কথা দ্বারা সেই লোকেরা খ্রীষ্টের বিষয়ে জানতে পেরেছিল। যারা তাঁর কাছে কেবল সুস্থ হতে এসেছিল তারা শুধু যে আরোগ্য লাভ করেছিল তা নয়; উপরন্তু শান্তিতে পবিত্র জীবন যাপনের জন্য অসীম সঞ্জীবনী বাক্যও শুনতে পেয়েছিল। লোকেরা যে উদ্দেশ্যেই খ্রীষ্টের কাছে আসুক না কেন তা অবশ্যই ভাল লক্ষণ; কারণ তারা খ্রীষ্টের কাছে 'যা পাবে' মনে করে আসে তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়ে শেষতক উপকৃত হবে। খ্রীষ্টের বিষয়ে শুনে সিরীয়রাও (কু'রোগী নামানও একজন সিরীয় ছিলেন) খ্রীষ্টের কাছে এসে সুস্থ হয়েছিল; অনেকে মন পরিবর্তন করেছিল (২ রাজাবলি ৫:১৫, ১৭)। শারীরিক সুস্থতা লাভের আশায় এই রোগীরা খ্রীষ্টের কাছে এসে শারীরিক-আত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই আরোগ্য লাভ করেছিল। তারা খ্রীষ্টের কাছ থেকে পরিত্রাণের সুসমাচার পেয়েছিল। যেমন শৌল 'দর্শকের বাড়ি' খুঁজতে গিয়ে রাজ্যের দেখা পেয়েছিলেন। তবুও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় যে, খ্রীষ্টকে 'আরোগ্যকারী' হিসেবে মেনে উপকৃত হলেও অনেকে তাঁর 'শিক্ষক' পরিচয় সম্পর্কে বিস্মৃত হয়েছিল।

এখন খ্রীষ্ট তাঁর কাজের মাধ্যমে যে চিহ্ন, ক্ষমা এবং গভীর রহস্য প্রকাশ করেছিলেন সে বিষয়ে আসুন চোখ বুলানো যাক।

(১) তাঁর চিহ্ন-কাজ: স্বর্গীয় ক্ষমতাবলে খ্রীষ্ট লোকদের সুস্থ করেছিলেন। পৃথিবীর কোন নিয়ম বা প্রক্রিয়া মেনে তিনি তা করেননি। ঈশ্বর তাঁকে যে ক্ষমতা দিয়েছিলেন তার বলে তিনি তাঁর মতো করে রোগীদের সুস্থ করে তুলেছিলেন। এই কাজ কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু ঈশ্বর যিনি বিশ্বপ্রকৃতির স্রষ্টা তাঁর পুত্র অনেক জাতির লোকদের সুস্থ করেছিলেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট তাঁর এই আশ্চর্য আরোগ্য-কাজ করেছিলেন অনেক সাক্ষীর সামনে। খ্রীষ্টের কাজের কার্যকারণ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার মতো অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিল। তারা যদি তা করতো তবে হয়তো একটি আরোগ্য-কাজও বৃথা যেত না। তারা কেবল দেখে গিয়েছিল। যে রোগগুলোকে নামি-দামি ডাক্তারেরাও সারিয়ে তুলতে পারেনি সেসব রোগকে খ্রীষ্ট খুব দ্রুতই নিরাময় করেছিলেন। রোগীদের তাই স্বাভাবিক নিয়মে রোগ সারার জন্য ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করতে হয়নি। খ্রীষ্ট যা করেছিলেন তা পৃথিবীর কারও পক্ষেই করা সম্ভব নয়; কারণ তা ঈশ্বর থেকেই হয়েছে (যোহন ৩:২); ঈশ্বরই তাঁকে সেই কাজ করতে দিয়েছিলেন (মথি ৬:৪,৫; যোহন ৫:৩৬)। খ্রীষ্টের কাছে সবার প্রত্যাশা ছিল যে তিনি বিভিন্ন আশ্চর্যকাজ করবেন (যোহন ৭:৩১); প্রকৃতির ওপরও

তাঁর আশ্চর্যকাজ করবার ক্ষমতা থাকবে (যিশাইয় ৩৫:৫, ৬); আমরা দেখি যে, 'খ্রীষ্ট' হিসেবে যীশু এর সবই করেছিলেন– যা এর আগে আর কেউ করে দেখাতে পারেনি। তিনি একই সাথে প্রচার এবং লোকদের সুস্থ করার কাজ করেছেন। এর দ্বারা তিনি যা বলতেন তা আরও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতো; এভাবে তিনি তাঁর প্রচার ও সুস্থতাদানের কাজ শুরু করেছিলেন (প্রেরিত ১:১)।

(২) তাঁর ক্ষমা: মোশির করা আশ্চর্য কাজসমূহের উদ্দেশ্য ছিল লোকদের বোঝানো যে, ঈশ্বরই তাঁকে পাঠিয়েছেন। এসব আশ্চর্য কাজসমূহের বেশিরভাগই ছিল মিশরীয়দের ওপর ঈশ্বরের বিচার হিসেবে নেমে আসা বিভিন্ন মহামারী; এর ফলে ইস্রায়েল জাতির লোকেরা ঈশ্বরের ভয়ঙ্কর রূপ দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু খ্রীষ্টের চিহ্ন-কাজের বেশিরভাগই ছিল অসুস্থদের সুস্থ করা (কেবল ফলহীন ডুমুর গাছই ব্যতিক্রম)। এর ফলে মানুষ ঈশ্বরের দয়া ও অনুগ্রহ দেখতে পেল। কারণ সুসমাচার মানুষের কাছে কোন ভীতিকর উপায়ে আসে নি; উপরন্তু ভালবাসা, অনুগ্রহ ও মমতাই ছিল এর ভিত্তি। তাই সুসমাচার আমাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে না, বরং খ্রীষ্টের ইচ্ছার বাধ্য হতে শেখায়। লোকদের সুস্থ করার মাধ্যমে খ্রীষ্ট তাদের কাছে সেই সুসমাচার তুলে ধরেছিলেন। তিনি এর মাধ্যমে লোকদের ঈশ্বরের জন্য জয় করে তাদের ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন (হোশেয় ১১:৪)। তাঁর এসব চিহ্ন-কাজ লোকদের কাছে তাঁর কথাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছিল; আর তিনি তাদের পরিত্রাণের বাণী শুনিয়েছিলেন। ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া ক্ষমতায় তিনি এসব চিহ্ন-কাজ করেছিলেন (যোহন ১০:৩২); এবং ঈশ্বরের এই দয়ার বিষয়টি অনুধাবন করার মাধ্যমে লোকেরা মন পরিবর্তন করার দিকে নিয়ে আসতে সাহায্য করেছিল (রোমীয় ২:৪); খ্রীষ্ট মানুষের প্রতি যে দয়া দেখিয়েছিলেন, যে ক্ষমার বাণী সবার কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন তা খ্রীষ্টের শিষ্য হিসেবে আমাদেরও সমস্ত শক্তি দিয়ে করা উচিত। প্রত্যেক খ্রীষ্টানদের খ্রীষ্টের শিক্ষা ও কাজ দ্বারা নিজেদের পরিচালিত করা প্রয়োজন।

(৩) গভীর রহস্যের উন্মোচন: খ্রীষ্ট লোকদের শারীরিকভাবে সুস্থ করার মাধ্যমে পৃথিবীর কাছে এই বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যে, একমাত্র তিনিই মানুষের আত্মিক রোগ নিরাময় করতে পারেন। তিনি ছিলেন ধার্মিকতার সূর্য– যা রোগীদের সুস্থ করার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। পরিত্রাণকর্তা হিসেবে তিনিই আত্মার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক; এবং তিনি সাহায্যের জন্য তাঁর কাছে আহ্বান জানাতে বলেছেন (৯:১২, ১৩)। পাপ হচ্ছে আত্মার রোগ; খ্রীষ্ট এই আত্মিক রোগ দূর করতেই পৃথিবীতে এসেছিলেন। ফলে তিনি মানুষকে শারীরিক সুস্থতা দান করেছিলেন। তাঁর এই কাজসমূহ কেবল আত্মিকভাবেই সম্পন্ন হয়নি বরং তা সাধিত হয়েছিল আরও বর্ণিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ উপায়ে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, তাঁর এই কাজ আমাদের আত্মিক বিষয়ে বুঝতে এবং তাঁর ইচ্ছা আমাদের জীবনে কীভাবে কাজ করে সেই সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে। তিনি যেভাবে রোগীদের সাথে কথা বলেছিলেন, যেভাবে তাদের পবিত্র করেছিলেন তা আমাদের তাঁর পথ সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বুঝতে শেখায়। খ্রীষ্ট তাঁর স্বর্গীয় গৌরব এবং অনুগ্রহ আমাদের জন্য বরাদ্দ করেছিলেন, 'অনেককে সুস্থ করার মাধ্যমে'। হ্যাঁ, তিনি আমাদের শারীরিক ও মানসিক সব ধরনের রোগ থেকেই আরোগ্য করেছেন।

মথি লিখিত সুসমাচার
অধ্যায় ৫

এই অধ্যায়ে আমরা পাহাড়ের ওপর খ্রীষ্টের দেওয়া অসাধারণ শিক্ষার সাথে পরিচিত হতে চলেছি। সুসমাচারে তাঁর যতগুলো শিক্ষা গ্রন্থিত হয়েছে তার মাঝে এটাই সবচেয়ে দীর্ঘ ও সম্পূর্ণ। তাঁর এই শিক্ষায় স্বর্গীয় জ্ঞানের উজ্জ্বল উপস্থিতি সত্ত্বেও তা পুরোপুরি বাস্তবসম্মত। যে কারণে স্বচ্ছ জীবন যাপনের জন্য দরকারি এই শিক্ষাসমূহের ধারাবাহিক বিন্যাস কখনো একঘেয়ে হয়ে ওঠেনি। এখানে বাস্তব জীবনের কতগুলো আবশ্যিক করণীয় সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। খ্রীষ্ট চেয়েছেন, বাস্তব জীবনে এই শিক্ষার প্রয়োগ ঘটানোর মাধ্যমে লোকেরা তাঁর বাণী সর্বোপরি ঈশ্বরের বিষয়ে জানতে সমর্থ হোক। লক্ষ্য করুন, পাহাড়ের ওপর খ্রীষ্টের দেওয়া এই শিক্ষা মূলত উপদেশমূলক; খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসসূত্রের সামান্যই এখানে উপস্থিত। তিনি এখানে তাঁর শিক্ষার ব্যবহারিক দিকটির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন; তাঁর শিক্ষা আমাদের পথ দেখায়; কোন সংস্কার-ধারণার বোঝা আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয় না; যেমনটা আমরা দেখি– শিষ্যরা কাছে আসার পর তিনি শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হলেন (১, ২ পদ);

ক. পৃথিবীর প্রচলিত ধারণার বাইরে গিয়ে খ্রীষ্ট সেই সৌভাগ্যবানদের বিষয়ে বললেন যারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভে ধন্য হবে। খ্রীষ্টের এই শিক্ষা জাগতিকতার বিচারে অযৌক্তিক, অসঙ্গত মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা কিন্তু যথেষ্টই অর্থপূর্ণ। ঈশ্বর মানুষকে কীসের নিরিখে মূল্যায়ন করেন সে বিষয়ে একটি পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গি এখানে ফুটে উঠেছে। সাহিত্যের পরিভাষায় একে বলা হয় প্যারাডক্স। খ্রীষ্ট চান যেন আমরা জাগতিক মূল্যায়নের প্রত্যাশা না করে, ঈশ্বরের প্রশংসা লাভে আগ্রহী হই (৩-১২)।

খ. তিনি আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের বিষয়ে বললেন।

১. এ ব্যাপারে শিষ্যদের নির্দেশনা দিতে গিয়ে তিনি তাদের লবণ ও আলোর সাথে তুলনা করলেন (১৩-১৬ পদ)।

২. তারা যেন বুঝতে পারে তাদের কি করা উচিত– তাদের নৈতিক নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। এখানে,

(১) আইন-কানুনের সাধারণ প্রতিফলন দেখা যায় এবং নিয়ম হিসাবে বাস্তবায়ন করার সুপারিশ করা (১৭-২০)।

(২) খ্রীষ্টের ওপর বিশ্বাস আনার ফলে আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহের অধীন হওয়ার সুযোগ লাভ করেছি। তবে পৃথিবীর আলো ও লবণ হিসেবে আমাদের অনবরত ভাল কাজ করে যেতে হবে। যারা ব্যবস্থার অধীন তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহের বিষয়ে না জেনে বিভিন্ন নিয়ম-কানুনের দ্বারা নিজেদের শৃঙ্খলিত করে ফেলে; তাদের ভাল কাজের পেছনে আনন্দ থাকে না; কিন্তু খ্রীষ্টের শিষ্যরা নিজেদের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে স্বতপ্রণোদিত হয়ে সৎ কাজ বেছে নেয়। এখানেই ব্যবস্থাপন্থীদের সাথে খ্রীষ্টের শিষ্যদের মূল পার্থক্য (২০ পদ)। ঈশ্বরের সাথে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের কারণেই মানুষ মোশির মধ্য দিয়ে আসা ব্যবস্থার নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল; এখানে আমরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে ব্যবস্থার সঠিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পাই:

(ক) ষষ্ঠ আদেশে উল্লেখিত খুনের বিষয়ে (২১-২৬ পদ);
(খ) সপ্তম আদেশে বলা ব্যভিচারের বিষয়ে (২৭-৩২ পদ);
(গ) দিব্য-বিষয়ক তৃতীয় আদেশ (৩৩-৩৭ পদ);
(ঘ) প্রতিশোধ সম্পর্কিত আদেশ (৩৮-৪২ পদ) এবং সবশেষে
(ঙ) ভালবাসা সম্বন্ধে (৪৩-৪৮ পদ)।

খ্রীষ্ট তাঁর শিক্ষায় ব্যবস্থার বিভিন্ন নিয়মকানুনের সঠিক উদ্দেশ্য এবং সেগুলোর প্রায়োগিক গুরুত্বের প্রতি আলোকপাত করার মাধ্যমে সবার কাছে এই অনুপম বার্তা পৌঁছে দিলেন যে, ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করতে হবে আত্মিকভাবে, জাগতিকতার নিরিখে নয়।

মথি ৫:১-২ পদ

ক. এখানে আমরা প্রচারক হিসেবে আমাদের প্রভু যীশুকে দেখতে পাই; যিনি শ্রেষ্ঠ ভাববাদীর প্রচারক হিসেবে এরই মাঝে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন; পৃথিবীর অন্ধকার দূর করতে 'আলো' হয়ে আসা খ্রীষ্ট তাঁর সমসাময়িক যোহনসহ অন্য ভাববাদীদের মতো কেবল কর্তব্যের খাতিরে প্রচার করেন নি; বরং প্রচারের ধরনে, নিবিষ্টতায় এবং অধিকারসুলভ দৃঢ়তায় তাদের সবাইকে তিনি ছাপিয়ে গিয়েছিলেন। খ্রীষ্ট হলেন অনন্ত জ্ঞান; তাঁকে ছাড়া কিছুই সৃষ্ট হয়নি। পৃথিবী সৃষ্টির আগে থেকেই তিনি ঈশ্বরের সাথে ছিলেন, যে কারণে ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্বন্ধে তিনিই ভাল জানতেন (যোহন ১:১৮)। শেষ দিবসের বিষয়ে খ্রীষ্টের বলা কথা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোন সুযোগ নেই, কারণ ঈশ্বরের বাক্য হিসেবে শেষ দিবসের বিষয়ে তিনিই তো ভাল জানবেন! গত অধ্যায়ে আমরা খ্রীষ্টকে গালীলে অনেককে সুস্থ করতে দেখেছি; তাঁর এই আশ্চর্য কাজ দেখে লোকেরা বাস্তবিকই তাঁর কাছ থেকে কিছু শোনার জন্য অনুপ্রাণিত হয়েছিল। বলা চলে, সেই চিহ্ন-কাজসমূহ খ্রীষ্টকে লোকদের শিক্ষা দেবার জন্য একটি চমৎকার ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছিল। গালীলের বিভিন্ন সমাজ-ঘরে খ্রীষ্ট যেসব বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে বেড়িয়েছিলেন সেই শিক্ষা বোধকরি সেসবেরই সারকথা কিংবা পুনরুক্তি। সে সময় তিনি এই বলে প্রচার করেছিলেন, 'পাপ থেকে মন ফেরাও, কারণ স্বর্গ -রাজ্য কাছে এসে গেছে।' পাহাড়ের ওপর খ্রীষ্ট এখন যে শিক্ষাদানে উদ্যত হয়েছেন তা মূলত পাপ থেকে মন ফেরানোর পরবর্তী কর্মপন্থার বিষয়ে নির্দেশিত। যেখানে বিচার ও তার প্রয়োগ উভয় ব্যাপারেই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। কীভাবে আমরা বিচারের দিনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করব– তার সুনির্দিষ্ট উপায় তিনি আমাদের কাছে তাঁর এই শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। ফলে 'আমরা কেমন করে ফিরে আসব'– সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি তার কাঙ্ক্ষিত উত্তর খুঁজে পেল (মালাখি ৩:৭)। মথির লেখা এই সুসমাচারের ১৩ অধ্যায়ে তিনি স্বর্গ-রাজ্যকে বর্ণনা করতে গিয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন। এর মাধ্যমে মানুষের প্রতি খ্রীষ্ট যে মমতা পোষণ করেন সেটাই আরও মূর্ত হয়ে ওঠে।

খ. লোকদের শিক্ষা দেবার জন্য খ্রীষ্ট গালীলের একটি সাধারণ পাহাড়কে বেছে নিলেন; এর আগে তিনি গালীলের সর্বত্র প্রচার ও আরোগ্য-কাজ করে বেড়িয়েছেন। শিক্ষাদানের জন্য কিংবা প্রচার কাজের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন স্থান তাঁর ছিল না; যেমন ছিল না মাথা রাখবার জন্য তাঁর একটুখানি আশ্রয়। ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকরা যখন মোশির

ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে জগতের প্রাপ্য সব সম্মান লাভ করে আরাম-আয়েশে জীবন যাপন করছিল, সেখানে সত্যের শিক্ষক আমাদের প্রভু যীশু মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ালেন; তিনি সেখানে পাহাড়ের চেয়ে ভাল আর কোন পুলপিঠ খুঁজে পেলেন না; এবং সবচেয়ে অবাক করা ঘটনা হচ্ছে সেই পাহাড় যিহূদীদের কাছে 'পবিত্র' বলে স্বীকৃত কোন পাহাড়ও (যেমন সিয়োনের পাহাড়সমূহ) নয়। লোকদের শিক্ষাদানের জন্য খ্রীষ্ট একটি সাধারণ পাহাড়কে বেছে নিয়ে উপাসনার স্থানের বিষয়ে সম্পূর্ণ নতুন এক শিক্ষা দিলেন; পৃথিবীতে 'পবিত্র' বলে এমন কোন স্থান নেই যেখানে মানুষ সত্যিকারের উপাসনা করতে পারে। ঈশ্বর চান যেন মানুষ আত্মায় ও সত্যে তাঁর উপাসনা করে; ফলে এর জন্য বিশেষ কোন স্থানের প্রয়োজন হয় না। বরং যে কোন স্থানে, যে কোন সময় মানুষ ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতায় তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা ও ধ্যানে সময় কাটাতে পারে। ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং এর ব্যবহারিক দিকটির সঠিক রূপায়নে খ্রীষ্ট যে শিক্ষা দিলেন তা একটি পাহাড়ের ওপর; কারণ মোশিকে এরকম একটি পাহাড়ের ওপরই ব্যবস্থা দেয়া হয়েছিল। খ্রীষ্টের এই শিক্ষায় তাঁর অনুসারীরা কীভাবে জীবন যাপন করবেন তার একটি দিকনির্দেশনাও দেয়া হয়েছে। লক্ষ্য করুন, মোশিকে ব্যবস্থা দেয়ার সময় ঈশ্বর পাহাড়ের ওপর আগুনের মধ্যে নেমে আসলেন; কথা বললেন জোর আওয়াজের সাথে; এ ছাড়া তাঁর নেমে আসার সময় লোকদের দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়াতে বলা হল। এখানে আমরা দেখি, প্রভু পাহাড়ের ওপর উঠলেন, কথা বললেন স্বাভাবিক স্বরে; আর লোকদের কাছে আসার অনুমতি দিলেন। কি আশ্চর্য পরিবর্তন! পৃথিবীর মানুষের জন্য খ্রীষ্ট নিয়ে এসেছিলেন অনুগ্রহ ও সত্য; তাঁর মধ্য দিয়ে আসা ঈশ্বরের অনুগ্রহ হচ্ছে মানুষের জন্য ঈশ্বরের নতুন এক ব্যবস্থা– যা মানুষ ও ঈশ্বরের মাঝে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে দেয় (২ করিন্থীয় ৩:৭, ইব্রীয় ১২:১৮)। গালীলের দুই গোত্র সবূলূন ও ইষাখর সম্বন্ধে এই কথা বলা হয়েছিল যে 'তারা লোকদের পাহাড়ের ধারে ডাকবে;' (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩:১৯) আর এই সেই পাহাড়, এখানেই আমাদেরকে ধার্মিকতার জন্য আত্মনিবেদন করার বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হল। এটাই সদাপ্রভুর সেই পাহাড় যেখানে তিনি আমাদের তাঁর পথ সম্বন্ধে শিক্ষা দিলেন (যিশাইয় ২:২,৩; মীখা ৪:১,২)।

গ. এখানে আমরা খ্রীষ্টের শিক্ষার শ্রোতা হিসেবে তাঁর শিষ্যদের দেখতে পাই; যারা তাঁর আহ্বান সাড়া দিয়ে তাঁর কাছে এসেছিলেন (মার্ক ৩:১৩; লূক ৬:১৩)। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দেবার জন্য বেছে নিলেন কারণ তারা তাঁকে অনুসরণ করেছিল ভালবাসায় এবং শেখার তাড়নায়; যেখানে অন্যরা কেবল রোগমুক্তির জন্য খ্রীষ্টের পেছনে পেছনে গিয়েছিল। তিনি তাদের শিক্ষা দিলেন কারণ তারা তা গ্রহণ করতে আন্তরিক ছিল; শিষ্যেরা খ্রীষ্টের শিক্ষা বুঝতে পারতেন– যা অন্যরা তাদের বোকামির কারণে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল। যেহেতু তারা অন্যদের কাছে খ্রীষ্টের শিক্ষা তুলে দেবার সুযোগ লাভ করেছিলেন তাই তাঁর শিক্ষার বিষয়ে তাদের স্বচ্ছ-সম্যক জ্ঞান থাকাটা আবশ্যক ছিল। স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশের জন্য যেসব করণীয়ের বিষয়ে খ্রীষ্ট এখানে উল্লেখ করেছেন তা যে কেবল তাঁর শিষ্যদের জন্য প্রযোজ্য ছিল তা নয় বরং তাঁর এই শিক্ষা ছিল পৃথিবীর সব মানুষের জন্য। যদিও খ্রীষ্ট এখানে শুধুমাত্র তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশে তাঁর শিক্ষা দিয়েছেন তবুও একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, তা সবাই শুনেছিল; কারণ ৭:২৮ পদে বলা হয়েছে, 'তাঁর শিক্ষা শুনে লোকেরা বিস্মিত হল।' খ্রীষ্টের শিক্ষা শোনা থেকে লোকদের বিরত রাখতে পাহাড়ের আশপাশে কোন প্রতিবন্ধকতা রাখা হয় নি; যেমনটা আমরা তুর পাহাড়ের ক্ষেত্রে দেখি (যাত্রা

১৯:১২); কারণ খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমরা কেবল ঈশ্বরের সাথে কথা বলার অধিকারই নয় উপরন্ত তাঁর শিক্ষা শোনার সুযোগও লাভ করি। খ্রীষ্ট যখন শিক্ষা দিচ্ছিলেন তখন তাঁর দৃষ্টি সামনের জনতার দিকেও ছিল। বিভিন্ন চিহ্ন-কাজ করার ফলে, তাঁকে ঘিরে বিপুল মানুষের যে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল তার যথার্থ মূল্যায়ন দানে তিনি তাদের শিক্ষা দিতে উদ্যত হলেন; লোকদের শিক্ষাদানের এই অপূর্ব সুযোগ তিনি হাতছাড়া করতে চাইলেন না। মনে রাখুন, যেখানে অনেক মানুষের সমাগম দেখা যাবে সেখানে প্রচারকদের খ্রীষ্টের বিষয়ে প্রচার করতে হবে; কারণ অনেকের মাঝ থেকে কেউ না কেউ তা গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে প্রচারকদের একটি বিষয়ে পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন যে, তারা খ্রীষ্টের রাজ্যের জন্য লোকদের জয় করতেই প্রচার করছেন, নিজেদের প্রশংসা কুড়ানোর জন্য নয়।

ঘ. 'তিনি বসলে পর' শিষ্যেরা তাঁর কাছে আসলেন; অর্থাৎ খ্রীষ্ট এখানে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই বসলেন। এর আগে তিনি বিভিন্ন সময়ে বিক্ষিপ্তভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন; কিন্তু এবারের শিক্ষা অনেকটাই সুসন্নিবেশিত; যেহেতু তিনি শিক্ষা দেবার জন্য মনস্থ করেছিলেন। তিনি বিচারকের মতো করে বসলেন। এর দ্বারা তিনি ঈশ্বরের বাক্য শোনার জন্য আমাদের কী রকম আকাঙ্ক্ষী ও মনোযোগী হতে হবে তার প্রতি আলোকপাত করলেন। 'তিনি বসলেন;' এবং এর মাধ্যমে মালাখি শাস্ত্রের ৩:৩ পদে বলা ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ হল– 'যে লোক রুপা গলিয়ে খাঁটি করে তিনি তার মতো হয়ে বসবেন। তিনি লেবীয়দের পবিত্র করবেন ও সোনা-রুপার মতো করে তাদের খাঁটি করবেন'। তিনি সিংহাসনে বসলেন ন্যায়বিচার করার জন্য (গীত ৯:৪); আর তাঁর এই কথাই আমাদের বিচার করবে। 'তিনি মুখ খুললেন'; হিব্রু ভাষায় কথা বলার বিষয়টি বোঝাতে এরকম ঘোরানো উক্তি (প্যারিফ্র্যাসিস) ব্যবহৃত হয়ে থাকে (যেমন ইয়োব ৩:১)। তবুও অনেকে মনে করেন এই উক্তি দ্বারা খ্রীষ্টের বক্তব্যের ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ দিকটির প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। তাঁর কাছে আগত লোকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছিল; তার সাথে পাল্লা দিয়ে খ্রীষ্টের কণ্ঠস্বরও ধীরে ধীরে উঁচুতে উঠছিল। এর আগে তিনি তাঁর ভাববাদীদের মাধ্যমে কথা বলেছিলেন; তিনি ভাববাদীদের মুখ খুলে দিয়েছিলেন (যিহিষ্কেল ৩:২৭; ২৪:২৭; ৩৩:২২); কিন্তু এখন তিনি তাঁর নিজের মুখ খুললেন এবং স্বাধীনভাবে অধিকারের সাথে কথা বলতে শুরু করলেন। একজন প্রাচীন বিজ্ঞজনের কাছ থেকে খ্রীষ্টের শিক্ষাদান ও প্রচারকাজ সম্বন্ধে একটি চমৎকার ধারণা পাওয়া যায়; তার মতে, খ্রীষ্ট মুখে কিছু না বলেও নিজের জীবন দ্বারা অনেককে শিক্ষা দিয়েছেন; তাঁর দৃষ্টান্তমূলক জীবন, ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র হিসেবে অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়ার বিনম্র অভিব্যক্তিই আমাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা এনে হাজির করে; এর জন্য তাঁর কথা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। তবুও এবারে তিনি মুখ খুললেন; এবং এর মাধ্যমে শাস্ত্রের এই কথা পূর্ণ হল– 'সুবুদ্ধি কি ডাক দেয় না? উঁচু জায়গা থেকে বিচারবুদ্ধি কি চিৎকার করে কথা বলে না?' এবং 'তাঁর ঠোঁট সবসময় সত্যের বিষয়ে বলে' (হিতোপদেশ ৮:১, ২, ৬)। 'তোমার সন্তানেরা প্রভুর শিক্ষা শুনবে'; যিশাইয় ৫৪:১৩ পদে করা এই প্রতিজ্ঞার বাস্তবায়নেই তিনি তাদের শিক্ষা দিলেন; কারণ এইজন্যই তাঁকে শিক্ষিতদের জিভ (৫০:৪) এবং প্রভুর আত্মা (৬১:১) দেওয়া হয়েছিল। তিনি তাদের শিক্ষা দিলেন যেন তারা কোন্‌টা ভাল আর কোন্‌টা খারাপ সে বিষয়ে বুঝতে পারে এবং নিজেদেরকে প্রভুর ইচ্ছামতো চলার দিকে পরিচালিত করতে পারে। বিষয়বস্তুর স্পষ্টতার জন্য খ্রীষ্টের এই শিক্ষার মর্মার্থ

বোঝার জন্য খ্রীষ্টানদের কোন অনুমানের দারস্থ হতে হয় না। কীভাবে আমরা আমাদের মনকে নিয়ন্ত্রণ করব এবং আমাদের মনোভাব কেমন হবে তা আমরা এই শিক্ষা থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারি; সুসমাচারের সময়ই যে সংশোধনের প্রকৃত সময় (ইব্রীয় ৯:১০) এবং সুসমাচারের দ্বারাই যে আমরা সংশোধিত হয়ে ভাল ও উৎকৃষ্ট কাজ করতে অগ্রসর হই– সেটাতো প্রমাণিতই। যারা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে তাদের জীবনে নিশ্চিতভাবে খ্রীষ্টের মাঝে থাকা সত্যের প্রকাশ দেখা যাবে (তীত ১:১)।

মথি ৫:৩-১২

খ্রীষ্ট আশীর্বাদের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে শুরু করলেন; কারণ আমাদের আশীর্বাদ করবার জন্য তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন (প্রেরিত ৩:২৬); তিনি আমাদের মহাপুরোহিত, মল্কিষেদকের মতো ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য পুরোহিত; তাঁর মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সব জাতির লোকেরা আশীর্বাদ পাবে (আদি ১২:৩)। খ্রীষ্ট আমাদের জন্য কেবল আশীর্বাদ নিয়েই আসেন নি উপরন্তু তিনি আমাদের ওপর সেই আশীর্বাদ ঢেলে দিতে এবং তা দিয়ে আমাদের পূর্ণ করতে এসেছিলেন। এখানে আমরা খ্রীষ্টকে এমন একজনের মতো আশীর্বাদের কথা উচ্চারণ করতে দেখি, যার অধিকার আছে এবং যিনি কাউকে আশীর্বাদযুক্ত করার বিষয়ে আদেশ দিতে পারেন। এবং সেই আশীর্বাদের কথাই তিনি এখানে বারবার তাঁর ইচ্ছার বাধ্য থাকাদের প্রতি উচ্চারণ করেছেন। তাঁর এই আশীর্বাদের বাণী নিশ্চিতভাবেই তাঁর প্রকৃত অনুসারীদের অপরিসীম আনন্দ ও উৎসাহ যোগায়; যেহেতু তারা ইতোমধ্যেই তাঁর আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হয়েছে। যেখানে অভিশাপ দিয়ে পুরাতন নিয়মের সমাপ্তি ঘটেছে সেখানে সুসমাচারের শুরুই হল আশীর্বাদ দিয়ে; কারণ এখানে আমাদের সেই আশীর্বাদের ভাগী হতে ডাকা হয়েছে। খ্রীষ্টের প্রতিবার আশীর্বাদের বাণী উচ্চারণের পেছনে দু'টি উদ্দেশ্য ছিল; তিনি দেখাতে চাইলেন যে, ১. কারা সত্যিকারের আনন্দ লাভ করবে এবং তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কেমন হবে ও ২. কীভাবে তারা সেই আনন্দ লাভ করবে এবং তা কোন্ কাজের নিরিখে সম্ভবপর হবে। এখন,

১. খ্রীষ্টের এই শিক্ষায় অন্ধকারাচ্ছন্ন ও লালসাপূর্ণ পৃথিবীর ধ্বংসপ্রবণ ভ্রান্ত পদক্ষেপসমূহকে সংশোধন করার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। আশীর্বাদ মানুষকে তার করণীয় পালনে উদ্বুদ্ধ করে, সুষ্ঠুভাবে তা সম্পন্ন করতে সাহায্য করে; আর সত্যিকারের আশীর্বাদ আসে ঈশ্বরের কাছ থেকে। কিন্তু মানুষ যখন এই বলে প্রশ্ন করল, 'কে আমাদের ভাল করতে পারে?' (গীত ৪:৬) তখন একথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, মানুষ ঈশ্বরের আশীর্বাদের বিষয়ে বুঝে উঠতে পারে নি। তারা সাধারণ্যে স্বীকৃত সুখ, আনন্দকে বেছে নিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার বাইরে চলে যায়; উপরন্তু তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করে না। সাধারণভাবে আমরা পৃথিবীতে ধনীদের সম্মান ও আশীর্বাদ লাভ করতে দেখি; তারা আমোদ-প্রমোদের মাঝে তাদের দিনগুলো কাটায় এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বছর অতিবাহিত করে। তারা চর্বিযুক্ত বিভিন্ন উপাদেয় খাবার এবং মিষ্টি পানীয় খেয়ে থাকে; আর সবকিছুকে নিজের করে পেতে চায়। শুধুমাত্র সুখী হওয়াটাই তাদের জীবনের ধ্যান-জ্ঞান হয়ে দাঁড়ায়; ফলে তারা তাদের খারাপ ইচ্ছাকে নিয়ে গর্ব করে এবং ঈশ্বরকে অভিশাপ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না (গীত ১০:৩)। এখন, আমাদের প্রভু যীশু এই ভুল

চিন্তাকে সংশোধন করে আমাদের ঈশ্বরের আশীর্বাদের অধীন করার জন্য আসলেন। সম্পূর্ণ নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি সত্যিকারের সুখী হবার মন্ত্র দিলেন। খ্রীষ্টের এই শিক্ষার অন্তর্নিহিত অর্থ না বুঝলে তা অনেকের কাছে পক্ষপাতদুষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারে; কিন্তু যারা অগ্রসর চিন্তা করেন এবং শিক্ষার মূল অনুসন্ধান করতে সচেষ্ট হন তাদের কাছে এর অর্থ পরিষ্কারভাবে পরম সত্য হিসেবে ধরা দেবে। এর মাঝে কোন অনিশ্চয়তার স্থান নেই। আমরা নিজেদের জীবনের সাথে এখানে বলা কথাগুলো মিলিয়ে দেখতে পারি; নিজেদের বিচার করতে পারি। তাই, এটা যদি খ্রীষ্টের মতবাদের সূচনা হয়ে থাকে তবে প্রত্যেক খ্রীষ্টানকে তার জীবনে খ্রীষ্টের এই বাস্তবসম্মত শিক্ষাকে কাজে লাগাতে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। কারণ এর ফলেই তারা জীবনের সত্যিকারের আনন্দ ও সার্থকতা খুঁজে পাবেন।

২. খ্রীষ্টের সুসমাচার গ্রহণকারীদের মাঝে যারা গরীব, দুর্বল তাদের কাছে এই শিক্ষা অসীম উৎসাহ বয়ে আনে; কারণ তারা তখন এই নিশ্চয়তা লাভ করে যে, খ্রীষ্টে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে কেবল তালন্ত, অনুগ্রহ, মানসিক প্রশান্তি এবং আত্মিক স্বাচ্ছন্দই নয় উপরন্তু স্বর্গ-রাজ্যে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে সুখ ও সম্মান লাভের সুযোগ লাভ করবে।

৩. এই শিক্ষা অনেককে খ্রীষ্টের পথে আসতে এবং খ্রীষ্টের আদেশকে নিজেদের আত্মায় প্রতিস্থাপন করতে অনুপ্রাণিত করে। এখানে লক্ষণীয় যে, খ্রীষ্ট তাঁর শিক্ষার শুরুতে আশীর্বাদের বাণী উচ্চারণ করলেন; শেষে নয়। শ্রোতাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে প্রথাগতভাবে যেভাবে আশীর্বচন দেওয়া হয়, তিনি সেই পথের ধার দিয়েও গেলেন না। তিনি তাঁর বক্তব্য শুরুই করলেন আশীর্বাদের বাণী দিয়ে। এর ফলে অনেকেই তাঁর কথা শুনতে কান পেতে দিয়েছিল। পুরাতন নিয়মে আমরা ইস্রায়েল জাতির লোকদের আশীর্বাদের বাণী শোনার জন্য গরিষীম পাহাড়ে এবং অভিশাপর বাণী শোনার জন্য এবেল পাহাড়ে সমবেত হতে দেখি (দ্বিতীয় বিবরণ ২৭:১২); এবং সেখানে আশীর্বাদের চেয়ে অভিশাপর ওপরই বেশি জোর দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এখানে খ্রীষ্টের মুখ থেকে নিঃসৃত হল আশীর্বাদের বাণী; এবং তা দৃঢ়তার সাথে। অভিশাপর কথা যেন অস্ফুটে শোনা গেল। এর কারণ, তিনি চান, কেউ যেন অভিশাপর ভাগী না হয়। আমাদের সামনে জীবন ও মৃত্যুর যে পৃথক মঞ্চ সাজানো আছে তার মধ্য দিকে আমরা যেন সত্যিকারের জীবনকে বেছে নিই– এই ছিল তাঁর মনোবাসনা। ব্যবস্থা আমাদের কাছে আসে অনেকটা শাসকের মতো যে বারবার মৃত্যুর ভয়ে আমাদের শংকিত করে তোলে; কিন্তু খ্রীষ্ট আমাদের সামনে আসেন বন্ধুর মতো জীবনের দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে। একমাত্র তিনিই আমাদের সত্যিকারের জীবন দিতে পারেন; তাঁর মাঝেই যাবতীয় 'ভালো'র অস্তিত্ব। যে লোকেরা তাঁকে রোগীদের সুস্থ করতে দেখেছিল (৪:২৩, ২৪) তারাই এবারে খ্রীষ্টের কাছ থেকে অনুগ্রহের বাণী শুনতে পেল। এর ফলে তারা একথা ভাবার অবকাশ পেল যে, তিনি আমাদের জন্য ভালবাসা নিয়ে এসেছেন।

৪. খ্রীষ্টের এই শিক্ষায় ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে স্থাপিত অনুগ্রহের চুক্তির সারকথা বিবৃত হয়েছে। স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ প্রথমে ঈশ্বর আমাদের কাছে কী চান সে সম্পর্কে বলে; তারপর, আমরা তাঁর কাছে কী প্রত্যাশা করব তা ব্যখ্যা করে। এখানে অল্প কথায় যেভাবে সামগ্রিক বিষয়টি ফুটে উঠেছে তা এর আগে অন্য কোথাও গ্রন্থিত হয়নি। এবং এটাই সেই সুসমাচার যা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে; কারণ প্রভুর এই বাক্য বিশ্বাসযোগ্য এবং তা আমাদের তাঁর প্রতিজ্ঞায় নির্ভর করতে শেখায়। যে পথ আমাদের আনন্দ-সুখের দিকে নিয়ে

যায় তার দ্বার এখানে খুলে দেওয়া হল; রচিত হল পবিত্রতার রাজপথ (যিশাইয় ৩৫:৮)। আর এই নিশ্চয়তার বাক্য এল খ্রীষ্টের কাছ থেকে। আমরা যদি তাঁর আদেশ মেনে চলি তবে তাঁর প্রতিজ্ঞাত পুরস্কার, দয়া আমরা অবশ্যই লাভ করব। তাঁকে ছাড়া পতিত মানুষ কোন মতেই ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ-সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে না। কোন কোন বিজ্ঞ অবিশ্বাসী সৌভাগ্য বা আশীর্বাদ সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে ভিন্ন ধারণা পোষণ করলেও দেখা গেছে যে, তাদের সেই ধারণার গভীরে স্বয়ং প্রভু যীশু রয়েছেন। অর্থাৎ তারা তাদের চিন্তার মাধ্যমে যীশুর কথাকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ ঘটেছে তাদের নিজেদের ভাষায়। সৌভাগ্যবান মানুষের বিষয়ে বলতে গিয়ে সেনেকা এই চরম সত্যটি আবিষ্কার করেছেন– সাধারণভাবে তাকেই ভাল ও সৎ মানুষ হিসেবে গণ্য করা যায়, যিনি খাঁটি হৃদয়ের অধিকারী; ভাল ও মন্দের পার্থক্য নিরূপণ করতে জানেন এবং যাকে আশপাশের কোন ঘটনা মন্দকাজের দিকে পরিচালিত করে না; পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী আনন্দ যার কাছে তুচ্ছ বলে মনে হয়; এবং যার কাছে মন্দতা পাপ এবং ভাল সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয়।

আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্ট এখানে আশীর্বাদযুক্ত আটটি চরিত্রের বিষয়ে বলেছেন; যা আমাদের কাছে একজন খ্রীষ্টানর জীবনের মূলনীতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়। প্রত্যেকের বিষয়ে বলার সময়ই তিনি উচ্চারণ করেছেন 'ধন্য তারা'; এবং কার্যত যারা সফল হবে তাদের প্রত্যেকে তার কাছ থেকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুত আশীর্বাদ লাভ করবে।

কারা প্রকৃত অর্থে সুখী? এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে,

ক. যারা আত্মায় নিজেদের গরীব মনে করে তারা সুখী (৩ পদ)। সাধারণত মানুষ যখন লালসার কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেয় তখন সে আত্মায় দরিদ্র হয়ে পড়ে; আত্মার এরূপ দারিদ্র আমাদের আশীর্বাদ পেতে দেয় না; কারণ তা এক প্রকার পাপ এবং কাপুরুষতার নামান্তর, উপরন্তু যার ভিত্তি হচ্ছে ভয়। কিন্তু এখানে আত্মায় নিজেদের গরীব মনে করার বিষয়টি সে অর্থে বলা হয়নি। আত্মার এই দারিদ্র্য হচ্ছে, নিজেদের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার জন্য নিজেদের আমিত্বকে বর্জন করে রিক্ত, বিনম্র হওয়া। প্রকৃত অর্থে আত্মায় গরীব হওয়ার অর্থ হচ্ছে:

১. ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী চলার জন্য সানন্দে দারিদ্র্যকে মেনে নেওয়া; জাগতিক সম্পদ, ভোগ-বিলাসের মায়া ত্যাগ করা। নিজেদের আর্থিক স্বচ্ছলতার উর্ধ্বে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া। পৃথিবীতে অনেক গরীব মানুষের দেখা পাওয়া যায়; তারা কেবল তাদের আর্থিক দুরাবস্থার বিষয়ে অভিযোগই জানায়; অন্যের আর্থিক স্বচ্ছলতার সাথে নিজের আর্থিক অসঙ্গতিকে তুলনা করতেই তারা সচেষ্ট থাকে। তাদের মাঝে খুব কম লোকই আছে যারা আত্মায় নিজেদের বিনম্র, শূন্য করতে আগ্রহী। কিন্তু আমরা অবশ্যই তাদের অনুসরণ করব না; নিজেদের আত্মিকভাবে বিনম্র, শূন্য করব; যে কোন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে শিখব (ফিলিপীয় ৪:১২); ঈশ্বর তাঁর অসীম জ্ঞান দ্বারাই আমাদের দারিদ্র্যকে মেনে নিতে বলেছেন; কারণ এর ফলে আমাদের আত্মিক জীবন আরও সাবলীল হয়ে ওঠে; অনেক সমস্যা এড়িয়ে চলা সম্ভবপর হয়; এজন্য আমরা সর্বাবস্থায় ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। আর আমাদের যা আছে, যতটুকুই ঈশ্বর দিয়েছেন তার সুষ্ঠু ব্যবহারে মনোযোগী হব। পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী সম্পদ আঁকড়ে ধরার চেয়ে আমাদের আত্মিক পবিত্রতা বজায় রাখার দিকেই বেশি নিবিষ্ট হওয়া উচিত; কারণ জাগতিক সম্পদ অনেক সময় আমাদের

জীবনে কাল হয়ে দেখা দেয়। তাই বলে ঈশ্বর আমাদের যা দিয়েছেন তা এক কথায় ছুঁড়ে ফেলাটা মোটেও গর্বের কিংবা অহমের বিষয় নয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে রোমান মণ্ডলীর কথা যার সদস্যরা আত্মায় দরিদ্র হতে গিয়ে তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে মণ্ডলীর ময়দান ভরে ফেলেছে। কিন্তু আমাদের মাঝে যারা ধনী তারাও অবশ্যই আত্মায় দরিদ্র হতে আন্তরিক হবেন। এর মানে হচ্ছে, গরীবদের দুঃখের ভাগী হওয়া; তাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া; তাদের সাথে আনন্দ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেওয়া; দারিদ্র্যকে সহজভাবে মেনে নিতে আমরা অবশ্যই প্রস্তুত হব; কোনোমতেই তা করতে পিছপা হব না। বরং তাকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত থাকব; বিশেষ করে যখন আমরা জানিই যে এর বিপরীতে আমাদের জন্য আরও ভাল ও স্থায়ী ধন মজুদ রয়েছে (ইব্রীয় ১০:৩৪)। ঈশ্বর যখন ইয়োবের সমস্ত ধন-সম্পদ কেড়ে নিয়েছিলেন তখন তিনি নিজেকে আত্মায় দরিদ্র করেছিলেন।

২. স্ব স্ব দৃষ্টিতে নিজেকে নিচু করা। আমাদের সামর্থ্য, কাজ কিংবা সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত-কোন কিছু নিয়েই আমাদের গর্ব করা চলবে না। পুরাতন নিয়মে দরিদ্র অর্থে অনেক সময় বিনম্র, নিজেকে শূন্য-তুচ্ছজ্ঞান করাকে বোঝানো হয়েছে। যেমনটা শিশুরা করে থাকে (১৮:৪; ১৯:১৪)। লায়দিকেয়া মণ্ডলী আত্মায় নিজেকে দরিদ্র করেনি, উপরন্তু সে দাবি করতো যে সে ধনী, তার কোন কিছুর অভাব নেই (প্র.কা. ৩:১৭)। অন্যদিকে ব্যক্তিগতভাবে পৌলের কিছুই ছিল না; ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং প্রচার ও চিহ্ন-কাজের দিক দিয়ে তিনি অনেক তালন্ত লাভ করেছিলেন। সব প্রেরিতদের মাঝে তাকে সহজেই আলাদা করা যায়; তবুও তিনি নিজেকে আত্মায় দীনহীন ভেবেছিলেন; কিন্তু আত্মিক প্রাচুর্যের কোন অভাব তার ছিল না। অন্যের তুলনায় নিজেকে সবসময় তুচ্ছ বলে গণ্য করা এবং অন্যকে প্রশংসার দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করার মাধ্যমেই আমরা নিজেদের বিনম্রতাকে প্রকাশ করতে পারি। আমাদের নিজেদের কমদামি, ক্ষুদ্র ভাবতে হবে; নিজেকে এমন একজনের মতো গণ্য করতে হবে যে অন্যের জন্য প্রয়োজনে ছোট কাজ করতেও প্রস্তুত। ঈশ্বরের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে, তিনি মহান কিন্তু আমরা তুচ্ছ, তিনি পবিত্র আর আমরা পাপী, তিনিই সব আর আমরা কিছুই না। আমাদেরকে নিজেদের তাঁর করুণাময় হস্তের নিকট সমর্পণ করতে হবে এবং তাঁর প্রতি বিনম্র-বাধ্য থাকতে হবে।

৩. খ্রীষ্টের ন্যায্যতার সামনে আমাদের অধার্মিকতা ও অক্ষমতা স্বীকার করে নিয়ে কেবল তাঁর ওপর নির্ভর করা; কারণ তিনিই আমাদের তাঁর ন্যায্যতা ও ভালবাসায় পবিত্র করেন। সেই কর-আদায়কারীর মতোই আমাদের ভগ্নচূর্ণ হৃদয়ে আত্মায় নিজেদের নত করতে হবে। আমরা নিজেদের অবশ্যই দরিদ্র বলে ভাববো; কারণ আমাদের চাওয়া, প্রার্থনা, অপেক্ষা-সবই কেবল ঈশ্বরের উদ্দেশে পরিচালিত হয়।

এখন, (১) খ্রীষ্টানদের জন্য প্রথম করণীয় হচ্ছে আত্মায় নিজেদের নত করা। অন্যান্য দার্শনিকরা এই বিনম্রতার ব্যাপারটাকেই এড়িয়ে গেছেন; অথচ তারা মূল্যবোধ গড়ে তোলার দিকে জোর দিয়েছেন; আত্মায় নিজেদের নত করা ছাড়া কি এই মূল্যবোধ রচনা করা সম্ভব? অবশ্যই তা নয়। সে কারণেই খ্রীষ্টের স্কুলের প্রথম পাঠই হচ্ছে 'আত্মায় নত, দরিদ্র হওয়া'। বিনম্রতার ওপরই তিনি অন্যসব অনুগ্রহকে গেঁথেছেন। যারা নিজেরাই নিজেদের মহান ভাবে, তাদের নিচু করা হবে। নিজেদের নম্র করার মাধ্যমেই আমরা আত্মায় ঈশ্বরের অপরিসীম অনুগ্রহ লাভ করতে সমর্থ হই। এর ফলে যে বীজ অর্থাৎ

ঈশ্বরের বাক্য আমাদের হৃদয়ে বোনা হয়েছে তা অবশ্যই আমাদের ভাল কাজের মধ্য দিয়ে ফলবান হয়ে বেড়ে উঠবে। যারা ক্লান্ত ও বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে, যাদের আত্মিক জীবনে কোন প্রাপ্তি নেই তারা খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের সেই অনুগ্রহের দেখা পেয়ে থাকে।

(২) বর্তমান পৃথিবীতে অবশ্যই তারা 'ধন্য'। কারণ ঈশ্বরের দৃষ্টি তাদের ওপর আছে। তারা তাঁর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য পেয়ে থাকে। তাদেরকে তিনি অনেক দয়া করেন। তাদের জীবন হয় আনন্দময়, সহজ; কোন শক্তিই তাদের ঈশ্বরের সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। অন্যরা যেখানে বিস্তর বাধা-প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয় সেখানে তাদের এই স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন উৎসাহিত হওয়ার মতোই ঘটনা।

(৩) 'স্বর্গ-রাজ্য তাদেরই'। ঈশ্বরের অনুগ্রহের রাজ্য যেভাবে বিন্যস্ত তা আমাদের খ্রীষ্টের মণ্ডলীর কথাই মনে করিয়ে দেয়। যাকে বলা যায় 'দরিদ্রদের জমায়েত'; সত্যিকার অর্থে তিনি তাদের একজনকেও ভুলে যান না (গীত ৭৪:১৯)। গৌরবের রাজ্য তাদেরই প্রস্তুত করা হয়েছে। যারা নিজেদের এভাবে বিনম্র করবে ঈশ্বর তাদের অবশ্যই অনেক গৌরব-সম্মান দান করবেন। পৃথিবীর গৌরব-ক্ষমতায় যারা আস্থা রাখে, তারা ঈশ্বরের দেওয়া সম্মান-গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়; কিন্তু এই পৃথিবীর সম্মানের জন্য যারা লালায়িত নয়, উপরন্তু নিজেদের নম্র, নত করে তারা ঈশ্বরের দেওয়া সেই অনন্য সম্মান লাভ করবে। যারা ধনী তাদের বিষয়ে আমরা একটু আগেই দেখেছি যে, তারা তাদের ধন-সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনে ভাল কাজ দেখাতে সচেষ্ট হবে; এবং কোন সন্দেহ নেই যে, তাদের জন্যও স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশাধিকার রয়েছে; কিন্তু যারা গরীব, যাদের ইচ্ছে থাকলেও অর্থের অভাবে অনেক ভাল কাজ করাও সম্ভব হয়ে ওঠে না তারা কী করবে? এই প্রশ্নের উত্তরে ঈশ্বরের দেওয়া সেই নিশ্চয়তার কথা বলতে হয়; যারা দরিদ্র; কিন্তু নিজেদের অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট ঈশ্বর তাদের কার্যকর ধনীদের মতো সেই একই আনন্দ দেবেন। যদি ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য আমার পয়সা খরচ করবার সামর্থ্য না থাকে; এবং যদি ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য আমার খরচ করবার সামর্থ্য ও ইচ্ছা দুই-ই থাকে– তবে উভয় ক্ষেত্রেই আমার কাজ করার সুযোগ রয়েছে। ঈশ্বর আমাকে যা দিয়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট থেকে, সামর্থ্য অনুযায়ী নিজের জীবনকে ঈশ্বরের ইচ্ছেমতো চলার জন্য নিয়োজিত করাই হবে আমার বিনম্রতার প্রকাশ।

খ. যারা দুঃখ করে তারা সুখী (৪ পদ); 'ধন্য তারা যারা দুঃখ করে।' আগেরটির মতো এটিও এক আশ্চর্য আশীর্বাদের বাণী! সাধারণত দরিদ্ররা বিভিন্ন প্রকার দুঃখভোগ করে থাকে; তাই খ্রীষ্টের অনুসারীদের মাঝে যারা দরিদ্র তাদের নিজ নিজ দুঃখভোগের জন্য হতাশ হবার কিছু নেই; এখানে তাদের আনন্দ করতে বলা হয়েছে, কারণ তারা ধন্য। আমাদের মনে এমন ভাবনা আসতে পারে, যারা সুখভোগ করছে তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রাচুর্যেই সুখী জীবন যাপন করছে; ফলে তারাই ধন্য। কিন্তু খ্রীষ্ট, যিনি দুঃখভোগের চরম অবস্থার মাঝ দিয়ে গিয়েছেন সেই তিনিই বলছেন, ধন্য তারা যারা দুঃখ করে। দুঃখভোগকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি; যেমন– পাপের কারণে, বন্ধুর কাছে ঈশ্বরের পরিচয় প্রকাশের জন্য এবং অনুগ্রহের দুঃখভোগ। পাপের কারণে যে দুঃখভোগ তা মানুষকে ঈশ্বরের অভিশাপর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়; এই দুঃখভোগ হচ্ছে মূলত পৃথিবীর। এর ফলে, মানুষের আত্মিক দীনহীনতার বিষয়টি প্রকাশিত হয়; জাগতিক অর্জনের বিপরীতে আত্মিক অর্জনের শূন্য খাতা এবং পাপের কারণে নিজের ওপর ডেকে আনা ঈশ্বরের অভিশাপ– উভয়ই এই দুঃখভোগ ডেকে আনে। অপর দুঃখভোগটি হচ্ছে

সংশোধনমূলক; যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাঁর অসীম আশীর্বাদে আমাদের তাঁর প্রতি নিবিষ্ট থাকতে চেতনা দেন; এবং আমাদের মাধ্যমে অন্যদের কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ করেন। কিন্তু খ্রীষ্ট যে দুঃখভোগের কথা বলেছেন তা হচ্ছে অনুগ্রহের দুঃখভোগ। যারা ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে এবং মনে প্রাণে তাঁর ইচ্ছামতো চলার জন্য সচেষ্ট, উদ্যোগী-তারা এই দুঃখভোগে ব্যথিত না হয়ে উল্টো আনন্দিত হয়ে থাকে। কারণ খ্রীষ্টের পথে চলার জন্য যারা আহূত তারা জেনে শুনেই দুঃখভোগের পথ বেছে নেয়:

১. পাপের কারণে আমাদের ওপর যে দুঃখভোগ নেমে আসে তা আমাদের অনুতপ্ত করে; ঈশ্বরই এই দুঃখভোগ পাঠিয়ে দেন; যেন আমরা বুঝতে পারি আমাদের পাপ কাকে আঘাত করছে (সখরিয় ১২:১০)। ঈশ্বরতে দুঃখভোগকারী তারাই যারা অনুতাপের জীবন যাপন করে এবং নিজেদের অধার্মিকতা ও ভুলের জন্য বিলাপ করে। বিপথে যাবার কারণে ঈশ্বর মানুষের ওপর থেকে তাঁর অনুগ্রহের হাত সরিয়ে নেন; আর ঠিক তখনই মানুষের ওপর নেমে আসে দুঃখভোগ। আবার অনেক সময় অন্যদের পাপের কারণেও দুঃখভোগ নেমে আসে (যিহিষ্কেল ৯:৪)– 'তুমি যিরূশালেম শহরের মধ্য দিয়ে যাও এবং তার ভেতর যেসব জঘন্য কাজ করা হয়েছে সেইজন্য যারা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কোঁকাচ্ছে তাদের কপালে একটি করে চিহ্ন দাও।'

২. অন্যদের জন্য অর্থাৎ যারা বিপথে গিয়েছে তাদের জন্য দুঃখভোগ করা। এই দুঃখভোগ হচ্ছে মানসিক। শাস্ত্রে আমরা এ প্রকার দুঃখভোগের বিষয়ে দেখতে পাই– 'বাবিলের নদীসমূহের পারে বসে আমরা যখন সিয়োনের কথা ভাবতাম তখন আমাদের চোখ জলে ভরে উঠতো' (গীত ১৩৭:১) এবং 'নির্দিষ্ট ঈদ পালন করতে না পেরে যারা দুঃখ করছে, তাদের আমি একত্র করব (সফনিয় ৩:১৮)। যিরূশালেমকে দেখে খ্রীষ্ট যেভাবে বেদনার্ত হয়ে উঠেছিলেন তেমনি অন্যের আত্মিক অধঃপতনে আমরা যখন দুঃখ করি তখন তা আমাদের এই প্রকার মানসিক দুঃখভোগের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

নিজেদের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে কাজ করার সুযোগ দিতে গিয়ে যারা দুঃখভোগকে বরণ করে নেয় তাদের এখানে 'ধন্য' বলা হয়েছে; এ-ও বলা হয়েছে যে, 'তারা সান্ত্বনা পাবে'।

(১) 'যারা দুঃখ করে তারা ধন্য'। স্বভাবতই দেখা যায় যে, যাদের হৃদয় পাপে পূর্ণ তারা আনন্দ করছে; যদিও তাদের সেই আনন্দ মেকি; কারণ তাদের হৃদয়ে সত্যিকারের আনন্দ অনুপস্থিত। তাই, যারা ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীনে থেকে দুঃখভোগ করে, তাদের হৃদয় থেকে উৎসারিত হবে সত্যিকারের আনন্দ। কারণ তারা জানে যে, তাদের হারাবার কিছু নেই; বরং প্রাপ্তির সম্ভাবনা তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে; তাদের স্বভাবতই কোন পিছুটান থাকে না। নিজের মনের কাছে তারা এ বিষয়ে পরিষ্কার যে এই দুঃখভোগ তাদের পাপের কারণে আসেনি; তাদের এই গোপন পরিতৃপ্তিই তাদের দুঃখভোগে আন্তরিক করে তোলে। 'তারা ধন্য' এইজন্য যে, তারা প্রভু যীশুর মতো; যিনি পৃথিবীতে থাকাকালীন অনেক দুঃখ সয়েছেন; যাঁর সম্পর্কে শাস্ত্রের কোথাও আমরা একথা পাই না যে, 'তিনি হেসেছিলেন'; কিন্তু প্রায়ই তাঁকে কাঁদতে দেখা যায়। 'তারা ধন্য' কারণ তারা পৃথিবীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছে; পরীক্ষাকেও তারা আনন্দের বিষয় বলেই মনে করে; শুধু তাই নয় তারা খ্রীষ্টের প্রতিশ্রুত সান্ত্বনা এবং শান্তি লাভের জন্য নিজেদের তৈরি করেছে।

(২) 'তারা ধন্য, কারণ তারা সান্ত্বনা পাবে'। হ্যাঁ, একথা সত্য যে তারা দুঃখভোগের

সাথে সাথেই সান্ত্বনা পাবে না; তাদেরকে কয়েকটা পর্যায় অতিক্রম করতে হবে; একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, তাদের যে স্বর্গীয় সান্ত্বনার আলো দেখানো হয়েছে তা তারা লাভ করবে; যেমনটা আমরা লাসারকে পৃথিবীতে দুঃখভোগের পর স্বর্গে সান্ত্বনা পেতে দেখি (লূক ১৬:২৫)। মনে রাখুন, স্বর্গীয় সুখ হচ্ছে অনন্তকালীন এবং তা চিরকালীন সান্ত্বনাদানে সক্ষম। 'যখন এই লোকদের চোখের জল মুছিয়ে দেওয়া হবে তখন তা হবে আমাদের প্রভু যীশুর জন্য সত্যিকারের আনন্দদায়ক ঘটনা; এই আনন্দ অভূতপূর্ব, অসাধারণ।' যারা খ্রীষ্টে দুঃখভোগ করে তাদের জন্য এই সান্ত্বনা হবে মধুর। যারা সত্যিকার ভাবেই স্বর্গের দিকে যাত্রা করেছে তাদের কাছে পৃথিবীর দুঃখভোগ কেবল স্বর্গ-রাজ্যে পাওয়া সান্ত্বনার পরিমাণ বাড়িয়ে নেওয়ার উপলক্ষ হয়েই দেখা দেয়। 'যে কাঁদতে কাঁদতে বীজ বুনতে যায় সে শস্যের বোঝা নিয়ে আনন্দে চিৎকার করতে করতে নিশ্চিতভাবেই ফিরে আসবে' (গীত ১২৬: ৫,৬); 'তোমরা যারা তাঁর জন্য দুঃখ করেছ, তোমরা তাঁর সঙ্গে আনন্দিত হও। তোমরা বুকের দুধ খেয়ে সান্ত্বনা পাওয়া শিশুর মতো যিরূশালেমের উপচে পড়া উন্নতি ভোগ করে তৃপ্ত হবে' (যিশাইয় ৬৬:১০)। সত্যিই, তাদের জন্য পর্বতসম সান্ত্বনা ও আনন্দ অপেক্ষা করে আছে; এবারে বরণ করে নেওয়ার পালা।

গ. স্বভাবে যারা নম্র তারা সুখী (৫ পদ); 'যাদের স্বভাব নম্র তারা ধন্য'। যারা ঈশ্বরের কাছে নিজেদের সর্বোতভাবে সমর্পণ করে তারাই নিজেদের বিনম্রতার পরিচয় দেয়। এর অর্থ হল, ঈশ্বরের বাক্যের অধীনে থেকে তাঁর ইচ্ছা ও আদেশ মেনে চলা; নিজেদের জীবনে তাঁর ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করা; এবং অন্যদের সাথে সবসময় ভদ্র ও নম্র ব্যবহার করা (তীত ৩:২)। এর মাধ্যমে তারা অন্যদের কাছে নিজেদের আসল পরিচয় তুলে ধরতে সক্ষম হয়; কোন চাপিয়ে দেওয়া কাজ না ভেবে তারা একে স্বেচ্ছায় নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করার মাধ্যমে পৃথিবীতে ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ করতে পারে। অন্যরা যখন রাগান্বিত হয় তখন তারা খুবই শান্ত ব্যবহার করবে; সর্বোপরি আশপাশের পরিবেশ, কোন ঘটনা তাদের কখনো ক্ষুব্ধ করে তোলে না; উপরন্তু তারাই তাদের নম্র ব্যবহারের মাধ্যমে গোটা পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার ক্ষমতা রাখে; এজন্য কোন সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি। বরং সবসময়, সবক্ষেত্রেই যেন তাদের নম্র ব্যবহার প্রকাশিত হয়– সেটাই ঈশ্বর চান। যাদের স্বভাব নম্র তারা সবসময় বিনম্রতার চর্চা করে; কেউ আঘাত করলে তার বিপরীতে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে ওঠা থেকে নিজেদের কী করে বিরত রাখতে হয়; উপরন্তু হাসিমুখে অন্যায়কারীর অপরাধ ক্ষমা করে দিতে হয়, তা তারা তাদের চর্চা থেকেই শিখে থাকে।

নম্র ব্যক্তিদের এখানে সুখী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে; তা কেবল স্বর্গেই নয় উপরন্তু এই পৃথিবীতেও।

১. 'তারা ধন্য' কারণ তারা 'ধন্য যীশু'-এর মতো; যিনি বিনম্রতার চূড়ান্ত উদাহরণ নিজের জীবন দিয়ে প্রকাশ করেছেন। এবং তাঁর কাছ থেকেই তাঁর অনুসারীরা কীভাবে নম্রতা প্রদর্শন করতে হয় তা শিখে থাকে (১১:২৯)। তারা ধন্য কারণ তারা ঈশ্বরের মতো রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে জানে; এবং ঈশ্বরতে অপার সান্ত্বনা, অপরিসীম আনন্দ পেতে চলেছে। তারা যেকোন পরিস্থিতি, পরিবেশের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে, গড়তে পারে নতুন নতুন সম্পর্ক। ঈশ্বরের দেওয়া আনন্দে তারা বেঁচে থাকতে কিংবা মৃত্যুবরণ করতেও হাসিমুখে প্রস্তুত থাকে।

২. 'যাদের স্বভাব নম্র তারা ধন্য, কারণ পৃথিবী তাদেরই হবে;'– এই উক্তিটি মূলত গীত ৩৭:১১ পদ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে– 'যারা নম্র তারা দেশের দখল পাবে;' জাগতিক বিষয়-আশয়ের ওপর এই একটি প্রতিজ্ঞাই নতুন নিয়মে বিবৃত হয়েছে। এর মানে এই নয় যে, তারা পৃথিবী থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ লাভ করবে; বরং এখানে ঈশ্বরের দেওয়া প্রতিশ্রুত জীবনের কথাই বলা হয়েছে– যা আমরা বর্তমানে যাপন করছি। বিনম্রতার কারণে আমরা এই পৃথিবীতেই সুস্বাস্থ্য, সম্পদ, স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা পেতে পারি। নম্রতার কারণে অনেক কঠিন সমস্যা, বিরুদ্ধতাও আমাদের কাছে সহজেই সমাধানযোগ্য হয়ে ধরা দেয়। যারা নম্র তারা স্বভাবতই সামনের দিকে তাকাবে এবং শান্তিপূর্ণ-সহজ জীবন যাপনে অগ্রসর হবে; 'কারণ তারা দেশের দখল পাবে' (দেশের স্থলে আমরা 'কনান দেশ' তথা আমাদের কাঙ্ক্ষিত 'স্বর্গ'-এর কথা ভাবলে আলোচ্য উক্তিটির মানে বোঝাটা আমাদের জন্য সহজসাধ্য হয়ে ওঠে)। তাই, যারা স্বভাবে নম্র তারা স্বর্গের মতো পৃথিবীতেও আনন্দময় জীবনের ভাগী হয়ে থাকে।

ঘ. যারা ঈশ্বরের ইচ্ছামতো চলতে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত তারা সুখী (৬ পদ)। অনেকে একথার ভুল ব্যাখ্যা করে থাকেন; তারা মনে করেন এখানে জাগতিক ক্ষুধা ও তৃষ্ণা বোধের ব্যাপারে বলা হয়েছে; কিন্তু ঈশ্বর যিনি মহান-মমতায় পূর্ণ বিচারক তিনি কী করে তাঁর ইচ্ছেপথের পরিব্রাজকদের ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাহিল করে রাখেন! তিনি তো পৃথিবীর সেই অত্যাচারী শাসকদের মতো নন- যারা তাদের অধীনস্থদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত কাজের ধকল চাপিয়ে দেয়; আর খাবারের সময় অপ্রতুল খাবার-জল দিয়ে বলে, 'খেয়ে নে, এটাই অনেক বেশি।' ঈশ্বর যে তাঁর লোকদের ওপর সহ্যের অতিরিক্ত চাপ বা পরীক্ষা আসতে দেন না– তা যেমন সত্য, তেমনি এটাও সত্য যে তিনি তাঁর লোকদের প্রতি অনেক যত্নবান; তিনি তাদের দিকে সবসময় খেয়াল রাখেন। আবার, ন্যায়বিচারক হিসেবে পৃথিবীতে যারা অত্যাচারিত তাদেরও তিনি ন্যায়ভাবে বিচার করে থাকেন (গীত ১০৩:৬)। তাই, যারা কষ্ট স্বীকার করছে তারা যদি ঈশ্বরের কাছে নীরবে তাদের আকুতি তুলে ধরে, তবে নিরূপিত সময়ে অবশ্যই তারা ঈশ্বরের ন্যায্যতা ও ভালবাসায় সান্ত্বনা লাভ করবে। কিন্তু এখানে মূলত আত্মিক ক্ষুধা ও তৃষ্ণা বোধের বিষয়টিই বোঝানো হয়েছে। যারা ঈশ্বরের ইচ্ছামতো চলবার জন্য নিজেদের মনে সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে ও সেভাবে তৃষ্ণা মেটাবার জন্য উদ্যোগী হয়– তাদের কথাই এখানে বলা হয়েছে। 'ক্ষুধা' ও 'তৃষ্ণা' দ্বারা এখানে মনোগত তাড়না, সুতীব্র আকাঙ্ক্ষাকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

১. যারা ঈশ্বরের ইচ্ছামতো চলে তারা তাঁর আশীর্বাদ পাবে (দেখুন, ২৪:৫; ৬:৩৩)। খ্রীষ্ট আমাদেরকে ঈশ্বরের ইচ্ছামতো চলবার জন্যই নিজের রক্ত দ্বারা কিনেছেন; তিনি আমাদের নিজের করে নিয়ে ঈশ্বরের সাথে আমাদের যোগাযোগ-সম্বন্ধ পুনঃস্থাপিত করেছেন যেন আমরা নিজেদের সমস্ত কাজে ঈশ্বরের ইচ্ছাকেই সবার ওপরে প্রাধান্য দিই। প্রথমেই যেন আমরা তাঁর ধার্মিকতায় চলার জন্য নিজেদের নিয়োজিত করি। এর ফলে আমরা ঈশ্বরের ধার্মিকতায় নিজেদের সাজাতে সমর্থ হই।

২. আমাদের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা বোধ সর্বোপরি বেঁচে থাকাটাই যেন ঈশ্বরের জন্য হয়। ক্ষুধার্ত-পিপাসার্ত মানুষ যেমন খাবার-জল গ্রহণ না করা পর্যন্ত শান্তি পায় না ঠিক তেমনি আমাদেরও ঈশ্বরের ইচ্ছামতো চলবার জন্য ব্যাকুল হওয়া উচিত, কারণ আমাদের সব প্রয়োজন তিনিই জোগাবেন; আমাদের জন্য সেগুলো অপেক্ষা করে আছে। ঈশ্বরের ইচ্ছা

অনুযায়ী কাজ করার জন্য আমাদের মাঝে সুতীব্র, অসীম ক্ষুধা ও চাহিদা থাকা প্রয়োজন। পৃথিবীর মানুষের যেমন ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কোন সীমা, অন্ত নেই; যেমন করে তারা কখনো কোন কিছুতে সন্তুষ্ট হয় না– ঠিক তেমনিভাবে আমাদেরও ঈশ্বরের কাজ করতে গিয়ে কিছু দূর যাওয়ার পরই সন্তুষ্ট হয়ে গেলে চলবে না। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা যেভাবে বার বার ফিরে আসে ঠিক সেভাবে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের ইচ্ছামতো কাজ করার জন্য আমাদের জীবনে সজীব, আনন্দদায়ী ক্ষুধা অনুভূত হওয়া প্রয়োজন; কারণ তা আমাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে পুরস্কার হিসেবে অপরিসীম দয়া লাভের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। দেহের শক্তি উৎপাদনের জন্য যেভাবে খাবারের প্রয়োজন হয় তেমনি আত্মিক ক্ষুধা আমাদের তাঁর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে আগ্রহী করে তোলে; কারণ তখন তা আমাদের কাছে প্রয়োজন বলেই অনুভূত হয়। ক্ষুধার্ত, পিপাসিতরা তাদের খাবারের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে; তাই আমাদের ঈশ্বরের দেওয়া নিয়োগপত্রের যথার্থ ব্যবহারে আত্মিক জীবনের সমৃদ্ধির পাশাপাশি কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। ড. হ্যামন্ড তার ব্যবহারিক ক্যাটেকিজমে (প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠ গ্রহণ) 'ক্ষুধা' ও 'তৃষ্ণা'– এর পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। তিনি বলেন, 'ক্ষুধা হচ্ছে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণের তাড়না; আত্মিক অর্থে যা আমাদের ধার্মিকতাকে স্বচ্ছ, পরিষ্কৃত অবয়ব দিতে সাহায্য করে; এবং অন্যদিকে উদ্যমতা ফিরে পেতে পান করবার বাসনাই হচ্ছে তৃষ্ণা; আমাদের আত্মিক তৃষ্ণাবোধের ফলে আমরা নিজেদের ধার্মিকতাকে নির্মোহভাবে বিচার করার অবকাশ পাই। যার দ্বারা প্রয়োজনীয় ক্ষমা ও সাহায্য লাভে আমরা ঈশ্বরের দারস্থ হতে সক্ষম হই।

'ঈশ্বরের ইচ্ছামতো চলবার জন্য যারা ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত তাদের অন্য সব প্রয়োজন মেটানো হবে।

(ক) কিন্তু সেই প্রয়োজনসমূহ হতে হবে আক্ষরিকভাবেই প্রয়োজনতুল্য; কোন অমলূক চাহিদা, প্রত্যাশা থাকা চলবে না। তাহলে, কী সেই অনুগ্রহ যার জন্য আমরা প্রত্যাশা করে আছি? সেই প্রত্যাশা অবশ্যই ভাল কিছুকে ঘিরে যা ঈশ্বর থেকে আসে। ঈশ্বরের ইচ্ছামতো কাজ করার জন্যই যেহেতু আমরা নিয়োগপ্রাপ্ত, সেইহেতু আমাদের সবসময় ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করার প্রত্যাশা থাকা উচিত; এবং ঈশ্বর আমাদের সেই প্রত্যাশা অবশ্যই পূরণ করবেন। ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত আত্মা সবসময় ভালোকে গ্রহণ করতে উদগ্রীব হয়; কারণ তা তৃপ্তিদায়ক এবং তা কখনো ছলনা করে না কিংবা পায়ের ধূলোর মতো ঝেড়েও ফেলে না (আমোষ ২:৭; ইশা ৫৫:২)।

(খ) ঈশ্বরের অপরিসীম দয়া পেয়ে 'তাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হবে'। যারা ঈশ্বরের পথে চলে তিনি তাদের প্রত্যাশা মিটিয়ে সন্তুষ্ট করবেন। একমাত্র ঈশ্বরই কোন আত্মাকে পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করতে পারেন; তাঁর অনুগ্রহই মানুষের প্রত্যাশা সার্বিকভাবে মেটাতে এবং নিজের ধার্মিকতা দিয়ে তাদের আত্মিক শূন্যতাকে পূর্ণ করতে পারেন। তিনি অভাবীকে ভাল ভাল জিনিস দিয়ে তার অভাব মোচন করেন (লূক ১: ৫৩); ক্লান্তদের সতেজ এবং দুর্বলদের আত্মাকে শক্তিশালী করে তোলেন (যিরমিয় ৩১:২৫)। ঈশ্বর তাঁর অসীম করুণায় নিশ্চিতভাবেই তাঁর লোকদের অন্তঃকরণ ও ধার্মিকতাকে পূর্ণ করবেন; আর এসবই তিনি করবেন তাঁর নিজের ধার্মিকতা ও ভালবাসায়।

ঙ. যারা দয়ালু তারা সুখী (৭ পদ)। এটিও অন্যগুলোর মতো আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে; শুনে মনে হয়– এ কীভাবে সম্ভব– যেখানে দয়ালু হওয়াটাকে পৃথিবীর দৃষ্টিতে

জ্ঞানীসুলভ কাজ বলে গণ্য করা হয় না এবং যারা দয়ালু হতে ইচ্ছুক তারা স্বেচ্ছায় নিজ সমৃদ্ধিকে জলাঞ্জলি দেয়? কিন্তু খ্রীষ্ট এখানে বলেছেন, যারা দয়ালু– অর্থাৎ অন্যের সাহায্যে সাগ্রহে এগিয়ে আসে, অন্যের দুঃখে সমব্যথী হয়ে বুক পেতে দেয়; কাউকে ব্যথা পেতে দেয় না– তারা 'ধন্য'। একজন মানুষ, যার কঠোর কিংবা উদার হবার ক্ষমতা নেই, সে স্বাভাবিকভাবেই দয়ালু হতে পারে; কিন্তু ঈশ্বর চান সত্যিকারের দয়ালুকে যিনি মনে কোন ধরনের খারাপ ইচ্ছা, বিরুদ্ধ প্রবৃত্তিকে ঠাঁই দেয় না। কেউ যদি আন্তরিকভাবে ঈশ্বরকে হৃদয়ে গ্রহণ করে থাকে তবেই তার পক্ষে দয়ালু হওয়াটা সম্ভব হয়। আমরা অবশ্যই নিজেদের ক্ষমতা, সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করব না; বরং প্রভুর দয়া-ভালবাসাকে আমাদের জীবনে কাজ করতে দেব। খ্রীষ্টের দেখানো জীবন-দৃষ্টান্ত, ভালবাসার পথকে অনুসরণ করে আমাদের উচিত বন্ধুর প্রতি বিশ্বস্ত থাকা (ইয়োব ৬:১৪) এবং ক্ষমার সর্বোচ্চ প্রয়োগ দেখানো (কলসীয় ৩:১২)। এর মাধ্যমে আমরা সবার সাথেই সহযোগিতা ও সহভাগিতার সম্পর্কে নিজেদের বাঁধতে সমর্থ হই। যারা পাপের পথে চলছে তাদের হৃদয়কে জয় করার জন্য আমাদের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকা প্রয়োজন; শুধু তাই-ই নয়, উপরন্তু তাদের আত্মিক অধঃপতনকে প্রশ্রয় না দিয়ে সঠিক নির্দেশনা-পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে সত্যিকারের জীবনের দিকে নিয়ে আসা উচিত। এ ছাড়াও যারা বিভিন্ন প্রকার দুঃখ-দুর্দশার মাঝে রয়েছে তাদের প্রতিও আমাদের দয়ার মনোভাব থাকা জরুরি। তাদেরকে সান্ত্বনা দিতে আমাদের আগ্রহী হতে হবে (ইয়োব ১৬:৫)। যারা আমাদের পেছনে পড়ে আছে কিংবা যাদের অনেক প্রয়োজন রয়েছে তাদের প্রতিও আমাদের দয়ার হাত প্রসারিত করতে হবে। যদি আমরা তা করতে ব্যর্থ হই তবে বুঝতে হবে, আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের ভালবাসা অনুপস্থিত (যাকোব ২:১৫,১৬ এবং ১ যোহন ৩:১৭); 'যদি খিদে পাওয়া লোকদের প্রতি দয়া দেখিয়ে তাদের খাবার দাও, তবে অন্ধকারেও তোমাদের আলো জ্বলে উঠবে (যিশাইয় ৫৩:৭,১০)।

এখন, যারা দয়ালু

১. তারা 'ধন্য'; যেমনটা পুরাতন নিয়মে বলা হয়েছে, 'ধন্য সে যার মনে অসহায়দের জন্য চিন্তা রয়েছে' (গীত ৪১:১)। আর তাদের এই কাজে অসীম দয়ালু ঈশ্বরের দয়াময় রূপটিই ফুটে ওঠে। আমাদেরও ঠিক ঈশ্বরের মতোই দয়ার মনোভাব ধারণ করা উচিত; কারণ তা ঈশ্বরের ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ; অন্যদের কোনোরকম সাহায্য করতে পারাটা আমাদেরই মনোতুষ্টির কারণ হয়। পৃথিবীতে ভাল কিছু করাকে সবাই সাদরে স্বাগত জানায়; এবং তা পরীক্ষিত সত্যবিশেষ। খ্রীষ্ট যে এখানে দয়ালুদের ধন্য বলে অভিহিত করেছেন তা সুসমাচারের আর কোথাও খ্রীষ্টের কথা হিসেবে দেখতে পাওয়া যায় না; এখানেও আমরা 'পরিমিতিবোধ' এবং 'বিনম্রতা'– এর প্রকাশ দেখতে পাই; কারণ দয়া দেখাতে হলে তা নীরবে করাই ভাল। যেমন ভাল নেওয়ার চেয়ে অধিক দেওয়া (প্রেরিত ২০:৩৫)। 'যারা দয়ালু তারা দয়া পাবে'। নিরূপিত সময়ে ঈশ্বরের লোকেরা তাঁর দয়া লাভে ধন্য হবে (আমরা জানি না কত শীঘ্র আমাদের জীবনে এই দয়ার প্রয়োজন অনুভূত হবে যেজন্য আমাদের দয়ালু হতে হবে); কিন্তু একথা তো আমরা জানি যে ঈশ্বর বিশ্বস্তদের সাথে বিশ্বস্ত ব্যবহার করেন এবং তাঁর প্রতিশ্রুত দয়া দান করেন (গীত ১৮: ২৫)। যারা সত্যিকার অর্থেই দয়ার মনোভাব হৃদয়ে পোষণ করে তারা কখনো কাউকে দয়া দেখাতে পিছপা হয় না। যে অন্যদের ক্ষমা করে সে ঈশ্বরের ক্ষমা লাভে সমর্থ হয় (৬:১৪ পদ); শুধু তাই-ই নয়, সে ঈশ্বরকে ধার দেয় (হিতোপদেশ ১৯:১৭); নিজের জন্য ঈশ্বরের

সুরক্ষা নিয়ে আসে (গীত ৪১:২); খ্রীষ্টের আসবার দিনে দয়া লাভের যোগ্য বলে পরিগণিত হয় (২ তীমথিয় ১:১৮); এবং পৃথিবীর শুরুতে প্রস্তুতকৃত রাজ্যের অধিকার লাভ করে (২৫:৩৪, ৩৫)। কিন্তু যারা কারও প্রতি নূন্যতম দয়ার মনোভাব দেখায় না তারা বিচারের দিনে ঈশ্বরের কাছ বিন্দুমাত্র দয়া যেন প্রত্যাশা না করে। কারণ তারা নিজেদের কৃতকর্মের প্রাপ্য পুরস্কারই পেতে চলেছে।

চ. যাদের হৃদয় খাঁটি তারা সুখী (৮ পদ); 'ধন্য তারা যাদের হৃদয় খাঁটি কারণ তারা ঈশ্বরকে দেখতে পাবে'। খ্রীষ্টের দেয়া আশীর্বাদের বাণীর মাঝে এটি সবচেয়ে আনন্দের, পরম আরাধ্য। এখানে পবিত্রতা এবং সুখ একত্রে বিবৃত হয়েছে।

১. ঈশ্বর যেহেতু খাঁটি সেহেতু খুব স্বাভাবিকভাবেই এখানে খাঁটি হৃদয়ের অধিকারীদের 'ধন্য' বলা হয়েছে। মনে রাখুন, সত্যিকারের ধর্ম খাঁটি হৃদয় গড়ে তোলার দিকে জোর দেয়। সেখানে ব্যক্তির ভেতরের পবিত্রতা সমুন্নত রাখার কথা বলা হয়ে থাকে। এর ফলে প্রকৃত ও পবিত্র ক্ষমতার অধীনে একজন ব্যক্তি তার হৃদয়ের সত্যিকারের অবস্থা পরিলক্ষণ করার সুযোগ পায়। এবং কখনো সে লোকদেখানো পবিত্রতা, ধার্মিকতার দিকে ঝোঁকে না। প্রকৃত খ্রীষ্টানরা পরিষ্কৃত, পবিত্র হৃদয় ধারণ ও লালন করেন। সেটা এমন এক হৃদয় যা সমস্ত মন্দতাবিচ্যুত (যিরমিয় ৪:১৪)। কারণ আমাদের ঈশ্বরের সম্মুখে কেবল পরিষ্কার হাত নিয়ে নয় বরং খাঁটি হৃদয় সহযোগে তোলা হবে (গীত ২৪:৪,৫; ১ তীমথিয় ১:৫)। তাই আমাদের হৃদয়কে খাঁটি করা আবশ্যক; যেখানে অন্যরা পৃথিবীর নোংরামি গায়ে মাখাতে ব্যস্ত সেখানে আমাদের নিজেদের হৃদয়কে শুদ্ধ রাখতে উদ্যোগী হতে হবে; কারণ সৎ হৃদয় সবসময় চারপাশের দূষণ-দুর্নীতি-অনাচারকে এড়িয়ে যাবতীয় ভালকেই বেছে নিতে আগ্রহী হয়। খ্রীষ্টের অনুসারী হিসেবে আমাদের দৈহিক কামনা-বাসনা, প্রার্থিব লালসা -মোহ, অমূলক চিন্তা-অনিঃশেষ আক্ষেপ থেকে হৃদয়কে পবিত্র ও খাঁটি রাখতে সাগ্রহী ভূমিকা পালনে ব্রতী হতে হবে; কারণ বাইরে থেকে যা ভেতরে যায় তা আমাদের অশুচি করে না বরং ভেতর থেকে যা বাইরে প্রকাশিত হয়, তা-ই আমাদের অশুচি করতে পুরোমাত্রায় সক্ষম। সেজন্য আমাদের হৃদয়কে বিশ্বাস দ্বারা খাঁটি করে নিতে হবে এবং নিজ নিজ হৃদয়কে ঈশ্বরের ইচ্ছেমতো চলতে প্রস্তুত করতে হবে; যেন আমরা খ্রীষ্টকে দেখানোর জন্য একটি খাঁটি, সৎ হৃদয়কে গচ্ছিত রাখতে পারি। হে ঈশ্বর, আমার হৃদয়কে পরিষ্কার, খাঁটি রাখতে সাহায্য কর!

২. আমরা যদি আমাদের হৃদয়কে খাঁটি রাখতে সক্ষম হই তবে আমাদের জন্য অসাধারণ এক পুরস্কার অপেক্ষা করছে; আমরা ঈশ্বরকে দেখতে পাব। মনে রাখুন,

(১) আত্মিক আনন্দের সম্পূর্ণতা পেলেই আমরা ঈশ্বরকে দেখতে পাই। বর্তমানে আমরা যেমন তাঁকে বিশ্বাসে অনুভব করতে পাই, দেখতে পাই, তেমনি সত্যিকারভাবেই ভবিষ্যতে আমরা তাঁর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হব। নিজেদের জীবনে তাঁর প্রতিটি বৈশিষ্ট্য ও গুণের সম্মিলন ঘটানোর মাধ্যমে আমরা তাঁকে হৃদয়ে একদম মুখোমুখি, স্বচ্ছ, পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে পারি এবং তাঁকে দেখতে পেয়ে সামনে এগুবার প্রেরণা লাভ করে থাকি। সে আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না; শাস্ত্রে যেমনটা বলা হয়েছে 'যাতে মৃত্যু থেকে জেগে উঠে তোমাকে দেখে আমি আনন্দ পাই' সেরকম আনন্দই আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। তাঁকে আমরা স্বর্গে চিরকাল দেখতে পাব; কখনো তাঁর সান্নিধ্য বঞ্চিত হব না– এই নিশ্চয়তাও তো আমাদের জন্য পরম আনন্দের।

(২) ঈশ্বরকে দেখার আনন্দ পূর্ণতা পায় খাঁটি হৃদয়ে তাঁর প্রতিশ্রুত অনুগ্রহের প্রকাশ অবলোকন করলে। যাদের হৃদয় খাঁটি কেবল তারাই ঈশ্বরকে দেখার যোগ্য; তাঁর দর্শনের ধারণক্ষমতাও কেবল তারাই রাখে। কিন্তু যাদের হৃদয় মিথ্যায় পূর্ণ তারা ঈশ্বরকে দেখার সামর্থ্য রাখে না। কারণ, যেহেতু তারা নিজেদের মন্দতাকে দেখে না; এবং সেগুলোকে সংশোধন করতেও সম্মত হয় না সেহেতু তারা ঈশ্বরের পবিত্রতাকেও দেখতে পায় না। শাস্ত্রে এদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, অপবিত্র হৃদয়ের অধিকারী কেউ স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। কিন্তু যাদের হৃদয় পবিত্র তারাই কেবল সেই প্রতিশ্রুত যিরূশালেমে প্রবেশ করতে পারবে। তারা যে ইচ্ছা নিয়ে নিজেদের হৃদয়কে পবিত্র রাখতে উদ্যোগী, আগ্রহী হয়েছে তাদের সেই ইচ্ছা তখন আক্ষরিকভাবেই পূর্ণ হবে। তাদের যাবতীয় অতৃপ্তি তখন ঘুচে যাবে; কারণ তারা ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।

ছ. শান্তি-কর্মীরা সুখী (৯ পদ)। খ্রীষ্ট এখানে প্রথমে খাঁটি হৃদয়ের আবশ্যকতার বিষয়ে বলেছেন তারপর সেই হৃদয়কে মানুষের জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হতে বলেছেন। ঈশ্বরের কাছে যেমন খাঁটি হৃদয় প্রশংসার যোগ্য তেমনি লোকদের কাছে শান্তি স্থাপনে ইচ্ছুক হৃদয়ও প্রশংসা কুড়ায়। খাঁটি হৃদয় এবং শান্তিকামিতা উভয়ই নিজেকে তো বটেই অন্যদেরও অপরাধে জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত রাখতে প্রশংসনীয়ভাবে সমর্থ হয়। এবারে আসুন দেখা যাক কারা প্রকৃত অর্থে এই শান্তিকর্মী:

১. যারা শান্তির জন্য নিজেদের নিবেদিত রাখে এবং কথায়-কাজে সঙ্গতিপূর্ণ এবং শান্তি স্থাপনে সক্রিয় ভূমিকা রাখে, তারা প্রকৃতই শান্তিকর্মী। শান্তিকামী মানুষের হৃদয় সবসময় শান্তির কথাই বলে; কারণ তারা শান্তি ভালবাসে (গীত ১২০:৭)। খ্রীষ্টের অনুসারী হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজেদের ভালবাসার প্রকাশ ঘটিয়ে সবসময় শান্তির প্রত্যাশা করা এবং একজন দক্ষ-যোগ্য শান্তিকর্মীর মতো নিজেদের জীবনে তার চর্চা করা।

২. শান্তিপূর্ণ আলাপচারিতার মাধ্যমে চারপাশের শান্তি বজায় রাখা এবং কোথাও অশান্তির উদ্ভব হতে দেখলে তার মীমাংসা করাও প্রকৃত শান্তিকর্মীর কাজ। আমরা যেমন আমাদের প্রতিবেশীর সাথে, চারপাশের মানুষজনের সাথে শান্তিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের মাঝে শান্তি অক্ষুণ্ন রাখতে পারি, তেমনি বাইরের বিরুদ্ধ-প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও শান্তি স্থাপনে উদ্যোগী হয়ে সবার কাছে খ্রীষ্টের দেওয়া শান্তির বারতা ছড়িয়ে দিতে পারি। তা হতে পারে শান্তির প্রস্তাবনা উত্থাপন করে; অশান্তির মূলে কী রয়েছে তা সমাধানের চেষ্টা করে– সর্বোপরি নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী দরকার মতো সম্ভব সবকিছুই আমরা করতে পারি; এবং তা কেবল শান্তি রক্ষা বা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। যদিও এই কাজ অনেকটা ধন্যবাদহীন দপ্তরের মতো; এবং এর সুফল ভোগে অনেককেই সাগ্রহে এগিয়ে আসতে দেখা যায়, তবুও এই কাজ আমাদের খ্রীষ্ট নিরূপিত দায়িত্ব পালনের সুযোগ করে দেয়। অনেকে মনে করেন, প্রচারকদের এই 'শান্তি প্রতিষ্ঠার পাঠ' গ্রহণ করা উচিত; যেন বিরুদ্ধ-প্রতিকূল পরিবেশে গিয়েও নিজেকে তার সাথে মানিয়ে নিয়ে শান্তিতে প্রচার কাজ চালিয়ে যেতে পারেন। এবং তাদের কাছ থেকে শান্তির বারতা পেয়ে অন্যরা খ্রীষ্টের অনুগ্রহের স্বাদ পেতে আগ্রহী ও অনুপ্রাণিত হবে।

এখন,

(১) 'যারা শান্তিকর্মী তারা ধন্য' কারণ তারা তাদের কাজের মাধ্যমে নিজেদের সন্তুষ্টি বিধান করে এবং অন্যদের নিজেদের কাজের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। খ্রীষ্টকে সাথে

নিয়েই তারা তাদের শান্তি স্থাপনের কাজ চালিয়ে থাকে। খ্রীষ্ট, যিনি পৃথিবীর সমস্ত বিরুদ্ধতাকে জয় করে শান্তি ঘোষণা করতে এসেছিলেন, তাঁর বাণীতে উদ্দীপিত হয়েই তারা শান্তি স্থাপনের কাজে ব্রতী হয়েছে।

(২) 'তাদেরকে ঈশ্বরের সন্তান বলে ডাকা হবে'; খ্রীষ্টে প্রত্যেক প্রকৃত শান্তিকর্মীর জন্য এটি এক আনন্দের ঘোষণা এবং তারা যে ঈশ্বরের সন্তান হবার গৌরব লাভ করেছে তারই বহিঃপ্রকাশ। ঈশ্বর যে তাদের নিজের বলে বেছে নিয়েছেন এই ঘোষণা সেই সত্যটিই বলে দেয়। 'শান্তিকর্মীরা ধন্য' কারণ ঈশ্বর নিজেই শান্তির আবিষ্কারক; তাঁর পুত্র হলেন শান্তির বরপুত্র এবং আমাদের মাঝে বিদ্যমান পবিত্র আত্মা হচ্ছেন শান্তির আত্মা। ঈশ্বরের আহ্বানে যারা সাড়া দিয়েছে তাদের তিনি তাঁর সাথে নতুন করে হৃদ্যতা স্থাপন করেছেন; কিন্তু যারা তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের নোংরামির মাঝে পড়ে রয়েছে, তারা তাঁর ক্রোধের অধীনে নিজেদের স্থাপন করেছে; ঠিক সে কারণেই অবিশ্বাসীদের তৈরি বিভিন্ন বিরুদ্ধতা-প্রতিকূলতাকে জয় করে যারা শান্তি স্থাপনে ব্রতী হয়েছে, খ্রীষ্ট তাদের 'ধন্য' বলে অভিহিত করেছেন; এর ফলে যারা অশান্তিকর্মী, চারপাশে অস্থিরতার বীজ বপন করে চলে তাদের যে এখানে 'ধিক' বলে নিন্দিত করা হল সেটা তো পরিষ্কারই। খ্রীষ্ট কখনো তরবারি-ধ্বংসযজ্ঞ-ভীতি সঞ্চারণের মধ্য দিয়ে তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে বলেন না; বরং তিনি চান তাঁর অনুসারীরা যেন তাঁর স্বভাবকে নিজেদের জীবনে প্রস্ফুটিত করার মাধ্যমে, অন্যদের কাছে শান্তি-ক্ষমা-পরিত্রাণের বারতা ছড়িয়ে দেয়; যেমনটা দিয়েছিলেন তাঁর শিষ্যরা। পৃথিবীর মানুষেরা যেখানে নিজেদের জীবনের নির্বিঘ্নতা নিশ্চিত করতে ব্যস্ত সেখানে ঈশ্বরের সন্তানেরা পৃথিবীর শান্তি নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে, নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত হয়ে পড়ে।

জ. ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী চলতে গিয়ে যারা নির্যাতন ভোগ করে তারা সুখী। খ্রীষ্টের বলা আশীর্বাদের বাণীর মাঝে আগের সবগুলোর চেয়ে এটা অনেক বেশি বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। বোধকরি সে কারণেই তা পরিধিতেও বড় (১০-১২) কিন্তু এ কীভাবে সম্ভব! নির্যাতনে আনন্দ! তবে, এখানে আশ্চর্যের কিছুই নেই; খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের ধরনই এমন। কারণ খ্রীষ্ট নির্যাতনের প্রত্যুত্তর না করে, আনন্দ করার শিক্ষাই তাঁর শিষ্যদের দিয়েছেন। খ্রীষ্টের দেওয়া এই শিক্ষা আমাদেও ফরৌণের স্বপ্নের কথা মনে করিয়ে দেয়; যেখানে বাস্তবতার দু'টো পিঠই উদ্দিষ্ট হয়েছিল। ঠিক সেভাবে যারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে পরিত্রাণ লাভের আনন্দে উদ্বেল হয়েছে, তাদেরকে যে নির্যাতন ভোগ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে তা তো বাস্তব আখ্যানেরই অনুপম বর্ণনা। এখানে খ্রীষ্ট যেন বলছেন, 'বন্ধুরা, ধন্য তোমরা; কারণ তোমরা আমাকে গ্রহণ করে আরাধ্য পরিত্রাণ লাভ করেছ; তোমরা যে যার-পর-নাই নিয়ে আনন্দিত সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ; কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তোমাদের জানিয়ে রাখছি যে, এই পৃথিবীতে তোমরা আমার জন্য দুঃখভোগ করবে; তবে তার কোন প্রত্যুত্তর তোমরা করবে না; কিংবা দুঃখার্তও হবে না; বরং তোমরা যা পেয়েছ সেই পরিত্রাণের আনন্দে সমস্ত কষ্ট সহ্য করবে– আমার সম্মানে; তোমাদের তা পারতেই হবে।'

এখানে লক্ষণীয়,

১. দুঃখভোগ করাটা আসলেই একটি দুআত্মা কর্ম। ভাববাদীদের বর্ণনায় আমরা দুঃখভোগের যেসব ঘটনা দেখি তা সহ্য করা অনেকের কাছেই কষ্টসাধ্য বলে মনে হয়।

(১) তারা অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করেছিলেন; অনেক দুর্ব্যবহার, অবিশ্বাস তাদের

সইতে হয়েছিল; চারপাশের বিরুদ্ধ পরিবেশ তাদের কণ্ঠস্বরকে আটকে রাখতে চেয়েছিল। ভয়ংকর অপরাধীদের যেভাবে ধরে আনার নির্দেশ দেওয়া হয় সেভাবে তাদেরও ধরে আনার জন্য নির্দেশ জারি করা হয়েছিল– যেখান থেকে পার, ওকে ধরে নিয়ে এসো। কখনো তাদের জেলে পুরে দেওয়া হয়েছিল; কখনো বা নিষ্ঠুর শাস্তি দিয়ে তাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল। উৎসর্গের মেষের মতো তারা সেসব নির্যাতনের কোন প্রত্যুত্তর করেন নি; বরং নীরবে সমস্ত দুঃখভোগ-নির্যাতন খুশিমনেই মেনে নিয়েছেন। এই ঘটনা আমাদের পবিত্রতার বিরুদ্ধে শয়তানের সমস্ত চাতুরিকর্মের কথা মনে করিয়ে দেয়। হেবলকে যেভাবে তার ধার্মিকতার কারণে খুন হতে হয়েছিল সেভাবে যেন এখনও খ্রীষ্টের অনুসারীদের বিরুদ্ধে শয়তান তার অনুসারীদের লেলিয়ে দিচ্ছে। যেমনটা আমরা পুরাতন নিয়মের সময়ে দেখতে পাই (ইব্রীয় ১১:৩৫); খ্রীষ্ট বলেছেন যে মণ্ডলীর ওপর নির্যাতন আসবেই এবং আমরাও যেন একে স্বাভাবিকভাবেই নিই (১ যোহন ৩:১৩)। তিনি নিজেই যার উদাহরণ।

(২) লোকে তাদের ঘৃণা ও জুলুম করবে এবং তাদের নামে মিথ্যে সব রকম বাজে কথা বলবে। কেউ যা করেনি যদি তাকে সেই দোষেই দোষী করা হয় তবে তা কতটা অযাচিত, অনাকাঙ্ক্ষিত। খ্রীষ্টের অনুসারীদের নামে লোকেরা অনেক মিথ্যাচার করবে এবং তাদের ধার্মিকতায় কালিমা লেপনের চেষ্টা করবে– একথা জেনে বুঝেও তাদের তা মেনে নিতে হবে। তারা যা করেনি সেজন্যও অনেক সময় তাদের দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তির অধীন করা হবে; যেমনটা আমরা পড়ি গীত ৩৫:১১ পদে– জুলুমবাজেরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে এগিয়ে আসছে; আর আমি যা জানি না সে বিষয়েই আমাকে জেরা করছে' (এ ছাড়াও দেখুন যিরমিয় ২০:১৮; প্রেরিত ১৭:৬,৭ পদ)। খ্রীষ্টে যারা নির্যাতন সহ্য করেছিলেন তাদের মাঝে যাদের তার প্রত্যুত্তর করার ক্ষমতা ছিল না তারা স্বভাবতই তা নীরবে মেনে নিয়েছিলেন; কিন্তু যাদের সেই নির্যাতনকে রুখে দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল তারাও যখন নীরবে সেই নির্যাতনকে বরণ করে নিলেন তখন তা খ্রীষ্টের শিক্ষারই প্রতিফলন ঘটিয়েছিল– 'তারা তোমাদের অত্যাচার ও জুলুম করবে'। মনে রাখুন, যেভাবে ভাববাদীরা নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন সেভাবে আমাদেরও নির্যাতনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে (যিহূদা ১৫; ইব্রীয় ১১:৩৬)। তারা কখনো বিচারকের চেয়ারে বসে, কখনো ভ্রান্ত সাক্ষী হিসেবে আবার কখনো হাস্যোজ্জ্বল ভণ্ডের মতো আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ দাখিল করবে। আমাদের বিরুদ্ধে তারা একঘেয়ে ভঙ্গিতে বলে যেতেই থাকবে; কি সামনা-সামনি; কি পেছনে-আড়ালে। দায়ূদের সামনে শিমিয়ি এবং যিরমিয়ের শত্রুরা তার বিরুদ্ধে যেমনটা করেছিল। মনে রাখুন, এমন এক স্থানে যাবার জন্য আমরা প্রস্তুত হচ্ছি যেখানে শয়তান ও তার প্রবঞ্চনা– কোনোটারই প্রবেশাধিকার নেই।

(৩) এসবই ঘটবে ধার্মিকতা এবং খ্রীষ্টের জন্য (১০, ১১ পদ)। ধার্মিকতার জন্য নির্যাতন ভোগ করার মানেই খ্রীষ্টের জন্য তা মেনে নেওয়া। কারণ তাঁকে গ্রহণ করার ফলে তাঁর ধার্মিকতাই আমাদের ধার্মিকতা বলে গণ্য হয়। আর ধার্মিকতার শত্রু খ্রীষ্টেরও শত্রু। কিন্তু যারা নিজেদের দোষে নির্যাতন ভোগ করে, তারা এই নিরিখের বাইরে। তারা তো নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তিই ভোগ করছে। অপরদিকে যারা খ্রীষ্টের জন্য দুঃখভোগ করে, এমনকি মৃত্যুকেও হাসিমুখে বরণ করে, তারা সত্যিকার অর্থেই ধার্মিকতার জন্য দুঃখভোগ করে; তারা পাপ করতে মনস্থ হয়নি বলেই নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার হয়েছে। একথা

নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, খ্রীষ্টের অনুসারীরা যে নিপীড়ন, নির্যাতনকে বরণ করে নিচ্ছে এতে নির্যাতনকারীর কোন কৃতিত্ব নেই; বরং খ্রীষ্ট ও তাঁর ধার্মিকতার শক্তিতেই তাঁর অনুসারীরা সমস্ত নির্যাতন ভোগ করতে দ্বিধা বোধ করে না; খ্রীষ্টের সেই ভালবাসার শক্তিতেই তারা নির্যাতনকে স্বাগত জানায় (গীত ৬৯:৯; রোমীয় ৮:৩৬)।

২. যারা খ্রীষ্ট এবং ধার্মিকতার জন্য নির্যাতন সহ্য করে তারা সান্ত্বনা পাবে।

(১) তারা 'ধন্য' কারণ তাদের ওপর নেমে আসা দুঃখভোগের কথা প্রভু মনে রাখবেন এবং তিনি তাদের সান্ত্বনা দেবেন (লূক ১৬:২৫)। তারা 'ধন্য' কারণ তারা খ্রীষ্টকে গৌরবান্বিত করার সুযোগ পেয়ে তা কাজে লাগিয়েছিল; সেজন্য তাদের 'ধন্য' বলে সম্মানিত করা হয়েছে; এবং তারা তাঁর সান্নিধ্যে সান্ত্বনা লাভের মহাসম্মান এবং গৌরব লাভ করবে (২ করিন্থীয় ১:৫; দানিয়েল ৩:২৫; রোমীয় ৭:২৯)।

(২) তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে মহাপুরস্কার লাভ করবে; তাদের সেই মহাপুরস্কার হচ্ছে স্বর্গ-রাজ্য। হ্যাঁ, প্রকৃতই তারা স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হবে। যদিও তারা জানে যে খ্রীষ্টের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার মাধ্যমে তারা মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়ে গেছে; তবুও এই পুরস্কারের প্রত্যাশা তাদের নিজেদের অবস্থানে খ্রীষ্টে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে উদ্বুদ্ধ করে; শয়তানের সমস্ত প্রচেষ্টাকে দৃঢ় বিশ্বাসের দ্বারা প্রতিহত করতে সাহায্য করে। তদুপরি এখানে ১২ পদে তাদের জন্য স্বর্গীয় পুরস্কারের বিষয়ে বলা হয়েছে। এই পুরস্কার নির্যাতনভোগীদের উদ্যম, দৃঢ়তা বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়; তাদের চোখে তখন কেবল ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের ছবিটাই ভাসতে থাকে। নির্যাতনভোগীরা যখন জানতে পারে যে, তারা এমন এক যিরূশালেমে প্রবেশ করতে চলেছে যেখানে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ; সেখানে কোন ভণ্ডামি, নৃশংসতার স্থান নেই, তখন তা তাদের জন্য কত না সান্ত্বনার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। মনে রাখুন, যারা ঈশ্বরের ইচ্ছামতো চলার জন্য নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেন, তা যে স্বর্গ-রাজ্যে হারানোর আর কোন ভয় থাকবে না সেটাই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি, কাম্য সান্ত্বনা। স্বর্গে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যে সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রনার চির অবসান ঘটবে তা অনুধাবন করে, নির্যাতিত বিশ্বাসীরা পৃথিবীতেই অনেক বেশি পরিমাণে সান্ত্বনা পেয়েছিলেন।

(৩) তোমাদের আগে যে ভাববাদীরা এসেছিলেন লোকেরা তাদেরও এরকম নির্যাতন করতো (১২ পদ)। এখানে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে যে, আমাদের ভাববাদীদের ওপরও লোকেরা বিভিন্নভাবে নির্যাতন চালাতো; ফলে তারা কীভাবে তা সহ্য করতেন তা অনুসরণ করার কথাও এখানে আমাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে (যাকোব ৫:১০)। খ্রীষ্টের অনুসারীদের যেভাবে নির্যাতিত হতে হয় সেভাবে পূর্বেকার ভাববাদীদেরও নির্যাতন করা হতো। ইলিশায় কিংবা যিশাইয়কে যেভাবে লোকেরা উপহাস করেছিল সেভাবে খ্রীষ্টের অনুসারীদেরও লোকেরা উপহাস করে থাকে; তাদের ওপর নিয়ে আসে যন্ত্রণাদায়ক দুঃখভোগ। এই দুঃখভোগের ছবিটা যারা দেখতে পায় তারা কোনমতেই সেই দুঃখভোগে সাড়া দিতে অসম্মত হয় না। যে গৌরব তাদের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে তা দেখে তারা সানন্দে দুঃখভোগকে 'হ্যাঁ' বলে থাকে। যে অনুগ্রহের বলে পূর্বেকার ভাববাদীরা উপহাস-বিদ্রূপকে সহজভাবে মেনে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন সেই অনুগ্রহ যে আমাদের বঞ্চিত করবে না তা তো নিশ্চিত। খ্রীষ্টের অনুসারীদের যারা এখন নির্যাতন করছে তারা পূর্বেকার ভাববাদীদের নির্যাতনকারীদেরই বংশধর– মতাবলম্বী (২ বংশাবলি ৩৬:১৬; মথি ২৩:৩১ এবং প্রেরিত ৭:৫২)।

মথি ৫:১৩-১৬ পদ

খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের এর আগে 'মানুষ ধরার জেলে' বলে অভিহিত করেছিলেন; আর এখন আমরা দেখব তিনি তাদের পৃথিবীর লবণ ও আলোর সাথে তুলনা করলেন; এর ফলে তাঁর শিষ্যদের নিজেদের প্রমাণের দায় বেড়ে গেল। খ্রীষ্ট তাদের কাছ থেকে কেমন কাজ ও আচরণ প্রত্যাশা করেন এবং এর ফলে পৃথিবী কীভাবে উপকৃত হবে– সেই নিবিড় অনুশীলন-ঋদ্ধ জীবনের কথাই আমরা এখানে প্রত্যক্ষ করব।

ক. 'তোমরা পৃথিবীর লবণ।' দুঃখভোগকে সহজভাবে মেনে নিতে খ্রীষ্টের এই উক্তি তাঁর অনুসারীদের জন্য এক অনুপম উৎসাহদায়ী বাণী। কারণ নিজেদের দিকে মানুষের অবজ্ঞা-অবিশ্বাস ধেয়ে আসলেও তারা যে পৃথিবীর জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, তা তো নিশ্চিত সত্য। তাদের আগে যে ভাববাদীরা এসেছিলেন, তাদেরকে কেবল 'কনান দেশের লবণ' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছিল কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর অনুসারীদের এখানে গোটা 'পৃথিবীর লবণ' বলে সম্বোধন করলেন। এর কারণ তারা পৃথিবীর সর্বত্র সুসমাচারের বাণী প্রচার করবেন। অন্যভাবে দেখলে, খ্রীষ্টের এই কথা তাঁর অনুসারীদের হতোদ্যম করে দিতেও যথেষ্ট ছিল; কারণ পৃথিবীটা তো আর ছোট নয়; আর বিশাল-বিস্তীর্ণ এই পৃথিবীতে কীভাবে তাদের মতো অল্প সংখ্যক মানুষ সুসমাচার ছড়িয়ে সবাইকে আলোকিত করবেন সেটাও দূরদৃষ্টির অভাবে না বোঝাটা তাদের জন্য ছিল স্বাভাবিক। খ্রীষ্ট তাদের এই শিক্ষা দেননি যে, যেভাবেই হোক লোকদের তাঁর কাছে নিয়ে আসতে হবে– সে অস্ত্রের ব্যবহারে হোক কিংবা পেশীশক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে। বরং তিনি তাঁর শিষ্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন মানুষের মাঝে তাদের খ্রীষ্টীয় ভালবাসা দেখাতে হবে; হতে হবে সত্যিকারের লবণ। তাদেরকে দূরে কাছে সব জায়গায় দায়িত্ব নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যেতে হবে; অনেকটা খামির মতো (১৩:৩৩)। সুসমাচারের বাণী অনেকটা লবণের মতো; তা জীবন্ত ও কার্যকর (ইব্রীয় ৪:১২); এবং তা হৃদয়ে আঘাত করে (প্রেরিত ২:৩৭)। এটি হৃদয়কে পরিষ্কৃত করে আনন্দে ভরিয়ে দেয় এবং সমস্ত মন্দতা থেকে সুরক্ষা পেতে সাহায্য করে। খ্রীষ্টকে জানা অনেকটা সুগন্ধের মতো (২ করিন্থীয় ২:১৪) এবং তাঁকে জানা ছাড়া কোন শিক্ষাই সম্পূর্ণ হয় না। 'লবণ'– এর অভিধাপ্রাপ্ত শিষ্যরা ঈশ্বরের চিরকালীন অনুগ্রহের চুক্তিরই ফল (গণনা ১৮:১৯) এবং খ্রীষ্টের সুসমাচারও চিরকালীন। পুরাতন নিয়মে আমরা লবণকে সমস্ত উৎসর্গের অত্যাবশ্যকীয় অনুষঙ্গ হিসেবে দেখি (লেবীয় ২:১৩); এমনকি যিহিষ্কেলের দর্শনে যে মন্দির বিবৃত হয়েছিল সেখানেও উৎসর্গের প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেব লবণের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় (যিহিষ্কেল ৪৩:২৪)। এখন, খ্রীষ্টের শিষ্যরা সুসমাচারের বিষয়ে শিক্ষা পেয়ে তা অন্যের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব লাভ করেছে– এবং তা লবণ হিসেবে। মনে রাখুন, খ্রীষ্টানরা, বিশেষভাবে প্রচারকেরা পৃথিবীর লবণ।

১. খ্রীষ্টের শিষ্যরা যদি লবণের মতো নিজেদের পৃথিবীর জন্য প্রয়োজনীয় করে তুলতে পারে তবেই তাঁর এই শিক্ষা সার্থক হয়ে উঠবে; লবণ ছোট কিন্তু স্বচ্ছ, সাদা; ভেঙে গুঁড়ো করা গেলেও তা খুবই প্রয়োজনীয়; প্লিনি বলেন, 'লবণকে বাদ দিয়ে মানুষের বেঁচে থাকার কথা ভাবাই যায় না।' দেখুন,

(১) খ্রীষ্টের শিষ্যরা লবণের মতোই নিজেদের সাজাবে; মানুষের জন্য তারা ঈশ্বরের

অনুগ্রহের বাণী নিয়ে যাবে; এবং সেই বাণী অন্যের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলে ধরার জন্য নিজেদের প্রেমময় জীবনকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরতে সচেষ্ট হবে। তাদের মুখের কথা হবে মধুর এবং লবণ দেয়া খাবারের মতো গ্রহণযোগ্য (কলসীয় ৪:৬)। তারা হৃদয়ের মধ্যে লবণ রাখবে এবং তাদের দেখে অনেকেই খ্রীষ্টের প্রতি অনুপ্রাণিত হবে (মার্ক ৯:৫০)।

(২) তারা অন্যের কাছে গ্রহণীয় হবে; তারা যে কেবল অন্যের কাছে 'ভাল' বলে পরিগণিত হবে তা নয় বরং অন্যদের প্রতিও তাদের ভাল কাজ প্রদর্শন করতে হবে; আর এর মাধ্যমেই তারা লোকদের মনে ঠাঁই পেতে সমর্থ হবে। তবে খ্রীষ্টের শিষ্যরা শুধুমাত্র একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তা করতে প্রবৃত্ত হবে আর তা হচ্ছে সুসমাচারের বাক্য সবার হৃদয়ে স্থাপন করা।

(৩) খ্রীষ্টের শিষ্যরা পৃথিবীর জন্য কত মহান অনুগ্রহ হিসেবে কাজ করে যায়! যারা একসময় মন্দতায়, পাপে বাস করতো তারাই এখন ঈশ্বরের অনুগ্রহের পরিত্রাণ পেয়ে মানুষের কাছে সুসমাচারের বাণী পৌঁছে দেবার দায়িত্ব পেয়েছে। নিজেদের জীবনকে লবণের ন্যায় সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার মাধ্যমে তারাই পৃথিবীকে স্বাদযুক্ত করতে চলেছে। খ্রীষ্টের শিষ্যরা নিজেদের পরিবর্তিত জীবন এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহের জ্ঞান নিয়ে সুসমাচার প্রচারে বেড়িয়ে পড়েছিল। খ্রীষ্ট তাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন যেন তারা লোকদের কাছে সুসমাচার তুলে ধরার আগে নিজেদের জীবনে তার প্রয়োগ দেখায়। এর ফলে তারা যেমন নিজেদের জীবনকে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলে ধরতে সক্ষম হবে তেমনি মানুষও তাদের মুখ থেকে সুসমাচার শুনতে আগ্রহী হবে।

(৪) 'তোমরা পৃথিবীর লবণ'– এই কথার দ্বারা খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের সুসমাচার প্রচার করতে গিয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার ছবিটি তুলে ধরেছেন। লবণ যেভাবে মাংসের ভাঁজে ভাঁজে পৌঁছে গিয়ে তাকে স্বাদযুক্ত করে, সেভাবে শিষ্যরাও কেবল যিরূশালেমে গণ্ডিবদ্ধ না থেকে সুসমাচার প্রচারের লক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন কোণে ছড়িয়ে পড়বেন। ব্যাপারটা অনেকটাই ওপর থেকে শস্যকণার পতনে বিক্ষিপ্ত অবস্থান খুঁজে নেওয়ার মতো। পুরাতন নিয়মে আমরা লেবীয়দের বিক্ষিপ্তভাবে ইস্রায়েলের বিভিন্ন স্থানে বাস করতে দেখি; স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে অন্যদের কাছ থেকে তাদের সহজেই আলাদা করা যেত। এ সম্পর্কে কারও কারও পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, 'আমাদের সামনে অন্যদের লবণের মতো কার্যকর সেবাকারী হিসেবে সবার গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠাটা মেনে নেওয়া যায় না; কারণ আমাদেরই এক্ষেত্রে সবার আগে নিজেদেরকে দৃষ্টান্ত হিসেবে সবার কাছে তুলে ধরা প্রয়োজন। অবিশ্বাসীগণ আমাদের চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠলে তা তো আমাদের জন্য লজ্জাই বয়ে আনে।'

২. আমাদের মাঝ থেকে যদি প্রত্যাশিত ফল না দেখা যায়; যদি আমরা স্বাদহীন লবণের ন্যায় আত্মিক জীবনকে কলুষিত করে ফেলি তবে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের জন্য দুঃখজনক পরিণতি অপেক্ষা করে আছে। তাই, স্বাদহীন লবণের ন্যায় ফলহীন জীবনও অকার্যকর, বাতিল এবং ধ্বংসের উপযোগী হয়।

(১) লবণের স্বাদ যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে তা আর নোনতা করা যায় না; তখন তা কোন কাজেও লাগে না। যে লবণ মাংসকে স্বাদযুক্ত করে সেই লবণ তার স্বকীয়তা হারালে তা আর পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় না। খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার ফলে একজন ব্যক্তি সেই লবণে পরিণত হয় যা অন্যদের স্বাদযুক্ত করতে সাহায্য করে; কিন্তু সেই ব্যক্তিটি যদি

নিজের জীবনে পবিত্র আত্মার ফল দেখাতে টানা ব্যর্থ হয় এবং আত্মিক জীবনকে নষ্ট করে ফেলে তবে তার সেই জীবনকে আর কোনভাবেই পূর্বের অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যায় না; খ্রীষ্টের কাছে এসেও যদি সে নিজেকে বদলাতে না পারে, তবে অন্য কোথাও গিয়েও সে নিজেকে বদলাতে পারবে না।

(২) সেই ব্যর্থ, ফলহীন জীবন তখন বাতিল বলে পরিগণিত হয়– যা আর কোন কিছুকেই স্বাদযুক্ত করতে পারে না। যে খারাপ ছাড়া ভাল কিছু আর উপহার দিতে পারে না তাকে তো বোঝা হিসেবেই গণ্য করা উচিত; মনুষ্যত্ব না থাকলে কাউকে যেমন মানুষ বলে গণ্য করা যায় না তেমনি খ্রীষ্টের আদর্শ কারও মাঝে অনুপস্থিত থাকলে তাকে খ্রীষ্টীয় বলা যায় না। লক্ষ্য করুন, একজন পাপী এই পৃথিবীর বোঝা; তেমনি আদর্শহীন খ্রীষ্টীয় মানুষের কাছে বোঝা হিসেবে আবির্ভূত হয়; পাশাপাশি আদর্শহীন প্রচারক আবার খ্রীষ্টানদের জন্যই সাক্ষাৎ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। (৩) আদর্শহীন-ফলহীন সেই ব্যক্তিকে তখন বাতিল বলে গণ্য করে ছুঁড়ে ফেলা হয়। নিশ্চিতভাবেই তাকে মণ্ডলী থেকে, বিশ্বাসীদের সমাজ থেকে বহিষ্কার করা হবে; কারণ সে তাদের জন্য বোঝারূপ হয়ে পড়ে। মানুষের কাছ থেকে সে ধিকৃত হবে– 'তা কেবল লোকের পায়ে মাড়াবার উপযুক্ত হয়'। এরকম মৃত বিশ্বাসী তার জীবন দ্বারা যিনি তাকে আহ্বান করেছিলেন সেই ঈশ্বরকেই অগৌরবান্বিত করে। ফলে এটা তো নিশ্চিত যে, ঈশ্বর তার প্রতি কত না অসন্তুষ্ট হবেন এবং তার ওপর থেকে নিজের অনুগ্রহ তুলে নেবেন।

খ. 'তোমরা পৃথিবীর আলো' (১৪ পদ)। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের এখানে আলোর সাথে তুলনা করলেন। আগেরটির মতোই এই 'আলো' অভিধাটি খুবই প্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে (আলো এবং লবণের চেয়ে প্রয়োজন তুল্য বস্তু আর নেই); এবং খ্রীষ্টের শিষ্যদের জন্য এই অভিধাটি অনেক গৌরবের। খ্রীষ্টানদের প্রত্যেকেই পৃথিবীর জন্য আলোস্বরূপ (ইফিষীয় ৫:৮) এবং তারা আলো হিসবেই লোকদের সামনে আবির্ভূত হয় (ফিলিপীয় ২:১৫); যারা প্রচার করেন তাদের জন্য ব্যাপারটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। খ্রীষ্ট যেখানে নিজেই নিজেকে পৃথিবীর আলো হিসেবে দাবি করেছেন (যোহন ৮:১২), সেখানে তাঁর শিষ্যদের মাঝেও তাঁর বৈশিষ্ট্য, সম্মানের প্রতিফলন ঘটবে– তা তো অনুমিতই। সত্যিকার অর্থেই আলো সুন্দর; তা জীবনের প্রতীকরূপে চিহ্নিত করা যায়; ভোরের আলো যেমন অন্ধকারের সমস্ত বিভ্রম কাটিয়ে পৃথিবীতে জীবনের সূচনা করে, তেমনি খ্রীষ্টের সুসমাচারও শয়তানের সমস্ত অন্ধ-চাতুরিকে দূরীভূত করার মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষকে সত্যিকারের জীবন দান করে। অন্ধকারে নিমজ্জিত পৃথিবীকে আলোতে উদ্ভাসিত করতে খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের মনোনয়ন দিলেন যেন তারা তাঁরই আলোতে সমুজ্জ্বল হয়ে অন্যদের আলোকিত করতে পারে।

'আলো' হিসেবে খ্রীষ্টের শিষ্যরা কীভাবে পৃথিবীর অন্ধকার দূর করতে পারে সে বিষয়ে এখানে দু'টি দিক নিয়ে আলোচনা করা হল:

১. পৃথিবীর আলো হিসেবে তারা প্রথমে নিজেদের আলোকিত করবে; কারণ তাদের দিকে অনেক কৌতূহলী-ছিদ্রান্বেষী চোখ তাকিয়ে থাকবে। পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত শহরকে যেভাবে দৃষ্টির আড়াল করা যায় না, ঠিক তেমনি খ্রীষ্টের শিষ্যরা যদি সত্যিকারের আলো হিসেবে নিজেদের মেলে ধরতে পারে তবে তা কেউ অগ্রাহ্য করতে পারবে না। লোকদের জন্য তারা চিহ্নস্বরূপ হবে (যিশাইয় ৭:১৮); এবং লোকেরা তাদের দেখে

বিস্মিত হবে (সখরিয় ৩:৮); তাদের ওপর চারপাশের মানুষজনের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে। এদের মাঝ থেকে কেউ কেউ তাদের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে বিস্ময় নিয়ে তাকাবে, তাদের নিয়ে আনন্দে মেতে উঠবে, তাদের মতো হবার জন্য সংকল্পবদ্ধ হবে; আবার অনেকে তাদের খুঁত ধরার জন্য তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ পর্যবেক্ষণ করবে, তাদের ঘৃণা করবে এবং তাদের চরিত্রে কালিমা লেপনের চেষ্টা চালাবে। সে কারণেই তাদেরকে সতর্ক পদক্ষেপ ফেলতে হবে; যেহেতু অনেকেগুলো কৌতূহলী চোখ তাদের লক্ষ্য করছে। পৃথিবীতে তারা হবে আতশকাচের মতো; যার আয়নায় সবাই যার যার ভুলগুলো চাক্ষুষ করতে পারবে; কারণ খ্রীষ্টের শিষ্যদের জীবন হবে দৃষ্টান্তযোগ্য; খ্রীষ্ট আহ্বান করার পূর্বে শিষ্যদের চরিত্র লোকদের কাছে অতটা বোধগম্য হয়ে ধরা দেয়নি, যেমনটা এখন খ্রীষ্টের কাছ থেকে সুসমাচার প্রচারের দায়িত্ব পাবার পর আলো হিসেবে নিজেদের অন্যদের সামনে মেলে ধরার প্রয়াস পেয়েছে। এই দায়িত্বের কারণেই তারা তাদের আলোকিত জীবন প্রদর্শনের মাধ্যমে লোকদের কাছে সমাদৃত হয়ে খ্রীষ্টের সাথে বসে ইস্রায়েলের বারো গোষ্ঠীর বিচার করতে অগ্রসর হতে পেরেছে (লূক ২২:৩০); খ্রীষ্টকে যারা তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেয় তিনিও তাদের উপযুক্ত সম্মান দানে ধন্য করেন।

২. 'আলো' হিসেবে তারা অন্যদেরও আলোকিত করবে (৫:১৫)। আর তাই

(১) তারা লোকদের সামনে আলো হিসেবে জ্বলবে। খ্রীষ্ট তাঁর আলোতে শিষ্যদের আলোকিত করেছেন; ঝুড়ির নিচে যেমন আলো লুকানো থাকে না তেমনি শিষ্যদের সেই আলোও অবশ্যই লোকদের সামনে প্রজ্জ্বলিত হবে। এখন যেমন তারা গালীলের বিভিন্ন শহরের জন্য আলোকবর্তীকা হয়ে জ্বলছে তেমনি পরে তাদেরকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে 'আলো' হিসেবে জ্বলার জন্য পাঠানো হবে। মণ্ডলী হচ্ছে গুচ্ছ গুচ্ছ আলোর আধার; যার অংশ হিসেবে শিষ্যরা দিকে দিকে তাদের আলো ছড়িয়ে দিতে বদ্ধ পরিকর। শিষ্যদের আলোর প্রকোপ কখনো যদি কমে আসে তখন মণ্ডলী থেকে উৎসারিত সুসমাচারের বাণী তাদের পূর্বাবস্থায় নিয়ে যায়। কারণ সুসমাচার হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী আলো। পাহাড়ের ওপর স্থাপিত শহর যেভাবে সবার দৃষ্টিগোচর হয় তেমনি সুসমাচারের আলোও সবার কাছে প্রজ্জ্বলিত হয়; এমনকি যারা 'দেখব না' বলে চোখ বন্ধ করে রেখেছে তাদের কাছেও। কিন্তু যারা এর কাছে এসে নিজেদের আলোকিত করতে উদ্যোগী হয় তারাও পরিণত হয় এক একটি আলোতে। অপরদিকে যারা এই আলো দেখেও তা থেকে নিজেদের বিরত রাখে তারা কখনো আলোকিত জীবনের স্বাদ পেতে সক্ষম হয় না; এবং তারা তাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনের জন্য কাউকে দায়ীও করতে পারে না; কারণ তারা আলো দেখতে পেয়েও দেখেনি; উদ্যোগী হয়নি নিজেকে আলোতে রাঙাতে।

(২) খ্রীষ্টের শিষ্যরা অন্যদের আলোকিত করবে, (ক) তাদের চমৎকার প্রচারের মাধ্যমে। যে জ্ঞান ঈশ্বর তাদের দিয়েছেন তা অন্যদের কাছে সুসমাচারের নিগূঢ় অর্থ তুলে ধরার জন্য সহায়ক; তারা কখনো তা নিজের মধ্যে চেপে রাখবে না; বরং ছড়িয়ে দেবে সর্বত্র। প্রকৃত প্রতিভা যেভাবে শত প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে উঠে আসে, সেভাবে শিষ্যরাও যে বর পেয়েছে তার প্রকাশ ঘটাতে অবশ্যই সচেষ্ট হবে। অবশ্য 'ভাল প্রচারকারী' হিসেবে প্রশংসাবাণে উচ্ছ্বসিত হবার চেয়ে কতজনকে প্রভুর রাজ্যে নিয়ে আসা গেল সেই সমীকরণ মেলানোতেই তাদের বেশি ব্যস্ত থাকা প্রয়োজন। কারণ যে তালন্ত তারা পেয়েছে তার উপযুক্ত ব্যবহার তাদের করা উচিত (লূক ১২:৩)। (খ) তাদের ভাল জীবন দেখিয়ে।

তাদের আলো লোকদের সামনে জ্বলতে হবে (যোহন ৫:৩৫); তাদের সমস্ত কাজে যেন এটাই প্রকাশ পায় যে, তারা খ্রীষ্টের অনুসারী (যাকোব ৩:১৩); তারা অন্যদের নিখুঁত জীবন যাপনে উৎসাহ, নির্দেশনা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবে (ইয়োব ২৯:১১)।

লক্ষ্য করুন, প্রথমত, কীভাবে আমাদের মাঝ থেকে আলো বিচ্ছুরিত হবে– ভাল কাজের মাধ্যমে; যেন মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, এরা সত্যিকার অর্থেই খ্রীষ্টের অনুসারী; লোকেরা আমাদের জীবন দেখে যেন ভাল রিপোর্ট পায়; আর তা করতে পারলে তারা নিশ্চিতভাবেই নিজেদের বিভ্রান্ত অবস্থানের বিপরীতে ভ্রান্তহীন খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস সম্পর্কে চিন্তা করার প্রয়াস পাবে। আমাদের নিজেদের জীবনকে অন্যদের কাছে এএভাবে দৃষ্টান্তযোগ্য করে তুলতে হবে যেন তারা খ্রীষ্টকে চর্চা করতে অনুপ্রাণিত হয়। নিজেদের ভুল, অসদাচরণের জন্য আমাদের ঈশ্বরের কাছে নীরবে প্রার্থনায় নিবিষ্ট হতে হবে। তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে হবে যেন আমরা কখনো ভুল করে না বসি; বরং 'আলো' দরকারি সব গুণ দিয়ে যেন নিজেদের সাজাই (ফিলিপীয় ৪:৮); কারণ অনেকেই আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখছে। যারা আমাদের কাছ থেকে সুসমাচার শুনে আমাদের জীবনকে পর্যবেক্ষণ করছে তারা যেন খ্রীষ্টের কাছে আসতে উদ্বুদ্ধ হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। আর সৎ জীবনে চলবার জন্য ঈশ্বরের পরিচালনায় অগ্রসর হওয়ার বিকল্প নেই।

দ্বিতীয়ত, আমাদের মাঝে প্রজ্জ্বলিত আলো ঈশ্বরকেই গৌরবান্বিত করবে– 'যারা তোমাদের ভাল কাজ দেখবে তারা তোমাদের স্বর্গীয় পিতার গৌরব করবে' (এক্ষেত্রে ফরীশীদের আমরা আশ্চর্য ও ব্যতিক্রম হিসেবে দেখি; তারা নিজেদের গৌরবান্বিত করার দিকেই লালায়িত থাকত)। মনে রাখুন, আমাদের কাজের প্রশংসা বা গৌরবের ভাগী আমরা নই, কেবল ঈশ্বরকেই সেই গৌরব দিতে হবে (১ পিতর ৪:১১)। এখানেই আমাদের সমস্ত কাজের প্রাপ্তি এক সীমারেখায় এসে পৌঁছে; শুধু নিজেরা ভাল জীবন যাপন করে ঈশ্বরকে গৌরব দান করলে চলবে না; উপরন্তু অন্যদের ঈশ্বরের কাছে নিয়ে এসে তাদের মধ্য দিয়েও ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমাদের ভাল কাজগুলোই হতে পারে অনন্য সমাধান, ১. স্বর্গীয় পিতার গৌরব। 'তাই লোকদের সামনে নিজেদের ভাল জীবন দেখাও যেন তারা তোমাদের মাঝে ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপস্থিতি অবলোকন করে তাঁর গৌরব করতে পারে'। ২. প্রণোদনা লাভ। 'নিজেদের আদর্শ জীবনকে অন্যদের কাছে তুলে ধর যেন তারা খ্রীষ্টীয় ধর্মের সত্যতা ও আবশ্যকতার বিষয় বুঝতে ও তা গ্রহণ করতে সম্মত হয়; তাদের মাঝে যেন এই বোধোদয় হয় যে তোমাদের ভাল কাজের পেছনে অনুপ্রেরণাদায়ী পবিত্র শক্তি ও উদ্দেশ্য কাজ করছে; সর্বোপরি তারা যেন স্বর্গীয় পিতাকে ধন্যবাদ দিতে পারে যে তিনি তাদের সামনে তোমাদের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।'

মনে রাখুন, যারা ঈশ্বরের বিষয়ে জানতে উদাসীন, তাদের জন্য খ্রীষ্টের শিষ্যদের জীবনই সুসমাচার প্রচারে শ্রেষ্ঠ কথপোকথন বলে বিবেচিত হয়। কারণ এ বিষয়ের গভীরে পৌঁছাতে হাজারো তত্ত্বকথা, টকশোর চাইতে একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণই যথেষ্ট। খ্রীষ্টের শিষ্যদের দেখে শাস্তির অধীনে থাকাদের অনেকেই হয়তো প্রণোদনা লাভ করে খ্রীষ্টের মহব্বতে সিক্ত হতে চাইবে। তাহলেই সমস্ত প্রচার, আলোরূপ জীবন সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়ে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করতে সক্ষম হবে।

মথি ৫:১৭-২০ পদ

খ্রীষ্ট তাঁর সহাবীদের শিক্ষা ও নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে পুরাতন নিয়ম ও ব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীলদের উদ্দেশ্যে এই বার্তা পৌঁছে দিলেন যে, তারা ঠিক পথেই আছেন; কারণ খ্রীষ্টের প্রচার শুনে অনেকের মনে এই ভাবনা খেলা করছিল, তাহলে কি ব্যবস্থা বাতিল হয়ে গেল? খ্রীষ্ট স্বভাবতই তাদের এই দোলাচলকে সুস্থিরতা দিতে গিয়ে জানালেন যে তাঁর আসবার ফলে পুরাতন নিয়মের গুরুত্ব এতটুকু কমে যায় না। কিন্তু পাশাপাশি তিনি এর চর্চার জায়গাটির দিকে ইঙ্গিত করে ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকদের ভণ্ডামির ওপর তীর্যক দৃষ্টি হানলেন; তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, তারা ঠিক পথে নেই; ব্যবস্থাকে তারা ব্যবহার করছে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য।

ক. খ্রীষ্ট যে নতুন নিয়ম প্রতিষ্ঠা করতে এসেছিলেন তা পুরাতন নিয়মের (পঞ্চপুস্তক ও ভাববাদীদের পুস্তক) সাথে ছিল সঙ্গতিপূর্ণ। ভাববাদীরা ছিলেন ব্যবস্থার ভাষ্যকার এবং খ্রীষ্ট– যিনি উভয়ের পূর্ণতা দিতে এসেছিলেন– তিনি সেগুলোকে বিশ্বাস ও কাজের মাধ্যমে গাঁথলেন; জোর দিলেন অন্তর্নিহিত শিক্ষার বিষয়ে।

১. তিনি তাঁর আগমনে পুরাতন নিয়ম বাতিল বা দুর্বল হয়ে পড়ার শঙ্কাকে খারিজ করে দিলেন, 'এই কথা মনে কোরো না যে, আমি পঞ্চপুস্তক ও ভাববাদীদের শাস্ত্র বাতিল করতে এসেছি'।

(১) 'ধর্মভীরু যিহূদীরা, তোমাদের পবিত্র শাস্ত্র ও ব্যবস্থা আমি বাতিল করে দিচ্ছি– একথা ভাবার কোন কারণ নেই।' যিহূদীরা তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ও ব্যবস্থা নিয়ে গর্বিত ছিল; যদিও সেগুলোর চর্চার জায়গাটায় তাদের সেই ভালবাসার প্রকাশ দেখা যায় নি; ধর্মভীরু হিসেবে তারা পবিত্র পুস্তককে বাহ্যিক সম্মান দানের চেষ্টায় স্বতঃপ্রবৃত্ত ছিল; কারণ, তারা একে ঈশ্বরের বাক্য এবং এর মধ্য দিয়ে তাঁর পবিত্রতা ও ক্ষমতার স্বরূপ দেখা যায় বলে বিশ্বাস। তাই খ্রীষ্ট যখন তাঁর মতবাদ প্রচার করছিলেন তখন লোকদের মনে এই ধারণাটা আসা খুবই স্বাভাবিক ছিল যে, তিনি বুঝি আগের পুস্তকগুলো বাতিল করে দেবেন। খ্রীষ্ট তাদের সেই অমূলক ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে যেন এই কথাই বলতে চাইলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ব্যবস্থার ভার বহন করতে পারছো না; যারা এর প্রতি কোন আকর্ষণ বোধ কর না; তাদেরকেও বলছি, আমি মোশি ও ভাববাদীদের শাস্ত্র বাতিল করতে আসি নি'। 'তোমরা যারা পৃথিবীর ভোগবাদী জীবনকে বেছে নিয়েছ, লালসা-কামনায় নিজেদের অতিমাত্রায় আসক্ত করে রেখেছ, তারা এই কথা ভেব না যে, আমার আগমনে তোমরা স্বর্গীয় নির্দেশ ও এর আনুগত্য থেকে মুক্তি পেয়ে গেছ; আর আমি তোমাদের স্বর্গীয় অনুগ্রহ ও প্রশান্তি দান করব– তোমরা ইচ্ছামতো যা খুশি তাই করতে পারবে। কিন্তু এই কথা শুনে রাখ, খ্রীষ্ট ব্যবস্থার কোন নিয়মকে পাল্টাতে কিংবা বাতিল করে দিতে আসেন নি। কেউ যদি তা ভেবে থাক তবে তা হবে বিরাট ভুল। কারণ ঈশ্বর তাঁর ভাববাদীদের মাধ্যমে তোমাদের যা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন মনুষ্যপুত্র তার একটিরও অবাধ্য হতে কাউকে উৎসাহিত করেন না; বরং তিনি তোমাদের সংশোধনের পথে নিয়ে আসেন।' আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রীষ্ট ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা কোন কিছুই বাতিল করতে আসেন নি, তিনি এসেছিলেন শয়তানের সমস্ত কর্মকাণ্ডকে ধ্বংস করতে। খ্রীষ্ট মোশি ও ভাববাদীদের শাস্ত্র বাতিল করতে আসেননি বরং তার পূর্ণতা দিতেই এসেছিলেন।

এবারে আমরা দেখব কীভাবে তিনি তা পূর্ণ করেন–

(ক) ব্যবস্থার প্রতি বাধ্যতায়; খ্রীষ্ট নিজেও ব্যবস্থার অধীনে জীবন কাটিয়েছিলেন (গালা ৪:৪)। তিনি ব্যবস্থার বিভিন্ন নিয়ম-কানুনের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছিলেন; পিতামাতাকে সম্মান করা, নিয়মিত উপাসনায় যোগদান, ধর্মীয় পর্বে অংশগ্রহণ, পবিত্র জীবন-যাপনসহ ব্যবস্থার একটি নিয়মের প্রতিও তিনি অবহেলা, অবাধ্যতা প্রদর্শন করেন নি; বরং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এর সবগুলোই মেনে চলেছিলেন যেন কেউ তাঁর ধার্মিকতার বিষয়ে প্রশ্ন তুলতে না পারে।

(খ) ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রতিজ্ঞা পালনে; খ্রীষ্টের বিষয়ে ভাববাদীদের করা সমস্ত প্রতিজ্ঞাকে তিনি বাস্তবায়িত করেছিলেন; একটারও অন্যথা হতে দেননি। এর ফলে তাঁর জীবনই তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে মধ্যস্থকারী হিসেবে তিনি তাঁর জীবন দিয়ে ঈশ্বরের সমস্ত প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়ন করেছিলেন; যে প্রতিজ্ঞার কথা ঈশ্বর তাঁর ভাববাদীদের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। খ্রীষ্ট প্রতিজ্ঞার বাস্তবায়নেও চমৎকার মধ্যস্থতা করেছিলেন।

(গ) ব্যবস্থার সঠিক রূপরেখা নির্ধারণের মাধ্যমে; এভাবে (বিশপ টিলটসনের ভাষায়) তিনি ব্যবস্থার একটারও অবাধ্য হন নি; বরং বাধ্য থেকে ভাল কাজ করার মাধ্যমে সবার, এমনকি ব্যবস্থার সামনেও নিজেকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন।

(ঘ) ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাকে দূর করে তাকে পূর্ণাঙ্গতা দেবার মাধ্যমে; খ্রীষ্ট ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও নির্দেশনায় পূর্ণ করে তুললেন, যেন এর ফলে তা সম্পন্ন হয়ে ওঠে। একটা উদাহরণের মাধ্যমে আমরা ব্যাপারটা আরো পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারব; ধরা যাক একটি বালতির কিছু অংশ পানিশূন্য হয়ে আছে; খ্রীষ্ট এসেছিলেন আরও জল দিয়ে সেই বালতিটি পূর্ণ করে তুলতে; কিংবা একটা অসম্পূর্ণ ছবি– যা শেষ করতে শিল্পীর আরও মনোযোগ ও তুলির পোচ দেওয়া প্রয়োজন, খ্রীষ্ট সেই অসম্পূর্ণ ছবিটিই রং-তুলির সঠিক বিন্যাসে সম্পন্ন করতে এসেছিলেন। তাই, একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, খ্রীষ্ট ব্যবস্থার ঘাটতিগুলোকে প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ দিয়ে পূর্ণাঙ্গতা দিতে ও তাকে উন্নত অবস্থায় নিয়ে যেতে এসেছিলেন।

(ঙ) ব্যবস্থার অবয়বকে অবিকৃত রাখার মাধ্যমে; খ্রীষ্টের অনুসারীরা বর্তমানে তাঁর সংশোধিত ব্যবস্থাকেই মেনে চলছে; কিন্তু তা যিহূদীদের মতো করে নয়; কারণ তারা এখনও ব্যবস্থার বাহ্যিক দিকটিকেই গুরুত্ব দিয়ে চলেছে; অপরদিকে খ্রীষ্টের অনুসারীরা তাঁর সংশোধিত ব্যবস্থায় জীবনে তার প্রয়োগের দিকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে; কারণ এখন সময় সংশোধনের, ঈশ্বরের অনুগ্রহের (ইব্রীয় ৯:১০)।

২. খ্রীষ্ট এখানে পঞ্চপুস্তক ও ভাববাদীদের শাস্ত্রের স্থায়িত্বের বিষয়টি জোরের সাথে উচ্চারণ করে বলেছেন যে, তার একটিও মুছে যাবে না (১৮ পদ); 'আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আসমান ও জমির শেষ না হওয়া পর্যন্ত যতদিন না পঞ্চপুস্তক শাস্ত্রের সমস্ত কথা সফল হয় ততদিন তা পূর্ণ অবয়বে সমুন্নত থাকবে; একবিন্দুও মুছে যাবে না'। তাঁর একথা থেকেই এটা পরিষ্কার যে, পঞ্চপুস্তক ও ভাববাদীদের শাস্ত্রের প্রতিটি অংশই স্বমহিমায় অক্ষুণ্ন-অবিকৃত থাকবে; কারণ এতে ঈশ্বরের ক্ষমতা ও আশীর্বাদে পূর্ণ কাজের বিষয়ে বলা হয়েছে। ঈশ্বর এসব শাস্ত্রের মাধ্যমে মানুষের কাছে সঞ্জীবনী বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন। পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার আগ পর্যন্ত যতদিন না এর প্রতিটি কথা পূর্ণ হয়,

ততদিন পর্যন্ত তা সমুন্নত অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করবে; কারণ 'ঈশ্বরের বাক্য চিরকাল টিকে থাকে'– সুসমাচার এবং ব্যবস্থা উভয়েই। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের ব্যবস্থার মাঝে যেগুলোকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয় সেগুলোকে রক্ষার ব্যাপারেও ঈশ্বর সমানভাবে মনোযোগী। ঈশ্বর চান না যে, কেউ তাঁর ব্যবস্থার একটিকেও অবহেলা করে। ঈশ্বরের কথা মেনে না চলে মানুষ যেসব নিয়মকানুনের প্রতি বেশি শ্রদ্ধা দেখিয়ে থাকে তা অনেক সমস্যায় জর্জরিত; অসম্পূর্ণ। এবং তা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়। ঈশ্বরের কাছে বড় ব্যবস্থা, ছোট ব্যবস্থা বলে কিছু নেই। কেউ গৌণতা-মুখ্যতার বিচারে এগুলোর একটিকেও অবহেলা-অবজ্ঞা করলে ঈশ্বর তা ভালভাবে নেন না।

৩. খ্রীষ্ট এখানে তাঁর শিষ্যদের ঈশ্বরের আদেশের প্রতি যত্নবান হতে নির্দেশনা দিয়েছেন; সেই সাথে যারা এর বিরুদ্ধে যাবে তাদের কী দশা হবে সেটাও উল্লেখ করেছেন (১৯ পদ)। 'মোশির ব্যবস্থার মধ্যে ছোট একটা আদেশও যে কেউ অমান্য করে এবং লোকদের তা অমান্য করতে শিক্ষা দেয়, তাকে স্বর্গ-রাজ্যে সবচেয়ে ছোট বলে গণ্য করা হবে।' খ্রীষ্ট তাঁর কথার দ্বারা ফরীশীরা যে নিজেদের মতো করে ঈশ্বরের ব্যবস্থার ব্যাখ্যা দেয় এবং তার মাঝে বৈষম্য তৈরি করে 'বড়'-'ছোট' হিসেবে উপস্থাপন করে, সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ফরীশীরা খ্রীষ্টের রাজ্যের শিক্ষক হিসেবে শিক্ষাদানের সুযোগ পাবে না; যেটা খ্রীষ্টের শিষ্যরা পেয়েছে; এই ফরীশীরা ব্যবস্থার অপব্যাখ্যা করার মাধ্যমে লোকদের ব্যবস্থা পালনের শিক্ষা দিত। ফলে বিচারের দিনে তারা তাদের নিজেদের ভণ্ডামির জন্য কাঁদবে। কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের ব্যবস্থা সঠিকভাবে মেনে চলতে এবং সেইমতো অন্যদের শিক্ষা দিতে বলেছেন। যেন তাদের স্বর্গ-রাজ্যে সবচেয়ে মহান হিসেবে গণ্য করা যায়। মনে রাখুন,

(১) ঈশ্বরের ব্যবস্থার মাঝে বড়-ছোট বলে কিছু নেই। যদিও যিহূদীরা ঈশ্বরের আদেশের তুলনা করতে গিয়ে 'পাখির বাসা' সম্পর্কিত ব্যবস্থাটিকে ক্ষুদ্র বলে মনে করতো (দ্বিতীয় বিবরণ ২২:৬,৭)। এভাবে তারা ব্যবস্থাকে মুখ্য ও গৌণ বলে বিচার করতো; এমনকি তাতে কোন মহৎ উদ্দেশ্য, চিহ্ন উপস্থিত থাকলেও।

(২) ঈশ্বরের আদেশকে ভাগ করাটা সবসময়ই বিপজ্জনক। তার ওপর তাতে 'মহৎ' কিংবা 'ক্ষুদ্র'– এর লেবেল সাঁটিয়ে দেওয়াটা তো আরও ভয়াবহ অপরাধ। কারণ তা করতে গিয়ে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতার বাঁধন আলগা হয়ে যায়; ফলে মনোস্তাত্ত্বিকভাবেই একপর্যায়ে দশ আদেশকেও অবজ্ঞা করার ঔদ্ধত্য চলে আসে। আর যারা তা করবে তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে ক্রোধ কিনবে; তিনি তাদের প্রতিটি আচরণ মনে রাখবেন। কারণ স্পষ্টতই তারা তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করেছে (গীত ৬৯:১২৬)।

(৩) ফরীশীরা সে সময় কেবল নিজেরাই ব্যবস্থা লঙ্ঘন করতো না উপরন্তু তা করার জন্য অন্যদেরও আদেশ দিত। এটা তো আরও বড় অপরাধ! খ্রীষ্ট সেদিকেই ইঙ্গিত করেছিলেন যেন ফরীশীরা চেতনা পায়। ধর্মীয় বিষয়ে মতামত দানের সুযোগ পেয়ে তার অপব্যবহার করা অর্থাৎ ভ্রান্ত মতবাদ শিক্ষা দেওয়া, শাস্ত্রের পদের ভুল অর্থ করা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে জঘন্য কাজ বলে গণ্য হয়। তার ওপর কেউ যদি তা মেনে চলতে অন্যদেরও শিক্ষা দেয়, প্ররোচিত করে, সেটা যে তাঁর কাছে আরও বড় অপরাধ বলে স্বীকৃত হবে– এ তো জানা কথাই। খ্রীষ্ট ঠিকই বলেছেন 'তাকে স্বর্গ-রাজ্যে সবচেয়ে ছোট বলে ধরা হবে'। শুধু তাই নয় সে ঈশ্বরের গৌরব দেখতে পাবে না। অনন্তকালের জন্য সে ঈশ্বরের গৌরবের

ভাগী হওয়ার সুযোগ হারাবে। এমনকি এই পৃথিবীতেও খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে তাকে একই পরিণতি বরণ করতে হবে। শিক্ষক হিসেবে তার যে সম্মান পাবার কথা ছিল সেই সম্মান সে পাবে না। স্বর্গ-রাজ্যের 'লেজ' হয়ে থাকাটাই তাদের ভবিতব্য বলে নির্ধারিত হবে। যেদিন সত্য যাথাযথ প্রমাণসহ স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হবে সেদিন ফরীশীদের মতো ভ্রান্ত শিক্ষকেরা কাঁদবে, কারণ তাদের দেওয়া ভ্রান্ত শিক্ষাসমূহই তাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে। ভাল কিছুই তাদের স্বর্গীয় অ্যাকাউন্টে জমা হবে না; প্রচারকদের জন্য ঈশ্বরের আদেশ সম্পর্কে ভুল শিক্ষা দেওয়ার মতো জঘন্য কাজ আর কিছুই হতে পারে না (মালাখি ২:৮,১১)।

সমাজ-ঘরে যারা ভ্রান্ত শিক্ষা দিয়ে লোকদের ঈশ্বরের আদেশের বাইরে যেতে, পাপ করতে, ধর্মীয় অনুশাসনকে কঠোরভাবে মেনে চলতে এবং উপাসনায় নিরুৎসাহী হতে প্ররোচিত করে, তারা উপাসনা গৃহের জন্য বিষফোঁড়ার মতো। অন্যদিকে যারা ঈশ্বরের বাক্যের সঠিক ব্যাখ্যা করে, লোকদের ধর্মীয় শৃঙ্খলা মেনে চলতে শিক্ষা দেয়, উপাসনায় মনোযোগী হতে উৎসাহ দেয়, তারা খ্রীষ্টের সমাজ-ঘরে বরণীয় ও সম্মানিত রূপে স্বীকৃত হবে। এর অবশ্য একটা অন্য চেহারাও আছে। দেখা গেল, কেউ শিক্ষক হিসেবে সঠিকভাবেই তার দায়িত্ব পালন করছে; অর্থাৎ লোকদের গঠনমূলক শিক্ষা দিচ্ছে, শাস্ত্রের সঠিক ব্যাখ্যা করছে, উপাসনায় অধিকতর আগ্রহী হতে উৎসাহিত করছে কিন্তু নিজের জীবনে তার প্রয়োগ দেখাচ্ছে না; ফলে তার কোন লাভ হচ্ছে না; সে ঈশ্বরের কাছ থেকে সম্মান-গৌরবের কিছুই আসা করতে পারবে না। স্বর্গ-রাজ্যে সবচেয়ে গুরুত্বের সাথে যাদের বরণ করে নেওয়া হবে, তারা যেমন সঠিক শিক্ষা দেবেন তেমনি নিজেদের জীবনেও তা প্রয়োগ করে দৃষ্টান্ত রাখতে সমর্থ হবেন। তারা হবেন জীবন্ত পুস্তক, যেহেতু তারা তাদের নিজেদের জীবনে সেই শিক্ষা প্রয়োগ করে তবেই তার অভিজ্ঞতা-ঋদ্ধ প্রকাশ ঘটান। ঈশ্বর তাদের অনেক বেশি সম্মান ও গৌরব দান করবেন (১ শমূয়েল ২:৩০)। আর তারা স্বর্গ-রাজ্যের জ্বলজ্বলে তারকা হিসেবে ভাস্বর হওয়ার সম্মান লাভে ধন্য হবেন।

খ. খ্রীষ্ট এখানে তাঁর শিষ্যদের পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, যদি ধর্ম-শিক্ষক ও ফরীশীদের চেয়ে তাদের ধার্মিকতা বেশি বলে প্রমাণিত না হয়, তবে তারা কোনোমতেই স্বর্গ-রাজ্যের প্রবেশাধিকার পাবে না (২০ পদ)। ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকদের বিষয়ে খ্রীষ্ট যা বলেছেন তাতে বিস্মিত হতে হয়; কারণ তারা উভয়ে মোশির ব্যবস্থার বিষয়ে শিক্ষাদানের সুযোগ পেয়েছিল (২৩:২)। যিহূদী ধর্মে তাদের অবস্থান ছিল অনেক সম্মানের। ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে তাদের ভুল ধরার কথা কেউ ভাবতেও পারতো না। ব্যবস্থার বিষয়ে তাদের কথাকে সবাই শিরোধার্য বলে সায় দিত। তাই খ্রীষ্টের একথা তাদের কাছে বিস্ময় হয়েই এসেছিল। কারণ খ্রীষ্ট এখানে স্বর্গ-রাজ্যের প্রবেশাধিকারের মানদণ্ড হিসেবে তাদের ধার্মিকতাকে নির্দিষ্ট করে দিয়ে বলেছিলেন যে, তাদের চেয়ে কারও ধার্মিকতা বেশি বলে প্রমাণিত না হলে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ বারণ। তাই, খ্রীষ্ট সে বিষয়ে বলার আগে উচ্চারণ করেছিলেন, 'আমি তোমাদের বলছি।' আর এভাবে বলার অধিকার একমাত্র তাঁরই ছিল। ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকরা সে সময় খ্রীষ্ট ও তাঁর বাণীর বিরুদ্ধবাদী, নির্যাতনকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। কারণ খ্রীষ্ট সবসময় অধিকারের সাথে শিক্ষা দিতেন; ফলে ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকদের ভণ্ডামি আরও বেশি করে ফুটে উঠতো। খ্রীষ্ট এখানে কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠে তাদের কথা উল্লেখ করেছিলেন। ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকরা ঈশ্বরের বাক্যের সঠিক শিক্ষা এড়িয়ে

নিজেদের তৈরি নিয়মকানুনের দিকে বেশি ঝুঁকে ছিল। হ্যাঁ, তারা প্রভুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ দিত, নিয়ম করে প্রার্থনা করতো, ধর্মীয় উৎসবগুলোতে তাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল; কিন্তু তাদের সেই কার্যক্রম ছিল কেবল মানুষের কাছ থেকে সম্মান পাবার জন্য; ফলে তারা লোক দেখানো ধার্মিকতায় বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল।

লোকেরা এমনও ভাবতো যে, দু'জন লোকও যদি স্বর্গ-রাজ্যে যায় তবে তাদের একজন নির্ঘাত ফরীশীই হবে। কিন্তু খ্রীষ্ট এখানে সমস্ত জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটালেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের প্রতি দৃঢ়ভাবে বললেন যে, তাদের ধার্মিকতা অবশ্যই ফরীশীদের চেয়ে বেশি হতে হবে। তাই, আমাদের ধার্মিকতা যেন সেই ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকদের চেয়ে বেশি উৎকৃষ্ট বলে পরিগণিত হয়, সেজন্য আমাদের সচেষ্ট, সচেতন থাকা উচিত। যেখানে তারা ঈশ্বরের আদেশকে 'খণ্ডিত' করেছিল সেখানে আমরা তার যথাযথ প্রয়োগ নিজেদের জীবনে দেখাব। ধার্মিকতার জন্য আমরা কোন পালকের প্রতি নির্ভর করব না; বরং ঈশ্বরকে আমাদের জীবনে কাজ করার জন্য আহ্বান জানাব। ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকরা ঈশ্বরের মূল শিক্ষার বাইরে ছিল, কিন্তু আমরা থাকব ভেতরে। তারা লোকদের প্রশংসা পেতে ইচ্ছুক ছিল কিন্তু আমরা ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্যতা পেতে আন্তরিক হব। আমরা অবশ্যই তাদের মতো নিজেদের ধার্মিকতায় ভরসা ও ধর্মচর্চার জন্য গর্ব বোধ করব না; বরং আমরা কেবল আমাদের প্রভুর ধার্মিকতার ওপর ভরসা করব এবং নিজেদের জীবনে তাঁর পরিচালনার হাত প্রসারিত করার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাব। এভাবে আমরা ধার্মিকতার বিচারে ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকদের অতিক্রম করে যেতে পারব।

মথি ৫:২১-২৬

খ্রীষ্ট তাঁর একটু আগের শিক্ষার মাধ্যমে সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন যে, নিজেদের ধার্মিকতার জন্য তারা ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকদের কাছে আর জিম্মী নয় বরং মোশির ব্যবস্থার অধীন। তিনি তাঁর জ্ঞানপূর্ণ শিক্ষার মাধ্যমে চর্চার ক্ষেত্রে ব্যবস্থার বিভিন্ন অসঙ্গতি তুলে ধরলেন এবং তার উপযুক্ত সমাধানও বলে দিলেন। তিনি নতুন কিছুই যোগ করলেন না; কেবল ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত প্রকৃত অর্থের দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কারণ ঈশ্বর যে উদ্দেশ্যে মানুষকে ব্যবস্থা দিয়েছিলেন সেই উদ্দেশ্য থেকে তারা অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। খ্রীষ্ট ঈশ্বরের আদেশগুলোর আত্মিক প্রকৃতি, ঔজ্জ্বল্য, ব্যাপকতা, কার্যকর দিক ফুটিয়ে তুলতে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করলেন। ফলে তা সবার কাছে আরও মূর্ত এবং কার্যকর রূপে দৃশ্যমান হল। তাঁর এই বিশ্লেষণ আমাদের ঈশ্বরের প্রতি আরও বাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়। খ্রীষ্ট এখানে ষষ্ঠ আদেশের আবশ্যক বিশ্লেষণ করেছেন।

ক. এখানে ২১ পদে ষষ্ঠ আদেশটিই বিবৃত হয়েছে– তোমরা শুনেছ, আগেকার লোকদের কাছে এই কথা বলা হয়েছে, 'নরহত্যা কোরো না'। যারা খ্রীষ্টের কাছে শিক্ষা শোনার জন্য সমবেত হয়েছিল তারা ব্যবস্থার এই আদেশ সম্পর্কে জানতো। আর আগেরকার লোক বলতে এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে যারা সাব্বাতের দিনে মোশির কাছ থেকে ব্যবস্থা শিক্ষা পেয়েছিল। মনে রাখুন, ঈশ্বরের ব্যবস্থা কোন অপঠিত উপন্যাস কিংবা অপরিচিত কোন গ্রন্থও নয়। কিন্তু তা দেওয়া হয়েছিল আগেকার লোকদের কাছে। তবে পৃথিবীর অন্যান্য ক্ষয়িষ্ণু বস্তুর মতো তা কখনো ক্ষয়ে যায় না; এর এমন কোন

সময়সীমা নেই যে, তা নির্ধারিত সময় পার হলে বাতিল বলে গণ্য হবে। পৃথিবীর তৈরি নিয়মকানুন পৃথিবীতে ঠিকভাবে জীবন ধারণের জন্য সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু ঈশ্বরের দেওয়া আদেশ স্বর্গীয় জীবন যাপনে সহায়ক। এখানে খুন করার বিষয়ে পরিষ্কার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তা প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ যেরকমই হোক না কেন; কাউকে হত্যা করা, কাউকে দিয়ে তা করানো এমনকি নিজেকে হত্যা করাও এখানে জঘন্য অপরাধ বলে অভিহিত করা হয়েছে। ঈশ্বরের আদেশ, ঈশ্বরের দেওয়া জীবন খুবই মূল্যবান এবং ঈশ্বর তাঁর নিয়ম দ্বারাই তাঁর দেওয়া প্রাণবায়ুতে সম্পন্ন মানুষকে রক্ষা করেন। নোহের কাছ থেকেও আমরা এ বিষয়ে শুনতে পাই (আদি ৯:৫, ৬)।

খ. ঈশ্বরের এই আদেশটিকেই যিহূদী শিক্ষকরা সম্পূর্ণ করেছিল এইভাবে, 'যে খুন করে সে বিচারের দায়ে পড়বে'। এতেই তাদের মনোবাসনা পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে যে, হয় খুনী ছোরার আঘাতে মৃত্যুবরণ করবে নয়তো কোনোমতে বিচার এড়িয়ে আশ্রয়-শহরে আত্মগোপন করবে। ফলে, ঈশ্বরের আদেশের সাথে নিজেদের কথা যোগ করার মাধ্যমে তারা খুনকেই উৎসাহিত করছে। যিহূদীদের বিচারসভা বসতো তাদের মূল শহর-দরজায়। সাধারণত তেইশজন বিচারক সেখানে বিচারকাজ পরিচালনা করতেন। তারা মামলার নথি-প্রমাণাদি পর্যবেক্ষণ করে তাদের রায় দিতেন। অর্থাৎ খুনী এখানে তাদের বিচারের অধীন বলে বিবৃত হয়েছে। বাহির থেকে সুন্দর মনে হলেও ঈশ্বরের আদেশের সাথে তাদের এই 'বিধান' মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। কারণ

১. প্রভুর এই আদেশটিকে তারা যথেষ্ট বলে মনে করেনি। তারা এর সাথে নিজেদের কথা যোগ করে পরোক্ষভাবে খুনকেই উৎসাহিত করেছিল। যে কারণে পৃথিবীর মানুষ এখনও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের বীভৎসতা প্রত্যক্ষ করছে। যিহূদী শিক্ষকদের আরও একটি মৌলিক ভুল ছিল যে তারা 'পাপের কাজ' চিহ্নিত করতেই বেশি আগ্রহী ছিল; যেটা 'পাপের কাজের বিষয়ে চিন্তা'– এর ক্ষেত্রে দেখা যায় না। এর দ্বারা তারা পাপের কথা ভাবাকে বৈধতা দিয়েছিল এবং পাপ করার দিকে অন্যদের প্ররোচিত করেছিল। তারা এই আদেশের কেবল জাগতিক অর্থই খুঁজেছিল কিন্তু সত্যিকারের আত্মিক অর্থ খোঁজায় আন্তরিক হয় নি। পৌল যখন ফরীশী ছিলেন তখন ঈশ্বরের আদেশের আত্মিক অর্থ খোঁজেন নি; কিন্তু পরবর্তীতে সেই তাকেই আমরা পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় অন্য যে কারও চেয়ে পুস্তকী শিক্ষায় আত্মিক অর্থ খোঁজার দিকে প্রণোদিত হতে দেখি (রোমীয় ৭:৭,১৪)।

২. যিহূদী আরও একটি মারাত্মক ভুল হচ্ছে তারা ঈশ্বরের আদেশকে রাজনীতি ও সাধারণ্যে নামিয়ে এনেছিল। এর ফলে মানুষের তৈরি বিচার ব্যবস্থা দ্বারা খুনীর মৃত্যুর সাথে সাথে তারা যেন ঈশ্বরের আদেশের সুগভীর জ্ঞানকেই মেরে ফেলতে উদ্যত হল।

গ. এরপর খ্রীষ্ট ঈশ্বরের এই আদেশের অসাধারণ এক ব্যাখ্যা প্রদান করলেন। ঈশ্বর যে উদ্দেশ্য থেকে মানুষের কাছে ষষ্ঠ আদেশটি দিয়েছিলেন তা থেকে মানুষ অনেক দূরে সরে গিয়ে নিজেদের ওপর রক্তপাত ডেকে এনেছে। মানবীয় স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্য থেকে মানুষের মতো করে তিনি একে সংকুচিত করলেন না বরং এর ব্যাপ্তিকে প্রসারিত করলেন। তাঁর ব্যাখ্যা থেকে একথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, যারা এই পৃথিবীয় তাদের কৃতকর্মের জন্য বিচারে আনীত হয়; তারা পরবর্তী জীবনেও বিচারের সামনে পড়বে।

১. খ্রীষ্ট তাঁর ব্যাখ্যায় বললেন, 'যে কেউ তার ভাইয়ের ওপর রাগ করে সে বিচারের দায়ে পড়বে' (২২ পদ); অর্থাৎ সে ষষ্ঠ আদেশ লঙ্ঘন করে। এখানে ভাই বলতে কাউকে

নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া হয়নি; তা যে কেউ হতে পারে; সে হতে পারে আমাদের অধস্তন, চাকর কিংবা শিশু; কারণ আমরা সবাই একই রক্তমাংসে সৃষ্ট। 'রাগ' মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি; এর জন্ম হতাশা থেকে। কিন্তু কারণহীন, অমূলক রাগ পাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যে রাগ অযৌক্তিক, যার উদ্দেশ্য ভাল নয় তা পাপেরই নামান্তর। আসুন দেখা যাক কোন্ কোন্ সময় রাগ পাপে পরিণত হয়:

(১) যখন আমরা নিজেদের ভুলের কারণে নিজেদের ওপর রাগ না করে অন্যদের ওপর রাগান্বিত হই। যখন আমরা গঠনমূলক কোন কারণ ছাড়াই শিশু কিংবা অধস্তনদের ওপর রাগ করি– যা কারও কোন সাহায্যে আসে না। এ ছাড়াও যখন আমরা কোন গুজব শুনে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি, অন্যদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করি; কিংবা কেউ আমাদের দোষ দেখিয়ে দিলে তার ওপর রাগান্বিত হই।

(২) যখন আমরা অযথাই কাউকে আমাদের রাগের লক্ষ্যবস্তু বানাই। আমরা সাধারণত নিজেদের কর্তৃত্ব প্রদর্শনের জন্য কিংবা অন্যদের বশ করার জন্য নিজেদের 'রাগী' প্রমাণে সচেষ্ট হই তখন তা অনেক সম্পর্কের, অনেক ধারণার ক্ষতি সাধন করে। যারা সবসময় অযৌক্তিক রাগের মাধ্যমে চারপাশের মানুষকে তটস্থ করে রাখে, তারা কারও কাছেই অনুকরণীয় হয়ে ওঠে না। এর ফলে আমাদের বিবেক অসাড় হয়ে পড়ে; ভেতরের অনুতাপ বোধ তখন আর কাজ করে না (২ করিন্থীয় ৭:১১)।

(৩) যখন রাগের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। কারণ মাত্রাহীন রাগের ফলে আমরা বোধবুদ্ধি হারিয়ে ফেলি এবং তখন কোন অনিষ্ট সাধন করতে না পারলে মন শান্তি পায় না। ঠিক সে কারণেই খ্রীষ্ট রাগ না করার প্রতি জোর দিয়েছেন। কারণ তা খুন করার দিকে প্রথম পদক্ষেপ। কয়িনের কথা মনে করে দেখুন, সে তার ভাইয়ের প্রতি রাগান্বিত হয়েই খুন করেছিল। মন কখন খুনের দিকে অগ্রসর হবে তা কেউ বলতে পারে না (১৫:১৯)।

২. খ্রীষ্ট এবারে রাগের দরুন মুখ থেকে বেরিয়ে আসা বাজে কথার বিষয়টিকে উদ্দেশ্য করে বললেন– যে কেউ তার ভাইকে বলে 'অপদার্থ' সে মহাসভার বিচারের দায়ে পড়বে এবং যে কেউ তার ভাইকে 'বিবেকহীন' বলে, সে নরকের আগুনে পুড়বে। রাগের ফলে আমাদের মুখ থেকে যদি এরকম বাজে কথা বেরিয়ে আসে তবে পাপ বলে গণ্য হয়। তবে যদি তা হয় গঠনমূলক কিংবা কাউকে চেতনা দেবার জন্য তবে তা পাপ নয়; যেমন যাকোব বলেছিলেন, 'হে অহঙ্কারী'; কিংবা পৌল যেমন বলেছিলেন, 'বোকা লোকেরা'; এ ছাড়া খ্রীষ্ট নিজেও 'অবিশ্বাসী ও দুষ্ট লোকেরা' বলে সম্বোধন করেছিলেন। কিন্তু যদি তা রাগের কারণে মুখ থেকে বেরিয়ে আসে তবে তা চারপাশের সবকিছুকে নরকের আগুনের মতো জ্বালিয়ে দেয়।

(১) কাউকে 'অপদার্থ' বলার মাধ্যমে তাকে তো অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়ই, তার সাথে নিজেকেও 'জ্ঞানী' বলে জাহিরের চেষ্টা চলে। শলোমন এদের সম্পর্কে বলেছেন, 'গর্বিত ও অহংকারী লোকের নাম হল "ঠাট্টা বিদ্রূপকারী" সে অতিরিক্ত গর্বের সঙ্গে কাজ করে' (হিতোপদেশ ২১:২৪)। কাউকে এরকম কথা বললে সে অপ্রস্তুত বোধ করে, তার আত্মবিশ্বাস নড়বড়ে হয়ে যায়; ফলে সে এরূপ আচরণে সহজেই প্রভাবিত হতে পারে। 'এই যে সাধারণ লোকেরা, এরা তো মোশির ব্যবস্থা জানে না; এদের ওপর অভিশাপ রয়েছে' (যোহন ৭:৪৯)।

(২) 'বিবেকহীন' একটি ঘৃণার্হ শব্দ; কাউকে একথা বলার মাধ্যমে কেবল যে তাকে

অসম্মানিত করা হয় তা নয় উপরন্তু তাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখার প্রবণতাও ফুটে ওঠে। আগের কথাটি যেমন সত্যিকারের জ্ঞান থেকে উৎসারিত হয় না তেমনি এই 'বিবেকহীন' কথাটা যে উচ্চারণ করে সে প্রমাণ করে যে, তার মাঝে ঈশ্বরের অনুগ্রহ অনুপস্থিত। এর দ্বারা যে কেবল ঘৃণাই প্রকাশ পায় তা নয় বরং অন্যকে 'দোষী' বলেও সাব্যস্ত করা হয়– যেটা কেবল ঈশ্বরই করতে পারেন। রাগের কারণে মুখ থেকে বেরিয়ে আসা এ ধরনের কথার মাধ্যমে ষষ্ঠ আদেশকে পরিষ্কার লঙ্ঘন করা হয়। এর দ্বারা খুব সন্তর্পণে কাউকে খুন করা হয়– 'তারা যেন ছোরার মতো করে জিভে শান দিয়ে রেখেছে, তাদের তেতো কথার তীর ধনুকে লাগিয়ে রেখেছে' (গীত ৬৪:৩)। প্রতিবেশীকে খারাপ কথা উপহার দেওয়া তাকে মেরে ফেলার সমতুল্য; তাই, আমরা যেন কখনো মুখ থেকে এরকম বাজে কথা বের না করি; কারণ এতে করে আমাদের ভেতরে যে মন্দতা বাস করে সেটাই ফুটে ওঠে।

৩. খ্রীষ্ট এরকম 'রাগী' ব্যক্তিদের কী রকম শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে সে বিষয়ে পরিষ্কার বলে দিলেন, 'যে তার ভাইয়ের ওপর রাগ করে সে বিচারের দায়ে পড়বে; যে তার ভাইকে বলে 'তুমি অপদার্থ' সে মহাসভার বিচারের দায়ে পড়বে এবং যে তার ভাইকে 'বিবেকহীন' বলে সে নরকের আগুনের দায়ে পড়বে'। যিহূদী শিক্ষকেরা তাদের মহাসভায় অপরাধের ভিত্তিতে 'সাধারণ' এবং 'সর্বোচ্চ' শাস্তির বিধান তৈরি করেছিল। আর খ্রীষ্ট এখানে তাদের সেই বিষয়টি মাথায় রেখে রাগের ক্ষেত্রে 'সর্বোচ্চ' ও 'সাধারণ' শাস্তির বিষয়ে বললেন। এক্ষেত্রে তাঁর বিবেচনায় ছিল রাগের সুদূরপ্রসারী ফলাফল এবং কোন প্রকার রাগ কতটা মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে– সে বিষয়টি। যিহূদীদের বিচারসভায় প্রধানত তিন ধরনের শাস্তির বিধান ছিল; তার মাঝে একটির চেয়ে অপরটি ছিল আরও ভয়াবহ। প্রথমটি শিরোচ্ছেদ– যেটা বিচারের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হতো; দ্বিতীয়টি হচ্ছে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা– মহাসভার বিচার থেকে এই রায় প্রদান করা হতো; তৃতীয় শাস্তি অর্থাৎ হিন্নোমের উপত্যকায় আগুনে পুড়িয়ে মারার শাস্তিটি সচরাচর দেখা যেত না; কেউ মারাত্মক অপরাধ করলে তাকে এই শাস্তি দেওয়া হতো। তাই, খ্রীষ্ট তাঁর শিক্ষায় শাস্তির বিষয়টি উল্লেখ করার মাধ্যমে দেখিয়ে দিলেন রাগের দরুন মুখ থেকে বেরিয়ে আসা বাজে কথাবার্তা কতটা মারাত্মক ফল, পরিণতি বয়ে আনে; তিনি এর একটির চেয়ে অন্যটি যে আরও জঘন্য এবং অমার্জনীয় পাপবিশেষ তা-ও উল্লেখ করলেন।

ঘ. খ্রীষ্ট তাঁর শিক্ষায় রাগের ব্যাপারে এমন সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন যেন আমরা আমাদের ভাইদের প্রতি খ্রীষ্টীয় ভালবাসা দেখাতে পারি; তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হই; শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করে চলি। আর কারও সাথে কোন মনোমালিন্য দেখা দিলে আমরা যেন শীঘ্রই তা মিটিয়ে ফেলতে আন্তরিক হই; তার কাছে ক্ষমা চাই এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে উদ্যোগী হই।

১. কারণ, তা না করা পর্যন্ত আমরা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসার গ্রহণযোগ্যতা হারাই (২৩, ২৪ পদ)। এখানে বলা হয়েছে, 'তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের কিছু বলার থাকলে' অর্থাৎ আমরা যদি আমাদের ভাইয়ের বিরুদ্ধে কোন দোষ করে থাকি, তবে বিন্দুমাত্র সময়ক্ষেপণ না করে আমাদের তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইতে হবে; তার সাথে পুনরায় সুসম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। শুধু তাই নয়, আমাদের বিরুদ্ধেও যদি কেউ কোন অন্যায় করে থাকে, তবে তাকেও সাথে সাথেই ক্ষমা করে দিতে হবে (মার্ক ১১:২৫)। কারণ, কারও প্রতি ঘৃণার মনোভাব নিয়ে কিংবা অন্যের কাছে দোষী হয়ে থেকে ঈশ্বরের

সান্নিধ্য লাভ করা যায় না; তা প্রার্থনায় হোক, কিংবা তাঁর কাছে কোন উপহার নিয়ে আসার মাধ্যমেই হোক। মনে রাখুন,

(১) সঠিকভাবে ধর্মচর্চার জন্য আমাদের মনকে আগে প্রস্তুত করতে হবে। বিশেষ করে ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হবার আগে আমাদের মানসিক সুস্থিরতা নিশ্চিত করাটা খুবই জরুরি। সে সময় অনেক কিছুই মনে করবার আছে: আমাদের প্রতি কেউ মনোক্ষুণ্ন কিনা, কাউকে আঘাত দিয়েছি কিনা; কারও প্রতি নিজেরাই ঘৃণা বা অসন্তোষের মনোভাব পোষণ করে আছি কিনা।

(২) আত্মায় পবিত্র না হলে আমাদের কোন উপাসনাই ফলপ্রসূ হয় না; ঈশ্বর বিক্ষুব্ধ মনের উপাসনা গ্রহণ করেন না। কেবল রাগহীন খাঁটি মনের উপাসনাই ঈশ্বর কবুল করেন (১ তীমথিয় ২:৮)। অন্যথায় তিনি সেই উপাসনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন (যিশাইয় ১:১৫; ৫৮:৪)।

(৩) অন্যদের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব নিয়ে এবং অপরের ওপর অন্যায় করে ঈশ্বরের সামনে যারা উপাসনায় বসে যায়; তারা মনে করে ঈশ্বর বুঝি এরকম উপাসনায় সন্তুষ্ট হন। কিন্তু তাদের এই চিন্তা ভুল। ভণ্ডামিপূর্ণ উপাসনার চেয়ে ঈশ্বরের কাছে ভালবাসাপূর্ণ নম্র হৃদয় অনেক বেশি দামি; এবং তিনি তাতেই সবচেয়ে সন্তুষ্ট হন। তাই কারও প্রতি অন্যায় করার মাধ্যমে কিংবা কারও প্রতি ক্ষোভ নিয়ে ঈশ্বরের উপাসনায় নিবিষ্ট হলে তা সফল হবে না; ভাইয়ের প্রতি আমাদের কোন রাগ না দেখিয়ে খ্রীষ্টের ভালবাসায় সিক্ত করতে হবে।

(৪) রাগে পূর্ণ হৃদয় নিয়ে ঈশ্বরের উপাসনায় বসার আগে যাবতীয় ক্ষোভ, বিরুদ্ধ মনোভাব ছেড়ে আসতে হবে– 'তবে তোমার দান সেই বেদির ওপরে রেখে চলে যাও; এবং তার সঙ্গে আবার মিলিত হও।' অনেকে আবার এই অজুহাত দেখিয়ে মণ্ডলীতে আসা বন্ধ করে দেয়। তারা বলে, 'আমার প্রতিবেশীর সাথে সমস্যা চলছে– আমার উপর অনেকেই ক্ষুব্ধ– যারা আমার সর্বনাশ করেছে তাদের আমি ক্ষমা করতে পারব না, তাই মণ্ডলীতে যাই না'। কিন্তু এগুলীতে না যাওয়ার জন্য এরকম অজুহাত আসলে ধোপে টেকে না; উপর্যুক্ত ভুল করার মাধ্যমে সে নিজের দোষ স্বীকার করতে অসম্মতি জানায় এবং এতে কেবল তার মনের কাঠিন্য এবং মণ্ডলীর প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ পায়। খুব সহজেই আমরা এই সমস্যা থেকে নিস্তার পেতে পারি– এক. যারা আমাদের প্রতি অন্যায় করে, তাদের ক্ষমা করে দেবার মাধ্যমে এবং দুই. যাদের বিরুদ্ধে আমরা অন্যায় করি, তাদের কাছ থেকে ক্ষমা চাইবার মাধ্যমে। এর ফলে আমাদের সাথে অন্যদের সুসম্পর্ক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক টিকে থাকে; এবং মানসিকভাবে আমরা ঈশ্বরের সামনে যাবার জন্য প্রস্তুত হই। 'তারপর এসে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে তোমার দান উৎসর্গ দাও।' তাই আমরা অবশ্যই সূর্য ডোবার আগেই আমাদের রাগ ঝেড়ে ফেলব, কারণ আমরা যখন ঘুমুবার আগে প্রার্থনায় যাব তখন যেন তা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। ফলে নতুন সূর্যোদয় আমাদের মাঝে প্রেম ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হবে; আমরা প্রার্থনা ও উপাসনায় আরও বেশি করে ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ হতে পারব; যেহেতু এখন প্রার্থনায় নিবিষ্ট হওয়ার সময়।

২. আর তা না করলে পরিণতিতে আমাদের জন্য যে কী বিপদ অপেক্ষা করছে তা আমরা ২৫, ২৬ পদে দেখতে পাব।

(১) পৃথিবীবী বিপদ: যদি কারও বিরুদ্ধে আমরা অন্যায় করে তা শুরুতেই মিটিয়ে না ফেলি তাহলে আমাদেরকে কঠিন বিপদের মুখোমুখি হতে হবে। সেই ব্যক্তিটি যদি তা

আদালত পর্যন্ত নিয়ে যায় তবে আমাদের জন্য তা খুবই লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন সবাই বিড়ম্বনার সম্মুখীন হবে; অনেকে হবে বিব্রত। তাই শুরুতেই ঝামেলা মিটিয়ে না ফেললে পরিণতিতে আমাদের অনেক দুঃখভোগ করতে হয়। আর যেহেতু আমরা সবসময় নির্ঝঞ্ঝাট জীবন চাই, তাই শুরুতেই আমাদের সমস্যাকে কবর দিয়ে ফেলা উচিত। কারণ তা যখন বেড়ে যাবে তখন আমাদের লজ্জায় এবং দুঃখভোগে মুখ লুকানোর জায়গা থাকবে না। জ্ঞানী শলোমন এ বিষয়ে একটি চমৎকার পরামর্শ দিয়েছেন, 'নিজেকে নম্র কর; তাহলে তুমি নিজেকে অনেক বিপদ থেকে রক্ষা করবে' (হিতোপদেশ ৬:১-৫)। কেউ আমাদের বিরুদ্ধে দোষ করলে তাকে ক্ষমা করবার মাধ্যমে আমরাও অন্যের ক্ষমা লাভের উপযুক্ত হয়ে উঠি; এক্ষেত্রে নিজেকে বিনম্র করার বিকল্প নেই। ক্ষমায়-ভালবাসায় অন্যের সাথে সম্পর্কটাকে ঝালিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি যাদের বিরুদ্ধে আমরা অন্যায় করি তাদের কাছে নিজেকে নত করার মাধ্যমে ক্ষমা লাভ করাটাও গুরুত্বপূর্ণ। আর জেলখানার অন্ধকার প্রকো'বসে অনুতাপ করার চেয়ে, আগেই নিজেকে নত করে সমস্যা মিটিয়ে ফেলাটা যে অনেক মঙ্গলজনক– সেটা তো আপনিও মানবেন।

(২) স্বর্গীয় বিপদ: অন্যের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করে থাকলে, কিংবা অন্যে আমাদের বিপক্ষে ক্ষুব্ধ হয়ে থাকলে আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করার অযোগ্য বলে গণ্য হই। শুধু তাই নয়, 'যারা নিজেদের ইচ্ছামতো চলে আর সত্যকে না মেনে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়, ঈশ্বর তাদের ভীষণ শাস্তি দেবেন' (রোমীয় ২:৮)। আর কে না জানে, জগতের শাস্তি থেকে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও ঈশ্বরের শাস্তি থেকে কোনোভাবেই পালানো যায় না! ঈশ্বরের ইচ্ছামতো না চলে, আমরা যদি অন্যের মন কিংবা নিজের মনকে বিষিয়ে তুলি, তবে ঈশ্বর আমাদের দিক থেকে তাঁর মুখ ফিরিয়ে নেন। এবং ততক্ষণ পর্যন্ত মুখ ফিরিয়েই থাকেন যতক্ষণ না আমরা অন্যের সাথে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করি। ঈশ্বরের দেওয়া অনন্তকালীন শাস্তি ভোগ করার চেয়ে এই 'ছোট্ট' কাজটি করাই কি সঙ্গত নয়!

খ্রীষ্টের এই শিক্ষা আমরা ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক পুনঃস্থাপনেও কাজে লাগাতে পারি– 'শীঘ্রই তার সাথে মিলিত হও' এবং তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পার। মনে রাখুন,

(ক) ঈশ্বর পাপীদের বিপক্ষে দাঁড়ান। তিনি তাদের দোষী বলে স্থির করেন এবং শাস্তি দেন। (খ) ঈশ্বর চান যেন আমরা তাঁর সাথে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করি, যেন আমরা শান্তিতে বাস করতে পারি (ইয়োব ২২:২১; ২ করিন্থীয় ৫:২০)।

(গ) জীবন দশায় তা করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ; কারণ চোখ বুঁজলে তা করার আর কোন উপায় থাকবে না; সে কারণেই কত দ্রুত আমরা তাঁর সাথে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করতে পারি সেদিকেই আমাদের বুদ্ধিদীপ্তভাবে সচেষ্ট হতে হবে।

(ঘ) যারা ঈশ্বরের দিকে না ফিরে নিজেদের ইচ্ছামতো কাজ করে যেতে থাকে, তারা ঈশ্বরের বিচারের জন্যই নিজেদের প্রস্তুত করতে থাকে। তারা তা থেকে কোনমতেই পালাতে পারবে না; খ্রীষ্ট নিজে তাদের বিচার করবেন; কিন্তু তারা তাঁর ক্রোধের সামনে থেকে পালাতে চাইবে (প্রকাশিত ৬:১৬, ১৭; মথি ১৩:৪১, ৪২); এমনকি শয়তানও তাঁর শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে না (ইব্রীয় ২:১৪)। নরক হচ্ছে অনন্তকালীন কারাগার; যারা ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন না করে তাঁর বিরুদ্ধে টানা অন্যায় কাজ করে যেতে থাকে,

তারাই এর বাসিন্দা হিসেবে নিজেদের আবিষ্কার করবে (২ পিতর ২:৪)।

(ঙ) পাপীরা খ্রীষ্টের দেওয়া শাস্তি চিরকাল ভোগ করবে; এর কোন নির্দিষ্ট সময়, সীমা -পরিসীমা নেই। নরকের আগুন কখনো সন্তুষ্ট হয় না; তাই, আমাদের শীঘ্রই ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করা প্রয়োজন। এতে করে আমরা নিজেদের স্বর্গীয় জীবনই রক্ষা করতে সমর্থ হব।

মথি ৫:২৭-৩২ পদ

খ্রীষ্ট এবারে সপ্তম আদেশের ব্যাখ্যা দিলেন। খুনের বিপরীতে ষষ্ঠ আদেশের পর এই আদেশটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ব্যভিচারের বিরুদ্ধে এই আদেশ দৈহিকভাবে নিজেদের পবিত্র রাখবার বিষয়ে শিক্ষা দেয়। তবে, যিহূদী শিক্ষকেরা যেভাবে এর অনুবাদ করেছিল তা ঈশ্বর-নির্দেশিত অর্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না; তারা জোর দিয়েছিল 'কাজ'-এর ওপর। আর খ্রীষ্ট এখানে সেই একই আদেশের ব্যাখ্যাদানে 'চিন্তা'-এর ওপরও আলোকপাত করলেন। তিনি তাঁর ব্যাখ্যার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন যে, কেবল ব্যভিচার করাই পাপ নয়; উপরন্তু ব্যভিচার করার কথা চিন্তা করাও পাপ। অপরাধের দিক দিয়ে ব্যভিচার খুনের চেয়ে মোটেও গৌণ নয়; বরং দু'টিই সমান অপরাধ বলে ঈশ্বরের কাছে স্বীকৃত হয়; এমনকি বর্তমানে আমরা পৃথিবীর আইনেও এরকমটা প্রত্যক্ষ করছি।

ক. এখানে ২৭ পদে সেই সপ্তম আদেশের কথাই বর্ণিত হয়েছে, 'ব্যভিচার কোরো না;' সাধারণত ব্যভিচার হচ্ছে শারীরিক কামনা-বাসনার চূড়ান্ত প্রকাশ; 'ক্রোধ' যেমন মানুষকে খুনের দিকে নিয়ে যায় তেমনি 'কামনা' নিয়ে যায় ব্যভিচারের দিকে। ফলে 'কামনা' যে জেনারই সমতুল্য তা ফরীশীদের ব্যাখ্যায় ছিল অনুপস্থিত। তারা মনে করতো, মনে অন্যায় পুষে রাখলে ঈশ্বর তা ধরেন না (গীত ৬৭:১৮) এবং তাই তারা কারও দিকে কামাতুর দৃষ্টিতে তাকালে সেটাকে ব্যভিচার মনে করতো না (লূক ১৮:১১)।

খ. খ্রীষ্টের ব্যাখ্যায় 'ব্যভিচার' যেন নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত হল; তিনি তিনটি বিষয়ে সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন; তিনি যেমনটা বললেন তা এর আগে কেউ বলেনি, শোনেও নি। লোকদের কাছে তাঁর এই শিক্ষা সম্পূর্ণ নতুন হয়ে ধরা দিল; কারণ প্রথাগতভাবে তারা এমনটা করতে ইতোপূর্বে তাদের শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষা পায় নি।

১. আমরা এখানে অভ্যন্তরীণ (মনে মনে) ব্যভিচারের বিষয়ে পরিষ্কার সাবধানবাণী পাই। কেবল ব্যভিচার করাই নয় মনে মনে ব্যভিচারের কথা চিন্তা করাও ঈশ্বরের কাছে পাপ বলে ধার্য হয়। যিহূদী শিক্ষকরা ঈশ্বরের আদেশের ভাবার্থকে ভুল ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে জেনাকে প্রশমিত না করে উৎসাহিতই করেছিল; শুধু তাই নয় তারা তাঁর আদেশের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্মৃত হয়েছিল। তারা বিভিন্ন ধর্মীয় পর্বের দিকে বেশি উৎসাহিত ছিল– যেমন, বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা; হাত ধোয়া প্রভৃতি। এ থেকেই তাদের মনোবৃত্তি বোঝা সম্ভব যে তারা ঈশ্বরের আদেশের বাহ্যিক রূপ বা প্রকাশকেই যথার্থ বলে ধরেছিল। কিন্তু খ্রীষ্ট এখানে পরিষ্কার বলে দিলেন যে, 'যে কেউ কোন নারীর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায় সে তখনই মনে মনে ব্যভিচার করল' (২৮ পদ)। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কেবল ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করাই নয়, তা অমান্য করার চিন্তাও পাপ; যেমন– ব্যভিচার করাই শুধু নয় ব্যভিচারের কথা চিন্তা করাও ঈশ্বরের কাছে পাপ হিসেবে স্বীকৃত হয়; কারণ

(১) নিষিদ্ধ কাজে উৎসাহী হওয়া মানে পাপের পথে এক পা দিয়ে রাখা (যাকোব ১:১৫)। এটা খুবই খারাপ লক্ষণ; কারণ মনে পাপের চিন্তা আসলে তা মাথায় খেলতে থাকে; তৈরি হয় নতুন নতুন ব্যাখ্যা, অজুহাত; তারপর সুযোগের অপেক্ষা; আর সুযোগ পেলে তার সদ্ব্যবহার করতে অনেকেই পিছ পা হয় না; কারণ তখন তা ক্ষুধায় পরিণত হয়; ফলে সে পথ থেকে ফিরে আসার কোন চেষ্টাই পরিলক্ষিত হয় না।

(২) খ্রীষ্ট এখানে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটাকে পাল্টানোর কথা বলেছেন। শয়তানের প্ররোচনায় হাওয়া যখন নিষিদ্ধ ফলের দিকে তাকিয়েছিলেন তখন তার কামনারও উদ্রেক হয়েছিল। মূলকথা হচ্ছে, কোন্ দৃষ্টিতে আমরা তাকাচ্ছি। যদি আমরা কামনার দৃষ্টিতে তাকাই তবে তা বাড়বে বই কমবে না। অনেকেই ভাবেন, কী হয় তাকালে? কিন্তু কামনার দৃষ্টি যে কেবলই ধ্বংস ডেকে আনে সেটা বুঝতে হবে। মানুষের ভেতরের কামবোধই অপরাধে উৎসাহী হয়; যেমনটা আমরা দেখি যোষেফের মনিবের স্ত্রী (আদি ৩৯:৭), শিমিয়োন (বিচারকর্তৃকগণ ১৬:১) এবং দায়ূদের জীবনে (২ শমূয়েল ১১:২)। শাস্ত্রে আমরা পড়ি, যে চোখে ব্যভিচার মিশে থাকে তা পাপ করা বন্ধ করে না (২ পিতর ২:১৪)। তাই, খ্রীষ্টের দেখিয়ে যাওয়া পথে চলার জন্য, নিজেদের ধার্মিকতাকে রক্ষা করার জন্য আমাদের চোখকে ঈশ্বরের নিরূপিত দায়িত্বের প্রতি নিবদ্ধ করতে হবে। আমাদের চোখ যদি সর্বদাই ঈশ্বরের অনুগ্রহ, কাজ এবং স্বর্গীয় আলোর ওপর নিবদ্ধ থাকে, তবে তা কখনো পাপের কথা কল্পনা করতে উদ্যত হবে না। ফলে আমরা পাপ এবং পাপের শাস্তি থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সমর্থ হব। শুধু যে দৃষ্টিভঙ্গি এবং এর প্রকাশভঙ্গিকে পাল্টাতে হবে তা নয় বরং মনের গহীন কোণেও যেন সুপ্ত কোন কামভাব বসত না করে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। খ্রীষ্টের দেওয়া 'হৃদয়ের পবিত্রতা'– এর বিষয়ে শিক্ষার (৮ পদ) সাথে সম্পর্কিত এই ধারণামতে, কারও দিকে ব্যভিচারের দৃষ্টিতে তাকানো যদি 'নিষিদ্ধ ফল' হয়ে থাকে, তবে তা করার কথা ভাবা মানে নিজেকে 'নরকের অগ্নিকুণ্ডে' আবিষ্কার করা। আর কামাতুর দৃষ্টির মতো কামোত্তেজক পোশাকও সমানভাবে দায়ী; কারণ তা অন্যকে জেনায় প্ররোচিত করে (এক্ষেত্রে আমরা ইষেবলের উদাহরণ টানতে পারি– যে মেকআপ নিয়ে অসৎ উদ্দেশ্যে জানলার দিকে তাকিয়ে থাকতো)। মনে রাখুন, মানুষ পাপ করে, আর শয়তান পাপ করায়।

২. কামাতুর চোখ আত্মাকে ধ্বংস করে। একটু আগে আমরা খ্রীষ্টকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে শিক্ষা দিতে দেখি। এবারে তিনি সেই দৃষ্টির উৎসমূলকে নির্দেশ করে বললেন, আমাদের ডান চোখ যদি আমাদের পাপের পথে টানে তবে তা উপড়ে ফেলা উচিত; অনুরূপভাবে যদি আমাদের ডান হাত আমাদের পাপের দিকে টানে তবে তা কেটে ফেলা প্রয়োজন (২৯, ৩০ পদ)। পাপ-প্রবৃত্তি অবশ্য তা মানা অসম্ভব বলে আপত্তি জানায়– 'আমরা রক্তমাংসের মানুষ; কী করে একজন সুন্দরী রমণীর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখব! তাকে দেখে যদি আমাদের মনে তাকে পাবার বাসনা জাগে তবে এতে ভুল কোথায়?' এবং এরকম অজুহাতের মাধ্যমে অপরাধপ্রবণ মন পাপচ্যুত হতে চায় না; যে কারণে এ ধরনের মনোপ্রবৃত্তির অধিকারীরা প্রভুর সাবধানবাণীকে অবজ্ঞা করার দুঃসাহস দেখায়।

(১) নিজের মনোবৃত্তিকে যদি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হয়, তবে হৃদয়ের পবিত্রতা রক্ষার জন্য খ্রীষ্ট এখানে এক কষ্টসাধ্য অপারেশনের কথা বলেছেন, 'যদি ডান চোখ কিংবা ডান

হাত পাপের দিকে ধাবিত করে তবে তা কেটে বাদ দেওয়াটাই সমীচীন হবে'। ডান চোখ বা ডান হাত যদিও অনেক সম্মানের এবং প্রয়োজনীয় তবুও আমাদের মনোবৃত্তি যদি শয়তানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে তা না থাকাই শ্রেয়। জীবনে পাপের চর্চার ফলে ঈশ্বরের সহভাগিতা হারানোর চেয়ে দুঃখজনক আর কী হতে পারে! এর চেয়ে দৈহিক বিকলাঙ্গতাকে স্বীকার করে নেওয়াটাই কি কম শাস্তি হয়ে যায় না? পাপের চর্চাকারী হৃদয় আত্মিক জীবনকে ধ্বংস করে দেয়; কারণ সেই হৃদয় ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত হয় না। পাপের জন্য 'রক্তমাংসের দেহ' কোন অজুহাত হতে পারে না; কারণ দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে মন। সেই মন যদি ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণের অধীনে না থাকে, তবে পাপের কাছে সমর্পিত হওয়া থেকে, পাপের প্ররোচকদের এড়িয়ে চলা থেকে, পাপের উপলক্ষ থেকে নিজের আত্মিক জীবনকে রক্ষা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। শয়তানের নিয়ে আসা প্রলোভন থেকে বাঁচার জন্য আমরা যদি ঈশ্বরের সাহায্য না চাই, তবে তো আমরা নিজেরাই নিজেদের পাপী সাব্যস্ত করে তুলতে কার্যকর ভূমিকা রাখছি। তাই, প্রতিদিন আমরা যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহ, সুরক্ষার অধীনে থেকে আত্মায় ও সত্যে চলি, তবেই আমরা শারীরিক কামনা-বাসনার ওপর জয়লাভ করতে সমর্থ হব; আর তা করলে আমাদের আর ডান হাত, ডান চোখ কেটে ফেলতে হবে না। পরিণত মানুষ যেমন অনেক কিছুকে পরিহার করতে শেখে, তেমনি আমাদেরও আত্মিক পরিপক্কতায় অনেক তৃপ্তিদায়ক কাজকে 'না' বলতে হবে।

(২) পাপ থেকে বিরত থাকার জন্য খ্রীষ্ট এখানে অদ্ভুত এক নির্দেশ দিয়েছেন; এই নির্দেশ দিতে গিয়ে তিনি ২৯ এবং ৩০ পদে একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন; এর কারণ এই যে, মানুষ সত্যিটা শুনতে চায় না (যিশাইয় ৩০:১০)। 'তোমার সমস্ত শরীর নরকে যাওয়ার চেয়ে বরং একটা অংশ নষ্ট হওয়া তোমার পক্ষে ভাল'। মনে রাখুন (ক) খ্রীষ্টের কাছ থেকে নরকের এবং শাস্তির কথা শুনে অনেকে বলে যান; সুসমাচার তো জীবনের কথা বলে; তাহলে খ্রীষ্ট কেন লোকদের নরক-শাস্তির ভয় দেখাচ্ছেন! এর কারণ, আমরা যাতে তাঁর পথ থেকে কখনো সরে না যাই; এই সাবধানবাণী আমাদের তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে শিক্ষা দেয়। (খ) এখানে যে পাপের কথা বলা হয়েছে, তার মাঝে বিশেষত শারীরিক কামনা-বাসনা থেকে নিজেদের বিরত রাখতে তাঁর এই শাস্তির ভয় দেখানোটা প্রয়োজন ছিল; এর ফলে আমরা সর্বদা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থেকে নিজেদের মনোবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে আরও বেশি করে উদ্যোগী হই। (গ) 'কতদিন নিজেকে জাগতিক সুখ থেকে বঞ্চিত রাখব? ' কিংবা 'এভাবে কি থাকা যায়? সবই মানতে হবে নাকি?'– এরূপ চিন্তায় প্ররোচিত হয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে অথবা শারীরিক কামনা-বাসনাকে জলাঞ্জলি দিতে ব্যর্থ হওয়ার চেয়ে নরকের শাস্তির বিষয়ে চিন্তা করাটা আমাদের কাছে অনেক কঠিন ও ভয়াবহ রূপে ধরা দেয়। যাদের নরকে বিশ্বাস নেই তাদের মনে নরকের শাস্তিভীতিও নেই; কিন্তু আমরা যারা নরক সম্পর্কে জানি তারা অবশ্যই সেখানে যেতে চাইব না; তার চেয়ে বরং নিজেদের মনকে নিয়ন্ত্রণ করার দিকেই সচেষ্ট হতে চাইব। (ঘ) নরকের আগুনে গোটা দেহই কষ্ট পাবে; তাই সময় থাকতে পাপপ্রবণ অঙ্গটিকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার দিকেই আমাদের অধিকতর মনোযোগী হওয়া উচিত। (ঙ) মনকে পবিত্র-খাঁটি রাখাটা বেঁচে থাকার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ। আর আমাদের প্রভু তো জানেন কোনটা আমাদের জন্য ভাল এবং কল্যাণ বয়ে আনে।

৩. খ্রীষ্ট এখানে স্ত্রীকে ত্যাগ দেবার বিষয়ে বললেন যে, কেউ যদি ব্যভিচারের দোষ

ছাড়া অন্য কোন কারণে তার স্ত্রীকে ত্যাগ দেয়, তবে সে তাকে ব্যভিচারিণী করে তোলে এবং ত্যাগপ্রাপ্তাকে যে বিয়ে করে সেও ব্যভিচার করে (৩১, ৩২)। তদানীন্তন যিহূদী সমাজে ত্যাগ দেবার যে রীতি গড়ে উঠেছিল তা ছিল সপ্তম আদেশের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

(১) ত্যাগ দেবার বিষয়ে বলতে গিয়ে খ্রীষ্ট উচ্চারণ করলেন 'আবার বলা হয়েছে'। বাস্তবিকই ঈশ্বর তা করতে আদেশ দেননি। কিন্তু কঠিনমনা যিহূদীদের মানসিকতার সাথে সঙ্গতি রেখে মোশি তাদের ত্যাগ দেবার অনুমতি দিয়েছিলেন (১৯:৭,৮); 'কেউ যদি তার স্ত্রীকে ছেড়ে দিতে চায়, তবে তাকে ত্যাগপত্র দিক'– এটা কোন আদেশ নয়; স্রেফ অনুমতি। এই 'অনুমতি' পেয়েই যিহূদী শিক্ষকরা সপ্তম আদেশ সম্পর্কে বিস্মৃত হয়েছিল। মোশি যখন তাদের এই অনুমতি দেন তখন তাদের মাঝে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা খুব কমই ছিল; ফলে তখন ত্যাগ দেবার হার ছিল নেহায়েতই হাতেগোনা। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন লেখালেখি একটা মামুলি ব্যাপারে পরিণত হল, তখন যেনতেন প্রকারের ত্যাগ দেওয়াটাও নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হল। নিছক 'অনুমতি' কীভাবে 'ঈশ্বরের আইন' হয়ে উঠল তা খ্রীষ্টের সাথে ফরীশীদের আলাপের ধরন দেখলেই বোঝা যায় (১৯:৩)।

(২) আমাদের ত্রাণকর্তা এখানে ত্যাগ প্রসঙ্গে বললেন যে, ব্যভিচারের দোষ ছাড়া কাউকে ত্যাগ দেওয়া যাবে না; কারণ ব্যভিচার বিয়ের পবিত্র শর্তকে লঙ্ঘন করে। ঈশ্বর যে নর ও নারীকে একদেহ করেছেন তা চাইলেই আলাদা করা যায় না। খ্রীষ্ট তাঁর বক্তব্যের সাথে সম্পূরক হিসেবে উল্লেখ করলেন, যাকে ত্যাগ দেওয়া হয়েছে সেই স্ত্রীকে যে বিয়ে করে সেও ব্যভিচার করে। মনে রাখুন, যারা অন্যকে পাপে প্ররোচিত করে, সহযোগিতা ও উৎসাহ দেয়, তারাও পাপের দায় এড়াতে পারবে না; ঠিক তেমনি যে অন্যকে ব্যভিচার করতে প্ররোচিত করে, সে সেই ব্যভিচারের অংশীরূপে বিবেচিত হয়।

মথি ৫:৩৩-৩৭

খ্রীষ্ট এবারে তৃতীয় আদেশের বিষয়ে বললেন। তিনি তাঁর ব্যাখ্যায় মূল আদেশের প্রতি আলোকপাত করে বললেন যে, কেউ যদি কোন বাজে উদ্দেশ্যে সদাপ্রভু ঈশ্বরের নাম নেয় তবে সে ঈশ্বরের কাছ থেকে উপযুক্ত শাস্তি পাবে; কারণ ঈশ্বর এখানে নির্দিষ্ট করে নিজের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। আসুন, মূল আদেশের প্রতি একবার চোখ বুলিয়ে নেয়া যাক।

ক. ঈশ্বর তাঁর তৃতীয় আজ্ঞায় কোন বাজে উদ্দেশ্যে তাঁর নাম নিতে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করেছিলেন; খ্রীষ্ট এখানে আগেকার লোকদের কাছে এই আদেশটি যেভাবে অনূদিত হয়েছিল তা তুলে ধরলেন, 'মিথ্যা দিব্য খেয়ো না, বরং সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে তোমার সমস্ত দিব্য পালন কোরো' (৩৩ পদ)। মূল আদেশের সাথে সঙ্গতি রেখে যিহূদীদের কাছে এই ব্যখ্যা করা হয়েছিল যে, তোমরা বিনা কারণে, গর্ব প্রকাশে কিংবা মিথ্যা বলতে গিয়ে সদাপ্রভু ঈশ্বরের নাম নিয়ো না (তাঁর নামে যেভাবে দিব্য দেওয়া হয়); কারণ তা করলে সদাপ্রভু তোমাদের ভীষণ শাস্তি দেবেন। মিথ্যা দিব্যের বিষয়ে আমরা শাস্ত্রের আরও এক জায়গায় সাবধানবাণী উচ্চারিত হতে দেখি, 'কেবল সে-ই যোগ্য, যার মুখে নেই মিথ্যা দিব্য' (গীত ২৪:৪)। মিথ্যা দিব্য খাওয়াটা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তো বটেই মানুষের কাছেও তা অবিশ্বস্ততার কাজ বলে গণ্য হয়। মানুষ সাধারণত নিজের বিশ্বস্ততা, সততা প্রমাণের দরুনই দিব্য খেয়ে থাকে। 'ঈশ্বরের' নামে দিব্য খেয়ে কেউ মিথ্যা বলবে না এই বোধ

থেকেই মানুষ 'দিব্যে' বিশ্বাস করে। কিন্তু কারও মনে যখন মিথ্যা ঘাঁটি গেড়ে বসে তখন সে নিজের মিথ্যাকে সত্য বলে গণ্য করানোর জন্য স্বয়ং ঈশ্বরের নামে দিব্য খেতেও দ্বিধাবোধ করে না। সত্য প্রমাণের কোন দায় নেই; তাই ঈশ্বর তাঁর নামে যারা মিথ্যা দিব্য খায় তাদের ভীষণ শাস্তি দিতেও কুণ্ঠিত হবেন না; তিনি তাদের ধ্বংস করবেন; কারণ তারা নিজেদের আত্মিক জীবনকে খাঁটি রাখার জন্য তাঁর সাহায্য না চেয়ে তাঁর নামকে ব্যবহার করে মিথ্যাকে সত্য বলে প্রমাণের ঘৃণ্য চেষ্টা চালিয়েছে।

তা ছাড়া দিব্য পালনের বিষয়ে যে শিক্ষার কথা যিহূদীরা জানতো সে বিষয়ে আমরা গণনা পুস্তকের ৩০:২ পদে দেখি, 'কসম খেয়ে কেউ যদি কোন প্রতিশ্রুতি পূরণের কথা বলে, তবে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।' এ কথার দ্বারা সম্ভবত এটাই বোঝানো হয়েছে যে, ১. ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে যে প্রতিজ্ঞা করা হয় তা অবশ্যই পালন করা উচিত (উপদেশক ৫:৪, ৫); এবং ২. কেউ নিজের বিশ্বস্ততা প্রমাণে ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে কারও কাছে কোন প্রতিজ্ঞা করলে তা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে অবশ্যই পূরণ করা উচিত কারণ ঈশ্বর এই প্রতিজ্ঞা পূরণের সাক্ষী হতে অপেক্ষা করেন। তাই দিব্যের মাধ্যমে করা প্রতিজ্ঞার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের কাছে তা পালনে দায়বদ্ধ হই; ফলে তাঁর জন্য, তাঁকে গৌরবান্বিত করার জন্য হলেও সেই প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়ন করাটা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়; আর তাঁকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করে পরবর্তীতে তা ভঙ্গ করলে আমরা কেবল মানুষের কাছেই অবিশ্বস্ত হই না; উপরন্তু ঈশ্বরের কাছেও মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হই।

খ. তৃতীয় আদেশটি কেবল মিথ্যা দিব্যের বিরুদ্ধেই বলে না বরং তা যেন বাজে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়েও পরিষ্কার সাবধানবাণী উচ্চারণ করে; তাই দিব্যের অপব্যবহার রোধ করার জন্য খ্রীষ্ট একেবারেই দিব্য না খাওয়ার নির্দেশ দিলেন (৩৪ পদ ; তুলনা করুন যাকোব ৫:১২)। তাই বলে সব দিব্যই পাপ নয়; বিশেষ করে যে দিব্য প্রভুকে গৌরবান্বিত করার উদ্দেশ্যে করা হয় (দ্বিতীয় বিবরণ ৬: ১৩; ১০:২০; ইশা ৪৫:২৩; যিরমিয় ৪:২)। পৌলকে আমরা ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে তার জীবনকে নিয়ে দিব্য খেতে দেখি (২ করিন্থীয় ১:২৩); অবশ্য তখন এর প্রয়োজন ছিল। অনেক সময় আমরা প্রয়োজনের নিরিখে দিব্যের দ্বারা সন্দেহাতীত, অজানা সত্যকে অনেকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে সক্ষম হই (আদালতে যেভাবে সাক্ষ্য দেওয়া হয়)। কিন্তু দিব্য খেয়ে মিথ্যা বলার মাধ্যমে আমরা মানুষ ও ঈশ্বর– উভয়ের চোখেই অবিশ্বস্ত বলে পরিগণিত হই।

কিন্তু খ্রীষ্ট এখানে বললেন,

১. যেন আমরা কখনো দিব্য না দিই, কিন্তু প্রয়োজনের গুরুত্ব বিবেচনায় সামাজিক অনুশাসনকে সম্মান জানাতে কিংবা আদালতে দিব্য (শপথ) করা যেতে পারে; কারণ কখনো কখনো তা গোলমাল থামাতেও কাজে দেয় (ইব্রীয় ৬:১৬)। আমরা হয়তো দিব্য খেতে বাধ্য হতে পারি কিন্তু নিজে থেকে আমাদের কখনো দিব্য দেওয়া উচিত নয়।

২. যেন আমরা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সাধারণ কোন ব্যাপারে দিব্য না দিই। কারণ, পৃথিবীর মামুলি বিষয়ে ঈশ্বরকে সাক্ষী মানাটা খুবই হাস্যকর এবং তা নিজেদের আত্মিক জীবনের প্রতি যত্নবান হতে নিরস্ত করে। তাই, ঈশ্বরের পবিত্র নামকে হালকা করে দেওয়া থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। ঈশ্বর, যিনি আমাদের পবিত্র করেছেন, তিনি আমাদের স্বীয় পবিত্রতা রক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন। যারা মন্দতায় চলে, যারা অবিশ্বস্ত, তাদেরই কেবল দিব্য খাওয়ার প্রয়োজন পড়ে; তাই, ঈশ্বরের নামের পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখার

জন্য আমাদের তাঁর নামের যথেচ্ছ ব্যবহারে পাপের ভাগী হওয়া থেকে নিজেদের বিরত রাখতে হবে; কারণ পাপীরাই মন্দ উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করে থাকে।

৩. যেন আমাদের সত্যবাদিতা দিব্য খাওয়ার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব না ঘটায়। প্রতিজ্ঞাকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা যদি দিব্য খাই তবে তো আমাদের বিশ্বস্ততা প্রশ্নবিদ্ধ অবয়ব পায়। খ্রীষ্ট আমাদের জীবনকে এএভাবে সাজাতে বলেছেন যেন আমাদের মুখের কথাই যথেষ্ট বলে প্রমাণিত হয়; কেউ যেন তার মাঝে মিথ্যা কিংবা সন্দেহ খুঁজে না পায়। দিব্যের দ্বারা নিজেকে কোন প্রতিজ্ঞায় বাঁধলে, তা দীর্ঘ মেয়াদী দায়বদ্ধতা তৈরি করে; ফলে তা লঙ্ঘনের সম্ভাবনা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়; আর শয়তান এই সুযোগে তার প্রলোভন নিয়ে আসার প্রয়াস পায়। খ্রীষ্টের অনুসারীদের জীবন এমন হওয়া উচিত যেন তাদের কথাতেই সবাই 'কাজ হয়ে গেছে' বলে ধরে নেয়।

৪. খ্রীষ্ট এখানে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে নিয়ে (যেমন- স্বর্গ, পৃথিবী) দিব্য খেতে বারণ করেছেন (৩৪ পদ)। খ্রীষ্টের কথায় যদিও ঈশ্বরের নামের উল্লেখ নেই; তবুও সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা হিসেবে তাঁর কথা তো এসেই যায়। তিনি আমাদের ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কিত কিংবা অন্য যেকোন কিছু নিয়েই দিব্য না দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ এর কিছুই আমাদের তৈরি নয়। তাই ঈশ্বরের সৃষ্টিকে নিয়ে দিব্য খাবার অধিকার আমাদের নেই। এই অধিকার কেবল তিনিই সংরক্ষণ করেন। তাই, তাঁর সৃষ্টিকে নিয়ে দিব্য দেওয়া খুবই বিপদজনক। খ্রীষ্ট এখানে ঈশ্বরের বিভিন্ন সৃষ্টির বিষয়ে উল্লেখ করেছেন, তাতে কেবল আমাদের তাঁকে গৌরবান্বিত করার দিকেই মনোযোগী হওয়া উচিত। ঈশ্বরের সত্যের তত্ত্বাবধায়ক, তাঁকেই তো আমাদের সম্মান জানানো উচিত।

(১) 'স্বর্গের নামে দিব্য দিও না;' আমরা বিশ্বাস করি যে, স্বর্গ হচ্ছে 'ঈশ্বরের সিংহাসন;' যেখান থেকে তিনি গৌরবের সাথে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু পরিচালনা করেন। তাঁর সেই গৌরব, ক্ষমতা মানুষের বোধের বাইরে, তাই স্বর্গের নামে দিব্য দেওয়া চলবে না; বরং নিজেদের জীবনে ঈশ্বরের পরিচালনা পেতেই তাঁর নাম স্মরণ করা উচিত।

(২) 'পৃথিবীর নামে দিব্য খেয়ো না কারণ তা তাঁর পা রাখবার জায়গা।' ঈশ্বরই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা (গীত ৪৬:৪)। তিনি যেমন স্বর্গকে পরিচালনা করেন তেমনি পৃথিবীকেও শাসন করেন। যদিও পৃথিবী তাঁর পা রাখবার জায়গা তবুও তিনি এর সবকিছুকেই নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করেন। তাই পৃথিবীর নামে দিব্য না খেয়ে পৃথিবীর স্রষ্টার কাছে সাহায্যের জন্য মুখ খোলা উচিত।

(৩) 'যিরূশালেমের নামে দিব্য দিও না।' যিহূদীরা যে যিরূশালেমকে 'পবিত্র নগরী' জ্ঞান করে সেখানে উপাসনা করতে যেত এবং এর নামে দিব্য দিতে দ্বিধা করতো না, তার প্রতি ইঙ্গিত করে খ্রীষ্ট তাঁর কথা দ্বারা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন যে, ঈশ্বরের কাছে যিরূশালেম কেবল তাঁর সৃষ্টিরই একটা অংশ। তবে এই নগরীর সাথে তাঁর এক বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল; পুরাতন নিয়মে এই নগরীকে 'মহান রাজার নগরী' (গীত ৪৮:২) এবং 'ঈশ্বরের নগরী' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। খ্রীষ্ট তাই ঈশ্বরের সৃষ্ট নগরী যিরূশালেমকে নিয়ে দিব্য দিতে নিষেধ করেছেন।

(৪) 'তোমার মাথার নামে দিব্য দিও না।' মাথা আমাদের দেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে বিবেচিত। যেহেতু ঈশ্বরই তা সৃষ্টি করেছেন তাই তা তাঁর কাছেও মূল্যবান। কিন্তু এর শরীরবৃত্তীয় কার্যক্রম আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। একটি চুল সাদা কি কালো

করার ক্ষমতাও আমাদের নেই। তাই নিজেদের মাথার নামে দিব্য না দিয়ে আমরা এর উপযুক্ত পরিচালনার জন্য ঈশ্বরের সাহায্য চাইব। একমাত্র ঈশ্বরই আমাদের নিচু মাথা উঁচু করতে পারেন (গীত ৩:৩)।

৫. খ্রীষ্ট আমাদের জীবনকে সত্যের উপযুক্ত প্রমাণ হিসেবে সাজাতে বলেছেন। আমরা কাউকে 'হ্যাঁ' বললে তা যেন 'হ্যাঁ' এবং 'না' বললে তা যেন 'না'-ই হয় (৩৭ পদ)। খ্রীষ্ট যেমন নিজেকে সত্যের প্রামাণ্য রূপ হিসেবে তুলে ধরেছিলেন তেমনি আমাদেরও খাঁটি ও সৎ জীবন দ্বারা নিজেদের বিশ্বস্ততা ও গ্রহণযোগ্যতাকে সবার কাছে ফুটিয়ে তুলতে হবে। আমরা যদি কাউকে 'কথা' দিই তবে তা যেন 'কাজ হয়ে গেছে' গেলে গণ্য হয়। কোন কাজ বা কথার ক্ষেত্রে আমরা যদি 'না' বলি তবে সেই 'না' যেন দৃঢ়তার সাথে পরবর্তীতেও 'না' হয়েই প্রকাশিত হয়। তা করলেই আমরা অন্যদের কাছে আস্থাভাজন হয়ে উঠতে সমর্থ হব; ফলে সত্য প্রকাশে দিব্য দেওয়ার আবশ্যকতা দেখা দেবে না; কারণ, সত্যের নিজেকে প্রমাণের কোন দায় নেই। খ্রীষ্টের কাছ থেকে পাওয়া এই শিক্ষা আমাদের ঈশ্বরের নামের যথেচ্ছ ব্যবহারের হাত থেকে বেরিয়ে আসার পথ দেখায়। ড. হ্যামন্ডের মতে– আমাদের 'হ্যাঁ' এবং 'না'-এর বাইরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। এর অন্যথা হলে কী হবে– তা না ভেবে আমাদের অনুরূপভাবে নিজেদের জীবনকে সাজানো উচিত।

কেন আমরা 'হ্যাঁ' এবং 'না'– এ দু'য়ের বাইরে যাব না তা খ্রীষ্ট তাঁর পরের কথাতেই পরিষ্কার কারণ দর্শিয়েছেন– অর্থাৎ এর বেশি যা তা দিয়াবলের কাছ থেকে আসে (পুরানো অনুবাদে দিয়াবলের স্থলে শয়তান উল্লিখিত হয়েছে; যদিও দিয়াবলই শয়তান)। আমরা যদি ঈশ্বরের কথার বাইরে যাওয়ার বিষয়ে চিন্তা করি তবে তা আমাদের পাপপ্রবণ মনের কাজ বলে বুঝতে হবে। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের ভেতরেই এরূপ পাপের প্রবৃত্তি রয়েছে; সে কারণেই মানুষ ঈশ্বরের আদেশের বাইরে যেতে পথ খোঁজে। ফলে, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। মনে রাখুন, প্রকৃত খ্রীষ্টানরা পাপের পথ তো দূরের কথা পাপের ছায়া মাড়াতেও অস্বীকৃতি প্রদান করে। খারাপ কোন কিছুকেই তারা নিজেদের মনে প্রশ্রয় দেয় না; ঈশ্বরের আদেশের বাইরে যেতে কোন কারণ খুঁজে বেড়ায় না। সত্যবাদিতা প্রমাণের দাওয়াই হিসেবে দিব্য মোটেও সুবিধের নয়; কারণ তা ইনফেকশনের মাধ্যমে পাপ-রোগকে আমন্ত্রণ জানায়।

মথি ৫:৩৮-৪২ পদ

খ্রীষ্ট এখানে প্রতিশোধের বিষয়ে দেওয়া আদেশটি ব্যাখ্যা করেছেন; এবং তা করতে গিয়ে তিনি এর প্রায়োগিক দিকটিকে বাতিল করে দিলেন। লক্ষ্য করুন,

ক. প্রতিশোধের বিষয়ে পুরাতন নিয়মে বর্ণিত আদেশের বিষয়টি বলতে গিয়ে খ্রীষ্ট কিন্তু এবারে 'আগেকার লোকদের কাছে বলা হয়েছে'– এ কথা বললেন না; বরং তিনি বললেন, 'বলা হয়েছে'; কারণ সত্যিকারেই এটা ছিল একটা আদেশ। তাই, যিহূদী-সমাজে কেউ আঘাতপ্রাপ্ত হলে আঘাতকারীকে তার সমুচিত শাস্তি দেওয়ার বিধান ছিল; যদিও এর জন্য আনীত অভিযোগ প্রমাণ করতে হতো। এর ফলে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি মানসিক সন্তুষ্টি লাভ করতো; (যাত্রা ২১:২৪; লেবীয় ২৪:২০; দ্বিতীয় বিবরণ ১৯:২১)। যিহূদী ম্যাজিস্ট্রেটরা এই আইন কার্যকর করতেন– যদিও অন্যায়ের শাস্তি দেবার ক্ষমতা তাদের

ছিল না; তা কেবল ঈশ্বরই দিতে পারেন (রোমীয় ১৩:৪)। অন্যায়কারীকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে যিহূদী বিচারকেরা এই নির্দেশনা অনুসরণ করতেন; দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে কেউ যেন এরকম অন্যায় কাজ না করে, সেজন্য তারা শাস্তি কার্যকরে ছিলেন বদ্ধ পরিকর। 'যদিও চোখের বদলে চোখ কিংবা দাঁতের বদলে দাঁত'– এই নির্দেশনা অন্যায়কে প্রশমিত করতে সক্ষম হয়নি। তারপর আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যায়ের মাত্রা বিবেচনায় টাকার বিনিময়ে শাস্তি থেকে ছাড় পাওয়া যেত। যদিও খুনীকে টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দেবার ক্ষেত্রে পরিষ্কার নিষেধাজ্ঞা ছিল (গণনা ৩৫:৩১)।

কিন্তু যিহূদী শিক্ষকেরা অপরাধীর প্রতি কোন করুণা পোষণ করতে যেন অপারগ ছিল; তারা উপযুক্ত শাস্তি বিধানে খুবই তৎপর হতো; এমনকি সেই অপরাধী নিজেদের কেউ হলেও। অপরাধীকে শাস্তি প্রদানে তাদের উৎসাহের কমতি না থাকলেও অপরাধ কিন্তু কমেনি। অবশ্য তাদের ওপর অপরাধীদের আস্থা কিংবা শ্রদ্ধা কোনওটাই ছিল না। এমনকি রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে থাকাকালে যিহূদীরা যখন রোমান ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা বিচারিত হচ্ছে, তখনও তারা পূর্বেকার মানসিকতা ধরে রেখেছিল।

এখন কেউ কাউকে আঘাত করলে পৃথিবীর নিয়মানুযায়ী তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের মুখোমুখি হতে হয়; এবং ম্যাজিস্ট্রেট তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে থাকেন। শাস্ত্রে আমরা এক বিচারকের বিষয়ে দেখি যিনি ঈশ্বরকে ভয় করতেন না এবং মানুষকে গ্রাহ্য করতেন না; তবুও গরীব বিধবার পক্ষে রায় দিয়ে ন্যায়বিচার করেছিলেন (লূক ১৮:২, ৩)। প্রতিশোধের বিষয়ে যিহূদীদের কাছে যে আদেশটি দেওয়া হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিল অপরাধকে নিরুৎসাহিত করা, নির্দোষ মানুষের প্রাণ রক্ষা করা, নিরাপত্তা বিধান।

খ. কিন্তু খ্রীষ্ট এখানে বললেন সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। তিনি আঘাতের বদলা নিতে নিষেধ করলেন। তার বদলে আঘাতকারীর প্রতি ভালবাসা দেখিয়ে ক্ষমা করে দিতে নির্দেশ দিলেন। এর দ্বারা এখানে খ্রীষ্টের বিনম্রতা ফুটে উঠেছে। নতুন নিয়মের শিক্ষাই এমন– আঘাতের বদলে ভালবাসা এবং শুধুই ক্ষমা।

খ্রীষ্ট এখানে দু'টি বিষয়ে শিক্ষা দিলেন,

১. আমরা প্রতিশোধপরায়ণ হব না (৩৯ পদ)– তোমাদের বিরুদ্ধে কেউ খারাপ ব্যবহার করলে তোমরা তার বিরুদ্ধে কিছুই কোরো না। আমাদের ওপর যে আঘাতই আসুক না কেন তার প্রতিউত্তর করা যাবে না। কারণ কাউকে শাসন করবার ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই (রোমীয় ১৩:২); এক্ষেত্রে নিজেকে রক্ষার ব্যাপারে প্রদত্ত আদেশটি লঙ্ঘিত হয় না। উপরন্তু আমরা এর দ্বারা আমাদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার বিধান করতে সক্ষম হই। প্রতিহিংসা পরায়ণতার মাধ্যমে যেটি সম্ভব হয় না। যারা আমাদের ওপর অন্যায় করে তাদের প্রতি আমাদের ক্ষমার মনোভাব প্রসারিত করা উচিত। তাদেরকে মন থেকেই ক্ষমা করে দিতে হবে (হিতোপদেশ ২০:২২; ২৪:২৯; ২৫:২১,২২; রোমীয় ১২:৭)। প্রতিশোধের নিয়মকে আমাদের ভালবাসায় মথিত করতে হবে। কেউ আমাদের আঘাত করলে, তার প্রতিদানে প্রতিহিংসা পরায়ণ না হয়ে আমরা তাকে আমাদের খ্রীষ্টীয় ভালবাসা দেখাব। এর ফলে সবাই বুঝতে পারবে যে, আমরা খ্রীষ্টের অনুসারী। আর তা না করলে অর্থাৎ আঘাতের প্রতিদানে আঘাত করলে তা না কমে বাড়তে শুরু করবে এবং এক পর্যায়ে তা বড় আকার ধারণ করবে। তাই, শুরুতেই অপরাধীকে ক্ষমা করে দিলে তা আর বৃদ্ধি পায় না; সেখানেই থেমে যাবে। কারণ পাল্টা আঘাত করে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লে

কে আগে মেরেছে তা প্রমাণ করা যেমন কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি তা খ্রীষ্টের আদেশের বিরুদ্ধাচরণের বিষয়টিও প্রকাশ্যে নিয়ে আসে।

খ্রীষ্ট যে আমাদের কেবল প্রতিশোধ নিতে নিষেধ করেছেন তা নয় বরং তিনি আমাদের তাদের প্রতি ভালবাসার কাজ দেখাতে পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছেন।

(১) 'যে কেউ তোমাকে ডান গালে চড় মারে তাকে অন্য গালটিও পেতে দিয়ো।' খ্রীষ্ট যে কেবল আঘাতের প্রতি উত্তর করতে নিষেধ করেছেন তা নয়, উপরন্তু তার প্রতি আরও বিনম্রতা প্রদর্শন করতে বলেছেন। আমাদের যদি কেউ এক গালে চড় মারে তবে আমরা যেন আরেকটি চড় খাবার জন্য প্রস্তুত হই; তবুও যেন কোন মতেই প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে না উঠি (২ করিন্থীয় ১১:২০)। তার বদলে আমরা যেন তাকে খ্রীষ্টের ভালবাসায় সিক্ত করে তার কাছে (এমনকি যারা তা প্রত্যক্ষ করছে) নিজেদের পরিচয় তুলে ধরি। তাহলে বিষয়টি তৎক্ষণাৎই মীমাংসা হয়ে যাবে। আর এই আঘাতও তো তেমন জোরদার নয়; শুধু তো একটা চড়ই। তাই তাকে ক্ষমা করে দিন; এবং যা হয়েছে তা ভুলে যান। তাহলেই বুঝতে হবে আপনি জ্ঞানীর মতো কাজ করলেন। তা দেখে কেউ হাসলেও কিছু যায় আসে না; প্রকৃত অর্থে যারা জ্ঞানী তারা কিন্তু আপনার এই কাজকে ঠিকই মূল্যায়ন করবে; খ্রীষ্টের অনুসারী হিসেবে আমাদের তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত। যদিও তিনি ইস্রায়েলের বিচারক ছিলেন কিন্তু তারপরও তিনি আঘাতের প্রতি উত্তর করেন নি (মীখা ৫:১)। আঘাতের পাল্টা উত্তর না দিয়ে আরও আঘাতের প্রতীক্ষা করলে কী হবে– সে বিষয়ে মোটেও ভাবিত হবেন না; আপনার সুরক্ষা বিধানে ঈশ্বর তো রয়েছেনই। আঘাতের বিপরীতে বিনম্রতা প্রদর্শন করলে আর কোন আঘাত না-ও আসতে পারে; এমনও হতে পারে এই ঘটনায় কারও মন পরিবর্তিত হল; এ ছাড়া আঘাতকারীকে বিনম্রতা, প্রেম প্রদর্শন করলে আমরা তার মাথায় জ্বলন্ত কয়লা গাদা করে রাখি (হিতোপদেশ ২৫:২২)। আমরা যদি খ্রীষ্টের জন্য কষ্ট, লজ্জা সহ্য করি তবে নিশ্চিতভাবেই তিনি আমাদের পুরস্কৃত করবেন।

(২) 'যে কেউ তোমার কোর্তা নেবার জন্য মামলা করতে চায় তাকে তোমার চাদরও নিতে দিয়ো' (৪০ পদ)। এটা মানা সত্যিই কঠিন। মনে রাখুন, অপরাধ করলে তার শাস্তি বিধানে যে কোর্ট রয়েছে সেখানেও অনেক সময় আমাদের হয়রানীমূলক মামলা দ্বারা অপদস্থ করার চেষ্টা করা হতে পারে। কিন্তু সে সময় যেন আমরা ভীত না হই (উপদেশক ৫:৮), বরং এক্ষেত্রে যেন আমরা তার চাহিদার অতিরিক্ত দিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকি। যদি আমরা তাকে আমাদের 'চাদর' দিই তবে আমাদের প্রতিপক্ষ ঝামেলা পাকাবার কোন সুযোগ পায় না। আমরা যেন আমাদের প্রতিপক্ষকে সমস্যা জিইয়ে রাখার সুযোগ না দিই। বৃহৎ স্বার্থ রক্ষার জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করাও ভাল। কারণ এর ফলে আমরা আমাদের পরিবারকে আরও বড় কোন ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে সমর্থ হই এবং অন্যের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিষয়টি নিশ্চিত করি। একটা চাদর কিনে নিতে খুব বেশি পয়সা খরচ হয় না; মামলায় জড়িয়ে উকিলের পেছনে টাকা ঢালার চেয়ে ক্ষুদ্র ত্যাগেও সন্তুষ্ট থাকা প্রয়োজন।

(৩) 'যে তোমাকে তার বোঝা নিয়ে এক মাইল যেতে বাধ্য করে, তার সঙ্গে দুই মাইল যেয়ো' (৪১ পদ)। খ্রীষ্টের শিক্ষা মেনে চলতে গিয়ে একথা ভাববেন না যে, 'আমি যদি বাধ্য না হতাম তবে তা করতে অস্বীকৃতি জানাতাম;' বরং একথা বলুন, 'কোন

ঝগড়ার যেন উদ্ভব না হয় সেজন্য আমি খুশিমনেই তা করতে রাজি'। নিজের মর্জিমতো চলে পাপ করার চেয়ে খ্রীষ্টের কথামতো অন্যের চালিত হওয়া অনেক আনন্দের। যদিও যিহূদী শিক্ষকেরা এক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করতো। তারা শিক্ষা দিত যে, ঈশ্বরের লোকদের সরকারের অধীনে চাকরি করা মূর্খতার নামান্তর এবং এতে করে ঈশ্বরের ব্যবস্থার প্রতি যথাযথ সম্মান দেখানো হয় না। কিন্তু খ্রীষ্ট এখানে আরও এক কদম সরে গিয়ে তাঁর শিষ্যদের বাধ্যতামূলক কাজের ক্ষেত্রেও আপত্তি জানাতে নিষেধ করলেন। সারকথা হচ্ছে, খ্রীষ্টানরা নিশ্চিতভাবেই কোন বিতর্কে জড়িয়ে পড়বে না; তারা সমস্যাকে অঙ্কুরেই মিটিয়ে ফেলতে আন্তরিক হবে; এমনকি তা করতে গিয়ে যদি দৈহিক কিংবা আর্থিক ক্ষতিও স্বীকার করতে হয় তবুও তা করা প্রয়োজন। মোটকথা খ্রীষ্টের অনুসারীদের মোটেই প্রতিশোধপরায়ণ হওয়া চলবে না; এতে করে আমরা নিজেদের জাগতিক ও আত্মিক জীবন রক্ষা করতে সমর্থ হই; কারণ আমাদের বিনম্রতা আঘাতকে নিরস্ত করে; কেউ যদি বলে যে, সম্মান-মর্যাদা এসব তো শারীরিক আঘাতের মতো ব্যাপার নয়, তবে নিশ্চিত জেনে রাখুন, সে স্বর্গের প্রবেশাধিকার হারাবে।

২. খ্রীষ্ট আমাদের উদার হতে বলেন (৪২ পদ)। প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসায়, তার আঘাতের প্রতিউত্তর না করে, উল্টো সে যদি কিছু চায় তবে তাকে তা দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

(১) আমাদেরকে উদার হতে হবে। 'যে তোমার কাছে কিছু চায় তাকে তা দিয়ো'। সামর্থ্য থাকলে আমাদের প্রতিবেশীর চাহিদা মেটানো উচিত। বিশেষ করে যারা গরীব তাদের দরকারের সময় আমরা যেন সাহায্য করি। কারণ এর ফলে ঈশ্বর আমাদের উন্নত করেন (গীত ১১২:৫)। অপ্রয়োজনে খরচ করার চেয়ে তা কারও প্রয়োজনের সময়ে ব্যবহৃত হওয়া ভাল। ঈশ্বর চান যেন আমরা আমাদের গরীব ভাইদের জন্য সবসময় আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে রাখি।

(২) আমরা ধার দিতে প্রস্তুত থাকব। কারণ এর দ্বারা অনেকের উপকার হয়। সাধারণত ধার দেওয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা হয়, ধারপ্রার্থীর সততা, সে কতটা পরিশ্রমী, তার কোন স্থায়ী ঠিকানা আছে কি না ইত্যাদি। কিন্তু ফেরত পাব কিনা– এই প্রত্যাশা না করে আমাদের কেউ ধার চাইলে তা দিতে সম্মত হওয়া উচিত। অনেকে আছে, যারা লজ্জায় ধারের কথা বলতে পারে না; আমরা যদি তার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জেনে থাকি তবে আমাদের উচিত তাকে ধার দিয়ে সাহায্য করা। ধার দেওয়া হচ্ছে দয়ার কাজ। আর তা করার জন্যই ঈশ্বর আমাদের আহবান করেছেন। তাই, আমাদের তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ সহভাগিতা রেখে অবিরতভাবে দয়ার কাজ করে যাওয়া উচিত।

মথি ৫:৪৩-৪৮

আমরা এখানে খ্রীষ্টের কাছ থেকে প্রতিবেশীকে ভালবাসার বিষয়ে ঈশ্বর যে আদেশ দিয়েছিলেন তার সত্যিকারের ব্যাখ্যা পাই।

ক. যিহূদী শিক্ষকেরা প্রতিবেশীকে ভালবাসার ব্যাপারে ঈশ্বরের আদেশের যে ভুল ব্যাখ্যা করেছিল তা লক্ষ্য করুন (৪৩ পদ)। ঈশ্বর বলেছিলেন, 'তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাস।' কিন্তু যিহূদী শিক্ষকেরা 'তোমার প্রতিবেশী' বলতে যারা তাদের প্রতি আন্তরিক,

স্বদেশের, স্বধর্মের লোকদের দিকে নির্দেশ করতো। তারা যে শুধু প্রতিবেশী নির্বাচনের ক্ষেত্রেই সঙ্কীর্ণ মনের পরিচয় দিয়েছিল তা নয় উপরন্তু তারা ঈশ্বরের আদেশের সাথে যোগ করেছিল, 'নিজের শত্রুকে ঘৃণা কর।' শুধু এই ধারণা প্রসব করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি; বরং তারা একে নিয়মে পরিণত করেছিল। ঈশ্বরের আদেশকে সম্পূর্ণ ভিন্নখাতে নিয়ে যেতেও তারা কুণ্ঠিত হয়নি (যাত্রা ২৩:৪, ৫; দ্বিতীয় বিবরণ ২৩:৭)। ঈশ্বর তাদের কখনো এমনটা করতে বলেন নি; তিনি বরং বলেছেন যেন তারা শত্রুর সম্পদের প্রতিও যত্নবান হয়। হ্যাঁ, এটা সত্যি যে, ঈশ্বর যিহূদীদের কনানের সাতটি জাতিকে ধ্বংস করার জন্য পাঠিয়েছিলেন এবং তাদের সাথে কোন সমঝোতা করতেও নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু সেখানে একটি সুনির্দিষ্ট কারণ ছিল; আর তা হচ্ছে ইস্রায়েলের জন্য পৃথক আবাসস্থল তৈরি করা। কিন্তু যিহূদী শিক্ষকেরা সব ক্ষেত্রেই শত্রুদের ঘৃণা করার যে মতবাদকে নিয়মে পরিণত করেছিল তা সত্যিই ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করে। নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় তারা ঈশ্বরের আদেশকে ভিন্ন দিকে ধাবিত করতেও কুণ্ঠা বোধ করেনি।

খ. কিন্তু খ্রীষ্ট সম্পূর্ণ ভিন্ন শিক্ষা দিলেন; তিনি বললেন, আমরা যেন আমাদের শত্রুদেরও ভালবাসি (৪৪ পদ)। একমাত্র ভালবাসার মাধ্যমেই আমরা আমাদের শত্রুর কাজ থামিয়ে দিতে পারি। শত্রুর প্রতি ঘৃণার মনোভাব পুষে রাখলে তা ধারাবাহিক শত্রুতারই জন্ম দেয়। যদি আমরা শত্রুকে ক্ষমা করতে না পারি তবে আমরা মানসিক শান্তি লাভে ব্যর্থ হই। শুধু তাই নয়, এতে করে ঈশ্বরের অনুগ্রহও আমাদের ছেড়ে চলে যায়। মনে রাখুন, শত্রুকে ভালবাসা প্রত্যেক খ্রীষ্টানর অবশ্য কর্তব্য। এই কাজের ফলে মনের অশান্তি দূর হয়; পাপকে আমরা অবশ্যই ঘৃণা করব; কিন্তু আমাদের শত্রু, সে যত খারাপ প্রকৃতিরই হোক না কেন তাকে ভালবাসতে হবে। এর মাধ্যমে আমি সহিষ্ণু হয়ে উঠি; বিনম্রতায় নিজেকে সাজাই এবং অন্যদের প্রতি দয়ার মনোভাব দেখাতে সমর্থ হই। শত্রুর জন্য আমাদের সহানুভূতি, তার ভাল করার ইচ্ছা থাকা প্রয়োজন। এখানে বলা হয়েছে–

১. আমরা যেন শত্রুর সাথে ভাল ব্যবহার করি। শত্রুকে 'তোমার মঙ্গল হোক' এই কথা বলার মাধ্যমেই আমরা তার শত্রুতার প্রতিউত্তর করি। শত্রুতার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ না করে, তার সাথে নম্র ব্যবহার করা প্রয়োজন। শত্রুর আড়ালে তার বিষয়ে মন্দ কথা না বলে তার সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করতে হবে। এবং দরকারের বেশি বলা থেকে নিজেকে সংযত রাখতে হবে (১ পিতর ৩:৯)। যার জিহবা দয়ার আদেশের অধীন সে অবশ্যই শত্রুর বাজে কথার বিপরীতে ভাল কথা উপহার দিতে সক্ষম হয়।

২. শত্রুর সবসময় ভাল করা উচিত 'যারা তোমাদের ঘৃণা করে তাদের প্রতি ভাল কাজ কর' এবং তা ভাল কথা উপহার দেওয়ার চেয়ে কার্যকর বলে প্রমাণিত হবে। শত্রুর প্রতি ভালবাসার এটি সত্যিকারের বহিঃপ্রকাশ। শত্রুর প্রতি, তার পরিবার, নামের প্রতি সবসময় আমাদের ভাল আচরণই করা উচিত। এর দ্বারা আমাদের দয়ার মনোভাব প্রকাশ পায়। আর্চবিশপ ক্রেনমারের সম্পর্কে এই কথা বলা হতো যে, যারা তার ভাল চাইতো তাদের চেয়ে যারা তার বিরুদ্ধাচরণ করতো তাদেরই তিনি বেশি কাছের বলে গণ্য করতেন।

৩. শত্রুদের জন্য আমাদের প্রার্থনা করতে হবে। 'যারা তোমাদের জুলুম করে তাদের জন্য প্রার্থনা কোরো'। মনে রাখুন, (১) এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়; ঈশ্বরের ভাববাদীরাও নির্যাতনের বিপরীতে তা করেছিলেন; এমনকি স্বয়ং খ্রীষ্টও তা করেছিলেন। (২) আমরা যখন কোন নির্যাতনের সম্মুখীন হই তখন আসলে আমাদের সামনে খ্রীষ্টের আদর্শ

দেখানোর সুযোগ এসে যায়; শত্রুর জন্য প্রার্থনা করার মাধ্যমে আমরা নিজেদের জীবনে খ্রীষ্টের ভালবাসার উপস্থিতির বিষয়টিই প্রমাণ করি। এর ফলে আমাদের শত্রু আমাদের প্রকৃত পরিচয় লাভ করে। তাই, আমরা অবশ্যই তার জন্য প্রার্থনা করব, কারণ সে জানে না যে সে কত গর্হিত কাজ করছে; সে তার আত্মিক জীবন সম্পর্কে অজ্ঞানতার মাঝে রয়েছে। ফলে, তার কাজ তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, নিজের জন্য সে কী ধ্বংস ডেকে আনছে– সে সম্পর্কেও সে উদাসীন থাকে। তার প্রতি নম্রতাপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে আমরা তাকে শান্তির পথে আসতে আমন্ত্রণ জানাই। সত্যিকারের ভালবাসার এ এক অনুপম দৃষ্টান্ত। পৃথিবীর অনেক মহান দার্শনিক, শাসকও শত্রুদের প্রতি ঘৃণার মনোভাব প্রকাশ ও ব্যক্ত করতেন। প্লুটার্ক তার সংক্ষিপ্ত নীতিশাস্ত্রে অভিজাত ব্যক্তিদের ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে বলতে গিয়ে ক্লিওমেনসের প্রসঙ্গ টানেন। 'একজন মহান রাজার আচরণ কেমন হওয়া উচিত'– এই প্রশ্নের জবাবে ক্লিওমেনস বলেন, 'বন্ধুর প্রতি ভাল ব্যবহার করতে হবে, আর শত্রুকে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে হবে'। বহুল প্রশংসিত এই মন্তব্যের পাশে প্লুটার্ক লেখেন, 'শত্রুকে বন্ধু বলে কাছে টেনে নেওয়াটা তো তাহলে আরও মহৎ কাজ।' খ্রীষ্ট আমাদের স্পষ্টতই তাই করতে বলেন– শত্রুকে ভালবাস।

কেন আমরা শত্রুদের ভালবাসব এখানে তার দু'টি কারণ বিবৃত হয়েছে।

(ক) যেন সবাই বুঝতে পারে যে, ঈশ্বরই আমাদের পিতা; 'যেন লোকে দেখতে পায় তোমরা সত্যিই তোমাদের স্বর্গীয় পিতার সন্তান।' আমরা কি আমাদের পিতার ভালবাসাকে অনুকরণ করতে পারব? শত্রুকে ভালবাসার মাধ্যমে আমাদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ভালবাসাই প্রকাশিত হয়; আমরা যদি তাঁর পবিত্রতার স্বভাব ও ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে ধারণ করতে পারি তবেই আমরা শত্রুকে ভালবাসা দিতে সমর্থ হই। ঈশ্বর মহান; মানুষের ওপর আশীর্বাদ ঢেলে দিতে গিয়ে তিনি কারও প্রতি বৈষম্য করেন না; 'তিনি ভাল-মন্দ সকলের ওপর সূর্য ওঠান এবং সৎ-অসৎ লোকদের ওপর বৃষ্টি দেন' (৪৫ পদ)।

মনে রাখুন, প্রথমত, সূর্যালোক ও বৃষ্টি পৃথিবীর জন্য ঈশ্বরের অশেষ অনুগ্রহ। যে সূর্য আলো ছড়ায় তা তাঁরই সৃষ্টি; তিনিই বৃষ্টিকে পাঠান। কি বৃষ্টি, কি সূর্যালোক– এগুলো ঈশ্বরই নিয়ন্ত্রণ করেন। দ্বিতীয়ত, মানুষের সাধারণ দোষগুলোকে ক্ষমা করে দিলে অবশ্যই আমাদের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের ভালবাসা প্রকাশিত হয়; কিন্তু আমরা যদি আমাদের শত্রুর মারাত্মক অপরাধও ক্ষমা করে দিতে পারি তবে ঈশ্বর অনেক বেশি সন্তুষ্ট হন। পৃথিবীর দৃষ্টিতে ঘৃণিত ব্যক্তিটি আমাদের কাছ থেকে অবশ্যই অন্যদের চেয়ে ভাল ব্যবহার পাবে। খ্রীষ্টের অনুসারী হিসেবে এমনটাই আমাদের করা উচিত। তৃতীয়ত, ঈশ্বর তাঁর অসীম মমতায় ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ কাউকেই তাঁর দয়া থেকে বঞ্চিত করেন না; তাই আমাদেরও 'কে ভাল,' 'কে খারাপ' তা বিচার করার দরকার নেই। আমরা আমাদের ভেতরে থাকা ভালবাসার শক্তিতে শত্রুকে ভালবাসব; কারণ আমাদের মাঝে ধার্মিকতার সূর্য বাস করেন। চতুর্থত, খারাপ মানুষেরাও অন্যদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান পেতে চায়; যদিও তারা নিজেরাই অন্যদের নির্যাতন করে এবং নিজেদের মন্দ কাজের দ্বারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মেতে ওঠে, তবুও তারা অন্যের কাছ থেকে বিরুদ্ধাচরণ পেতে উৎসাহী হয় না; মানবপ্রকৃতির এ এক অদ্ভুত রহস্য। যারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যায়, তাঁর নামের অসম্মান করে তাদের প্রতিও তিনি সমানভাবে তাঁর অনুগ্রহের হাত প্রসারিত করে থাকেন। যদিও একবার তিনি মিশরীয়দের সূর্যের আলো থেকে বঞ্চিত করেছিলেন; এবং ইস্রায়েলীয়দের গ্রামে পর্যাপ্ত

আলো দিয়েছিলেন; তবুও একথা তো সত্যি যে, তিনি তাঁর প্রেমের কারণেই প্রতিদিন সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করছেন না। পঞ্চমত, ঈশ্বরের দয়া যেভাবে সৎ-অসৎ উভয়কে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে তেমনি আমাদেরও শত্রুকে ভালবাসা উচিত। এর ফলে আমরা ক্রোধের ওপর জয়লাভ করতে সমর্থ হই এবং শত্রুকে বুঝিয়ে দিই যে, আমাদের মানসিকতা পুরোপুরি ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন। ষষ্ঠ ত, শত্রুকে ভালবাসার ফলে যারা ঈশ্বর সম্পর্কে জানে তারা বুঝতে সমর্থ হবে যে, আমরা তাঁরই সন্তান; এবং তাঁরই স্বভাব আমাদের হৃদয়ে বাস করছে।

(খ) যেন আমাদের ভালবাসা অন্যদের চেয়ে বেশি বলে প্রমাণিত হয় (৪৬, ৪৭ পদ)। মানবপ্রকৃতির একটি স্বাভাবিক আচরণ হচ্ছে বন্ধুকে ভালবাসা। অর্থাৎ যে তোমার প্রতি ভাল ব্যবহার করে তাকেও ভাল ব্যবহার দাও। কর-আদায়কারীদের যিহূদীরা ঘৃণা করলেও তাদের চেয়ে নিজেরা অধিকতর ভালবাসায় নিজেদের গাঁথতে পারেনি; কারণ কর-আদায়কারীরাও তাদের প্রতি ভাল আচরণকারী কিংবা সঠিকভাবে করদাতার সাথে ভাল ব্যবহার করতো। সমাজে তাদের বলার মতো গ্রহণযোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও তারা যদি তাদের উপকারীর প্রতি ভাল আচরণ প্রদর্শন করতে পারে, তবে নিজেদের ধার্মিকতা প্রমাণে আমাদের কি আরও বেশি কিছু করা উচিত নয়? স্বার্থপরের মতো আচরণ না করে আমরা যদি অন্যের বিষয়ে ভাবিত হই; অন্যকে সাহায্য করতে এগিয়ে যাই এমনিক শত্রুকেও ভালবাসি, তবেই আমাদের আত্মিক জীবন পরিপক্ক হবে। দ্বিতীয়ত, আমরা যেহেতু শত্রুকে ছাড়িয়ে যেতে চাই, ধার্মিকতায় তাকে হারিয়ে দিতে চাই, সেহেতু তাকে ভালবাসা উচিত। কিন্তু আমরা যদি তা না করে ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকদের অনুসরণ করি তবে আমরা কর-আদায়কারীর কাতারেই পড়ে থাকব; ছাড়িয়ে যাওয়া আর হবে না।

মনে রাখুন, খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস মানবতাবাদের চেয়েও বেশি কিছু। 'অন্যের চেয়ে আমরা বেশি কী করছি'– এটা খুবই মারাত্মক একটা প্রশ্ন। আমরা শাস্ত্র সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে বেশি জানি; ঈশ্বরের বিষয়ে আমরা অন্যদের চেয়ে বেশি বলি ও শিক্ষা দিই এবং ঈশ্বর আমাদের নিজের সন্তানের মর্যাদা দিয়েছেন; স্বভাবতই তিনি আমাদের কাছ থেকে অন্যদের চাইতে বেশি ভাল কাজ প্রত্যাশা করবেন। আসুন নিজেকে প্রশ্ন করি, খ্রীষ্টের অনুসারী হিসেবে আমরা কি এই পৃথিবীর মানুষকে ধার্মিকতায় ছাড়িয়ে যেতে পেরেছি? ভালবাসায় হারিয়ে দিতে পেরেছি আমাদের শত্রুকে? অন্যরা যখন ভালর বিপরীতেই ভাল দিয়ে যাচ্ছে সেখানে কি আমরা খারাপের জবাবে ভাল কিছু উপহার দিতে পেরেছি? যারা খ্রীষ্টের পরিচয় পায়নি তারা তাদের নিজেদের পথ, মত, দলের লোকদের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল হয়ে থাকে; কিন্তু আমরা যারা তাঁর পরিচয় পেয়েছি তারা অবশ্যই শত্রুকেও ভালবাসব। তা না হলে, খ্রীষ্টীয় হিসেবে আমাদের যে পুরস্কার পাবার কথা তা আমরা হারাব; কারণ আমরা তো এক কর-আদায়কারীদেরই ছাড়িয়ে যেতে পারিনি। মনে রাখুন, যে প্রথম হতে চায় তাকে অবশ্যই অন্যের চেয়ে বেশি পরিশ্রম করতে হবে।

পরিশেষে, আমাদের ত্রাণকর্তা এই কথা বলে শত্রুকে ভালবাসার বিষয়ে তাঁর শিক্ষার উপসংহার টানলেন, 'তোমাদের স্বর্গীয় পিতা যেমন খাঁটি তোমরাও তেমনি খাঁটি হও' (৪৮ পদ)। অর্থাৎ (ক) ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে আমাদের তাঁর গুণাবলি দিয়ে নিজেদের সাজাতে হবে। মনে রাখুন, প্রত্যেক খ্রীষ্টানকে ঈশ্বরের পবিত্রতায় ও অনুগ্রহে খাঁটি হওয়ার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা উচিত (ফিলিপীয় ৩:১২-১৪)। ঈশ্বর যেমন পবিত্র আমাদেরও

তেমনি পবিত্র জীবন যাপন করতে আগ্রহী হতে হবে (১ পিতর ১:১৫, ১৬)। (খ) খ্রীষ্ট যে দয়ার কাজের কথা নির্দিষ্ট করে বলেছেন সেই মতো আমাদের শত্রুকেও ভালবাসা উচিত (লূক ৬:৩৬)। শত্রুর আঘাতের প্রতিউত্তর না করে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া এবং কীসে তার ভাল হয় তা করতে উদ্যোগী হওয়া তো ঈশ্বরের গুণেরই পরিচায়ক। এর দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সেই খাঁটিত্ব অর্জনের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে সমর্থ হই। স্বর্গীয় পুরস্কার লাভের জন্য আমাদের সমস্ত কাজে, কথায় ঈশ্বরের নির্দেশনা ও পরিচালনা মেনে চলা প্রয়োজন। তাঁর সাহায্যই পবিত্র ও খাঁটি জীবন যাপনে আমাদের শক্তি।

মথি লিখিত সুসমাচার
অধ্যায় ৬

গত অধ্যায়ে খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকদের ভ্রান্ত শিক্ষা ও মতবাদ সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়ে তা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিশেষত তাদের করা ব্যবস্থার ভুল ব্যাখ্যা থেকে; যাকে তিনি 'ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকদের খামি' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন (১৬:১২ পদ)। ধর্মীয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকরা যে ভণ্ডামিকে প্রশ্রয় দিয়েছিল তার আঁচ তাদের জীবনাচরণেও এসে লেগেছিল। ভণ্ডামিপূর্ণ ধর্মচর্চার মাধ্যমে তারা যে গুরুতর অন্যায় কাজটি চালিয়ে যাচ্ছিল তার কাছে তাদের ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার ও শিক্ষাদানের কাজটিও কেমন ম্লান হয়ে যায়। যদিও তারা তাদের ধার্মিকতার ব্যাপারে যথেষ্টই গর্বিত ও নিশ্চিত ছিল; তবুও একথা তো সত্য যে, তাদের লোকদেখানো ধর্মকর্মের মূল লক্ষ্য ছিল জাগতিক প্রশংসা ও সম্মানের উঁচু আসন! সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে, তারা একে পাপ বলেও গণ্য করতো না; ফলে নিজেদের ভণ্ডামির জন্য অনুতপ্ত হওয়ার কোন তাগিদও তাদের মাঝে লক্ষ্য করা যেত না। ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে অর্থহীন ধর্মকর্মে নিয়োজিত হবার মাধ্যমে ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকরা জাগতিক মোহ-লালসার কাছে নিজেদের ধার্মিকতাকে বিকিয়ে দিয়েছিল। ফলে, তাদের শিক্ষা শুনে ও জীবন যাপন প্রত্যক্ষ করে লোকেরা স্বভাবতই বিভ্রান্ত হয়েছিল। অথচ জাগতিক যশ-খ্যাতি, সম্মান-সম্পদের প্রলোভনকে পাশ কাটিয়ে ধর্মীয় শিক্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক পবিত্র জীবন যাপন করা-টাই সঙ্গতিপূর্ণ। খ্রীষ্ট তাই এখানে ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকদের ভণ্ডামিপূর্ণ ধর্মচর্চার দিকটি উন্মোচন করে তাঁর শিষ্যদের এ থেকে দূরে থাকতে সতর্ক করে দিলেন,

(১) ভণ্ডামির বিষয়ে; আমরা যেন দান দেবার ক্ষেত্রে (১-৪ পদ), প্রার্থনা (৫-৮ পদ) এবং উপবাস রাখবার ক্ষেত্রে (১৬-১৮ পদ) ভণ্ডদের মতো না করি। খ্রীষ্ট আমাদের সঠিক নিয়মে প্রার্থনা (৯-১৩ পদ) এবং অন্যের দোষ ক্ষমা করার বিষয়ে শিক্ষা দিলেন (১৪, ১৫ পদ)।

(২) জগতমুখী ভাবনার বিষয়ে; আমাদের কাজে যেন ভণ্ডামির লেশ না থাকে (১৯-২৪) এবং জাগতিক প্রয়োজনের ব্যাপারে আমরা যেন অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে না উঠি (২৫-৩৪) সেই বিষয়েই খ্রীষ্ট এখানে শিক্ষা দিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অনেক ভাল খ্রীষ্টানর মাঝেও এরূপ আচরণ লক্ষ্য করা যায়।

মথি ৬:১-৪

হৃদয়ের পবিত্রতা বজায় রাখার মাধ্যমে আমরা ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকদের চেয়ে বেশি কিছু করতে সমর্থ হই। খ্রীষ্ট আমাদের এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমরা আমাদের ধার্মিকতাকে কেবলমাত্র ঈশ্বরের সম্মুখে রাখি এবং মানুষের প্রশংসা লাভের আশায় লোকদেখানো ধর্মকর্ম থেকে নিজেদের বিরত রাখি; কারণ তা করলে আমরা 'পবিত্র জীবন' ও 'ঈশ্বরের নৈকট্য'- দু'টোই হারাই। মন থেকে উৎসারিত সর্বপ্রকার পাপকে

এড়িয়ে চলার মাধ্যমে আমরা আমাদের হৃদয়কে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পবিত্র রাখতে সক্ষম হই; যেহেতু ক্ষমার মনোভাব, ত্যাগের মানসিকতা, বিনম্রতা আমাদের চরিত্রে ইস্পাতসম দৃঢ়তা এনে দেয়। ফলে আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রশংসা ও সম্মান লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হই। ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে সত্যিকারের উপাসনা চান; তিনি চান যেন আমরা ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকদের খামি থেকে বিযুক্ত থাকি (লূক ১২:১) ও কোন ধরনের ভণ্ডামির দারস্থ না হই। ঈশ্বরের উদ্দেশে দান, প্রার্থনা ও উপবাস– খ্রীষ্টানদের তিনটি তাৎপর্যপূর্ণ দায়িত্ব; আরবীয়রা একে ব্যবস্থার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। দান, প্রার্থনা ও উপবাসর মাধ্যমে ঈশ্বরের উদ্দেশে আমাদের উপাসনা তিনটি পৃথক জায়গা থেকে পূর্ণাঙ্গতা পায়; যেমন– প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা আত্মায় তাঁর সাথে একীভূত হই; উপবাসর মাধ্যমে দৈহিকভাবে তাঁর প্রশংসা ও গৌরব করতে সচেষ্ট হই এবং দানের মাধ্যমে আমাদের সম্পদ দ্বারা তাঁর উপাসনায় নিবিষ্ট হই। অর্থাৎ প্রার্থনা, উপবাস ও দানের মাধ্যমে আমরা আমাদের আত্মা, দেহ ও সম্পদকে ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদন করি; যেন আমাদের সবকিছুই তাঁর উপাসনায় ব্যবহৃত হয়। এভাবে আমরা যে কেবল মন্দতা থেকে নিজেদের বিরত রাখতে সমর্থ হই তা নয় বরং আমাদের ভাল কাজের মাধ্যমে সেই মন্দতা আমাদের কাছে পরাজিত ও অপসৃত হয়।

খ্রীষ্ট এখানে আমাদের দান দেবার ক্ষেত্রে ভণ্ডামির সংশ্রব থেকে দূরে থাকার বিষয়ে শিক্ষা দিলেন। তাঁর এই শিক্ষা আমাদের জীবনে প্রয়োগ করা প্রয়োজন; কারণ ঈশ্বরের উদ্দেশে দান দিতে গিয়ে আমরা যদি ভণ্ডামির আশ্রয় নিই, তবে তা তাঁর কাছে পাপ হিসেবে পরিগণিত হয়।

(১) এই পাপ আমাদের সহজেই বিভ্রান্ত করতে পারে; কারণ আত্মতুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে অতিমাত্রায় 'মানবীয়'। ফলে কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমরা এই পাপের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়তে পারি। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের এ সম্পর্কে সতর্ক করে দিলেন যেন আশ্চর্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে অসাধারণ সব কাজ করার সময় তারা মোটেও আত্মপ্রসাদে না ভোগে; কারণ তাদের কাজ দেখে অনেকে বিরুদ্ধাচরণ করলেও তাদেরকে প্রশংসাবচনে ভাসাবার লোকেরও অভাব হবে না। খ্রীষ্টের শিষ্যেরা যদি সেসবে কান দিয়ে বিন্দুমাত্র আমিত্বকেও নিজেদের মনে ঠাঁই দেয় তবে নিশ্চিতভাবেই শয়তানের নিয়ে আসা এই নিরীহদর্শন পরীক্ষায় তারা হেরে যাবে।

(২) আমাদের মাঝে যদি ভণ্ডামির লেশমাত্র থাকে তবে নিশ্চিতভাবেই আমরা বিপদের মাঝে আছি; কারণ তা আমাদের আত্মিক পবিত্রতাকে ধ্বংস করে দিতে বদ্ধপরিকর, ক্রিয়াশীল। ধার্মিকতাজনিত আমিত্বের কাছে আমাদের যাবতীয় ভাল কাজ, উপাসনা স্বভাবতই ঈশ্বরের কাছে অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। ফলে একে হালকাভাবে নেওয়ার কোন সুযোগ নেই; কারণ একবাটি সুগন্ধি তেলকে নষ্ট করার জন্য একটি মরা মাছিই যথেষ্ট।

লক্ষ্য করুন, এখানে দু'টি বিষয়ের প্রতি পরিষ্কার ইঙ্গিত করা হয়েছে–

ক. সামর্থ্য অনুযায়ী গরীবদের দান করা খ্রীষ্টের শিষ্যদের একটি স্বীকৃত দায়িত্ব; মোশির ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের নির্দেশনায়ও এর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন অনুবাদে 'দান' দ্বারা ধার্মিকতাকে নির্দেশ করা হয়েছে; 'সে খোলা হাতে গরীবদের দান করেছে; তার ধার্মিকতা চিরকালীন' (গীত ১১২:৯; হিতোপদেশ ১০:২)।

যিহূদীরা গরীবদের তাদের ধার্মিকতার কাজের উপলক্ষ বলে মনে করতো; কারণ সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের উপকার করার বিষয়ে শাস্ত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছিল (হিতোপদেশ ৩:২৭)। কিন্তু যিহূদীরা তাদের ধার্মিকতাকে গর্বভরে প্রকাশ করার জন্য এই কাজকে বেছে নিয়েছিল; স্পষ্টতই তারা দান দেওয়ার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যটি বুঝতে অনাগ্রহী ও ব্যর্থ হয়েছিল। রোমান ক্যাথলিকরা এরূপ দয়ার কাজকে প্রভুত মূল্য দিয়ে থাকে; যার দিকে অনেক প্রোটেস্টান্টকেও ঈর্ষার চোখে তাকাতে এবং এর প্রয়োজনীয় দিকটিকে অস্বীকার করতে দেখা যায়, 'তাদের মতবাদ তো ভ্রান্ত; তাদের কঠিন অনুশাসন জগতমুখী চিন্তা-ভাবনায় আশ্লিষ্ট। তারা দয়ার কাজ করে চাপিয়ে দেওয়া নিয়ম হিসেবে; তাদের এই চর্চা স্বতঃস্ফূর্ত নয়।' কিন্তু দয়ার কাজকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য ভ্রান্ত মতবাদ সেবীদের এই উদাহরণ কোন অজুহাত হতে পারে না। হ্যাঁ, এটা সত্য যে ঈশ্বর এবং তাঁর স্বর্গ স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমাদের এসব দানের প্রয়োজন তাঁর নেই। কিন্তু পাশাপাশি এটাও বাস্তবতা যে দয়ার কাজ ছাড়া আমরা স্বর্গে যেতে পারি না; কারণ ঈশ্বরের চোখে এটাই খাঁটি ও সত্য ধর্ম (যাকোব ১:২৭)। বিচারের দিনে তিনি আমাদের কাছ থেকে প্রাপ্য দয়ার কাজ বুঝে নেবেন। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের দানের বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে দান করাকে তাদের জন্য বাধ্যতামূলক করলেন; কারণ তিনি চাইলেন যেন তাঁর শিষ্যদের মাঝে দানের মানসিকতা গড়ে ওঠে এবং তাদের দয়ার কাজসমূহ একমাত্র ঈশ্বরকেই গৌরবান্বিত করে।

খ. দান করার ফলে আমরা ঈশ্বরের চোখে পুরস্কার লাভের যোগ্য হই; কিন্তু তিনি যদি আমাদের দয়ার কাজের মধ্যে ভণ্ডামি দেখতে পান তবে নিশ্চিতভাবেই আমরা প্রতিশ্রুত পুরস্কার পাবার অযোগ্য বলে বিবেচিত হই। সঠিক মনোভাবের দান আমাদেরকে এই পৃথিবীতেই পুরস্কৃত করে; যেমন– খোলা হাতে দান করলে আমাদের সম্পদ কমে যায় না; উপরন্তু তা আরও বেড়ে যায়; শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমে আমরা সদাপ্রভুকে ধার দিই এবং তিনি আমাদের সেই উপকারের প্রতিদান দেন (হিতোপদেশ ১১:২৪; ১৯:১৭); দান করার ফলে আমরা নিজেদের 'অভাব' থেকে দূরে রাখতে সমর্থ হই (হিতোপদেশ ২৮: ২৭; গীত ৩৭:২১, ২৫) এবং দুর্দিনে সদাপ্রভুর কাছ থেকে সুরক্ষা লাভের যোগ্য হয়ে উঠি (গীত ৪১:১, ২)। আমরা যদি সঠিক মনোভাব নিয়ে দয়ার কাজ করি তবে ঈশ্বর আমাদের শক্তি ও সম্মান বাড়িয়ে তুলে আমাদের সুনামের ভাগী করবেন (গীত ১১২:৯)। দান করার ফলে আমরা যে কেবল জাগতিকভাবে উপকৃত হই তা নয় উপরন্তু মৃত্যু থেকে পুনরায় জীবিত হবার পর আমরা এর প্রতিদান পাব (লূক ১৪:১৪); 'যেভাবে আমরা দিই সেভাবেই আমাদের প্রতিদান দেওয়া হবে'। তাই খ্রীষ্ট এখানে দান দেবার ক্ষেত্রে সঠিক মনোভাব পোষণ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

লক্ষ্য করুন,

১. দান দিতে গিয়ে ভণ্ডেরা কী রকম ছলনার আশ্রয় নিত। তারা দান দিত ঠিকই, কিন্তু তাতে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা কিংবা মানুষের প্রতি ভালবাসার লেশমাত্র ছিল না; তারা একে জাগতিক সম্মান ও গৌরব লাভের উপায় হিসেবেই গ্রহণ করেছিল। ফলে তাদের এই দয়ার কাজ যতটা না দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি থেকে কৃত তার চেয়েও বেশি সমাজের চোখে ভাল মানুষ হিসেবে নিজেদের প্রকাশ করার উদ্দেশ্য থেকে উৎসারিত। আয়োজন করে দান দেবার মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রশংসা লাভের চেয়ে সমাজে নিজেদের দানশীল, মহানুভব বলে প্রচার করতেই বেশি আগ্রহী ছিল; এবং এতে তারা সফলও হতো; কারণ

নিজেদের উদ্দেশ্য কীভাবে চরিতার্থ করতে হয় সেটা তারা ভালভাবেই জানত; এমনকি অল্প দান করেও কী করে অধিক বাহবা কুড়ানো যায় সে ব্যাপারে তারা ছিল সমানভাবে চিন্তাশীল; সৃজনশীলও বটে! মানুষের প্রশংসা লাভের আকাঙ্ক্ষা থেকে তারা সমাজগৃহ ও জনাকীর্ণ পথে দান দিত; এতে করে সহজেই অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব হতো এবং মুফতে লোকদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত বাহবাও জুটে যেত। দানকারী এবং দান কাজের প্রশংসাকারী উভয়েরই দানের সঠিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না; ফলে তাদের কাছে তা ভণ্ডামি বলেও গণ্য হতো না। মানুষের কাছে ধার্মিক বলে সমাদৃত হবার অভিপ্রায় থেকে তারা দান দেবার এই প্রক্রিয়াকে দৃঢ়ভাবেই সমর্থন করতো। যে কারণে তাদের সমাজ-ঘরে কিংবা পথের মোড়ে জড় হওয়া গরীবদের সাড়ম্বরে ভিক্ষা দিতে দেখা যেত। এমন নয় যে, দান দেবার সময় কারও উপস্থিতি আমাদের দোষী করে তোলে; বরং দান দেবার সময় আমাদের আচরণে যেন 'আমিই দিচ্ছি' এমন মনোভাব ফুটে না ওঠে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। তবে, দান দেবার ক্ষেত্রে আমাদের যতটা সম্ভব গোপনীয়তা অবলম্বন করা উচিত; ভুলক্রমেও আমরা যেন ভণ্ডদের মতো না করি। কারণ তারা বাড়িতে বসে দান দিলেও আশপাশের মানুষ জেনে যায়; গরীবদের দান নেবার জন্য তারা এএভাবে আহ্বান করে যে, চারদিকে আলোড়ন পড়ে যায়; এতে করে তাদের সমাজে নিজেদের 'দানশীল' হিসেবে মেলে ধরার যে অভিলাষ তা ঠিকই পূর্ণ হয়– 'দান দিলাম, লোকে দেখল, বাহবা পেলাম, আর কি চাই!' তাদের এই দান দেওয়া তো মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা লাভের জন্য; এর বেশি কিছু নয়।

এখন, খ্রীষ্ট ভণ্ডদের এরূপ কাজের ফল কী-তা পরিষ্কার বলে দিলেন, 'আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, ইতোমধ্যেই তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে।' প্রথম দর্শনে একে প্রতিশ্রুতি বলে মনে হলেও খ্রীষ্টের কথার মাঝে দু'টি শব্দের উপস্থিতি পুরস্কার প্রাপ্তির এই ঘটনাকে 'ভীতিকর' বলে মনে করাচ্ছে–

(১) তারা 'তাদের' পুরস্কার পেয়ে গেছে। ঈশ্বর তাদের যে পুরস্কার দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন, এই পুরস্কার সেই পুরস্কার নয়। বরং মাংসিক অভিলাষ থেকে যে পুরস্কার পেতে তারা দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ ছিল এই পুরস্কার হচ্ছে সেই পুরস্কার– মানুষের কাছ থেকে সম্মান আর প্রশংসা। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নগণ্য বলে বিবেচিত এই পুরস্কার পেতেই তারা মরিয়া হয়ে লোকদেখানো দানের দিকে ঝুঁকেছিল। সমাজের কাছে তাৎক্ষণিকভাবে অল্প সময়ের জন্য আদৃত হওয়ার বাসনায় তারা আত্মপ্রবঞ্চনার আশ্রয় নিতেও কুণ্ঠিত হয়নি। ফলে, তারা যে উদ্দেশ্য থেকে দান দিয়েছিল, যে পুরস্কার পেতে তারা অতিমাত্রায় আকাঙ্ক্ষী হয়েছিল কেবল সেই পুরস্কারই তারা লাভ করেছে। জাগতিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণে তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে কোন স্বর্গীয় পুরস্কারের প্রত্যাশা করতে পারে না। যেহেতু তারা জাগতিক পুরস্কার পেতেই বেশি আগ্রহী তাই ঈশ্বর তাদের ভাগ্যে সেই পুরস্কারই নির্ধারণ করে রেখেছেন, 'তাদের এই সব পুরস্কার এই জগতেই রয়েছে– তোমার ধন-সম্পদে তাদের পেট ভরে' (গীত ১৭:১৪)। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, এর বেশি কিছু যেন তারা আশা না করে। জাগতিক সুখভোগের মাঝেই তাদের পুরস্কার সীমাবদ্ধ (লূক ৬:২৪; ১৬:২৫) এবং এতেই তাদের তৃপ্ত থাকতে হবে। এর কারণ তারা বিশ্বস্তভাবে দান দেয় নি; জাগতিক পুরস্কার লাভের প্রত্যাশায় ঈশ্বরের নির্দেশের বাধ্য থাকেনি। যারা তাদের প্রতিটি দানের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততার প্রমাণ দেয় একমাত্র তারাই ঈশ্বরের কাছ থেকে

স্বর্গীয় পুরস্কার লাভের প্রত্যাশা করতে পারে।

(২) তারা তাদের 'জাগতিক' পুরস্কার পেয়ে গেছে; ফলে ভবিষ্যতে তাদের জন্য আর কোন পুরস্কার গচ্ছিত নেই। তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে যে জাগতিক পুরস্কারের প্রত্যাশা করেছিল তার পুরোটাই এখানে, এই পৃথিবীতে পেয়ে গেছে। অর্থাৎ তাদের পুরস্কারের কোটা পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু মানুষের জীবনের জন্য এই পুরস্কারই শেষ কথা নয়; কারণ ঈশ্বরের লোকেরা স্বর্গীয় পুরস্কারের প্রত্যাশায় এই জগতে কেবল 'ব্যয়' করে যান। তারা জানেন, জগতের যশ-খ্যাতি অল্প সময়ের। ফলে, যেখানে ভণ্ডেরা সর্বদা সাময়িক 'লাভ'-এর পেছনে ছোটে সেখানে তারা 'ত্যাগে'-ই জীবনের সার্থকতা খুঁজে পান। ঈশ্বর ভণ্ডদের পাওনা এই পৃথিবীতেই মিটিয়ে দেন; কারণ তারা ক্ষয়িষ্ণু পুরস্কার পেতেই বেশি আগ্রহী। পৃথিবীকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তারা নিজেরাই এই 'মীমাংসা' বেছে নিয়েছে।

২. দান দেবার বিষয়ে খ্রীষ্ট কী শিক্ষা দিয়েছেন সেদিকে লক্ষ্য করুন (৩, ৪ পদ)। খ্রীষ্ট নিজেই বিনম্রতার প্রতিমূর্তি হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেছিলেন; তাই তিনি চাইলেন, তার শিষ্যরাও তাদের জীবন দ্বারা এই বিনম্রতাকে ফুটিয়ে তুলুক এবং ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তাদের সমস্ত কাজ গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠুক। তাই, শিষ্যদের দান দেবার বিষয়ে নির্দেশনা দিতে গিয়ে তিনি বললেন, 'তোমার ডান হাত কী করছে তা তোমার বাঁ হাত না জানুক'। এ কথার দ্বারা তিনি হয়তো পরোক্ষভাবে মন্দিরের দানবাক্সের প্রতি ইঙ্গিত করলেন; লোকেরা যেন তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ডান হাতে তাদের উপহার এই বাক্সে রাখতে পারে সেজন্য এই দানবাক্স বা সিন্দুকটি উপাসনা গৃহের ডান দিকে স্থাপন করা হয়েছিল। ডান হাতে দান দেওয়ার কথা বলে খ্রীষ্ট হয়তো এটাও বোঝাতে চাইলেন যে, আমরা যেন সর্বদা দান দিতে প্রস্তুত থাকি; অর্থাৎ আমাদের ভেতর যেন দানের মনোভাব থাকে। শুধু তাই নয়, আমরা যেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আন্তরিকভাবেই তা দিতে প্রস্তুত থাকি। কখনো যেন আমরা একে বাহুল্য বা বোঝা বলে মনে না করি; বরং স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে কোন প্রকার আত্মতুষ্টি বা প্রশংসা লাভের প্রত্যাশাকে বিসর্জন দিয়েই আমরা যেন দান দিতে উন্মুখ হয়ে থাকি। 'ডান হাত' দ্বারা গরীবদের সাহায্য করা, তাদের উন্নতির জন্য কাজ করা, তাদের জন্য লেখালেখি করাকেও বোঝায়। অর্থাৎ শুধুমাত্র অর্থ-সাহায্য প্রদানই নয় উপরন্তু অন্যভাবেও তাদের উন্নতিকল্পে কাজ করা যায়। কিন্তু যখন আমরা গরীবদের সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানে কিছু করি তখন যেন তাতে যথেষ্টই গোপনীয়তা বজায় থাকে সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। আমরা নিজেরাও যেন সেই কাজ নিয়ে মনে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব না করি। তাই, সম্মান-যশ-খ্যাতির ভাবনা জলাঞ্জলি দিয়ে গরীবদের সাহায্য করুন, কারণ তা ভাল কাজ। 'আমাদের সমস্ত কাজে যেন এটাই পরিলক্ষিত হয় যে আমরা কেবল কাজটাকেই প্রাধান্য দিচ্ছি, এর দর্শককে নয়।' দানের বিষয়ে খ্রীষ্টের এই শিক্ষায় দু'টি বিষয় স্পষ্ট বলে প্রতীয়মান হয়–

(১) আমরা যেন কখনো কাউকে দেখানোর জন্য কিছু না করি; অর্থাৎ আমাদের ভাল কাজের উদ্দেশ্য হবে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করা; মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা কুড়ানো নয়। 'বাঁ হাত' মানে আমাদের অধঃস্তন কেউ নয়, এই 'বাঁ হাত' হচ্ছে আমাদের কাছের মানুষজন; যারা আমাদের সম্পর্কে জানে, আমাদের কাজের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখে। নিজেকে জাহির করার মানসিকতা থেকে কিছু করলে তা যেমন শীঘ্রই প্রকাশ পেয়ে যায় তেমনি বিনম্রতায় ভাল কাজে আত্মনিবেদন করলে তার ফল হয় সুদূরপ্রসারী; কারণ তা

ঈশ্বরকেই সম্মানিত করে। তাই, দান দেবার কিংবা ভাল কাজের ক্ষেত্রে আমাদের যতটা সম্ভব গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। সমাজের চোখে 'ভাল' বলে পরিগণিত হবার কিংবা অন্য যেকোনো অভিপ্রায়ে 'ভাল কাজের' প্রচার থেকে নিজেদের বিরত রেখে তার প্রসারের দিকেই আমাদের অধিকতর মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

(২) আমরা যেন আমাদের ভাল কাজের কথা ভেবে আত্মপ্রসাদে না ভুগি। ভাল কাজের দরুন মনে মনে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুললে তা আমাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে। কারণ নিজেদের দিকে আমরা যতবার তাকাই অর্থাৎ ভাল কাজ দেখাতে পারার দরুন যতই আমরা নিজেদের পিঠ চাপড়ে দিই ততই আমাদের মনে গর্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। 'বাঁ হাত' কিন্তু আমাদের দেহেরই একটি অংশ। তাই, নিজের কাছে পরিষ্কার থাকার জন্যই আমাদের গর্বিত হওয়া চলবে না। আত্ম-অহমিকা, আত্মপ্রসাদ এবং নিজেকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে গর্বের একেকটি শাখা– যেগুলো মানুষকে আত্মপ্রচারে প্ররোচিত করে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। এমন উদাহরণ তো আমাদের হাতের কাছেই অজস্র রয়েছে। যারা তাদের ভাল কাজের কথা মনে করে আত্মতৃপ্তিতে ভুগেছিল তাদের অগ্রগমন সেখানেই থমকে গিয়েছিল; কারণ গর্বিত স্মৃতিচারণা কেবল বর্তমানকেই নয় ভবিষ্যতকেও নিষ্ফলা করে দেয়। এর ফলে ভাল কাজের ক্ষুধাটাই মরে যায়। নিজেদের আমরা কী অবস্থায় আবিষ্কার করি– ভাল কাজ করতে ক্ষুধার্ত-উন্মুখ অবস্থায়, না অতীতে করে আসা ভাল কাজের স্মৃতিচারণকারী রূপে?

৩. খ্রীষ্টের নির্দেশের প্রতি বাধ্য থেকে যারা গোপনে তাদের দান দেবে তাদের উদ্দেশে করা তাঁর প্রতিশ্রুতির দিকে লক্ষ্য করুন। 'তোমরা গোপনে দান দাও;' এবং এই জন্যে আনন্দিত হও যে, 'তোমাদের যিনি পিতা– যাঁর অজ্ঞাতে কিছুই ঘটে না, তিনিই তা প্রত্যক্ষ করছেন।' মনে রাখুন, যতটা নিভৃতে আমরা আমাদের ভাল কাজগুলো সম্পন্ন করি ততটাই সাড়ম্বরে ঈশ্বর আমাদের উঁচুতে তুলে ধরেন। আমাদের ওপর খারাপ কিছু ঘটলে আমাদের নীরবতায় ঈশ্বর যেমন উদ্যোগী হয়ে ওঠেন (গীত ৩৮:১৪:১৫) তেমনি যখন আমরা আমাদের ভাল কাজের বিষয়ে নির্মোহ থাকি তখন তিনি তা যত্নের সাথে লক্ষ্য করেন। ঈশ্বর যে গোপনে সমাধাকৃত ভাল কাজসমূহ প্রত্যক্ষ করেন তা জেনে ভণ্ডেরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেও একজন আদর্শ খ্রীষ্টীয় নিশ্চিতভাবেই উৎসাহিত হবেন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়; ঈশ্বর যে কেবল আমাদের গোপনে করা ভাল কাজ পর্যবেক্ষণ ও অন্তরীক্ষে তার প্রশংসা করে যান তা নয়, উপরন্তু তিনি আমাদের পুরস্কৃত করবেন। মনে রাখুন, ব্যক্তিস্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে যারা কেবলমাত্র ঈশ্বরের উদ্দেশে ভাল কাজ করবে কেবল তারাই এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত হবে। ঈশ্বরভক্তেরা সত্যিকারের গৌরবের পেছনে ধাবিত হয় আর ভণ্ডেরা ছোটে মরীচিকার পেছনে। তাই, 'ঈশ্বর নিজেই' তাঁর এই ভক্তদের তাদের ভাল কাজের জন্য পুরস্কৃত করবেন। লক্ষ্য করুন, কতটা আন্তরিকতার সাথে এখানে সেই গৌরবময় মুহূর্তের বিষয়ে বলা হয়েছে! 'যারা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী অগ্রসর হয় তারা তাঁর হাত থেকে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার পায়' (ইব্রীয় ১১:৬)। তাই, ঈশ্বরের কাছ থেকে সেই মহান পুরস্কার লাভের জন্যই আমাদের তাঁর ইচ্ছেমতো চলা উচিত (আদি ১৫:১)। তিনি আমাদের পুরস্কার দেবেন পিতা হিসেবে; মনিব হিসেবে নয়। মনিব যেমন তার দাসকে নির্দিষ্টকৃত বেতনের এক পয়সাও বেশি দেয় না তেমনটা ঈশ্বর আমাদের সাথে করবেন না; কারণ তিনি আমাদের পিতা এবং পিতা হিসেবেই তিনি আমাদের উপচে পড়া উপহার

সামগ্রীতে পুরস্কৃত করবেন। পুরস্কার প্রদানের এই মাহেন্দ্রক্ষণেই সবাই তা প্রত্যক্ষ করবে। যদিও তা এই পৃথিবীতে অনুষ্ঠিত হবে না; তবুও সেই মহান দিনে, যখন প্রত্যেকে ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রশংসায় সরব হবে সেদিনের সেই অপূর্ব সম্মানপ্রাপ্তির কথা চিন্তা করে সত্যিকারের খ্রীষ্টানরা নিশ্চিতভাবেই আরও বেশি করে ভাল কাজ করার জন্য উদ্দীপিত হবেন। ভাল কাজে প্রচারবিমুখ থাকাটা ঈশ্বরের সন্তানদের বিনম্রতাকেই প্রকাশ করে।

মথি ৬:৫-৮ পদ

খ্রীষ্ট এবারে তাঁর শিক্ষায় কতটা গুরুত্ব ও সততার সাথে আমাদের প্রার্থনায় নিবিষ্ট হওয়া উচিত– সে বিষয়ে আলোকপাত করলেন। তিনি চাইলেন যেন তাঁর শিষ্যরা সঠিক মনোভাব নিয়ে, ভণ্ডামি থেকে বিযুক্ত হয়ে প্রার্থনা করে। যেহেতু প্রার্থনায় আমরা ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠ হই সেহেতু তা করার সময় আমাদের অবশ্যই সজাগ, সতর্ক থাকতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, প্রার্থনার সময় যেন আমাদের মনোভাবে সততা এবং অভিব্যক্তিতে অর্থপূর্ণতা থাকে। 'তোমরা যখন প্রার্থনা কর' (৫ পদ)– এ কথার দ্বারা খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের জন্য প্রার্থনা করাকে আবশ্যক বলে স্থির করলেন। একজন সত্যিকারের খ্রীষ্টানর কাছে প্রার্থনা জীবনীশক্তি বলে বিবেচিত হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যতিরেকে কোন জীবিত মানুষের কথা যেমন কল্পনাও করা যায় না, খ্রীষ্টের শিষ্যদের কাছে প্রার্থনাও সেরকমই এক সহজাত প্রবৃত্তি বলে গণ্য হয়। যে পৌলকে ঈশ্বরের নামে প্রার্থনাকারীদের ধরবার জন্য প্রধান পুরোহিতদের কাছ থেকে ক্ষমতা নিতে দেখা গিয়েছিল, মন ফেরাবার পর সেই পৌলকেই আমরা প্রার্থনায় নিবিষ্ট হতে দেখি (প্রেরিত ৯:১২)। তাই, খ্রীষ্টের শিষ্যরা যে প্রার্থনাকে প্রাধান্য দেয়– এতে বিস্ময়ের কিছু নেই; বরং এটাই স্বাভাবিক। কারণ প্রার্থনা নেই তো ঈশ্বরের অনুগ্রহও নেই। এখন সেই প্রার্থনা কীভাবে করা উচিত– খ্রীষ্ট এখানে সে সম্পর্কেই বললেন, 'তোমরা যখন প্রার্থনা কর তখন ভণ্ডদের মতো কোরো না।' মনে রাখুন, যারা ভণ্ডদের মতো প্রার্থনা করা থেকে নিজেদের বিরত রাখে তাদের প্রার্থনা ফলপ্রসূ হয়; কারণ তাদের অভিব্যক্তি ও মনোভাবে ভণ্ডামি মিশে নেই। খ্রীষ্ট এখানে কারও নাম উল্লেখ না করলেও এই মথি পুস্তকেরই ২৩:১৪ পর্বের দিকে তাকালে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি যে, 'ভণ্ড' বলতে তিনি এখানে ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকদের কথাই বুঝিয়েছেন।

খ্রীষ্ট এখানে সুস্পষ্টভাবে প্রার্থনায় ভণ্ডদের দু'টি কাজের প্রতি নির্দেশ করে আমাদের সতর্ক করে দিলেন– আত্মপ্রচার (৫, ৬ পদ) এবং অর্থহীন কথার পুনরুক্তি (৭, ৮ পদ)।

ক. প্রার্থনার সময় আমাদের কথার মধ্য দিয়ে যেন গর্ব ফুটে না ওঠে এবং আমরা যেন কখনো তা মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা লাভের উদ্দেশে না করি। লক্ষ্য করুন,

১. ভণ্ডরা কীভাবে প্রার্থনা করতো। তাদের উপাসনার ধরনই বলে দিত যে, তারা আশপাশের মানুষকে দেখানো ও তাদের প্রশংসা কুড়ানোকেই উপাসনার মুখ্য উদ্দেশ্য হিসেবে বেছে নিয়েছে। যেখানে মিথ্যে প্রশংসা লাভই ছিল তাদের ধ্যানজ্ঞান। প্রার্থনার সময় উপরের দিকে তাকিয়ে উচ্চস্বরে প্রার্থনা করলেও তাদের দৃষ্টি কিন্তু আশপাশের মানুষের সপ্রশংসনীয় অভিব্যক্তির দিকে নিবদ্ধ থাকত। প্রার্থনার জন্য তারা যেসব স্থান বেছে নিয়েছিল তা লক্ষণীয়–

(১) তারা সমাজ-ঘরে প্রার্থনা করতো। এক্ষেত্রে যদিও তা আদর্শ স্থান বলে বিবেচিত

হয়ে থাকে তবুও তা ছিল সর্বসাধারণের প্রার্থনার স্থান; ব্যক্তিগত প্রার্থনার নয়। তারা দেখাত যে কতটা নিষ্ঠার সাথে তারা সমাজ-ঘরে প্রার্থনায় নিবিষ্ট হচ্ছে, কিন্তু তাদের মানবীয় অভিলাষ ছিল ভিন্ন; আর তা হচ্ছে কেবল মানুষের কাছে 'প্রার্থনার মানুষ' বলে প্রশংসিত হওয়া। এ ছাড়াও তারা পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতে পছন্দ করতো; কারণ এতে করে সহজেই অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভবপর হতো। তারা যদি সত্যিকারভাবেই ধার্মিকতার আত্মা দ্বারা পরিচালিত হতো তবে এমনটা করতে আগ্রহী হতো না। কিন্তু যেহেতু তাদের উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের জাহির করা, তাই পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে পথচারীদের শুনিয়ে-দেখিয়ে তারা লম্বা প্রার্থনা করতো।

(২) তারা দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতো; তবে তা নিয়মসিদ্ধ হলেও হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করার মাধ্যমে আরও বেশি বিনম্রতা ও ভক্তি প্রকাশ পায় (লূক ২২:৪১; প্রেরিত ৭:৬০; ইফি ৩:১৪); কারণ দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করার সময় ভণ্ডদের অভিব্যক্তিতে অহংকার ও ঔদ্ধত্য ফুটে ওঠে (লূক ১৮:১১), 'সেই ফরীশী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের বিষয়ে প্রার্থনা করলেন।'

(৩) প্রকাশ্যে প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে তাদের এই আকুলতা দু'টি বিষয় প্রকাশ করে–

(ক) তাদের প্রার্থনার লক্ষ্য ছিল নিজেদের ধার্মিক প্রতিপন্ন করা; ফলে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করার চিন্তাকে দূরে ঠেলে, এমনকি প্রার্থনার পবিত্র উদ্দেশ্যকেও জলাঞ্জলি দিয়ে তারা গণমঞ্চে প্রার্থনা পরিবেশনে সচেষ্ট হতো; বলা বাহুল্য, এই কাজে তারা অনেক বেশি আন্তরিক ও উৎসাহী ছিল। পরিস্থিতির বিচারে প্রকাশ্যেও আমাদের ভাল কাজ করতে হতে পারে; এবং স্বভাবতই তা অনেকের কাছে আদৃত ও প্রশংসিত হবে– এতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু নিশ্চিতভাবেই তা পাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায় যখন আমরা এরকমটা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি, মানুষের কাছ থেকে বাহবা পাবার লোভ আমাদের পেয়ে বসে। মনে রাখবেন, সমাজের উঁচু আসন কিংবা প্রশংসা পেতে আমাদের ভাল লাগে কারণ তা আমাদের গর্বিত অন্তঃকরণে অক্সিজেন জুগিয়ে থাকে।

(খ) তাদের প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল– সে কথা ভাবার চেয়ে মানুষের কাছ থেকে তাৎক্ষণিক বাহবা, প্রশংসা পেতেই তারা অধিকতর মনোযোগী ছিল; কারণ এতে করে তাদের সামনে বিধবা ও এতিমদের সম্পত্তি হাতানোর রাস্তা খুলে যেত এবং সুযোগমতো তার পূর্ণ সদ্ব্যবহারও তারা করতো। যারা নিয়ম মেনে প্রার্থনা ও উপাসনায় নিজেদের নিয়োজিত রাখে তাদের কে না বিশ্বাস করে বলুন? এই গর্হিত কাজের জন্য তাদের মনে যে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা হতো না সেটাতো পরিষ্কার বলে দেয়, তারা ধর্মকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতো (২৩:১৪)। সোজা কথায়, তারা মানুষকে ধোঁকা দিত।

(৪) এসবের ফলশ্রুতিতেই 'তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে'; ঈশ্বরের কাছ থেকে এই পুরস্কার– প্রতিদানই তারা প্রত্যাশা করেছিল, যদিও পুরস্কার হিসেবে তা অতি নগণ্য, ক্ষয়িষ্ণু। প্রভুর উদ্দেশে আমাদের যে কাজ তা দেখে তিনিই যদি 'ভাল' না বলেন, তাতে আমাদের কী লাভ হয়? তেমনিভাবে আমাদের প্রার্থনা যদি ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য না হয় তবে আমরা যে মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা পাবার মতো নগণ্য পুরস্কারই পাব– এতে আর অবাক হবার কি আছে। ভণ্ডেরা মানুষকে দেখাতে চাইতো যে তারা ধার্মিক; এবং এ কাজে তারা তাদের সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করতেও কুণ্ঠিত হতো না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাদের সেই মনোবাসনা পূর্ণ হতো– মানুষ তাদের ভাল বলতো এবং সরলভাবে বিশ্বাস

করতো। মনে রাখুন, যারা ঈশ্বরের উদ্দেশে গ্রহণযোগ্য উপাসনা করতে চায় তারা মানুষের প্রশংসাকে সম্মান দেখালেও তাতে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হবে না। কারণ তাদের প্রার্থনার গন্তব্য একমাত্র ঈশ্বর, কোন মতেই মানুষের মনোযোগ বা প্রশংসা নয়। মানুষের দৃষ্টিতে 'মহান' হয়ে কোন লাভ নেই; তারা তো আমাদেরই মতো ছাই, ধূলো। আমরা কেমন কর-ছি– তা একমাত্র ঈশ্বরই বিচার করবেন; তাই, নিজেদের উপাসনা কাজের বিষয়ে তাদের কাছ থেকে মূল্যায়ন শোনারও কোন আবশ্যকতা নেই। সত্যিকারের উপাসনা করতে হয় আত্মায় ও সত্যে; ফলে আমাদের উপাসনার পরিধি কেবল ঈশ্বর ও আমাদের আত্মার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকাটাই শ্রেয়, বাইরের মানুষকে তা দেখানোর বা জানানোর কোন প্রয়োজন নেই। মণ্ডলীতে উপাসনা করার সময় আমাদের অংশগ্রহণ যেন কারও দৃষ্টি আকর্ষণে অগ্রসর না হয়, সেদিকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে; অনুরূপভাবে নিজেদের উপাসনাকে স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপন করা থেকেও আমাদের বিরত থাকতে হবে; কারণ ভণ্ডরাই এমনটা করে। তারা মনে করে, এরকম উপাসনা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে (যিশাইয় ৫৮:৪)। বাস্তবিকই প্রকাশ্যে পবিত্র ও গাম্ভীর্যপূর্ণ প্রার্থনা করা সম্ভব হয় না; স্থান হিসেবেও তা আদর্শ নয়।

২. ভণ্ডামিপূর্ণ প্রার্থনার বিপরীতে খ্রীষ্ট আমাদের বিনম্রতা ও সততার সাথে প্রার্থনা করতে শিক্ষা দিলেন; 'কিন্তু যখন তুমি প্রার্থনা কর' অর্থাৎ সব প্রকার ভণ্ডামির বিরুদ্ধে গিয়ে যখন তাঁর শিষ্যরা প্রার্থনা করবে তখন তারা অবশ্যই ভণ্ডরা যা করে তা করবে না (৬ পদ)। খ্রীষ্ট এখানে তাঁর শিষ্যদের কাছে প্রাত্যহিক জীবনে ব্যক্তিগত প্রার্থনার গুরুত্ব তুলে ধরলেন। তিনি চাইলেন, যেন তাঁর শিষ্যরা একে অবশ্য কর্তব্য হিসেবে নিয়ে নিজেদের জীবনে তার চর্চা করে।

এখানে লক্ষণীয়, (১) কী করে প্রার্থনা করতে হবে– খ্রীষ্ট তা নির্দেশ করলেন।

(ক) সমাজ-ঘরে এবং রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করার স্থলে তিনি তাঁর শিষ্যদের ভেতরে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে প্রার্থনা করতে বললেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রার্থনা করবার জন্য ইসহাক মাঠ (আদি ২৪:৬৩), খ্রীষ্ট নির্জন পাহাড় এবং পিতর বাড়ির ছাদকে বেছে নিয়েছিলেন। তবে, যে কাজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় তা কোন স্থানকেই মহান বলে স্বীকৃতি দিতে পারে না। মনে রাখুন, অবসর সময়ে আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে একাকী প্রার্থনায় নিবেদিত হতে হবে যেন তা কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। এর ফলে, আমরা ভণ্ডদের মতো মিথ্যে অহংকার, আত্মপ্রসাদ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখে নিরবচ্ছিন্নভাবে, মুক্তমনে, নিঃসংকোচে, আরও বেশি স্বাধীনতার সাথে প্রার্থনায় সময় কাটানোর অবকাশ পাই। তবে এমন পরিস্থিতিরও উদ্ভব হতে পারে যে, আমরা কোনভাবেই গোপনীয়তা বজায় রাখতে পারছি না; তখন আমাদের কর্তব্যে অবহেলা করা চলবে না। প্রকাশ্য প্রার্থনায় অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চাইতেও প্রতিকূল পরিস্থিতির অজুহাতে প্রার্থনা না করাটা আরও বড় ধরনের অপরাধ।

(খ) মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা পাবার জন্য প্রকাশ্যে প্রার্থনা করার স্থলে খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের গোপনে 'পিতার কাছে, কেবল পিতার উদ্দেশেই' প্রার্থনা করতে নির্দেশ দিলেন (৬ পদ ; সখরিয় ৭:৫,৬)। ফরীশীরা যতটা না ঈশ্বরের উদ্দেশে তারও চেয়ে বেশি মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা লাভের উদ্দেশে প্রার্থনা করতো। তারা যে জাগতিক সম্মান-প্রশংসাকে ঈশ্বরেরও ওপরে প্রাধান্য দিত তা তাদের প্রার্থনার ধরন কিংবা স্থানের দিকে তাকালেই পরিষ্কার বোঝা যায়। 'তোমরা অবশ্যই ঈশ্বরের উদ্দেশেই প্রার্থনা করবে; তোমাদের

অর্থপূর্ণ অভিব্যক্তিতে যেন এটা প্রকাশ পায় যে তোমরা ঈশ্বরকে প্রাধান্য দিচ্ছ, আর সেটাই যথেষ্ট। কারণ, তোমরা তো তোমাদের পিতার কাছে প্রার্থনা করছে; যিনি তাঁর অপার মহিমা ও প্রাচুর্যে তোমাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য, সমাধান দিতে পারেন। তাই, তোমরা পিতার কাছেই প্রার্থনা কর– নিভৃতে, একান্তে। মনে রাখুন, একাকী প্রার্থনায় ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করাটা সহজ। কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের মনোযোগ চারপাশের ঘটনায় বিক্ষিপ্ত হতে বাধ্য; তাই, কেবল ঈশ্বরের বিষয়ে চিন্তা করার জন্য সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করাটা আবশ্যক হয়ে পড়ে। তৃতীয় কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে আমাদের হৃদয় চারপাশ থেকে একপ্রকার বিচ্ছিন্ন, 'বন্ধ'ই হয়ে যায়; ফলে, আমরা আমাদের হৃদয়কে প্রার্থনার জন্য প্রস্তুত করতে সমর্থ হই। একাকী প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকর্মের জন্য গৌরব ও প্রশংসা দিতে (প্রেরিত ১৭:২৪) এবং নিজেদের জন্য প্রয়োজনীয় সান্ত্বনা ও স্বস্তি লাভ করতে পারি।

(২) তিনি আমাদের এই বলে উৎসাহ দিলেন যে,

(ক) আমাদের পিতা, যিনি গোপন সবকিছুই দেখেন 'তিনিই আমাদের প্রার্থনা শুনবেন'। আমাদের ভাল কাজের জন্য প্রশংসা করার কেউ না থাকলেও সদাপ্রভু ঈশ্বরের দৃষ্টি আমাদের ওপর আছে। তিনি আমাদের ভাল কাজের প্রশংসা করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। তাঁর কাছে কিছুই গোপন নেই। যীশু খ্রীষ্ট নথনেলকে বলেছিলেন, 'তুমি যখন ডুমুর গাছের নিচে ছিলে তখনই আমি তোমাকে দেখেছিলাম' (যোহন ১:৪৮)। এ ছাড়া পৌল যখন যিহূদার বাড়িতে প্রার্থনা করছিলেন তখনও খ্রীষ্ট তাঁকে লক্ষ্য করেছিলেন (প্রেরিত ৯:১১)। তাই, যেখানে, যে নির্জন স্থানেই ঈশ্বরকে ডাকা হোক না কেন তাতে তিনি কর্ণপাত করেন; কারণ তাঁর কাছে কিছুই গোপন থাকে না।

(খ) ঈশ্বর আমাদের সবার সামনে পুরস্কৃত করবেন; কিন্তু যারা প্রকাশ্যে মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা পাবার জন্য প্রার্থনা করে তারা এই পুরস্কার পাবে না। যেহেতু তারা জাগতিক পুরস্কার পেতেই বেশি আকাঙ্ক্ষী সেহেতু তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে কোন পুরস্কার প্রত্যাশা করতে পারে না। অপর দিকে যারা গোপনে ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করে তারা তাঁর কাছ থেকে প্রকাশ্যে অনুগ্রহের পুরস্কার লাভ করবে। ঈশ্বর নিজে তাদের এই পুরস্কার দেবেন। তাঁর পুরস্কার কোন ভাল কাজের 'বিনিময়' হিসেবে নয়, বরং জীবদ্দশায় যারা তাঁর প্রতি বাধ্য থাকাকেই সর্বাগ্রে প্রাধান্য দেবে কেবল তারাই এই পুরস্কারের গৌরব ও সম্মানের ভাগী হবে। বাস্তবিকই ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক দেনা-পাওনার নয়, বরং অনুগ্রহের। পিতা হিসেবেই তিনি আমাদের অফুরন্ত অনুগ্রহ দান করেন। তাই, ভাল কাজের 'বিনিময়' হিসেবে আমাদের তাঁর কাছ থেকে অনুগ্রহ চাইতে হয় না। তিনি কেবল দেখতে চান, আমরা তাঁর প্রতি বাধ্য কি না। ভণ্ডদের মাঝে বাধ্যতার অভাবই বেশি করে পরিলক্ষিত হয়। একাকী প্রার্থনাকারীদের জীবনে স্পষ্টতই ঈশ্বরের পরিচালনার লক্ষণগুলো মূর্ত হয়ে ওঠে। ফলে, তাদের ফলপ্রসূ প্রার্থনা প্রত্যক্ষ করে মানুষ ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করার অবকাশ পায়। তাদের এরূপ প্রার্থনার জীবন ও তার ফল ভণ্ডদের মুখ বন্ধ করে দেয়; অবশ্য এদের অনেককেই ঈশ্বরভক্তদের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠতে দেখা যায়। কিন্তু এসবই বৃথা সময়ক্ষেপণ বলে গণ্য হবে যেদিন সত্যিকারের ঈশ্বরভক্তরা সেই মহান দিনে খ্রীষ্টের সাথে গৌরবের ভাগী হবে। ফরীশীরা যে পুরস্কার লাভ করেছে তা কেবল হাতে গোনা কয়েকটা শহরের মানুষের কাছ থেকে; সত্যি বলতে, তাদের সেই পুরস্কার প্রকৃ

ত অর্থেই মূল্যহীন। কেবল অপসৃয়মান ছায়া বা বিদ্যুৎ চমকের সাথেই এর তুলনা চলে। কিন্তু যে পুরস্কার অমূল্য, সেই পুরস্কার যেদিন সত্যিকারের খ্রীষ্টানরা লাভ করবে, সেদিন তা গোটা পৃথিবী দেখবে। কি মানুষ, কি স্বর্গদূত– সবাই সেদিন বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রকৃত খ্রীষ্টানদের এই ওজনদার পুরস্কার প্রাপ্তির ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করবে।

খ. খ্রীষ্ট আমাদের প্রার্থনার সময় অর্থহীন কথার পুনরুক্তি করতে বারণ করলেন (৭, ৮ পদ)। যদিও সঠিক মনোভাবের প্রার্থনা আত্মায় ও সত্যে পরিচালিত হয়, তবুও প্রার্থনার সময় কিছু প্রয়োজনীয় কথা উচ্চারণের আবশ্যকতা দেখা দেয়, বিশেষ করে যৌথ প্রার্থনার ক্ষেত্রে। এর আগে খ্রীষ্ট একাকী প্রার্থনার বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন; এবারে 'যখন তোমরা প্রার্থনা কর' বলে তিনি যৌথ প্রার্থনার বিষয়টিই বুঝিয়েছেন; যার ধারাবাহিকতায় কিছুপরে তিনি প্রভুর প্রার্থনাটি উচ্চারণ করবেন। যৌথ প্রার্থনার ক্ষেত্রে আমরা যেন অযথা এক কথা বার বার বলে প্রার্থনাকে দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা না করি– সে বিষয়েই খ্রীষ্ট আমাদের পরিষ্কার নির্দেশ দিলেন। এরকম প্রার্থনার পেছনে একটি অসৎ উদ্দেশ্য থাকে; আর তা হচ্ছে নিজেকে জাহির করা। যেমনটা আমরা ফরীশীদের বেলায় দেখি; কি একাকী কি যৌথ প্রার্থনা-উভয় ক্ষেত্রেই তারা নিজেদের মেলে ধরতে উন্মুখ হয়ে থাকতো; ফলে তাদেরকে অর্থহীন কথাবার্তায় প্রার্থনাকে দীর্ঘায়িত করার দিকে সচেষ্ট থাকতে দেখা যেত (২৩:১৪)। লক্ষ্য করুন,

১. খ্রীষ্ট এখানে সুনির্দিষ্টভাবে যে দোষের বিষয়ে বললেন তা লক্ষ্য করুন। প্রার্থনার সময় অর্থহীন কথার পুনরাবৃত্তি দ্বারা নিজেকে জাহির করার যে অপচেষ্টা চলে, তিনি তার প্রতি ইঙ্গিত করলেন। কেননা প্রার্থনায় অর্থহীন কথা বলার উদ্দেশ্যই হচ্ছে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করার বদলে নিজেকে প্রকাশ করা। এই প্রকার প্রার্থনায় আত্মার পরিচালনাকে পেছনে ঠেলে জাগতিক জ্ঞানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। প্রার্থনায় অর্থহীন কথার পুনরাবৃত্তিকে আমরা দু'ভাবে প্রকাশ করতে পারি–

(১) উদ্দেশ্যহীনভাবে একই কথা বার বার উচ্চারণ করে যাওয়া। অনেকটা বোকার মতো না বুঝেই কোন কিছু পড়ে যাওয়া বা অনবরত জপ করতে থাকা; 'বুদ্ধিহীনেরা প্রচুর কথা বলে, কিন্তু কী হবে তা কেউ জানে না, তা ছাড়া ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা মানুষকে কে বলে দিতে পারে?' (উপদেশক ১০:১৪)। পরিণামের কথা চিন্তা না করে অভদ্রের মতো কাউকে কিছু বলে বসাটা যেমন লজ্জা ও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি প্রার্থনার সময় ঈশ্বরের উদ্দেশে বৃথা বাগ্মিতা দেখাতে যাওয়াটাও ফলপ্রসূ প্রার্থনার অন্তরায় বলে গণ্য হয়। তবে খ্রীষ্ট যে এখানে প্রার্থনায় সব ধরনের পুনরাবৃত্তির ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন তা নয়; কেবল অর্থহীন, উদ্দেশ্যবিহীন কথার পুনরাবৃত্তি করতেই তিনি বারণ করেছেন। খ্রীষ্ট নিজেও একই কথা বলে তৃতীয়বারের মতো প্রার্থনা করেছিলেন (২৬:৪৪)। তবে তাঁর সেই প্রার্থনা ছিল অসামান্য আবেগ, অনুভূতি থেকে উৎসারিত (লূক ২২:৪৪); দানিয়েলকেও আমরা অনুরূপ প্রার্থনা করতে দেখি (দানিয়েল ৯:১৮, ১৯)। গীত ১৩৬ অধ্যায়ে আমরা দ্যোতনাদায়ী শব্দব্যঞ্জনায় একই কথার পুনরাবৃত্তির বিষয়টি দেখতে পাই। তবে তার প্রায়োগিক উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের বোধ, অনুভূতিকে ছুঁয়ে যাওয়া; ঈশ্বরের অসাধারণত্ব সম্বন্ধে গভীরভাবে ভাবতে অনুপ্রাণিত করা। কিন্তু প্রার্থনার সময় মন্ত্রের মতো অপ্রয়োজনীয় শব্দগুচ্ছ আবৃত্তি করে যাওয়ার মাঝে এরকম গ্রহণযোগ্য উদ্দেশ্য নিহিত থাকে না; পোপের অনুসারীরা যেভাবে উপাসনার সময় বার বার একই কথা মুখস্থ বলে যায়,

কিংবা মরিয়মের উদ্দেশে প্রার্থনায় সমর্পিত হয়, তা শেষ পর্যন্ত বাচনিক দক্ষতা বৃদ্ধি ছাড়া আর কোন কাজে আসে না। যে পরিবেশ বা আবহ সৃষ্টির লক্ষ্যে তারা এভাবে মন্ত্রোচ্চারণ করতে থাকে, আখেরে সেই উদ্দেশ্যই তাদের মন ছেড়ে পালায়। এর ফলে কিছু লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করা সম্ভব হলেও যার উদ্দেশে এই প্রার্থনা বা উপাসনা সেই ঈশ্বরই তা গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। খ্রীষ্ট ঠিক এই কাজটি করতেই পরিষ্কার নিষেধ করে দিয়েছেন। অপ্রয়োজনীয় কথা আমরা অনেক বলতে পারি, কিন্তু কাজের সময় দেখা যায় যে, আমাদের মুখ দিয়ে কথা সরছে না। এ ধরনের উটকো সংলাপে কেবল ঈশ্বরই নন, বোধবুদ্ধি সম্পন্ন যেকোনো মানুষই বিরক্ত বোধ করেন।

(২) বেশি কথা বলা; এটা কথনের স্বতঃস্ফূর্ততা থেকে হয়ে থাকে; কিন্তু প্রার্থনায় অযথা বেশি কথা বলে তা দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা মূলত নিজের বাগ্মিতা, আত্মিক জীবন প্রকাশের অভিপ্রায় থেকে আসে; অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যেন ঈশ্বরের সাথে কোন বিষয়ে ঐকমত্যের প্রচেষ্টা চলছে। এটা আবার অনেকের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়; অবশ্য মানবীয় প্রবৃত্তিই এমন– মানুষ বলতে ভালবাসে। তাই বলে এখানে যে সবপ্রকার দীর্ঘ প্রার্থনাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে তা নয়; খ্রীষ্ট নিজেও সারারাত প্রার্থনায় সময় কাটিয়েছিলেন (লূক ৬:১২)। অনুরূপভাবে শলোমনকেও দীর্ঘ প্রার্থনা করতে দেখা যায়। অসামান্য নিমগ্নতা ও নিবেদনের স্বার্থে কখনো কখনো এরকম প্রার্থনার আবশ্যকতা দেখা দেয়; কিন্তু তার লক্ষ্যস্থলে যদি ঈশ্বর না থাকেন এবং তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে সন্তুষ্ট করার জন্য তা করা হয় তবে সেই প্রার্থনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়; খ্রীষ্ট আমাদের এই প্রকার দীর্ঘ প্রার্থনা করতে বারণ করেছেন। 'দীর্ঘ প্রার্থনা' বলতে সবসময় প্রার্থনা করা কিংবা প্রার্থনায় দীর্ঘ সময় কাটানোকে বোঝায় না বরং অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে প্রার্থনাকে দীর্ঘায়িত করাকে বোঝায়। প্রার্থনার সময় মাত্রাজ্ঞান ভুলে গিয়ে কেবল সুন্দর কথা বললেই তা পূর্ণাঙ্গতা পায় না; বরং সুবিবেচনা প্রসূত কথনই প্রার্থনাকে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। শলোমন এ ব্যাপারে আমাদের সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন (উপদেশক ৫:২), 'তোমার কথা যেন অল্প, সঠিক মনোভাব ও চিন্তা প্রসূত হয়; কারণ এর ফলে তোমাদের বক্তব্য অন্যের কাছে স্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। তাই সদাপ্রভুর উদ্দেশে কথা বলার সময় সঠিক কথা বেছে নাও (হোশেয় ১৪:২; ইয়োব ৯:১৪); আর যা কিছু মাংসিক অভিপ্রায় থেকে আসে তা বর্জন কর।

২. প্রার্থনায় অর্থহীন কথার পুনরাবৃত্তির বিরুদ্ধে এখানে যেসব কারণ দর্শানো হয়েছে তা হচ্ছে,

(১) অবিশ্বাসীরাই এমনটা করে। আর এভাবে প্রার্থনা করার মাধ্যমে এটাই প্রকাশ পায় যে, খ্রীষ্টানরা অবিশ্বাসীদের অনুকরণ করছে; যা মোটেও কাম্য নয়। পৌত্তলিক অযিহূদীরা ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রকৃত উপাসনা কী এবং তা কীভাবে করতে হয় সে বিষয়ে ছিল সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। ঈশ্বরের উপাসনা করার জন্য তারা তাঁর প্রকৃতিকে বেছে নিয়ে নিজেদের জ্ঞান ও বুদ্ধিতে সেই উপাসনার নিয়মকানুন তৈরি করেছিল। ফলে অনড়, স্থির মূর্তির সামনে তারা বারবার একই কথা আবৃত্তি করে নিজেদের আবেদন-নিবেদন জানিয়ে যেত। তারা মনে করতো, এভাবে তাদের প্রভুকে সন্তুষ্ট করা যায়; অন্ততপক্ষে তাদের আত্মনিবেদনের কথা মাথায় রেখে হলেও 'প্রভু' তাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করবেন। যদিও তাদের প্রভু ছিল দুর্বল, বধির তবুও তারা এসব আমলে না নিয়ে অসীম ধৈর্যের সাথে সকাল

থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা মন্ত্র উচ্চারণ করে যেত। পুরাতন নিয়মে আমরা বালদেবতার পুরোহিতদের এমনটা করতে দেখি। তারা 'হে বালদেব, আমাদের কথা শুনুন; আমাদের কথায় কান দিন বালদেব' বলে কঠিন নিয়ম মেনে তাদের উপাসনা কাজ চালিয়ে যেত। বাস্তবিকই এসব ছিল অর্থহীন কথার পুনরাবৃত্তি। এলিয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বালদেবতার পুরোহিতরা কর্মিল পাহাড়ে সমবেত হয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বালদেবতাকে ডেকেও যখন কোন প্রত্যুত্তর পেল না তখন এলিয় অল্প কথায় খুবই প্রাসঙ্গিক একটি প্রার্থনা করলেন; আর স্বভাবতই তাতে সাড়া মিলল। সদাপ্রভু ওপর থেকে আগুন পাঠিয়ে উৎসর্গের মাংস, কাঠ, পাথর, মাটি পুড়িয়ে দিলেন; এমনকি নালার জল শুষে নিল (১ রাজাবলি ১৮:২৬, ৩৬)। প্রার্থনায় অর্থহীন কথার পুনরাবৃত্তি মানে অযথা শ্রমের শ্রাদ্ধ। যারা এমনটা করেন তাদের 'কথাকার' বলা যেতে পারে। তাদের এ কাজে কিছুই মেলে না; তবে হারায় অনেক কিছু।

(২) খ্রীষ্ট এখানে স্পষ্টতই বললেন, 'তোমাদের তো অবিশ্বাসীদের মতো ঈশ্বর প্রার্থনা শুনবেন কি না– সে দুর্ভাবনা নেই। তোমাদের যিনি পিতা, তিনি তো জানেন তোমাদের কী প্রয়োজন। তাই অবিশ্বাসীদের মতো প্রার্থনায় বারংবার অর্থহীন কথা বলে যাওয়ার কোন উপযোগিতা নেই। তবে, তার মানে এই নয় যে, ঈশ্বরের উদ্দেশে তোমাদের প্রার্থনা করার দরকার নেই। যদিও তিনি তোমাদের প্রয়োজন সম্পর্কে জানেন তবুও তাঁর প্রতি, তাঁর প্রতিজ্ঞার প্রতি তোমাদের বাধ্যতাকে প্রকাশ করার জন্য এবং তাঁকে তাঁর প্রাপ্য গৌরব ও প্রশংসা দেওয়ার জন্য তোমাদের প্রার্থনা করা প্রয়োজন।' মনে রাখবেন,

(ক) ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তাঁর অনুগ্রহ আমাদের সন্তানের মর্যাদা দিয়েছে– উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি আমাদের পিতা। তাই তাঁকে ডাকার জন্য যে সম্বোধন আমরা ব্যবহার করব তা হতে হবে যথেষ্টই সহজ ও স্বাভাবিক। কারণ জাগতিক পিতা-মাতার কাছে কোন কিছু চাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা বেশি কথা বলি না। আসুন, বিশ্বস্ততা-বাধ্যতা-ভালবাসায় আমাদের পিতা ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত হই। তাঁকে 'পিতা' সম্বোধন করে পবিত্র আত্মার পরিচালনায় আমাদের প্রার্থনায় প্রাসঙ্গিক বক্তব্য তুলে ধরি।

(খ) ঈশ্বর আমাদের প্রয়োজন সম্পর্কে আমাদের চেয়েও ভাল জানেন। সন্তানদের রক্ষার জন্য তাঁর চোখ পৃথিবীর সব জায়গায় থাকে (২ বংশাবলি ১৬:৯) এবং আমরা না চাইতেই তিনি আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন (যিশাইয় ৬৫:২৪); তাঁর এই কাজ আমাদের চাওয়া, চিন্তার উর্ধ্বে (ইফি ৩:২০)। যখন তিনি আমাদের কোন প্রার্থনায় সাড়া না দেন তখন বুঝতে হবে বাস্তবিকই আমাদের তা প্রয়োজন নেই কিংবা তা পাবার সময় তখনো আসে নি; কারণ তিনি তাঁর দূরদর্শিতায় আমাদের অযাচিত সমস্যা থেকে মুক্ত রাখতে চান। আরও একটি ক্ষেত্রে আমাদের এই সমাধান মেনে নিতে হবে যে, তিনি আমাদের বিষয়ে আমাদের চেয়েও অনেক বেশি জানেন। তাই, কেবল তাঁর উদ্দেশে আমাদের বাধ্যতা-বিশ্বস্ততার সাথে মুখ খুলে প্রয়োজনের বিষয়টি বলতে হবে। নিজেদের তাঁর সামনে নিবেদন করতে হবে। তবে, অবশ্যই অর্থহীন কথার পুনরাবৃত্তিকে পাশ কাটিয়ে। কারণ সদাপ্রভু আমাদের অভিপ্রায়ের ব্যাপারে জানেন (গীত ৩৮:৯)। প্রার্থনার ভাষা কেমন হল, কতটা সময় নিয়ে তা করা হল সে বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই; তার স্থলে সেই প্রার্থনা কতটা পবিত্র আত্মার নির্দেশনায় পরিচালিত হল সেদিকেই তাঁর লক্ষ্য থাকে। ফলে, পবিত্র আত্মা-নির্দেশিত প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্যতা পায়

(রোমীয় ৮:২৬)। ঈশ্বরকে প্রার্থনা শোনার এবং তাতে সাড়া দেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেওয়ার প্রয়োজন নেই; সেটা আমাদের অজ্ঞানতাপ্রসূত ঔদ্ধত্য বলেই বিবেচিত হয়। ঈশ্বরকে সাজেশন দেওয়ার চেয়ে আমরা যদি তাঁর কাছ থেকে সঠিক শিক্ষালাভে আন্তরিক হই তবেই আমরা প্রার্থনায় পাসমার্ক অর্জন করতে সমর্থ হব।

মথি ৬:৯-১৫

খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের প্রার্থনার বিষয়ে শিক্ষা দিতে গিয়ে কী ধরনের প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায় কেবল সে বিষয়ে নির্দেশনাই দিলেন না, উপরন্তু তিনি কী বলে সেই অর্থপূর্ণ প্রার্থনা করতে হবে তা-ও বলে দিলেন। যেহেতু আমরা জানি না যে কীভাবে আমাদের প্রার্থনা করতে হবে সেহেতু তিনি আমাদের সাহায্যার্থে প্রার্থনার একটি কাঠামো তৈরি করে দিলেন। 'তাই, তোমরা এভাবে প্রার্থনা কোরো' (৯ পদ)। খ্রীষ্ট লক্ষ্য করেছিলেন যে, যিহূদীদের প্রার্থনা পদ্ধতিতে অনেক সমস্যা ও অনিয়ম জেঁকে বসেছিল। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের জন্য একটি অনুসরণযোগ্য প্রার্থনা-কাঠামো দিলেন। প্রার্থনার সময় আমাদের অবশ্যই তাঁর এই মডেল অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমরা আর কোনভাবে প্রার্থনা করতে পারব না কিংবা কেবল একেই সবসময় আওড়ে যাব। খ্রীষ্ট আমাদের প্রার্থনার এই মডেলটি দিয়েছেন যেন আমরা বুঝতে পারি যে ঠিক কীভাবে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে তাঁর প্রার্থনার মডেল আমাদের প্রার্থনার 'শরীর' গড়ে দিতে সাহায্য করে। যেমন– শব্দ ব্যবহারে প্রয়োজনীয় মাত্রাজ্ঞান, বক্তব্যের স্পষ্টতা, প্রসঙ্গের ধারাবাহিক অবতাড়না, প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অংশের ব্যবহারে কী করে প্রার্থনার রচনাশৈলী গ্রন্থিত হবে তা আমরা খ্রীষ্টের প্রার্থনার মডেল থেকে শিখতে পারি। সে কারণেই লূকের লেখায় এই মডেলটির ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলে কিংবা প্রেরিতদের কাউকে এভাবে প্রার্থনা করতে না দেখলে আমরা অবাক হই না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমরা যে খ্রীষ্টের নামে প্রার্থনা করি তা আমরা কোত্থেকে পেলাম? অথবা ধরুন, এখানে আমরা শিখি যে, প্রার্থনার সময় আমাদের 'তোমার রাজ্য আসুক' বলতে হবে। কিন্তু খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের পর যেদিন শিষ্যদের ওপর পবিত্র আত্মা নেমে আসলেন সেদিনই তো সেই রাজ্য এসে গেল! তবে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, খ্রীষ্টের শেখানো প্রার্থনা আমাদের জন্য একটি কার্যকর প্রার্থনার মডেল বলে বিবেচিত হয়। এর ফলে আমরা প্রার্থনার শরীরতত্ত্বের বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে সমর্থ হই। তা ছাড়া, প্রায় তৃতীয় শতাব্দী থেকে যুগে যুগে মণ্ডলীগুলোতে এই প্রার্থনার ব্যবহারের ফলে (ড. হুইটবির মতে) খ্রীষ্টের শিষ্যদের মাঝে যে ধারাবাহিক ঐক্যের ছবি মূর্ত হয়ে ওঠে, সেটাও এর যথার্থতার বিষয়েই বলে। এই হচ্ছে আমাদের প্রভুর প্রার্থনা; খ্রীষ্ট নিজে তা গ্রন্থন করেছিলেন। শিষ্যদের তিনি তা করতেও নির্দেশ দিয়েছিলেন। কলেবরে সংক্ষিপ্ত হলেও বক্তব্যের বিচারে তা সম্পূর্ণ; যা আমাদের প্রার্থনাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে সাহায্য করে। এতে যেমন বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তেমনি অনুভূতিকে সঠিক মাত্রায় প্রকাশের আবশ্যকতাও ফুটে উঠেছে। আমরা যেন প্রার্থনার প্রতিটি কথা বুঝে তার সাথে একাত্ম হতে পারি– সেইজন্য এখানে অল্প কথায় প্রাসঙ্গিক সব বিষয়ের অবতাড়না করে

তাকে অর্থপূর্ণ করে প্রকাশ করা হয়েছে। এর ফলে তা গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠার পাশাপাশি বোধগম্যরূপে অর্থহীন কথার পুনরাবৃত্তিকে বর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রভুর প্রার্থনা (প্রতিটি প্রার্থনাই) হচ্ছে পৃথিবী থেকে স্বর্গের উদ্দেশে পাঠানো চিঠিবিশেষ। এই পত্র যোগাযোগে প্রেরক হচ্ছে প্রার্থনাকারী, ঈশ্বর হচ্ছেন প্রাপক এবং স্বভাবতই স্বর্গ হচ্ছে তাঁর ঠিকানা। বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে বলা যায়, আমাদের যাবতীয় অনুরোধ সেখানে বিবৃত হয়। পত্রের শেষে আমরা 'ইতি, তোমার রাজ্যের...' লিখে 'আমেন' বলে তাতে সিল-ছাপ্পর মেরে, তারিখের জায়গায় 'এই দিনে' উচ্চারণ করে তা স্বর্গের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিই।

যাহোক, প্রভুর এই প্রার্থনাকে আমরা তিনটি অংশে বিভক্ত করতে পারি।

ক. ভূমিকা; 'হে আমাদের স্বর্গীয় পিতা।' প্রার্থনার গভীরে প্রবেশ করার আগে কার কাছে আমরা প্রার্থনা করছি তা একটি প্রয়োজনীয় সম্বোধনের মাধ্যমে প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়। খ্রীষ্ট এখানে যে সম্বোধনটি ব্যবহার করেছেন তা হচ্ছে 'আমাদের পিতা'; এর দ্বারা এটাই প্রকাশ পায় যে, প্রার্থনায় আমাদের কেবল নিজের বিষয়ে বললেই হবে না বরং অন্যদের কথাও বলতে হবে; কারণ আমরা সবাই ঈশ্বরের অনুগ্রহের অধীন এবং অভিন্ন সহভাগিতায় আবদ্ধ। এখানে আমাদের কোন স্বর্গদূত বা মানুষ নয়, কেবল ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কারণ, মানুষ বা স্বর্গদূতের উদ্দেশে করা প্রার্থনার কোন উত্তর আসে না; তা ছাড়া ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তা পাপ বলে বিবেচিত হয়। প্রার্থনায় আমরা যে গৌরব ও সম্মানের কথা উল্লেখ করি, কোন মানুষ বা স্বর্গদূত তা পাবার যোগ্যতা রাখে না; শুধু তাই নয়, ঈশ্বরকে ডিঙিয়ে তাঁর সৃষ্টির কাছে প্রার্থনা করলে সাথে সাথে আমাদের প্রত্যাশিত অনুগ্রহের মৃত্যু ঘটে। তাই খ্রীষ্ট আমাদের কেবল ঈশ্বরের উদ্দেশেই প্রার্থনা করতে শিক্ষা দিলেন। ঈশ্বরকে কী বলে সম্বোধন করতে হবে সেটাও তিনি বললেন–

১. 'আমাদের পিতা'। এই সম্বোধন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক কতটা নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ । এ ছাড়া আমাদের জীবনে তাঁর প্রয়োজন কতখানি; ঘুরিয়ে বললে, আমরা তাঁর প্রতি কতটা নির্ভরশীল– তা-ও এই সম্বোধনের মাধ্যমে মূর্ত হয়ে ওঠে। সে কারণেই ঈশ্বরকে 'আমাদের পিতা' বলে সম্বোধন করা প্রয়োজন এবং আমরা তা অবশ্যই করব। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা হিসেবে তিনি সবার সর্বজনীন পিতা (মালা ২:১০; প্রেরিত ১৭:২৮)। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে বেছে নেওয়া লোকদের পিতা (ইফি ১:৫; গালা ৪:৬)। যে বিশেষ ব্যবস্থায় তিনি তাঁর বেছে নেওয়া লোকদের পিতা হয়েছেন তা সত্যিই অসাধারণ, অনন্য। এভাবে ঈশ্বরকে 'পিতা' হিসেবে সম্বোধন করার মাধ্যমে প্রার্থনার সময় আমাদের দৃষ্টি কেবল তাঁরই উপর নিবদ্ধ থাকে; ফলে আমরা তাঁকে ভাল চিন্তা-চাওয়ার বিষয়ে বলতে সমর্থ হই। তা বলার সময় আমাদের ভেতর কোন ভীতি কাজ করে না; তার স্থলে অপরিসীম উৎসাহ ও প্রশান্তি এসে ঈশ্বরের উদ্দেশে গ্রহণযোগ্য প্রার্থনা নিবেদন করতে সাহায্য করে। খ্রীষ্ট তাঁর প্রার্থনায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে 'পিতা' সম্বোধন করেছেন। যদিও আমরা দুর্বল, অসমর্থ; তবুও 'পিতা' হিসেবে তিনি আমাদের প্রতি মমতা করেন (গীত ১০৩:১৩), আমাদের শাস্তি থেকে রেহাই দেন (মালাখি ৩:১৭) এবং আমাদের জন্য যা ভাল তা করতে দ্বিধা করেন না (লূক ১১:১১-১৩) । তাই, তাঁর সামনে দাঁড়াতে আমাদের ভয় পাবার কোন কারণ নেই; বরং তাঁর পরামর্শক আত্মার সাহায্যে নির্দ্বিধায় আমরা আমাদের সমস্যা, প্রয়োজন সম্বন্ধে তাঁর কাছে খুলে বলতে

পারি। নিজেদের পাপের জন্য আমরা তাঁর কাছেই অনুতাপ করব যেমনটা অপব্যয়ী পুত্র করেছিল (লূক ১৫:১৮; যিরমিয় ৩:১৯)। পুত্রের অধিকার নিয়েই আমরা তাঁর কাছে অনুগ্রহ, শান্তি চাইব এবং তিনি তা আমাদের দেবেন; কারণ খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমরা ভালবাসা ও আশীর্বাদে পূর্ণ ঈশ্বরের সাথে নতুন সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছি (যিরমিয় ৩:৪)।

২. 'স্বর্গীয় পিতা'-এর মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের গৌরব ও মহিমার বিষয়ে বুঝতে সমর্থ হই। ঈশ্বর আমাদের স্বর্গীয় পিতা; তবে তার মানে এই নয় যে, তাঁর বিচরণ কেবল স্বর্গের মাঝেই সীমাবদ্ধ। বরং পরাক্রমশালী স্রষ্টা হিসেবে সৃষ্টিজগতের সর্বত্রই তাঁর বিচরণ। কিন্তু এখানে 'স্বর্গী' অভিধাটির দ্বারা আমরা তাঁর প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে অবগত হই; তিনি গৌরব ও মহিমায় পূর্ণ ঈশ্বর, যাঁর সিংহাসন স্বর্গে (গীত ১০৩:১৯)। বিশ্বাসীদের কাছে এই সিংহাসন অনুগ্রহের বলে স্বীকৃত এবং খ্রীষ্ট, যিনি আমাদের প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে দেন তিনি এখন স্বর্গে আছেন (ইব্রীয় ৮:১)। এই স্বর্গ মানুষের দৃষ্টিসীমার বাইরে অবস্থিত; যা পরিচিত আত্মার জগত হিসেবে; আর তাই প্রার্থনায় ঈশ্বরের সাথে আমাদের কথোপকথনও আত্মিক হওয়া উচিত। উর্ধ্বে, স্বর্গের উদ্দেশে প্রার্থনা করার সময় আমরা জাগতিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হই; ফলে আমাদের হৃদয় ঈশ্বরকে পাবার আকাঙ্ক্ষায় আকুল হয়ে ওঠে (গীত ৫:১)। স্বর্গ হচ্ছে বিশুদ্ধ ও পবিত্র স্থান, তাই ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করার সময় আমাদের খাঁটি অন্তঃকরণে অগ্রসর হতে হবে; যে হাত আমরা তাঁর উদ্দেশে তুলব তা যেন পবিত্র হয়, সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কারণ ঈশ্বর পবিত্র; যারা তাঁর সামনে আসবে তাদেরকে পবিত্র অন্তঃকরণ নিয়েই আসতে হবে (লেবীয় ১০:৩)। তিনি স্বর্গ থেকে সমস্ত মানুষকে লক্ষ্য করেন (গীত ৩৩:১৩, ১৪); তাই প্রার্থনায় আমরা যেন তাঁর সেই দৃষ্টি, অবস্থিতি উপলব্ধি করি; তা করলে আমাদের সমস্যা, চাওয়া, বোঝা, দুর্বলতা তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়। যদিও তিনি আমাদের বিষয়ে সবই জানেন; তবুও তিনি চান যেন আমরা তাঁর অসীম ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাসে ও বাধ্যতায় তাঁর প্রশংসা করি (গীত ১৫০:১)। পিতা হিসেবে তিনি আমাদের কেবল সাহায্যই করেন না; উপরন্তু এমন মহান সব দান দেন যা আমরা ঘুর্ণাক্ষরেও ভাবিনি কিংবা চাইনি। তিনি তাঁর অসীম অনুগ্রহেই আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন। ঈশ্বর আমাদের পিতা, তাই তাঁর কাছে আসার সময় আমাদের ভয় পাবার কোন কারণ নেই। তিনি আমাদের স্বর্গীয় পিতা, তাই তাঁর কাছে আমরা সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে উপস্থিত হব (উপদেশক ৫:২)। এভাবে খ্রীষ্টীয় হিসেবে যে ফলপ্রসূ প্রার্থনার কথা আমরা চিন্তা করি তা সার্থক হয়ে ওঠে– আমাদের প্রার্থনা অকুস্থলে অর্থাৎ স্বর্গে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছায়। তাই, ঈশ্বর ও স্বর্গের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আমাদের প্রতিটি প্রার্থনা পরিচালিত হওয়া উচিত; যেহেতু ঈশ্বরই আমাদের প্রার্থনার গন্তব্য, শ্রবণকারী। প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা আমাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে অর্থাৎ ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হতে সমর্থ হই। আর এই লক্ষ্যপূরণে আমাদের অবশ্যই উদগ্রীব হতে হবে; কারণ তাঁর সান্নিধ্যই তো আমাদের এক ও অদ্বিতীয় চাওয়া।

খ. আবেদন; এখানে মোট ছয়টি আবেদন বিবৃত হয়েছে; প্রথম তিনটি ঈশ্বর ও তাঁর সম্মানের বিষয়ে এবং পরের তিনটি আমাদের নিজেদের বিষয়ে। ফলে এখানে আত্মিক ও জাগতিক প্রসঙ্গের এক অপূর্ব মিশেল পরিলক্ষিত হয়। যেমনটা আমরা 'দশ আজ্ঞার' বেলায় দেখে থাকি; যেখানে প্রথম চারটি আদেশ ঈশ্বরের প্রতি আমাদের করণীয় সম্বন্ধে এবং পরের চারটি প্রতিবেশীদের প্রতি আমাদের করণীয়ের বিষয়ে শিক্ষা দেয়। প্রভুর

প্রার্থনার এই মডেল আমাদের প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর ধার্মিকতার বিষয়ে চিন্তা করতে নির্দেশ দেয়। প্রসঙ্গানুক্রমে এরপর বাকিগুলোও যুক্ত করা যাবে।

১. 'তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক' (ইংরেজিতে 'পবিত্র বলে মান্য হোক' এর স্থলে 'হ্যালোউড' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে; যা অন্যত্র 'স্যাংটিফাইড' দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। প্রভুর প্রার্থনায় 'হ্যালোউড' শব্দটির ব্যবহারের আধিক্য ও পরিচিতির কথাটি মাথায় রেখে লেখক এই পুরানো শব্দটিকেই বহাল রেখেছেন)। এই কথার দ্বারা (১) আমরা ঈশ্বরকে তাঁর প্রাপ্য গৌরব দিই; ফলে একে আবেদন না বলে উপাসনা বলাটাই শ্রেয়। 'তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক' বলে আমরা ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করি এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ ত্বকে স্বীকার করে নিই; কারণ তাঁর পবিত্রতা মহান এবং নিখুঁত। ঈশ্বরকে প্রশংসা দেবার মাধ্যমে আমাদের প্রার্থনা শুরু করতে হবে। তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহ লাভে তাঁর গৌরব করার বিকল্প নেই; কারণ আমাদের সেবা ও উপাসনার একমাত্র দাবিদার তো তিনিই। তাই, আসুন প্রথমে তাঁকে তাঁর অপার পূর্ণতার জন্য গৌরব দিই এবং তারপর তাঁর কাছ থেকে উপকার লাভের প্রত্যাশা করি। (২) আমরা ঈশ্বরকে প্রথম স্থান দিই; এবং এটাই হওয়া উচিত। ঈশ্বরকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিয়ে নিজেদের অনুরোধ, আবেদনকে শেষে স্থান দেওয়ার ফলে ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনার 'মুখ্য উদ্দেশ্যে' পরিণত হন; এর ফলে আমরা ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করতে সমর্থ হই। প্রথমে ঈশ্বরের প্রশংসা পরে যা কিছু অনুরোধ, আবদার– এরকমটা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যেমন, 'পিতা, তোমার গৌরব করি যে, তুমি আমাকে আজকের দিনে প্রয়োজনীয় খাবার দিয়েছ, আমার পাপ ক্ষমা করেছ।' সবই তাঁর কাছ থেকে, তাঁর মধ্য দিয়ে আসে; তাই সবকিছুর জন্যই ঈশ্বরের প্রশংসা করতে হবে। প্রার্থনায় আমাদের যাবতীয় চিন্তা, অনুভূতির যেন একটাই লক্ষ্য থাকে– ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করা। লোকদের কাছে প্রশংসিত হবার ইচ্ছা থেকে ফরীশীরা তাদের প্রার্থনায় নিজেদের সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিত (৫ পদ)। যেহেতু খ্রীষ্ট আমাদের 'ফরীশীদের খামি' থেকে সাবধান হতে নির্দেশ দিয়েছেন, তাই ফরীশীদের মতো না করে ঈশ্বরকেই আমাদের প্রার্থনার 'মুখ্যব্যক্তি' হিসেবে গণ্য করা উচিত। যাবতীয় আবেদন, অনুরোধের কেন্দ্রে তাঁর অবস্থান প্রার্থনাকে সুদৃঢ় করে; যেমন, '...তুমি তা কর যেন এর মধ্য দিয়ে তোমার গৌরব প্রকাশিত হয়।' (৩) আমরা প্রার্থনা করি যেন এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের নাম বা ঈশ্বর স্বয়ং আমাদের ও অন্যদের দ্বারা গৌরবান্বিত হন; যেন প্রত্যেকে তাঁর পবিত্রতার স্বরূপ দেখতে পায়। এর সাথে আমাদের আরও একটি চাওয়া থাকে– তিনি নিজেই যেন তা করেন। 'পিতা, পিতা ও স্বর্গীয় পিতা হিসেবে তোমার নাম গৌরবান্বিত হোক; আমরা তোমার দয়া, সততা, মহিমা ও মর্যাদার গৌরব করি। তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক; কারণ এই নাম পবিত্র; সমস্ত নামের চেয়েও মহান। প্রভু, তুমি তোমার মহানামের পরাক্রম দেখাও।' তাই, যখন আমরা প্রার্থনা করি তখন যেন ঈশ্বর গৌরবান্বিত হন। এর মধ্য দিয়ে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রকাশ পায়– (ক) ঈশ্বরকে গৌরব দান করার বিষয়টিই আমাদের কাছে মুখ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে; কারণ ঈশ্বর বলেছেন যে, তিনি তাঁর নামকে পবিত্র করবেন এবং সব জাতি তাকেই গৌরব দান করবে (গীত ৪৬:১০)। (খ) আমরা নিশ্চিত জানি যে, আমরা যা চাইছি ঈশ্বর তা কবুল করবেন; কারণ আমাদের প্রভু যখন প্রার্থনায় বলেছিলেন 'পিতা, তুমি তোমার নামের গৌরব প্রকাশ কর' তখন এর উত্তরে ঈশ্বর বলেছিলেন, 'আমি তা গৌরবান্বিত করেছি এবং আবার তা করব'।

২. 'তোমার রাজ্য আসুক;' লোকদের কাছে প্রচার করার সময় খ্রীষ্ট এই কথাটিই বলেছিলেন। তার আগে যোহনকে আমরা একথা বলতে শুনি। পরবর্তী সময়ে খ্রীষ্ট যখন তাঁর শিষ্যদের প্রচার করতে পাঠিয়েছিলেন তখন তারাও 'স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট' বলে লোকদের কাছে প্রচার করেছিলেন। আমাদের স্বর্গীয় পিতা ও খ্রীষ্টের রাজ্য কাছে এসে গেছে। প্রার্থনা করুন যেন তা আসে। মনে রাখুন, প্রার্থনার সময় ঈশ্বরের রাজ্য, তাঁর প্রতিজ্ঞার বিষয়ে ইতিবাচক প্রত্যাশা ব্যক্ত করি। আমাদের হৃদয়ে যেন 'তোমার রাজ্য আসুক' কথাটি প্রতিধ্বনিত হয়। যেমন- খ্রীষ্টের 'আমি শীঘ্রই আসছি'– এই প্রতিজ্ঞার প্রত্যুত্তরে আমরা যেন বলি, 'তুমি আস প্রভু'; তেমনি প্রচারকেরা 'ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট' বলে প্রচার করলেও প্রার্থনার সময় তারা বলবেন, 'তোমার রাজ্য আসুক'। ঈশ্বর আমাদের কাছে যেসব প্রতিজ্ঞা করেছেন সেসবের আশুবাস্তবায়ন কামনা করে আমরা প্রার্থনা করব; নতুন কোন প্রতিজ্ঞা কিংবা কোনটার স্থানচ্যুতির জন্য নয়। ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞাসমূহ আমাদের প্রার্থনায় উৎসাহ জোগায়। ফলে, তাঁর কোন প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নের সময় ঘনিয়ে আসলে আমরা উন্মুখ হয়ে তার পূর্ণতা কামনা করি; যেমন– 'স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট'– এর স্থলে আমরা বলি, 'তোমার রাজ্য আসুক'। ইস্রায়েলের মুক্তির সময় ঘনিয়ে আসার বিষয়টি উপলব্ধি করে দানিয়েলও এভাবে প্রার্থনা করেছিলেন (দানিয়েল ৯:২; আরও দেখুন লূক ১৯:১১)। ঈশ্বরের উদ্দেশে যিহূদীদের প্রাত্যহিক প্রার্থনা ছিল এমন– 'তিনি তাঁর রাজ্য স্থাপন করুন, তাঁর উদ্ধার সমুন্নত করুন এবং প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্টকে পাঠিয়ে তাঁর লোকদের মুক্ত করুন' (ড. হুইটবি)। তাই আসুন, প্রার্থনার সময় ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে তাঁর উদ্দেশে বলি, 'তোমার রাজ্য আসুক; পৃথিবীর সর্বত্র সুসমাচার প্রচারিত ও আদৃত হোক। তুমি তোমার পুত্রের বিষয়ে শাস্ত্রে যা বলেছ তা উপলব্ধি করে অবিশ্বাসীরা খ্রীষ্টকে তাদের পরিত্রাণকর্তা ও জীবনের অধিকর্তারূপে গ্রহণ করুক। মণ্ডলীসমূহের যত সীমাবদ্ধতা, যত জড়তা– সব কেটে যাক; খ্রীষ্টের রাজ্য এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হোক এবং এর নাগরিক হিসেবে সমস্ত মানুষ তোমাকে গৌরব ও প্রশংসা দিক।'

৩. 'তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও সিদ্ধ হোক'। ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন সংশ্লিষ্ট এই প্রার্থনা করার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সব নিয়ম ও আদেশের প্রতি বাধ্য থাকার বিষয়টি প্রকাশ করি। 'ঈশ্বরের ইচ্ছা সিদ্ধ হোক'– এ কথার দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে, খ্রীষ্টের রাজ্য এসে গেছে এবং তা এসেছে স্বর্গ-রাজ্য হিসেবে। খ্রীষ্টের এই রাজ্যকে 'পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য' হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে। খ্রীষ্টকে আমাদের 'রাজা' বলে স্বীকার করে আমরা যদি তাঁর ইচ্ছেমতো না চলি তবে তো আমরা তাঁকে নামে মাত্রই রাজা বলি। তিনিই যদি আমাদের রাজা হবেন তবে তো তাঁর আদেশ-নির্দেশই আমাদের জীবনের একমাত্র কর্তব্য বলে বিবেচিত হবে। লক্ষ্য করুন,

(১) প্রার্থনার বিষয়– 'তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হোক'। 'প্রভু, তুমি যা ভাল মনে কর, আমার জীবনকে নিয়ে তা-ই কর (১ শমূয়েল ৩:১৮); আমি তোমার কাছে নিজেকে নিবেদন করছি এবং তোমার পরামর্শ মতো চলতে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।' এই দৃষ্টিকোণ থেকেই খ্রীষ্ট এই বলে প্রার্থনা করেছিলেন, 'তবু আমার ইচ্ছামতো নয় তোমার ইচ্ছামতো হোক'। তাই আসুন অনুরূপভাবে আমরাও বলি, "তোমাকে সন্তুষ্ট করতে আমাকে সমর্থ করে তোল এবং সেই অনুগ্রহ আমাকে দান কর যা আমাকে তোমার ইচ্ছা বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান জোগাবে; তোমার ইচ্ছার প্রতি বাধ্যতা এনে দেবে। আমার ও অন্যদের জীবনে

মাংসিক অভিলাষ, কামনা-বাসনা (১ পিতর ৪:২) কিংবা শয়তানের অভিপ্রায়ের স্থলে কেবল তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ কর। আমাকে সাহায্য কর, যেন আমার কোন কাজ তোমাকে ক্ষুব্ধ করে না তোলে এবং তোমার সব কাজে আমার সায় থাকে।"

(২) প্রার্থনার ধরন; এখানে স্বর্গের ন্যায় পৃথিবীতেও ঈশ্বরের ইচ্ছা সিদ্ধ হবার কথা বলা হয়েছে। পৃথিবী হচ্ছে আমাদের পরীক্ষার স্থান। এখানে আমাদের করা প্রতিটি কাজ ঈশ্বর মূল্যায়ন করবেন। জীবদ্দশায় আমরা যা করি তা মৃত্যুর পর সংশোধনের কিংবা তার দায়ভার এড়ানোর কোন সুযোগ নেই; কারণ ঈশ্বর আমাদের প্রতিটি কাজের দিকে আগ্রহভরে লক্ষ্য রাখেন। অপরদিকে, স্বর্গ হচ্ছে আনন্দ ও বিশ্রামের স্থান। তাই, আমরা প্রার্থনায় এই আশা ব্যক্ত করি যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা বাস্তবায়নের ফলে, পৃথিবী স্বর্গের মতো হবে (সেই পৃথিবী– যা শয়তানের ইচ্ছা পালনে ডুবে আছে; নরকের সাথে যার খুব একটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না) এবং ঈশ্বরভক্তেরা ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতায় ও উপাসনায় স্বর্গদূতদের মতো হয়ে উঠবে। আমরা পৃথিবীতে আছি; কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আমরা পৃথিবীর অধীন নই। আমরা কেবল জীবিতদের জন্যই প্রার্থনা করি। যা মৃত, যা নির্জনতায় চলে গেছে তার জন্য প্রার্থনা করি না।

৪. 'যে খাবার আমাদের দরকার তা আজ আমাদের দাও'। আত্মিক জীবনকে সমুন্নত রাখার জন্য আমাদের বেঁচে থাকতে হয়। আর বেঁচে থাকার জন্য আমাদের মৌলিক চাহিদাসমূহ মেটানো জরুরি হয়ে পড়ে। তাই, আমরা যেন নিরুদ্বিগ্নভাবে ঈশ্বরের রাজ্যের কথা মানুষের কাছে প্রকাশ করতে এবং তাঁর ইচ্ছামতো চলতে পারি সেজন্য ঈশ্বরই আমাদের 'নিত্যপ্রয়োজন' মিটিয়ে থাকেন। তাঁর কাছ থেকে এই সাহায্য আমরা উপহার হিসেবেই পাই। তিনি চান যেন এর মধ্য দিয়ে তাঁর গৌরব প্রকাশিত হয়। বেঁচে থাকার জন্য আমাদের খাবারের প্রয়োজন; তা যেমন দিনের শুরুতে তেমনি বাকি দিনগুলোর জন্যও। তাই, আমরা প্রার্থনায় ঈশ্বরকে বলি যেন তিনি আমাদের প্রয়োজনীয় খাবার জুগিয়ে দেন। এই প্রক্রিয়াটি পৃথিবীতে আমাদের সত্যিকারের চিত্র তুলে ধরে (হিতোপদেশ ৩০:৮) । যেখানে ব্যক্তি, শ্রেণীচরিত্র, সামাজিক অবস্থান ভেদে খাবারের ধরনও পাল্টে যায়। নিজের, পরিবারের এমনকি পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কাছে বেঁচে থাকার গুরুত্ব আ-কাশস্পর্শী। স্বভাবতই 'যে খাবার আমাদের দরকার তা আজ আমাদের দাও'– কথাটির দ্বারা আমরা ঈশ্বরের কাছে ক্ষুধার বিপরীতে নিজেদের অসহায়ত্বকে স্বীকার করে নিয়ে তাঁর সাহায্য কামনা করি।

লক্ষ্য করুন, এখানে প্রতিটি শব্দেই একেকটি শিক্ষা বিবৃত হয়েছে।

(১) আমরা ঈশ্বরের কাছে 'খাবার' চাইছি; যা আমাদের সংযমী হতে শিক্ষা দেয়। আমরা তাঁর কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিংবা রাজকীয় খানার আবদার করি না বরং পরিমিত মাত্রায় খাবার জুগিয়ে দেবার আবেদন জানাই; কারণ মাত্রাতিরিক্ত কোন কিছুই আমাদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনে না।

(২) আমরা 'আমাদের জন্য' খাবার চাইছি; যা আমাদের সৎ ও পরিশ্রমী হতে শেখায়; অসদুপায়ে অন্যকে ঠকিয়ে অন্যের মুখের গ্রাস মুখে পুরে রাখার কথা বলে না (হিতোপদেশ ২০:১৭) এমনকি চাকরি না করে অলসভাবে শুয়ে-বসে খাবারের জন্য অপেক্ষা করার কথাও বলে না (হিতোপদেশ ৩১:২৭); বরং সততার সাথে পরিশ্রম করে রুটি রুজির বিষয়েই শিক্ষা দেয়।

(৩) ঈশ্বরের কাছে আমাদের 'প্রতিদিনের' খাবার চাইছি; যা আমাদের আগামী দিনের বিষয়ে উদ্বিগ্ন না হতে শিক্ষা দেয় (৩৪ পদ)। অন্যরা যেখানে রুটি রুজির বিষয়ে অতিমাত্রায় ভাবিত হয়, সেখানে আমরা ঈশ্বরের দয়ার ওপর আস্থা রাখব। কারণ এর ফলে আমরা ঈশ্বরের স্বর্গীয় পরিচালনার প্রতি যত্নবান হয়ে উঠি।

(৪) আমরা 'ঈশ্বরের কাছে' চাই যেন তিনি আমাদের তা দান করেন। তাঁর এই দানের সাথে কোন লেনদেন বা ঋণের তুলনা চলে না। ঈশ্বর নিঃস্বার্থভাবে আমাদের তাঁর অনুগ্রহে সিক্ত করেন। একমাত্র তাঁর অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করার মাধ্যমেই আমরা প্রতিদিনের খাবারের বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে সমর্থ হই। শাস্ত্রে আমরা এমন অনেকের কথা পড়ি যারা তাদের প্রতিদিনের খাবারের জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করতেন।

(৫) আমরা চাই যেন তিনি সেই খাবার 'আমাদের' দেন। এর মাধ্যমে আমরা কেবল নিজের জন্যই নয় উপরন্তু যারা অভুক্ত অবস্থায় দিনপাত করছে তাদের জন্যও খাবার চেয়ে থাকি। এ থেকে আমরা দানের বিষয়ে শিক্ষা পাই। ঈশ্বর চান যেন আমরা অসহায়-দরিদ্রদের প্রতি আমাদের সাহায্যের হাত প্রসারিত করি। 'সেই খাবার আমাদের দাও'– এ বাক্যটি আমাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়– আমরা যেন পারিবারিক প্রার্থনায় অংশ নিই এবং পারিবারিক বন্ধন অটুট রেখে একসাথে খাওয়া দাওয়া করি।

(৬) আমরা প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বর আমাদের 'আজকের দিনের' খাবার জুগিয়ে দেন; যা আমাদের প্রতিদিন নতুনভাবে তাঁর কাছে আত্মায় সমর্পিত হতে শেখায়। আমাদের জীবনে প্রতিদিন যেভাবে নতুন করে খাবারের চাহিদা অনুভূত হয়; যেভাবে আমরা প্রতিদিন নতুন করে ক্ষুধার্ত হই ঠিক সেভাবে ঈশ্বরের সাথে মিলিত হবার ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিদিন নতুন করে তাগিদ অনুভব করা প্রয়োজন। সেইজন্য প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা প্রতিদিন ঈশ্বরের উদ্দেশে আমাদের 'নতুন প্রত্যাশা' রাখি। খাবার ছাড়া দৈহিকভাবে বেঁচে থাকাটা যেমন অসম্ভব তেমনি প্রার্থনা ছাড়া আমাদের আত্মিকজীবনও অচল হয়ে পড়ে। তাই, প্রার্থনাহীন একটি দিনও যেন আমরা না কাটাই– সেদিকে আমাদের সজাগ থাকতে হবে।

৫. এবং 'যারা আমাদের ওপর অন্যায় করে, আমরা যেমন তাদের ক্ষমা করেছি তেমনি তুমিও আমাদের সমস্ত অন্যায় ক্ষমা কর।' আগের আবেদনের সাথে একে যুক্ত করে দেওয়ার ফলে আমরা প্রাত্যহিক জীবনে এর গুরুত্বের বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম হই। ঈশ্বরের কাছ থেকে পাপের ক্ষমা না পেলে আমরা কার্যকর আত্মিক জীবন যাপনে এগিয়ে যেতে ব্যর্থ হই। কারণ ঈশ্বর তখন আমাদের দিক থেকে তাঁর অনুগ্রহের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। ফলে আমাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। প্রার্থনায় আমাদের প্রতিদিনকার পাপের জন্য ঈশ্বরের ক্ষমা চাইতে হবে যেমনটা আমরা প্রতিদিনের খাবারের জন্য করে থাকি; কারণ পাপ ক্ষমা না করা হলে আমরা এমন উৎসর্গের পশুর মতো হই যাকে খাইয়ে মোটাতাজা করা হচ্ছে। 'যে স্নান করে তাকেও তার পা ধুতে হয়।' দু'টি বিষয় এখানে লক্ষণীয়–

(১) একটি আবেদন; প্রার্থনায় আমরা ঈশ্বরের কাছে নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা চাই। মনে রাখুন, (ক) পাপ হচ্ছে এক প্রকার দেনা; যখন আমরা পাপ করি তখন আমরা ঈশ্বরের সমীপে দেনাগ্রস্ত হই। তাই তাঁর কাছে আমরা আবেদন জানাই যেন তিনি আমাদের ওপর থেকে দেনারূপ পাপের দুর্বহ বোঝা দূর করেন। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে যে 'ক্রোধ' আমরা কিনি তা আমাদের শাস্তির মুখোমুখি দাঁড় করায়। ব্যবস্থা আমাদের

দায়ী করে বলে যে, আমরা ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্য করেছি। তাই, প্রার্থনায় আমরা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। এর ফলে তিনি হয়তো আমাদের পাওনা শাস্তির হাত থেকে রক্ষা করবেন। দোনাদারকে যেমন পাওনাদারের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হয়, তেমনি আমাদেরও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে পাপের ক্ষমা চাইতে হবে। মনে রাখুন, ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণকারীকে ব্যবস্থা 'দেনাদার' সাব্যস্ত করে। (খ) প্রতিদিন আমাদের প্রার্থনায় ঈশ্বরের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইতে হবে। এর ফলে তিনি হয়তো আমাদের পাপ ক্ষমা করে এর শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেবেন; আর আমাদের 'দোষী বলেও স্থির করা হবে না'। তাঁর এই ক্ষমা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য অনুপম সান্ত্বনা বয়ে আনবে। নিজেদের পাপের জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে আমরা পাপের শাস্তির বিরুদ্ধে আপিল করি। এবং খ্রীষ্টের মধ্যস্থতায় আগাম জামিন নিয়ে আশু গ্রেপ্তারি পরোয়ানা (শাস্তি) এড়াই।

(২) আবেদনকে জোরালো করার জন্য একটি যুক্তি; 'আমরা যেমন আমাদের ওপর অন্যায়কারীদের ক্ষমা করেছি'। বলা বাহুল্য, এই যুক্তিটি আমাদের যোগ্যতা নয় বরং ঈশ্বরের অনুগ্রহের শক্তিকেই প্রকাশ করে। মনে রাখুন, নিজেদের পাপের জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাওয়ার আগে আমাদের বিরুদ্ধে অন্যদের করা অন্যায় আচরণ ক্ষমা করতে হবে। যদি তা না করেই কেউ প্রভুর প্রার্থনায় অন্যদের ক্ষমা করার মিথ্যে যুক্তি দেখায় তবে সে নিজের ওপরই অভিষাপ ডেকে আনে। তাই, নিজেদের অবস্থানকে পরিষ্কার করার জন্য যারা আমাদের ওপর অন্যায় করে তাদের ক্ষমা করে দিতে হবে। উদাহরণ হিসেবে আমাদের কাছ থেকে টাকা ধারকারীর কথা বলা যায়। কেউ যদি আমাদের কাছ থেকে টাকা ধার করে; তবে তা পাবার জন্য আমরা যেন অতিমাত্রায় ব্যস্ত না হই। কিংবা তার ওপর অন্যায় চাপ প্রয়োগ না করি। যদি দেখা যায়, সেই ব্যক্তিটি ধারের টাকা পরিশোধে একেবারেই অক্ষম তখন যেন আমরা তার ঋণ ক্ষমা করে দিই। কিন্তু এখানে মূলত যারা আমাদের আহত করে তাদের বিষয়ে বলা হয়েছে। আমরা যেন তাদের খারাপ ব্যবহারের (৫:৩৯) বিপরীতে নিরুত্তর থেকে তাদের ক্ষমা করে দিই এবং মনের ভেতর কোন প্রকার ক্ষোভ পুষে না রাখি। ক্ষমা ও শান্তির জন্য আমাদের এই কাজ ঈশ্বরের কাছে যোগ্যতা বলে বিবেচিত হয়। তা আমাদের মনে আশা জোগায় যে, ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করবেন। এ বিষয়ে আমরা তখনই নিশ্চিত হই যখন আমরা নিজেদের হৃদয়ে 'ক্ষমার' উপস্থিতি অনুভব করতে সক্ষম হই; নিঃশর্তভাবে অন্যদের ক্ষমা করতে পারি। তাই, ঈশ্বরের কাছ থেকে পাপের ক্ষমা পেতে প্রথমেই আমাদের অন্যের অন্যায় আচরণ ক্ষমা করতে হবে।

৬. 'আমাদের তুমি পরীক্ষায় পড়তে দিয়ো না, বরং শয়তানের হাত থেকে সুরক্ষা দাও।' এই আবেদনে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু'প্রকার বক্তব্যই ফুটে উঠেছে। এবারে দেখা যাক প্রথমে বর্ণিত নেতিবাচক বক্তব্যটি।

(১) 'আমাদের তুমি পরীক্ষায় পড়তে দিয়ো না'; আমরা প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষমা করেন; স্বভাবতই এর মাধ্যমে আমরা তাঁর কাছে পাপ থেকে বিরত থাকার বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করি। ফলে, আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনায় বলি যেন তিনি আমাদের পরীক্ষার সময় পাপে পতিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেন। তবে এমনটা ভাবা মোটেও ঠিক নয় যে, ঈশ্বর আমাদের পাপে ফেলেন। বরং নিজেদের দোষেই আমরা পাপে পতিত হই। প্রার্থনায় আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে সাহায্য চাই যেন গর্জনকারী সিংহরূপ

শয়তান আমাদের ওপর বিজয়ী না হয় এবং পরীক্ষার সময় ঈশ্বর যেন আমাদের ছেড়ে না যান (গীত ১৯:১৩)। কারণ আমরা দুর্বল, অক্ষম। 'হে প্রভু, পাপের ফাঁদ থেকে, পাপে পতিত হবার মতো পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া থেকে তুমি আমাদের রক্ষা কর।' পরীক্ষার ফলে আমরা প্রতিকূল পরিস্থিতি, সমস্যার মুখোমুখি হই; আর সে কারণেই আমরা ঈশ্বরের কাছে সাহায্য যাচনা করি যেন তিনি আমাদের পরীক্ষার পেছনে পাপে পতিত হবার যে 'বিপদ' লুকিয়ে থাকে তা থেকে রক্ষা করেন; আমরা যেন পরীক্ষায় 'পড়ে' (পতিত) না যাই।

(২) ইতিবাচকভাবে আমরা ঈশ্বরকে শয়তানের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করার আহ্বান জানাই। শয়তান আমাদের ওপর পরীক্ষা নিয়ে আসে; তাই আমরা ঈশ্বরের কাছে সাহায্য যাচনা করি যেন তিনি আমাদের শয়তান কর্তৃক আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেন এবং আমাদের ওপর তাকে বিজয়ী হতে না দেন। 'শয়তানের হাত থেকে' অর্থাৎ সমস্ত মন্দ কাজ– যা ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করে– তা থেকে আমরা যেন বিরত থাকতে পারি সেজন্য আমরা প্রার্থনায় ঈশ্বরের পরিচালনা চাই। 'প্রভু, সমস্ত মন্দতা, জাগতিক মোহ-লালসা থেকে তুমি আমাদের রক্ষা কর। সাহায্য কর, যেন কোন অবস্থাতেই তোমার বিরুদ্ধে গিয়ে পাপ না করি এবং তার দরুন মৃত্যুর হুল আমাদের না বিঁধে। তুমি আমাদের স্বভাবের ওপর থেকে মন্দতার প্রভাব দূর কর। রক্ষা কর মন্দ লোকদের হাত থেকে, যারা আমাদের জন্য ফাঁদ রচনা করে এবং আমাদের তার শিকার বানায়।

গ. উপসংহার: 'যেহেতু রাজ্য, পরাক্রম ও গৌরব চিরকাল তোমারই, আমেন'। কেউ কেউ এ প্রসঙ্গে ঈশ্বরের উদ্দেশে করা দায়ূদের প্রার্থনাটি উদ্ধৃত করেন, 'হে সদাপ্রভু, মহিমা, শক্তি, জাঁকজমক, জয় আর প্রশংসা তোমার' (১ বংশাবলি ২৯:১১)। এটা হচ্ছে

১. এক ধরনের আত্মপক্ষ সমর্থন যা আমাদের প্রার্থনাকে শক্তিশালী করে। ঈশ্বরের কাছে নিজের পক্ষে বলা এবং তাঁর কাছে নালিশ জানানোটা আমাদের কর্তব্যের মাঝেই পড়ে (ইয়োব ২৩:৪)। তবে তা ঈশ্বরকে প্রভাবিত করার জন্য নয়; বরং আমরা যেন তাঁর প্রতি বিশ্বাসে অটল থাকতে উৎসাহ পাই সেজন্যই এর মাধ্যমে আমরা আমাদের হৃদয়ের ব্যাকুলতাকে প্রকাশ করি। তবে, এখানে অবশ্য ঈশ্বরের শক্তি ও গৌরবের কথাই বিবৃত হয়েছে। প্রার্থনায় আমাদেরকে তাঁর শক্তি ও গৌরবের কথা উল্লেখপূর্বক নিজেদের অনুরোধ, আবেদন তাঁর কাছে তুলে ধরতে হবে; এর ফলে প্রার্থনার উত্তর পেতে আমরা যে কতটা ব্যাকুল হয়ে আছি তা প্রকাশ পায়। যেহেতু রাজ্য, পরাক্রম ও গৌরব একমাত্র ঈশ্বরেরই সেহেতু তাঁর কাছেই আমরা আমাদের সমস্ত অনুরোধ, আবেদন অর্পণ করি। কারণ আমরা জানি যে, আমাদের যাবতীয় আবেদন তাঁর রাজ্য, পরাক্রম ও গৌরবের এখতিয়ারেই পড়ে। প্রথম তিনটি আবেদনের সাথে শেষের এই কথাটির এক অদ্ভুত মিল রয়েছে; 'স্বর্গীয় পিতা, তোমার রাজ্য আসুক, যেহেতু এ রাজ্য তোমার; তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হোক, যেহেতু তোমার ক্ষমতা অসীম; তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক যেহেতু গৌরব তোমারই।' ঈশ্বরের এই পরিচয় আমাদের প্রাত্যহিক কাজেও উৎসাহ জোগায়। যেমন: 'রাজ্য তোমারই'– ঈশ্বরের রাজ্যের প্রজা হিসেবে আমাদের কোন প্রকার দুর্ভাবনার অবকাশ নেই। রাজা হিসেবেই তিনি আমাদের সাহায্য ও রক্ষা করেন। কারণ পৃথিবীর শাসন ক্ষমতার ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে; এবং তিনি তাঁর লোকদের সুরক্ষাদানে সক্ষম। 'পরাক্রম তোমারই'– এই ক্ষমতা তিনি তাঁর সেই গৌরবের রাজ্য পরিচালনায় এবং তাঁর লোকদের উপকারের নিমিত্তে

প্রয়োগ করেন। 'গৌরব তোমারই'– প্রার্থনার উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর গৌরব প্রকাশ করেন। প্রার্থনায় ঈশ্বরের উদ্দেশে নিজেদের আবেদন তুলে ধরে ঈশ্বরভক্তরা তাঁর প্রশংসায় মেতে ওঠার অপেক্ষায় থাকেন। কারণ প্রার্থনার উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর গৌরব প্রকাশ করবেন– এই বিশ্বাস তাদের মনে অনুপ্রেরণা, সান্ত্বনা ও পবিত্র আত্মবিশ্বাস এনে দেয়।

২. ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও প্রশংসা দেবার এক চমৎকার উপলক্ষ। ঈশ্বরের কাছে নিজেদের আবেদন তুলে ধরার পাশাপাশি তাঁর প্রশংসা করাটা আবশ্যক; কারণ এর ফলে আমরা তাঁর কাছ থেকে আরও বেশি পরিমাণে অনুগ্রহ লাভের যোগ্যতা অর্জন করি। তবে, তাঁর প্রশংসা করার সময় আমরা কী বলছি অর্থাৎ তাঁকে কী বলে সম্বোধন করছি, তাঁর কোন মহিমার কথা উল্লেখ করছি– সে বিষয়ে আমাদের সচেতন থাকতে হবে; লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তা গভীর শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হয়। প্রার্থনাকে কেবল নিজেদের অভাব, অনুযোগ জানাবার 'অবলম্বন' বিবেচনা না করে বরং ঈশ্বরকে গৌরব দানের সুযোগ হিসেবেই গণ্য করা উচিত। পাশাপাশি এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমরা তাঁকে গৌরব দিই কারণ এটা তাঁর প্রাপ্য। এমন নয় যে, আমাদের কাছ থেকে প্রশংসা না পেলে তাঁর চলবে না। কিন্তু যা তাঁর প্রাপ্য, যা আমাদের কর্তব্য তা করতে আমাদের বাধা কোথায়? মনে রাখুন, স্বর্গে স্বর্গদূতরা সবসময় তাঁর প্রশংসা করে চলেছেন। তাই, আমাদেরকে তাঁর পরিকল্পনা ও অনুগ্রহের প্রতি বাধ্য থেকে তাঁর প্রশংসা ও গৌরবে মুখর হয়ে উঠতে হবে; কারণ ঈশ্বরকে তাঁর প্রাপ্য প্রশংসা দেওয়াটা হচ্ছে স্বর্গীয় কাজ– যার মাধ্যমে আমরা স্বর্গীয় সুখ লাভে সক্ষম হই। তাই, ভবিষ্যত স্বর্গীয় জীবনের ছবিটা আমরা এই পৃথিবীতেই আঁকতে পারি। ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনায় প্রশংসামুখর হওয়ার মাধ্যমে আমরা এই পৃথিবীতেই স্বর্গীয় কাজ ও স্বর্গীয় সুখের স্বাদ গ্রহণ করতে পারি। তাই দেরি না করে আমাদের এখনই তা শুরু করে দেওয়া উচিত। লক্ষ্য করুন, তাঁর মহিমা কতটা পূর্ণাঙ্গ– রাজ্য, ক্ষমতা এবং গৌরব তাঁরই এবং তা সব সময়ের জন্য। মনে রাখুন, অনেক সময় তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে আমাদের কথনভঙ্গিতে এক ধরনের স্বতঃস্ফূর্ততা চলে আসে। ফলে তাতে প্রচুর বিশেষণ, আবেগ মিশ্রিত বর্ণনাধর্মী বাক্য কিংবা অতিশয়োক্তির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। তখন বুঝতে হবে যে, এই স্বতঃস্ফূর্ততা মানবীয় উদ্দেশ্য থেকে নয় বরং ঈশ্বরের অনুগ্রহজাত। কারণ সত্যিকারের একজন ঈশ্বরভক্ত কখনো মনে করেন না যে, তিনি সম্মানের সাথে ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রচুর কথা বলতে পারেন। এই স্বতঃস্ফূর্ততা, এই উদ্দমতা ঈশ্বরের মহিমার অসীমতার দিকটিতেই নির্দেশ করি। আমরা অনুভব করতে পারি যে, ঈশ্বরের প্রশংসা করতে গেলে তা চলতেই থাকবে। সে কারণেই চিরকালীন রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমার অধিকারী ঈশ্বরের প্রশংসা আমাদের সবসময় করতে হবে। এটা এক ধরনের কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। এর মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সাথে আমাদের চিরকালীন সম্পর্কের বিষয়ে বলি। এই প্রশংসা তো ঈশ্বরের চিরকালীন পাওনা– 'কিন্তু আমি সর্বদা তোমার ওপর নির্ভর করব এবং তোমাকে প্রশংসার ওপর প্রশংসা দিতে থাকব' (গীত ৭১:১৪)।

তাই, ঈশ্বরকে তাঁর প্রাপ্য গৌরব দিতে স্বর্গদূত রা, ঈশ্বরভক্তরা যে উন্মুখ হয়ে থাকবেন তা তো জানা কথাই। প্রার্থনার শেষে আমরা 'আমেন' শব্দটি যোগ করে থাকি। এর মানে হচ্ছে 'তাই হোক'। প্রার্থনার শেষে 'আমেন' বলার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের কাছে আমাদের অনুরোধ বাস্তবায়নের জন্য মিনতি জানাই। অপরদিকে ঈশ্বর যখন

'আমেন' বলেন তখন তিনি তাতে সম্মতি দেন। ঈশ্বরের সমর্থন ছাড়া আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। প্রার্থনায় আমরা তাঁকে বলি যেন তিনি আমাদের চাওয়া পূর্ণ করেন। আর তিনি যে আমাদের প্রার্থনা শুনেছেন তার নিশ্চয়তাস্বরূপ আমরা বলি 'আমেন'। নিজেদের অদূরদর্শিতা, অজ্ঞানতার দরুন প্রার্থনার সময় আমরা আমাদের অনেক দুর্বলতা, প্রয়োজনের কথা বলতে ভুলে যাই; সেক্ষেত্রে এই 'আমেন' শব্দটি সম্পূরক হিসেবে আমাদের সব আবেদন, অনুরোধকে একত্রিত করে তাঁর কাছে তুলে ধরে। ধর্মীয় দায়িত্ব সম্পন্ন করতে উষ্ণ ও তেজদীপ্ত শব্দের উচ্চারণ আমাদের উদ্দীপিত করে থাকে। এ থেকে আমরা আমাদের আত্মার মিষ্টতার স্বাদ পেতে সমর্থ হই। আগেকার দিনে লোকেরা তাদের প্রার্থনার শেষে শ্রুতিযোগ্যভাবে 'আমেন' শব্দটি উচ্চারণ করতো। এই প্রশংসাসূচক অনুশীলনের প্রচলন হয়েছিল অন্যদের বোধগম্যতার স্বার্থে যেন তারাও 'আমেন' বলে প্রশংসায় অংশ নিতে পারে (১ করিন্থীয় ১৪:১৬)। মানবীয় ইচ্ছা, আত্মবিশ্বাসের এই বাহ্যিক প্রকাশ আমাদের অন্তর্গত মনোভাব, সদিচ্ছা, সপ্রাণ-সজীব জীবনকেই মেলে ধরে।

প্রভুর প্রার্থনায় বিবৃত বেশির ভাগ আবেদনের সাথেই যিহূদীরা পরিচিত ছিল; প্রার্থনায় তারা সাধারণত এই কথাগুলোই ব্যবহার করতো। কিন্তু পঞ্চম আবেদনের এই উপবাক্যটি 'আমরা যেমন আমাদের ওপর অন্যায়কারীদের ক্ষমা করেছি' তাদের কাছে ছিল একেবারেই নতুন। তাই খ্রীষ্ট এখানে এর সপক্ষে ব্যাখ্যা হাজির করেছেন। বস্তুতই খ্রীষ্ট তৎকালীন যিহূদী সমাজের মনোভাব সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি নিজে তখনকার লোকদের অসহিষ্ণু মনোভাব, দ্বান্দ্বিক চরিত্র, মন্দ প্রকৃতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সন্দেহ নেই তাঁর এই ব্যাখ্যা প্রদানের পেছনে তখনকার লোকদের চারিত্রিক বেহাল দশা যথেষ্টই ভূমিকা রেখেছিল। তবে সেটাই একমাত্র কারণ নয়; বরং স্বতন্ত্র আবেদন ও গুরুত্বের বিচারে ব্যাখ্যাটি নিজেই তার প্রয়োজনীয় উপস্থিতির কথা ঘোষণা করে। ঈশ্বরের ক্ষমা পাবার ক্ষেত্রে অন্যদের ক্ষমা করাটাও জরুরি। ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করার আগে আমরা আমাদের অনিষ্টকারীদের ক্ষমা করেছি কিনা তা খতিয়ে দেখেন। তাই, তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা চাইবার সময় প্রার্থনায় অন্যদের ক্ষমা করবার বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে। এর মাধ্যমে আমরা যে কেবল নিজেদের ক্ষমার গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিই তা নয় উপরন্তু আমরা নিজেদের ক্ষমার সাথে বেঁধে ফেলি। ফলে, আমাদের ক্ষমার মনোভাব ও ক্ষমার কাজ আরও 'ধারাবাহিক' হয়ে ওঠার প্রয়াস পায়। এ সম্পর্কে পরিষ্কার হতে মথি পুস্তকেরই ১৮:২৩-৩৫ পদে বর্ণিত দৃষ্টান্তটি দেখুন। এখানে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, কেন খ্রীষ্ট 'ক্ষমার' বিষয়টিকে এতটা গুরুত্বের সাথে নিয়ে এ সম্পর্কে বারবার লোকদের শিক্ষা দানে প্রবৃত্ত হলেন। জবাবে মানব স্বভাবের স্বার্থপর দিকটির দিকে আলোকপাত করতে পারি– 'স্বার্থপর' অন্তঃকরণ কখনো ক্ষমার শিক্ষাকে সহজভাবে মেনে নিতে চায় না। যে কারণেই যাবতীয় অসহিষ্ণুতা-স্বার্থপরতা-কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে খ্রীষ্ট ক্ষমা ও বিনম্রতার ধ্বজা ওড়ালেন (১৪, ১৫ পদ)–

১. একটি প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে: 'যদি তোমরা অন্যদের দোষ ক্ষমা কর তবে স্বর্গীয় পিতাও তোমাদের ক্ষমা করবেন।' ক্ষমা পাবার জন্য অন্যকে ক্ষমা করাই একমাত্র শর্ত নয়; কারণ ক্ষমার সাথে অনুতাপ, বিশ্বাস এবং নতুন বাধ্যতা– এ বিষয়গুলোও জড়িত। তাই, এখানে ধরেই নেওয়া হয়েছে যে খ্রীষ্টের অনুসারীরা যখন ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইবেন তখন তাদের মাঝে অন্যদের ক্ষমা প্রদর্শনের দৃষ্টান্তের সাথে অনুগ্রহের অপরাপর উপাদানগুলোও উপস্থিত থাকবে। ফলে তা আমাদের অন্তঃকরণে অনুতাপ, বিশ্বাস ও বাধ্যতার সপ্রাণ

উপস্থিতির কথাই ঘোষণা করে। ভাইয়ের প্রতি বিনম্রতা প্রদর্শনের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে নিজেদের অনুতপ্ত হৃদয়কে তুলে ধরি। 'অন্যদের' বলতে এখানে মূলত যারা আমাদের দৈহিক, মানসিক, আর্থিক কিংবা সম্মানের ক্ষতি সাধন করে তাদের কথা বোঝানো হয়েছে। লক্ষণীয় যে, আমাদের বিরুদ্ধে অন্যায়কারীকে এখানে কেবল 'দোষ' করতেই দেখা যাচ্ছে। 'দোষ' শব্দটির দ্বারা মারাত্মক কোন অপরাধকে বোঝায় না; বরং তা অপরাধের পরিমাণ, দায়কে হ্রাস করতেই যেন অধিকতর মনোযোগী– অনেকটা ভুল করে গায়ে হাত তোলার মতো অবস্থা! মনে রাখুন, অন্যরা আমাদের যত বড় ক্ষতিই করুক না কেন তাদের অপরাধকে তুচ্ছজ্ঞান করাটা আমাদের বিনম্রতারই পরিচায়ক; এর মধ্য দিয়ে আমরা যে ক্ষমার মনোভাব পোষণ করছি সেটাই প্রকাশ পায়– 'তারা ভুল করে কিছু না বুঝেই আমার ক্ষতি করেছে।' তাই, ক্ষতি স্বীকার করেও খ্রীষ্টের অনুসারীরা অন্যায়কারীর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠা তো দূরের কথা বরং তারা অন্যায়কারীর অপরাধকে নিছক 'দোষ' হিসেবে দেখতেই আন্তরিক থাকেন। তাদের চোখ থাকে অন্যায়কারীর ভুলের প্রতি, তার দেয়া আঘাতের প্রতি নয় (আদি ৪৩:১২)। সে কারণেই যারা আমাদের ওপর অন্যায় করে তাদের প্রতি আমাদের দয়ার মনোভাব থাকতে হবে। আমরা তাদের অবশ্যই ক্ষমা করব; কারণ ঈশ্বরের ক্ষমা আমাদের প্রয়োজন। তাই, অন্যায়কারীর প্রতি কোন প্রকার ক্ষোভ, প্রতিহিংসার মনোভাব পুষে না রেখে সবসময় তাদের সাহায্য, সহযোগিতা করার দিকে সচেষ্ট হতে হবে; তাদের অপরাধকে কখনো বড় করে দেখানো কিংবা তাদের অন্যায়ের সমালোচনা করা চলবে না। তার স্থলে অন্যায়কারীকে বন্ধুরূপে পাওয়ার জন্য যা যা করা প্রয়োজন তা করতে আমাদের উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক। সে যদি কখনো তার ভুল বুঝতে পেরে আমাদের কাছে অনুতপ্ত হয় তবে তাকে সানন্দে 'বন্ধু' বলে বুকে টেনে নিতে হবে।

২. একটি সাবধানবাণীর মাধ্যমে: 'যারা তোমাদের ক্ষতি করে তোমরা যদি তাদের ক্ষমা না কর' তবে তোমরা নিজেদের সম্পর্কে সবার সামনে একটি বাজে দৃষ্টান্ত রাখলে; কারণ তোমরা ক্ষমার প্রয়োজনীয়তাকেই অস্বীকার করেছ। এতে করে তোমরা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ক্ষমা লাভের অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছ; কারণ যাঁকে তোমরা 'পিতা' বলে ডাক এবং 'পিতা' হিসেবে যিনি তোমাদের প্রয়োজনের সময় তাঁর অনুগ্রহের হাত প্রসারিত করেন সেই 'ঈশ্বর তোমাদের ক্ষমা করবেন না'। তোমরা যদি মনে কর যে তোমাদের মাঝে অনুগ্রহের অপরাপর উপাদান, যেমন– বিশ্বাস, বাধ্যতা, অনুতাপ অটুট আছে এবং তারপরও তোমরা অন্যদের দোষ ক্ষমা করতে ব্যর্থ হচ্ছ তখন বুঝতে হবে যে, তোমাদের মানসিকতার মাঝেই সমস্যা রয়েছে; আর এই সমস্যার ফলে তোমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে ক্ষমা লাভ করা কিংবা অন্যদের সামনে নিজেদের পরিচয় তুলে ধরা থেকে পিছিয়ে পড়ছ। এই 'সমস্যা' তোমাদের পরিপার্শ্ব কিংবা অন্য কারও প্ররোচনা-প্রভাবের দ্বারাও সৃষ্ট হতে পারে। মনে রাখুন, আমরা যেমন ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুগ্রহ পেয়েছি তেমনি অন্যদের প্রতিও সেইরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে হবে; তাছাড়া আমরা কোনওভাবেই এমনটা আশা করতে পারি না যে ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের ধারা বজায় রাখবেন। তাই, কারও প্রতি ক্ষোভের মনোভাব না রেখে আমাদের পরিষ্কার অন্তরে হাত তুলে প্রার্থনা করতে হবে (১ তীমথিয় ২:৮)। যদি আমরা রাগের মনোভাব সহকারে প্রার্থনা করি তবে এই ভয় আমাদের পেয়ে বসে যে, ঈশ্বর আমাদের রাগের সাথে উত্তর দেবেন। কথিত আছে, রাগ থেকে উৎসারিত প্রার্থনা ঈশ্বরকে বিরক্তই করে কেবল। শুধুমাত্র একশো টাকা ধার নিয়ে

ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায় আমরা যদি আমাদের ভাইকেই ক্ষমা করতে না পারি তবে ঈশ্বর– যাঁর কাছে আমাদের লক্ষ টাকা দেনা– সেই তিনি আমাদের কী করে ক্ষমা করবেন? খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে এসেছিলেন শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে; তিনি যে কেবল ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করতে এসেছিলেন তা নয় উপরন্তু অন্যদের সাথেও যাতে আমরা হৃদ্যতা-আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিস্থাপিত হয় সেজন্যই এসেছিলেন। তিনি চান, যেন আমরা তাঁর নির্দেশের বাধ্য থেকে অন্যদের ক্ষমার মাধ্যমে জয় করে নিই। অন্যদের ক্ষমা করলে যেমন পুরস্কারস্বরূপ ঈশ্বরের কাছ থেকে ক্ষমা মিলবে তেমনি ক্ষমা না করার দরুন ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা শাস্তিস্বরূপ ক্রোধ জড়ো করি। খ্রীষ্ট তাই এখানে 'ক্ষমা' প্রসঙ্গে উৎসাহদায়ী মন্ত্র ও সাবধানবাণী– দুই-ই উচ্চারণ করেছেন। এখন কেউ যদি খ্রীষ্টের দেওয়া শিক্ষার একটিকেও হালকাভাবে নিয়ে তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধে যায় তবে সে নিজের ওপরই বিপদ ডেকে আনে। কারণ মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা-আগ্রহে ঈশ্বরের বাক্যের কিছু এসে যায় না।

মথি ৬:১৬-১৮

খ্রীষ্ট এখানে উপবাসর ক্ষেত্রে ভণ্ডদের মতো না করতে সতর্ক করে দিলেন। এর আগে তিনি দান এবং প্রার্থনা সম্বন্ধে এই প্রকার সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন।

ক. উপবাস রাখাটা খ্রীষ্টের অনুসারীদের একটি স্বীকৃত দায়িত্ব। ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে, পবিত্র আত্মার প্রেরণায় অথবা বিশেষ কোন প্রয়োজনে তারা উপবাস রেখে থাকেন– 'যখন বরকে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে তখন তারা উপবাস রাখবে' (৯:১৫)। দান ও প্রার্থনার পর উপবাসর অন্তর্ভুক্তি এখানে বিষয়ের গুরুত্বকেই তুলে ধরে। প্রার্থনার অবস্থান এখানে দান ও উপবাসর মাঝখানে; অর্থাৎ দেহ ও আত্মার মাঝে প্রার্থনা এক অসাধারণ সমন্বয় গড়ে দেয়। তবে আবশ্যকতার বিচারে 'রোজা' দান কিংবা প্রার্থনার মত নয়; এটা অনেকটা ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। যেমন, প্রার্থনা কিংবা দানের ক্ষেত্রে কোন উপলক্ষের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু উপবাসর ক্ষেত্রে কার্যকারণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়। খ্রীষ্ট এখানে বিশেষভাবে গোপনে উপবাস রাখার বিষয়ে বলেছেন। মুক্তমনে দান দেওয়ার মতোই উপবাস রাখাটা ব্যক্তির ইচ্ছা বা প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করে। খুব স্বাভাবিকভাবেই উপবাস যিহূদীদের উপাসনার অংশ ছিল। প্রয়োজনবোধে তাদের কেউ একদিন উপবাস রাখতো, কেউ কেউ দুই দিন, কেউবা প্রতি সপ্তাহে আবার কেউ মাঝে মধ্যে উপবাস রাখতো। এসময় তারা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কিছুই খেত না এবং কঠোরভাবে উপবাসর প্রতিটি নিয়ম-কানুন মেনে চলত। নিজেদের ধার্মিকতার জন্য যারা বড়াই করতো তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য খ্রীষ্ট এক ফরীশীর কথা উল্লেখ করেন, যে সপ্তাহে দু'বার উপবাস রাখার কথা বলেছিল (লূক ১৮:১২); তাই বলে ফরীশীরা সপ্তাহে দু'বার উপবাস রাখতো– ব্যাপারটা এমনটা নয়। খ্রীষ্ট কেবল তাদের দোষ দেখিয়ে দেওয়ার জন্যই এমনটা বলেছিলেন। উপবাস হচ্ছে একটি প্রশংসনীয় অনুশীলন; উপবাস রেখে ঈশ্বরের উদ্দেশে উচ্চস্বরে মাতম করা যথেষ্টই যুক্তিযুক্ত। যদিও একে খ্রীষ্টানরা অবহেলা করে থাকে। লক্ষ্য করুন, শাস্ত্রে আমরা হান্নার বিষয়ে দেখতে পাই যিনি অসংখ্য দিন উপবাস-প্রার্থনায় কাটিয়েছেন (লূক ২:৩৭); এছাড়া, কর্ণীলীয়কেও আমরা উপবাস ও

প্রার্থনায় সময় কাটাতে দেখি (প্রেরিত ১০:৩০)। প্রাথমিক যুগের খ্রীষ্টানরাও এর ওপর বেশি জোর দিত (দেখুন প্রেরিত ১৩:৩; ১৪:২৩)। সংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ, বিনম্রতার এই চর্চা সম্পর্কে ১ করিন্থীয় ৭:৫ পদে গুরুত্ব সহকারে বলা হয়েছে। উপবাসর মধ্য দিয়ে আমরা সংযমী হতে ও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখি। মানবীয় চাহিদা, অভিলাষ ও লালসাকে দমনের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের পরিচালনার অধীনে বিনম্র সহাবস্থানের বিষয়টিকে নিশ্চিত করি। নতুন খ্রীষ্টানরা উপবাস ও প্রার্থনায় বেশি সময় কাটানোর মাধ্যমে নিজেদের বেড়ে ওঠাকে আরও বেগবান করতে পারে। কারণ এর ফলে তারা ধীরে ধীরে নিজেদের 'শক্ত খাবার'– এর উপযোগী করে তুলতে সমর্থ হয়। তখন নিশ্চিতভাবেই পুস্তকী শিক্ষা বোঝার এবং তা পালন করার মতো স্বর্গীয় জ্ঞান ও পবিত্র আত্মার পরিচালনা তাদের মাঝে দৃঢ়তর হবে। 'বেশি খেয়ে ফেললে ঘুমিয়ে পড়ার শঙ্কা থাকে'; তাই নতুন বিশ্বাসীকে শুরুর দিকে দেহকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো ইচ্ছাশক্তি অর্জন করার দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এর ফলে ধর্ম চর্চায় তারা আরও বেশি নিবেদিতপ্রাণ হয়ে উঠতে সমর্থ হবে এবং অনেককে প্রভুর কাছে নিয়ে এসে 'ভাল কাজ' দেখাতে পারবে। পৌল প্রায়ই উপবাস রাখতেন– যা তার আত্মিক জীবনের পরিপক্কতায় সাহায্য করেছিল।

খ. খ্রীষ্ট এখানে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন যেন আমরা উপবাস রাখার সময় ভণ্ডদের মতো না করি, কারণ এর ফলে মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা মিললেও ঈশ্বরের কাছ থেকে আরাধ্য পুরস্কার হারাই। তাই, একথা বলা যায়, ভণ্ডামিপূর্ণ উপবাস বিশ্বাসীদের জন্য মূর্তিমান 'বিপদ বিশেষ'।

এখন ১. ভণ্ডদের উপবাস রাখার মাঝে কোন অনুতাপ বা বিনম্রতার লেশ থাকে না। যা কিনা উপবাসর প্রয়োজনীয় শর্ত বলে বিবেচিত। উপবাসর গুরুত্বপূর্ণ দুই মাধ্যম– আত্মা ও দেহ– কোন জায়গাতেই তারা স্বচ্ছতার প্রতিফলন দেখাতে পারেনি। নিজেদের মনের কাঠিন্যের কারণ তারা উপবাসর মতো একটি ধর্মীয় কাজকে ব্যঙ্গ করতেও দ্বিধা করেনি। তাদের উপবাস ছিল লোক-দেখানো, অন্তঃসারশূন্য। উপবাস রাখার সময় তারা প্রকৃতই যতটা না নম্র তার চেয়েও বেশি নম্রতার ভান করতো– যা ঈশ্বরের সাথে প্রতারণার সামিল। এই হীন মনোবৃত্তি তাদের আর সব ভণ্ডামিকেও ছাপিয়ে গিয়েছিল। অথচ ঈশ্বর চেয়েছিলেন মানুষ উপবাস রাখার মাধ্যমে একটি দিন তাঁর পরিচালনার ও আত্মার অধীনে সমর্পিত হোক। কিন্তু মানুষ তার ভিন্ন অর্থ ও প্রয়োগ করল; যেকারণে তাদের উপবাস রাখাটা কেবল নলখাগড়ার মতো মাথা নোয়ানো এবং চট ও ছাইয়ের ওপর শুয়ে থাকার মাঝেই গণ্ডিবদ্ধ হয়ে পড়ল। আমরা যদি একেই 'রোজা' বলি তবে তা হবে মহাভুল (যিশাইয় ৫৮:৫)। উপবাস যদি কেবল শারীরিক কষ্টভোগের অনুশীলনের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে তবে ধরে নিতে হবে তা ঈশ্বরের উদ্দেশে করা হচ্ছে না। প্রকৃত অর্থেই এই কষ্টভোগের কোন মানে নেই; ফল তো দূরের কথা।

২. ভণ্ডেরা এএভাবে উপবাস রাখতো, যেন লোকে তাদের দেখে প্রশংসা করে। তাই তাদের এই 'উপবাস দিবস' ছিল মূলত দর্শকদের উদ্দেশে, তাদেরই নিয়ে। এমনকি এই দিনগুলোতে যেখানে তাদের নিভৃত কক্ষে থাকার কথা সেখানে তাদের চেহারায় দুঃখিত-বিমর্ষ-ক্লান্তভাব ফুটিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। আর এসবই ছিল লোকদের কাছে নিজেদের উপবাস রাখার কথা প্রকাশ করা। ফলে, তাদের এই 'নীরব ঘোষণায়' লোকেরা বিভ্রান্ত হয়ে স্বভাবতই উপবাসকারীদের ধার্মিকতার তারিফ করতো। মনে রাখুন, যারা

লোকদের কাছ থেকে প্রশংসা-মূল্যায়ন পাবার জন্য ভণ্ডামিপূর্ণ ধর্মচর্চা করে 'দৈহিক পাপে' প্রবৃত্ত হয় তারা তাদের গর্বের কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে; তবে তার চেয়েও ভয়াবহ ফল অপেক্ষা করছে তাদের 'আত্মিক পাপের' জন্য। তাদের সেই দুঃখজনক অবস্থার জন্য দায়ী আর কেউ থাকবে না; শুধু তারাই থাকবে। এখানে বলা হয়েছে, তারা তাদের ঈপ্সিত পুরস্কার পেয়ে গেছে– মানুষের প্রশংসা, বাহবা; যা পেতে তারা অতিমাত্রায় আগ্রহী ছিল। হ্যাঁ, তারা তা পেয়ে গেছে এবং এই-ই শেষ; তারা আর কিছু পাবে না।

গ. এখানে আমরা কীভাবে উপবাস রাখব সে বিষয়ে নির্দেশনা পাই। উপবাস রাখার ব্যাপারটি যেন অত্যন্ত গোপনে হয় (১৭, ১৮ পদ)। খ্রীষ্ট বলে দেননি যে কখন কখন আমাদের উপবাস রাখতে হবে। তাই অবস্থা, প্রয়োজন বা আবশ্যকতা বুঝে পবিত্র আত্মার পরিচালনার অধীনে থেকে আমাদের উপবাস রাখতে হবে। অবশ্য এটাও সত্য যে, স্বাধীনতা পেয়ে গেলে আমরা পরাধীন হতে ভালবাসি অর্থাৎ নির্দেশের বাধ্যবাধকতা না থাকলে আমাদের মন তা করতে উদ্যোগী হয় না; কিন্তু একে একটি আদেশ হিসেবেই দেখতে হবে। আপনি যখন উপবাস রাখবেন তখন সচেষ্ট থাকুন যেন তা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে; আর মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা-মূল্যায়ন পাবার অনৈতিক ইচ্ছাকে ঝেড়ে ফেলুন। উপবাস যেন আপনার বিনম্রতাকে চূড়া অব্দি নিয়ে যেতে সক্ষম হয়– সেই চেষ্টা করুন। খ্রীষ্ট কিন্তু উপবাসর নিয়মকে এতটুকু হ্রাস করেন নি; তিনি বলেননি যে, 'রোজার সময় অল্প মাংস, হালকা পানীয় অথবা হালকা কিছু খাওয়া যেতে পারে'। বরং তিনি বললেন, 'দেহকে কষ্ট পেতে দাও, কিন্তু তা যেন কেউ না দেখে। এসময় তুমি তোমার স্বাভাবিক পোশাকই গায়ে চাপাও এবং না খাওয়ার ফলে তোমার চেহারায় কোন প্রকার যন্ত্রণা-ক্লান্তির ছাপ ফুটিয়ে তুলো না। তোমার উপবাস রাখার কথা কেউ যেন জানতে না পারে; এমনকি কাছের মানুষও না। তার স্থলে আর সব দিনের মতো মাথায় তেল দিয়ে ও মুখ ধুয়ে উৎফুল্ল মেজাজে থাক। উপাসনার উদ্দেশ্যের কথা সবাইকে জানানোর কী দরকার! তাই, লোকের প্রশংসা লাভের প্রত্যাশা না করে একমাত্র ঈশ্বরের উদ্দেশে সত্যিকারের উপবাস রাখ। ঈশ্বর, যিনি তোমার অন্তর দেখেন, তিনি অবশ্যই তা গ্রহণ করবেন।' উপবাস হচ্ছে আত্মার বিনম্রতা (গীত ৩৫:১৩)। তাই, যেভাবে আমরা দেহের যত্ন নিই সেভাবেই আমাদের আত্মার এই অন্যতম অনুষঙ্গ 'বিনম্রতা'– এর যত্ন নিতে হবে। তবে তার বাহ্যিক প্রকাশ থেকে বিরত থাকতে হবে। যদি আমরা উপবাসর মূল উদ্দেশ্যের প্রতি যত্নবান থেকে বিনম্র হই এবং হৃদয়ে ঈশ্বরের পরিচালনাদায়ী আত্মার উপস্থিতিকে অনুভব করতে সমর্থ হই তবে তিনি আমাদের আরাধ্য পুরস্কার, স্বর্গীয় সম্মান দান করবেন। ভাল কাজ– তা যত গোপনেই করা হোক না কেন সেটা ঈশ্বরের চোখকে এড়িয়ে যেতে পারে না। তাই, গোপনে আমরা যে উপবাস রাখছি তা তিনি নিশ্চিতভাবেই দেখছেন এবং এর জন্য স্বর্গে সবার সামনে আমাদের পুরস্কৃত করবেন। সঠিক নিয়মে উপবাস রাখার মাধ্যমে আমরা চিরকালীন খাদ্য সঞ্চয় করি। ঈশ্বরের উদ্দেশে আমাদের 'ক্ষুদ্র' কষ্টভোগের ক্ষতিপূরণ হিসেবে তা বিরাটই। গোপনে উপবাস রাখলে তা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠার পাশাপাশি আমাদের এমন মৃত মানুষে পরিণত করে, যে মানুষ প্রশংসা লাভে লালায়িত হয় না এবং ভণ্ডদের দেখে তাদের মতো করতে উৎসাহিত হয় না। আমরা অবশ্যই ভণ্ডদের অনুসরণ করব না; কারণ এর পরিণতি ভয়াবহ। দায়ূদের উপবাসর কষ্ট তার দুর্নামের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল (গীত ৬৯:১০)। এমনটা আমাদের বেলায়ও

হতে পারে; তাই লোকেরা আমাদের নিয়ে যা খুশি বলুক, তাতে কিছু যায় আসে না। আমাদের কেবল একটি ব্যাপার নিশ্চিত করতে হবে, যে সময়ে তাঁর দয়া পাওয়া যায় সেই সময়ে আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করছি কি না (গীত ৬৯:১৩)।

মথি ৬:১৯-২৪

জাগতিকতার দিকে ঝুঁকে পড়াটা ভণ্ডামিরই লক্ষণ; বৈষয়িক ভাবনায় প্রাণপাত করাকে ভণ্ডামির উন্নত 'সংস্করণ' বলা যেতে পারে-যা অন্যগুলোর মতোই বিপজ্জনক; কারণ শয়তান এর মধ্য দিয়ে শীঘ্রই একটি আত্মাকে গ্রাস করে ফেলতে সমর্থ হয়। এই প্রক্রিয়া এতটাই 'স্বচ্ছ' বলে প্রতীয়মান হয় যে, অনেক সময় একে ধর্তব্যে নেওয়ার মতো ব্যাপার বলেও মনে হয় না। ধার্মিকতার ছদ্মাবরণে অত্যন্ত সুকৌশলে শয়তান এই কর্মটি করে থাকে। ফলশ্রুতিতে একটি আত্মা নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়। তাই, খ্রীষ্ট আমাদের প্রথমে 'মানুষের প্রশংসা' থেকে সাবধান করে এবারে 'জাগতিক ধন-সম্পদের' ব্যাপারে নিজেদের অবস্থানকে স্পষ্ট করতে নির্দেশ দিলেন। যে জগতকে প্রাধান্য দিয়ে ভণ্ডেরা মানুষের প্রশংসা লাভকেই 'মুখ্য' জ্ঞান করে সেই জগতকে আমাদের সবার ওপরে স্থান দেওয়া চলবে না। কারণ তা করলে ভণ্ডদের সাথে আমাদের কোন পার্থক্যই পরিলক্ষিত হয় না। তাই, জগতকে বাদ দিয়ে আমাদের চিরস্থায়ী গৌরব, মহান পুরস্কার ও প্রভুর দিকে ধাবিত হওয়া উচিত।

ক. এখানে আমাদের সত্যিকারের 'ধন' জমা করার প্রতি আগ্রহী হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মানুষ মাত্রই ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভেবে যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী ধন-সম্পদ জমা করে থাকে। ফলে, তার সমস্ত সাধ্য-সাধনা-মনোযোগ সেই জমাকৃত সম্পদকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। কিন্তু প্রকৃতই এর কোন আবশ্যকতা আছে কি না– এই জিজ্ঞাসা থেকে রাজা শলোমন 'কোনটি ভাল' তা খুঁজে পেতে সচেষ্ট হয়েছেন; 'আমি দেখতে চাইলাম, আকাশের নিচে মানুষের মধ্যে কয়েক দিনের জীবনকালে তার জন্য কোনটা ভাল– জ্ঞানের পথে চলা না নির্বুদ্ধিতার পথে চলা' (উপদেশক ২:৩)। জীবদ্দশায় মানুষ সুখের পেছনে ছুটতে গিয়ে বেশির ভাগ সময়ই প্রকৃত অর্থে যা সুখ, আত্মবিশ্বাস, তৃপ্তির কারণ তার কথা ভুলে যায়; উপরন্তু দৃশ্যমান জাগতিক ভোগ-বিলাসে গা ভাসিয়ে তাকেই প্রকৃত 'সুখ' বলে নিজেকে প্রবোধ দেয়, নতুন দর্শন তৈরি করে। যাহোক, খ্রীষ্ট কিন্তু এখানে তাঁর শিক্ষা দ্বারা আমাদের সম্পদ জমাতে নিরুৎসাহিত করেননি বরং 'সত্যিকারের ধন' লাভে আকাঙ্ক্ষী হতে নির্দেশ দিলেন। তিনি তাঁর শিক্ষায় আমাদের -

১. দৃশ্যমান ও ক্ষয়িষ্ণু বস্তু সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে বলে এর স্থলে সত্যিকারের ধন, সুখকে স্থাপন করলেন; 'তোমরা এই পৃথিবীয় নিজেদের জন্য ধন-সম্পদ জমা কোরো না।' খ্রীষ্টের আহ্বানে সাড়া দিয়ে শিষ্যেরা তাদের সর্বস্ব ত্যাগ করে তাঁর অনুগামী হয়েছিলেন। তাদের সেই মানসিকতা যেন অটুট থাকে সেই লক্ষ্যে খ্রীষ্ট তাদের এই শিক্ষাটি দিলেন। মূলত 'ধন' হচ্ছে আমাদের ভাষায় মূল্যবান, দামি এমন কিছুর আতিশয্য– যাকে ভবিষ্যতের পাথেয় বলে ধরে নেওয়া হয়। এখন, পৃথিবীতে নিজেদের জন্য ধন জমা না করার অর্থ হচ্ছে,

(১) আমরা একে কখনো নিজেদের জীবনে প্রথম স্থান দেব না। কখনো ভাববো না

যে, এটা ছাড়া আমাদের বেঁচে থাকাটা অসম্ভব; অর্থাৎ আমাদের কাছে তা 'অমূল্য' বলে গণ্য হবে না। লাবনের ছেলেদের মতো আমরা একে 'গৌরব' বলেও আখ্যায়িত করব না। বরং আমাদের প্রকৃত গৌরবের কাছে এই ধন-সম্পদ যে অসার এবং কোন প্রকারের তুলনায় আসারও অযোগ্য– এই অব্যর্থ-সত্যকে নিজেদের জীবনদর্শন রূপে সাজাব।

(২) আমরা এই ধনের আধিক্য কামনা করব না। অর্থাৎ সম্পদের তালিকা স্ফীত করতে কাড়ি কাড়ি অর্থ এনে গচ্ছিত করা কিংবা টাকা বানাবার নতুন নতুন খাত আবিষ্কার করা থেকে বিরত থাকব। ধনীদের মাঝে এমন অনেকের বিষয়েই আমরা শুনতে পাই, যারা প্রকৃতই জানেন না যে, ব্যাংকে তাদের কত টাকা রয়েছে। সম্পদের পরিমাণ সীমা অতিক্রম করলে তা অবিশ্বাসীদের জন্য আনন্দের কারণ হতে পারে কিন্তু সত্যিকারের খ্রীষ্টানদের ক্ষেত্রে তা হওয়া উচিত নয়।

(৩) আমরা একে ভবিষ্যতের পাথেয় বলে ধরে নেব না। সামনের দিনগুলোতে নিজেদের আর্থিক নিরাপত্তা, সচ্ছলতা বিধানে এর ওপর অতিমাত্রায় নির্ভর করব না। সোনার দিকে তাকিয়ে আমরা কখনো বলব না যে, 'তুমিই আমার ভবিষ্যত'।

(৪) জাগতিক সম্পদ যেন আমাদের আনন্দের কারণ না হয়; কারণ তা চিরস্থায়ী নয়, নয় প্রকৃত সুখ। তারপরও অনেক সময় একে ঘিরেই আমাদের স্বপ্ন ও প্রত্যাশাকে আবর্তিত হতে দেখা যায়। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যেন 'সম্পদের আধিক্যে' আমাদের 'বেঁচে থাকাটা' কখনো নিষ্ফল বলে পরিগণিত না হয়। বেঁচে থাকার জন্য অর্থের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করছি না; কেবল এর আতিশয্যকে নিরুৎসাহিত করছি মাত্র। কারণ এই সম্পদ আমাদের সান্ত্বনা দিতে পারে না (লূক ৬:২৪); ফলে প্রকৃত অর্থে তা মূল্যহীন (লূক ১৬:২৫)। এই জগতের ভবিষ্যতের জন্য ব্যস্ত না হয়ে আমাদের চিরকালীন আত্মিক ভবিষ্যতের জন্য চিন্তিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ স্বর্গে ধন জমা করার দিকেই আমাদের আগ্রহী হতে হবে। এখানে আমাদের 'স্বর্গীয় ধন' ও 'জাগতিক ধন'– এ দু'য়ের মধ্য থেকে একটিকে বেছে নিতে বলা হয়েছে। কাজেই বুদ্ধিপূর্বক সিদ্ধান্ত নিন– কোন্ পক্ষে যাবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মানবপ্রকৃতি সবসময় নিজের জন্য 'সেরাটা' বেছে নিতে তৎপর থাকে; এটাই তার স্বাভাবিক প্রবণতা। ফলে, আমরা যদি নিজেদের পরিচয়, কী উদ্দেশ্যে আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, আমাদের পরিধি কতটা বিস্তৃত এবং আমাদের ধারাবাহিকতা কতটা দীর্ঘ সে বিষয়ে বুঝতে সমর্থ হই তাহলেই আমাদের ভোট স্বর্গীয় ধন জমা করার বাক্সে যাবে। কারণ পৃথিবীতে ধন-সম্পদ জমা করা যে কতটা আহাম্মকি তা আমরা ঈশ্বরের বাক্যের দিকে দৃষ্টি দিলেই পরিষ্কার বুঝতে পারি।

২. কেন আমরা এই পৃথিবীতে ধন জমা করব না– তার স্বপক্ষে এখানে একটি চমৎকার যুক্তি দেওয়া হয়েছে; কারণ তা ক্ষয়িষ্ণু এবং হারাবার ভয় থাকে,

(১) ক্ষয়িষ্ণু এই সম্পদে মরিচা পড়ে এবং পোকার আক্রমণে তা নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি যদি আমরা একে চমৎকার কাপড়ে মুড়িয়েও রাখি তবুও পোকারা নিষ্ক্রান্ত হয় না; উল্টো তারা সেই কাপড় ছিদ্র করে ভেতরে ঢুকে সম্পদ নষ্ট করে। তবুও আমরা এই সত্যকে মেনে নিই না; উপরন্তু নিজেদের তৈরি নিরাপত্তাব্যূহকে দুর্ভেদ্য জ্ঞান করে সম্পদের সুরক্ষার কথা ভেবে আমরা তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলি। এখানে বর্ণিত সম্পদের স্থলে আমরা লাভজনক খাদ্যশস্যের কথা বোঝাতে পারি। সাধারণত ভবিষ্যতের কথা ভেবে বড় বড় গোলাঘরে প্রচুর খাদ্যশস্য জমা করা হয়ে থাকে (লূক ১২:১৬, ১৭)। কিন্তু এই মজুদ কি

আসলেই অক্ষত থাকে? এর উত্তরে 'না' বলাটাই শ্রেয়; কারণ ইঁদুর কিংবা অপরাপর কীটপতঙ্গের সংক্রমণের পাশাপাশি এই খাদ্যভাণ্ডারকে ঘিরে অনেক মুখের আনাগোনা তৈরি হয়– 'সম্পত্তি বাড়লে তা ভোগ করবার লোকও বাড়ে' (উপদেশক ৫:১১)। এক্ষেত্রে আমরা উদাহরণ হিসেবে মান্নার কথা বলতে পারি। স্বর্গীয় এই খাবার নিজেই 'পোকার' ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো। বস্তুত এর মেয়াদ ছিল স্বল্প। সময় বাড়ার সাথে সাথে তা বেড়ে গিয়ে ফেটে যেত। ফলে, নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলে এর স্বাদ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যেত। পচে যাওয়া এই খাবার তখন আর কোন কাজে লাগতো না। এক্ষেত্রে আমরা সোনা বা রুপার উদাহরণও টানতে পারি। জগতের দৃষ্টিতে মূল্যবান এসব ধাতুতে মরচে ধরে এবং ব্যবহারের ফলে তা ক্ষয়ে যায় (যাকোব ৫:২, ৩)। পোকা কাপড় কাটে আর ধাতুতে মরচে পড়ে; জাগতিক সম্পদের বৈশিষ্ট্যই এমন– নষ্ট হয়ে যাওয়া, ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া। বাস্তবিকই এ সকল সম্পদ শুকিয়ে যায়; ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে যায়।

(২) সম্পদ সহিংসতার উৎস; 'চোর সিঁদ কেটে চুরি করে'। প্রতিটি সহিংসতার পেছনেই সম্পদের সংশ্লিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। সম্পদের কারণে চোর-ডাকাত তো বটেই উপরন্তু আমাদের ওপর আরও বড় কোন হামলার আশঙ্কা থেকে যায়। সম্পদরূপ 'ঝামেলা' বয়ে বেড়িয়ে আমরা যদি নিজেদের 'ঝামেলামুক্ত' বলে ঘোষণা দিই তবে তা কেবল হাসিরই খোরাক জোগায়। আদপে এতে কোন মীমাংসা, নিশ্চয়তার ছাপ থাকে না। এ বিষয়ে আমরা সেনেকার বলা কথাটি উদ্ধৃত করতে পারি, 'আমি কখনো ভবিষ্যতের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারিনি। বর্তমানে পাওয়া সম্মান, সম্পদ, গৌরব ভবিষ্যতে কী কাজে লাগবে কিংবা আদৌ লাগবে কিনা– সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম না। অনেক সময় মনে হতো পরবর্তীতে এসব কাজে লাগলেও লাগতে পারে। তবুও সঙ্গত কারণেই আমি এই অনিশ্চয়তার পিছু যেতে চাইনি। বরং আন্তরিকভাবে সবসময়ের জন্য সেই কাজটুকুই করে যেতে চেয়েছি যা আমার ভবিষ্যতকে প্রকৃতই সমস্যাহীন করে রাখবে, প্রয়োজনের সময় বুদ্ধিদীপ্ত সাড়াদানে আমাকে সাহায্য করবে।' তাই ধন-সম্পদ বানানোটা বোকামিই, যখন তা যেকোনও মুহূর্তে আমরা হারাতে পারি।

৩. স্বর্গীয় ধন চিরকালীন; এতেই আমাদের প্রকৃত সুখ ও আনন্দ নিহিত। দেখা না গেলেও আমরা নিশ্চিত জানি, এই সম্পদ হাতছাড়া হবার ভয় নেই। তাই চিরস্থায়ী গৌরব ও আনন্দের ভাগী হওয়ার জন্য খ্রীষ্ট আমাদের স্বর্গে ধন জমা করতে নির্দেশ দিলেন। মনে রাখুন,

(১) জাগতিক সম্পদের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা যেমন নিঃসন্দেহ থাকি তেমনি ঈশ্বরের কাছে আমাদের স্বর্গীয় ধন– চিরস্থায়ী গৌরব ও সুখ গচ্ছিত আছে– এ ব্যাপারে আমাদের নিশ্চিত থাকতে হবে। জীবদ্দশায় যাদের মাঝে ঈশ্বরের পবিত্রতার স্বরূপ ফুটে উঠবে তারা তাঁর কাছ থেকে সেই গৌরব ও আনন্দ লাভ করবে। ঈশ্বর তাদের পবিত্র বলে গণ্য করবেন।

(২) স্বর্গীয় ধন জমা করার প্রতি আগ্রহী হওয়ার মাধ্যমে আমরা নিজেদের 'জ্ঞানী' বলে প্রমাণ করি। আমাদের সমস্ত পরিশ্রম যেন খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পাওয়া অনন্ত জীবনকে সম্মানিত করে সেদিকে সজাগ থাকতে হবে; নিজেদের জীবনে 'পবিত্র পরিচালনার' জন্য আমরা অবশ্যই তাঁর ওপর নির্ভর করব; কারণ এর মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, কাজের গতি-প্রকৃতিকে পবিত্রতার দিকে চালিত করতে পারি। এতেই আমাদের

সত্যিকারের সুখ এবং যাবতীয় ভাবনার সমাধান নিহিত; এর বাইরে আর কোন কিছু চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। খ্রীষ্টের নির্দেশ অনুসারে আমাদের ঈশ্বরের তত্ত্বাবধানে স্বর্গে ধন জমা করার প্রতি অগ্রসর হতে হবে। ঈশ্বরের কাছে আমাদের জমাকৃত সম্পদ যে অক্ষত-অবিকৃত থাকবে– তাতে কোন সন্দেহ নেই। ফলে, তাঁর পরিচালনার অধীনে থেকে আমাদের সমস্ত ইচ্ছা ও কাজকে স্বর্গের দিকে চালিত করতে হবে। শুধু তাই নয়, এই কাজে আমাদের সামর্থ্যের 'সেরাটুকু' ঢেলে দিতে সচেষ্ট ও মনোযোগী হতে হবে। কারণ স্বর্গে ধন সঞ্চয়ের এই প্রচেষ্টা কোন তুলনা বা প্রশংসা লাভের প্রত্যাশা থেকে নয় বরং নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদেই গৃহীত হয়েছে। পৃথিবীতে 'ক্যাশ' করার দিকে আমাদের কখনো মনোনিবেশ করা উচিত নয়, কারণ তা একসময় সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়; অনেক সময় ডুবায়ও। তাই, সেরা নিরাপত্তায় আপনার সেরা সম্পদ সঞ্চয় করুন। ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিতে আস্থা রেখে প্রকৃত বিশ্বাসীর মতো স্বর্গে আপনার সম্পদ পাঠিয়ে দিন। এবং ভবিষ্যতে এই সম্পদের প্রাপ্তিযোগ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন, কারণ ঈশ্বর যে আপনার সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করে চলেছেন তার প্রমাণ হিসেবে তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতি তো রইলই। তাঁর এই প্রতিশ্রুতিসমূহ অনেকটা বিনিময় বিলের মতো, যা আমাদের স্বর্গে সম্পদ জমা হবার নিশ্চয়তা বিধান করে।

(৩) স্বর্গে ধন রাখার প্রতি আমাদের উৎসাহী হওয়া উচিত কারণ স্থান হিসেবে তা নিরাপদ; সেখানে সম্পদ নষ্ট হওয়ার ভয় নেই– পোকায় কাটবে না, মরিচা পড়বে না, কোন অপশক্তি বা প্রতারক তা ছিনিয়ে নিতে পারবে না এবং চোরও সিঁদ কেটে ঢুকে চুরি করতে পারবে না। এই আনন্দ সময়ের, সুযোগের এবং পরিবর্তনের। অনেকটা উত্তরাধিকারের মতো সে সম্পদ আমরা পাব সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায়।

৪. মানুষের মনোযোগের একটা বড় অংশ তার সম্পদকে ঘিরেই আবর্তিত হয়; ফলে, তার ভাবনা-চিন্তা-পরিকল্পনা সব-ই সেই সম্পদকে উপজীব্য করে গড়ে ওঠে। মানব- প্রকৃতির এই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের দিকে নির্দেশ করে খ্রীষ্ট আমাদের স্বর্গে ধন জমা করার স্বপক্ষে একটি চমৎকার যুক্তি উত্থাপন করেছেন– যেখানে তোমার ধন থাকবে, সেখানে তোমার মনও থাকবে। আমাদের সম্পদ যদি স্বর্গে থাকে তবে সেদিকেই আমাদের মন পড়ে থাকবে; আবার যদি দেখা যায় আমাদের মূল আগ্রহ জাগতিক ধনের প্রতি, তাহলে যে আমরা জাগতিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ব তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই, এখানে আমাদের বলা হয়েছে যেন আমরা সঠিক জিনিসটিকে বেছে নিয়ে জ্ঞানীর ন্যায় কাজ করি। বিশেষ করে ধন বেছে নেওয়ার ব্যাপারে। কারণ আমাদের মনোযোগ ও মানসিকতার জন্য সঠিক 'অভিমুখ' নির্ধারণ করা না গেলে তার প্রভাব আমাদের জীবনেই এসে পড়ে। মানবীয় কামনা-বাসনা তথা জগতের গোলামিকে পাশ কাটিয়ে আত্মিক বা স্বর্গীয় বিষয়ে ভাবিত হওয়ার লক্ষ্যেই আমাদের মনকে পরিচালনা করা উচিত। যেভাবে একটি চুম্বক সূঁচকে আকর্ষণ করে কিংবা সূর্যমুখীকে সূর্য সেভাবে জমাকৃত সম্পদও মনকে আকর্ষণ করে থাকে। সম্পদের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়িয়ে তোলা এবং তার সুষ্ঠু নিরাপত্তা বিধান করার দিকেই আমাদের সমস্ত লক্ষ্য ও মনোযোগ একীভূত হয়। যেখানে সম্পদ সেখানেই আমাদের যত্ন, শংকা থাকে। যেকোন মূল্যে আমরা তার কাছাকাছি থাকতে চাই। সে কারণেই শাস্ত্রে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে, 'জাগতিক বিষয়ে মনোযোগ না দিয়ে বরং স্বর্গীয় বিষয়ে মনোযোগ দাও' (কল ৩:২)। যেহেতু ধনীরা তাদের ধনকেই 'রক্ষাকারী দেয়াল'

বলে মনে করে থাকে সেহেতু স্বর্গীয় ধনেই আমাদের আশা, বিশ্বাস (হিতোপদেশ ১৮:১০, ১১) ও আনন্দ রয়েছে (গীত ১১৯:১১১)। ফলশ্রুতিতে, আমাদের ভেতরের সব চিন্তা হতে পারে বিক্ষিপ্ত, পরিচিত কিংবা নির্ধারিত– সেই স্বর্গীয় ধনের উদ্দেশেই পড়ে থাকে। আমাদের হৃদয় ঈশ্বরের পাওনা (হিতোপদেশ ২৩: ২৬)। তাঁর উদ্দেশে স্বর্গীয় ধন জমা করার মধ্য দিয়েই আমরা স্ব স্ব হৃদয়কে তাঁর কাছে সমর্পণ করি; যা আমাদের তাঁর অনুপম সাহচর্য লাভের সুযোগ করে দেয়।

স্বর্গে ধন জমা করার বিষয়ে খ্রীষ্টের দেওয়া এই নির্দেশনা প্রসঙ্গে আমরা আগের সতর্কবাণীর কথা উল্লেখ করতে পারি; আর তা হচ্ছে, আমাদের ধর্মকর্ম মানুষকে দেখানোর জন্য নয়। প্রকৃত অর্থে দান, প্রার্থনা, উপবাস এবং তার পুরস্কারই হচ্ছে আমাদের সম্পদ। যদি আমরা মানুষকে দেখানোর জন্য কিংবা তাদের কাছ থেকে প্রশংসা লাভের আশায় তা করে থাকি তবে আমরা পৃথিবীতে, মানুষের হাতেই আমাদের ধন জমা করি। এবং তা থেকে আর বেশি কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই। ফলে, তা করাটা হবে অপরিণামদর্শিতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কারণ, মানুষের প্রশংসা-যা আমরা প্রত্যাশা করে থাকি তা ক্ষয়িষ্ণু, নষ্ট হয়ে যায়। জাগতিক সম্মান-প্রশংসা দ্রুতই নিঃশেষিত হয়ে যায়। তা পোকায় খেয়ে ফেলে, ক্ষয়ে যায়। মরা মাছি যেমন সুগন্ধি তেলকে দুর্গন্ধ করে তোলে সেভাবেই জাগতিক গৌরব নষ্ট হয়ে যায় (উপদেশক ১০:১)। যে কারণে প্রশংসার স্থলে কলঙ্ক, অপবাদের স্থান দখলে খুব একটা সময় লাগে না। সিঁদেল চোর এসে আমাদের সমস্ত গৌরব মুছে নিয়ে যায়। ফলে, শীঘ্রই আমরা গভীর হতাশায় নিমজ্জিত হই। যে সম্মান-গৌরব চিরস্থায়ী নয় তার পেছনে ছুটলে নিশ্চিতভাবেই আমরা এরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হব; কারণ খ্রীষ্টের অনুসারী হিসেবে মিথ্যে সম্মানের পিছু অগ্রসর হওয়াটা আমাদের জন্য হবে বোকামিরই পরিচায়ক। লক্ষ্যবিচ্যুত না হয়ে আমাদের সঠিক কাজটিই করে যেতে হবে। মনে রাখবেন, ভণ্ডামিপূর্ণ কাজ স্বর্গের জন্য কিছুই জমা করতে পারে না (যিশাইয় ৫৮:৩); আত্মাদের উত্থানের সময় ভণ্ডদের সব বিজয়, গৌরব মুছে যাবে– 'ঈশ্বর যখন তাঁর প্রতি ভয়হীনদের শেষ করে দেন তখন তাদের অন্য কোন আশা-ই থাকে না' (ইয়োব ২৭:৮)। যদি আমরা সততার সাথে ঈশ্বরের উদ্দেশে দান, প্রার্থনা ও উপবাসয় নিবিষ্ট হই তবে আমরা স্বর্গে ধন জমা করতে সমর্থ হই; আমাদের এইসব কাজের কথা ঈশ্বরের স্মরণ-বইয়ে লেখা থাকবে (মালাখি ৩:১৬); পরবর্তীতে নথিভুক্ত এসব কাজের ভিত্তিতেই আমাদের পুরস্কৃত করা হবে। আর আমরা লাভ করব ঈশ্বরের সাথে মিলিত হওয়ার এবং অনন্তকাল তাঁর সাথে থাকার সুযোগ; যেখানে পাপীরা অনন্ত শাস্তি ভোগ করার জন্য তৈরি হবে। ভণ্ডদের কথা কেবল জগতেই লেখা হয় (যিরমিয় ১৭:১৩); কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি যারা বিশ্বস্ত তাদের কথা লেখা হবে স্বর্গে (লূক ১০:২০)। ঈশ্বরের তত্ত্বাবধানে তাদের সম্পদ স্বর্গে থাকবে– যা কখনো চুরি হবে না, নষ্টও হবে না। নিশ্চিতভাবেই ঈশ্বর তাদের প্রশংসা করে বলবেন, 'সন্তান আমার, ভাল কাজ দেখিয়েছ'। এভাবে যদি আমরা আমাদের ধন তার কাছে জমা করি এবং আমাদের হৃদয় তাঁর সাথে থাকে তবে এর চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে?

খ. আমরা অবশ্যই ভণ্ডামি এবং জাগতিক বিষয়ে চিন্তা করা থেকে বিরত থাকব এবং সত্যিকার অর্থে যা ভাল তা বেছে নিতে সচেষ্ট হব। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে; আর তা হচ্ছে আমাদের চোখ ভাল কি না। সঠিক পথটি বেছে নিয়ে সেদিকে অগ্রসর হতে 'ভাল চোখের' বিকল্প নেই; আবার চোখ যদি খারাপ হয় তবে পথ খুঁজে

পাওয়া কিংবা এগিয়ে যাওয়া– কোনোটাই সম্ভবপর হয়ে ওঠে না; উপরন্তু পুরো দেহটাই অন্ধকারে পতিত হয়। খ্রীষ্ট এখানে আমাদের বস্তু-জগতের চোখের উপমা দ্বারা মানুষের জীবনে প্রভাব বিস্তারকারী দু'টি সত্তা– ভাল ও মন্দের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর ভাষ্যে আমরা দু'প্রকার চোখের বিষয়ে দেখি– একটি স্বতন্ত্র ও অন্যটি মন্দ (২২, ২৩)। খ্রীষ্ট তাঁর বক্তব্যে 'অন্ধকারের' ওপর আলোকপাত করেছেন; অন্ধকারের স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর এই সমালোচনা মূলত আলোর গুরুত্বকে ফুটিয়ে তোলার লক্ষ্যে। তাই, আমরা তাঁর কথাকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। 'চোখ দেহের প্রদীপ'; স্বভাবতই চোখ আবিষ্কার করে এবং কোন্ দিকে যেতে হবে তা নির্দেশ করে। যদি এই দেহের আলো না থাকে তবে জগতের আলো আমাদের খুব কমই সাহায্য করে; 'আনন্দ ভরা চোখ অন্যকে আনন্দ দেয়' (হিতোপদেশ ১৫:৩০)। এবারে আমরা দেখব দৈহিক চোখ দ্বারা এখানে মূলত কী কী বিষয়ে ভাল ও মন্দের তুলনা করা হয়েছে।

১. হৃদয় রূপ চোখ: মানবহৃদয় যদি স্বতন্ত্র অর্থাৎ মুক্ত এবং ঈশ্বরের পরিচালনার অধীনে থাকে (যে হৃদয় ঈশ্বরের পরিচালনার অধীনে থাকে নিশ্চিতভাবেই তা সদাপ্রভুর সব বিষয়ে আনন্দ করবে, তাঁর ওপর ঈশ্বর কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে, খোলামনে দান করবে ইত্যাদি; দেখুন– রোমীয় ১২:৮; ২ করি ৮:২; ৯:১১,১৩; যাকোব ১:৫) তবে তা একজন আদর্শ খ্রীষ্টানর দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়; যা তার চারপাশকে আলোকিত করে তোলে। এটাই হচ্ছে সত্যিকারের খ্রীষ্টীয় ধর্মের উদাহরণ। এজন্য আর কোন প্রমাণ খুঁজতে হয় না। পিতা-ঈশ্বরের কাছে এ-রকম জীবন যাপন খাঁটি ধর্ম বলে বিবেচিত হয় (যাকোব ১:২৭)। শুধু তাই নয়, এর ফলে মানুষের কাছেও খ্রীষ্টানদের ভাল কাজগুলো সূর্যের জ্বলজ্বলে 'আলো' হয়ে ধরা দেয়। কিন্তু যদি সেই হৃদয় মন্দ বিষয় দ্বারা যেমন– কাঠিন্য, লালসা, ঈর্ষা, মিথ্যায় পূর্ণ থাকে (মানুষের মন থেকেই সব রকম খারাপ চিন্তা, পাপের কাজ বেরিয়ে আসে; ফলে আমিত্ব ভরা অন্তর কেবল মন্দতাকেই উৎসাহিত করে; মথি ২০:১৫; মার্ক ৭:২২; হিতোপদেশ ২৩:৬, ৭) তবে গোটা দেহই অন্ধকারে পূর্ণ হয়; সেই হৃদয় থেকে কেবল অবিশ্বাসী ও অ- খ্রীষ্টানসুলভ কথাবার্তাই উৎসারিত হতে থাকে। ভাল লোক যেখানে ভাল পরিকল্পনা করে এবং তার ভাল কাজে স্থির থাকে, সেখানে গর্বে ভরা হৃদয়ে অভব্যতা, মন্দতার সব উপকরণই মজুদ থাকে (যিশাইয় ৩২:৫-৮)। আমাদের মাঝে যে আলো রয়েছে তার নির্দেশনা, আকর্ষণ ক্ষমতা যদি দুর্বল হয়ে পড়ে, যদি তা আমাদের ভাল'র দিকে পরিচালিত না করে মন্দতার দিকে, অন্ধকারের দিকে প্ররোচিত করতেই বেশি সচেষ্ট থাকে তবে আমরা যে আসন্ন ধ্বংসের প্রহর গুনছি– সে তো জানা কথাই। মানবপ্রকৃতিতে যদি সত্যিকারের দয়ার ভাব, ভাল স্বভাব অনুপস্থিত থাকে তবে তা সীমাহীন নষ্টামিতে ছেয়ে যায়; আর যে লোক এই প্রবৃত্তির অধিকারী, সে যে কী পরিমাণ অন্ধাকারাচ্ছন্ন জগতে বাস করছে– তা ভাবলেই শিউরে উঠতে হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা মূল প্রেক্ষাপটের বিষয়ে ভাবতে সমর্থ হই– আমরা অবশ্যই আমাদের ভাল স্বভাব দিয়ে স্বর্গে ধন জমা করার প্রতি আগ্রহী হব; দুঃখার্ত মনে নয় বরং আনন্দের সাথেই দান করব (লূক ১২:৩৩, ২ করিন্থীয় ৯:৭)। তবে দৃষ্টিকোণ, ভাবগত পার্থক্যের কারণে এই ব্যাখ্যা (স্বর্গে ধন জমা করার ওপর) লূক ১১:৩৪ পর্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

২. বিবেচনাকারীর ভূমিকায় দেহকে রক্ষা করার জন্য চোখ যেভাবে বলি'ভূমিকা পালন করে থাকে, অনুরূপভাবে যাবতীয় মন্দতা থেকে আত্মাকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে

বিবেচনাবোধও (ভাল-মন্দের পার্থক্য নিরূপণকারী) কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। এখন এই বিবেচনাবোধ যদি স্বতন্ত্র হয় তবে তা সঠিক বিবেচনা দ্বারা সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ করার মতোই স্বর্গে ধন জমা করার সাথে পৃথিবীবী ধন সঞ্চয়ের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে। ফলে, অনুগ্রহের আলো ও সান্ত্বনায় পূর্ণ হতে নিশ্চিতভাবেই তা স্বর্গে ধন জমা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু যদি তা মন্দতায় আচ্ছন্ন হয়ে নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে এবং ভেতরের শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে কেবল খারাপের দিকেই পরিচালিত ও প্ররোচিত করে, তবে বুঝতে হবে যে, তা অন্ধকারে আকণ্ঠ ডুবে আছে। যারা এই প্রবৃত্তির দাসত্ব করছে তাদের বিবেচনাবোধ যে ভোঁতা হয়ে গেছে তা তারা স্বীকার করতে চায় না; উপরন্তু অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতেই তাদের যত স্বাচ্ছন্দ্য (গীত ৮২:৫)। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, যেখানে এই লোকদের প্রভুর বাতিদান হওয়ার কথা ছিল সেখানে তারা বিভ্রান্তকারী আলেয়ায় পরিণত হয়েছে। অসাড় বিবেচনাবোধের কারণে অনেককে আবার ভ্রান্ত শিক্ষকদের অনুসরণ করে বিপথে পরিচালিত হতে দেখা যায় (যিশাইয় ৯:১৬)। এ ছাড়া যারা 'ভালকে' বলে 'মন্দ' আর 'মন্দকে' বলে 'ভাল' (যিশাইয় ৫:২০), তাদের কাছ থেকেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। মোটকথা আমাদের ভালটা নির্ণয় করা শিখতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আমাদের হৃদয় মন্দতার দাসত্ব না করে।

৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধকারী; চোখের সাহায্যে আমরা আমাদের গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হতে সমর্থ হই। যে লক্ষ্য আমরা স্থির করি অর্থাৎ যেখানে আমরা যেতে চাই– চোখ দিয়ে আমরা তা দৃষ্টিসীমার মধ্যে রাখি এবং নিজেদের গতি-প্রকৃতিকে সেদিকেই নির্দিষ্ট করি। ধরা যাক, প্রতিটি কাজে আমরা ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলছি; তারপরও আমাদের দৃষ্টিতে আরও একটি জিনিস যোগ করার আবশ্যকতা থেকে যায়; আর তা হচ্ছে, ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করার মনোবৃত্তি। এখন আমাদের চোখ যদি স্বতন্ত্র হয় তা পরিষ্কারভাবে লক্ষ্যটাকে দেখতে পায়, সঠিক দিক নির্ণয় করে সেদিকেই ধাবিত হতে সমর্থ হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কী সেই লক্ষ্য– যার প্রতি স্বতন্ত্র চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে? এক্ষেত্রে বলা যায় যে, ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করাই হচ্ছে স্বতন্ত্র চোখের মূল লক্ষ্য। যদি আমরা ঈশ্বরের গৌরবের দিকে দৃষ্টি রাখি, কেবল তাঁর সাহায্য ও প্রশংসা চাই এবং নিজেদের সম্পূর্ণরূপে তার দিকেই পরিচালিত করি তখন বুঝতে হবে যে আমাদের চোখ স্বতন্ত্র। অনুরূপ জীবন যাপন করার ফলেই পৌল বলতে পেরেছিলেন 'আমার কাছে জীবন মানে খ্রীষ্ট।' যদি আমরা ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করার লক্ষ্যে অবিচল থাকি, তাহলে আমাদের সব কাজই আলোতে পূর্ণ হয়; উপরন্তু আমরা তাঁর কাছ থেকে লাভ করি অপরিসীম দয়া ও আনুকূল্য। আমাদের জন্য এর চেয়ে সান্ত্বনা ও সাচ্ছন্দ্যের বাণী আর কী হতে পারে? কিন্তু যদি আমাদের চোখ কাঙ্ক্ষিত 'লক্ষ্য' থেকে দূরে সরে গিয়ে মন্দতায় পূর্ণ হয়; যদি আমরা ঈশ্বরের গৌরব লাভের ও তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠার অভিপ্রায়কে পাশ কাটিয়ে মানুষের কাছ থেকে সম্মান ও প্রশংসা লাভের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিই; ঈশ্বরকে সম্মান দেওয়ার কথা স্বীকার না করে, নিজেরাই গৌরব পেতে উদগ্রীব হই এবং যা খ্রীষ্টের তাতে নিজেদের 'গৌরব' খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি– তবে তা সবকিছুকেই শেষ করে দেয়। খারাপি ও অস্থিরতায় গোটা দেহই তখন কলঙ্কিত হয়ে পড়ে। কারণ, ভিত্তিটাই যদি এভাবে স্থানচ্যুত হয়ে পড়ে তবে সেখানে আর কিছুই থাকতে পারে না কেবল বিভ্রান্তি, মন্দ কাজ ও এর কাঠামোটুকু ছাড়া। সীমানা থেকে যেকোন দিকে যতগুলো রেখাই আঁকা হোক না কেন

তা অবশ্যই কেন্দ্রকে অতিক্রম করে যাবে। আপনার মাঝে যে আলো রয়েছে তা যদি নিভু নিভু হয় তবে শীঘ্রই তা অন্ধকারের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নেবে। লক্ষ্যহীন পথচলা হচ্ছে একটি মৌলিক ভুল; অনিশ্চিত গন্তব্যের উদ্দেশে যাত্রা করার মাধ্যমে মানুষ নিজের ধ্বংস ডেকে আনে। মনে রাখুন, লক্ষ্য কাজকে নির্দিষ্ট করে। আমাদের ধর্মচর্চার সারকথাও এটাই– লক্ষ্যে অবিচল থেকে অনন্তকালীন সুখভোগে আগ্রহী হওয়া (২ করি ৪:১৮)। ভণ্ড হচ্ছে ভাড়া করা নৌকার মাঝির মতো, যে জানে না পরের ট্রিপে তাকে কোথায় যেতে হবে; অপরদিকে সত্যিকারের খ্রীষ্টীয় হচ্ছে এমন ভ্রমণকারীর মতো যে জানে কোথায় তাকে যেতে হবে এবং সেভাবেই তার যাত্রাপথ সাজায়। ভণ্ড ঘুড়ির ন্যায় আকাশে উদ্দেশ্যবিহীন ঘুরে বেড়ায়। তবে তার মন পড়ে থাকে মাটির দিকে; কখন ডাক পড়বে– সেই প্রতীক্ষায় তার দৃষ্টি আকাশ-পাখি-গাছ-পুকুর হয়ে কেবল নিচের দিকেই ফিরে ফিরে আসে। পক্ষান্তরে, সত্যিকারের খ্রীষ্টানরা হচ্ছে মৃতদেহ (ভরতপক্ষী) পাখির মতো যে কেবল উপরে আরও উপরে উড়ে যায়; মাটির আকর্ষণ যাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে না।

গ. জীবনের অধিকর্তার সঠিক নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা ভণ্ডামি এড়াতে পারি; যেহেতু 'কেউই দুই কর্তার সেবা করতে পারে না।' দুই কর্তার সেবা হচ্ছে স্বতন্ত্র চোখের দ্বান্দ্বিক অবস্থা; কারণ ঈশ্বর– যিনি আমাদের কর্তা– তাঁর দিকেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে (গীত ১২৩:১, ২)। আমাদের প্রভু যীশু এখানে সেই লোকদের ভণ্ডামির বিষয়টি তুলে ধরেছেন যারা একাধারে ঈশ্বর ও মানুষকে সন্তুষ্ট করতে চায়; তারা জাগতিক ধনসম্পদের পাশাপাশি স্বর্গের ধন জমা করছে বলে তৃপ্ত থাকে। এ প্রসঙ্গে ভণ্ডরা এই বলে নিজের পক্ষে সাফাই গায়, 'মানুষের জীবনে কি একের অধিক দর্শন থাকতে পারে না?' বস্তুত ধর্মকর্মের মাধ্যমে সাংসারিক পরিতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা থেকেই তারা এরকম দ্বিমুখী টান অনুভব করে। তাদের এই হাস্যকর কর্ম আমাদের সেই মায়ের কথা মনে করিয়ে দেয়, যে তার কথিত শিশুকে দু'ভাগ করার বিচারে সায় দিয়েছিল। শমরীয়রা ঈশ্বর ও পৌত্তলিকতাকে মিশিয়ে ফেলেছিল। এক্ষেত্রে প্রকৃত খ্রীষ্টানর উত্তর শুনুন, 'না, খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসকে জাগতিক লাভের উপায় বলে মনে করা যাবে না' (১ তীমথিয় ৬:৫)। এখানে,

১. একটি সাধারণ ধারণার বিষয়ে বলা হয়েছে; 'কেউই দুই কর্তার সেবা করতে পারে না' -স্বভাবতই এ কথাটি যিহূদীদের মাঝে প্রবচন হিসেবে ব্যবহৃত হতো। জীবনের অধিকর্তা হিসেবে আমরা ঈশ্বরের স্থলে আর কাউকে কল্পনাও করতে পারি না; কিন্তু জাগতিকতা যদি ঈশ্বরের সমান্তরালে উঠে আসে তবে নিশ্চিতভাবেই আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে ঈশ্বরের আদেশ পালন করতে ব্যর্থ হই। কারণ জাগতিক বিষয়-আশয় তখন ঈশ্বরের আদেশের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। এই দ্বন্দ্বের সুযোগে 'জগত' আমাদের পুরোমাত্রায় গ্রাস করে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আরও সহজভাবে বলা যায়, একজন চাকরের যদি দু'জন কর্তা থাকে; তবে সেই চাকর কর্তার আদেশ পালনে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে; খুব স্বাভাবিকভাবেই একসাথে দু'জনের আদেশ পালন করা সম্ভব হয় না। ফলে তার কাজের দ্বারা এটাই প্রকাশ পেয়ে যাবে যে, সে কাকে তার সত্যিকারের কর্তা হিসেবে বেছে নিয়েছে; কাকে সে ভালবাসে বা ঘৃণা করে। তারপরও যদি সে উভয়ের মন যুগিয়ে চলতে চায় তবে তার সেই প্রতারণাও শীঘ্রই ফাঁস হয়ে যাবে। এই সত্য হচ্ছে সহজ-স্বাভাবিক বাস্তবতা।

২. এটি প্রায়োগিক ক্ষেত্রে তা লাভের ব্যাপার বলে দৃষ্ট হয়। 'একই সাথে তোমরা ঈশ্বর ও ম্যামন– উভয়ের সেবা করতে পার না।' 'ম্যামন' হচ্ছে সিরিয়াক শব্দ– যা মূলত

কোন কিছু 'লাভ' করাকে বোঝায়; তাই, যে লাভের প্রত্যাশায় ভণ্ডেরা জাগতিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ে সেই লাভই হচ্ছে ম্যামন (ফিলিপীয় ৩:৭)। জগতে যা আছে– দেহের কামনা, চোখের লোভ, সাংসারিক বিষয়ে অহংকার– এ সবই হচ্ছে ম্যামন। 'তাদের পেটই হচ্ছে তাদের ম্যামন এবং তারা তারই দাসত্ব করে' (ফিলিপীয় ৩:১৯); কারও কাছে ঈশ্বরের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পাওয়া ঘুম, খেলাধুলা এবং কাজকর্ম (হিতোপদেশ ৬:৯); আবার কারও কাছে জাগতিক ধন-সম্পদ জমানোটাও 'ম্যামন' হিসেবে দেখা দেয় (যাকোব ৪: ১৩)। ফরীশীদের কাছে 'ম্যামন' ছিল অন্যদের কাছ থেকে পাওয়া সম্মান, প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠ পদ। স্বভাবতই ম্যামনের শিষ্যদের উপাসনা ঈশ্বরকে বিন্দুমাত্র গৌরবান্বিত করে না। উপরন্তু ম্যামনের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবার আহ্বানের মাধ্যমে তারা তাঁকে বিব্রত -বিরক্ত করে তোলে। একইসাথে ঈশ্বর ও ম্যামনের সেবা করা যায় না– একথা তারা কখনো মেনে নিতে চায় না; উল্টো তারা উভয়কে ভালবাসতে গিয়ে গভীর পাঁকে পড়ে (১ যোহন ২:১৫; যাকোব ৪:৪)। তারা যেন ঈশ্বরকে করুণা করে তাঁর সাথে সম্পর্ক রেখেছে– এমনই তাদের ধৃষ্টতা! ঈশ্বর ও ম্যামন– উভয়ের পর্যবেক্ষণ, উপস্থিতি, আস্থায় এবং নির্ভরতায় থাকা কখনো সম্ভব নয়, কারণ তারা একে অন্যকে স্বীকার করে না। ঈশ্বর বলেন, 'আমার পুত্র, তুমি আমাকে তোমার হৃদয় দাও'। ম্যামন বলে, 'না আমাকে দাও।' ঈশ্বর বলেন, 'তোমার যা আছে তা-ই নিয়ে সন্তুষ্ট থাক।' ম্যামন বলে, 'যত পার লুফে নাও; টাকা টাকাই; তার আবার ভাল-মন্দ কী। যেভাবে পার কামিয়ে নাও।' ঈশ্বর বলেন, 'বঞ্চনা কোরো না, কখনো মিথ্যা বোলো না এবং সৎ জীবনে স্থির থাকো।' ম্যামন বলে, 'তোমার পিতাকে প্রবঞ্চনা কর। একে লাভের উপায় বলে গণ্য কর।' ঈশ্বর বলেন, 'দান কর।' ম্যামন বলে, 'না, দিও না। যত পার জমাও; মিছিমিছি কেন তুমি দিতে যাবে?' ঈশ্বর বলেন, 'সত্যিকারের ধনের বিষয়ে আগ্রহী হও।' ম্যামন বলে, 'আরে বাবা, একদিকে দেখলে চলে! ধর্মকর্মের পাশাপাশি যদি দু'টো পয়সা কামিয়ে নেওয়া যায় তাতে ক্ষতি কী?' ঈশ্বর বলেন, 'তোমার বিশ্রাম দিবসকে পবিত্র উদ্দেশ্যে পালন কোরো।' ম্যামন বলে, 'ওই দিন যদি কামাইয়ের একটা ব্যবস্থা করা যায় তাতে কি পবিত্র বাইবেল অশুদ্ধ হবে?' এভাবে ঈশ্বর ও ম্যামনের আদেশের মতদ্বৈধতা দেখা দিয়ে থাকে। সে কারণেই আমাদের ঈশ্বর ও ম্যামন– উভয়ের সেবা করা থেকে সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের 'কর্তা কে' সেটা যেন আমাদের কাজের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায়। খ্রীষ্টের অনুসারী হিসেবে জাগতিকতাকে তুচ্ছজ্ঞান করে একমাত্র ঈশ্বরকেই আমাদের জীবনের অধিকর্তারূপে প্রামাণ্য স্বীকৃতি দিতে হবে।

মথি ৬:২৫-৩৪

বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষার মাধ্যমে খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তারা জগতের প্রতি অতিমাত্রায় অনুরক্ত হয়ে না পড়ে। জীবনকে ভালবাসতে গিয়ে মানুষ কীভাবে তার বিশ্বাসের জায়গা থেকে সরে যায়, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করে সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে খ্রীষ্ট এখানে আবারও তাঁর শিষ্যদের জগতকেন্দ্রিক স্থূল-অকার্যকর চিন্তা থেকে বিযুক্ত থাকার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিলেন। ভবিষ্যত জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রত্যাশায় মানুষের ক্রমশ বৈষয়িক, ঈশ্বর-বিহীন হয়ে পড়াকে 'ভণ্ডামি' আখ্যা দিয়ে তিনি তাঁর

শিষ্যদের 'জগতমুখীনতার' বিপরীতে শক্তভাবে দাঁড়াতে বললেন। ভবিষ্যত-চিন্তাজনিত 'উদ্বেগের' ফলে 'বিভ্রান্ত' হয়ে যারা ঈশ্বরের প্রতি 'আস্থা হারিয়ে' ফেলে তারা যে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের বিরুদ্ধেই পাপ করছে তা তাঁর শিক্ষায় দৃশ্যমান; ফলে, বেঁচে থাকার দুশ্চিন্তা এখানে পরিণত হয়েছে অপরিসীম আনন্দে। লক্ষ্য করুন,

ক. খ্রীষ্ট এখানে নিষেধের সুরে নয় বরং সাহায্যকারী, বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো পরামর্শের সুরে আমাদের বলছেন যেন আমরা জগতের বিষয়ে ভাবিত না হই। 'আমি তোমাদের বলছি'। এই 'আমি' হচ্ছেন আমাদের হৃদয়ের অধিকর্তা, সান্ত্বনাদানকারী বন্ধু প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, যিনি আমাদের আইনপ্রণেতা এবং অফুরন্ত আনন্দের উৎস। তো তিনি কী বললেন? তিনি বললেন, 'কী খাবে বলে বেঁচে থাকবার বিষয়ে কিংবা কী পড়বে বলে শরীরের বিষয়ে চিন্তা কোরো না' (২৫)। জগতমুখী হয়ে পড়াটা যে ভণ্ডামিরই নামান্তর– সে কথা গুরুত্বের সাথে বলতে গিয়ে খ্রীষ্ট এখানে তাঁর সতর্কবাণীর পুনরুক্তি করেছেন (৩১, ৩৪); এবং স্বভাবতই এর ব্যবহার নিরর্থক নয়; কারণ বিষয়কে স্পষ্ট করে তোলার স্বার্থে দ্বিতীয়বার কোন প্রসঙ্গের অবতাড়নার যথেষ্টই গুরুত্ব রয়েছে। জীবন ও জগতের প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসা আমাদের ঈশ্বরের কাছে দোষী করে তোলে। তা এমন এক পাপ যা সহজেই আমাদের গ্রাস করে ফেলতে সক্ষম। বেঁচে থাকার জন্য আমরা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করছি কি না, অর্থাৎ তাঁর তত্ত্বাবধানের প্রতি আমাদের আস্থা আছে কি না, সর্বোপরি নিজেদের জীবন দ্বারা আমরা তাঁকে কতটা সন্তুষ্ট করতে পারছি, তা আমাদের যাপিত জীবনই বলে দেয়। খ্রীষ্ট এখানে তাঁর আদেশের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে শিষ্যদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে চাইলেন যেন তারা জগত সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে নিজেদের বিশ্বাস, মনকে দ্বিধা-বিভক্ত করে না ফেলে। তবে, জীবন সংশ্লিষ্ট কিছু 'ভাবনা' কেবল আইনসিদ্ধই নয় উপরন্তু দায়িত্বও বটে, 'তোমার ছাগল-ভেড়ার পালের অবস্থা তুমি ভাল করে জেনে রেখ, আর তোমার পশুপালের দিকে মনোযোগ দিয়ো' দেখুন, হিতোপদেশ ২৭:২৩)। বস্তুত সৎ, আদর্শ নারী এই কাজকে প্রশংসার চোখে দেখে থাকেন। পৌলের ক্ষেত্রেও আমরা এই 'চিন্তা' শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ্য করি। তিনি তার সময়কার মণ্ডলীসমূহের এবং যুবক তীমথির আত্মিক জীবনের সমৃদ্ধির কথা ভেবে চিন্তিত হয়েছিলেন (২ করি ১১:২৮; ফিলি ২:২০)।

কিন্তু এখানে মূলত যে 'চিন্তা' করতে নিষেধ করা হয়েছে তা এই:

১. উদ্বেগপূর্ণ চিন্তা, যা মনকে বিক্ষিপ্ত করে তুলে উৎকণ্ঠায় ভরিয়ে রাখে। স্বভাবতই এই প্রকার চিন্তা ঈশ্বরতে আমাদের যে আনন্দ রয়েছে তাকে হেসে উঠতে দেয় না বরং তাঁর প্রতি আমাদের প্রত্যাশাকে দমিয়ে দেয়। অযথা উদ্বেগে আমাদের ঘুম নষ্ট হয়; মানসিক যাতনা প্রবল হওয়ায় বন্ধুদের সান্নিধ্য এমনকি ঈশ্বর আমাদের যা দিয়েছেন তা উপভোগ করতেও আমরা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ি।

২. আস্থাহীনতা, অবিশ্বাসের চিন্তা। ঈশ্বর তাঁর অসীম অনুগ্রহে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদানের ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করেছেন। হ্যাঁ, যে জীবন আমরা বর্তমানে যাপন করছি তার জন্য অতি আবশ্যক খাদ্য, পোশাক তিনি আমাদের দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন; তবে তা বাড়তি করে নয়, বরং প্রয়োজন অনুসারে। ঈশ্বর কখনো এমনটা বলেননি, 'তারা ভূড়িভোজে তৃপ্ত হবে' বরং তিনি বলেছেন, 'তাঁরা খেয়ে বাঁচবে'। এখানে মূলত 'ভবিষ্যত চিন্তার' বিষয়ে বলা হয়েছে। সামনের দিনগুলো কীভাবে চলবে– সে বিষয়ে অতিরিক্ত চিন্তাযুক্ত হওয়ার ফলে মানুষ ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা ও স্বর্গীয় তত্ত্বাবধানের

প্রতি সন্দিহান হয়ে পড়ে। বাস্তবিকই এই ভাবনা মন্দতায় আচ্ছন্ন। বেঁচে থাকার জন্য আমরা অবশ্যই নিয়মসিদ্ধ উপায়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য চাইব; তবে কোন মতেই তাঁকে পরীক্ষা করে নয়। ঈশ্বরের আহ্বানের বাধ্য থেকে আমরা তাঁর কাছে প্রতিদিনের খাবার চাইব এবং সতর্কতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে হাতের টাকা-পয়সা খরচ করব। এ ছাড়া কখনো যদি আমাদের আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যায়, তবে ভেঙে না পড়ে তাঁর কাছে সাহায্য চাইব; কারণ তিনি আমাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য দানে সমর্থ; তিনি পারেন না– এমন কিছুই নেই। নিজেদের সামর্থ্যের উপর ভরসা করে যেহেতু আমরা বেশি দূর অগ্রসর হতে পারি না সেহেতু আমাদের সব ক্ষেত্রে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে হবে। 'ভিক্ষা করতে আমার লজ্জা লাগে'– বক্তা খুব বিখ্যাত কেউ নন, তবে শাস্ত্রে আমরা তার বিষয়ে পড়ি (লূক ১৬:৩)। এ ছাড়াও আমরা আরেকজনের বিষয়ে জানি, যে ধনী লোকের টেবিল থেকে পড়া উচ্ছিষ্ট খাবার দিয়ে পেট ভরাতে চাইতো (২১)। তাই ভবিষ্যতের ভাবনা আমরা অবশ্যই ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দেব এবং নিজেদের ওপর কোন দুর্ভাবনা টেনে আনব না। কারণ, আমরা না জানলেও ঈশ্বর তাঁর দূরদর্শিতায় আমাদের সব প্রয়োজন সম্বন্ধে অবগত আছেন এবং তিনি কীভাবে সেই সাহায্য পাঠাবেন তা কেবল তিনিই জানেন। নিজেদের জীবনকে তাঁর হাতে তুলে দিয়ে আমাদের তাঁকে বলা উচিত, 'প্রভু, তুমি আমাকে চালাও'। রুটিরুজির জন্য প্রাণপাত করা কিংবা সীমাহীন চাহিদার পেছনে অন্তহীন ছুটে চলাটা ঈশ্বরের কাছে অর্থহীন বলে বিবেচিত হয়, 'মিথ্যেই তোমরা খাবার জোগাড়ের জন্য ভোরে ওঠো, আর দেরি করে ঘুমাতে যাও' (১২৭:২)। খ্রীষ্টের সতর্কবাণীর প্রতি লক্ষ্য করুন,

(১) 'বেঁচে থাকবার ব্যাপারে ভাবিত হয়ো না।' পৃথিবীতে আমাদের বেঁচে থাকাটাই পরম আশ্চর্যের ব্যাপার বলে প্রতীয়মান হয়। ফলে, 'মানুষ তার মূল্যবান জীবনের বিনিময়ে সব কিছু দিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হয় না'। তবুও 'বেঁচে থাকবার ব্যাপারে ভাবিত হয়ো না'। লক্ষ্য করুন, এখানে কিন্তু,

(ক) আমাদের চিন্তার ধারাবাহিকতায় ছেদ টেনে দেওয়া হয়নি। যে কারণে চিন্তার ধারাবাহিক গতি-প্রকৃতি অক্ষুণ্ন রেখে পরবর্তী পদক্ষেপের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে আমাদের কোন বাধা নেই। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, আমাদের সেই চিন্তা যেন ঈশ্বরকে ক্ষুব্ধ করে না তোলে। 'বেঁচে থাকা' সংশ্লিষ্ট আমাদের সব 'চিন্তা' ঈশ্বরের পরিচালনার অধীনে রাখতে হবে যেন তিনি তাঁর মতো করে সেসবের সমাধান দিতে পারেন। এর ফলে আমরা বলতে সমর্থ হই, 'আমার দিনগুলো তোমার হাতে পড়েছে এবং তা ভাল হাতেই পড়েছে।'

(খ) জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যভাবে এগিয়ে যাওয়াকেও এখানে নিবৃত্ত করা হয়নি; বরং অর্থহীন ভবিষ্যত চিন্তায় ডুবে না গিয়ে আমরা যেন নিজেদের বর্তমানকে ঈশ্বরের হাতে তুলে দিতে পারি– সে লক্ষ্যে সচেষ্ট হতে বলা হয়েছে। আমাদের সব চিন্তা ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে হবে; এবং হাসিমুখে তাঁর সিদ্ধান্ত, পদক্ষেপকে মেনে নিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ তিনি তাঁর ইচ্ছামতো আমাদের ভবিষ্যতকে তেতো কিংবা মিষ্ট করে তুলতে পারেন। প্রয়োজনীয় খাদ্য-সাহায্যের জন্য আমরা অবশ্যই তাঁর ওপর নির্ভর করব, কারণ তিনি আমাদের তা দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন; এবং সে কারণেই আমরা আত্মবিশ্বাসের সাথে তার কাছ থেকে আমাদের প্রয়োজন-প্রাপ্তির প্রত্যাশা করতে পারি। বলো না, 'কী খাব?'– এ কথা শোনামাত্রই আমাদের চোখে এমন এক মানুষের চেহারা ভেসে ওঠে যে তার

সবকিছু হারিয়ে বসেছে এবং স্বভাবতই জীবনের প্রতি হতাশ, বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। পৃথিবীর বেশির ভাগ ভাল মানুষের চাওয়া সীমিত হলেও তাদের কাছে বর্তমানের জন্য কিছু না কিছু থেকেই যায়। তাই এমনটা বলা তো বাতুলতাই– 'কী খাব?'

(২) 'আগামীদিনের জন্য চিন্তা কোরো না।' ভবিষ্যতের কথা ভেবে কখনো উদ্বিগ্ন হবেন না; সামনের বছরটি কীভাবে কাটবে, বুড়ো বয়সে কী করে চলবেন কিংবা মারা যাবার পর আপনার ছেলেমেয়ের কী হবে– সেসব ভেবে সময় নষ্ট করবেন না। ভবিষ্যতে কী হবে– তা নিয়ে যেমন আমরা ভাবিত হব না তেমনি সে বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়া থেকেও বিরত থাকব।

খ. এই নিষেধাজ্ঞার পেছনে যে কারণ ও যুক্তি প্রদর্শিত হয়েছে– তা লক্ষ্য করে যে কেউ এমনটা ভাবতে পারেন, খ্রীষ্টের আদেশই তো তাঁর প্রতি আমাদের উদ্বেগ ও আস্থাহীনতার পাপ থেকে নিবৃত্ত করতে যথেষ্ট, তবু কেন এই যুক্তি প্রদর্শন? এর কারণ, তিনি চাইলেন যেন আমরা তাঁর আদেশের যথার্থতা ও গুরুত্বের বিষয়টি বুঝতে সমর্থ হই; সে কারণেই বন্ধু-পরামর্শকের মতো তিনি আমাদের ওপর তাঁর আদেশটিকে চাপিয়ে দেওয়ার স্থলে তাকে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেবার ভার আমাদের ওপরই ছেড়ে দিলেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি দেখালেন যে, তাঁর শিষ্যরা যেন তাঁর অনুগ্রহের দিকে ফেরে সেজন্য তিনি কতটা উদগ্রীব হয়ে আছেন। তাঁর আদেশটি অব্যর্থ যুক্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যদি আমরা যুক্তিবাদীও হই তবুও এই যুক্তিপ্রিয়তার কারণেই আমরা অবশ্যই তাঁর আদেশের বাধ্য হব। উদ্বিগ্নতা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে এবং মাথা থেকে তা ঝেড়ে ফেলতে আমাদের খ্রীষ্টের বলা 'সান্ত্বনাদায়ী চিন্তার' দ্বারস্থ হতে হবে। নিজেদের দুর্ভাবনার স্থলে একে আমাদের প্রতিস্থাপন করতে হবে; কারণ এর উপস্থিতিতে আমাদের 'উদ্বিগ্নতা,' 'আস্থাহীনতা' প্রকৃতই দুর্বল হয়ে পড়ে, যেহেতু তা আসে সক্রিয় বিশ্বাস থেকে এবং সব প্রকার দুর্ভাবনা থেকে আমাদের মুক্তি দিতে সমানভাবে কার্যকর। ফলে, আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হই যে,

১. 'জীবনটা কেবল খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার নয়, আর শরীরটা কেবল কাপড়চোপড়ের ব্যাপার নয়' (২৫ পদ)। হ্যাঁ, তাঁর এ কথায় সন্দেহ পোষণের কোন কারণ নেই; কারণ আমাদের স্রষ্টা, সাহায্যকারী হিসেবে তিনি প্রকৃতই জানেন যে, বর্তমানে বেঁচে থাকতে গিয়ে আমাদের কী কী প্রয়োজনের মুখোমুখি হতে হয়। তাঁর এ কথার দ্বারা তিনি নিজের বিষয়েই বললেন যে, তিনি আমাদের প্রয়োজনের বিষয়ে অবগত আছেন। মনে রাখুন,

(১) আমাদের এই 'জীবন' কেবল বেঁচে থাকার জন্য নয়; জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিচারে স্রেফ বেঁচে থাকাটা গৌণ বলে বিবেচিত হয়; তাই বলা যায়, জীবনধারণের চেয়েও আমাদের জীবন অনেক বেশি মূল্যবান, আশীর্বাদধন্য। এটা সত্য যে, বেঁচে থাকা ছাড়া 'জীবন' অর্থহীন। কিন্তু এখানে মূলত বেঁচে থাকার জন্য আমরা যেসব প্রয়োজনকে 'মুখ্য' মনে করে থাকি এখানে সেই 'খাবার' ও 'পোশাকের' কথাই বলা হয়েছে। জীবনের জন্য খাবার ও পোশাক কেবল 'ভোগ' ও 'অলঙ্কার' বলেই পরিগণিত হয়। এসবের জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হতে গিয়ে আমরা জীবনের মূল লক্ষ্যের দিকে তাকাতে ভুলে যাই, যেখানে প্রকৃত আনন্দ ও গৌরব রয়েছে। সুস্বাদু খাবার, চমৎকার সাজ-পোশাক আসে পৃথিবী থেকে কিন্তু জীবন ঈশ্বরের শ্বাস-প্রশ্বাস থেকেই আসে। জীবনকে আমরা মানুষের তৈরি লণ্ঠনের সাথে তুলনা করতে পারি; যেখানে খাবার কেবল জ্বালানি হিসেবেই

ব্যবহৃত হয়। প্রকৃত অর্থে এটাই হচ্ছে ধনী ও গরীবের মাঝে পার্থক্য। ধনীর কেবল জ্বালানিরূপ খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। কিন্তু গুরুত্ব ও সম্মানের বিচারে তাদের অবস্থান একই এবং পার্থক্যও সামান্য।

(২) এই 'সান্ত্বনাদায়ী চিন্তা' আমাদের খাবার ও পোশাকের জন্য ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করতে উৎসাহ যোগায়। শুধু তাই নয়, এর মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদের অবস্থানকে স্পষ্ট করতে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাবৎ জটিলতা নিরসনে সক্ষম হই। আমাদের এই শরীর ও জীবন ঈশ্বরেরই দেওয়া। একে আমরা 'নিজের' বলে দাবি করলেও প্রকৃত অর্থে এর ওপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। ঈশ্বরই একে তাঁর সাহায্য ও যত্নে পরিচালিত করেন। তাই, এ পর্যন্ত যেভাবে তিনি আমাদের চালিয়ে এনেছেন সেভাবে ভবিষ্যতেও যে চালাবেন– তাতে কি কোন সন্দেহ আছে? আমরা যদি আমাদের আত্মার পরিচর্যায় এবং স্বর্গীয় জীবনে প্রবেশের প্রস্তুতি গ্রহণে আন্তরিক হই তবে নিশ্চিতভাবেই ঈশ্বর আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য-পোশাক যোগাবেন। নিজেদের জীবনে আমরা এ পর্যন্ত ঈশ্বরের কাছ থেকে যে অপরিমেয় দয়া লাভ করেছি তা বলে শেষ করা যাবে না; আমাদের প্রতিটি হৃদস্পন্দন, রক্তকণা সাক্ষ্য দেবে যে, একমাত্র ঈশ্বরই আমাদের জীবনের রক্ষাকর্তা। মন্দতা থেকে সুরক্ষা লাভের জন্য আমরা যদি আমাদের জীবনের ভার তাঁর ওপর ছেড়ে দিই তবে নিশ্চিতভাবেই তিনি আমাদের খাবার, পোশাক ও ভাল ভাল জিনিস জুগিয়ে দেবেন। তিনি যদি আমাদের মেরে ফেলতে চান কিংবা ক্ষুধার্ত অবস্থায় ফেলে রাখতে চান তবে তাঁর চাওয়াকে সম্মান জানিয়ে আমাদের তাঁর সাহায্যকারী স্বর্গদূতের প্রত্যাশায় বসে থাকা চলবে না।

২. 'আকাশের পাখিদের দিকে তাকিয়ে দেখ এবং মাঠের ফুলগুলোর কথা ভেবে দেখ।' যুক্তি দিতে গিয়ে খ্রীষ্ট এখানে ঈশ্বরের সাধারণ সৃষ্টিকর্ম বেছে নিয়েছেন। তিনি এর দ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রতি আকাশের পাখি ও বনের ফুলের নির্ভরতার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। ঈশ্বরের পরিচালনার প্রতি কীরকম বাধ্যতা প্রদর্শন কার উচিত– তা জানতে মানুষকে এখানে আকাশের পাখিদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে বলা হয়েছে (ইয়োব ১২:৭, ৮)।

(১) পাখিদের দিকে তাকাও এবং খাবারের জন্য কী করে ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করতে হয় তা শেখো (২৬ পদ)। তাই 'কী খাবে' তা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ো না।

(ক) লক্ষ্য করুন, আকাশের পাখি ও বনের ফুল আমাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহের ওপর পুরোমাত্রায় নির্ভরশীল হতে শেখায়। তাদের বিচরণ, জীবন-যাপন লক্ষ্য করে তা থেকে নির্দেশনা গ্রহণ করুন। পৃথিবীতে বহু প্রজাতির পাখির বাস এবং সংখ্যায়ও তারা অনেক। তবুও নিজেদের জন্য উপযোগী খাবারই তারা পেয়ে থাকে। এদের কেউ নিছক খাবারের কারণে মারা গেছে– এমনটা খুঁজে পাওয়া ভার। এমনকি শীতকালেও যখন প্রকৃতি, আবহ-াওয়া বিরূপ হয়ে পড়ে তখনও তাদের খাবারের অভাব হয় না। তাদের জীবন-যাপন ছকবাঁধা, গণ্ডিবদ্ধ; স্বভাবতই মানুষের মতো এরা ন'টা-পাঁচটা অফিস করে না, ওভারটাইম তো নয়ই। ফলে, নিজেদের জীবিকার জন্য তারা যত্নবান– এ কথা বলা যায় না। মাঝে মাঝে তারা মানুষের কাছ থেকে খাবার পেয়ে থাকলেও তা সংখ্যায়, পর্যাপ্ততায় অপ্রতুল; তা -ও যেটা বলা হল– মাঝে-মধ্যে। এরপরও তারা প্রয়োজনীয় খাবার খেয়ে বেঁচে থাকে। যদিও বিরুদ্ধ পরিবেশ, প্রতিকূল আবহাওয়ার বিপরীতে তাদের লড়াইয়ের গল্পটা আমাদের অজানা। তবে একথা তো আর বলে দিতে হয় না যে, আমাদের স্বর্গীয় পিতাই তাদের

খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখেন! পৃথিবীর একটি পাখির বিচরণ কিংবা চাহিদার কথাও তাঁর অজানা নয়। পাহাড়ের সব পাখিকে তিনি যতটা জানেন ততটা আমরা নিজেদের গুদামঘরের দরজা সম্পর্কেও জানি না (গীত ৫০:১১)। শস্যদানা খুঁটে খাবার জন্য চড়ুই পাখির শস্যক্ষেতে অবতরণের কথাটা একবার ভাবুন; আর পাশাপাশি রাখুন খ্রীষ্টের এই কথাটিকে, 'তারা বীজ বোনে না, কাটেও না, গোলাঘরে জমাও করে না'। স্পষ্টতই এ থেকে আপনি সমগ্র সৃষ্টিতে ছড়িয়ে থাকা ঈশ্বরের নিদর্শন সম্পর্কে জানতে পারেন। আকাশের পাখিরা ধরাবাঁধা জীবন যাপন করে; জীবন ধারণের জন্য দৃশ্যত তাদের কোন সুনির্দিষ্ট কাজ করতে দেখা যায় না। তারা ফসল ফলায় না, গোলাঘরে তা জমাও করে না, তবুও ঈশ্বর তাদের খাইয়ে থাকেন। শ্রমকুশলতা ও ভবিষ্যত চিন্তার জন্য প্রাণিজগতের মাঝে পিঁপড়ে ও মৌমাছি উদাহরণ হয়ে আছে। তবে আকাশের পাখিরা তা করে না; তাদের ভবিষ্যতের ভাবনা নেই; কিছু জমা না করেও তারা এই বেলা, ও বেলা, পরের দিনের খাবারের জন্য কেবল ঈশ্বরের হাতের দিকে চেয়ে থাকে। তাদের এ প্রতীক্ষা মহান, আদর্শ গৃহকর্তারূপী ঈশ্বরের উদ্দেশে যিনি প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী খাবার যুগিয়ে থাকেন।

(খ) খ্রীষ্টের তুলনাটি আমাদের জন্য এক অনুপম উৎসাহ বিশেষ, 'তোমরা কি তাদের চেয়ে আরও মূল্যবান নও?' হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবেই আমরা তাদের চেয়ে মূল্যবান। মনে রাখুন, স্বর্গের উত্তরাধিকারীরা আকাশের পাখিদের চেয়ে অনেক মহান, কারণ তাদের পবিত্র করা হয়েছে এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে বিশ্বাস স্থাপনের ফলে তারা অনেক উঁচুতে উঠবে। সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে তারা আকাশের পাখিদের চেয়েও বেশি জ্ঞান রাখে (ইয়োব ৩৫:১১); যদিও পৃথিবীর সন্তানদের মাঝে যারা প্রভুর বিচার সম্বন্ধে জানে না তাদের জ্ঞান সারস, বক কিংবা শালিকের চেয়ে বেশি নয় (যিরমিয় ৮:৭)। তারা ঈশ্বরের খুবই কাছের এবং প্রিয়, যদিও তারা পাখিদের মতো উড়তে পারে না। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সত্য হচ্ছে, ঈশ্বর-ই তাদের পিতা, যেখানে আকাশের পাখিদের কাছে প্রভু, মনিব হিসেবেই পরম প্রার্থিত। তাঁর কাছে তাঁর সন্তানদের মূল্য অজস্র চড়ুই পাখির চেয়েও বেশি। এবারে নিজের বিষয়ে ভাবুন– আপনি ঈশ্বরের সন্তান, তাঁর প্রথমজাত সন্তান। ফলে, যেখানে তিনি এই পাখিদের খাবার যুগিয়ে থাকেন সেখানে কি তিনি আপনাকে না খাইয়ে রাখবেন? আপনার ক্ষেত্রে তো তা আরও সুনিশ্চিত বলে পরিলক্ষিত হয়! তারা আপনার পিতার অনুগ্রহের প্রতি আস্থাশীল, আর আপনি তা করতে ব্যর্থ হবেন? ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে, বাধ্যতায় পাখিরা ভবিষ্যত চিন্তায় জর্জরিত হয়ে বেঁচে থাকার আনন্দকে ভুলতে বসে না; তারা বাস্তবিকই ভাবনাহীন, নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপন করে– 'তারা গাছের ডালে বসে পরম সুখে গান ধরে' (গীত ১০৪:১২)। তারা তাদের সামর্থ্যের সবটুকু উজাড় করে দিয়ে আপন সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশে প্রশংসা-সঙ্গীতে চারপাশ মুখরিত করে তোলে। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি বিশ্বাসে বাধ্যতায় আমরা যদি ভবিষ্যত চিন্তাকে জলাঞ্জলি দিতে সমর্থ হই তবে আমরাও এই পাখিদের মতো অনবরত তাঁর গৌরব করে যেতে সক্ষম হব; সেই প্রশংসা-গানে আমরা তাঁকে গৌরবান্বিত করতে পারব যা জাগতিক ভবিষ্যত চিন্তা আমাদের করতে দেয় না।

(২) মাঠের ফুলগুলোর দিকে তাকান এবং পোশাকের ব্যাপারে ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করতে শিখুন। 'কী পরব'– সেই চিন্তাও আমাদের নিয়ত তাড়িয়ে ফেরে। রোদ-গরম-ঠাণ্ডা-আঘাত থেকে শরীরকে বাঁচাতে আমাদের পোশাকের দারস্থ হতে হয়; অবশ্য অতিরিক্ত কিংবা দামি পোশাক মানুষের সমাজে মর্যাদা, গৌরবের পরিচায়ক হয়ে থাকে। অন্যের

সামনে নিজেকে আরও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপনের জন্য গায়ে বাহারি পোশাক জড়ানোতে সবারই আগ্রহ থাকে। তবে সামর্থ্য অনুযায়ী কাউকে এক কাপড়ে মাসের পর মাস আবার কাউকে প্রতিদিনই নতুন পোশাকে বের হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে অবশ্য 'প্রয়োজন ও বিলাসিতা'– এ দু'টি বাস্তব প্রসঙ্গ উঠে আসে। মনে রাখবেন, আভিজাত্য, বিলাসিতাকে পাশ কাটিয়ে আমাদের কেবল প্রয়োজনের দিকটিকেই বিবেচনা করতে হবে। তাই, প্রতিদিনের খাবারের জন্য আমরা যেভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি সেভাবে পোশাক চাওয়ার যৌক্তিকতা নেই। তবে, আমরা কীভাবে ঈশ্বরের কাছে আমাদের দরকারি পোশাক চাইব? খ্রীষ্টের এ কথাতেই তা পরিষ্কার, 'মাঠের ফুলগুলোর কথা ভাব'; কেবল দেখাই নয় বরং এ সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবুন। মনে রাখুন, প্রতিদিন আমরা যা প্রত্যক্ষ করি তাতে অনেক জ্ঞানের বিষয় লুকায়িত আছে (হিতোপদেশ ৬:৬; ২৪:৩২)।

(ক) ফুলগুলোর কোমলতার কথা ভাবুন; এগুলো মাঠের ঘাস বলেই দৃষ্ট হয়। রঙের কারণে এদের মাঝে পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও মূলত তারা ঘাসই। ঠিক এরকমভাবে মানুষও ঘাসের মতো; যদিও তাদের চমৎকার শরীর ও বিবেচনাশক্তি রয়েছে যা মাঠের ফুলগুলোর নেই, তবুও ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রকৃতিতে তারা ঘাসমাত্র। বেঁচে থাকার প্রকৃতি বিবেচনায় মানুষের সাথে মাঠের ঘাসগুলোর বাস্তবিকই কোন পার্থক্য নেই; তারা উভয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। 'সব মানুষ ঘাসের মতো, আর মাঠের ফুলগুলোর মতোই তাদের সব সৌন্দর্য (১ পিতর ১:২৪)। যে ঘাস আজ দেখা যাচ্ছে কালই তা চুলায় ফেলে দেওয়া হবে। মানুষের কাছে কবরই হচ্ছে সেই চুলা যেখানে 'নির্দিষ্ট করা কবরে তাদের নিয়ে যাওয়া হবে এবং মৃত্যুকে তাদের রাখাল হিসেবে পাবে' (গীত ৪৯:১৪)। ঠিক সে কারণেই আমাদের পরের দিনের জন্য ভাবিত হওয়া কিংবা সেদিনের জন্য খাদ্য, পোশাক মজুদ করার জন্য ব্যস্ত হওয়া চলবে না। কারণ পরদিনই আমাদের কাফনের পোশাক পরতে হয় কিনা তা কে বলতে পারে!

(খ) ভেবে দেখুন, তারা কত অযত্নে বেড়ে ওঠে; মানুষের মতো তারা পরিশ্রম করে না, পোশাকের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে না কিংবা মহিলাদের মতো সুতাও কাটে না। তবে তার মানে এই নয় যে, আমরাও নিজেদের শরীরের যত্ন নিতে অস্বীকৃতি জানাব বা সব কাজ বাদ দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকব। গুণবতী স্ত্রীর প্রশংসা করতে গিয়ে শলোমন বলেছিলেন, 'হাত দিয়ে তিনি সুতা কাটবার টাকু ঘোরান আর আঙুল দিয়ে সুতা কাটেন (হিতোপদেশ ৩১:১৯, ২৪)। তাই, আমাদের পরিশ্রমী হতে হবে; কারণ অলস লোক ঈশ্বরের ওপর নির্ভরতার শিক্ষাকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে তাঁকে পরীক্ষা করতেই উদ্যত হয়। এখানে আমাদের পরিশ্রম করতে নিরুৎসাহিত করা হয়নি, বরং অযত্নে বেড়ে ওঠা মাঠের ফুলগুলোর উদাহরণ টেনে খ্রীষ্ট আমাদের বিশ্বাস ও আশা যেন ঈশ্বরের প্রতিই থাকে– তা নিশ্চিত করতে চাইলেন। তিনি বলতে চাইলেন, 'ঈশ্বর যদি আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ এই ফুলগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেন তবে তিনি যে তোমাদের প্রতি আরও বেশি করে চোখ রাখবেন, সাহায্য করবেন তা তো জানা কথাই।' ঈশ্বর আমাদের পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তাঁর অনুগ্রহ ঢেলে দেবেন কিন্তু যারা অসুস্থ, কাজে যোগদানে অক্ষম– সেক্ষেত্রে ঈশ্বর তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য, পোশাক যুগিয়ে দিতে পারেন।

(গ) মাঠের ফুলগুলোর সৌন্দর্য ও তাদের বেড়ে ওঠার বিষয়ে চিন্তা করুন। শীতের মৌসুমে টিউলিপ বা লিলির শেকড় শুকিয়ে যায়, বসন্তে তা আবার সজীব হয়ে ওঠে। আর

অল্প দিনের মধ্যেই ফুলে ফুলে চারদিক ছেয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আমাদের ইস্রায়েলের বিষয়ে ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন 'সে লিলি ফুলের মতো বেড়ে উঠবে'– তা মনে পড়ে যায় (হোশেয় ১৪:৫)। ভেবে দেখুন সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মাঠের ফুলগুলো কী করে বেড়ে উঠে সৌন্দর্যের পসরা সাজিয়ে বসেন, যে সৌন্দর্য বিপুল প্রতাপান্বিত রাজা শলোমনেরও ছিল না। প্রচুর ধন-সম্পদ ও অনেক প্রদেশের অধিপতি হিসেবে শলোমনের পোশাক ছিল অসাধারণ, যাকে বলে রাজকীয়। তিনি যখন প্রজাদর্শনে বের হতেন কিংবা রাজ-দরবারে উপস্থিত হতেন তখন স্বভাবতই তার পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে 'আভিজাত্য' ঠিকরে বেরুতো; কিন্তু তবুও তিনি এই লিলি কিংবা টিউলিপের সৌন্দর্য দিয়ে নিজেকে সাজাতে পারেননি। সে কারণেই আমাদের শলোমনের গৌরবদীপ্ত আভিজাত্যের বদলে তার সেই প্রজ্ঞার জন্যই আকাঙ্ক্ষী হওয়া উচিত, যে প্রজ্ঞার দ্বারা তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্তভাবে তার রাজ্য পরিচালনা করতেন। বাহ্যিক কিংবা পোশাকি সৌন্দর্য নয় বরং জ্ঞান ও অনুগ্রহই মানুষকে পূর্ণতা দিতে পারে। তাই, ঈশ্বর যেন আমাদের বলছেন, 'মাঠের ফুলগুলো যেমন পোশাকের ব্যাপারে ভাবিত হয় না, তেমনি তোমরাও কী পরবে বলে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ো না।' মনে রাখুন, একমাত্রই ঈশ্বরই তাঁর সৃষ্টিকে সম্মানিত করতে সক্ষম। তিনিই ঘোড়াকে দ্রুততার সাথে চলার শক্তি এবং লিলিকে সৌন্দর্য দিয়েছেন। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টিকে যেভাবে সাজিয়েছেন তাকে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তাই, আমাদের মনে সৌন্দর্য বিষয়ক হীনম্মন্যতাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

(ঘ) এখানে বর্ণিত শিক্ষার বিষয়ে চিন্তা করুন (৩০ পদ)।

প্রথমত, আমরা অবশ্যই সুন্দর সাজপোশাকের প্রতি অধিক যত্নবান কিংবা লালায়িত হব না; এ নিয়ে কোন গর্বও যেন আমাদের ভেতরে ঘাঁটি গেড়ে না বসে। কারণ যত দামি, চাকচিক্যপূর্ণ পোশাকেই আমরা নিজেদের সাজাই না কেন তা লিলি ফুলের সৌন্দর্যের ধারের কাছেও আসতে পারে না। তবুও এই মিথ্যে সাজপোশাক নিয়ে কেন এত প্রতিযোগিতা, বাড়াবাড়ি– একটিবার তা ভেবে দেখুন। বাস্তবিকই কোন সাজপোশাক বেশিদিন টেকে না; ঠিক আমাদের মতো, যেভাবে আমরা বেড়ে উঠি, তারপর একদিন টুপ করে মরে যাই। যে সাজপোশাক নিয়ে মানুষের গর্বের অন্ত নেই তা ক্ষণস্থায়ী; রং জ্বলে গিয়ে এক সময় এর চাকচিক্য নষ্ট হয়ে যায়। ফলে, একে বাতিল করে ফেলে দিতেও আমাদের সময় লাগে না। সাজপোশাকের এই ধর্ম মানুষের প্রকৃত গতি-গন্তব্যের কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, 'সত্যিই মানুষ ঘাসের মতো' (যিশাইয় ৪০:৬, ৭)। এর পাশাপাশি আমরা মনে করতে পারি ধনীদের পরিণতির কথা, 'সে ঘাসের ফুলের মতোই ঝরে পড়ে যাবে' (যাকোব ১:১০)।

দ্বিতীয়ত, প্রয়োজনীয় পোশাকের জন্য আমাদের 'যিহোবা-যিরি' ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করতে হবে; যেভাবে তিনি মাঠের ফুলগুলোকে সাজান সেভাবে আমাদেরও সাজাবেন। পোশাক বাইরের তাপমাত্রা থেকে আমাদের দেহকে সুরক্ষা দেয়; তাই ঈশ্বর আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পোশাক জুগিয়ে দেবেন– দখিনা বাতাসে দেশ নীরব হয়ে যাবার সময়, এমনকি উত্তরের বাতাসে চারপাশ আলোড়িত হবার সময়েও (ইয়োব ৩৭:১৭)। ঈশ্বরের অনুপম সৃষ্টি হিসেবে তিনি আপনাকে চমৎকার সব পোশাকে সাজাতে পারেন; যদি তিনি মাঠের ফুলগুলোকেই এমন সৌন্দর্য উপহার দিতে পারেন তবে তিনি যে আপনাকে অনন্তকালীন পোশাকে সাজাবেন তা তো নিশ্চিত। হ্যাঁ, তিনি চান যেন আপনি তাঁর

পরিত্রাণের উপহার গ্রহণ করে স্বর্গে তাঁর অনন্তকালীন সান্নিধ্য পান। মানুষের প্রতি ঈশ্বরের মমতা অসীম; বিপথে যাওয়া নীনবীর মানুষজনের প্রতি তাঁর মমতাকে প্রকাশ করতে তিনি একটি কুমড়ো গাছকে ব্যবহার করেছিলেন (যোনা ৪:১০, ১১)। তাই, ঈশ্বর যাদের তাঁর অনুগ্রহের চুক্তির অধীন করেছেন সিয়োনের সেই সন্তানদের প্রতি তাঁর মমতা তো আ-কাশপ্রমাণ হবেই। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট এখানে লোকদের 'ওহে অল্প বিশ্বাসীরা' বলে সম্বোধন করেছেন (৩০ পদ)।

১. ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা ও তত্ত্বাবধানের প্রতি নিজেদের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করে তোলার জন্য তাঁর এই কথা আমাদের উৎসাহ জোগায়। 'দৃঢ় বিশ্বাস' ঈশ্বরের কাছে প্রশংসিত হয় এবং তাঁর কাছ থেকে 'প্রয়োজন' বুঝে পেতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই বলে নড়বড়ে বিশ্বাসকেও ঈশ্বর বাতিল করে দেন না; উপরন্তু তাকেও প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করে থাকেন। সে কারণেই খ্রীষ্ট এখানে যেসব অল্প বিশ্বাসীর কথা বলেছেন, নিজেদের অক্ষমতার কারণে তারা যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হবে তা নয়, বরং সবল বিশ্বাসীর মতো তাদের প্রতিও ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহের হাত প্রসারিত করবেন। এ প্রসঙ্গে আমরা পরিবারের ছোট সদস্য, যে কেবল বেড়ে উঠছে– তার উদাহরণ টানতে পারি। ছোট বলেই সে অবহেলার পাত্রে পরিণত হয় না; বরং পরিবারের আর সবার মতো সে-ও প্রয়োজনীয় যত্ন-আত্তি পেয়ে থাকে; তাই দুঃখ করে তাকে বলতে হয় না, 'শিশু বলে আমি একটা শুকনো গাছের মতো হয়েছি, কেউ আমার যত্ন নেয় না' (যিশাইয় ৫৬:৩, ৫)। অসহায়, দরিদ্রদের বিষয়েও সদাপ্রভুর চিন্তা রয়েছে। অথবা ,

২. খ্রীষ্ট তাদের 'অল্প বিশ্বাসী' বলে ভর্ৎসনা করেছিলেন যেন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয় (১৪:৩১ পদ)। এর দ্বারা নিজেদের তত্ত্বাবধানের প্রতি আমাদের আস্থার স্বরূপ ফুটে ওঠে; এই আস্থা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে দুর্বল করে দেয়। যদি প্রকৃতই আমাদের ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ আস্থা থাকে তবে তো অপ্রয়োজনীয় চিন্তায় মাথা ঘামানোর অবকাশই নেই।

৩. 'ভেবে দেখ– তোমরা কারা! তোমাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে জ্ঞানী, শক্তিশালী জনও চিন্তা-ভাবনা করে নিজের আয়ু এক ঘণ্টা বাড়াতে পারে না (২৭ পদ); এই সামান্য কাজটুকুও যখন তোমরা করতে পার না (লূক ১২:২৬) তখন আগে থেকে ভবিষ্যত চিন্তায় কী লাভ? আর তোমাদের সেই আয়ুও তো ঈশ্বরের কাছে কিছুই নয়; মাত্র চার আঙ্গুলের সমান!' (গীত ৩৯:৫)। ভেবে দেখুন,

(১) আমাদের বেঁচে থাকাটা একমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহের ওপরই নির্ভর করে। যেখানে শত চেষ্টা করেও আমরা নিজেদের আয়ু একটি ঘণ্টা বাড়াতে পারি না সেখানে শিশু অবস্থা থেকে কী করে আমরা বয়সে-শরীরে বেড়ে উঠে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হই– সেকথা একব-ার ভেবে দেখুন। শারীরিক এই বৃদ্ধিতে আমাদের কোন হাত নেই। কীভাবে আমরা বেড়ে উঠি– সেটাও আমাদের অজানা। আমাদের কেউ অনুমান করে কিংবা পরিকল্পনা করে নিজেদের শারীরিক বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে পারি না; বরং ঈশ্বরের অনন্য তত্ত্বাবধানেই আমাদের শরীর প্রয়োজন অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। আর ঈশ্বরই যখন আমাদের শরীরের মনিব তখন এটা তো নিশ্চিত যে এর জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই তিনি জুগিয়ে দেবেন। মনে রাখুন, ঈশ্বর যে আমাদের শারীরিকভাবে শক্তিতে, আয়ুতে বাড়িয়ে তুলছেন সেজন্য তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে এবং জাগতিক সব প্রয়োজনের জন্য তাঁর ওপর

নির্ভর করতে হবে; কারণ আমাদের শরীরকে তিনিই পরিচালনা দেন। কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা ও মানবীয় হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে আমরা বেড়ে উঠি; কিন্তু যিনি এসবের পেছনে আছেন তিনি কি আমাদের ঐসব প্রয়োজন যুগিয়ে দিতে অস্বীকার করবেন?

(২) আমরা আমাদের আয়ুস্কালকে পাল্টাতে পারি না; যদি তা সম্ভব হতো তবে আমাদের কাছে সেটা হালকা হয়ে যেত; এবং আমাদের জন্য তা হতো চরম বোকামি। কারণ তখন আমরা নাওয়া-খাওয়া-ঘুম বাদ দিয়ে সবসময় এর পেছনেই ছুটতাম এবং সবসময় এই চিন্তায় ব্যস্ত থাকতাম, কী করে আয়ুটাকে বাড়িয়ে নেওয়া যায়। যেহেতু আমরা জানি যে, নিজেদের চেষ্টায় আমরা এর কিছুই করতে পারি না; তাই একে মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকাটাই হবে উত্তম কাজ। মানুষ হিসেবে আমরা ভিন্ন ভিন্ন শারীরিক গড়ন পেয়েছি; সেভাবেই আমাদের একজনের সাথে অন্যের আয়ুতেও পার্থক্য রয়েছে এবং আমরা তা হিসেব করে বলে দিতে পারি না। ছোট্ট শিশু স্বপ্ন দেখে যে, সে একদিন বড়দের মতো হবে, তাই বলে সে জানে না যে, সেই সময় পর্যন্ত সে বেঁচে থাকবে কি না; সে কারণেই সে কেবল তার সাধ্যমতো চেষ্টা করে যায়। শারীরিক গড়ন সম্পর্কে আমাদের এই ভাবনাকে আমরা জাগতিক সম্পদের স্থলে প্রতিস্থাপন করতে পারি।

(ক) আমরা পৃথিবীতে প্রচুর ধন-সম্পদ কামনা করব না। এক্ষেত্রে আমরা ব্যক্তিভেদে শারীরিক গড়নের পার্থক্যের কথা বলতে পারি। অনেক সময় অন্যের লম্বা, সুঠাম দেহ দেখে নিজেদের মনেও সেরকম হওয়ার ইচ্ছে জাগে; কারণ সামাজিকভাবে সুন্দরের রোলমডেল হিসেবে এদের সাথেই আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। তারপরও শরীরের নিয়মমাফিক বৃদ্ধি অর্থাৎ ঈশ্বর আমাদের যেভাবে সাজিয়েছেন– তাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। দেখা গেল, খাটো বলে একজনের খুব মনোকষ্ট; সে এখন যে কোন মূল্যে লম্বা হতে চাইছে, দরকার হলে শরীরের সাথে কোন 'বাহুল্য' যোগ করতেও তার আপত্তি নেই। তবে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াবে? নিশ্চিতভাবেই তা তাকে অন্যদের কাছে হাসির পাত্র করে তুলবে। কারণ এর ফলে শরীরের মানানসই আকৃতি হারিয়ে সে তার প্রকৃত সৌন্দর্য হারিয়ে বসবে। বাইরে থেকে তাকে দেখতেও বেঢপ, বেখাপ্পা লাগবে। স্বাভাবিক কাজ-কর্ম ব্যাহত হওয়ার দরুন শেষমেশ 'বাহুল্যরূপী অঙ্গটি' তার জন্য স্রেফ বোঝায় পরিণত হবে।

(খ) আমরা অবশ্যই নিজেদের অবস্থা, অবস্থান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকব; যেমন আমরা নিজেদের শারীরিক গড়ন নিয়ে থাকি। কারণ আমরা চাই না আমাদের স্বাভাবিক চলাটা বাধাগ্রস্ত হোক। যেহেতু আমরা অসুবিধার বিপরীতে সুবিধা পেতেই বেশি আগ্রহী; তাই আমাদের যা আছে তাকেই উপযুক্ত করে ব্যবহারে অধিক মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন; এটা কোন প্রতিবিধান না হলেও আমরা যে আমাদের সেরাটুকু দিচ্ছি সেটাই আমাদের সান্ত্বনা ও প্রাপ্তি। নিয়তিকে আমরা পাল্টাতে পারি না, তাই একে মেনে নেওয়া জরুরি। আমাদের তা ধারণ করতে হবে এবং তাকে মেনে নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে নিজেদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা সক্কেয়ের উদাহরণ টানতে পারি; খ্রীষ্টকে দেখার সুবিধার জন্য নিজের খর্বাকৃতির দরুন তিনি দৌড়ে গিয়ে একটা ডুমুর গাছে উঠেছিলেন।

৪. 'অযিহূদীরাই এইসব বিষয়ের জন্য ব্যস্ত হয়' (৩২ পদ)। জগতকেন্দ্রিক চিন্তা-ভাবনা আসলে অবিশ্বাসীসুলভ পাপ এবং তা অ-খ্রীষ্টানত্বেরই পরিচায়ক। অযিহূদীরা

এসবের জন্য ব্যস্ত হয়, কারণ তারা এর চেয়ে ভাল কিছু জানে না। তারা জগতকে ভালবাসে কারণ তারা ভালোর কাছে আগন্তুক বই আর কিছুই নয়। তারা উদ্বেগ ও নিজেদের তত্ত্বাবধানের ওপর বিশ্বাস থেকে এসব বিষয়ে ভাবিত হয়, কারণ তারা পৃথিবীতে ঈশ্বরহীন হয়ে বেঁচে আছে এবং তারা তাঁর বিধান বুঝতেও অক্ষম। তারা দেবদেবীদের ভয় ও উপাসনা করে, কিন্তু জানে না প্রার্থনার উত্তর কিংবা সাহায্যলাভে কীভাবে তাদের ওপর আস্থা রাখতে হয় এবং সে কারণেই তারা নিজেদের প্রতি অধিক যত্নবান হয়ে থাকে। কিন্তু খ্রীষ্টানদের জন্য এ চরম লজ্জার; কারণ তারা নিজেদের 'মহান নীতির' অধীন করেছে এবং তারা এমন এক ধর্মকে স্বীকার করেছে যা তাদের কেবল ঈশ্বরের বিধানের বিষয়েই শিক্ষা দেয় না উপরন্তু সেখানে জীবনের ভালোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিজ্ঞার উল্লেখ রয়েছে– যা বর্তমানে ক্রিয়াশীল। এসব প্রতিজ্ঞা তাদের ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রাখতে এবং জগতকে অবজ্ঞা করতে শিক্ষা দেয়। এ ছাড়াও ঈশ্বরকে কেন জগতের ওপরে স্থান দিতে হবে তার কারণও সেখানে বর্ণিত আছে। তাই খ্রীষ্টানদের জন্য অযিহূদীদের মতো চলা এবং ভবিষ্যত চিন্তায় নিজেদের অন্তর ভরিয়ে তোলাটা লজ্জার কারণ বলেই প্রতীয়মান হয়।

৫. 'তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তো জানেন যে, তোমাদের এইসব জিনিসের প্রয়োজন আছে।' আমাদের কোন কোন জিনিসের প্রয়োজন সে-সম্পর্কে ঈশ্বর আমাদের চেয়েও ভাল জানেন। তিনি আমাদের জন্য যা করেন তা আমাদের পক্ষে করা তো দূরের কথা, ভাবাও অসম্ভব। যদিও তিনি স্বর্গে আছেন এবং তার সন্তানেরা পৃথিবীতে; তবুও তিনি তাঁর সন্তানদের মাঝে যারা দরিদ্র তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, 'তোমাদের অভাবের কথা আমি জানি' (প্রকাশিত বাক্য ২:৯)। একটু চিন্তা করুন, যদি আপনার খুব ভাল বন্ধু আপনার চাওয়া-সমস্যার কথা জানেন তবে আপনি আশা করতে পারেন যে, শীঘ্রই আপনি তার সমাধান পাবেন। ঠিক সেভাবে ঈশ্বর, যিনি আপনার পিতা, যিনি আপনাকে ভালবাসেন তিনি যখন আপনার প্রয়োজনের বিষয়ে জানেন তখন তো আপনার কোন দুশ্চিন্তাই থাকার কথা নয়। তাই, আপনি আপনার সব দুর্ভাবনা, উদ্বেগ তাঁর কাছে সমর্পণ করুন; কারণ তিনি আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন; এবং তাঁর ভাণ্ডারও অফুরন্ত। যিনি আপনার সব প্রয়োজন সম্পর্কে জানেন, সেই ঈশ্বর আপনাকে বলছেন, 'সন্তান আমার, তোমার কাছে কি খাবার আছে?' (যোহন ২১:৫)। আপনার কাছে খাবার আছে কি নেই তা তাঁকে বলুন। যদিও তিনি আমাদের প্রয়োজন সম্পর্কে জানেন তবুও তিনি আমাদের কাছ থেকেই তা শুনতে চান; এবং যখন আমরা তাঁর কাছে নিজেদের প্রয়োজনের বিষয়টি খুলে বলি তখন আমরা তাঁর জ্ঞান, ক্ষমতা এবং খাঁটি স্বভাবের কাছে নিজেদের সমর্পণ করি। ঈশ্বরের অনুগ্রহের অধীনে নিজেদের সমর্পণ করার মধ্য দিয়ে এভাবেই আমরা দুর্ভাবনা, উদ্বেগমুক্ত হই, যেহেতু তিনি আমাদের বিষয়ে চিন্তা করেন (১ পিতর ৫:৭)। আর এসব যুক্তিরই বা কি প্রয়োজন? ঈশ্বর যদি আমাদের বিষয়ে ভেবে থাকেন তাহলে কেন নিজেরা ভাবিত হই?

৬. 'প্রথমে তোমরা ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর ধার্মিকতার জন্য ব্যস্ত হও, তাহলে ঐসব জিনিসও তোমরা পাবে' (৩৩ পদ)। দুর্ভাবনার পাপের বিরুদ্ধে এখানে দু'টি যুক্তি উত্থাপিত হয়েছে–

(১) 'নিজের জীবনের জন্য বেশি চিন্তিত হয়ো না; কারণ চিন্তা-ভাবনা করার জন্য এর চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। আর তা হচ্ছে, তোমার আত্মিক জীবন যা তোমাকে অনন্ত সুখের দিকে নিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে সেটাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (লূক

১০:৪২)। তাই, ফুলে-ফেঁপে ওঠা দুর্ভাবনার বিপরীতে আত্মিক জীবনের সঠিক অগ্রগমনের চিন্তাকে তোমাদের মাথায় স্থান দাও।' ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার দিকেই যদি আমাদের পূর্ণ মনোযোগ থাকে এবং আমাদের সব ভাবনা কেবল নিজেদের পরিত্রাণের বিষয়েই কেন্দ্রীভূত হয় তাহলে আত্মতুষ্টি, বিত্তবৈভবের চিন্তা আপনাতেই পিছু হটবে। জগতমুখী ভাবনার চেয়ে নিজেদের আত্মিক জীবন নিয়ে ভাবিত হওয়া অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর।

(২) অসীম চাহিদার কথা ভেবে চিন্তা, উদ্বেগে সময়ক্ষেপণের চেয়েও আপনার জন্য আরও নিশ্চিত, সহজ, নিরাপদ এবং ক্ষতিপূরণদায়ী একটি বিষয় রয়েছে; আর তা হচ্ছে, প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য ব্যস্ত হোন এবং ধর্মকে কেবল ব্যক্তিগত চর্চার মাঝে সীমাবদ্ধ না রেখে একে আপনার কাজে পরিণত করুন। আবার বলে বসবেন না যেন, 'সব কাজ বাদ দিয়ে কেবল ধর্ম প্রচার করে আমি কি না খেয়ে থাকব নাকি!' না, এমনটা ভাবার কোন কারণই নেই। বরং নিজের ভাত-কাপড়সহ অন্যান্য প্রয়োজন প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করতে এটাই হচ্ছে সত্যিকারের পথ।

(ক) এখানে যে মহান দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে– তা লক্ষ্য করুন। মূলত এটাই আমাদের যাবতীয় চিন্তা ও কাজের সারকথা, 'প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য ব্যস্ত হও।' তাই, ধর্মকে আমাদের জীবনের সেরা বিষয় হিসেবে ভাবতে হবে। ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য কাজের ক্ষেত্র খুঁজে বের করা, তাঁর পরিচালনা প্রত্যাশা করা এবং তাঁর নির্দেশনা অনুসরণ করা-ই হচ্ছে আমাদের বর্তমান দায়িত্ব। পাশাপাশি জাগতিক প্রয়োজনের জন্য তাঁর ওপর নির্ভরতা স্থাপনের ব্যাপারটি তো আছেই। এখানে একটি শব্দ এসেছে-যা প্রকৃতই নতুন চুক্তির বিষয়ে আমাদের পক্ষে কথা বলে; যদিও খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে যে পরিত্রাণ আমরা পেয়েছি তা আমাদের অর্জন নয়। যদি আমরা সত্যিকার অর্থে ঈশ্বরের ধার্মিকতার খোঁজ করি, তবে আমরা যে তা পাব– সে বিষয়ে খ্রীষ্ট এখানে আমাদের নিশ্চিত করেছেন। তবে তা পাওয়ার জন্য আমাদের অধিক যত্নবান ও আন্তরিক হতে হবে; নিজেদের ব্যর্থতা ঘুচিয়ে দিতে সত্যিই এই 'অর্জন' হবে অসামান্য, অনন্য। এখন লক্ষ্য করুন, প্রথমে আমাদের 'ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাঁর ধার্মিকতার বিষয়ে' সচেষ্ট হতে বলা হয়েছে। আমরা অবশ্যই মনে করব, স্বর্গ হচ্ছে আমাদের গন্তব্য এবং পবিত্রতা হচ্ছে সেই গন্তব্যে পৌঁছুবার পথ। 'সত্যিকারের সুখ পেতে অনুগ্রহ ও গৌরবের রাজ্যের সান্ত্বনার খোঁজ কর, স্বর্গ-রাজ্যের প্রতি লক্ষ্য স্থির কর; সেদিকে যেতে সচেষ্ট হও, এটাকে নিশ্চিত করতে একাগ্র, পরিশ্রমী হও। কিন্তু সহজে, সোজাপথে তা পেতে যেয়ো না। প্রকৃত সম্মান, অনন্তজীবন ও চিরস্থায়ী গৌরব পেতে পৃথিবী ও এর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ওপরে স্বর্গীয় দয়া ও স্বর্গকে প্রাধান্য দাও।' যে ধর্মচর্চা আমরা করি তা যদি আমাদের স্বর্গ পাইয়ে দিতে ব্যর্থ হয় তবে তা নিষ্ফল বলে পরিগণিত হয়; তাই হৃদয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের সুখ অনুভব করেই আমাদের পবিত্রভাবে তাঁর ধার্মিকতার দিকে অগ্রসর হতে হবে। যে ধার্মিকতা ঈশ্বর আমাদের মাঝে দেখতে চান তা যেন ফরীশী ও সুদ্দুকীদের চেয়ে বেশি হয়– সে বিষয়ে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। আমরা অবশ্যই শান্তি ও পবিত্রতার অনুগমন করব (ইব্রীয় ১২:১৪)। দ্বিতীয়ত, এর নির্দেশ– 'প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য ব্যস্ত হও।' তাই, আপনার নিজের আত্মিক জীবনের বিষয়ে যত্নবান হোন। কে কী করছে– সেদিকে না তাকিয়ে আপনি আপনার কাজটুকু করে যান। জীবনের বাকি সব কিছুই আপনার কাছে গৌন হয়ে পড়ুক। যা কিছু আপনার লাগবে তার জন্য ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করুন। এখানে লক্ষণীয়, জগতের অর্থ-সম্পদের পেছনে

অন্যদের ছুটতে দেখে আমরা যেন কোনক্রমেই বিচলিত না হই; বরং খ্রীষ্টকে অন্য সব কিছুর উর্ধ্বে প্রাধান্য দিই। এখানে সেই সুস্পষ্ট নির্দেশ বিবৃত হয়েছে– 'এই সব বিষয়ে প্রথমে ভাবিত হও– তোমার জীবনের শুরুতে।' আপনার যৌবনের সকালকে আপনি ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করুন। এর ফলে আপনার জ্ঞান ও জীবনাচরণ বিকশিত হয়ে শীঘ্রই চারপাশ আলোতে ভরিয়ে তুলতে সমর্থ হবে। ধর্মের প্রতি এগিয়ে চলার এটাই হবে ভাল শুরু। দিনের শুরুতে প্রথমেই ঈশ্বরের বিষয়ে ভাবনায় জেগে উঠুন। একে জীবনের মূলনীতিরূপে সাজান এবং তা করতে প্রথমেই আপনাকে যা করতে হবে তা হল– তার কাছে যা 'প্রথম' সেটাই তাঁকে প্রথমে দিতে হবে।

(খ) এখানে একটি অনুগ্রহপূর্ণ প্রতিজ্ঞার কথা যোগ করা হয়েছে; 'ঐসব জিনিস'– যা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য আবশ্যক– তা আমাদের দেওয়া হবে। তা অনেক বেশি করে উপচে পড়বার মতো করে দেওয়া হবে। এটাই হচ্ছে পরিণতি– আপনি যার খোঁজ করছেন তা পাবেন– ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর ধার্মিকতা; কারণ লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থাকলে কোন প্রচেষ্টা, পরিশ্রম বৃথা যায় না। ফলত আপনার কাজের মধ্য দিয়েই তা অর্জিত হবে এবং এর সমান্তরালে আপনি পাবেন দরকারি খাবার, পোশাক; পাবেন উপচে পড়বার মতো করে। দোকানীর সাথে দরদাম করে ক্রেতা যেভাবে তার পছন্দসই পণ্যটি কিনে প্যাক করে নেয়, সেভাবে আমরাও ঈশ্বরের ধার্মিকতা ও তাঁর রাজ্যের জন্য কাজ করতে মনস্থির করার মাধ্যমে নিজেদের প্রয়োজন প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করি। মনে রাখুন, ঈশ্বরের প্রতি ভয়ে বর্তমানের জন্য আশ্বাস রয়েছে (১ তীমথীয় ৪:৮)। শলোমন ঈশ্বরের কাছে জ্ঞান চেয়েছিলেন, কিন্তু ঈশ্বর তাকে জ্ঞানের পাশাপাশি অনেক ধন-সম্পদ উপঢৌকন হিসেবে দিয়েছিলেন (২ বংশাবলি ১:১১, ১২)। শলোমনের চাওয়াকে ঈশ্বর যেভাবে সম্পূর্ণ করে দিয়েছিলেন সেভাবে তিনি আমাদের অন্বেষণকেও সাফল্য দান করতে সক্ষম। আমাদের জন্য এই উদাহরণ সত্যিই গভীর প্রত্যাশা ও আগ্রহ হয়ে আসে। আমরা যদি ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাসে স্থির থাকি যে, তাঁর পথে অগ্রসর হলে আমরা এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য দরকারি সব কিছুই লাভ করব, তবেই আমরা ভবিষ্যত জীবনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে তুলি। ফলে এই পৃথিবী ও অন্য পৃথিবী– উভয় স্থলেই আমরা শান্তি লাভে সমর্থ হই। ঈশ্বরকে সামনে রেখেই আমরা সঠিক জায়গা থেকে কাজ শুরু করতে পারি। যদি আমরা আমাদের শ্রম ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর ধার্মিকতার দিকে পরিচালিত করতে সক্ষম হই তবে আমাদের সব প্রয়োজন যিহোবা যিরি– প্রভুই যোগাবেন; যতটা তিনি ভাল মনে করবেন, আমাদের জন্য আবশ্যক বলে মনে করবেন– ততটুকুই তিনি যোগাবেন। এর বেশি আমরা আর কি চাইতে পারি! ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহে যে উত্তরাধিকার আমাদের পাইয়ে দিয়েছেন তার জন্য আমরা কি তাঁর ওপর আস্থা রাখতে পেরেছি? প্রয়োজনীয় ভাত-কাপড়ের জন্যও কি আমরা তাঁর ওপরই আস্থা রাখব না? ঈশ্বরের মনোনীত ইস্রায়েল শেষ অবধি কেনান দেশে পৌঁছে দীর্ঘ মরুবাসের অতৃপ্তি, কষ্ট ভুলতে সক্ষম হয়েছিল। ঈশ্বর নিজেই তাদের হাত পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। অথচ এরপরও আমরা নিজেদের ভবিষ্যত চিন্তায় অতিমাত্রায় ভাবিত হয়ে পড়ি। তবে, অদেখা বিষয়ের প্রতি মানবীয় এই আগ্রহকে আমরা সহজেই ইতিবাচকতার দিকে পরিচালিত করতে পারি। এক্ষেত্রে বস্তুজগতের ক্ষয়িষ্ণু, দৃশ্যমান বিষয়গুলোর স্থলে আমরা অনন্তজীবন, অনন্তকালীন সুখ, চিরস্থায়ী গৌরবকে প্রতিস্থাপন করতে পারি। যদিও ঈশ্বরের অনন্তকালীন বিষয়সমূহ আমাদের বোধ ও ভাবনার উর্ধ্বে,

তবুও সাংসারিক বিষয়-আশয়ের চিন্তাকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে ও স্বর্গের দিকে অগ্রসর হতে সেসব ভাবনা আমাদের মনে উৎসাহেরই সঞ্চার করে (আদি ৪৫:২০, ২৩)।

৭. 'কালকের চিন্তা কালকের উপর ছেড়ে দাও' (৩৪ পদ)। ভবিষ্যতে কী ঘটবে– তা নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হওয়া চলবে না; কারণ স্বাভাবিক নিয়মে প্রতিদিন নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটবে। তাই, আমরা যদি সেসব সমস্যার কথা ভেবে আগেই দুর্ভাবনায় পড়ে যাই তবে কাজের কাজ কিচ্ছু হবে না; উপরন্তু ভবিষ্যতে ব্যর্থ-অসফল হওয়ার ভয় আমাদের পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলবে। সে কারণেই এই অমূলক, অযাচিত ভীতি থেকে নিজেদের বিযুক্ত করতে হবে; কারণ খ্রীষ্ট তো এখানে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, ভবিষ্যত-সমস্যা মোকাবেলায় আমরা তাঁর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় শক্তি ও সাহায্য পাব। মূলত সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই এখানে বলা হয়েছে,

(১) আগামীদিনের ভাবনা অর্থহীন। 'কালকের চিন্তা কালকের ওপর ছেড়ে দাও।' যদি প্রতিটি দিনের সাথে নতুন নতুন চাওয়া ও সমস্যার যোগ হতে থাকে তবে সেই গতিতে নতুন করে সাহায্যও পাওয়া যাবে; কারণ ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রতি সকালেই নতুনভাবে দেখা দেয় (মাতম ৩:২২, ২৩)। প্রতিদিনের নির্ধারিত কাজ অনুসারে (ইষ্রা ৩:৪) ঈশ্বর তাঁর আশীর্বাদে প্রতিদিন সকালে তাঁর লোকদের শক্তি হবেন (যিশাইয় ৩৩:২)। সে কারণেই ঈশ্বর তাঁর লোকদের তাদের নির্ভরতার ভিত্তিতে ধরে রাখেন। তাই, ঈশ্বরের বিশ্বস্ত হাতে নিজেদের সমর্পণ করার মাধ্যমে কালকের ওপর কালকের কাজ, চিন্তা ও সমস্যার ভার চাপিয়ে দিন। আগামীদিনকে যদি আমরা নিয়ন্ত্রণই করতে না পারি তবে কেন আমরা ঈশ্বরের তত্ত্বাবধানকে পাশ কাটিয়ে সে বিষয়ে উদ্বিগ্ন হব? তবে এই 'চিন্তামুক্তির' মানে এই নয় যে, আমরা সতর্কভাবে পথ চলার জন্য অগ্রসর হয়ে চিন্তা করব না কিংবা সেই বিষয়ে আগেভাগে প্রস্তুতি নিতেও অস্বীকৃতি জানাব। এর মানে হচ্ছে, আমরা যেন হাতের কাজটুকুই সেরে রাখি; বর্তমানের প্রতি দায়বদ্ধ হই এবং তারপর সব ঘটনা, সমস্যাকে ঈশ্বরের হাতে সঁপে দিই। দিনের কাজগুলো ঠিকঠাকভাবে করে রাখার মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্দিষ্ট করতে সমর্থ হই; অর্থাৎ আজ আমরা কী করলাম তা-ই আমাদের পরের দিনের করণীয় বলে দেবে।

(২) আগামী দিনের জন্য চিন্তা হচ্ছে একপ্রকার বোকামি এবং তা কেবল কষ্টেরই কারণ হয়। পরের দিনের প্রয়োজন মেটাতে পর্যাপ্ত খাদ্য-বস্ত্রসহ অন্যান্য সামগ্রীর মজুত গড়ে তুলতে যারা ধনী হবার ইচ্ছে পোষণ করে তাদের জীবনে দুঃখ-যন্ত্রণাই সঙ্গী হয়। অর্থাৎ তারা নিজেরাই সমস্যাকে নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে ডেকে আনে। তাই 'দিনের কষ্ট দিনের জন্য যথেষ্ট'। প্রতিদিন এমনিতেই অনেক সমস্যা, প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে আমাদের চলতে হয়; তাই অহেতুক সমস্যার পরিমাণগত স্ফীতি আমাদের আরও বেশি করে হতাশ করে তোলে। আগামী দিনের সম্ভাব্য বিপদ কিংবা সমস্যা নিয়ে ভেবে হতবুদ্ধি হয়ে কোন উপকার নেই। প্রকৃতপক্ষে এই অনর্থক চিন্তা মোটেই অগ্রসর চিন্তার পরিচয় দেয় না। এমন তো নয় যে, পরের দিনের সমস্যা নিয়ে ভাবলে তা মিটে যাবে! তাই পরের দিন কী কী প্রয়োজনের সামনে দাঁড়াতে হতে পারে– সে চিন্তা বাদ দিন। সমস্যা যখন আসবে তখন এ নিয়ে ভাবা যাবে। আসুন, একসাথে সব বিষয়ে উতলা না হয়ে নিজেদের জীবনকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করি এবং যে নির্দেশনা ও প্রতিশ্রুতি তিনি আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন, বিশ্বাস ও কর্মে তা হৃদয়ে ধারণ করি; অর্থাৎ তাঁর রাজ্য ও ধার্মিকতার পথে অগ্রসর হই। জীবনের

দরকারি বিষয়ে খ্রীষ্ট এখানে যে শিক্ষা দিয়েছেন তার সারকথা হচ্ছে, আমরা যেন কখনো নিজে নিজে চলতে চেষ্টা না করি; বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈশ্বরের তত্ত্বাবধানের ওপর নির্ভর করি। বস্তুজগতের যাবতীয় প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ভুলক্রমেও আমরা যেন জগতের তৈরি সমস্যার ফাঁদে জড়িয়ে না পড়ি; উপরন্তু প্রার্থনার মাধ্যমে প্রতিদিনের সমস্যা কিংবা পরীক্ষা মোকাবেলায় ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য-শক্তি চাই। মোটকথা, আমাদের জীবনের নিয়ন্ত্রণভার আমরা কোন মতেই জগতমুখী চিন্তার কাছে সঁপে দেব না।

মথি লিখিত সুসমাচার
অধ্যায় ৭

পাহাড়ের ওপর খ্রীষ্টের দেওয়া শিক্ষা এই অধ্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে শেষ হয়েছে। ঈশ্বর ও মানুষ– উভয়ের সম্মুখে খ্রীষ্টের অনুসারীদের জীবনাচরণ কেমন হওয়া উচিত– সে বিষয়ে খ্রীষ্ট এখানে স্পষ্টই গঠনমূলক, ব্যবহারিক দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর এই শিক্ষায় খ্রীষ্টীয় ধর্মের স্বরূপ ফুটে উঠেছে। এ এমন এক ধর্ম– যার গাঠনিক বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে মানুষকে ভাল এবং সৎ পথে পরিচালিত করা। শিক্ষাদানের ধারাবাহিকতায় খ্রীষ্ট এখানে–

(১) দোষ ধরবার বিষয়ে আমাদের সতর্ক করে দিলেন (১-৬ পদ);
(২) আমরা যেন প্রার্থনায় নিজেদের প্রয়োজনের কথা ঈশ্বরের কাছে খুলে বলি– সে বিষয়ে উৎসাহ দিলেন (৭-১১);
(৩) তাঁর নির্দেশিত জীবনাচরণে অধিক যত্নবান হতে (১২-১৪) এবং
(৪) ভণ্ড ভাববাদীদের চেনার উপায় বলে দিয়ে তাদের শিক্ষা ও সঙ্গ পরিহার করতে নির্দেশ দিলেন (১৫-২০)। পরিশেষে,
(৫) খ্রীষ্টের আদেশের চিরন্তন বাধ্যতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করার মাধ্যমে পুরো শিক্ষার যবনিকা টানা হয়েছে। বাস্তবিকই খ্রীষ্টের আদেশের বাধ্য হওয়া ব্যতিরেকে আমরা সত্যিকারের আনন্দ লাভের প্রত্যাশা করতে পারি না (২১-২৭); এরপর
(৬) খ্রীষ্টের শিক্ষা শুনে লোকদের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা আমরা দেখি ২৮ ও ২৯ পদে।

মথি ৭:১-৬

অন্যের দোষ-ত্রুটির বিপরীতে আমাদের আচরণ ও অবস্থান কেমন হওয়া উচিত– সে বিষয়ে খ্রীষ্ট এখানে পরিষ্কার নির্দেশনা দিলেন। এর দ্বারা তিনি পরোক্ষে অন্যদের দোষ ধরবার বিষয়ে অত্যুৎসাহী ফরীশী ও সুদ্দূকীদের সমালোচনা করলেন। কারণ, তারা যে কেবল অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াত এবং তা নিয়ে সমালোচনা করতো তা নয়, উপরন্তু তাদের দৃষ্টিতে নিজেদের কোন দোষ ধরা পড়ত না। নিজেদের ধার্মিকতার বিষয়ে তারা এতটাই নিশ্চিত ছিল যে, তারা নিজেদের 'দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে' বলে গণ্য করতেও দ্বিধা করতো না; তাই অন্যদের বিচার করবার ব্যাপারে তাদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। তাই–

ক. খ্রীষ্ট এখানে আমাদের অন্যদের বিচার করবার ব্যাপারে সতর্ক করে দিলেন (১, ২ পদ)। মানুষের দোষ, অপরাধের বিচার করবার জন্য পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আদালত; সুষ্ঠু আইনি-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেখানে আসামির বিচারকাজ সম্পন্ন করা হয়। বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণ, যাচাই-পর্যবেক্ষণ করে জজ কিংবা ম্যাজিস্ট্রেট রায় দেন– আসামি দোষী কি নির্দোষ। অর্থাৎ এদের পেশাই হচ্ছে লোকের বিচার করা। কিন্তু খ্রীষ্ট চান নি যে, তাঁর একজন প্রজাও বিনষ্ট হয়; তাই এই পৃথিবীতে তিনি মানুষের বিচার করতে আসেন নি; যদিও 'তাঁর মধ্য দিয়েই শাসনকর্তারা ন্যায়বিচার করবেন'। তবে এখানে মূলত ব্যক্তিগতভাবে কারও সমালোচনা কিংবা বিচার করার বিষয়টিকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

খ্রীষ্ট এই নির্দেশনা দিলেন তাঁর শিষ্যদের, যারা পরবর্তীতে তাঁর সাথে বিচারাসনে বসবেন। তবে বর্তমান সময়টা যে কারও দোষ ধরবার জন্য উপযুক্ত নয়– সে বিষয়ে খ্রীষ্ট তাদের পরিষ্কার ভাষায় সতর্ক করে দিলেন।

১. এখানে কারও দোষ ধরতে নিষেধ করা হয়েছে। আমরা অবশ্যই নিজেদের এবং নিজেদের কাজের বিচার ও সমালোচনা করব; কিন্তু কখনো আমাদের ভাইয়ের দোষ খুঁজতে যাব না; এমনকি কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দায়ের করা থেকেও নিজেদের বিরত রাখব; কারণ তা না হলে তারাও আমাদের দোষ ধরার সুযোগ পেয়ে যাবে; আর শিক্ষক হিসেবে আমাদের যে অন্যদের চেয়ে আরও কঠিনভাবে বিচার করা হবে– সে তো আমরা জানিই (যাকোব ৩:১)। নিজেদের মুখের কথাকে আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আমাদের পক্ষে বিচারকের আসনে বসে পড়াটা মোটেও সমীচীন হবে না। যেহেতু আমরা আমাদের ভাইয়ের সম্পর্কে মন্দ কিছু বলতে চাই না, সেহেতু তাদের দোষ ধরা থেকেও আমাদের বিরত থাকতে হবে (যাকোব ৪:১১ পদে এ সম্পর্কে আরও বিশদভাবে বলা হয়েছে)। ভাইয়ের দোষ ধরার মাধ্যমে আমরা তাকে তুচ্ছজ্ঞান করি (রোমীয় ১৪:১০); এবং অবিবেচকের মতো তার বিচার করার মাধ্যমে আমরা তাকে অন্তহীন সমস্যার মাঝে ফেলে দিই, যা মোটেও কাম্য নয়। প্রকৃতপক্ষে এই প্রকার অবিবেচনাপ্রসূত বিচার বা সমালোচনা হচ্ছে আমাদের ঈর্ষা ও মন্দ কাজেরই ফল। অন্যের কথা ও কাজ আমাদের অসন্তুষ্ট করলেও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে ভাল কি মন্দ– সে বিষয়ে আমরা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাব না; কারণ আমাদের মূল্যায়নে কারও ক্ষতি হোক– তা আমরা চাই না। অন্যের মন্দ আচরণের বিপরীতে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে আমরা যেন কখনো অন্যায়ভাবে তার ক্ষতি করবার ইচ্ছা থেকে বিচারে প্রবৃত্ত না হই– সে ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। মানবীয় প্রবৃত্তির কারণে যেহেতু আমরা বিচারকাজে নিরপেক্ষ থাকতে অক্ষম সেহেতু আমাদের কোন প্রকার বিচার করাই উচিত নয়; কারণ বিচার করার সময় প্রথমেই আমাদের বিবেচনায় ব্যক্তির দোষের বদলে আসবে তার পরিচয়, অর্থাৎ তিনি কে। তাই আমরা অবশ্যই কারও অবস্থানের কথা চিন্তা করে তার বিচার করব না। তাছাড়া একবারের সাক্ষাতে কে কী দোষ করল– তা বিবেচনায় নেওয়াটা বোকামিরই নামান্তর। ঠিক সেভাবে আমরা যেন কারও জীবন, অভিপ্রায় নিয়ে সমালোচনায় মেতে না উঠি; কারণ তা ঈশ্বরের এখতিয়ারে। একমাত্র তিনিই কাউকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন। তাই যে বিচার করার ভার একমাত্র ঈশ্বরের হাতে তা যেন আমরা নিজেদের হাতে তুলে না নিই। মনে রাখুন, অন্যদের বিচার করার অধিকার আমাদের নেই; তা যেমন পৃথিবীতে তেমনি বিচারের দিনেও। খ্রীষ্টের অনুসারী হিসেবে কাউকে 'ভণ্ড', 'দুর্নীতিবাজ' বলে সম্বোধন করাটা আমাদের সাজে না। সে কারণেই আমাদের জন্য নিজেদের 'সীমারেখা' জেনে তা অতিক্রম না করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। মানুষ হিসেবে আমরা কী করে আমাদের ভাইয়ের দোষ খুঁজে ফিরি? যে অধিকার আমাদের দেওয়া হয় নি, কেন আমরা তার অবিবেচনাপ্রসূত প্রয়োগে উদ্যত হচ্ছি? তাই ভাইয়ের দোষ খুঁজে না বেড়িয়ে, তাকে গঠনমূলক পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করুন। কিন্তু ভুলেও তার বিচার করতে এগুবেন না।

২. এখন, কেন আমরা অন্যদের দোষ ধরব না তার পেছনে একটি যুক্তি এখানে প্রদর্শিত হয়েছে– 'যেন তোমাদেরও দোষ ধরা না হয়।' অর্থাৎ

(১) অন্যদের বিচার করার মাধ্যমে আমরা নিজেদের ওপর অনুরূপ বিচার ডেকে

আনি। ব্যাপারটা জাগতিক বিচার-ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও সত্য। প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধে গিয়ে কেউ যদি নিজেই বিচারক সেজে বসে, তবে জগতের নিয়মেই তাকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। এ বিচার অবশ্য মানুষের হাতে; মানুষই তাকে 'দোষী' বলে স্থির করে তার দিকে নিন্দাবাক্য ছুঁড়ে দেয়; শুধু তা-ই নয়, তাকে মারার জন্য হাতে পাথরও তুলে নেয়। এই অ বিশ্বাস, নিন্দাবাক্য মানব-মনের পুঞ্জীভূত ঘৃণা, ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ। সেই ব্যক্তিটি তখন আর কাউকেই বন্ধু হিসেবে পাশে পায় না; কারণ ইসমাইলের মতো সে 'প্রত্যেকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, ফলে প্রত্যেকের হাত ও জিহবা এখন তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে' (আদি ১৬:১২)। অন্যদের বিচারের সময় যারা কোন করুণা দেখায় না, নিজেদের বিচারের সময় তারাও কোন করুণা পাবে না। ভোগান্তির এই-ই শেষ নয়; তাদেরকে ঈশ্বরের শক্ত বিচারের মুখেও পড়তে হবে (যাকোব ৩:১); ঈশ্বরের বিচারসনের সামনে তাদের সাথে সেসব লোকেরাও থাকবে যাদের বিচার করতে গিয়ে তারা কোন দয়া দেখায় নি (রোমীয় ১৪:১০)। ঈশ্বর তাঁর কঠোর বিচার থেকে বিনম্র-নির্যাতনভোগীদের নিষ্কৃতি দেবেন; কিন্তু যারা নিজেদের সমালোচনা না করে কেবল অন্যদের দোষ ধরে বেড়ায়, তাদের তিনি প্রতিরোধ করবেন এবং তাদের জন্য কঠিন বিচার নিয়ে আসবেন। স্বভাবতই এক্ষেত্রে তিনি তাদের প্রতি কোন দয়া দেখাবেন না।

(২) আমরা যদি অন্যদের বিচার করা থেকে নিজেদের বিরত রাখি, তাদের দোষকে বড় করে না দেখে বন্ধুসুলভ সহমর্মিতায় তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসি এবং পাশাপাশি নিজেদের সমালোচনায় অধিক মনোযোগী হই, তবে আমরা নিশ্চিতভাবেই ঈশ্বরের বিচারে আনীত হব না। নিজ ভাইকে যে ক্ষমা করে, তাকে যেভাবে ঈশ্বর ক্ষমা করেন সেভাবে যে তার ভাইয়ের বিচার করা থেকে নিজেকে বিরত রাখবে, ঈশ্বর তার বিচার করবেন না। যার মনে অন্যের জন্য দয়ার মনোভাব রয়েছে, সে ঈশ্বরের কাছ থেকেও দয়া পায়। প্রকৃতপক্ষে এটাই হচ্ছে বিনম্রতা ও দয়ার নিদর্শন। নিজেদের মাঝে বিনম্রতা ও দয়ার উপস্থিতি নিশ্চিত করার মাধ্যমেই আমরা ঈশ্বরের কাছে নিজেদের স্বকীয়তা, পার্থক্য প্রমাণে সমর্থ হই। ফলে ঈশ্বরের বিচারাসনের সামনে দাঁড়াতে আমাদের ভয়ের কোন কারণ থাকবে না; উপরন্তু তাঁর কাছ থেকে আমরা প্রতিজ্ঞাত সম্মান ও পুরস্কার লাভ করব (রোমীয় ১৪:১০)।

যারা ব্যবস্থার বিভিন্ন নিয়ম-কানুনের ভিত্তিতে অন্যদের দোষ ধরে, তাদের বিচারও সেই ব্যবস্থা অনুসারেই হবে (২ পদ)। ধার্মিকতার ঈশ্বর তাঁর বিচারে প্রায়ই কর্মফলকে বিবেচনা করেন, যেমনটা আমরা আদোনী-বেষেকের ক্ষেত্রে দেখি (বিচারকর্তৃকগণ ১:৭; আরও দেখুন প্রকাশিত বাক্য ১৩:১০; ১৮:৬)। এভাবে ঈশ্বর ন্যায্যতার সাথে নিখুঁতভাবে তাঁর বিচার কাজ সম্পন্ন করবেন; তাঁর বিচার দেখে কারও টু শব্দটি করার জো থাকবে না। 'যেভাবে তোমরা অন্যদের মেপে দাও সেভাবে তোমাদেরও মেপে দেওয়া হবে;' হতে পারে মানুষ তার ওপর নেমে আসা শাস্তির মধ্য দিয়ে এই পৃথিবীতেই নিজের পাপের বিষয়ে চেতনা পাবে। তাই আসুন, অন্যদের বিচার করা থেকে নিজেদের বিরত রাখি; কারণ আমাদেরও ঈশ্বরের বিচারাসনের সামনে দাঁড়াতে হবে। অন্যদের বিচার করার সময় যদি আমাদের মনে দয়ার মনোভাব না থাকে, সেক্ষেত্রে ঈশ্বর যখন আমাদের বিচার করতে বসবেন তখন আমাদের বিপরীতে কী ঘটবে? 'ঈশ্বর যখন আমার মুখোমুখি হবেন তখন আমি কী করব?' (ইয়োব ৩১:১৪)। যেভাবে আমরা অন্যদের বিচার করি সেভাবে ঈশ্বরের

যদি আমাদের প্রতি কোন রকম দয়ার মানসিকতা না দেখিয়ে বিচার করেন তবে আমাদের কী দশা হবে? আমরা যদি কঠোরভাবে আমাদের ভাইয়ের দোষ ধরি, তবে ঈশ্বর যে সেভাবে আমাদের দোষ ধরবেন তা নিশ্চিত। এর মধ্যে অন্য আরেকটি বিষয় হল, মানুষ অন্যকে যে নিষ্ঠুর শাস্তি দেয় তা তার নিজের ওপরই এসে বর্তায়।

খ. এখানে দোষ ধরার বিষয়ে কয়েকটি সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। আমরা অবশ্যই অন্যদের বিচার করতে গিয়ে পাপ করব না। তবে কেবলমাত্র পাপের কারণেই যে আমরা অন্যদের দোষ ধরা থেকে বিরত থাকব তা নয়, বরং একে আমরা নেব দায়িত্ব হিসেবে; যার ফলশ্রুতিতে আমরা অপর একটি জীবনকে ধ্বংসের পথ থেকে ফেরাতে সমর্থ হই। যাহোক, এখানে আমাদের অন্যের দোষ ধরা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে; এর মানে হতে পারে, অন্যদের বিষয়ে বাজে সমালোচনা থেকে নিজেদের জীবনকে রক্ষা করা। লক্ষ্য করুন,

১. এমন নয় যে কেউ দোষ ধরতে পারবে না। এখানে মূলত তাদের কথাই বলা হয়েছে, যারা নিজেরা দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও অন্যকে ঠিক সেই কাজটি করতে নিষেধ করছে বা সেই কাজের সমালোচনা করছে। এর ফলে পরবর্তীতে সেই ব্যক্তিরই নিজের তীরে নিজে ঘায়েল হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়, কারণ সে নিজেই তা পালন করছে না। আর কেউ যখন তার কথা দিয়ে তাকেই বধ করবে, তখন সেটা হবে তার জন্য চরম লজ্জার (৩-৫ পদ)। এখানে,

(১) অন্যের দোষ ধরতে গিয়ে নিজের দোষ বেরিয়ে আসার ঘোরতর বিপদের কথা বর্ণিত হয়েছে। সামান্য বিষয় নিয়ে যে তার ভাইয়ের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় সে নিজেকে যতই ভাল, নীতিবান বলে দাবি করুক না কেন তা আর ধোপে টিকবে না; কারণ সে অন্যের চোখের 'কুটা' আবিষ্কারেই ব্যস্ত, কিন্তু তার নিজের চোখেই যে 'কড়িকাঠ' আছে তা লক্ষ্য করছে না। যেখানে সে নিজেই অন্ধ সেখানে সে যদি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কাউকে পথ দেখাতে যায় তবে কেউ কি তার কথা শুনবে? মনে রাখুন,

(ক) এখানে পাপের তুলনামূলক একটা মাত্রা নির্দেশ করা হয়েছে। কোন পাপ কুটার মতো, কোনোগুলো কড়িকাঠ, কোনটি মাছি আবার কোন কোনটি উটের মতো। তাই বলে আবার কোন পাপকে 'ছোট' বলে ভেবে বসবেন না; কারণ ঈশ্বর সব পাপের বিরুদ্ধেই দাঁড়াবেন। স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের চোখে যদি কোন কুটো আটকে থাকে কিংবা শ্বাসনালীতে আস্ত মাছি আটকে যায় তবে আমাদের যন্ত্রণা ও অস্বস্তির সীমা থাকে না। সেক্ষেত্রে যত শীঘ্র সম্ভব আমরা চোখ থেকে সেই কুটা কিংবা শ্বাসনালী থেকে অনাহূত মাছিটি তুলে আনার চেষ্টা করি। তেমনিভাবে 'কুটা' বা 'মাছি' সদৃশ পাপ-ও আমাদের স্বাভাবিক আত্মিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলতে সক্ষম। তাই 'ছোট,' 'বড়' বলে পাপের একটিকেও তুচ্ছজ্ঞান করবেন না।

(খ) অন্যদের তুলনায় নিজেদের অনুরূপ দোষকে আমাদের বড় করে দেখতে হবে। যে বিনম্রতায় ভাইয়ের দোষকে কমিয়ে এখানে 'কুটা' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে, তারই উপস্থিতিতে সত্যিকারের অনুতাপ এবং পবিত্র দুঃখবোধ আমাদের এই শিক্ষা দেয় যেন আমরা নিজেদের দোষকে 'কড়িকাঠ' হিসেবে দেখি। অর্থাৎ অন্যের দোষকে দৃশ্যমান করে না তুলে, আত্মোপলব্ধির জায়গাটাকে আমাদের পরিষ্কার করতে হবে। এর ফলে আমাদের মাঝে অন্যের দোষকে বড় করে দেখার যে প্রবণতা রয়েছে তা ঝেড়ে ফেলা সম্ভবপর হবে।

(গ) অনেককে দেখা যায়, নিজেরা দোষ করে যাচ্ছেন কিন্তু নিজেদের চোখের সেই কড়িকাঠটি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। তখন বুঝতে হবে, তারা পাপ ও দোষের এক ভয়ঙ্কর রাজ্যে বাস করছেন; উপরন্তু নিজেদের প্রকৃত অবস্থান বিচারেও তারা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে চলেছেন। যেহেতু তাদের ভেতর আত্মসমালোচনার কোনো জায়গা নেই, সেহেতু নিজেদের জীবনকেও তারা পর্যবেক্ষণ করে দেখে না যে, সেখানে আদৌ অনুতাপ কিংবা পরিশুদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে কি না। এটা খুবই বিস্ময়ের যে, একজন মানুষ কেন পাপে অসুখী জীবন যাপন করছে তার কারণ সে অনুসন্ধান করে দেখে না; এবং যে মস্ত কড়িকাঠ তার চোখে বসত গেড়ে বসেছে তা নিয়েও সে মোটেই ভাবিত নয়। তাদের এই 'নির্ভাবনার' বিষয়ে আমরা অবশ্য শাস্ত্র থেকেই দেখি, 'তাদের চোখ এই পৃথিবীর প্রভু অন্ধ করে দিয়েছে।' সে কারণে যদিও তারা বলে যে, তাদের দেখায় কোন সমস্যা নেই, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই– তারা কিছুই দেখতে পায় না।

(ঘ) এখানে আরেক পক্ষের বিষয়ে বলা হয়েছে যারা নিজেদের পাপে পূর্ণ জীবনের ব্যাপারে উদাসীন কিন্তু অন্যদের দোষ ধরতে অতিমাত্রায় আগ্রহী; যেমন, ফরীশীরা– তারা নিজেদের বিচার করার চেয়ে অন্যদের দোষ ধরতেই বেশি উৎসাহী ছিল। অন্যের দোষ-ত্রুটির সমালোচনা করতে গিয়ে তারা কোন দয়া দেখাতো না। শিষ্যেরা কেন হাত না ধুয়ে খায়– সেই 'কুটা'র সদৃশ অভিযোগ তারা খ্রীষ্টের কাছে উত্থাপন করেছিল; অথচ নিজেরা যে লোকদের পিতা-মাতাকে অবহেলা করতে উৎসাহিত করতো– সেই 'কড়িকাঠ' এর সদৃশ অন্যায় তাদের উপলব্ধিতে আসতো না। অন্যদের দোষারোপ বা বিচার করার ক্ষেত্রে কারও মাঝে দয়ার মনোভাব অনুপস্থিত থাকলে এবং তার দোষ দেখিয়ে দেবার অভিপ্রায় ও প্রকাশভঙ্গিতে যদি অহংকার মিশে থাকে তবে তা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে 'কড়িকাঠ' বলে বিবেচিত হয়। কারও ভেতর যদি এই প্রকার 'গোপন অপরাধ' থেকে থাকে তবে সেই ব্যক্তির মাঝে তা অস্বীকার করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ফলে সে যখন একই অপরাধ হেতু কাউকে শাস্তি দিতে উদ্যত হয় তখন তার মাঝে মাত্রাতিরিক্ত 'ক্ষোভ' ও 'নিষ্ঠুরতার' প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে সেনেকা বলেন, 'যে মানদণ্ড ও দোষের নিরিখে আপনি আজ কাউকে দোষী সাব্যস্ত করছেন, সেই একই দোষ যদি আপনার মাঝেও থেকে থাকে তবে তো আপনি নিজের বিরুদ্ধেই কথা বলছেন। এক্ষেত্রে আপনার আচরণই বলে দিচ্ছে যে, নিজের বিচারেই আপনি নিরপেক্ষ থাকতে ব্যর্থ হচ্ছেন।'

(ঙ) নিজে দোষী হওয়া সত্ত্বেও অন্যের দোষ দেখিয়ে দিতে যাওয়া কিংবা দোষী ব্যক্তির বিপরীতে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করাটা স্পষ্টতই ভণ্ডামির লক্ষণ। এই ভণ্ডামির মূলে রয়েছে নিজের 'নির্দোষিতা' প্রমাণের দায়। এরই ফলশ্রুতিতে 'ঠাকুর ঘরে কে'– তা জানতে চাওয়ার আগেই অপরাধমেধযজ্ঞের কুশলী যোদ্ধা হিসেবে 'সাহেব সমালোচক' বলে বসেন, 'আমি কলা খাই না'। খ্রীষ্ট এদের কঠোর ভাষায় 'তোমরা ভণ্ড' বলে ভর্ৎসনা করেছেন (৫ পদ)। সমলোচনার ক্ষেত্রে অনেকের আচরণই বলে দেয় যে, তারা দোষী নয় বরং দোষীর বিরুদ্ধে; কারণ প্রকৃতপক্ষে তারা যদি দোষের বিরুদ্ধে থাকতো তবে প্রথমেই তারা নিজেদের দোষের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতো। তাদের এই 'অনমনীয় মনোভাব' বাস্তবিকই দোষী ভাইকে সংশোধনের পথে ফেরায় না, উল্টো তাকে অপদস্থ করে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। এক্ষেত্রে যদি সত্যিকারের দয়ার মনোভাব নিয়ে দোষী ভাইয়ের কাছে যাওয়া সম্ভব হয়, তবেই তাকে সংশোধনের পথে ফিরিয়ে আনার কাজ ফলপ্রসূ হয়। তাই প্রথমে নিজের

দিকে তাকান এবং নিজের ভেতরে দয়ার মনোভাবের উপস্থিতি নিশ্চিত করুন। তা না হলে অন্যের দোষ ধরিয়ে দিতে গিয়ে নিশ্চিতভাবেই আপনি আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগবেন; উপরন্তু বিবেকের জ্বালার পাশাপাশি আপনার ভাগ্যে তীক্ষ্ণ সমালোচনাও জুটে যেতে পারে। যেখানে আপনার নিজের চোখেই কড়িকাঠ রয়েছে, সেখানে আপনি কী করে ভাইয়ের চোখ থেকে কুটা বের করে আনার কথা বলতে পারেন! এর মাধ্যমে আপনার চরিত্রের দ্বান্দ্বিক সত্তাই কি ফুটে উঠছে না? কোন অসুস্থ অভিপ্রায় থেকে আপনি যদি কারও দোষ দেখিয়ে দিতে যান তবে মনে রাখবেন, এর দ্বারা আপনিও আক্রান্ত হতে পারেন। এছাড়া যে 'ভগ্ন আত্মবিশ্বাস' নিয়ে আপনি অন্যের দোষ দেখিয়ে দিতে যাচ্ছেন– তা যে বার বার আপনার কানের কাছে বলে চলেছে 'নিজেকে সিদ্ধ কর, ডাক্তার নিজেকে সুস্থ করো'– তা শুনতে আগ্রহী হোন। তা না হলে আপনার আশপাশের লোকই একদিন আপনার মুখের ওপর বলে বসবে, 'আগে আপনি যান, তারপর আমরাই আপনাকে অনুসরণ করব।' এক্ষেত্রে শাস্ত্রের শিক্ষা মনে রাখাও জরুরি, 'তুমি যখন অন্যদের শিক্ষা দিয়ে থাক তখন নিজেকেও শিক্ষা দাও' (রোমীয় ২:২১)।

(চ) অন্যের দোষ প্রত্যক্ষ করে আমরা নিজেদের দোষ-ত্রুটি নিয়ে ভাবার প্রয়াস পাই এবং এই ভাবনাই আমাদের অন্যের সমালোচনা করা থেকে বিরত রাখে; পাশাপাশি আমরা নিজেদের ভেতর দয়ার মনোভাব জাগ্রত করার বিষয়েও শিক্ষা গ্রহণ করি। এই 'দয়ার' গুণেই একজন দোষী ব্যক্তিকে সংশোধনের পথে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়– 'তবে খুব নরম মনোভাব নিয়ে অন্যের দোষ দেখিয়ে দিয়ো এবং পাশাপাশি নিজের জীবনের বিষয়েও সচেতন থেকো' (গালা ৬:১)।

(২) এখানে ৫ পদে কীভাবে আমরা অন্যের দোষ ধরিয়ে দিতে পারি– সে বিষয়ে বলা হয়েছে। 'সঠিক পথ ধরে এগোও। প্রথমে তোমার নিজের চোখ থেকে কড়িকাঠটা বের করে আনো।' কেউ যদি এমনটা ভাবতে শুরু করেন, 'যেখানে আমি নিজেই দোষমুক্ত নই সেখানে ভাইয়ের দোষ ধরিয়ে দিয়ে তাকে সংশোধনের পথে ফিরিয়ে আনা কি আমার সাজে? তার চেয়ে নীরব শ্রোতা হয়েই থাকি।' এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, কাউকে সংশোধনের পথে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে আমাদের দোষ-ত্রুটি কোন অজুহাত হতে পারে না। 'আমিও তো দোষী' বলে হাল ছেড়ে না দিয়ে সংশোধনের মাধ্যমে নিজেকে ভাইয়ের ভুল ধরিয়ে দেবার 'যোগ্য' করে তোলাটা জরুরি। তাই ভাইকে সংশোধনের পথে ফেরানোর ইচ্ছা থেকে হলেও আমাদের আত্মশুদ্ধির দিকে এগুতে হবে। 'কিন্তু আমি অবশ্যই প্রথমে নিজেকে সংস্কার করব যেন আমার ভাইকে সাহায্য করতে পারি এবং নিজেকে তার সমালোচনা করার যোগ্য করে তুলতে পারি।' মনে রাখুন, যারা অন্যদের দোষ ধরিয়ে দিতে চায় তাদের অবশ্যই ত্রুটিমুক্ত হতে হবে। যাদের উপর অন্যদের দোষ ধরিয়ে দেবার ভার রয়েছে, তাদের খুবই সতর্কতার সাথে জীবন যাপন করতে হবে; মোটকথা তাদের কথায় ও কাজে মিল থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে মণ্ডলীর পরিচালকের কথা এসে যায়, অবধারিতভাবেই তাকে ভাল রিপোর্টের অধিকারী হতে হবে (১ তীমথিয় ৩:২, ৭); যেন কেউ তার দোষ ধরতে না পারে। 'উপাসনা গৃহের বাতিদানটিকে হতে হবে খাঁটি সোনার তৈরি'।

২. কিন্তু প্রত্যেকেই যে সংশোধনের কথায় কান দিয়ে মন ফেরাবে– তেমনটা ভাবা মোটেও উচিত নয়। এখানে স্পষ্টতই বলা হয়েছে, 'কুকুরকে পবিত্র কিছু দিয়ো না' (৬ পদ)। খ্রীষ্টের এই কথাকে আমরা কয়েক দিক থেকে চিন্তা করতে পারি:

(১) খ্রীষ্ট তাঁর এই কথার মাধ্যমে শিষ্যেরা কাদের কাছে প্রচার করবে– সে বিষয়ে নির্দেশনা দিলেন। তবে তার মানে এই নয় যে, শিষ্যেরা পাপী কিংবা খারাপ লোকদের কাছে প্রচার করবে না; কারণ খ্রীষ্ট নিজেও কর-আদায়কারী ও পাপীদের কাছে প্রচার করেছেন। কিন্তু এখানে মূলত তাদের কথা বলা হয়েছে, যারা সুসমাচার পেয়েও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে মনস্থ করেছে; এমনকি এর বিরুদ্ধাচরণকেও নিয়েছে ব্রত হিসেবে। যার ফলশ্রুতিতে সুসমাচার প্রচার কারীদের ওপর নির্যাতন চালাতেও তারা কুণ্ঠিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে এদের কাছে সুসমাচার দেওয়া মানে সময়ের অপচয়। তাই এদের পেছনে নিরর্থক সময় নষ্ট না করে অন্যদের কাছে সুসমাচার প্রচার কাজ চালিয়ে যাওয়াটা জরুরি (প্রেরিত ১৩:৪১); ড. হুইটবিও এমনটাই মনে করেন।

(২) আবার এমনটাও ভাবা যায়, যারা অন্যদের সংশোধনের কথা বলে, এই নির্দেশনা মূলত তাদের জন্য। অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে পাপের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান নেওয়া উচিত। পাশাপাশি কাউকে উপদেশ, পরামর্শ দেবার কাজটিও তাদের বুঝে শুনেই করতে হবে। এক্ষেত্রে 'ব্যক্তি নির্বাচন' খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে প্রতীয়মান হয়; কারণ যে ব্যক্তি আপাদমস্তক খারাপিতে ডুবে আছে, তাকে যদি কঠোর ভাষায় সমালোচনা করা হয় তবে তাতে হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য কাউকে পরামর্শ, নির্দেশনা দেবার ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। শূকরের গলায় মুক্তোর মালা পরাতে যাওয়া, আর তার দিকে পাথর ছুঁড়ে মারা সমান কথা; কারণ তার কাছে দু'টো কাজেরই অর্থ একরকম; ভাল-মন্দের প্রভেদ তার জানা নেই। তাই যাদের মন কঠিন হয়ে আছে তারা যে সমালোচনা গ্রহণ না করে এর প্রতিবাদ জানাবে– তা তো জানা কথাই। প্রকৃতপক্ষে তাদের বৈশিষ্ট্যই এমন (লূক ১১:৪৫; যিরমিয় ৬:১০)। তাই কুকুর কিংবা শূকরকে (অপরিচ্ছন্ন প্রাণীকে) পবিত্র কিছু দিতে নেই। মনে রাখুন,

(ক) সুপরামর্শ হচ্ছে দামি মুক্তোর মতো মূল্যবান বিষয়। কারও দোষ ধরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তাকে সংশোধনের পথে নিয়ে আসাটা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে 'পবিত্র দায়িত্ব' বলে স্বীকৃতি পায়। ভাইকে তার কুপথ থেকে ফেরাবার জন্য সতর্ক করা আমাদের জন্য ঈশ্বরের আদেশস্বরূপ। আর সেই পরামর্শ, সতর্কবাণী কারুকাজ করা স্বর্ণালংকারের মতোই মূল্যবান। জ্ঞানী লোকের উপদেশও ঠিক তাই (হিতোপদেশ ২৫:১২)। তাদের পরামর্শ হচ্ছে খাঁটি তেলস্বরূপ (গীত ১৪১:৫)। প্রকৃতপক্ষে এটাই হচ্ছে জীবন-গাছ (হিতোপদেশ ৩:১৮)।

(খ) পাপীদের মধ্যে যারা খারাপির চরম সীমায় উপনীত হয়, সংশোধনের বাণী তাদের মনে কোন ছাপ ফেলতে পারে না; কারণ মন্দতায় চলাটা তখন তাদের জীবনের গতি ও গন্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলে নিজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে মন ফেরাবার বদলে মন্দ কাজেই তারা অধিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। তারা নির্দ্বিধায় পরামর্শকে ঘৃণা ও তুচ্ছ করে এবং কুপথ থেকে ফেরার আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে। ভাল পরিবেশে রাখলেও 'কুকুর যেভাবে তার বমির দিকে ফেরে' সেভাবে সুপরামর্শ পাওয়ার পরও তারা তাদের পুরানো পথে ফিরে যায় এবং গা ধু'য়ে দিলেও 'শূকর যেভাবে কাদায় গড়াগড়ি খেয়ে' নিজের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলে সেভাবে তারাও লাগাতার মন্দ কাজ করে যেতে থাকে।

(গ) যদিও কেউ এমনটা আশা করে না, অন্যে তার পরামর্শ পায়ে মাড়াক কিংবা অবজ্ঞা করুক, তবুও প্রায়ই তেমনটা ঘটতে দেখা যায়। যার দোষ ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে

সেই ব্যক্তিটি যদি শুদ্ধ মনের অধিকারী না হয় তবে তার কাছ থেকে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া আসাটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে যিনি দোষ ধরিয়ে দিচ্ছেন, তারই আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। 'দোষী' তার দোষ ঢাকতে সমালোচনাকারীকে পাল্টা দোষারোপ করতে, এমনকি তার অনিষ্ট করতেও দ্বিধা বোধ করে না। বস্তুত দীর্ঘদিন মন্দতায় কাটানোর ফলে তাদের মনস্তত্ত্ব একপাক্ষিক দর্শন, জীবনাচরণে অভ্যস্ত হয়ে যায়, ফলে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করার শক্তিটুকুও তাদের থাকে না। নিজেদের চিন্তাজগতে প্রচুর দ্বন্দ্বের সংক্ষুব্ধ বিচরণের কারণে তাদের স্বভাব হয়ে পড়ে উগ্র, অসহিষ্ণু। যে কারণে তারা সমালোচনাকারীর ক্ষতি করতে উঠে পড়ে লাগে। সংশোধনের কথার বিপরীতে আক্রমণাত্মক যুক্তি, অশ্লীল গালিগালাজের ব্যবহারে তারা সমালোচনাকারীর সুনাম ক্ষুণ্ন করতে কুণ্ঠিত হয় না, পাশাপাশি তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে আহত করারও আয়োজন চলে।

রাজা হেরোদ তার ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়াকে বিয়ে করেছিলেন বলে বাপ্তিস্মদাতা যোহন তার সমালোচনা করেছিলেন। ফলশ্রুতিতে হেরোদের কোপানলে পড়ে তাকে জেলে যেতে হয়েছিল। দেখুন, মানুষের আচরণ কীভাবে কুকুর-শূকরের সাথে মিলে যায়! কঠিন-মনা লোকেরা সংশোধনের কথায় কান তো দেয়ই না, উল্টো সমালোচককে বিপদগ্রস্ত করে তুলতে অগ্রসর হয়। যে দয়া ও ভালবাসা থেকে সমালোচক তার দোষ ধরিয়ে দেন তার প্রতি বিন্দুমাত্র সম্মান প্রদর্শন না করে সে তার প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভ উগড়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে এই পাপ হচ্ছে প্রতিবিধানের বিরুদ্ধে। যে ব্যক্তি সুস্থ হতে চায় না তাকে আরোগ্য করা কি আদৌ সম্ভব? এটা পরিষ্কার যে, ঈশ্বর তাদের ধ্বংস করার স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন (২ করিন্থীয় ২৫:১৬)। সমালোচনার ক্ষেত্রে 'ব্যক্তিনির্বাচন'– এর যে প্রাসঙ্গিক দিকটি এখানে বিবৃত হয়েছে তা সুসমাচার প্রচারের ক্ষেত্রেও প্রয়োগযোগ্য। ছেলেমেয়েদের খাবার যেভাবে কেউ কুকুরকে দেয় না, সেভাবে যাদের মন কঠিন হয়ে আছে, যারা খ্রীষ্টের সুসমাচার থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে মনস্থ করেছে, তাদের কাছে পবিত্র বাক্য নিয়ে যাওয়া সময়-মেধা-শ্রম ক্ষেপণেরই অন্য নাম। তবে ব্যক্তিনির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাদের নিশ্চিতভাবেই সতর্ক বা সজাগ থাকতে হবে যেন 'খ্রীষ্টের এই প্রজাদের একজনও বিনষ্ট না হয়'।

তাই পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণ, পরীক্ষা ব্যতিরেকে কাউকে শূকর-কুকুর গোত্রের বলে চিহ্নিত করা উচিত হবে না; যেহেতু আমরা কারও মনের খবর জানি না, সেহেতু কাউকে ভাল বা মন্দ বলার 'দায়িত্ব' নিতে গেলে আমাদের সামনে ফরীশীদের মতো পা পিছলানোর সম্ভাবনা তৈরি হবে। তাই সব খারাপকে কুকুর-কুকরের সাথে গুলিয়ে ফেলে কাউকে খারাপ, নৈরাশ্যবাদী বলে আখ্যায়িত করা আমাদের জন্য চরম ভুল বলেই গণ্য হবে।

(ঘ) আমাদের প্রভু আমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে খুবই যত্নবান। তিনি আমাদের অযাচিত নির্যাতনের সামনে পড়তে দেবেন না, কারণ তাঁর কাছে তাঁর অনুসারীদের রক্ত মূল্যবান। সেই সাথে আমরা যেন নিজেদের 'অতি ধার্মিক' না ভাবি; বরং যারা কুপথে আছে তাদের প্রতি অনুগ্রহে পূর্ণ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই, সেই শিক্ষাই খ্রীষ্ট আমাদের দিলেন। তাঁর এই অমূল্য নির্দেশনা আমাদের আত্মরক্ষার কৌশল ও ধ্বংসের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় বলে দেয়।

মথি ৭:৭-১১

আগের অধ্যায়ে খ্রীষ্ট তাঁর অনুসারীদের জন্য প্রার্থনাকে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবে নির্দেশ করে বলেছিলেন, সঠিক মনোভাবের প্রার্থনা ঈশ্বরকে সম্মানিত করে এবং ঈশ্বর নিজে তার পুরস্কার দেবেন। তারই ধারাবাহিকতায় এখানে তিনি তাঁর অনুসারীদের প্রার্থনার ফল পেতে ব্যস্ত ও অধৈর্য না হয়ে ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা ও প্রতিজ্ঞার ওপর পূর্ণ নির্ভরতা স্থাপন করতে নির্দেশ দিলেন।

ক. এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে খ্রীষ্ট এখানে তিনটি অভিন্ন তাৎপর্যবাহী শব্দ ব্যবহার করেছেন, 'চাও', 'খোঁজো', 'দ্বারে আঘাত করো' (৭ পদ)। এভাবে তিনি যেন বলতে চাইলেন, 'আন্তরিকতার সাথে সঠিক মনোভাব নিয়ে সবসময় প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাক। নিজের মাঝে প্রার্থনার বোধ জাগ্রত করে তার মাঝে বাস করতে আগ্রহী হও। প্রার্থনাকে নাও দায়িত্ব হিসেবে; আর তা পালনে নিষ্ঠাবান হও। বারংবার প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরকে তাঁর প্রাপ্য গৌরব ও প্রশংসা দাও। তাঁর কাছে নিজের প্রয়োজনের কথা অকপটে খুলে বল, যেভাবে ভিখারী জানায়।' এই আহ্বান যারা আত্মিক অর্থে ধনী-তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এভাবে ভিখারীর মতো চাওয়ার মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও পরিচালনার প্রতি নিজেদের আস্থার বিষয়টিই প্রমাণ করেন; যা তাদের উত্তরোত্তর উন্নতির বিষয়টিও নিশ্চিত করে। এখানে 'চাও' শব্দটি দ্বারা নিজের প্রয়োজন ও সমস্যাকে ঈশ্বরের কাছে সঁপে দেওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে। তাই ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে একমাত্র তাঁর কাছেই নিজের প্রয়োজনের কথা খুলে বলুন।

ভ্রমণকারী যেভাবে তার পথ জানতে চায় সেভাবে আপনিও ঈশ্বরের কাছে নিজের জীবনের জন্য নির্দেশনা চেয়ে নিন (যিহিষ্কেল ৩৬:৩৭)। সাধারণত আমরা হারিয়ে যাওয়া মূল্যবান কিছুরই 'খোঁজ' করি; আরেকদিক থেকে আমরা ঝানু ব্যবসায়ীর কথা চিন্তা করতে পারি, যিনি ব্যবসায়ে লাভবান হতে পারেন এমন সব পণ্য খুঁজে পেতে উন্মুখ হয়ে থাকেন। ঠিক সেভাবেই প্রার্থনায় আপনার জন্য সেরা জিনিসটি খুঁজুন (দানিয়েল ৯:৩)। ঘরের ভেতরে ঢোকার আন্তরিক ইচ্ছা থেকেই সাধারণত আমরা দরজায় 'আঘাত' করে থাকি। এক্ষেত্রে আমরা যে ঈশ্বরের সান্নিধ্য, ভালবাসা পেতে এবং তাঁর সাথে তাৎপর্যপূর্ণ কথোপকথনে উদগ্রীব হয়ে আছি, সেটাই প্রার্থনায় আমাদের ফুটিয়ে তুলতে হবে। ঈশ্বর আমাদের মাঝে যে সম্বন্ধ-দ্বার পাপ বন্ধ করে দেয় তা খুলতে আমাদের প্রার্থনায় অশেষ আন্তরিকতার সাথে বলতে হবে, 'প্রভু, তুমি দ্বার খুলে দাও, আমি ভেতরে ঢুকতে চাই।' খ্রীষ্ট যেভাবে আমাদের হৃদয়-দ্বারে আঘাত করেন (প্রকাশিত বাক্য ৩:২০; শলোমন ৫:২) সেভাবে আমাদেরও তাঁর দ্বারে কড়া নাড়তে হবে। এখানে আমাদের জন্য যে অপরিমেয় উৎসাহের কারণ রয়েছে– তা লক্ষ্য করুন। খ্রীষ্টের দ্বারে আমরা অধিকারবিহীন সাধারণ ভিখারীর মতো কড়া নাড়ি না, বরং তাঁর দ্বারে যাওয়ার অধিকারটুকু তিনিই আমাদের দিয়েছেন। কোন কিছু পেতে কেবল চাওয়া বা নিবেদন জানানোটা যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয় না। প্রয়োজনের গুরুত্ব বোঝাতে এর সাথে খুঁজে খুঁজে দ্বার অব্দি পৌঁছে যাওয়াও প্রভূত মূল্য ধরে। লক্ষ্য করুন,

১. আমরা অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে নিজেদের প্রয়োজনের কথা বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকব না; বরং এর সাথে আমাদের কাজও যুক্ত করব; অর্থাৎ তা খুঁজে পেতে অধিক

নিষ্ঠাবান হব। কেউ যদি ঈশ্বরের কাছে 'দাও' বলে পাথরের মতো বসে থাকে তবে নিশ্চিতভাবেই সে তাঁকে পরীক্ষা করছে। বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে অনুধাবনের জন্য খ্রীষ্টের বলা কাহিনীটি উল্লেখ করা যেতে পারে। তিন বছরের অপেক্ষার পরও ডুমুর গাছটিতে ফল দেখতে না পেয়ে বাগান-মালিক বলেছিলেন, 'আমি একে উপড়ে ফেলব' (লূক ১৩:৭, ৮)। ঈশ্বরের নির্দেশনা, পরিচালনা বোঝার জন্য যারা শাস্ত্রের শরণাপন্ন হয় তাদের তিনি প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দয়া দান করেন। কিন্তু যারা পুস্তকপাঠের প্রয়োজনীয়তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং সেই সাথে নিজেদের জীবনে সত্যিকারের ফল দেখাতে ব্যর্থ হয়, তাদের কাছ থেকে ঈশ্বরের জ্ঞান শত হাত দূরে থাকে। শুধু তাই নয়, ঈশ্বর তাদের উপড়ে ফেলতেও দ্বিধা বোধ করেন না।

২. কেবল চাওয়ার মাঝেই আমরা আমাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখব না, উপরন্তু ঈশ্বরের দুয়ারে উপস্থিত হয়ে তার কড়া নাড়ব। তাঁর কাছে আকুল হয়ে বার বার চাইব। এ কেবল আবেদন, আর্জি জানানো নয় উপরন্তু নিজেদের দিকে তাঁর অনুগ্রহের দৃষ্টি ফেরাতে বাধ্য করার মতো ব্যাপার। এভাবে বারবার নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রার্থনায় ঈশ্বরের উদ্দেশে আমাদের চাওয়াগুলো তুলে ধরতে হবে। পাশাপাশি নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের কথাও ভুলে গেলে চলবে না। প্রার্থনায় ঈশ্বরের ইচ্ছে না জানা পর্যন্ত এভাবেই আমাদের প্রার্থনা চালিয়ে যেতে হবে।

খ. এখানে একটি প্রতিজ্ঞার কথা যুক্ত করা হয়েছে: প্রার্থনায় আমাদের প্রয়োজনীয় শ্রমটুকু দিতে হবে; তবে লক্ষ্য রাখতে হবে তা যেন অর্থহীন হয়ে না পড়ে। কারণ প্রার্থনারত হৃদয় ঈশ্বরের কাছে অজ্ঞাত থাকে না। একথা নিশ্চিত যে, তিনি প্রার্থনা শুনছেন। সঠিক মনোভাব নিয়ে কেউ তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে, তিনি তাকে সন্তোষজনক উত্তরই দিয়ে থাকেন। 'চাও', 'খোঁজো', 'দ্বারে আঘাত করো'– খ্রীষ্টের উপদেশস্থিত এই শব্দগুলো হচ্ছে তাঁর উপদেশের তিনটি ভাঁজ, যা তাঁর উপদেশের গভীর অর্থের দিকে নির্দেশ করে। অপরদিকে যে প্রতিজ্ঞার কথা এখানে বলা হয়েছে, তা রয়েছে এর দ্বিগুণ অর্থাৎ ছয় ভাঁজবিশিষ্ট অভিব্যক্তিতে। প্রকৃতপক্ষে যা আমাদের জন্য ঈশ্বরের অপরিসীম অনুগ্রহ, মমতার কথাই প্রকাশ করে; যেন আমরা তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে আনন্দিত ও উৎসাহিত হই এবং সেই অগ্রসরমানতায় তাঁর পরিচালনার প্রতি বাধ্যতায় স্থির থাকি। এবার সেই প্রতিজ্ঞাগুলোর ওপর চোখ বোলানো যাক।

১. খ্রীষ্টের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করলে কী প্রাপ্তিযোগ ঘটবে, প্রতিজ্ঞাটিতে সে বিষয়েই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে– 'চাও, তোমাদের দেওয়া হবে' (৭ পদ); এখানে লক্ষণীয়, কোন ধার দেওয়া কিংবা বিক্রীত পণ্য হস্তান্তর নয় বরং তোমাদের 'দেওয়া হবে'; এটি কোন বিনিময় সংশ্লিষ্ট প্রতিদান নয় বরং প্রদান, অর্থাৎ আমাদের জন্য তা ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া উপহারবিশেষ। একেবারে মুফতে উপহার ছাড়া আর কী পাওয়া যায়? ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি আস্থাশীল হয়ে আপনি যখন ঈশ্বরের কাছে কিছু চান, তখন তিনি যদি দেখেন আপনার চাওয়াটা সঙ্গত তবে তিনি যে আপনাকে তা দেবেন– সে সম্পর্কে নিশ্চিত থাকুন। ঈশ্বরের কাছে যা আপনি চাইছেন তার মূল্য, পরিমাণ তাঁর কাছে কোন ব্যাপার নয়, তবে চাওয়াটা হতে হবে সঙ্গত। 'তোমরা চাইতে জান না বলেই পাও না; কিংবা ঠিকভাবে চাইতে পার না বলেই হয়তো পাও না।' 'খোঁজ কর, পাবে' ফলে তোমার শ্রম বৃথা যাবে না। যারা ঈশ্বরকে খোঁজে তাদের তিনি নিজেই খুঁজে নেন। আর আমরা যদি ঈশ্বরকেই

পেয়ে যাই, তবে এর বেশি আর কী হতে পারে? তাহলে তো আমরা সবই পেয়ে গেলাম। 'দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য তা খোলা হবে।' ঈশ্বরের ক্ষমা ও অনুগ্রহের দরজা আপনার সামনে শত্রুর মতো বাধা হিসেবে বেশিদিন বন্ধ থাকবে না, বরং তাঁর বন্ধু, সন্তানের জন্য তা খুলে দেওয়া হবে। দরজার প্রান্ত থেকে যদি আপনার পরিচয় জানতে চাওয়া হয়, তবে যদি তার সদুত্তর দিতে সক্ষম হন তবে আপনার ভেতরে ঢোকা নিয়ে কোন প্রকার সংশয়ের অবকাশ নেই।

ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা ও পরিচালনার প্রতি আপনি যদি আন্তরিক আস্থাবান হন, তবে সেই অনুগ্রহের দরজা শীঘ্রই খুলে যাবে। যদি প্রথম ধাক্কায় তা না খোলে তবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থবার এভাবে নিরবচ্ছিন্ন প্রার্থনায় তাঁর দ্বারে কড়া নাড়তে থাকুন। দরজার ওপাশে বন্ধু দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ছে; বারবার একই কাজ করেও সে ক্ষান্ত হচ্ছে না, কোথাও চলেও যাচ্ছে না। চেহারায় কোন বিরক্তির ভাব নেই, বরং গভীর আগ্রহ নিয়ে দরজা খোলার অপেক্ষা করছে। অবস্থাটা যদি এমন হয়, তবে দরজা একসময় খুলে যাবেই। কারণ দরজার ওপাশে বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে– দৃশ্যটা কি গৃহকর্তার পক্ষে মোটেই শোভনীয়?

২. ৮ পদে এই প্রতিজ্ঞার সাথে সম্পূরক কিছু কথা জুড়ে দিয়ে তার একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হয়েছে:

(১) অনুগ্রহের সিংহাসন কারও প্রতি বৈষম্য করে না। কেউ যদি প্রকৃতই ঈশ্বরের কাছে বিশ্বাসে সমর্পিত হয়ে কিছু চায় তবে তিনি তাকে তা দিতে অস্বীকৃতি জানান না; সে যিহূদী কি অযিহূদী, ছোট কি বড়, ছেলে কি বুড়ো, দাস কি মনিব, শিক্ষিত কি মূর্খ– তাতে কিছু যায় আসে না। তাঁর দৃষ্টিতে কেউই আলাদা কিছু নয়। খ্রীষ্ট এখানে তাঁর শিষ্যদের কাছে সেই বার্তাটিই পৌঁছে দিলেন, 'আমার শিষ্য বলে কেবল তোমরাই যে প্রার্থনার ফল পাবে-তা নয় বরং 'যারা চায় তাদের প্রত্যেকে পায়।'

(২) কত দ্রুত ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা কবুল করেন– সে জিজ্ঞাসার একটি চমৎকার উত্তর এখানে বিবৃত হয়েছে, 'যারা চায় তাদের প্রত্যেকে পায়।' লক্ষ্য করুন, এখানে কিন্তু বলা হয় নি 'তারা পাবে' বরং বলা হয়েছে, 'তারা পায়'। বর্তমান কালে লেখা এই উক্তিটি ভবিষ্যত-প্রাপ্তির বিষয়ে এক অনন্য নিশ্চয়তা প্রদান করে। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি বিশ্বাসে, বাধ্যতায় সক্রিয় বিশ্বাসীরা প্রার্থনার মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহসিক্ত হয়। তাই তারা যখন প্রার্থনা করে তখন তাদের ভাবতে হবে, তাদের কাজ হয়ে গেছে। কারণ ঈশ্বর বিশ্বস্ত, তিনি কখনো তাঁর প্রতিজ্ঞার অন্যথা করেন না। আমাদের জন্য এ বড় আশার কথা যে আমরা ঈশ্বরের এই অসাধারণ প্রতিজ্ঞার অংশী হতে পেরেছি। কারণ, তাঁর এই প্রতিজ্ঞার কথা আমাদের কানে মধু বর্ষণ করে; আশা ও বিশ্বাসে আমাদের তা প্রাপ্তির আনন্দে ভরিয়ে দেয়। ঈশ্বর যেভাবে তাঁর পবিত্রতার নাম করে বলেন, 'গিলিয়দ আমার, মানশাও আমার' সেভাবে তাঁর প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে আমরাও সবকিছুকে নিজের বলে ভাবতে এমনকি পেতেও সক্ষম হই (গীত ১০৮:৭, ৮)। এক্ষেত্রে আমাদের চাওয়াটা কেমন হচ্ছে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এর সাথে আমাদের প্রাপ্তির যোগসূত্রতা রয়েছে। খ্রীষ্ট চান যেন আমাদের প্রার্থনা ফলপ্রসূ হয়; তাই ভাবনাতীত, অসীম ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার পরও খ্রীষ্টের উপদেশে আবেদনের স্বর স্পষ্ট।

৩. প্রার্থনার বিষয়ে করা প্রতিজ্ঞাকে আরও বর্ণিল করে উপস্থাপন করতে খ্রীষ্ট এখানে জাগতিক পিতা-মাতার উদাহরণ টেনে এনেছেন, যারা তাদের সন্তানদের চাওয়ার প্রত্যুত্তরে

সবসময় ভাল কিছু দিতে প্রস্তুত থাকেন। যারা তাঁর শিক্ষা শুনছিল খ্রীষ্ট তাদের প্রতি এই প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিলেন, 'তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে সন্তান রুটি চাইলে পাথর দেবে?' (৯, ১০ পদ)। তাঁর এই প্রশ্ন মোটেই কোন মন্দ রসিকতা নয়; বরং লোকদের কাছে ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার স্বরূপ ফুটিয়ে তুলতেই যে তিনি এই প্রশ্নবোধক উক্তিটি করেছিলেন তা তাঁর পরের কথাতেই পরিষ্কার হয়ে যায়, 'নিজেরা খারাপ হয়েও যদি তোমরা তোমাদের ছেলেমেয়েদের ভাল জিনিসগুলোই দিতে জান তবে তোমাদের স্বর্গীয় পিতার কাছে যারা চায় তাদের যে তিনি ভাল ভাল জিনিসই দেবেন– তা তো নিশ্চিত সত্য।' এবারে দেখা যাক কেন তিনি এই উদাহরণ টানলেন,

(১) আমাদের প্রার্থনা ও চাওয়াগুলোকে উপযুক্ত নির্দেশনা দেওয়ার জন্য।

(ক) ঈশ্বর আমাদের 'স্বর্গীয় পিতা;' তাই তাঁর সামনে আমাদের সন্তানের অধিকার নিয়ে আত্মবিশ্বাসের সাথে উপস্থিত হতে হবে। খেলতে গিয়ে ব্যথা পেলে কিংবা খিদে পেলে বাচ্চারা যেভাবে নিঃসঙ্কোচে তাদের বাবা-মার কাছে বায়না ধরে অথবা অভিযোগ জানায়, সেভাবে আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে অকপটে নিজেদের সব প্রয়োজনের কথা জানাতে হবে।

(খ) ঈশ্বরের কাছে আমরা অবশ্যই ভাল জিনিস প্রত্যাশা করব; কারণ যারা তাঁর কাছে কিছু চায় তিনি তাদের তা দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর কাছে একশো ভাগ আত্মনিবেদনের বিকল্প নেই, যেহেতু কীসে আমাদের ভাল হবে– সেটা বুঝতে আমরা অক্ষম (উপদেশক ৬:১২)। পক্ষান্তরে ঈশ্বর আমাদের প্রয়োজনের যথার্থতা সম্বন্ধে জানেন। যেহেতু তিনি জানেন কীসে আমাদের ভাল হবে সেহেতু নিজেদের ভাল-মন্দের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে তাঁর কাছে সমর্পণ করে বলতে হবে, 'পিতা, তোমার ইচ্ছামতোই হোক'। উদাহরণটিতে যেমন বলা হয়েছে, সন্তান রুটি বা মাছ চাইলে আমরা নির্দ্বিধায় তার প্রয়োজন মেটাতে সচেষ্ট হই; কারণ তার এই চাওয়া সংগত। বেঁচে থাকার জন্য রুটি যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনি মেধায়-মননে শিশুর বেড়ে ওঠায় মাছও প্রভূত ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে সন্তানের চাওয়াটা প্রয়োজন হিসেবে গণ্য হয়। কিন্তু সে যদি রুটির স্থলে পাথর কিংবা মাছের স্থলে সাপ চেয়ে বসে তখন পিতা-মাতা হিসেবে আমরা যত খারাপ কিংবা সন্তানের প্রতি যতই স্নেহশীল হই না কেন, সন্তানের ভাল'র কথা চিন্তা করেই তার এই অন্যায় আব্দারে আমরা কান দেব না।

অনেক সময় আমরা ঈশ্বরের কাছে এমন কিছু চেয়ে বসি যা আমাদের ক্ষতির কারণ হতে পারে; কিন্তু ঈশ্বর তাঁর অসীম মমতায় আমাদের সেই অসংগত আব্দার প্রত্যাখ্যান করেন, যেহেতু তিনি জানেন কীসে আমাদের ভাল হবে। ভালবাসার প্রত্যাখ্যান ক্রুদ্ধ অনুমোদনের চেয়ে উত্তম। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কেন আপনি কোন কোন প্রার্থনার ফল পেতে ব্যর্থ হয়েছেন! হয়তো আপনি যা চেয়েছিলেন তা আপনার ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতো– সেটা বুঝেই ঈশ্বর আপনার আহ্বানে সাড়া দেন নি। তাই আপনার ভালর জন্যই নিজেকে ঈশ্বরের হাতে সঁপে দিন। এ প্রসঙ্গটি একজন অবিশ্বাসী, জুভেনালের লেখনিতে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে, 'ওপরওয়ালার হাতে আপনার ভবিষ্যতের ভার ছেড়ে দিয়ে তাঁর অশেষ প্রজ্ঞা, মহানুভবতা ও পরিচালনার ওপর আস্থা রাখুন। এর ফলে আপনার যৌক্তিক চাওয়াগুলোকে নির্বাচন করে তিনিই আপনাকে সুন্দর ভবিষ্যত উপহার দেবেন। তাঁর পরিচালনা এতই অসাধারণ যে আপনি তা ভাবতেই পারবেন না। তাছাড়া নিজেদের

সম্পর্কে আমরা কতটুকুইবা জানি! শুধুমাত্র অন্ধ আবেগ থেকে আমরা নিজেদের ভালবেসে যাই; আর জীবনের গতি-গন্তব্য নির্ধারণের বৃথা চেষ্টায় প্রাণপণ করি। তা যেমন বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে সত্য, তেমনি জীবনসঙ্গী খুঁজে নেওয়ার ক্ষেত্রে আরও সদৃশ। অথচ আমরা জানি না কারা আমাদের জীবনসঙ্গী হওয়ার উপযুক্ত কিংবা কারা হতে যাচ্ছে আমাদের অনাগত বংশধর। এই অনিবার্য ভবিষ্যতের বিষয়ে একমাত্র উপরে যিনি আছেন তিনিই বলতে পারবেন।'

(২) আমাদের প্রার্থনা ও চাওয়াকে উৎসাহিত করতে। আমাদের এই আশা করতে হবে যে, প্রার্থনায় আমরা প্রত্যাখ্যাত কিংবা নিরাশ হব না; অর্থাৎ রুটি চাইলে ঈশ্বর আমাদের পাথর দেবেন না অথবা মাছ চাইলে সাপ; কারণ তিনি জানেন, রুটির স্থলে পাথর চাবাতে গিয়ে আমাদের দাঁত ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং মাছের বদলে প্লেটে সাপ পরিবেশিত হলে তা উল্টো আমাদেরই কামড়ে দিতে পারে। তাই চাওয়ার ব্যাপারে আমাদের যেমন ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে হবে, তেমনি তাঁর কাছ থেকে আমরা ভাল কিছুই পাব– সে বিষয়েও নিশ্চিত থাকতে হবে। পাপের বেতনের চেয়ে তাঁর দেওয়া উপহারই যে শ্রেষ্ঠ – তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। পৃথিবী তার সন্তানদের প্রয়োজনের যথার্থতা বিবেচনা না করে অনেক সময় রুটির বদলে পাথর কিংবা মাছের বদলে সাপ পরিবেশন করে থাকে; কিন্তু সেদিক থেকে ঈশ্বর সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি কখনো তাঁর সন্তানদের ক্ষতিকর কিছু দেন না। অধিকন্তু তাঁর সন্তানেরাও এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, তাদের প্রার্থনা শোনা হবে এবং তার জবাবও আসবে।

(ক) ঈশ্বর পিতা-মাতার মনে সন্তানের প্রয়োজন পূরণের জন্যে গভীর মমতা ও এক ধরনের প্রবণতা পুরে দেন। যার কারণে পিতা-মাতা সবসময় তাদের সন্তানের যাতে ভাল হয়– সে চেষ্টাই করেন। এই যে বিবেচনাবোধ– এটা কিন্তু মোটেও কৃত্রিম নয়। পিতামাতা তাদের সহজাত বিবেচনাবোধ থেকেই সন্তানের ভাল লাগাকে নয়, বরং তার ভাল হওয়াটাকেই প্রাধান্য দেন। সন্তানের কীসে ভাল হয়– তা ভাবতে ও সম্পাদন করতে পিতামাতার ওপর জোর খাটাতে হয় না; অর্থাৎ এই দায়িত্ববোধ মোটেও আরোপিত কিছু নয়। সঙ্গত কারণেই এ ব্যাপারে কোন আইন প্রণয়নের দরকার পড়েনি; এমনকি রাজা শলোমনের আমলে লোকেরা যখন বিপথগামী হচ্ছিল– তখনও নয়।

(খ) সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার ভালবাসা-মমতার উদাহরণ তুলে ধরে খ্রীষ্ট এখানে আমাদের জন্য তাঁর গভীর মমত্ববোধের কথা স্বীকার করলেন। তিনি আমাদের তাঁর 'সন্তান' হিসেবে অভিহিত করলেন। ফলশ্রুতিতে যে অনন্য 'আত্মিক সম্পর্কের' বিষয়ে আমরা জানলাম, তা প্রকৃতই আমাদের যাবতীয় প্রয়োজন প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দেয়; কারণ আমাদের জন্য তাঁর মনে রয়েছে পিতার মমতা ও মায়ের সান্ত্বনা (গীত ১০৩:১৩; যিশাইয় ৬৬:১৩; ৪৯:১৪, ১৫)। সন্তানের জন্য পিতা-মাতার যে ভালবাসা, তা একমাত্র ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে। তাই স্বর্গীয় পিতা হিসেবে আমাদের জন্য তাঁর মনে যে ভালবাসা, যে মমত্ববোধ রয়েছে– তার কোন তুলনা নেই। বাস্তবিকই ঈশ্বর তাঁর অসীম ভালবাসা-অনুগ্রহে আমাদের সব প্রয়োজন যুগিয়ে দেন।

তাই স্বর্গীয় পিতা হিসেবে শুধু তাঁর কাছেই আমাদের সব প্রয়োজন, চাওয়াকে রাখতে হবে। আর তিনি যে আমাদের তা দিতে প্রস্তুত আছেন- সেটা আমরা খ্রীষ্টের শিক্ষার আলোকেই বুঝতে পাই। মনে রাখবেন, আমাদের জন্য তাঁর ভালবাসা, মমতা প্রশ্নাতীত;

এর কোন সীমা-পরিসীমা নেই। তাঁর অসীম-অনন্য মমত্ববোধের সাথে জাগতিক পিতা-মাতার ভালবাসার তুলনায় আসার ও যোগ্য নয়। পৃথিবীর যে কোন পিতা-মাতার চেয়ে ঈশ্বর আমাদের প্রতি অনেক বেশি যত্নবান; যে-কারণে তাঁর কাছ থেকে আমরা 'ভাল ভাল জিনিসই' প্রত্যাশা করি। তাঁর প্রশ্নোর্ধ্ব বিশ্বস্ততা, অতুলনীয় শ্রেষ্ঠ ত্ব, অনুপম সততা আমাদের বলে দেয়, 'পিতা হিসেবে তাঁর মতো আর কেউ নেই।' পিতা-মাতা হিসেবে আমরা আমাদের সন্তানের যত্ন নিই, যেমনটা আমাদের পিতা-মাতারা করে গেছেন। আদমের বংশধর হিসেবে দায়িত্বভারের এই 'অর্পণ' ও 'গ্রহণের' পরম্পরায় মূলত কতটা আন্তরিকতার উপস্থিতি রয়েছে– সে বিষয়ে সংশয় থেকেই যায়। কারণ পাপ আমাদের ভাল প্রবৃত্তির বড় অংশটাই ঝেড়ে দিয়েছে। উপরন্তু স্বার্থপরতা আমাদের উপর এএভাবে জেঁকে বসেছে যে, 'মনুষ্যত্ব' ব্যাপারটাই এখন অচেনা ঠেকে। আর এটা তো ঠিক, সন্তানের প্রতি যে 'যত্নকর্মের' কথা এখানে বলা হচ্ছে– তাতে মানুষ হিসেবে আমাদের অবদান খুবই অল্প; কারণ দেখা না গেলেও এর বেশির ভাগ কাজ তো ঈশ্বরই করে থাকেন। তাই নিজেরা খারাপ হয়েও জাগতিক পিতা-মাতারা যদি তাদের সন্তানদের ভাল ভাল জিনিস দিতে জানে, তবে 'স্বর্গীয় পিতা' হিসেবে ঈশ্বর যে আমাদের 'অনেক' ভাল জিনিস দেবেন– তা বলাই বাহুল্য। তাঁর অসীম মমত্ববোধের বিষয়ে শাস্ত্র থেকে দেখুন, 'আমার পিতা-মাতা আমাকে ত্যাগ করলেও প্রভু আমার ভার নেবেন' (গীত ২৭:১০)।

প্রথমত, ঈশ্বর তাঁর অসীম প্রজ্ঞায় আমাদের সংগত প্রয়োজন, অভিপ্রায়ের কথা জানেন। তিনি সবসময় কীসে আমাদের ভাল হবে– সে বিষয়ে চিন্তা করেন। এক্ষেত্রে জাগতিক পিতা-মাতারা মাঝে-মধ্যে বোকামির পরিচয় দিলেও ঈশ্বর কিন্তু সতত সঠিক। দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরের দয়া অসীম। তাঁর অনুগ্রহ অতুলনীয়। পৃথিবীর তাবৎ পিতার মমতাকে যদি একপাশে জড় করা হয় তবুও তা ঈশ্বরের মমতার সাথে কোন সম্মানজনক ব্যবধান রচনা করতে পারে না। সূর্যের পাশে মোমবাতি আর সমুদ্রের পাশে এক বিন্দু জল– এটা কোন তুলনা হল নাকি! ঈশ্বরের ধন অফুরন্ত এবং তিনি আমাদের সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়েই আছেন। আত্মিক পিতা হিসেবে তিনি তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে আমাদের অনুগ্রহ করে থাকেন। জাগতিক পিতা-মাতার দেওয়া 'ভাল জিনিস' এর সাথে তুলনায়ও আসে না। ঈশ্বর, যিনি অনন্তকালীন, যাঁর ভালবাসা চিরস্থায়ী, তিনি তাঁর প্রজাদের মধ্যে ভাল-মন্দ উভয়ের প্রতিই মমতা করেন, যত্ন নেন; যেভাবে জাগতিক পিতা-মাতারা তাদের সন্তানের প্রতি করে থাকে। বিদ্রোহী পুত্র অবশালোমের প্রতি দায়ূদকেও আমরা অনুরূপ মমতা করতে দেখি। এতসব উদাহরণ, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ প্রত্যক্ষ করার পরও আমাদের প্রতি ঈশ্বরের মমত্ববোধ নিয়ে কোন সংশয় থাকা সম্ভব?

মথি ৭:১২-১৪

আমাদের ধার্মিকতা একদিকে যেমন মানুষের কাছে আদর্শ ধর্মের পরিচয় তুলে ধরে তেমনি অপরদিকে তা ঈশ্বরের কাছে সাদরে গৃহীত হয়। তাঁর ধার্মিকতায় জীবন কাটানোর মাধ্যমে আমরা খাঁটি ও সত্য ধর্মের ঝাণ্ডা উঁচিয়ে ধরতে সমর্থ হই। তাই ঈশ্বর-স্বীকৃত এই খাঁটি ও সত্য ধর্ম পালনের অনুষঙ্গ হিসেবে আমাদের জীবনে তাঁর ধার্মিকতার প্রতিফলন দেখানো জরুরি। সেই লক্ষ্যে খ্রীষ্ট এখানে আমাদের জন্য 'ধার্মিকতাকে' আবশ্যক

করলেন।

ক. আমরা অবশ্যই ধার্মিকতার পথে চলার জন্য ব্যস্ত হব এবং একে উপজীব্য করেই জীবনপথে অগ্রসর হব (১২ পদ)। তাই একে আপনার জীবনের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করুন যেন আপনি সেই আরাধ্য ধার্মিকতা লাভে সমর্থ হন। তা করলে আপনি নিজের জন্য ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত সাহায্যকে দৃঢ়তার সাথে আহ্বান করছেন। ঈশ্বরের শিক্ষা-আদেশের প্রতি বাধ্য থেকে যেহেতু আপনি অন্যের দোষ ধরা থেকে বিরত থাকছেন সেহেতু ঈশ্বরের আপনার দোষ ধরবেন না। কথাটা ঘুরিয়ে এভাবেও বলা যায়, যেহেতু আপনি ঈশ্বরের ক্ষমা পেয়েছেন সেহেতু অন্যদেরও ক্ষমা করুন। এভাবে ঈশ্বর-নির্দেশিত পথে চলার মাধ্যমে আপনি নিজেকে বিচারের হাত থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হন। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে স্বভাবতই আমাদের অন্যদের প্রতি ভাল ব্যবহার করা প্রয়োজন। কারণ তা না হলে ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শুনবেন না (যিশাইয় ১:১৫-১৭; ৫৮:৬,৯; সখরিয় ৭:৯, ১৩)। মূলত সে কারণেই ফলপ্রসূ প্রার্থনার রহস্য বলে দেবার পর খ্রীষ্ট এখানে অন্যদের প্রতি ভাল ব্যবহার করতে শিক্ষা দিলেন। সততায় না চললে আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে ভাল জিনিসগুলো আশা করতে পারি না; আর এটাই হচ্ছে ধার্মিকতা– যা মানুষের মাঝে প্রকৃষ্ট, আদর্শ উদাহরণ তৈরি করতে সক্ষম। আমাদের ধার্মিকতাকে সততার সাথে প্রামাণ্য করে তুলতে হবে, যেখানে কেবল সত্যিকারের উপাসনাই থাকবে, কোন ভণ্ডামি নয়। এখানে,

১. বিচার সম্পর্কিত নিয়ম বিবৃত হয়েছে; 'অন্য লোকদের কাছ থেকে তোমরা যেরকম ভাল ব্যবহার প্রত্যাশা কর, তেমনি তাদের প্রতিও তোমরা ভাল ব্যবহার কর।' খ্রীষ্টের এই শিক্ষাকে কেবল জানা ও বিশ্বাস করার মাঝে সীমাবদ্ধ না রেখে তা পালনে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। সেক্ষেত্রে ঈশ্বর ও মানুষ– উভয়ের প্রতিই আমাদের বিশ্বস্ত থাকা প্রয়োজন; কারণ মানুষের জন্য হৃদয়ে ভালবাসার মনোভাব না রেখে ঈশ্বরের উপাসনা করলে তা পণ্ডশ্রমে রূপ নেয়। 'অন্য লোক' বলতে এখানে কেবল আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী, সমমনা, বিশ্বাসীবন্ধুদের কথাই বোঝায় না বরং যারা আমাদের সংস্পর্শে আসে– তাদের সবার কথাই এখানে বলা হয়েছে। সহজ করে বললে, 'প্রতিবেশী'। খ্রীষ্টের দেওয়া অসামান্য এই আদেশে যে 'সাম্য', 'তুলনার' বিষয়ে আমরা পড়ি, তা নিশ্চিতভাবেই পারস্পরিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে, 'অন্যদের কাছ থেকে তোমরা যেমন ভাল ব্যবহার প্রত্যাশা কর, তেমনটা তাদের প্রতিও কর।'

সম্রাট আলেক্সান্দার সেভারাসা অবিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও খ্রীষ্টের এই শিক্ষায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। সেই মুগ্ধতা থেকেই তিনি সেটা তার শয়নকক্ষের দেয়ালে লিখে রাখেন। লোকদের বিচার করতে গিয়ে প্রায়ই তিনি তার উল্লেখ করতেন। এর ফলে তার মনে খ্রীষ্টের জন্য জন্মেছিল শ্রদ্ধাবোধ এবং তাঁর অনুসারীদের জন্য সহানুভূতি। 'কারও ভাল করলে সে-ও তোমার ভাল করবে'। একে ইতিবাচক, নেতিবাচক– যেভাবেই দেখা হোক না কেন তার ফল কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় এসে মিলে যায়। তাই বলে, কেউ যদি আমাদের আঘাত করে বসে তবে তাকে পাল্টা আঘাত করাটা মোটেও সমীচীন হবে না। উপরন্তু তার সামনে নিজেকে বিনম্রতার সাথে উপস্থাপন করতে হবে। সেটাই হবে নিজেদের ধার্মিকতা প্রদর্শনের চমৎকার সুযোগ। তাই আপনার ওপর কারও অন্যায় আচরণের প্রত্যুত্তর করবেন না। এক্ষেত্রে আপনার ক্ষমতা আছে কি নেই– সেটা বড় কথা নয়। কেবল মনে রাখুন আপনি খ্রীষ্টের অনুসারী। অন্যায়কারীর অনিষ্ট কামনার বদলে

তাকে ভালবাসার আলিঙ্গনে বাঁধুন। খ্রীষ্টের এই শিক্ষা আমাদের প্রতিবেশীকে ভালবাসতে শেখায়। এ প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি মোশিকে দেওয়া ঈশ্বরের সেই মহান ব্যবস্থার কথা, 'তোমরা তোমাদের প্রতিবেশীকে ভালবাস।' প্রকৃতই এই ভালবাসা নিঃস্বার্থ, যা কোন প্রতিদান প্রত্যাশা করে না। আমরা যদি স্বার্থপরের মতো প্রতিবেশীকে মেপে মেপে ভালবাসা দিই, তবে বুঝতে হবে আমাদের বেঁচে থাকাটা স্রেফ নিজেদের জন্যই। অনুরূপভাবে অন্যের প্রতি ভাল ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও আমাদের প্রতিদানের কথা চিন্তা করা যাবে না। খ্রীষ্টের এই আদেশ থেকে আমরা তিন প্রকার করণীয় খুঁজে পাই:

(১) নিজেদের জন্য আমরা যা করি, তা সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিবেশীর জন্য করতেও প্রস্তুত থাকব। খ্রীষ্টের এই আহ্বানের ভিত্তি হচ্ছে আমাদের মানবীয় বিবেচনাবোধ– যা প্রকৃতই আমাদের স্বার্থবাদী চরিত্র উন্মোচন করে। নিজের স্বার্থ হাসিলের সুযোগ না থাকলে আমরা যে কোথাও একটা পা পর্যন্ত ফেলি না– সে তো আমরা নিজেরাই জানি।

(২) অন্যদের আমরা নিজেদের সমকক্ষ ভাববো এবং আমাদের মনে যেন তাদের জন্য সহানুভূতি বরাদ্দ থাকে। এর ফলে আমাদের ভাল আচরণের জবাবে তারাও আমাদের প্রতি ভাল ব্যবহারটুকুই করবে। ফলশ্রুতিতে উভয়পক্ষই লাভবান হবে।

(৩) অন্যদের প্রতি ভাল ব্যবহার করার সময় আমরা যেন নিজেদের তাদের জায়গায় কল্পনা করি। এর ফলে আমরা আমাদের করা ভাল ব্যবহারের প্রতিদান লাভের আকাঙ্ক্ষা এবং মিথ্যে অহংবোধ থেকে নিজেদের বিযুক্ত রাখতে সমর্থ হব। তাই কারও জন্য কোন ত্যাগ স্বীকার করলে তার বিনিময়ে কী পাবেন– সে চিন্তা না করে কেবল নিজেদের দায়িত্বটুকু পালন করে যান। কারণ 'তাদের' পালা কখন আসবে– তা আমাদের জানা নেই। আমরা কেবল ঈশ্বরের বিচারের ওপর আস্থা রাখতে পারি যে, তিনি আমাদের এই ত্যাগটুকু বিবেচনায় রাখবেন।

২. 'এটাই হচ্ছে পঞ্চপুস্তক ও ভাববাদীদের শাস্ত্রের শিক্ষার মূল কথা' বলে খ্রীষ্ট তাঁর হুকুমের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বুঝিয়ে দিলেন। 'সবচেয়ে বড় আদেশ কোনটি'– ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকদের করা এই প্রশ্নের জবাবে খ্রীষ্ট যে দু'টি আদেশের কথা বলেছিলেন, এটি তার একটি এবং তা দ্বিতীয় আদেশটিরই সারকথা (মথি ২২:৪০)। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের বলা আদেশদ্বয় ঈশ্বর ও মানুষ-উভয়ের প্রতি আমাদের বিশ্বস্ত থাকতে নির্দেশ দিচ্ছে। 'প্রতিবেশীকে ভালবাস'– পঞ্চপুস্তক ও ভাববাদীদের শাস্ত্রের শিক্ষাসমূহ মূলত এই আদেশকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে; যে-কারণে খ্রীষ্ট তাঁর অনুসারীদের ধার্মিকতার বিষয়ে শিক্ষা দিতে গিয়ে 'নতুন কিছু' যোগ করার কথা না ভেবে পুরাতন নিয়মের মূল ভাষ্যটিকেই বহাল রাখলেন। প্রতিবেশীকে ভালবাসার কথা পুরাতন নিয়মেও বেশ গুরুত্বের সাথে 'বড় আদেশ' হিসেবেই আলোচিত হয়েছে। তবে পুরাতন নিয়মের বিস্তৃত আলোচনার বিপরীতে এখানে আমরা তার সারকথাটুকু খুব অল্প কথায় পাই। যেহেতু খ্রীষ্ট এখানে পুরাতন নিয়মের আদেশটিকেই বহাল রাখলেন সেহেতু আমাদের উচিত প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের 'করণীয়' পালন করা। অর্থাৎ অন্যদের কাছ থেকে আমরা যে রকম ব্যবহার পেতে চাই, তাদের প্রতিও যেন আমরা অনুরূপ ব্যবহারই করি। খ্রীষ্টের দেওয়া এই আদেশটি বাস্তবিকই তাঁর 'নিয়মকে' প্রশংসিত করে। তবে তাঁর অনুসারী হিসেবে এ নিয়ে আমাদের আত্মতুষ্টিতে ভোগার কোন কারণ নেই; যেহেতু এর ভিত্তিতেই আমাদের জীবনকে বিচার করা হবে। তাই খ্রীষ্টীয় হিসেবে খ্রীষ্টের শিক্ষা ও আদেশে নিজেদের জীবনকে সাজানোর

বিকল্প নেই– 'হয় এটা সুসমাচার নয়, নইলে তারা খ্রীষ্টানই নয়।

খ. ধর্ম পালনকে আমাদের নিতে হবে দায়িত্ব হিসেবে এবং তা চালিয়ে যেতেও আগ্রহী হতে হবে। আমরা অবশ্যই আমাদের আচরণে তা দৃঢ়তার সাথে প্রয়োগ করব এবং এখানে যে সরু ও সঙ্কীর্ণ পথের কথা বলা হয়েছে– সেটা ধরে এগিয়ে যাব (১৩, ১৪ পদ)।

এখানে ১. ন্যায়ের পথ যা পবিত্রতার এবং খারাপ পথ যা পাপের– উভয়ের কথাই বলা হয়েছে। সর্বোপরি এখানে দু'টো পথের কথা বলা হয়েছে– সঠিক ও ভুল পথ, ভাল ও মন্দতার পথ; স্বর্গগামী পথ ও নরকগামী পথ। একটি পথ আমাদের বেছে নিতেই হয়; মাঝামাঝি বা মধ্যপন্থা বলে কিছু নেই। 'কে কোন পথ ধরে এগুচ্ছে'– সেটাই ঈশ্বরভক্ত ও পাপীদের মাঝে পার্থক্য গড়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে এর মাঝেই চিরকালীন গন্তব্য নিহিত।

(১) এখানে পাপ ও পাপীদের পথ নির্দেশ করা হয়েছে। বাইরে থেকে যাকে ভাল বলে মনে হয় কিন্তু ভেতরটা মন্দতায় আচ্ছন্ন।

(ক) এই পথ সবাইকে নিজের দিকে নিয়ে যেতে প্রলুব্ধ করে। তার দরজা বড় এবং পথও চওড়া। দুঃখজনক হলেও সত্য এই পথে অনেক যাত্রীর দেখা মেলে। এর কারণ: প্রথমত, সেখানে বিচরণ করতে গেলে আপনি অবাধ স্বাধীনতা পাবেন, কারণ তা প্রশস্ত এবং যারা সঠিক পথে চলে তাদের এ পথে আসার জন্য আহ্বান জানাতে পারবেন। আপনি আপনার সব লালসা চরিতার্থ করার জন্য এই পথে যেতে পারেন; এই পথ আপনার আ-চরণে সংযমের বাঁধ পরিয়ে দেবে না; আপনার কাজের বিরুদ্ধে কিছু বলবে না। আপনি তখন ইচ্ছেমতো যা খুশি তাই করতে পারবেন। তা আপনাকে অবাধ স্বাধীনতা পাইয়ে দেবে। চওড়া হওয়ার ফলে এই পথ ধরে চলতে গিয়ে কেউ কোন বাধা পায় না, উপরন্তু অবিরাম চলতেই থাকে। পাশাপাশি কিছু দূর যাওয়ার পর অনেক শাখাপথের দেখা পাবেন– যেগুলো একটির সাথে অন্যটি জড়াজড়ি করে আছে। প্রকৃতই এই পথগুলো আপনাকে পাপের বিচিত্রতার স্বরূপ দেখিয়ে দেবে। ফলে সেখানে একটি পথে পা দেওয়া মানে ক্রমশ পথজালে জড়িয়ে যাওয়া।

দ্বিতীয়ত, এই পথে আপনি অনেকের সান্নিধ্য পাবেন; 'অনেকেই তার মধ্য দিয়ে ঢোকে' এবং সেই পথে হাঁটে । যদি আমরা সব মানুষকে অনুসরণ করি তবে নিশ্চিতভাবেই মন্দতায় আপতিত হই। যদি আমরা এই জনতাকে নিয়ে চলি তবে তা আমাদের ভুল পথেই পরিচালিত করছে। এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার যে, আমরা বিরুদ্ধস্রোতে না হেঁটে সবাই যেটা করে সেটা করতেই মনস্থ করি। এক্ষেত্রে আমাদের তাদের সান্নিধ্যের জন্য আকাঙ্ক্ষী হওয়া চলবে না, কারণ তা করলে তাদের সাথে আমাদের নরকে যেতে হবে। যেখানে আমরা স্বর্গে যাচ্ছি দেখেও তারা আমাদের অনুসরণ করতে চাচ্ছে না, সেখানে কেন আমরা তাদের অনুসরণ করে নরকে যাব! আকস্মিক দুর্ঘটনায় অনেকে মারা যাচ্ছে দেখেও কি আমরা বাঁচার চেষ্টা করি না!

(খ) এটি আমাদের শংকিত করে তোলে, কারণ তা মানুষকে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। মৃত্যু, অনন্ত মৃত্যুই এর শেষ পরিণতি। প্রভুর উপস্থিতিতে এরা সব ধ্বংস হয়ে যাবে। পাপের পথের এটাই হচ্ছে গন্তব্য। তাই যদি পাপ করে তা থেকে মন না ফেরাই তবে আমরাও ধ্বংস হয়ে যাব।

(২) এখানে পবিত্রতার পথ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

(ক) যেখানে অনেক কষ্ট, যন্ত্রণা রয়েছে; আসুন সেই পথের বিষয়ে জেনে নিই, যেন

আমরা তাতে স্থির থাকতে পারি। খ্রীষ্ট আমাদের বিশ্বস্ততার সাথে সব বললেন;

প্রথমেই বললেন সরু পথের কথা। এর মাধ্যমে তিনি এক নতুন পথের বিষয়ে বললেন, যেন আমরা পাপের পথ থেকে ফিরে তা দিয়ে প্রবেশ করি এবং বিশ্বাস ও পবিত্রতার জীবনে চলি। পাপের আওতা থেকে কীভাবে আমরা অনুগ্রহের অধীন হই– সে বিষয়ে বলতে গিয়ে, তিনি 'নতুন জন্মের' প্রসঙ্গ টানলেন (যোহন ৩:৩, ৫)। এটা হচ্ছে সরু পথ; তা খুঁজে পাওয়া যেমন কঠিন, তেমনি তাতে প্রবেশ করাটাও কঠিন। অনেকটা দু'টি পাথরের মাঝ দিয়ে পথ করে যাওয়ার মতো (১ শমূয়েল ১৪:৪)। যারা এই পথ ধরে এগিয়ে যায় তারা বদলে যাওয়া নতুন এক জীবনের অধিকারী। পুরাতন সব কিছু মুছে ফেলে তাদের আত্মাকে নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। ফলে তাদের জীবনধারা বদলে গেছে; অসৎ মনোবৃত্তি দূরীভূত হয়েছে। তাদের প্রতিদিনের কাজ-কর্ম এখন বদলে যাওয়া জীবনেরই প্রতিছবি তুলে ধরে।

প্রকৃতপক্ষে সরু পথে হাঁটতে গিয়ে আমরা স্রোতের বিরুদ্ধে লড়ছি এবং তা করাটা আসলেই খুব কঠিন। অনেকটা সংগ্রাম করার মতো। বাস্তবিকই একজন মানুষকে নিজের বিরুদ্ধে লাগানোর চেয়ে গোটা পৃথিবীর বিরুদ্ধে লাগানো সহজ। এটা হচ্ছে সরু পথ, মাথা হেঁট না করে যা দিয়ে প্রবেশ করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে আমাদের শিশুদের মতো হতে হবে; উচ্চাভিলাষী চিন্তাগুলোকে ছোট করে এনে নিজেকে অস্বীকার করতে হবে; স্বভাবতই এই পৃথিবী কিংবা বৃদ্ধেরা তা করতে অভ্যস্ত নয়। খ্রীষ্টের জন্য আমাদের সরু পথের দুঃখ-কষ্টকে মেনে নিতে হবে এবং নিজেদের মধ্যে বিনম্রভাবের প্রকাশ ঘটাতে হবে; কারণ এই পথের যন্ত্রণা-কষ্ট সবার জন্যই সমান। যদিও কারও কারও কাছে তা একটু বেশিই সঙ্কীর্ণ বলে মনে হয়ে থাকে। বিশেষ করে ধনীদের কাছে। এ ছাড়াও তাদের কাছে– যারা দীর্ঘ সময় ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছে। এই পথ সরু; তবুও ঈশ্বরের ধন্যবাদ যে, তা বন্ধ হয়ে যায় নি কিংবা একে তালাবদ্ধ করে ফেলা হয় নি। কিংবা এর সামনে আগুনের তলোয়ারও রাখা হয় নি। কিন্তু নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেলে তা বন্ধ করে দেওয়া হবে (২৫:১০)।

দ্বিতীয়ত, এই পথ সঙ্কীর্ণ। আমরা এই সরু দরজা দিয়ে প্রবেশ করামাত্রই কিন্তু স্বর্গে চলে যাচ্ছি না; কনান দেশে যাওয়ার আগে যিহূদীরা যেভাবে লোহিত সাগরে পা রেখেছিল সেভাবে আমরা কেবল স্বর্গের দিকে এক পা ফেলে অগ্রসর হলাম মাত্র। এরপর আসছে দীর্ঘ মরুযাত্রার ধকল। সমস্যাসংকুল এই সরু পথ ধরে এগুতে হলে আমাদের ঈশ্বরের পরিচালনার ওপর নির্ভর করতে হবে। পাশাপাশি তাঁর স্বর্গীয় নির্দেশের প্রতিও আমাদের বাধ্য থাকতে হবে। তবে সেজন্য নিজেদের অস্বীকার করার বিকল্প নেই। শরীরকে নিয়ন্ত্রণে রেখে সব প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সজাগ থাকতে হবে যেন আমাদের 'চোখ' ও 'হাত' সিদ্ধতার পরীক্ষায় উৎরে যায়। প্রাত্যহিক প্রলোভনগুলোকে দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করে আমাদের 'করণীয়' পালন করে যেতে হবে; প্রকৃতই যা আমাদের মন্দপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কাজ করবে। আমাদের কঠিন যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে। 'তারা যুদ্ধ করবে এবং কষ্ট সহ্য করতে আগ্রহী হবে। তারা চারদিকে লক্ষ্য রাখবে এবং পরিবেশ বুঝে সতর্কতার সাথে পা ফেলবে।' আমাদের ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে; কারণ সরু পথ আসলেই একটি যন্ত্রণাদায়ী পথ, যাতে কাঁটা বিছিয়ে রাখা হয়েছে। তবে মহান ঈশ্বরের গৌরব করি যে, তিনি তাতে দেয়াল তুলে দেন নি। যে শরীর আমরা বয়ে চলি– তা

আমাদের জন্য অন্যায় বয়ে আনে– তা আমাদের কর্তব্যকে কঠিন করে তোলে। কিন্তু দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যদি ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয়, তবে তা অনেকটাই সহজ হয়ে আসে।

তৃতীয়ত, দরজাটি হচ্ছে খুব সরু এবং সঙ্কীর্ণ। এতে অবাক হবার কিছু নেই যে, খুব অল্প লোকই তা খুঁজে পায় এবং তা বেছে নেয়। অনেকেই একে অবহেলায় পাশ কাটিয়ে চলে যায়। কারণ নিজেদের অবস্থা নিয়ে তারা সন্তুষ্ট থাকে; ফলে তা বদলাবার কোন প্রয়োজন ও চেষ্টা তাদের মাঝে লক্ষ্য করা যায় না। আবার অন্যরা এর দিকে তাকিয়েও তা এড়িয়ে যায়; তারা গণ্ডির মাঝে আটকা পড়তে চায় না। যারা স্বর্গে যাচ্ছে তাদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। পাশাপাশি যারা নরকে যাচ্ছে তাদের সাথে এদের সংখ্যার কথা চিন্তা করলে ব্যাপারটা এমনই দাঁড়ায়– এক থোকা আঙ্গুরের বিপরীতে একটি আঙ্গুর। নোহের সময় জাহাজে কেবল আটজনই উঠেছিল (১ পিতর ৩:২০)। এ প্রসঙ্গে সেনেকা বলেন, 'মানুষ যেহেতু জেনেশুনেই পাপের পথে অগ্রসর হয় সেহেতু কেমন করে তাদের কেউ নিরাপদ হতে পারে, যখন তারা বহুজন একত্রে যায় এবং তাও আবার কোন প্রতিবাদ ছাড়াই?' এই পথ অনেককেই নিরুৎসাহিত করে। তারা একা কিংবা আলাদা হতে অনিচ্ছুক। নিজেদের ব্যর্থতা স্বীকার না করে তারা অন্যদের দেখিয়ে বলে, 'এরাও যদি নরকে যায় তবে আমিও না হয় নরকে যাব।'

(খ) এই পথ আমাদের জীবনের দিকে নিয়ে যায়– যা বর্তমানের জন্যও ঈশ্বরের সাহায্য ও সান্ত্বনাদানে সক্ষম। প্রকৃতই এই পথ হচ্ছে আত্মিক জীবন– যা অনন্তকালীন আশীর্বাদে পূর্ণ। যার ভেতরে আশা রয়েছে এবং যার শেষে পথের সমস্ত কষ্ট, ক্লান্তি মুছে যাবে; এখানেই জীবন এবং আশ্চর্য সব দান রয়েছে (২ পিতর ১:৩)। দরজাটি সরু, সঙ্কীর্ণ এবং উঁচু কিন্তু স্বর্গের একটি ঘন্টাই এর ক্ষতিপূরণ দানে সক্ষম।

(২) আমাদের প্রত্যেকের জন্য এই বার্তা ধ্বনিত হচ্ছে, 'তোমরা সরু দরজা দিয়ে যাও'। আমাদের সামনে জীবন-মৃত্যু, ভাল-মন্দ– উভয় পথই পড়ে রয়েছে এবং আমরা জানি এর শেষে কী আছে। তাই আপনার সামনে যখন উপযুক্ত পথটি বেছে নেবার সুযোগ রয়েছে তখন বুদ্ধিপূর্বক তা বেছে নিয়ে তাতে প্রবেশ করুন। তা না হলে আপনার নীরবতাই আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, 'আপনি চওড়া পথে থাকতেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন'। লাখ টাকা দিলেও কেউ যেমন সজ্ঞানে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে চায় না, তেমনি ঝামেলা আছে জেনে বাড়ির মালিকানাও কেউ হাতছাড়া করতে চায় না। তারপরও মানুষ কেন ভুল পথে থাকতেই মনস্থ করে, তা অনেক সময় বুঝে ওঠা যায় না। তাই দেরি না করে সময় থাকতেই সরু দরজা দিয়ে প্রবেশ করুন এবং ধৈর্য ধরে প্রার্থনা ও উপাসনার মধ্য দিয়ে কড়া নাড়তে থাকুন। অপেক্ষা করুন, সেই দরজা অবশ্যই খুলে যাবে। এটা সত্য যে, স্বর্গীয় অনুগ্রহের সাহায্য ছাড়া আমরা কেউ কাউকে সঠিক পথে ফেরাতে পারি না। পাশাপাশি এ-ও সত্য যে, ঈশ্বরের সেই অনুগ্রহ কিন্তু আপনাকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কোন জোর করছে না; বরং আপনাকে স্বাধীনতা-ই দিয়েছে। তাই কষ্টকর হলেও সরু দরজা দিয়ে ঢুকতে প্রাণপণ চেষ্টা করুন (লূক ১৩:২৪)।

মথি ৭:১৫-২০

এখানে আমাদের ভ্রান্ত ভাববাদীদের বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে, যেন তাদের গ্রহণ করে আমরা না ঠকি কিংবা বিনষ্ট না হই। সাধারণত ভাববাদী বলতে যারা ঈশ্বরের মনোনয়ন পেয়ে পবিত্র আত্মার পরিচালনায় ভবিষ্যতের কথা বলেন তাদেরকেই বোঝানো হয়। কিন্তু শাস্ত্রে আমরা এমন ভাববাদীদের কথাও পড়ি যারা ঈশ্বরের মনোনয়ন ও পবিত্র আত্মার পরিচালনা ছাড়া মিথ্যেই তাঁর নামে ভবিষ্যতের কথা বলতো। প্রকৃতপক্ষে এরাই হচ্ছে ভ্রান্ত ভাববাদী। পুরাতন নিয়মে আমরা সিদিকিয়ের বিষয়ে পড়ি, যে ইস্রায়েলের রাজা ও যিহূদার রাজা যিহোশাফটের কাছে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মিথ্যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল (১ রাজাবলি ২২:১১)। সিদিকিয় (মাসেয়ের ছেলে) নামে আরও একজন ভ্রান্ত ভাববাদীর বিষয়ে আমরা যিরমিয় পুস্তকে পড়ি (যিরমিয় ২৯:২১)। কিন্তু ভাববাদীরা যেহেতু তাদের শিক্ষার মধ্য দিয়ে লোকদের তাদের দায়িত্ব সম্পর্কেও বলতেন; তাই এখানে যাদের ভ্রান্ত ভাববাদী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে মূলত ভ্রান্ত শিক্ষা। খ্রীষ্ট ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত একজন ভাববাদীর শিক্ষক এবং তাঁর অনুসারীদের তিনি শিক্ষক হিসেবে পৃথিবীর সর্বত্র পাঠিয়েছিলেন এবং তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যেন তারা সব প্রকার প্রতার-ণার বিরুদ্ধে থাকে; অন্যথায় তাদের সুসমাচার প্রচার -কাজ কিংবা রোগীদের সুস্থ করার কাজ– সব মিথ্যে হয়ে যেত। তাই ভ্রান্ত শিক্ষকরাই এখানে বর্ণিত ভ্রান্ত ভাববাদী । ভ্রান্ত ভাববাদীরা :

১. ঈশ্বরের আহ্বান বা নির্দেশনা না পেয়েও মিথ্যে করে তাঁর নামে লোকদের শিক্ষা দেয়। তারা দাবি করে, ঈশ্বরের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সম্বন্ধ রয়েছে; এবং এর মাধ্যমেই তারা প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পেয়ে থাকে। নিজেদের ভাববাদী হিসেবে দাবি করে তারা আরও বলে যে, তারা স্বর্গীয় অনুপ্রেরণা প্রাপ্ত; অথচ তারা আদৌ তা নয়। যদিও তারা অনেক সময় 'সত্য' শিক্ষা দেয়, তবুও আমাদের এই ভ্রান্ত ভাববাদীদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। যারা বলে 'আমরা প্রেরিত' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা তা নয়– ভ্রান্ত ভাববাদীদের মতো তারা হচ্ছে ভ্রান্ত প্রেরিত (প্রকাশিত বাক্য ২:২)। 'যারা স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের ব্যাপারে মিথ্যে পরিচয় দেয় তাদের ত্যাগ করুন। যাচাই না করে তাদের সাথে চলাফেরা করবেন না; অন্যথায় আপনাকে দেখে আরও অনেকে তাদের সাথে বিপথে যেতে পারে'।

২. খ্রীষ্ট কিন্তু ভ্রান্ত ভাববাদীদের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেন নি। তার স্থলে ভ্রান্ত ভাববাদীদের পরিচয় তুলে ধরে তিনি আমাদের তাদের সম্পর্কে সাবধান করে দিলেন। ভ্রান্ত ভাববাদীদের শিক্ষা খ্রীষ্টের দেওয়া সত্য শিক্ষার সাথে দ্বন্দ্ব তৈরি করে এবং প্রকৃত সত্যকে আড়াল করার চেষ্টা করে। ভ্রান্ত ভাববাদীদের কাজ দেখে মনে হয় তারা পূর্বের ধারণাকে সংস্কার করছে কিন্তু সাধারণত পরেরটি আরও বেশি করে ভ্রান্ততায় ডুবে থাকে; কারণ যে ভ্রান্ততায় ডুবে থাকে বা এর দ্বারা কোন কিছু সাজায় এবং তা বলতে মিথ্যের আশ্রয় নেয় তা আরও সফলভাবে সত্যকে আক্রমণ করে। 'তাই ভ্রান্ত ভাববাদীদের বিষয়ে সাবধান থাকুন, তাদের শিক্ষা যে ভ্রান্ত তা ধরিয়ে দিতে সচেষ্ট হোন। তাদের ভণ্ডামি, ভ্রান্ততা যখন আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে তখন তাদের এড়িয়ে যান; তাদের

সাথে কিছুই করবেন না।' এই প্রলোভনের বিপরীতে আপনি আপনার রক্ষাকবচ পরিধান করুন, যেন নিজেকে ভ্রান্ত শিক্ষার আওতামুক্ত রাখতে পারেন। সাধারণত সংস্কারের সময় এ ধরনের প্রলোভন এসে থাকে। 'যখন স্বর্গীয় আলো অত্যুজ্জ্বল চেহারায়, শক্তিশালী রূপে দেখা দেয়– তখনই এই প্রকার প্রলোভন এসে থাকে।' ঈশ্বরের কাজ যখন উজ্জীবিত হয় তখন শয়তান তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এখানে,

ক. এই সতর্কবাণীর পেছনে একটি চমৎকার কারণ বর্ণিত হয়েছে, তাদের বিষয়ে সাবধান থাক কারণ তারা ভেড়ার চেহারায় আসবে (১৫ পদ)।

১. আমাদের সম্পর্কে সে কারণেই তাদের অনেক বেশি সাবধান থাকতে হবে; কারণ তাদের এই ছল অনেক বেশি পবিত্র ও সত্য বলে মনে হতে বাধ্য এবং যদি আমরা নিজেদের রক্ষা করতে না পারি তবে তা আমাদের প্রবঞ্চনা করতে সক্ষম। তারা ভেড়ার চেহারায় ভাববাদীদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসবে। 'ভেড়ার চেহারা' বলতে এখানে মূলত সরল, সাদাসিধে, নিরীহ অভিব্যক্তির কথাই বোঝানো হয়েছে; কারণ এখন তারা ছলনা করবার জন্য ভাববাদীদের মতো পশমের পোশাক পড়বে না (সখরিয় ১৩:৪); এলিয়ের চাদরকে সেপ্টুয়াজিন্টে 'ভেড়ার চামড়া' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা অবশ্যই মানুষকে তাদের পোশাকী রূপ দেখে মূল্যায়ন করব না; কারণ ফরীশীরা বাহ্যিক সাজপোশাকের সুবিধা নিতে সিদ্ধহস্ত ছিল; তারা লম্বা আলখাল্লা গায়ে চড়াতে ভালবাসতো (লূক ২০:৪৬)। আবার ভেড়ার চামড়া দিয়ে হয়তো মানবীয় বৈশিষ্ট্যের কথাই বোঝানো হয়েছে– তারা ভেড়ার মতো নিষ্পাপ, নিরীহ একটা চেহারা নেবে, বিনম্রতার ভান করবে। তাদের সবকিছুই ভাল দেখা যাবে, তবে তা বাইরে থেকে। তা অনেকের মাঝে ছড়িয়েও যেতে পারে। তারা কেবল মানুষকে ছলনা করবে এবং পোশাক বা মেকী স্বভাবের সুবিধা নিয়ে ভেড়ার দলে প্রবেশ করবে। ফলে তারা অন্যদের বিপথে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবে। ভ্রান্ত ভাববাদীরা এবং তাদের ভুলগুলো বাঁধানো থাকে পবিত্রতার নমুনা ও এবাদতে। শয়তান স্বর্গদূতের উজ্জ্বল চেহারা নিতে পারে (২ করি ১১:১৩, ১৪), ভেড়ার মতো তার শিং আছে (প্রকা ১৩:১১); তার মুখ মানুষের মতো (প্রকা ৯:৭, ৮); কুমন্ত্রণাদাতার ভাষা এবং বাহন যেন নরম উলের মতো (রোমীয় ১৬:১৮; ইশা ৩০:১০)।

২. কারণ এই ছলনার অধীনে তাদের সাজ ঘৃণার্হ ও খারাপ, ভেতরে তারা রাক্ষুসে নেকড়ে বাঘের মতো। প্রত্যেক ভণ্ড হচ্ছে ভেড়ার পালে ঢুকে পড়া ছাগল; তা ভেড়া নয় কিন্তু ভেড়ার পালের ক্ষতি করে, তাদের ছড়িয়ে দেয় এবং ছিন্নভিন্ন করে (যোহন ১০:১২)। তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে এবং অন্যের কাছ থেকে আলাদা করে লোকদের বিপথে নিয়ে যায়। তারা আমাদের কোন বিশ্বাস দ্বারা প্রতারণা এবং বিভ্রান্ত করে ভুল করতে উৎসাহ দেয়। তাদের ছলনা আমাদের আত্মাকে বিপথে নিয়ে যায়। পৌল তাদের হিংস্র নেকড়ের সাথে তুলনা করেছেন (প্রেরিত ২০:২৯)। তারা খ্রীষ্টের সেবা না করে নিজেদের পেটের সেবা করে (রোমীয় ১৬:১৮); তারা আপনাকে লুটে নেবে এবং আপনার বিরুদ্ধে জয়ী হতে চাইবে। এখন যদিও একে সহজ বলে মনে হচ্ছে তবুও তার মোকাবেলা করা বিপজ্জনক; কারণ এর ফলে প্রতারিত হবার ভয় থাকে। তাই এদের কাছ থেকে সাবধান হোন।

খ. এখানে এই সতর্কবাণীতে কীভাবে আমরা ভ্রান্ত ভাববাদীদের এড়াতে পারি– সে বিষয়ে বলা হয়েছে। আমরা অবশ্যই তাদের যাচাই করে দেখব (১ থিষলনীকীয় ৫:২১)। বিশেষত তাদের জীবনকে যাচাই করে দেখব (১ যোহন ৪:১)। ভ্রান্ত ভাববাদীদের এড়িয়ে

চলার ক্ষেত্রে সাহায্যের জন্য এখানে আমরা একটি কষ্টি পাথর পাই, 'তোমরা তাদের জীবনে যে ফল দেখা যায় তা দিয়েই তাদের যাচাই করতে পারবে' (১৬-২০)। পর্যবেক্ষণ করুন,

১. খ্রীষ্ট এখানে ফল দ্বারা গাছ চিনে নিতে বললেন। আপনি সবসময় তাদের বাকল কিংবা পাতা দেখে যাচাই করবেন না কিংবা শাখা-প্রশাখা দেখেও মূল্যায়ন করবেন না। কিন্তু তাদের ফলই আপনাকে বলে দেবে যে, তারা কী জাতের গাছ। যেমন ফল, তেমন গাছ। মানুষ পেশাগত জীবনে তাদের প্রবৃত্তির ওপর চাপ প্রয়োগ করে এবং নিজেদের সত্তার নীতির সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় কিন্তু তাদের কাজের গতি-প্রকৃতিই তাকে বলে দেয় কোনটা বেছে নিতে হবে। খ্রীষ্ট এর মাধ্যমে আমাদের গাছ এবং ফলের বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বলছেন।

(১) যদি আপনি গাছের পরিচয় সম্পর্কে জানেন তবে আপনি তা থেকে সেই ফলই আশা করবেন। কখনো কাঁটাঝোপে আঙ্গুর কিংবা শিয়ালকাঁটায় ডুমুর খুঁজবেন না; কারণ তা সম্ভব নয়। কাঁটাঝোপে বেশি হলে একটি আপেল কিংবা আঙ্গুরের থোকা ঝুলতে দেখা যেতে পারে; সেইভাবে খারাপ লোকের কাছেও সত্য বাক্য কিংবা তার কাজ দেখা যেতে পারে। কিন্তু আপনি নিশ্চিত থাকবেন যে তা সেখানে জন্মায় নি। মনে রাখুন,

(ক) দুর্নীতিপরায়ণ, অপবিত্র, ক্ষুব্ধ হৃদয় হচ্ছে কাঁটাঝোপ বা শিয়ালকাঁটার মতো– যা থেকে পাপ বেরিয়ে আসে। প্রকৃতই যা কোন কাজে দেয় না; তা নিষ্ফলা এবং শেষে তা চুলোয় জ্বালানো হয়।

(খ) ভাল কাজ হচ্ছে ভাল ফল; অনেকটা আঙ্গুর বা ডুমুর ফলের মতো, তা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে এবং মানুষের উপকার করে।

(গ) এই ভাল ফলগুলো কখনো একজন খারাপ লোকের কাছ থেকে আশা করা যায় না; এর চেয়ে নর্দমায় সুগন্ধ খোঁজা সহজ। তারা চায় একটি প্রভাবক, গ্রহণযোগ্য নীতি। মন্দ ধনের ভেতর কেবল মন্দতাই থাকে।

(২) অপরদিকে যদি আপনি জানেন ফল কী, তবে আপনি তার দ্বারা নির্বাচন করতে পারেন সেটা কোন্ গাছের। ভাল গাছ কখনো মন্দ ফল দেয় না। কিন্তু এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে কোন্টা স্বাভাবিক উপায়ে এসেছে আর কোন্টা মেকি। এটা চেনা খুবই জরুরি। নইলে পরে দেখা যাবে, যাকে ভাল বলা হল, তার গোড়াটাই হয়তো খারাপে পূর্ণ। তাই স্বতস্ফূর্তভাবে যা বেরিয়ে আসে এবং যা স্থায়ী কিছু তার দিকে লক্ষ্য রাখা জরুরি। নইলে আরোপিত কিছু আমাদের বিভ্রান্ত করতে পারে। মানুষকে চেনা যায় কেবল তার নির্দিষ্ট কতগুলো কাজের মাধ্যমেই নয় বরং তার গতি-প্রকৃতি-ব্যবহারের মাধ্যমে এবং স্বতস্ফূর্ত কাজের মাধ্যমে। যা মূলত আরোপিত নয় এবং যা তাদের নিজস্ব এবং তা কাউকে দেখানোর জন্য নিজেকে খাঁটি বলে প্রমাণের জন্য করা হয় না।

২. এটা প্রয়োগ করতে হবে ভ্রান্ত ভাববাদীদের চেনার জন্য।

(১) হুমকি এবং ভুল পথ দ্বারা (১৯ পদ)। যে গাছে ভাল ফল ধরে না তা কেটে ফেলা হবে। এই কথা আমরা বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কণ্ঠেও শুনি (৩:১০)। খ্রীষ্ট এই কথাকে অন্যভাবে বলতে পারতেন কিংবা এর বিকল্প কিছু বলতে পারতেন, কিন্তু তিনি যোহনের অভিব্যক্তিই ব্যবহার করলেন; এতে তিনি নিজেকে অশ্রদ্ধা দেখালেন না। তাই প্রচার কারীদেরও এভাবে প্রচার করা উচিত; তারা যেন উচ্চাভিলাষী হয়ে নতুন নতুন অভিব্যক্তি

তৈরিতে ব্যস্ত না থাকেন; কারণ তা হলে মানুষ হয়তো ভিন্নভাবে তা অনুবাদ করবে; একই কথা লেখা কিংবা বলা কোন সমস্যা নয়; বরং সেটা সহজেই লোকদের রক্ষা করে। এখানে

(ক) নিষ্ফলা গাছের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে; যেগুলো কোন ভাল ফল দেয় না। যদিও তাতে ফল আছে কিন্তু যেহেতু তা ভাল নয়, তাই সেই গাছকে এখানে বলা হয়েছে নিষ্ফলা গাছ।

(খ) এখানে সেই নিষ্ফলা গাছের পরিণতির বিষয়ে বলা হয়েছে; নিশ্চিতভাবেই তাদের কেটে ফেলা হবে এবং আগুনে পোড়ানো হবে। শুকনো গাছের ক্ষেত্রে মানুষ যা করে ঈশ্বর তাদের নিয়ে ঠিক সেই কাজটিই করবেন; এতে করে মাটির বোঝা লাঘব হবে। তিনি তাদের তালন্ত কেড়ে নিয়ে ক্ষোভের সাথে তাদের ছাল তুলে ফেলবেন এবং মৃত্যু দ্বারা তাদের কাটবেন; অতঃপর নরকের আগুনে ফেলে দেবেন। এই আগুন ঈশ্বরের ক্রোধ বয়ে আনে এবং তা এই নিষ্ফলা গাছকে খাদ্য বানাবে (যিহিষ্কেল ৩১:১২, ১৩; দানিয়েল ৪:১৪; যোহন ১৫:৬)।

(২) তাদের পথ যাচাই করার মাধ্যমে; তাদের ফল দ্বারা তোমরা তাদের চিনবে।

(ক) তাদের জীবনের ফল দ্বারা, তাদের কথা, তাদের কাজ এবং ব্যবহার। যদি আপনি জানেন তারা ঠিক না ভুল, তবে পর্যবেক্ষণ করুন তারা কীভাবে জীবন যাপন করে; তাদের কাজকে পরীক্ষা করুন– যা হয় তাদের পক্ষে, নয় বিপক্ষে যাবে। ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকরা মোশির চেয়ারে বসে লোকদের ব্যবস্থা শিক্ষা দিত, কিন্তু যেহেতু তারা এ কারণে গর্বিত এবং ঈর্ষান্বিত ছিল, ফলে তারা ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছিল। এ কারণেই তাদের মন কঠিন হয়ে উঠেছিল। সে কারণেই খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের ফরীশীদের খামি থেকে সাবধান থাকতে শিক্ষা দিয়েছিলেন (মার্ক ১২:৩৮)। মানুষ যদি ভাববাদী হবার জন্য অন্যায্য ছলনা করে এবং নিজেদের ভাববাদীত্ব প্রমাণে ব্যর্থ হয় তবে তারা খ্রীষ্টের ক্রুশের জন্য ভাল বন্ধু বলে বিবেচিত হয় না। তারা মুখে যত ভাল শিক্ষাই দিক না কেন, মূলত তাদের পেটই হচ্ছে তাদের ঈশ্বর; আর তাদের মন প্রার্থিব জিনিস দ্বারা পূর্ণ থাকে (ফিলিপীয় ৩:১৮, ১৯)। বাস্তবিকই তারা ঈশ্বরের কথা বলে না, কারণ ঈশ্বর তাদের পাঠান নি। তাদের জীবনই বলে দেয় যে, তারা মন্দ আত্মার দ্বারা পরিচালিত। ঈশ্বর মাটির পাত্রে সম্পদ পুরে দিয়েছেন কিন্তু তা খারাপ পাত্রে নয়। ভ্রান্ত ভাববাদীদের কথায় ও কাজে মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। মুখে ঈশ্বরের বাক্য বললেও কাজে তার কোন প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় না।

(খ) তাদের শিক্ষার ফল দ্বারা; তারা ভাববাদীদের মতো শিক্ষা দেয় কিন্তু এটাই একমাত্র উপায় নয় কিন্তু এটা কেবল একটা পথ; যদি তারা তা পালন করে তবেই তারা ঈশ্বরের হবে, নইলে নয়। তারা কী করতে চায়, তাদের উদ্দেশ্য কী? ঈশ্বরের শিক্ষা মোতাবেক কাজ তারা কেন করছে না। এর দ্বারা তারা কী প্রমাণ করে? এর ফলে মানুষ তো বিভ্রান্ত হয়। যদি তাদের শিক্ষা ঈশ্বরের হয় তবে খ্রীষ্টীয় অনুগ্রহ দ্বারা বিনম্রতা, একাগ্রতা, পবিত্রতা, দয়া এবং ভালবাসায় পূর্ণ থাকে; কিন্তু যদি কেউ কেবল লোকের কাছ থেকে বাহবা পাওয়ার জন্য ভাববাদী হিসেবে ঈশ্বরের বাক্য বলে কিন্তু নিজের জীবনে তা না থাকে তবে তো তারা নিজেদেরই ঠকাচ্ছে। পাশাপাশি তাদের কাজ যদি লোকদের বিরক্ত করে, ক্ষতি করে তবে তো কিছুই হল না। যদি তারা একে নিজেদের লালসার কাজে লাগায় এবং লোকদের বিপথে নিয়ে যায়, এমনকি নিজের পরিবারেও তার চর্চা করে না অর্থাৎ সরু পথে হাঁটে না– তবে আমরা তার সমাপ্তি টানব; কারণ তারা যা বলছে তা

ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে নি (গালা ৫:৮)। এই জ্ঞান স্বর্গের নয় (যাকোব ৩:১৫) কারণ স্বর্গীয় জ্ঞানে বিশ্বাস ও বিবেচনা একত্রে থাকে (১ তিমথীয় ১:১৯; ৩:৯)।

মনে রাখুন, স্ববিরোধিতায় পূর্ণ সংশয়যুক্ত শিক্ষাকে প্রতিহত করতে হলে আমাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও পরিচালনার ওপর নির্ভর করতে হবে। পাশাপাশি নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। যে মতামত ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে না, তা আমাদের পাপের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু আমরা যদি ফল দ্বারা ভ্রান্ত ভাববাদীদের চিনতে ব্যর্থ হই, তবে বিকল্প উপায় হিসেবে আমাদের তাদের সাক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে এবং তা খ্রীষ্টের শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা মিলিয়ে দেখতে হবে।

মথি ৭:২২-২৯

এখানে আমরা এই দীর্ঘ, চমৎকার শিক্ষার সমাপ্তি দেখতে পাই। খ্রীষ্ট এখানে তাঁর আদেশের প্রতি আবশ্যকীয় বাধ্যতার প্রসঙ্গ টানলেন– অনেকটা নখ চেপে ধরে সেটা যে ঠিক জায়গায় আছে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার মতো। তিনি তাঁর অনুসারীদের, যারা তাঁর প্রচার শোনার জন্য তাঁকে অনুসরণ করতো– তাদের তাঁর আদেশের বাধ্য হতে নির্দেশ দিলেন। যদি তিনি চাইতেন মানুষ তাঁর প্রশংসা করুক, তবে তা তিনি কেবল বললেই হতো; কিন্তু তিনি যে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে এসেছিলেন তা কেবল কথার ব্যাপার নয় বরং শক্তির (১ করিন্থীয় ৪:২০)। তাই কিছু ব্যাপার অত্যাবশ্যকীয়।

ক. তিনি সোজা কথায় জানিয়ে দিলেন, বাহ্যিক ধর্মচর্চা কেবল লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিন্তু সেটা আমাদের স্বর্গ পাইয়ে দেয় না, যদি না ঈশ্বরের সাথে আমাদের যোগাযোগ সম্বন্ধ অটুট থাকে। খ্রীষ্টের হাতেই বিচারের চাবি, তাই জীবন ও মৃত্যুর নতুন দিক ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা তিনি রাখেন এবং সে অনুযায়ী মানুষকে বিচারও করতে পারেন। এখানে তারই গাম্ভীর্যপূর্ণ ঘোষণা এল। লক্ষ্য করুন,

১. কারা স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করবে– সে সম্বন্ধে খ্রীষ্ট তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করলেন, 'যারা আমাকে প্রভু প্রভু বলে তারা প্রত্যেকে যে অনুগ্রহ ও গৌরবে পূর্ণ স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে, তা নয় (২১ পদ)।' এটা হচ্ছে সেই প্রশ্নের উত্তর, 'তোমার আবাসতাম্বুতে কে দাঁড়াবার যোগ্য?' (গীত ১৫:১)। মণ্ডলীর বিজয় তাহলে কোথায়? খ্রীষ্ট এখানে দেখালেন,

(১) মানুষের সামনে, প্রার্থনার সময় খ্রীষ্টকে কেবল মুখে 'প্রভু' সম্বোধন করাই যথেষ্ট নয়। তবে তার মানে এই নয় যে, আমরা তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেব না; আমরা অবশ্যই তাঁকে 'প্রভু' বলবো; কারণ তিনি তা-ই (যোহন ১৩:১৩)। কিন্তু এটাই কি কাউকে স্বর্গে নিয়ে যেতে পারে! এটা কেবল বাহ্যিক শিষ্টাচার; যদি হৃদয়ে সেই শ্রদ্ধার প্রকাশ না ঘটে তবে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কাউকে শ্রদ্ধা জানানোটা মানুষের সমাজে নৈমিত্তিক বিষয়। এখানে শ্রদ্ধা বিনিময়ের একটা ব্যাপারও লক্ষ্য করা যায়; কিন্তু প্রকৃতই সেই শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ ঘটে না। যেখানে মানুষ নিজেদেরই মুখে মুখে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে সেখানে খ্রীষ্টকে এর চেয়ে বেশি আর কী দেখাতে পারে? প্রার্থনায় আমরা ঈশ্বরকে 'প্রভু' সম্বোধন করি; কিন্তু যদি বাহ্যিক শ্রদ্ধাবোধের সাথে অন্তরের মিল না থাকে তবে আমরা ঝনঝন করা করতালের মতো শব্দ করছি। তার মানে এই নয় যে, আমরা তাঁকে প্রার্থনার সময় 'প্রভু'

বলা বাদ দেব কিংবা খ্রীষ্টকে 'প্রভু' বলে মহিমান্বিত করব না; বরং আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে মুখের শ্রদ্ধাপ্রকাশ যেন অন্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

(২) চিরস্থায়ী সুখের জন্য আমাদের খ্রীষ্টের ইচ্ছামতো চলা উচিত– যা তাঁর স্বর্গীয় পিতারও ইচ্ছা। খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে 'পিতা' বলে ডাকার অধিকার লাভ করি; সুসমাচার আমাদের এই অধিকারটুকু পাইয়ে দেয়। যেহেতু ঈশ্বর আমাদের পিতা, তাই তাঁর নির্দেশ পালনে আমাদের আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন। ঈশ্বর চান যেন আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাসে স্থির থাকি, নিজেদের পাপ স্বীকার করি এবং তার জন্য অনুতাপ করি, পবিত্র জীবন যাপন করি এবং অন্যদের ভালবাসি। অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছা– আমরা যেন পরিষ্কৃত হয়ে পবিত্রতায় চলি। এখন যদি আমরা খ্রীষ্টের ইচ্ছামতো না চলে তাঁকে 'প্রভু' বলে সম্বোধন করি, তবে আমরা তাঁকে উপহাস করি; যেমনটা তাঁর গায়ে দামি জুব্বা পরিয়ে 'কি যিহূদীদের রাজা' বলে লোকেরা উপহাস করেছিল। বলা আর করা দু'টো ভিন্ন বিষয়, প্রায়ই মানুষের ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় দেখা যায়, সেই ছেলেটির মতো যে যাচ্ছি বলেও যায় নি (২১:৩০ পদ)। কিন্তু এই দু'টো বিষয়কে ঈশ্বর তাঁর আদেশের মাঝে রেখেছেন। তাই কেউ যদি কথা ও কাজের অমিল করে তবে যেন সে স্বর্গ আশা না করে।

২. এই আদেশের বিপরীতেও ভণ্ডদের অজুহাত রয়েছে; তারা তাদের বাধ্যতার নজির দেখাতে চাইবে (২২ পদ)। সেই মহান দিনে যখন মানুষ আবার উঠবে এবং সবার গোপনীয়তা মুছে যাবে তখন এই ভণ্ডরা তাদের পাপ ঢাকতে এই অজুহাত দেবে। কিন্তু খ্রীষ্ট তাদের শক্তিমত্তা-দুর্বলতা সম্পর্কে জানেন। তাদের হৃদয় এখন যা নিয়ে ব্যস্ত সেটাই তাদের বিচারের দিনের পরিণতি; কিন্তু তাদের স্বর্গ-লাভের সেই ইচ্ছা ব্যর্থ হবে। তারা সেদিন আত্মবিশ্বাস নিয়ে খ্রীষ্টকে 'প্রভু' বলে সম্বোধন করে নিজেদের বক্তব্য পেশ করবে, 'প্রভু, তুমি কি জান না যে,

(১) আমরা তোমার নামে ভাববাদী হিসেবে কথা বলেছি?' হ্যাঁ, সেটা হতে পারে সত্য; বিলিয়ম এবং কাইয়াফাও ভাববাদী হিসেবে কথা বলেছিল এবং শৌল ভাববাদীদের মাঝে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়েছিল; তবুও তা তাদের রক্ষা করতে পারে নি। তাদের ভাববাদী হিসেবে কথা বলাও ছিল ঈশ্বরের নামে কিন্তু ঈশ্বর তাদের পাঠান নি। তারা কেবল নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই ঈশ্বরের নাম ব্যবহার করেছিল। মনে রাখুন, কেউ প্রচার কারী হতেই পারে, সে হয়তো তা করার তালন্ত পেয়েছে এবং বাহ্যিক আহ্বান পেয়েছে। হতে পারে এতে কিছু সাফল্যও তার খাতায় যোগ হয়েছে; যদিও সে খারাপ তবুও অন্যদের স্বর্গের দিকে যেতে সাহায্য করছে। তবুও আখেরে সে নিজে তা হারাচ্ছে।

(২) আমরা তোমার নামে ভূত ছাড়িয়েছি?' এটাও অনেকটা সেরকম, যিহূদাও মন্দ-আত্মাগ্রস্তদর ভাল করেছে যদিও সে ছিল নরকের সন্তান। অরিগেন বলেন, 'খ্রীষ্টের নামে ভূত ছাড়ানোটা সে সময় খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল; কিন্তু কখনও কখনও খারাপ খ্রীষ্টানরা তা করতে গিয়ে ব্যর্থ হতো।' নিজে ভূতগ্রস্ত হওয়ার পরও মানুষ অন্যদের থেকে ভূত ছাড়াতে পারে– তবে অজুহাত হিসেবে সেটা খুবই দুর্বল।

(৩) আমরা তোমার নামে অনেক চিহ্ন-কাজ করেছি?' সাধারণত বিশ্বাসের দ্বারাই চিহ্ন -কাজ সাধিত হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে বিশ্বাসকে বিচার করা হয় না। ভালবাসা ও বাধ্যতায় এই বিশ্বাস কাজ করে। মানুষকে এই পৃথিবীতে ভাববাদী হিসেবে কথা বলার এবং অসুস্থদের আরোগ্য করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর খাঁটি ও পবিত্র

কিছুকেই গ্রহণ করেন। পাহাড় সরানো অথবা মানুষ কিংবা স্বর্গদূতদের ভাষায় কথা বলার চেয়ে অনুগ্রহ ও ভালবাসার পথ অনেক চমৎকার (১ করিন্থীয় ১৩:১, ২)। চিহ্ন-কাজ না করেও মানুষ অনুগ্রহে স্বর্গ লাভ করতে পারে, কিন্তু অনুগ্রহ ছাড়া চিহ্ন-কাজ দিয়েও স্বর্গ পাওয়া যায় না। তাদের হৃদয়ের প্রকৃত অবস্থাটা দেখুন; তারা তাদের কাজের প্রতি আত্মবিশ্বাসী ছিল, ফলে একেই তারা যথেষ্ট বলে মনে করতো। শিষ্যদের চিহ্ন-কাজ দেখে শিমোনও অবাক হয়েছিল (প্রেরিত ৮:১৩) এবং সেই ক্ষমতা পাবার জন্য সে তাদের টাকা সেধেছিল।

দেখুন, এমন নয় যে অজুহাত দেবার মতো অনেক ভাল কাজ তারা করেছে: তাই তারা যে অনেক দয়া ও আশীর্বাদের কাজ করেছে তা বলতে পারবে না। তাদের একটি কাজও হয়তো তাদের পাশমার্ক দিত কিন্তু অবাধ্যতার কারণেই তারা তা তা হারাবে। চিহ্ন-কাজ এখন বন্ধ হয়েছে এবং সেই সাথে এই অজুহাতও; কিন্তু তবুও মিথ্যেবাদী হৃদয় এই ভিত্তিহীন আশায় নিজেদের উৎসাহিত করে যায়।। তারা মনে করে, তারা স্বর্গে যাবে কারণ তারা ধর্মশিক্ষকদের কাছ থেকে ভাল অভিধা পেয়েছে। তারা উপবাস রেখে, দান দিয়ে এবং মণ্ডলীতে সাড়ম্বর উপস্থিতির নজির রেখে লোকদের কাছে নিজেদের 'ধার্মিক' বলে পরিচয় করিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু ভেতরে যে তারা জগতমুখী চিন্তায় আচ্ছন্ন– সেদিকে কর্ণপাত করতে মোটেই উৎসাহী নয়। তাদের অন্তরের গর্ব এবং লালসাই তাদের বিচার করবে। তাদের আত্মবিশ্বাস হচ্ছে বেথেল (যিরমিয় ৪৮:১৩); তারা পবিত্র পাহাড়ের ব্যাপারে গর্ববোধ করে (সফনিয় ৩:১১)। বড়াই করে বলে যে, তারা ঈশ্বরের থাকবার ঘর (যিরমিয় ৭:৪)। তাই বাহ্যিকতার ওপর আমাদের ভরসা করা চলবে না; কারণ এতে করে আমরা হয়তো নিজেদের প্রতারিত করতে পারি; যার মূল্য আমাদের দিতে হতে পারে অনন্তকালীন শাস্তিকে গ্রহণ করে।

৩. খ্রীষ্ট এখানে আইনপ্রণেতা হিসেবে ভণ্ডদের সেই অজুহাত প্রত্যাখ্যান করলেন (২১ পদ) এবং তাদের শাস্তির কথা উল্লেখ করলেন (২৩ পদ)। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট এখানে সবার সামনে অধিকারের সাথে সেই মহান দিনের কথা বললেন, যেদিন তিনি এই ভণ্ডদের বিচার করতে গিয়ে বলবেন, 'আমি তোমাদের চিনি না, আমার সামনে থেকে দূর হও।' ভণ্ডরা পৃথিবীতে যত কাজ করে তা অনেককে বিস্মৃত করলেও তা আসলে কোন উদ্দেশ্য থেকে পরিচালিত– সে বিষয়ে খ্রীষ্ট বেশ ভালভাবেই অবগত আছেন। লক্ষ্য করুন,

(১) বিচারের দিনে তিনি তাদের প্রত্যাখ্যান করবেন, কারণ তারা যা-ই করেছে তা পরিচালিত হয়েছে মন্দ উদ্দেশ্য থেকে। মনে রাখুন, সুনামের জন্য মানুষ মন্দ উদ্দেশ্য থেকেও ভাল ভাল কাজ করতে সক্ষম। তাই যারা নিজেদের ভেতর পাপ পুষে রেখে বাইরে ভাল দেখিয়ে বেড়ায় তারা প্রকৃতই ভণ্ডামি করছে এবং সেকারণেই তারা ধ্বংস হবে। বিচারের দিনে এদের চেয়ে কথিত পাপীদের অবস্থা অনেক ভাল হবে।

(২) খ্রীষ্ট যে-কথা বলে তাদের প্রত্যাখ্যান করবেন– 'আমি তোমাদের চিনি না, আমি তোমাদের নিজের জন্য বেছে নিইনি; যখন তোমরা আমার নামে ঈশ্বরের বাক্য বলেছ তখনও নয়; কারণ নিজেদের কাজ নিয়ে তোমরা যে গর্বিত হয়েছ ও আত্মশ্লাঘায় ভুগেছ-তা আমি জানি।' তার এই কথায় প্রকাশ পায় যে, যদি তিনি তাদের কখনও চিনতেন, যেভাবে মনিব তার দাসদের চেনেন, তাদের বেছে নিতেন এবং ভালবাসতেন তবে শেষের দিনেও তাদের ভালবাসতেন, চিনতেন। কিন্তু তিনি তাদের চিনবেন না কারণ তিনি তাদের ভণ্ড

হিসেবে চেনেন এবং যিহূদার মতো তাদেরও হৃদয় থেকে দূর করে দিয়েছিলেন; তাই তিনি বলবেন, 'আমার কাছ থেকে দূর হও'। খ্রীষ্টের কি এরকম অতিথির প্রয়োজন আছে? তিনি যখন মানুষের বেশে পৃথিবীতে এসেছিলেন তখন পাপীদের তাঁর কাছে আহ্বান করেছিলেন (৯:১৩); কিন্তু তিনি যখন পুনরায় গৌরবের সাথে আসবেন তখন তাঁর কাছ থেকে পাপীদের দূর করে দেবেন। যারা তাঁর কাছে রক্ষা পেতে আসবে না, তারা তাঁর কাছ থেকে দূরে চলে যাবে এবং তার মানে নরকে যাওয়া। এটা হচ্ছে সমস্ত নিরাশা ও কষ্টের ভিত্তি– যা খ্রীষ্টকে মধ্যস্থ হিসেবে পেয়ে সুবিধা লাভের মৃত্যু ঘটায়। যারা প্রকৃতই খ্রীষ্টকে কাজে প্রকাশ করবে না, তিনি তাদের সেই বিচারের দিনে গ্রহণ করবেন না। দেখুন, কত উচ্চাশা থেকে কত নিচে– অসুখে পতন! স্বর্গের এত কাছে গিয়ে তারা কীভাবে নরকে যাবে! তাই এটা সব খ্রীষ্টানদের প্রতি সাবধানবাণী। একজন প্রচারকারী, যিনি ভূত তাড়ান এবং চিহ্ন-কাজ করেন– তিনিও খ্রীষ্টের কাছে তার অবিশ্বস্ততার কারণে প্রত্যাখ্যাত হতে পারেন। যদি আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকি, তবে তিনি আমাদের গ্রহণ করবেন। কেউ পাপের পথে থেকে খ্রীষ্টের সাথে যোগাযোগ সম্বন্ধ রক্ষা করে চলতে পারে না। তাই বিশ্বাসীদের নিজেদের মন থেকে সব প্রকার মন্দ উদ্দেশ্য তাড়াতে হবে।

খ. খ্রীষ্ট এখানে একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকার বিষয়টি দেখালেন। যদি আমরা প্রকৃতই তাঁর ইচ্ছেমতো কাজ করি, তবে তা আমাদের উৎসাহিত করে, অন্যথায় আমাদের মন খারাপ করে দেয় (২৪– ২৭)।

১. যারা খ্রীষ্টের কথা শুনছিল-তারা এই দুই ভাগে ছড়িয়ে ছিল। খ্রীষ্ট মিশ্র জনতার মাঝে কথা বলছিলেন এবং এভাবে তিনি তাদের আলাদা করলেন, একজন থেকে অন্যজন; যেভাবে তিনি বিচারের দিনে করবেন, যখন সমস্ত জাতি তাঁর সামনে আনীত হবে। বর্তমান সময়েও খ্রীষ্ট একইভাবে তাঁর আত্মা, বাক্য, নিদর্শন দ্বারা স্বর্গ থেকে কথা বলছেন এবং যারা শুনছে তারাও এদের মতো দু'দলের।

(১) কেউ তা শুনে পালন করে; ঈশ্বরের ধন্যবাদ যে, তারা আছে, যদিও তুলনায় তারা অল্প। তাঁর কথা শুনে তারা তা ফিরিয়ে দেয় না বরং মান্য করে। খ্রীষ্টের শিক্ষা শুনে আমাদের তা পালন করার কথা মনে রাখতে হবে। তাঁর কথা শুনতে পাওয়াও গৌরবের, যারা শোনে তারা দয়া পাবে (১৩:১৬, ১৭)। কিন্তু সেই বাক্য শুনেও তা পালন না করলে সেই দয়া অনর্থক হয়ে যাবে। তাঁর বারণ শুনে আমরা পাপ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হই এবং তিনি যা করতে বলেছেন তা করার মাধ্যমে সেই অনুগ্রহকে অর্থপূর্ণ করে তুলি। চিন্তার সাথে কথা এবং কথার সাথে যদি কাজের মিল থাকে তবেই আমাদের মনোবৃত্তি স্বচ্ছ অবয়ব লাভ করে। আমাদের জীবনের সার্থকতাও এখানেই। তাই খ্রীষ্টের সুসমাচার অনুযায়ী আমাদের জীবনকে সাজাতে হবে; অর্থাৎ তাঁর সমস্ত আদেশের প্রতি বাধ্য থেকে সেগুলো পালন করে যেতে হবে। তা কেবল আমাদের চোখের আলোই নয় উপরন্তু আমাদের দাঁড়িয়ে থাকার শক্তিও। তা কেবল বিচারের জন্যই সাজানো হয় নি বরং আমাদের হৃদয়কে নতুনভাবে জীবনের দিকে পরিচালিত করেছে। তাই জীবনের সাথে এই বোধকে যুক্ত না করলে তা বিশ্বাস করাটাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। খ্রীষ্টের কথা শুনে তা বোঝাটাই যথেষ্ট নয়। ঈশ্বরের বাক্য শোনা, মনে রাখা, বারবার আওড়ানোর দ্বারা আমরা স্বর্গে যেতে পারি না; স্বর্গের প্রবেশাধিকার পেতে চাইলে আমাদের তাঁর বাক্য শুনে তা পালনও করতে হবে। এর ফলেই আমরা বাঁচব। কিন্তু যারা তা শোনে এবং পালন করে

তারা দয়া পাবে (লূক ১১:২৮; যোহন ১৩:১৭)। খ্রীষ্ট তাদের নিজের পরিবারের লোক বলে স্বীকৃতি দেবেন (১২:৫০)।

(২) এখানে অন্য একদলের কথা বলা হয়েছে যারা খ্রীষ্টের কথা শোনে, কিন্তু তা পালন করে না; তাদের ধর্মকর্ম কেবল শোনার মাঝে এবং তা সেখানেই থেমে যায়। তারা অনেকটা রিকেটস্ রোগে আক্রান্ত শিশুর মতো; যাদের বোধ জড়তায় আচ্ছন্ন; তারা কোন পরিণত চিন্তা করতে পারে না; ফলে কিছু শুনলেও তা গুলিয়ে ফেলে। যেহেতু তাদের হাড়ের সংযোগ খুবই দুর্বল এবং ভারী হয়ে থাকে সেহেতু অল্পেই তারা অবসন্ন হয়ে পড়ে। এছাড়া কোন ভাল কাজেই তারা উদ্দীপিত হয় না। তারা ঈশ্বরের বাক্য শোনে অনেকটা পথ জানতে চাওয়ার মতো করে। এভাবে তারা নিজেদের ধার্মিক পরিগণিত করতে চায় ((যিহিষ্কেল ৩৩:৩০,৩১; ইশা ৫৮:২)। এর মধ্য দিয়ে তারা মীখার মতো নিজেদেরই প্রতারিত করে, যে লেবীয় হিসেবে ঈশ্বরের পুরোহিত হওয়ায় আত্মতুষ্টিতে ভুগতো, কিন্তু প্রকৃতই ঈশ্বর তাঁর সাথে ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে এদের হৃদয়ে ঈশ্বরের বাক্যের বীজ বপন কোন কাজে আসে না; বীজ বপন করা হয়েছে কিন্তু তা কখনও অঙ্কুরিত হয় না। তারা এমন লোকের মতো যে আয়নায় মুখ দেখে পরক্ষণেই তা ভুলে যায় (যাকোব ১:২২, ২৩) । এভাবে তারা নিজেদের আত্মার সাথে প্রবঞ্চনা করে। কারণ আমাদের কাজ যদি ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বাধ্যতাকে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়, তবে তা আমাদের অবাধ্যতার ছবিই তুলে ধরে। যারা খ্রীষ্টের কথা শুনে তা পালন করে না, তারা স্বর্গের অর্ধেক পথে বসে থাকে এবং তাদের সেই যাত্রা আর শেষ হবে না। তারা খ্রীষ্টের পরিবারের তবে 'সৎ সন্তান'। স্বভাবতই সৎ ছেলে উত্তরাধিকার পায় না।

২. এখানে সেই দুই প্রকার লোক তাদের আসল চরিত্র নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, যাদের 'নির্মাতা' হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। এদের মধ্যে যে জ্ঞানী সে পাথরের ওপর তার ঘর তৈরি করল এবং প্রচণ্ড ঝড়ের বিপরীতেও তা টিকে থাকল; অপরদিকে মূর্খ তার ঘর নির্মাণ করল বালুর ওপর; ফলে ঝড় এলে তা বিনা প্রতিরোধে পড়ে গেল।

এখন, (১) খ্রীষ্টের এই দৃষ্টান্ত আমাদের তাঁর শিক্ষার প্রতি বাধ্য থাকতে নির্দেশ দেয়। পাহাড়ের ওপর তাঁর দেওয়া শিক্ষার বিরুদ্ধে যাওয়া চলবে না। অনেকের কাছে এর কোন কোনটি পালন করা অসম্ভব বলে মনে হলেও তা দেখে পিছিয়ে আসা যাবে না। নিজেদের জীবনে এই ব্যবহারিক শিক্ষার প্রয়োগ ঘটানো ছাড়া আমরা কোনমতেই খ্রীষ্টের সন্তুষ্টি লাভ করতে পারি না। খ্রীষ্টের আদেশ পালনের মাধ্যমে আমরা সামনের দিনগুলোর জন্য একটি শক্ত ভিত্তি স্থাপন করি (১ তীমথিয় ৬:১৯)। এই ভিত্তিকে আমরা বন্ড হিসেবে ভাবতে পারি, কারণ তা প্রকৃতই আমাদের পরিত্রাণপ্রাপ্তির কথা বলে; যে পরিত্রাণ আমরা নিজেদের কোন কাজের দরুন পান নি; বরং ঈশ্বর-ই তাঁর অনুগ্রহে আমাদের তা দিয়েছেন। তাই মরিয়মের মতো আমাদেরও খ্রীষ্টের পায়ের কাছে বসে তাঁর আদেশ শুনতে ও পালন করতে উদগ্রীব হতে হবে। তাঁকে বলতে হবে, 'প্রভু, আপনি বলুন, আমি শুনছি'।

(২) খ্রীষ্টের দেওয়া দৃষ্টান্ত আমাদের শিক্ষা দেয়–

(ক) যেন আমরা প্রত্যেকেই স্বর্গে ঘর নির্মাণ করতে অগ্রসর হই। কারণ এর ফলে আমাদের চিন্তা, মনোযোগ, আশা, কাজ– সবই একে ঘিরে আবর্তিত হবে। তাছাড়া খ্রীষ্টের আদেশ পালনে কখনও যদি ব্যর্থ হই, তখন আমরা এই ঘরের স্বপ্ন-প্রত্যাশায়, স্বর্গীয় আনন্দে ঘুরে দাঁড়াব। মোটকথা খ্রীষ্টের প্রতি বাধ্যতাকে আমাদের চিরস্থায়ী বৈশিষ্ট্যে রূপ

দিতে হবে। তবে আমাদের চিন্তার সাথে বাইরের পৃথিবীর চিন্তা মিলবে না। তারা এই পৃথিবীর জন্য ঘর তৈরি করে, কারণ চিরকাল তারা এখানেই থেকে যেতে চায়। অন্য পৃথিবীর জন্য কোন ভাবনা-কাজও হাতে নেয় না। অপরদিকে যারা পৃথিবীয় ভাবনাকে পরিত্যাগ করে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতায় নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করে, তারা শেষ পর্যন্ত সফল হয়; কারণ তারা স্বর্গে যেতে সক্ষম হয়।

(খ) এখানে আমাদের পাথরের ওপর ঘর তুলতে বলা হয়েছে, আর খ্রীষ্ট-ই হচ্ছেন সেই পাথর। একমাত্র তিনিই আমাদের ভিত্তি হতে পারেন, আর কেউ নয় (যিশাইয় ২৮:১৬; ১ করিন্থীয় ৩:১১)। তিনি আমাদের আশা (১ তীম ১:১)। তাই খ্রীষ্টের প্রতি বাধ্য থেকে পাপের ক্ষমা পাবার জন্য আমাদের তাঁর ক্ষমতার ওপর নির্ভর করতে হবে হবে। সুসমাচারে আমরা খ্রীষ্টকে কেবল পরিত্রাণকর্তা হিসেবেই নয় উপরন্তু আমাদের সংশোধনকারী, জীবনের পরিচালক হিসেবেও পাই; যে কারণে খ্রীষ্ট-ই সমস্ত বিশ্বাসীর ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপরই মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত। তিনি পাথরের মতোই শক্তিশালী ও অনড়। আমরা যদি তাঁর ওপর নির্ভরতা স্থাপন করি এবং তা কখনো আমাদের আশাকে লজ্জিত করবে না।

(গ) যারা খ্রীষ্টের কথা শুনে তা পালন করে এবং সেই পাথরে তাদের আশা রাখে– তারা জ্ঞানীর পরিচয় দেয়। খ্রীষ্টই পিতার কাছে যাওয়ার একমাত্র উপায় এবং বিশ্বাসে বাধ্যতা স্থাপনই খ্রীষ্টের কাছে যাওয়ার একমাত্র পথ। কারণ যারা তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের তিনি অনন্তকালীন পরিত্রাণ উপহার দেন। যারা খ্রীষ্টে ভিত্তি গাঁথে, যারা তাকে রাজা ও পরিত্রাণকর্তা হিসেবে মানে এবং তাঁর সব নির্দেশ মেনে চলে তারা খ্রীষ্টকে লাভ করবে। তাই ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য লাভে আমাদের খ্রীষ্টের ওপর ভিত্তি গাঁথতে হবে। পাথরের ওপর ঘর তৈরি করতে অনেক যত্ন এবং শ্রম দিতে হয়, তাই যারা তাদের নির্বাচন-আহ্বানকে ফলপ্রসূ করতে চায় নিশ্চিতভাবেই তাদের অধ্যবসায়ী হতে হবে। শক্ত ও সঠিক ভিত্তি নির্বাচন করে তাতে ঘর তৈরির কাজ কেবল শুরুতেই সীমাবদ্ধ না রেখে তা শেষ করাটাও জরুরি; কারণ তারাই জ্ঞানী নির্মাতা যারা গাঁথতে শুরু করে এবং শেষ করে (লূক ১৪:৩০)।

(ঘ) অনেকেই বলেন যে, তারা স্বর্গে যাবে। কিন্তু তারা এই পাথরকে অবজ্ঞা করে বালুর ওপর ঘর তৈরি করে। এতে অধ্যবসায়ের কোন ব্যাপারই লক্ষ্য করা যায় না। ফলে সেটা তাদের পতনই সূচিত করে। কারণ, খ্রীষ্ট ছাড়া আর সবই বালু। ঈশ্বরের আনুকূল্য লাভে অনেকে মিথ্যেই তাদের জাগতিক ধনের ওপর ভরসা রাখে (হোশেয় ১২:৮)। আবার অন্যরা বাহ্যিক ধর্মচর্চায় তাদের কাজের সুযোগ উপভোগ করে। বস্তুত একে তারা নিজেদের সুনাম কুড়ানোর উপায় হিসেবে নেয়। তাদের খ্রীষ্টীয় বলা হয়; কারণ তারা বাপ্তিস্ম নেয়, মণ্ডলীতে যায়, খ্রীষ্টের বাক্য শোনে, প্রার্থনা করে ইত্যাদি; অথচ তারা প্রকৃতই খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বস্ত-বাধ্য নয়, তাই তাদের ভিত্তি বালুর ওপরই প্রতিষ্ঠিত। স্বর্গীয় আশার খুব অল্পই তাতে মজুদ থাকে, কারণ তা হয় দুর্বল।

(ঙ) এখানে একটি ঝড় আসার কথা বলা হয়েছে, যা আমাদের আশাকে বিনষ্ট করতে চাইবে, প্রত্যেকের কাজকে যাচাই করবে (১ করিন্থীয় ৩:১৩) এবং প্রত্যেকের ভিত্তি খুঁজে বার করবে (হবক্কুক ৩:১৩)। বৃষ্টি, বান এবং বাতাস এই ঘরের ওপর দিয়ে যাবে। আমরা যখন পৃথিবীতে পরীক্ষারূপ বিভিন্ন দুঃখভোগ, নির্যাতনের মুখোমুখি হই তখন বুঝতে হবে

সেই ঝড় এসে গেছে। সে সময় যদি আমাদের কথায় ও কাজে মিল থাকে, বিশ্বাসের ভিত শক্ত থাকে– তবেই আমরা ঝড়ের বিপরীতে অবিচল থাকতে সক্ষম হব। যাহোক, মৃত্যু ও বিচারের মতো আমাদের জীবনে এই ঝড়ের আগমন সুনিশ্চিত।

(চ) যারা খ্রীষ্টে ভিত্তি গাঁথবে তারা প্রচণ্ড ঝড়েও অনড় থাকবে; কারণ খ্রীষ্ট নিজেই তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেবেন। তিনি তাদের পরিত্যাগ করবেন না, দুঃখ পেতে দেবেন না। তার কাজ কখনও ম্লান হবে না, তার সান্ত্বনা কখনও ব্যর্থ হবে না। বরং তারা তাঁর শক্তিতে শক্তিমান হবে, যেভাবে একটি আত্মার নোঙ্গর স্থির থাকে। যখন তিনি শেষ মিলনে আসবেন তখন তাদের আশা মৃত্যু এবং কবরের ভয়মুক্ত হয়ে তাঁর সাথে সানন্দে অন্ধকার উপত্যকা পার হয়ে যাবে। তারা বিচারে পরীক্ষাসিদ্ধ হবে, তারা মহান দিনে অটলভাবে পরীক্ষিত হয়ে দাঁড়াবে। শেষ অব্দি তারা খ্রীষ্টের সাথে চিরকালীন গৌরব লাভে অগ্রসর হবে (২ করিন্থীয় ১:১২; ২ তীমথিয় ৪:৭, ৮)। সেই প্রজা ধন্য, যাকে প্রভু এসেও কাজ করতে দেখবেন।

(ছ) যারা বোকা লোকের মতো আশা করবে তাদের সেই আশা পূর্ণ হবে না; খ্রীষ্ট তাদের হবেন না। তারা নিশ্চিতভাবেই সেই ঝড়ে পড়ে যাবে। সেই ঝড়ের বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকার কোন সাফল্য বা তৃপ্তি তাদের থাকবে না। বিচারের দিনে নিজেদের অবিশ্বস্ততার পক্ষে কোন যুক্তিও তারা দেখাতে পারবে না। 'ঈশ্বর যখন তাঁর প্রতি ভয়হীনদের শেষ করে দেন তখন সেই ভণ্ডদের আশা কোথায় থাকবে? (ইয়োব ২৭:৮)। ভণ্ডদের আশা অনেকটা মাকড়সার জালের মতো; কারণ সে তাঁর ওপর স্থিরভাবে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে না (ইয়োব ৮:১৪, ১৫)। যে সময় তার একটা আশ্রয়ের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সেই ঝড়ের সময়ই তার ঘরখানা পড়ে যায়। সেটা এমন এক সময় পড়ে যায় যখন নতুন করে আরেকটা বানানোর সময় পাওয়া যায় না। একজন খারাপ মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে তার চাওয়াগুলোও ধ্বংস হয়ে যায়। নির্মাতার জন্য এ বড় হতাশার কথা যে, প্রয়োজনের মুহূর্তে তার ঘর কোন সেবা দিতে পারলো না। উপরন্তু পড়েও গেল। যারা সত্যিকারভাবে খ্রীষ্টে নিজেদের জীবনভিত্তি গাঁথবে এবং স্বর্গের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে তারা শেষ অব্দি সফলকাম হবে।

গ. শেষ দুই পদে আমরা খ্রীষ্টের শিক্ষা শুনে লোকদের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা লক্ষ্য করি। বস্তুত এ শিক্ষা ছিল অসাধারণ– উপস্থাপনা, গভীরতায়, সৌন্দর্যে ও সত্যতায়। এটা অনুমিত যে, খ্রীষ্ট এখানে যা লেখা হয়েছে তার চেয়েও বেশি বলেছেন এবং সন্দেহ নেই যে এটা তাঁর মুখ থেকেই বেরিয়েছে। যে মুখ ও ঠোঁট আশীর্বাদে পূর্ণ। এখন,

১. তাঁর শিক্ষা শুনে লোকেরা অবাক হয়ে গেল। এটা ভয়ের যে, কিছু লোকই তা ধারণ করে তাঁকে অনুসরণ করেছিল। কিন্তু খ্রীষ্টের শিক্ষা শুনে তারা যে অবাক হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। মনে রাখুন, অনেকে ভাল প্রচার শুনে তার প্রশংসা করলেও তা গ্রহণে উদযোগী হয় না; ফলে তাদের অন্তর কখনও পরিষ্কৃত হয় না।

২. লোকেরা অবাক হয়েছিল, কারণ খ্রীষ্ট অধিকার আছে এমন ব্যক্তির মতোই প্রচার করেছিলেন। নিশ্চিতভাবেই তা ফরীশীদের মতো ছিল না; কারণ তারা ভান করতো যে, তারা অন্যদের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতা পেয়েছে। এর সাথে তারা তাদের বাহ্যিক বেশভূষা যুক্ত করতো, কিন্তু তারপরও তাদের প্রচার শুনে আরোপিত, হীন, নীরস বলে মনে হতো। তারা অধিকারবিহীন শিক্ষকের মতো কথা বলতো, কারণ এই বাক্য তো তাদের

নয়; খ্রীষ্টের মতো তা তাদের মধ্য থেকেও আসে নি। স্কুলছাত্র যেভাবে তার পড়া মুখস্থ বলে যায় সেভাবেই তারা শিক্ষা দিয়ে যেত। কিন্তু খ্রীষ্ট অধিকারের সাথে 'রায়' দিচ্ছেন এমন শিক্ষক ও বিচারকের মতোই প্রচার করলেন। তাঁর শিক্ষাই ছিল নিয়ম, তাঁর কথাই ছিল আদেশ। পাহাড়ের ওপর খ্রীষ্ট যে সক্ষমতা দেখিয়েছিলেন তা ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। তাই তিনি যখন বলেন, 'আলো হোক', তখন নিশ্চিতভাবেই চারপাশ আলোকিত হয়ে যায়।

মথি লিখিত সুসমাচার
অধ্যায় ৮

আগের অধ্যায় ক'টিতে সুসমাচার-লেখক মথির লেখনিতে আমরা খ্রীষ্টের প্রচারের বিষয়ে জানতে পেরেছিলাম; এবারে আমরা তাঁর কয়েকটি চিহ্ন-কাজ দেখব– যা প্রমাণ করে যে, খ্রীষ্ট ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত শিক্ষক এবং অসুস্থ পৃথিবীর জন্য মহান আরোগ্যকারী। এই অধ্যায়ে আমরা দেখি,

(১) খ্রীষ্ট একজন চর্মরোগীকে (১-৪ পদ),
(২) অবশরোগী ও জ্বরে আক্রান্ত পিতরের শাশুড়িকে সুস্থ করলেন (৫-১৮ পদ);
(৩) দু'জন ব্যক্তির সাথে আলাপচারিতা– যারা তাঁকে অনুসরণ করতে আগ্রহপ্রকাশ করেছিল (১৯-২২ পদ);
(৪) ঝড়ের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ (২৩-২৭ পদ) এবং
(৫) ভূতে পাওয়া লোকেরা তাঁর স্বর্গীয় ক্ষমতায় সুস্থ হল।

মথি ৮:১-৪

এখানে প্রথম পদটি বিগত অধ্যায়ের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। খ্রীষ্টের শিক্ষা শুনে লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হল; ফলে খ্রীষ্ট যখন পাহাড় থেকে নেমে আসলেন তখন তারাও তাঁকে অনুসরণ করল। যদিও আইনপ্রণেতা হিসেবে তিনি ছিলেন কঠোর ও বিশ্বস্ত সমালোচনাকারী তবুও লোকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তাঁর কাছে আসল। শুধু তা-ই নয়, এই লোকেরা তাঁর সঙ্গ ছাড়তেও ছিল অনিচ্ছুক। মনে রাখুন, লোকেরা খ্রীষ্ট– যিনি তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন– তাঁর কাছে 'ভাল' বলে পরিগণিত হতে ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিল। বাস্তবিকই যারা খ্রীষ্টের বিষয়ে অনেক জানে তারা তাঁকে আরও বেশি করে জানার আগ্রহ-প্রকাশ করে। তাই তাঁকে অনুসরণ করার মাধ্যমে আমরাও তাঁকে আরও বেশি করে জানতে পারি। খ্রীষ্টের পেছনে লোকদের এই অনুগমন আমাদের অনেক উৎসাহ জোগায়; যেহেতু খ্রীষ্টের কাছ থেকে শিক্ষা লাভের এই সুযোগ তারা হাতছাড়া করতে চায় নি। সবাই যেভাবে 'ভাল' কিছুর প্রতি আকর্ষণ বোধ করে সেভাবে তারা খ্রীষ্টের মুখ থেকে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে শোনার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিল; ফলত তারা খ্রীষ্টের পেছনে পেছনে গেল। তাই একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, যারা ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে জানার এবং সেখানে পৌঁছানোর জন্য অন্তরে তাগিদ অনুভব করেন তারা তাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে খ্রীষ্টকে বেছে নেবেন। ফলশ্রুতিতে খ্রীষ্ট তাদের যেখানে নিয়ে যাবেন কিংবা যেখানে যেতে বলবেন তারা সেখানেই যাবেন। এখন, খ্রীষ্ট সম্পর্কে যাকোব যে ভবিষ্যদ্বাণীটি করেছিলেন তা পূর্ণ হল– 'লোকেরা তাঁর সামনে জড় হবে।' তথাপি এদের সবাই কিন্তু খ্রীষ্টকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরল না কিংবা নিজেদের তাঁর 'শিষ্য' হিসেবে স্বীকৃতি দিল না। তার জায়গায় নিতান্তই হাতেগোনা ক'জন মানুষ তাঁকে ঘনিষ্ঠ ভাবে অনুসরণ করেছিল। খ্রীষ্টের সেই অল্প সংখ্যক 'ডকখ্য' বা 'শিষ্য'দের সাথে এই বিশাল সমাবেশের কোন তুলনা হয়তো চলে না কিন্তু তাঁকে অনুসরণকারীর সংখ্যা যে ব্যাপক ছিল তা এখানে দৃশ্যমান।

এই পরিচ্ছেদে আমরা দেখি, খ্রীষ্ট একজন চর্মরোগীকে সুস্থ করলেন। সুসমাচার-লেখক মার্ক এবং লূকও এই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন (মার্ক ১:৪০ এবং লূক ৫:১২)। তবে ঘটনাক্রমের বিবেচনায় তাদের সাথে সুসমাচার-লেখক মথি ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি খ্রীষ্টের পাহাড়ের ওপর দেওয়া শিক্ষার পরই এই পরিচ্ছেদটি অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ মথির বিবেচনায় প্রথমে এসেছে খ্রীষ্টের দেওয়া শিক্ষা এবং তারপর তাঁর করা বিভিন্ন চিহ্ন-কাজ। যদিও সময়ের বিচারে এর কোন কোনটি কিছু আগে ঘটেছে তবুও মথি কিভাবে বর্ণনা করেছেন তা মাথায় রাখলে, তা কোন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে না। খ্রীষ্টের চিহ্ন-কাজের উল্লেখ করতে গিয়ে সুসমাচার-লেখক মথি প্রথমেই চর্মরোগীর সুস্থতা লাভের ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করলেন। তখনকার সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষিতে এর অবশ্য প্রয়োজনও ছিল–

১. কারণ, যিহূদীরা বিশ্বাস করতো যে, কু'রোগ হচ্ছে ঈশ্বরের ক্ষুব্ধতার ফল। প্রকৃতপক্ষে যিহূদীদের মাঝে কু'রোগের যে প্রাদুর্ভাব আমরা লক্ষ্য করি তা স্পষ্টতই ঈশ্বরের অসন্তুষ্টির কথা বলে। পুরাতন নিয়মে আমরা মিরিয়াম, গেহাজি এবং উষিয়ের বিষয়ে পড়ি– যাদের ঈশ্বর বিশেষ পাপের কারণে এই রোগ দিয়ে আঘাত করেছিলেন। তাই যেহেতু খ্রীষ্ট দেখাতে চাইলেন যে, পাপকে দূরে সরিয়ে নেবার মাধ্যমে তিনি পাপীদের ওপর থেকে ঈশ্বরের ক্রোধ সরিয়ে নিতে এসেছেন, তাই একজন চর্মরোগীকে সুস্থ করার মাধ্যমে তিনি তাঁর চিহ্ন-কাজ শুরু করলেন।

২. কারণ, এই রোগকে মনে করা হতো ঈশ্বরের হাত থেকে ত্বরিৎ নেমে আসা শাস্তি; তাই তাঁর হাত দিয়েই সেই শাস্তিরূপ রোগ দূরীভূত হল এবং চিকিৎসকেরা যে রোগ সারিয়ে তুলতে পারে নি, তিনি তা-ই করলেন; তা-ও আবার সদাপ্রভুর পুরোহিতদের সামনে। তাঁর এই আরোগ্যকাজ ফরীশীদের সন্দিগ্ধ চোখের সামনেই ঘটলো যেন তারা এই কাজের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারে; কারণ তারা দেখতে চাইছিল– সদাপ্রভু কী করতে পারেন। বর্তমানে আমরা 'কু'রোগ' সম্বন্ধে যা জানি তার চেয়ে তখনকার এই রোগের প্রকৃতি ছিল অনেকটাই ভিন্নতর; তা পোশাকে কিংবা বাড়ির দেয়ালেও দেখা দিত– যা আসলেই ছিল অলৌকিক। এ প্রসঙ্গে ইস্রায়েলের রাজা বলেছিলেন, 'আমি কি ঈশ্বর? আমি কি এই চর্মরোগীকে সুস্থ করতে পারি?' (২ রাজাবলি ৫:৭)। অনেককে খারাপ চর্মরোগ থেকে সুস্থ করে এবং তাঁর শিষ্যদেরও তাঁর নামে কু'রোগীদের সুস্থ করার ক্ষমতা দিয়ে খ্রীষ্ট নিজেকে 'ঈশ্বর' হিসেবে প্রমাণ করলেন। খ্রীষ্টের কাছ থেকে ক্ষমতা পেয়ে শিষ্যরাও কু'রোগীদের সুস্থ করেছিলেন (১০:৮); যা আমাদের কাছে খ্রীষ্টের স্বরূপ তুলে ধরে (১১:৫ পদ)। চর্মরোগীটিকে সুস্থ করার মাধ্যমে তিনি যে মানুষকে পাপের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে এসেছেন সেই অনন্য বার্তাটি ধ্বনিত হল; কারণ প্রতিটি রোগই হচ্ছে পাপের ফল এবং এই রোগ কোন ব্যক্তির পাপে নিমজ্জিত থাকার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এর মাঝেও কু'রোগের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল– তা ব্যক্তিকে 'অপবিত্র' বলে লোকসমক্ষে গণিত করতো। এর ফলে শারীরিকভাবে কষ্ট ভোগ করার পাশাপাশি রোগীর মানসিক স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়তো; অসীম যন্ত্রণাবোধে সে তখন ক্রমেই আড়ষ্ট হয়ে পড়তো ও নিজেকে লুকাতে পালাবার পথ খুঁজতো; যদিও এর কোন আবশ্যকতা ছিল না, কারণ যাবতীয় পবিত্র জিনিসের সংস্পর্শ থেকে তাকে অস্পর্শনীয় দূরত্বে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়া হতো। ফলশ্রুতিতে, একাকীত্ব, বিচ্ছিন্নতাবোধে নিজেকে অবাঞ্ছিত ভেবে এই অভিশপ্ত জীবন কাটানোকেই সে নিয়তি বলে ধরে নিত। বাস্তবিকই আর কোন রোগের ফলেই এরূপ অবর্ণনীয় দুঃখভোগ করতে হতো

না। কু'রোগীদের প্রতি যিহূদী সমাজের এই বৈরী মনোভাব ও আচরণের হেতু হচ্ছে ব্যবস্থাশাস্ত্র (লেবীয় ১৩ এবং ১৪)– যেখানে একে কেবল রোগ হিসেবেই নয় উপরন্তু একে অপবিত্রতার প্রতীক হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রদত্ত মানদণ্ড অনুসারে 'পবিত্র' এবং 'অপবিত্র' উচ্চারণ করার মাধ্যমে পুরোহিতেরা লোকদের পৃথক করতো। কিন্তু অপবিত্র চর্মরোগীদের পুনরায় পবিত্রীকরণের উপায় অথবা সম্ভবনা– এর কোনোটিই সেই পুরোহিতদের জানা ছিল না। তাদের সেই অক্ষমতাই এখানে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে সম্মানিত করল– যিনি আমাদের সব কাজের মহাপুরোহিত কেবল তার কাছেই চর্মরোগীদের 'পবিত্র' করার সম্মান বরাদ্দ ছিল। ব্যবস্থা যা করতে ব্যর্থ হয়েছিল তিনি সেই কাজটিই করতে এসেছিলেন। 'মানুষের পাপ-স্বভাবের কারণে ব্যবস্থা প্রকৃতই শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল' (রোমীয় ৮:৩)। ব্যবস্থা মূলত পাপ উন্মোচিত করে (যেহেতু ব্যবস্থা হচ্ছে পাপ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান) এবং পাপীদের 'অপবিত্র' বলে ঘোষণা করে। এ ছাড়াও ব্যবস্থা তাদের বন্দি করে রাখে (গালা ৩:২৩); যেমনটা ফরীশীরা চর্মরোগীদের ক্ষেত্রে করতো। কিন্তু এর বেশি তারা আর কিছুই করতে পারতো না। তাদের নিয়মানুবর্তিতা ও ব্যবস্থাচর্চা অপবিত্রদের 'পবিত্র' করতে পারতো না; কিন্তু খ্রীষ্ট পাপকে দূরীভূত করে আমাদের তা থেকে পবিত্র করলেন এবং এভাবে তিনি যারা তাঁর রক্তে পরিষ্কৃত হয়েছে তাদের চিরকালের জন্য খাঁটি করলেন। এখন এখানে আমরা দেখি–

ক. চর্মরোগীটি খ্রীষ্টের সামনে এল। যেভাবে এই ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে তা ধরলে– অর্থাৎ পাহাড়ের ওপর খ্রীষ্টের শিক্ষাদানের পর– অনুমান করা যেতে পারে, যিহূদীদের নিয়ম অনুযায়ী যদিও চর্মরোগীটি ইস্রায়েলের শহরগুলোর বাইরে ছিল তবুও সে খ্রীষ্টের শিক্ষার বিষয়ে শুনে তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে উৎসাহিত হয়েছিল; কারণ সে খ্রীষ্টের বিষয়ে শুনেছিল যে, তিনি অধিকারের সাথে শিক্ষা দিয়েছেন, ফলে তার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হল যে, তিনি তাকে সুস্থ করতে পারবেন। তাই সে তাঁর কাছে আসল এবং তাঁর সামনে উবুড় হয়ে পড়লো, যিনি স্বর্গীয় ক্ষমতায় পূর্ণ ছিলেন। এরপর সে খ্রীষ্টের উদ্দেশে বলল, 'প্রভু, চাইলেই আপনি আমাকে আরোগ্য করতে পারেন।' খ্রীষ্ট তার সুস্থতার বিষয়টি যে বিবেচনা থেকে নিয়েছিলেন তা হচ্ছে–

১. সাংসারিক অনুগ্রহ, এই অনুগ্রহ ছিল তার দেহের জন্য; তা থেকে মুক্তি দিতে। কারণ এই রোগ তাকে স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল এবং তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। তাই চর্মরোগীর এই উক্তি আমাদের খ্রীষ্টের কাছে কেবল নিজেদের প্রয়োজনের কথা তুলে ধরার বিষয়েই বলে না উপরন্তু কীভাবে আমরা তাঁর কাছে নিজেদের সমর্পণ করব– সে বিষয়েও শিক্ষা দেয়। খ্রীষ্ট আমাদের রোগমুক্ত করতে পারেন, সেই ক্ষমতা তার আছে। তাই তাঁর ক্ষমতার প্রতি আস্থা রেখে অর্থাৎ তিনি যে আমাদের আরোগ্য করতে সক্ষম– সেই বিশ্বাসটুকু নিয়ে সেই চর্মরোগীর মতো আমাদেরও তাঁর কাছে নিজেদের আবেদন তুলে ধরতে হবে– 'প্রভু, তুমি চাইলে আমাকে আরোগ্য করতে পার।' পৃথিবীতে থাকাকালীন তাঁর করা বিভিন্ন চিহ্ন-কাজ তাঁর ক্ষমতার প্রতি আমাদের বিশ্বাস আনয়ন করতে ও তাঁর ইচ্ছার প্রতি বাধ্য হতে শিক্ষা প্রদান করে। সাংসারিক অনুগ্রহ হিসেবে আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারি না যে, আসলেই তা আমাদের পক্ষে যাবে কি না। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা তাঁর ক্ষমতার বিষয়েও নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারি না, কারণ আমাদের খাঁটি স্বভাব ও তাঁর গৌরবের নিরিখে তাঁর ক্ষমতা অসীম

এবং সেই ক্ষমতার প্রকাশও ঘটে কোনোরূপ সীমারেখা না মেনে। তবে তাঁর ইচ্ছা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে না পারলেও তাঁর প্রজ্ঞা ও অনুগ্রহের ওপর আমরা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি। এর ফলে আমরা তাঁর কাছে নিজেদের সানন্দেই সমর্পণ করতে পারি, 'তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হোক'। আর তা আমাদের প্রত্যাশাকে সহজ করে দেয় এবং আমাদের জীবনে যা ঘটে তা মেনে নিতে ও তাতে সন্তুষ্ট থাকতে সাহায্য করে।

২. সত্যিকারের ক্ষমা। পাপ হচ্ছে আত্মার কু'- তা আমাদের ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ ছিন্ন করে, যিনি আমাদের সাথে সম্পর্কোন্নয়ন ঘটাতে চান। তাই এটা আশু প্রয়োজন যেন আমরা এই কু'থেকে পরিষ্কৃত হই এবং সেটা প্রকৃতই আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ বিষয়। এখন লক্ষ্য করুন, যেভাবে আমরা রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বড় ডাক্তারের কাছে যেতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি, সেভাবে খ্রীষ্টের কাছে নিজেদের সমর্পণ করার মাধ্যমে আমরা মনে স্বস্তি লাভ করি যে, তিনি চাইলে আমাদের পরিষ্কার করতে পারেন এবং আমরা অবশ্যই বিনম্রতার সাথে সুদৃঢ় বিশ্বাসে তাঁর কাছে অবনত হয়ে তা করতে বলব। আর তা হচ্ছে,

(১) আমরা অবশ্যই নিশ্চিত বিশ্বাসে তাঁর ক্ষমতার ওপর নির্ভর করব যে, খ্রীষ্ট আমাদের পরিষ্কার করতে পারেন। ঈশ্বরের ধার্মিকতায় অবিচল থাকার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার চেয়ে বড় ভুল আর হতে পারে না; তেমনি তাঁর অনুগ্রহের প্রতি বাধ্য না থাকাটাও নিকৃষ্টতম কাজ বলে গণ্য হয়। ঈশ্বর তাঁর হাসপাতালে এমন কোন চিকিৎসককে নিয়োগ দেন না যিনি তার কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ধারণ করেন না।

(২) আমরা অবশ্যই তাঁর দয়ার কাছে নিজেদের সমর্পণ করব; তবে কোন পাওনাদারের মতো আমরা তাঁর কাছে এই দয়া চাইতে পারি না, বরং বিনম্রতার সাথে তাঁর আনুকূল্য চাইতে পারি, 'প্রভু, যদি তুমি চাও; আমি আমাকে তোমার চরণে রেখেছি এবং যদি আমি মরি তবে ওখানেই মরব'।

খ. খ্রীষ্ট চর্মরোগীর আবেদনের যে প্রত্যুত্তর করলেন তা ছিল দয়াযুক্ত (৩ পদ)।

১. তিনি হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করলেন। তখনকার সময়ে কুৎসিদর্শন কু'রোগীকে ঘৃণার চোখে দেখা হতো, তবুও খ্রীষ্ট তাকে স্পর্শ করলেন; কারণ তিনি কর-আদায়কারী ও পাপীদের সাথে ওঠা-বসা কিংবা তাদের ভাল করতে অস্বীকৃতি জানান নি। চর্মরোগীকে স্পর্শ করার মাধ্যমে খ্রীষ্ট যিহূদীদের প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করলেন; কারণ যিহূদীসমাজে একে দূষণীয় বলে ধরা হতো। কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর জীবনাচরণ দ্বারা প্রমাণ করে দেন যে, পাপীদের সাথে ওঠা-বসা করার পরও তিনি তাদের দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হন নি। ফলে এই পৃথিবীর শাসনকর্তা তাঁর মাঝে কোন দোষ খুঁজে পান নি। আমরা যদি গরম আলকাতরা ছুঁই তবে আমাদের শরীর ক্ষতিগ্রস্ত হয়; কিন্তু খ্রীষ্ট ছিলেন পাপীদের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক, এমনকি তিনি তাদের সাথে মেশার পরও।

২. তিনি বললেন, 'আমি তা-ই চাই, তুমি শুচি হও।' তিনি একথা বললেন না, যেমনটা এলিয় নামানকে বলেছিলেন, 'যাও, যর্দন নদীতে গিয়ে নিজেকে ধুয়ে ফেল'; খ্রীষ্ট তাকে বিরক্তিকর, সমস্যাসংকুল, শারীরিক কোন কসরতের ঝামেলায় ফেলেন নি; বরং শুধুমাত্র মুখের কথায় তাকে সুস্থ করলেন।

(১) তাঁর এই কথাটি ছিল দয়ায় পূর্ণ, 'আমি তা-ই চাই, আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই, যেমনটা তোমার প্রয়োজন।' মনে রাখুন, যারা খ্রীষ্টের দয়া ও অনুগ্রহের কাছে বিশ্বাসে নিজেদের সমর্পণ করে তাদের ক্ষেত্রে খ্রীষ্ট যে দ্বিধাহীনভাবে সেই অনুগ্রহ ও দয়াকে

তাদের দেবেন– তা নিশ্চিত। খ্রীষ্ট এমন একজন চিকিৎসক যাকে দাবি জানাতে হয় না। তাকে সবসময়ের জন্য পাওয়া যায়। তাঁকে কোন কিছু বুঝিয়ে বলারও প্রয়োজন পড়ে না। আমাদের কথা কথা তিনি মনোযোগ সহকারে শোনেন। তবে সেজন্য তাঁকে কোন ফি দিতে হয় না। তিনি বিনামূল্যে সুস্থ করেন। তাঁর এই কাজ কোন পুরস্কার বা ব্যক্তিবিশেষকে প্রাধান্য দিয়ে সাধিত হয় না। তাঁর দৃষ্টিতে রাজা ও প্রজার মাঝে কোন পার্থক্য নেই; তাঁর সাহচর্য-সাহায্য উভয়ের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রতিফলিত হয়। তিনি সম্ভাব্য সব কিছু করে দেখিয়েছেন যে, তিনি চাইলেই পাপীদের রক্ষা করতে পারেন, কারণ তিনি সমর্থ।

(২) তিনি ক্ষমতার সাথে বললেন, 'তুমি শুচি হও'। শক্তি ও অধিকার উভয়ের মিলনে এই বাক্যের প্রয়োগ ঘটেছে। খ্রীষ্ট আমাদের তাঁর এই নির্দেশের বলে সুস্থ করেছেন, 'তুমি ভাল হও, শুচি হতে আগ্রহী হও এবং নিজের জীবনে এই পরিবর্তনকে ফলপ্রসূ করে তোল। নিজেকে সব ধরনের নোংরা থেকে পরিষ্কার কর।' কিন্তু এই সুস্থতা আমাদের দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দেয়; খ্রীষ্টের এই নির্দেশ আমাদের নিজেদের কর্তব্যের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়, 'আমি চাই তুমি ভাল হও।' আরোগ্য কাজের ক্ষেত্রে এরূপ উক্তির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং তা এক্ষেত্রে কার্যকরও; কারণ ঈশ্বরের অনুগ্রহ এখানে যা বলছেন তা অবশ্যই ঘটবে; অর্থাৎ যারা প্রকৃতই ভাল হতে ইচ্ছাপোষণ করে তাদের আর নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন পড়বে না।

গ. এরপর সেই সুখকর পরিবর্তনটি ঘটলো– লোকটির চর্মরোগ তখনই ভাল হয়ে গেল। প্রকৃতি নিয়মতান্ত্রিকভাবে ধীরে কাজ করে কিন্তু প্রকৃতির স্রষ্টা ঈশ্বর তাৎক্ষণিকভাবে কাজ করেন। তিনি যা বলেন তা সাথে সাথেই হয়ে যায়। আর তাঁর কাজ খুবই কার্যকরী। তিনি আদেশ করেন এবং তা দ্রুততার সাথে কার্যকর হয়। মোশির প্রথম চিহ্ন-কাজটি ছিল নিজেকে চর্মরোগ থেকে সুস্থ করা (যাত্রা ৪:৭); এর ফলে ব্যবস্থার অধীনে পুরোহিতেরা প্রথমে তাদের নিজেদের পাপের জন্য উৎসর্গ দিত। কিন্তু খ্রীষ্টের প্রথম চিহ্ন-কাজগুলোর একটি ছিল অন্যকে চর্মরোগ থেকে সুস্থ করা; কারণ তাঁর কোন পাপ ছিল না; ফলে এর জন্য কোন করণীয়েরও আবশ্যকতা ছিল না।

ঘ. খ্রীষ্ট এরপর লোকটিকে যা করতে বললেন। স্বভাবতই খ্রীষ্টের কাছ থেকে যারা সুস্থ হয়েছিল তাদের তাঁর দ্বারা পরিচালিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু খ্রীষ্ট এখানে তাকে বললেন,

১. দেখ, কাউকে একথা বল না; 'যতক্ষণ তুমি পুরোহিতের কাছে নিজেকে না দেখাচ্ছ এবং যতক্ষণ না সে তোমাকে পবিত্র বলে সম্বোধন করছে ততক্ষণ একথা কোন মানুষকে বল না; এর ফলে তুমি প্রমাণসহ লোকদের কাছে উপস্থিত হতে পারবে যে, তুমি খারাপ চর্মরোগ থেকে ভাল হয়েছ।' খ্রীষ্ট তাঁর চিহ্ন-কাজগুলোকে প্রমাণসহ সকলের সামনে প্রচারের আলোতে আনতে চাইলেন, কিন্তু তিনি তা সম্পূর্ণরূপে দেখা যাওয়ার আগে প্রকাশ করতে চাইলেন না। মনে রাখুন, যারা খ্রীষ্টের বিষয়ে সত্য প্রচার করে তারা তা প্রতিষ্ঠার স্বার্থে এবং নিন্দুকদের মুখ বন্ধ করে দেওয়ার খাতিরে অবশ্যই এর স্বপক্ষে প্রমাণও দেখাতে পারবে। 'যতক্ষণ না পুরোহিত তোমাকে দেখছে ততক্ষণ একথা কাউকে বল না। কারণ তা না হলে তারা যখন শুনবে যে, কে তোমাকে সুস্থ করেছে তখন তারা হয়তো তোমাকে আরোগ্যের সনদ দিতে অস্বীকৃতি জানাবে এবং সে কারণেই তাদের সনদ নেওয়া অব্দি কোন কিছু বলা থেকে বিরত থাক।' খ্রীষ্টের সময়কার পুরোহিতেরা কারও কাজের স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে আগে দেখতো সে যথেষ্ট বিজ্ঞ কিনা। সাপের ধূর্ততায় তারা তার

যোগ্যতার মূল্যায়ন করতে চাইতো।

২. 'যাও, ব্যবস্থা অনুসারে নিজেকে পুরোহিতের সামনে দেখাও' (লেবীয় ১৪:২)। এর মাধ্যমে খ্রীষ্ট ব্যবস্থার প্রতি বাধ্যতা দেখালেন; তিনি চাইলেন যেন কেউ তাঁকে ব্যবস্থা অমান্যকারী বলে অভিযুক্ত করতে না পারে। তিনি দেখালেন যে, তিনি ব্যবস্থার নির্দেশের প্রতি বাধ্য এবং তার শৃঙ্খলা মেনে চলতে শ্রদ্ধাশীল। শুধু তা-ই নয়, তিনি ব্যবস্থার উপযুক্ত মূল্য দিতে জানেন। যারা আত্মিক কু'থেকে সুস্থ হয়েছে একথা তাদের প্রতিও বলা হয়ে থাকতে পারে, যেন তারা খ্রীষ্টের প্রচার কারীদের বিকল্প হতে পারে এবং তাদের আরোগ্যের কথা অন্যদের কাছে প্রকাশ করতে পারে। এর ফলে অন্য বিশ্বাসীরা এই নতুন বিশ্বাসীকে পর্যবেক্ষণ করে তার আত্মিক জীবনের জন্য প্রার্থনা করার এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে তাকে সাহায্য করার প্রয়াস পাবে।

৩. 'ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদের স্বীকৃতিস্বরূপ এবং পুরোহিতের সেবার পারিশ্রমিক হিসেবে মোশির নির্দেশ মতো দান উৎসর্গ দাও। ফলশ্রুতিতে, তা তাদের কাছে সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়াবে।' হতে পারে,

(১) আত্মসাক্ষ্যের জন্য মোশি যে আদেশ দিয়েছেন তা মূলত লোকদের ওপর ঈশ্বরের অধিকার এবং তাদের প্রতি তাঁর তত্ত্বাবধানের কথাই প্রকাশ করে। এ ছাড়াও তা সেই অনুগ্রহের বিষয়েও বলে যা পরে প্রকাশিত হবে। নতুবা

(২) 'তোমার এই দান দাও যেন তা তোমার জন্য আত্মসাক্ষ্য হয় এবং পুরোহিতকে জানতে দাও যে কে কীভাবে তোমাকে 'পবিত্র' করেছেন। তোমার সেই সাক্ষ্য তাদের জানাবে যে, তাদের মাঝে একজন এসেছেন যিনি এইরকম কাজ করতে পারেন– যা মহা-পুরোহিতও করতে পারে না। আর তা হবে আমার ক্ষমতার একটি নিদর্শন এবং আমার জন্য তাদের কাছে একটি সাক্ষ্য; যদি তারা তাতে বিশ্বাস আনে তবে তাদের উন্নতি হবে কিন্তু যদি তারা তা না মেনে নেয় তবে এই সাক্ষ্য তাদের বিরুদ্ধে যাবে;' যেহেতু খ্রীষ্টের বাক্য এবং তাঁর কাজই হচ্ছে এক একটি জীবন্ত সাক্ষ্য।

মথি ৮:৫-১৩

খ্রীষ্ট এখানে একজন শতপতির দাসকে অবশরোগ থেকে সুস্থ করলেন। এটা ঘটেছিল কফরনাহুমে– যেখানে খ্রীষ্ট বাস করতেন (৪:১৩)। খ্রীষ্ট যখন এই স্থান ছেড়ে অন্যত্র গেলেন তখন তা ভাল কিছু করার জন্যেই, আবার ফিরে এসেও তিনি ভাল কাজই করলেন। অর্থাৎ ভাল কাজের জন্য তিনি নির্দিষ্ট কোনো স্থানকে বিশেষায়িত করেন নি, কারণ সব স্থানই তো তাঁর।

খ্রীষ্ট এখন যাকে সাহায্য করতে উদ্যত হলেন তিনি ছিলেন

১. একজন শতপতি, স্বভাবতই অযিহূদী; একজন রোমীয়-যিনি সৈন্যদলের অফিসার ছিলেন। তিনি সম্ভবত সেই অঞ্চলের রোমীয় সৈন্যদলের কমান্ডার ইন চিফ হিসেবে কর্মরত ছিলেন -যার সৈন্যসংখ্যা ছিল গোটা সেনাবাহিনীর এক চতুর্থাংশ। কফরনাহুমেই তিনি তার ছাউনি ফেলেছিলেন।

(১) যদিও তিনি একজন সৈনিক ছিলেন (এই রকম পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা কাউকে অল্প দয়া দেখালেও তাকে অনেক মনে করার যথেষ্ট কারণ এখনকার মতো তখনও

বিদ্যমান ছিল) তবুও তিনি ঈশ্বরকে ভয় করতেন এবং বাস্তবিকই তিনি তা-ই ছিলেন। মনে রাখুন, সব প্রকার মানুষের মাঝেই ঈশ্বরের প্রভাব রয়েছে; পৃথিবীতে কারও আহ্বান বা অবস্থানই তাঁর অবিশ্বস্ততা, অবিশ্বাসের পক্ষে অজুহাত হতে পারে না। সেই মহান দিনে কেউই একথা বলতে পারবে না– আমি যদি সৈনিক না হতাম তবে অবশ্যই আমি ধার্মিক হতাম, কারণ ঈশ্বরের পক্ষে এখানে কিছুই করার নেই। অনেক সময় এখানে কাউকে দয়া দেখানোটা কঠিন হয়ে পড়ে। এটা একজন বিজয়ীর চেয়েও বেশি কিছু যে, এই সৈনিক তারপরও ভাল ছিলেন, খুবই সৎ ছিলেন। বাস্তবিকই পেশা, অবস্থানের কারণে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসহীনতার দোহাই তাঁর কাছে গ্রাহ্য হয় না।

(২) যদিও তিনি রোমীয় সেনা ছিলেন এবং রোমীয় শাসনের জোয়াল টানা যিহূদীদের ওপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছিল, তবুও খ্রীষ্ট, যিনি যিহূদীদের রাজা, তিনি তাকে কৃপা করলেন এবং তা আমাদের শিক্ষা দেয় যেন আমরা আমাদের শত্রুদেরও ভালবাসা করি। তাদের কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত রাখি। উপরন্তু জাতিগত শত্রুদের বিষয়েও অমূলকভাবে ভাবিত না হই।

(৩) যদিও তিনি একজন অযিহূদী ছিলেন তবুও খ্রীষ্ট তাকে অগ্রাহ্য করলেন না। এটা সত্য যে, তিনি অযিহূদীদের কোন গ্রামে যাননি (এটা ছিল কনানের ভূমি– যা ইম্মানুয়েলের ভূমি বলে অভিহিত হয়েছে, (যিশাইয় ৮:৮), তবুও তিনি অযিহূদীদের গ্রাহ্য করেছিলেন। এখন বৃদ্ধ শিমশোনের ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণতা পেতে যাচ্ছে– যেভাবে তিনি তাঁর লোকদের ওপর নিজের মহিমা প্রদর্শন করেছেন সেভাবে তিনি অযিহূদীদের ওপর আলো দেবেন, তাদের আলোকিত করবেন। মথি এই ঘটনাটিকে কু'রোগীর আরোগ্য হবার চিহ্ন-কাজের সাথে যোগ করলেন। ফলে এখানে যিহূদী ও অযিহূদী– উভয়ের প্রতি খ্রীষ্টের মমতার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সেই চর্মরোগীটি ছিল যিহূদী; খ্রীষ্ট যিহূদী কু'রোগীকে সুস্থ করলেন কারণ তিনি আলাদাভাবে তাদের কাছে প্রচার করেছিলেন। কিন্তু সমান্তরালে কাছাকাছি সময়ে একজন অযিহূদীকেও তিনি সুস্থ করলেন কারণ ব্যক্তি হিসেবে তিনি তাদের কাছে যাননি বটে, কিন্তু তাঁর বাক্য তাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন– যা তাদের সুস্থ করেছিল। এর মধ্য দিয়েও তিনি অযিহূদীদের মাঝে নতুন আলোতে নিজেকে প্রকাশ করলেন।

২. এখানে মূলত রোগী ছিল শতপতির দাস। এক্ষেত্রে আমরা এ-ও দেখি যে, ঈশ্বরের কাছে যেমন কোন বৈষম্য নেই তেমনি খ্রীষ্টের কাছেও তাই। যেভাবে তিনি তক্‌ছেদ করানো আর না করানো লোকদের সমানভাবে দেখেন তেমনি কারও মর্যাদা-পদবি তাঁর মানদণ্ড বলে বিবেচিত হয় না; তাই তাঁর কাছে কে দাস আর কে স্বাধীন– সেই শ্রেণীকরণও নেই। তিনি যেভাবে ধনী মনিবকে সুস্থ করেন সেভাবে এই দরিদ্র দাসকে সুস্থ করার জন্যও প্রস্তুত আছেন– এখানে আমরা সেটাই দেখি। কারণ যারা ক্ষুদ্র তাদের প্রতি সম্মান দেখাতে তিনি দাসের বেশে নিজেকে সাজালেন।

এখন এই দাসকে সুস্থ করার কাহিনীতে আমরা অনুগ্রহের যোগাযোগ ও বিনিময়ের বিষয়ে দেখি। খ্রীষ্ট ও শতপতির মাঝে যার উপস্থিতি দৃশ্যমান। এখানে লক্ষ্য করুন–

ক. দাসের প্রতি সেনাপতির দয়া খ্রীষ্টের সম্মুখে কাজ করল। রোমীয় সৈন্যের কাছ থেকে কি কোন ভাল কিছু প্রত্যাশা করা সম্ভব ছিল? প্রশংসা করার মতো কিংবা গ্রাহ্য করার মতো কিছু? কিন্তু দেখা যায়, শতপতির মধ্য দিয়ে ভাল কিছুই এসেছিল; আর তা ছিল

উদাহরণযোগ্য ও মহৎ। লক্ষ্য করুন,

(ক) খ্রীষ্টকে করা তাঁর আকর্ষণীয় উক্তিটি–

(১) আমাদের মহান মনিবকে এমন একজন ধর্মভীরু ব্যক্তির মতো সম্মান প্রদর্শন করলেন যে, তার সমস্যা থেকে প্রতিকার তথা মুক্তি পেতে আগ্রহী ছিল। তিনি তাঁর কাছে এসে অনুরোধ জানালেন, তবে তা সিরীয় নামানের মতো নয় (এই নামানও শতপতি ছিল) যিনি এলিয়ের কাছে এসে তাকে সুস্থ করতে বলেছিল; কিন্তু সে তার সম্মান, শ্রদ্ধা ও গৌরবের জায়গাকে সমুন্নত রেখে এলিয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল; কিন্তু এই শতপতি তার টুপি খুলে হাতে নিয়ে বিনম্রতার পরিচয় দিলেন। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, তিনি খ্রীষ্টকে প্রথম দর্শনের তুলনায় তার চেয়ে বেশি দেখেছিলেন। তার সেই পর্যবেক্ষণই তাকে খ্রীষ্টের সামনে বিনম্র করল; কারণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জেনেছিলেন কী করে ওপর মহলের আদেশকে সম্মান জানাতে হয়। যদিও অনেকে কেবল বাহ্যিক রূপ দেখেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তবুও শতপতি সেই ভুল করলেন না; যেহেতু খ্রীষ্টের চেহারায় এমন কিছু ছিল না যা কাউকে আকর্ষণ করে। শহরের নিয়ন্ত্রক হিসেবে সন্দেহ নেই শতপতির পদমর্যাদা অনেক উঁচু ছিল; যদিও তিনি অনেক সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন তবুও খ্রীষ্টকে সম্বোধন করার ক্ষেত্রে নিজের পদমর্যাদার 'কী হবে' তা নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবিত হলেন না। তিনি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করলেন। মনে রাখুন, খ্রীষ্টের সম্মুখে কিছু করতে চাইলে মানুষের মধ্যে যারা মর্যাদা নিয়ে আছে তাদেরকেও ভিক্ষুকের মতো নতজানু হতে হবে। তিনি খ্রীষ্টকে 'প্রভু' বলে সম্বোধন করার মাধ্যমে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং তাঁর কাছে তার দাসের সুস্থতার ভার সঁপে দিলেন। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বিনম্র ও আন্তরিক; প্রকৃতপক্ষে তিনি মোটেও ভাবাবেগতাড়িত ছিলেন না। তিনি জানতেন একজন জ্ঞানী ও আশীর্বাদে পূর্ণ চিকিৎসকের সাথে কী ধরনের ব্যবহার করতে হয়; যাঁর কাছে সমস্যা উন্মোচন করা ছিল অনুরোধেরই অন্য নাম। আমাদের আত্মিক প্রয়োজন ও রোগের ক্ষেত্রে বিনম্র স্বীকারোক্তি কখনও শান্তির উত্তরের কাছে প্রত্যাখ্যাত হবে না। আপনার সমস্যা উত্থাপন করুন, তাহলে আপনার মাঝে অনুগ্রহের প্রবেশ ঘটবে।

(২) এখানে আমরা দাসের প্রতি সেই শতপতির দয়ার্দ্র মনোভাব ও সম্ভ্রম লক্ষ্য করি। আমরা অনেকের বিষয়ে পড়ি যারা খ্রীষ্টের কাছে নিজেদের সন্তানের জন্য এসেছিল কিন্তু এখানে এমন একজনের বিষয়ে আমরা পড়ি যিনি কিনা তার দাসের জন্য এসেছেন এবং তা আমরা একবারই পড়ি– 'প্রভু, আমার দাস ঘরে বিছানায়, সে অবশরোগে কষ্ট পাচ্ছে।' মনে রাখুন, মনিবের জন্য তার দাসের ভালমন্দের খোঁজ-খবর রাখাটা দায়িত্বের মাঝে পড়ে। বিশেষত যখন তারা কষ্ট ও যন্ত্রণার মাঝে থাকে। অবশরোগ সেই দাসকে তার কাজ থেকে বিরত রেখেছিল; ফলে শতপতি বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছিলেন। তা তাকে কষ্ট দিচ্ছিল ও বিরক্ত করে তুলছিল। তবুও তিনি তার দাসকে অসুস্থতার দরুন অন্যত্র সরিয়ে নেননি (অমালেকীয় তার দাসদের প্রতি যেমন করেছিল ১ শমূয়েল ৩০:১৩)। তিনি তাকে তার বন্ধুদের কাছে পাঠিয়ে দেন নি, অবহেলা-অবজ্ঞায় বিছানায় ফেলে রাখেন নি বরং তার সুস্থতার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট উপায় খুঁজে বের করতে সচেষ্ট ছিলেন। মনিব এখানে তার দাসের জন্য যা করলেন এর বেশি কিছু দাস হয়তো তার মনিবের জন্যও করতে পারতো না। তার এই দাসটি তার জন্য খুবই করিৎকর্মা ছিল (৯ পদ)। এখানে আমরা দেখি, দাসটির কর্তব্যপরায়ণতার জন্য সেই মনিবও তার প্রতি দয়ালু ছিলেন; পাশাপাশি অপরাপর

দাসদের প্রতিও তিনি তার মমতা প্রকাশ করতেন। তার এই কাজের দরুন তার দাসেরা তার বাধ্য থাকতে আরও বেশি করে অনুপ্রাণিত হতো। আমরা যেন আমাদের অধঃস্তনদের কোন অনুযোগকে তুচ্ছজ্ঞান না করি বরং তাদের ভাল করতে সচেষ্ট হই (ইয়োব ৩১:১৩, ১৫) এবং ঈশ্বর যখন তাদের প্রতি মনোযোগ দেন তখনও যেন আমরা তাদের বিষয়ে তুচ্ছজ্ঞান না করি; কারণ আমরা একই হাতে একই ছাঁচে গড়া এবং ঈশ্বরের সামনেও একই সারিতে দাঁড়িয়ে আছি। আমরা যেন কখনও তাদের পোষা কুকুর-বেড়ালের সমকক্ষ না ভাবি। শতপতি তার দাসের জন্য কোন জাদুকরের কাছে আবেদন জানান নি, কিন্তু জানিয়েছেন খ্রীষ্টের প্রতি। অবশরোগ এমন এক রোগ– যা চিকিৎসকেরাও তাদের দক্ষতা দিয়ে সারাতে ব্যর্থ হয়। খ্রীষ্টের ক্ষমতার প্রতি তার দৃঢ়বিশ্বাসও আমাদের সেকথাই বলে, যেহেতু তিনি সেই রোগ ভাল করানোর জন্য খ্রীষ্টের কাছে আর্জি নিয়ে এসেছিলেন– যা প্রার্থিব কোন জ্ঞান দ্বারা আরোগ্য করা সম্ভব ছিল না।

লক্ষ্য করুন, কতটা দুঃখের সাথে তিনি খ্রীষ্টের কাছে তার দাসের অসুস্থতার বিষয়ে বলেছিলেন, 'সে অবশরোগে কষ্ট পাচ্ছে'। এই রোগ সাধারণত রোগীর ব্যথাবোধকে ভোঁতা করে দেয়। তবুও সেই দাসটি সাংঘাতিক রকমের যন্ত্রণা পাচ্ছিল। যুবাবস্থায় স্ট্রোক সহজে ঘায়েল করতে পারে না, ফলে সে বুঝেছিল– যা তাকে কষ্ট দিচ্ছিল (এটা প্যারালাইসিস সিমপ্লেক্স ছিল না, ছিল স্করবুটিকা)। আমরা এভাবে আমাদের সন্তান, দাসের আত্মিক সুস্থতার ব্যাপারে খোঁজ খবর নেব যে, তা আত্মিক অবশরোগে স্থবির হয়ে পড়ছে কি না। আত্মিক জীবনের যাবতীয় অবশরোগ যেমন অবক্ষয়, নিষ্ক্রিয়তা, অসাড়তা, পাপাত্মার বশীভূত হওয়া, ভাল কাজ থেকে বিমুখ হয়ে পড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে তার লক্ষণ দেখলে আমরা অবশ্যই তাদের সুস্বাস্থ্যের জন্য খ্রীষ্টের সাহায্য চাইব।

২. তিনি যে বিনম্রতা দেখালেন এবং যেভাবে নিজেকে অস্বীকার করলেন– তা লক্ষ্য করুন। খ্রীষ্ট যখন তার দাসকে সুস্থ করার জন্য তার কাছে যেতে চাইলেন (৭ পদ) তখন তিনি নিজের বিনম্রতার প্রকাশ ঘটালেন। মনে রাখুন, বিনম্র আত্মা খ্রীষ্টের অনুগ্রহের সংস্পর্শে এলে ততোধিক নম্রতা প্রকাশ করে। দেখুন তার নম্রতার ভাষাটি কী ছিল– 'প্রভু, আপনি যে আমার বাড়িতে ঢোকেন তার যোগ্য আমি নই' (৮ পদ)। তার এই কথার মধ্য দিয়ে তিনি নিজের প্রকৃত অবস্থা বোঝাতে চাইলেন– যা আমাদের প্রভুকে সম্মানিত করল ও তাঁর মহত্ত্বকে স্বীকার করে নিল। তিনি এমনটা বললেন না, 'আমার দাসের কোন যোগ্যতা নেই যে আপনি তার কুটীরে যান কারণ তার আবাস তেমন উল্লেখ করার মতো কিছু নয়, তা তো ছাউনি।' কিন্তু বললেন, 'আপনি আমার বাড়িতে আসেন তার যোগ্য আমি নই'। শতপতি প্রকৃতই মহৎ ছিলেন, তবুও তিনি ঈশ্বরের সামনে নিজেকে যোগ্য মনে করলেন না। মনে রাখুন, বিনম্র আচরণ দ্বারাই ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ পায়। পৃথিবীর চোখে খ্রীষ্ট তখনও সম্মানিত বলে পরিগণিত না হলেও এই শতপতি তাঁকে ভাববাদীর দৃষ্টিতে দেখেছিল; হ্যাঁ, ভাববাদীর চেয়েও বেশি কিছু এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিয়েছিল। মনে রাখুন, আমরা ঈশ্বরের যা কিছু দেখি তার যথার্থ মূল্য দিতে এবং তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে আমাদের আন্তরিক হওয়া উচিত; এমনকি তাদের মাঝেও যারা আমাদের বাইরের বলে কথিত, তাদের ক্ষেত্রেও আমাদের হীনম্মন্য হওয়া চলবে না। শতপতি খ্রীষ্টের কাছে একটি আবেদন নিয়ে এসেছিলেন এবং সেকারণেই তিনি তা বিনম্রতার সাথে উপস্থাপন করলেন। মনে রাখুন, খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের সব রকম অভিব্যক্তিতে এবং খ্রীষ্টের

মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে যেতে আমাদের প্রথমে নিজেদের অহমবোধকে ঝেড়ে ফেলতে হবে, নিজেদের অস্বীকার করতে হবে এবং আমাদের অযোগ্যতার কথা মাথায় রেখে নিজেদের নিচু করতে হবে– ক্ষুদ্র সৃষ্টির মতো এবং জঘন্য পাপীর মতো। ঈশ্বরের জন্য আমরা যা-ই করতে চাই কিংবা তাঁর কাছ থেকে ভাল যা কিছু গ্রহণ করতে চাই অথবা তাঁর জন্য কিছু করার স্বার্থে প্রয়োজনীয় সাহায্য চাইতে যাই, মনে রাখবেন, আমাদের নিজেদের নিচু করতে ও বিনম্র হতে হবে।

৩. তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের দিকে লক্ষ্য করুন। বিনম্রতা হচ্ছে প্রকৃত বিশ্বাসপ্রসূত অভিব্যক্তি। আমরা যতই নিজেকে অস্বীকার করব ততই খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের আস্থা বেড়ে যাবে। খ্রীষ্ট তার দাসকে সুস্থ করতে পারবেন– কেবল সেই বিশ্বাসটুকুই নয় উপরন্তু,

(১) তিনি যে দূর থেকেই তাকে আরোগ্য করতে পারবেন সেই বিশ্বাসও তার ছিল। এক্ষেত্রে কোন শারীরিক স্পর্শের প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন নি, অথচ নিয়ম মতো রোগ মুক্তির জন্য চিকিৎসকের কাছে রোগীকে আনার কথা; যেন তিনি ক্ষতিগ্রস্ত অংশটিকে সারিয়ে তুলতে পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রে এই শতপতি চিকিৎসকের উপস্থিতি-স্পর্শের কোন দরকার বোধ করেন নি। তার বিশ্বাস ছিল চিকিৎসকের কাছে রোগীকে না এনেই তাকে সুস্থ করে তোলা যাবে; আর খ্রীষ্ট তা পারবেন। আর ক'টি ঘটনার পর আমরা দেখব লোকেরা খ্রীষ্টের কাছে এরকমই একজন অবশরোগীকে শত প্রতিবন্ধকতা, মানুষের ভিড় ঠেলে নিয়ে এসেছিল এবং খ্রীষ্ট তাদের সক্রিয় বিশ্বাসের প্রশংসা করেছিলেন। এই শতপতি কিন্তু তার দাস, যে অবশরোগে কষ্ট পাচ্ছিল– তাকে খ্রীষ্টের কাছে আনেননি এবং খ্রীষ্ট তার বিশ্বাসের জন্য প্রশংসা করেছিলেন। সত্যিকারের বিশ্বাস খ্রীষ্টের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে, যদিও তার প্রকাশ বিভিন্ন রকমের। খ্রীষ্ট বিভিন্ন মতাশ্রয়ী লোকদের ক্ষেত্রেও বিশ্বাসের মানদণ্ডে তাঁর সেরা উপহারই দেন এবং তাই তিনিও আমাদের সেই রকমই করতে বলেন। শতপতি বিশ্বাস করেছিলেন এবং সন্দেহাতীতভাবেই তা সত্য যে, খ্রীষ্টের ক্ষমতার কোন সীমা-পরিসীমা নেই এবং সেকারণে নৈকট্য কিংবা দূরত্ব তাঁর কাছে কোন ব্যাপার নয়। উভয়ই তাঁর কাছে সমান। খ্রীষ্টের জ্ঞান যাদের মাঝে উপস্থিত, তাদের জন্য তাঁকে জানা কিংবা তাঁর জন্য কাজ করায় স্থানিক দূরত্ব কোন ব্যাপার নয়। খ্রীষ্টের কাজেই তাঁর পরিচয় সতত বহমান– 'আমি কি কেবল কাছেরই ঈশ্বর, দূরের ঈশ্বর নই?' (যিরমিয় ২৩:২৩)।

(২) তিনি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন যে, খ্রীষ্টের মুখের একটি কথাতেই তার দাস সুস্থ হতে পারে এবং তা কোন ওষুধ কিংবা যাদুমন্ত্র পাঠানো ছাড়াই। এর ফলে দাসের সুস্থতার বিষয়ে সেই শতপতির মনে যে কোন সংশয় ছিল না– সেটাই মূর্ত হয়ে ওঠে। এখানে তিনি নিজেকে স্বর্গীয় ক্ষমতার সাহায্য পাওয়ার দাবিদার রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেই ক্ষমতা– যার দ্বারা বিশ্বপ্রকৃতি পরিচালিত হয় এবং যা খ্রীষ্টকে সমগ্র পৃথিবীর ওপর ইচ্ছেমতো কর্তৃত্ব করার সামর্থ্য দিয়েছে– সেই বাক্যের ক্ষমতা পেতেই শতপতি আন্তরিক ছিলেন। 'আলো হোক'– এই কথা দ্বারাই তিনি এই বিশ্বপ্রকৃতিকে গড়েছিলেন। মানুষের ক্ষেত্রে কথা ও কাজের ভিন্নতা দেখা গেলেও খ্রীষ্টের ক্ষেত্রে তা হওয়ার সুযোগ নেই। তিনি ঈশ্বরের দক্ষিণ বাহু, কারণ তিনিই অনন্ত বাক্য। তিনি যখন বলেন, 'তোমার ভাল হোক' তখন তিনি তার ভালই করেন, তাকে সুস্থ করেন এবং তার প্রয়োজন যুগিয়ে দেন (যাকোব ২:১৬)।

শতপতি এখানে খ্রীষ্টের প্রতি তার বিশ্বাসকে ব্যক্ত করলেন তার নিজের প্রশাসনিক

কার্যক্রম দ্বারা। তিনি তার কর্মজীবন থেকেই এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন যে, প্রত্যেককে ওপরের নির্দেশ মেনে চলতে হয়। অফিসার হিসেবে তিনি যেমন সৈন্যদের নির্দেশ দিতেন এবং তারা তার নির্দেশ মান্য করতো ঠিক তেমনি তাকেও উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশমতো চলতে হতো। একজন সৈন্য হিসেবে তিনি জানতেন অফিসারের নির্দেশই এখানে আইন; সুশৃঙ্খল সৈন্যরা জানে যে, তাদেরকে দেওয়া তাদের অফিসারের আদেশ কেবল পালন করার জন্য, ভঙ্গ করার জন্য নয়। এভাবে খ্রীষ্ট মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলেই যে তার দাস ভাল হয়ে যাবে– এই বিশ্বাস তার ছিল; তিনি জানতেন খ্রীষ্ট শারীরিক ব্যাধির ওপর সর্বময় ক্ষমতা ধারণ করেন। খ্রীষ্টের সেই ক্ষমতাও অসীম, কারণ তিনি নিজেই সমস্ত সৃষ্টিজগতের প্রভু। শতপতির দাস ছিল তার খুবই অনুগত, ফলে তার প্রভুর মনে তার সদাবিচরণ ছিল খুবই স্বাভাবিক। এখন

(ক) ঈশ্বরের কাছে আমাদেরও এরকম বিশ্বস্ত দাস হতে হবে। তাঁর বাক্যের নির্দেশ মতো চলার এবং তার নির্দেশনার আওতাধীন থাকার মাধ্যমে আমাদের তাঁর মনোযোগে স্থান করে নিতে হবে; তিনি যেখানে পাঠাবেন সেখানে যেতে ইচ্ছুক থাকতে হবে এবং যখন ফিরে আসতে বলবেন তখন চটজলদি ফিরে আসতে হবে। অর্থাৎ তিনি যা করতে বলবেন আমাদের তা-ই করতে হবে। তাই আমাদের সবসময় ধৈর্যের সাথে শুনতে হবে 'আমার প্রভু তার দাসকে কী বলেন'। আমরা যখন তাঁর ইচ্ছামতো চলতে মনস্থ করি তখন তিনি আমাদের অন্তরে অবস্থান নেন; আর আমাদের আমিত্ব বিদায় নেয়।

(খ) খ্রীষ্টের কাছে এই রোগব্যাধি দাসের মতো; তিনি যখন তা পাঠান তখন তা আমাদের আক্রান্ত করে এবং যখন তিনি তাদের আমাদের ছেড়ে চলে যেতে বলেন তখন চলে যায়। সেগুলো যেমন আমাদের ওপর, আমাদের দেহের ওপর ক্রিয়া করে তেমনি তাঁর নির্দেশকেও আমাদের জীবনে কাজ করতে দিতে হবে। যারা খ্রীষ্টের, তাদের জন্য এটাই সত্যিকারের সান্ত্বনা এনে দেয়; কারণ তাঁর ক্ষমতা তাদের ভাল কাজগুলোতে প্রয়োগ করা হয় এবং তাতেই স্থির থাকে। প্রতিটি রোগের ওপরই তাঁর ক্ষমতা আছে; তা তাঁরই ক্ষমতায় পরিচালিত, তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন এবং তা তাঁর অনুগ্রহের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নেই পরিচালিত হয়। সেজন্যই খ্রীষ্টের অনুসারীদের অসুস্থতায় ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই; উপরন্তু তারা একে বন্ধুর দৃষ্টিতে ভাল মনে করেই দেখবে। পাশাপাশি সংশোধনের পথে পা বাড়াবে।

খ. এখানে শতপতির সামনে খ্রীষ্টের অনুগ্রহ দেখা দিল; কারণ যে অন্যকে অনুগ্রহ করে তিনিও তাকে অনুগ্রহ করে থাকেন।

১. খ্রীষ্টকে 'প্রভু' সম্বোধন করে শতপতি প্রথমে তাঁকে তার দাসের অসুস্থতার বিষয়টি কানে দিলেন এবং তার সুস্থতার জন্য বিনতি জানালেন। বিপরীতে খ্রীষ্ট তাকে আশ্বস্ত করলেন এই সুন্দর কথা দ্বারা, 'আমি অবশ্যই গিয়ে তাকে সুস্থ করব' (৭ পদ); তিনি কিন্তু বললেন না, 'আমি গিয়ে তাকে দেখব।' খ্রীষ্টের প্রথম উক্তিতেই সেই শতপতির প্রতি তাঁর অনুগ্রহ ঝরে পড়ল– যা তাকে একজন দয়ালু ত্রাণকর্তা হিসেবেই মূর্ত করে তোলে। 'কিন্তু আমি গিয়ে তাকে সুস্থ করব'– এই বাক্য তাঁকে দেখায় একজন শক্তিমান ত্রাণকর্তা হিসেবে। আসলেই তা ছিল এ অনুগ্রহের বাণী কিন্তু তাঁর কৃত ভাল কাজের চেয়ে তা বেশি নয়, কারণ 'তাঁর ডানার নিচে ছিল আরোগ্যকারী ক্ষমতা'; তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে অসুস্থকে সুস্থ করা, আরোগ্য করা। যারা সংগৃহীত ক্ষমতার দ্বারা চিহ্ন-কাজ করেছিলেন

তারা এভাবে ইতিবাচক কথা বলতে পারতেন না, যেমনটা খ্রীষ্ট বলেছিলেন। কারণ যিনি এসব চিহ্ন-কাজ করতেন সম্পূর্ণ নিজের ক্ষমতায়; এমন একজনের মতো যার অধিকার আছে। যখন কোন বিশ্বাসীকে তার অসুস্থ বন্ধুর কাছে পাঠানো হয় তখন সে এটুকুই বলতে পারে– আমি তার জন্য প্রার্থনা করতে পারি। কিন্তু এই স্থলে খ্রীষ্ট বলেন, 'আমি গিয়ে তাকে সুস্থ করব।' খ্রীষ্টের এই উক্তি এটাই প্রকাশ করে যে, তিনি আমাদের জন্য আমাদের মণ্ডলীর পরিচালকের চেয়েও অনেক বেশি কিছু করতে পারেন। শতপতি চেয়েছিল খ্রীষ্ট তার দাসকে সুস্থ করে তুলুন। তাই খ্রীষ্ট বললেন, 'আমি গিয়ে তাকে সুস্থ করব'; এভাবে খ্রীষ্ট আমাদের চিন্তা ও ইচ্ছার বেশি সাহায্য, কাজ করে তাঁর অনুগ্রহকে প্রকাশ করে থাকেন।

মনে রাখুন, খ্রীষ্ট প্রায়শই অল্প চাওয়া-প্রার্থনাকে তাঁর অনুগ্রহের পূর্ণতায় ভরিয়ে দেন। প্রার্থনাকারী গরীব কি ধনী তা তাঁর কাছে ধর্তব্যের ব্যাপার নয়। এখানে খ্রীষ্টের যে বিনম্রতা ফুটে উঠেছে তা দেখুন– তিনি একজন দরিদ্র সৈনিকের বাড়িতে যেতে সম্মত হলেন। তিনি কিন্তু একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ছেলেকে দেখতে তার বাড়িতে যাননি, যে তাঁকে তার সাথে যেতে মিনতি করেছিল (যোহন ৪:৪৭-৪৯); কিন্তু তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, তিনি সেই দাসকে দেখতে যাবেন; এভাবে তিনি নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি তার সম্মান জ্ঞাপন করলেন। যা কেউ দেয় না, যাতে অনেক অবহেলা জমে ছিল সেই নগণ্য লোকদের সম্মানিত করে তিনি যাবতীয় অপ্রাপ্তির খাতা পূর্ণ করে দিলেন। শতপতির দাসকে সুস্থ করতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশের মাধ্যমে খ্রীষ্ট তার কাছে যে উদাহরণটি তুলে ধরলেন তা সেই শতপতিকেও নিজের বিনম্রতা প্রকাশের সুযোগ করে দিল– 'আপনি যে আমার বাড়ি যান তার যোগ্য আমি নই'। মনে রাখুন, খ্রীষ্টের অনুগ্রহ– যা আমাদের অধস্তন ব্যক্তির প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করতে শেখায়– তা আমাদের তাঁর সাক্ষাতে আরও বিনয়ী ও আত্মবিমুখ করে তোলে।

২. তিনি তার বিশ্বাসের প্রশংসা করলেন এবং দয়াপূর্ণ উক্তিতে তা উপস্থিত অযিহূদীদেরও বললেন (১০-১২ পদ)। দেখুন, আত্মবিমুখ ও দৃঢ় বিশ্বাস কী করে খ্রীষ্টের কাছ থেকে কত ভাল জিনিস বয়ে আনতে পারে, এমনকি তা সাধারণ্যে ও প্রকাশ্যেও হতে পারে; লোকসম্মুখেও আমরা এজন্য প্রশংসিত হতে পারি।

(১) শতপতির ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটেছিল। খ্রীষ্ট কেবল তাকে পরীক্ষাসিদ্ধ করেন নি বা গ্রহণযোগ্যই করেন নি (যে সম্মান সব সত্যিকারের বিশ্বাসীদের থাকে) উপরন্তু তার প্রশংসা করলেন এবং তাকে বাহবা দিলেন। যে সম্মান মহান বিশ্বাসীদের থাকে– যেমন, আইয়ুবের, তাঁর মতো পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

(ক) খ্রীষ্ট তার প্রশংসা করলেন; তবে তা তাঁর মহত্ত্বের জন্য নয় কিন্তু তার অনুগ্রহের দরুন। যীশু তার কথা শুনে বিস্মিত হলেন। তবে এমন নয় যে, তা তার কাছে বিস্ময়কর, নতুন, অভিভূত করে দেওয়ার মতো কিছু ছিল; কারণ তিনি শতপতির বিশ্বাসের কথা আগে থেকেই জানতেন, যেহেতু তিনিই তা গড়ে দিয়েছেন। কিন্তু এটা ছিল মহান ও অসাধারণ– যা খুব একটা দেখা যেত না; অর্থাৎ বিরল দর্শন এবং খ্রীষ্ট এ সম্পর্কে বললেন যে, তা বিস্ময়কর। তিনি তা করলেন আমাদের এই সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে, কোনটা প্রশংসা পাবার যোগ্য। খ্রীষ্টের কাছ থেকে প্রার্থিব জাঁকজমক কিংবা আভিজাত্য কখনও প্রশংসা পায় না; বরং প্রকৃত বিশ্বাসই তা কুড়িয়ে নেয়; কারণ তা পবিত্র, তা কেবল ঈশ্বরের

এবং তাঁরই উদ্দেশে। মনে রাখুন, প্রকৃতির বিস্ময় ও নিদর্শনের চেয়েও অনুগ্রহের বিস্ময় অনেক বেশি পরিমাণে আমাদের আলোড়িত করতে পারে এবং আত্মিক সাফল্য প্রার্থিব অনেক প্রাপ্তির চেয়েও আমাদের প্রবল আনন্দে ভরিয়ে দিতে পারে। তাই পৃথিবীতে যারা সোনা-দানার মালিক, সেই ধনীরা নয় বরং যারা বিশ্বাসে ধনী তাদের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি– তারা এই গৌরব পেয়ে গেছে (আদি ৩০:১)। কিন্তু তাদের বিশ্বাসের কোন দিক যদি প্রশংসাযোগ্য হয়ে ওঠে তখন নিশ্চিতভাবেই তা খ্রীষ্টের গৌরব বলে বিবেচিত হয়। খ্রীষ্ট তাঁর অসাধারণ শিক্ষা ও কাজের জন্য যেভাবে তাঁর বিশ্বাসীদের মাঝে প্রশংসিত হয়েছিলেন সেভাবে তিনি এই শতপতিরও প্রশংসা করলেন।

(খ) খ্রীষ্ট উপস্থিত লোকদের কাছে তার বিষয়ে প্রশংসাসূচক কথা বললেন। সব বিশ্বাসী অন্য পৃথিবীতে খ্রীষ্টের কৃতজ্ঞতা ও স্বীকারোক্তি পাবে, তবে এই পৃথিবীতেও কোন কোনও বিশ্বাসী মানুষের সামনে সম্মানিত হবেন। খ্রীষ্টই তা করবেন এবং তিনি তা করবেন তাঁর গৌরব প্রকাশের স্বার্থে। 'আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, ইস্রায়েলীয়দের মাঝে এত বড় বিশ্বাস আর কারও মধ্যে দেখিনি।' এখন তাঁর এই কথা প্রথমে শতপতিকে সম্মানিত করল, যিনি অব্রাহামের সন্তান ছিলেন না, ছিলেন বিশ্বাসে অব্রাহামের উত্তরাধিকারী এবং খ্রীষ্ট তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। মনে রাখুন, খ্রীষ্ট যা খোঁজেন তা হচ্ছে, বিশ্বাস এবং তা যেখানেই থাকুক তিনি তা বের করে আনবেন, তা যদি 'ক্ষুদ্র সরিষাদানার মতোও' হয়। কারণ সবকিছু বিবেচনায় রেখেও তিনি কারও মাঝেই মহৎ বিশ্বাস খুঁজে পান নি; তাই তিনি শতপতির বিশ্বাস দেখে বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, 'তার বিশ্বাস ইস্রায়েলীয়দের সবার বিশ্বাসকে ছাপিয়ে গেল'– যেভাবে গরীব বিধবার দান অন্য অনেকের দানকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল (লূক ২১:৩)। যদিও শতপতি একজন অযিহূদী ছিলেন তবুও তিনি এভাবে প্রশংসিত হলেন। মনে রাখুন, আমরা অবশ্যই কারও প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকবো, যেন আমরা অন্যের প্রশংসা করতে অগ্রসর হতে পারি। সে আমাদের নিজেদের লোক না হলেও তা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, তাঁর এই কথা ইস্রায়েলকে লজ্জিত করল, যার সাথে ঈশ্বরের সম্বন্ধ, গৌরব, চুক্তি এবং সব সাহায্য ও বিশ্বাসের উৎসাহ নিবদ্ধ ছিল।

মনে রাখুন, যখন মনুষ্যপুত্র আসলেন তখন তিনি খুঁজলেন ক্ষুদ্র বিশ্বাস এবং সেকারণে তিনি খুঁজলেন ছোট ফল। মনে রাখুন, তাদের সাফল্য– যারা তাদের আত্মার জন্য অল্পই করে– তারা অনেকের পাপ এবং ধ্বংসকে অনিবার্য করে তোলে; ফলে তারা অসামান্য অনুগ্রহের ভাগী হয়। খ্রীষ্ট তাঁর অনুসারীদের প্রতি একথা বললেন যেন তার একটিরও অর্থ দ্বারা তিনি তাদের পবিত্রতায় সমর্থ করে তুলতে উদ্দীপিত করতে পারেন, যেমনটা পৌল বলেছিলেন (রোমীয় ১১:১৪)। খ্রীষ্ট এই কথা বলেছিলেন যেন তারা 'অব্রাহামের বংশধর'– এই পরিচয়-সম্মানের গর্ব থেকে অযিহূদীর উদাহরণের জন্য দুঃখভোগ না করে। তারা যেন সেই অনুগ্রহবঞ্চিত না হয়– যা অব্রাহামের বংশকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে সম্মানিত করেছিল।

(২) যেমন অন্যদের ক্ষেত্রে। খ্রীষ্ট এই উপলক্ষকে এখানে যিহূদী এবং অযিহূদীর মাঝে তুলনায় আনলেন এবং তাদের দু'টি বিষয়ে বললেন– যা তাদের কাছে বিস্ময়কর ঠেকেছিল যারা ভেবেছিল 'পরিত্রাণ কেবল যিহূদীদেরই জন্য'। এখানে এই বক্তব্য বিবৃত হয়েছে যে,

(ক) অনেক অযিহূদী রক্ষা পাবে (১১ পদ)। শতপতির যে বিশ্বাস ছিল– তা অযিহূদীদের পরিবর্তিত হবারই একটি নমুনাবিশেষ এবং মণ্ডলীতে তাদের অন্তর্ভুক্তির

সূচনা। এই বিষয়টি আমাদের প্রভু যীশু প্রায়ই স্পর্শ করেছিলেন; তিনি তা বলেছিলেন নিশ্চয়তাসহ, 'আমি তোমাদের বলছি। আমি, যিনি সবাইকে জানেন।' তিনি তাঁর নিজের কিংবা অযিহূদীদের সন্তুষ্টির জন্য খুব একটা কথা বলেন নি। তাঁর দয়ার একটি ঘোষণা নাসরতীয়দের রোষের উদ্রেক করেছিল (লূক ৪:২৭)। খ্রীষ্ট আমাদের এখানে একটি ধারণা দিলেন– প্রথমে তাদের বিষয়ে, যারা রক্ষা পাবে; তাদের অনেকেই পূর্ব ও পশ্চিমের হবে। তিনি বলেছিলেন, (৭:১৪) 'অল্পই জীবনের পথ খোঁজে এবং তবুও অনেকেই আসে।' অল্প হচ্ছে একবারের জন্য একটি স্থানে, তবুও তারা যখন একত্রে আসবে তখন তাদের সংখ্যা হবে অগণিত। আমরা এখন সেই জায়গায় একজনকেই সেই অনুগ্রহের অধীনে আসতে দেখি, কিন্তু কিছু পরে আমরা দেখি আমাদের পরিত্রাণের ক্যাপ্টেন অনেক সন্তানকে তাঁর অনুগ্রহের অধীনে নিয়ে আসলেন (ইব্রীয় ২:১০)। তিনি তাঁর দশ হাজার অনুসারীকে নিয়ে আসবেন (যিহূদা ১৪); তাদের সংখ্যা গোনা যাবে না (প্রকাশিত বাক্য (৭:৯); রক্ষা পাওয়া সেই জাতিগুলো আলোতে পথ চলবে (প্রকাশিত বাক্য ২১:২৪)। তারা আসবে পূর্ব ও পশ্চিম থেকে; কাছে-দূরে বিভিন্ন জায়গা থেকে এবং তবুও তারা সবাই খ্রীষ্টের ডান পাশে মিলিত হবে– তাদের ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দুতে। মনে রাখুন, সর্বত্রই ঈশ্বরের উপস্থিতি রয়েছে; সূর্য যেখানে উদয় হয়, সেখান থেকে অস্ত যাওয়ার স্থান পর্যন্ত (মালা ১:১১) চারদিকের বাতাস নির্বাচিতদের একত্র করবে (২৪:৩১)। তারা পৃথিবীতে বপনকৃত বীজের মতো মাঠের প্রতিটি কোণে কোণে ছড়িয়ে আছে। এখানে পূর্ব ও পশ্চিমের অবিশ্বাসী রাজ্যের কথা বোঝানো হয়েছে; যদিও ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার চুক্তি তাদের কাছে এখন অচেনা এবং তা দীর্ঘ সময় ধরে, তবুও তাদেরই কেউ যখন ঈশ্বরকে এবং এই লুকানো চুক্তিকে খুঁজে পাবে তখন? এলিয়ের সময়ের ইস্রায়েল জাতিকে অগ্রাহ্য করে (১ রাজাবলি ১৯:১৪) শীঘ্রই তারা বড় পরিসরে মণ্ডলীতে মিলিত হবে (যিশাইয় ৬০:৯)।

মনে রাখুন, যেমনটা আমরা ধরে নিই যে, স্বর্গে অনেককে হয়তো কাছে পাব না, তেমনিভাবে অকুস্থলে পৌঁছে অনেক অপ্রত্যাশিত বন্ধুকে দেখে আমরা অবাক হয়ে যাব। দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্ট এখানে আমাদের পরিত্রাণের বিষয়ে একটি ধারণা দিলেন। তারা আসবে, একত্রে আসবে, একত্রে খ্রীষ্টের কাছে আসবে (২ থিষলনীকীয় ২:১)। ১. তারা পৃথিবীতে ঈশ্বরের অনুগ্রহের রাজ্যে প্রবেশ করবে; অব্রাহাম-ইসহাক- যাকোবের সাথে করা অনুগ্রহের চুক্তিতে প্রবেশ করবে। তারা বিশ্বস্ত অব্রাহামের সাথে আশীর্বাদ লাভ করবে; যার আশীর্বাদ অযিহূদীদের ওপর আসবে (গালা ৩:১৪)। এই প্রক্রিয়ায় সক্কেয় অব্রাহামের সন্তান হয়েছিল (লূক ১৯:৯)। ২. তারা স্বর্গের অনুরূপ গৌরব লাভ করবে। তারা আসবে আনন্দের সাথে, কবুতরের মতো উড়ে উড়ে তাদের নীড়ের দিকে ফিরবার মতো করে আসবে, তাদের সব ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে। তারা স্বর্গে এএভাবে বসবে যেন তাদের দিনের কাজ শেষ হয়েছে; তাদের এই 'বিশ্রাম' ধারাবাহিক অর্থ প্রকাশ করে; যখন আমরা দাঁড়াই তখন আমরা চলমান থাকি, আবার যখন কোথাও বসি তখন বিশ্রাম নিই। এক্ষেত্রে স্বর্গ হচ্ছে আমাদের জন্য চিরস্থায়ী বিশ্রামের স্থান। এখানে আমরা চিরদিন বিশ্রামে থাকব; 'সিংহাসনে বসার মতো করে তারা বসবে' (প্রকাশিত বাক্য ৩:২১)। প্রকৃতই আমরা তাঁর টেবিলে বসবো। টেবিলে বসার বিষয়টি এখানে রূপকার্থে ব্যবহৃত; যা প্রকাশ করে যে, আমরা তাঁর সাথে বসে আহার করব।

এ ছাড়াও তা যোগাযোগের সম্পূর্ণতা এবং স্বাধীনতা ও রাজ্যের লোকদের সাথে

একাত্মতা– উভয় অর্থই প্রকাশ করে (লূক ২২:৩০)। তারা বসবে অব্রাহামের সঙ্গে। এখানে এই পৃথিবীতে যারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তারা সেখানে একই অবস্থায় স্বর্গে মিলিত হবে, পুরানোরা যেমন তেমনি নতুনেরাও। সেখানে প্রাচীন, আধুনিক সবারই সম্মিলন ঘটবে– যিহূদী, অযিহূদী, ধনী কি গরীব। ধনী লোকটি নরক থেকে অব্রাহামকে দেখতে পেয়েছিল কিন্তু লাসার তাঁর সাথে বসেছিল– তাঁর বুকের কাছে হেলান দিয়ে। মনে রাখুন, পবিত্র সমাজ হচ্ছে স্বর্গীয় আনন্দের একটি অংশ। যার মাধ্যমে পৃথিবীর শেষ হবে, যিনি দুর্বোধ্য তিনি পরিবারগোষ্ঠীর প্রধানদের সাথে গৌরবের সাথে আনন্দ করবেন।

(খ) অনেক যিহূদী ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে (১২ পদ)। লক্ষ্য করুন,

প্রথমে একটি অদ্ভুত বাক্য রয়েছে, 'যাদের স্বর্গ-রাজ্যে থাকবার কথা তাদের বাইরে ফেলে দেওয়া হবে'; যদিও জন্মগতভাবেই যিহূদীদের স্বর্গীয়রাজ্যের অংশী হওয়ার কথা ছিল তবুও যেহেতু তারা তাদের অবিশ্বাসের কারণে তার অংশী হওয়ার 'অযোগ্য' গণিত হয়েছে, সেকারণে তাদের ঈশ্বরের রাজ্যের দৃশ্যমান মণ্ডলীর সদস্য হওয়া থেকে ঝেড়ে ফেলা হবে। তারা নিজেদের যে রাজ্যের সন্তান বলে দাবি করতো তা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে এবং তারা অনুগ্রহ পাবে না। ফলে স্বর্গের প্রবেশ করতে পারবে না (রোমীয় ১১:২০; ৯:৩১)। সেই মহান দিনে তাঁর রাজ্যের সদস্য হওয়াটা স্বর্গে প্রবেশের মানদণ্ড হবে না– তা যেমন যিহূদীদের ক্ষেত্রে সত্য তেমনি খ্রীষ্টানদের ক্ষেত্রেও; কারণ মানুষকে তখন বিচারাসনের মুখোমুখি হতে হবে। তারা কী পরিচয় নিয়ে আছে তা তখন ধরা হবে না; কিন্তু তারা কীভাবে ছিল, কী করেছে– সেটাই বিবেচ্য বিষয় হবে। যদি তারা প্রকৃত সন্তানের পরিচয় তুলে ধরতে সক্ষম হয় তবেই উত্তরাধিকাররূপে গণিত হবে; কারণ অনেকেই আছে যারা এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং এর কাজেও নিয়োজিত আছে অথচ তারা প্রকৃতই তা নয়। তাদের কাছ থেকে তাদের উত্তরাধিকার কেড়ে নেওয়া হবে। বিশ্বাসীর ঘরে জন্ম নিয়ে আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের সন্তান অভিধা পাই, কিন্তু আমরা যদি তাতেই নিরস্ত হয়ে পড়ি এবং স্বর্গের জন্য কিছুই না করি, তবে আমরা এর বাইরে চলে যাব।

দ্বিতীয়ত, এক অদ্ভুত শাস্তির কথা এখানে বিবৃত হয়েছে যা মন্দ লোকেরা পাবে; তাদের অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলা হবে, সেই অন্ধকার তাদের জন্য যারা এর বাইরে, সেই অবিশ্বাসীদের জন্য যারা মণ্ডলীর বাইরের। সেই অন্ধকারে যিহূদীদের ফেলে দেওয়া হবে এবং যে মন্দতায় তারা অন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং তাতে মন কঠিন করে রেখেছিল তাতেই পূর্ণ হবে এবং ভয়ঙ্করতা দর্শন করবে– যা প্রেরিতেরা দেখিয়েছেন (রোমীয় ১১:৮-১০)। যারা এখন মণ্ডলীর বাইরে এবং আত্মিক বিচারে যাদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে তারা ইতোমধ্যে অন্ধকারে পতিত হয়েছে; কিন্তু এখানে মূলত দোষী পাপীরা নরকে যে শাস্তি ভোগ করবে সে দিকে নির্দেশ করা হয়েছে– তাদেরকে ঈশ্বরের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং খাঁটি লোকেরা সান্ত্বনা পাবে কিন্তু তাদের অন্ধকারে ফেলে দেওয়া হবে। নরকে রয়েছে আগুন, কিন্তু কোন আলো নেই। এটা হচ্ছে চরম অন্ধকার; যার শেষ বলে কিছু নেই। সর্বোচ্চ পর্যায়, কোন আলোর আশা বা তার ঝলক কিংবা আলো দেখতে পাবার সম্ভাবনাও সেখানে থাকবে না। এই অন্ধকার তাদের স্বর্গ বঞ্চিত হবার ফল– যাকে আলোর ভূমি বলা হয়– সেখানে তারা থাকবে না; তারা থাকবে অন্ধকার অঞ্চলে। তবুও তাই শেষ নয়, সেখানে তারা কান্নাকাটি করবে এবং যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে।

১. নরক হবে গভীর দুঃখের, অশ্রুর বন্যা বয়ে যাওয়া স্থান এবং তার কোন শেষ বা সান্ত্বনা থাকবে না। এখানে অনন্তকাল ধরে তারাই থাকবে যারা ঈশ্বরের ক্রোধ কিনেছে, তাঁর কাছে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, পাপে আগ্রাসী জীবন যাপন করেছে। ফলে এ তাদের আক্ষেপের স্থান।

২. নরক হচ্ছে ঘৃণাযুক্ত ক্রোধের স্থান। দোষী পাপীরা এখানে ঈশ্বরের পূর্ণ ক্রোধ নিজেদের দিকে টেনে আনার দরুন এখানে যন্ত্রণা ও আক্ষেপে দাঁতে দাঁত ঘষবে; কারণ তারা অন্যদের সুখী দেখবে। আর তা দেখে দেখে তাদের মনে পড়ে যাবে, 'আমিও তো সেখানে থাকতে পারতাম!' কিন্তু পরক্ষণেই তাদের মনে প্রচণ্ড ভয়-আতঙ্ক জায়গা করে নেবে; কারণ তা এখন অতীত।

৩. তিনি শতপতির দাসকে সুস্থ করলেন। খ্রীষ্ট শুধুমাত্র তার আবেদন-বিশ্বাসকে প্রশংসিত করেন নি উপরন্তু তার আবেদন পূর্ণ করলেন– যা ছিল প্রকৃত উত্তর (১৩ পদ)। লক্ষ্য করুন,

(১) খ্রীষ্ট তাকে কী বললেন: শতপতি যেভাবে তার দাসের প্রতি অনুগ্রহ দেখিয়েছিল ঠিক সেভাবে তার চেয়েও মহান এক কথার মাধ্যমে খ্রীষ্ট সেই দাসকে সুস্থ করলেন, 'আপনি যেমন বিশ্বাস করেছেন, তেমনই হোক।' এর ফলে সেই দাস তার রোগ থেকে নিষ্কৃতি পেল কিন্তু তার মনিব এখানে তার বিশ্বাসের স্বীকৃতি, সিদ্ধতা ও নিশ্চয়তা পেলেন। মনে রাখুন, খ্রীষ্ট প্রায়ই তাঁর উদ্দেশে প্রার্থনাকারীদের উৎসাহব্যঞ্জক উত্তর দিয়ে থাকেন– বিশেষত তারা যখন অন্যের জন্য চায়। এখানে আমরা অন্যদের কথা শোনা এবং তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখার বিষয়ে শিখি। ঈশ্বর ইয়োবের সব কিছু ফিরিয়ে দিলেন যখন তিনি তার বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা করলেন (ইয়োব ৪২:১০)। খ্রীষ্ট এখানে সেই শতপতিকে এক মহান সম্মান দিলেন– যখন তিনি তাকে একটি খালি চেকে যত ইচ্ছে অংক বসিয়ে নেবার মতো করে বললেন, 'আপনি যেমন বিশ্বাস করেছেন, তেমনটাই হোক।' এর বেশি তিনি আর কী পেতে পারতেন! তবুও তাকে যা বলা হয়েছে তা আমাদের প্রতিও বর্ষিত হচ্ছে, 'বিশ্বাস কর, তাহলে পাবে, কেবল বিশ্বাস কর।' এখানে খ্রীষ্টের ক্ষমতার পাশাপাশি বিশ্বাসের ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য করুন। খ্রীষ্ট যেভাবে যা ইচ্ছা তা করতে পারেন, সেভাবে সক্রিয় বিশ্বাসী খ্রীষ্টের কাছে যা চান তা পেতে পারেন; কারণ অনুগ্রহের তেল বৃদ্ধি পায় এবং তা যতক্ষণ না বিশ্বাসের জায়গা নড়বড়ে হয় ততক্ষণ বৃদ্ধি পেতেই থাকে।

(২) তার এই কথার প্রেক্ষিতে কী ঘটলো; বিশ্বাসের প্রার্থনা ছিল তাৎক্ষণিক ফল লাভের উপযুক্ত এবং তা সবসময়ের জন্য, ভবিষ্যতেও তা দেখা যাবে। এখানে তা দেখা দিল সুস্থতার তাৎক্ষণিকতার ক্ষেত্রে– যা ছিল আশ্চর্যের ব্যাপার এবং তা কাকতালীয়ভাবে খ্রীষ্টের বলার সাথেই ঘটলো; এর ফলে খ্রীষ্টই যে এই আরোগ্যকাজ করেছেন– সেটা প্রমাণিত হল। 'তিনি বললেন, আর তা হয়ে গেল।' তাঁর হাত যে কত লম্বা, এই ঘটনা সেই ক্ষমতার স্বপক্ষে প্রমাণবিশেষ। একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক খ্রীষ্টের এই আরোগ্যকাজ প্রত্যক্ষ করে বলেন, 'প্রত্যেক অবশরোগ, বিশেষত যা দীর্ঘদিনের তা সারিয়ে তোলা সম্ভব হয় না। চিকিৎসাশাস্ত্র তাকে 'সুস্থ করা যাবে না' বলে হার মেনে যায়। এমনকি যুবাবস্থায় যারা এই রোগে আক্রান্ত হয়– তাদের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। এভাবে আমি নিবিড় পর্যবেক্ষণে দেখেছি যে, খ্রীষ্টের কাছে যত রোগীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদের বেশিরভাগেরই কোন আশা ছিল না। সবাই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিল যে, একে আর

সারিয়ে তোলা যাবে না। সেই প্রেক্ষিতে এই অবশরোগীরও কোন আশা ছিল না' (মারকুরিয়ালিস ডা মরবিস পুয়েরোরাম; লিব. ২ অধ্যায় ৫)।

মথি ৮:১৪-১৭

'প্রথমে খ্রীষ্টের শিক্ষা, তারপর তাঁর চিহ্ন-কাজ'– মথির এই বিবেচনা প্রসূত বর্ণনাকে যাদের কাছে দুর্বোধ্য-ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয় তারা অনায়াসে অপর দুই সুসমাচার-লেখক মার্ক ও লূকের ঘটনাক্রমকে অনুসরণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে তারা এই পরিচ্ছেদসহ পুরো ৯ অধ্যায়কে পাহাড়ে দেওয়া শিক্ষার আগে স্থাপন করতে পারেন। ড. লাইটফুট পাহাড়ে দেওয়া শিক্ষার আগে কেবল এই পরিচ্ছেদটি নিয়েছেন এবং এরপর ১৮ পদ থেকে বাকি অংশ ধারাবাহিকভাবে এসেছে। এখানে আমরা,

ক. একটি বিশেষ চিহ্ন-কাজ দেখি; আর তা হচ্ছে পিতরের শাশুড়ির আরোগ্যলাভ, যিনি জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। এই ঘটনায় আমরা লক্ষ্য করি,

১. এমন একটি কেস যা খুব একটা অসাধারণ ছিল না। জ্বর হচ্ছে খুবই স্বাভাবিক একটি রোগ। কিন্তু রোগী ছিলেন পিতরের নিকট আত্মীয়; তা লিপিবদ্ধ হয়েছে খ্রীষ্টের অদ্ভুত যত্নের ঘটনা হিসেবে– যা তাঁর শিষ্যদের পরিবারের প্রতি তাঁর দয়ার প্রকাশ ঘটিয়েছে। এখানে আমরা দেখি যে,

(১) পিতরের স্ত্রী ছিল এবং তবুও খ্রীষ্ট তাকে তাঁর প্রেরিত হতে ডেকেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি বৈবাহিক অবস্থাকে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান করলেন। স্ত্রীর সূত্রে রচিত সম্বন্ধ বা আত্মীয়ের প্রতি খ্রীষ্টের দয়া প্রদর্শন মূলত বৈবাহিক অবস্থার প্রতি খ্রীষ্টের সম্মতির কথাই তুলে ধরে। ফলে রোমান মণ্ডলী যে যাজকদের বিয়েতে নিষেধ করে, তা কিন্তু খ্রীষ্টের শিক্ষার সাথে দ্বন্দ্ব তৈরি করে। যাজকদের বিয়েতে নিষেধের দেয়াল তুলে তারা সেই প্রেরিতের উদাহরণকেই অবজ্ঞা করে– যে প্রেরিতকে তারা আদর্শ বলে গন্য করে। প্রকৃতপক্ষে তাদের এই প্রথা খ্রীষ্টের প্রথাবিরুদ্ধ।

(২) পিতরের বাড়ি ছিল; যদিও খ্রীষ্টের তা ছিল না (২০ পদ)। এভাবে শিষ্য তার প্রভুর চেয়ে ভাল সুযোগ-সুবিধার অধিকারী ছিলেন বলে দেখা যায়।

(৩) তার বাড়ি ছিল কফরনাহুমে; যদিও তিনি ছিলেন বৈথসৈদার লোক। এটা অনুমিত যে, খ্রীষ্টের কফরনাহুমে যাবার সময়ই তিনি সেখানে স্থানান্তরিত হন এবং তারপর থেকে একেই তার মূল আবাসস্থল হিসেবে গ্রহণ করেন। মনে রাখুন, আমরা যখন আবাসস্থল পরিবর্তন করি তখন আমাদের মাথায় রাখা প্রয়োজন যেন আমরা খ্রীষ্টের কাছাকাছি থাকতে পারি এবং আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেতে পারি।

(৪) পিতরের শাশুড়ি তার পরিবারের সাথে থাকতেন– যা জোয়ালবাহীদের জন্য তাদের নিজেদের সম্পর্কের মতো অন্যদের প্রতিও দয়াবান হওয়ার উদাহরণ বিশেষ। সম্ভবত এই সৎ মহিলা ছিলেন বৃদ্ধা এবং তবুও শ্রদ্ধাভাজন এবং তার প্রতি যত্ন নেওয়া হতো– যেভাবে বৃদ্ধরা যত্ন পেতে পারে।

(৫) তিনি জ্বরে অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। তবে এইপ্রকার রোগের ক্ষেত্রে বার্ধক্যের দুর্বলতা-শীতলতা, তারুণ্যের উষ্ণতা তথা বয়স কোন প্রতিবন্ধকতা বলে গণ্য হয় না। স্থায়ীত্বের বিবেচনায় জ্বরের তীব্রতা অল্পদিনের যেখানে অবশরোগ দীর্ঘদিন ভুগিয়ে

থাকে, কিন্তু উভয়ই খ্রীষ্টের কাছে আনিত হয়েছিল।

২. ১৫ পদে আমরা তার সুস্থতার বিষয়টি দেখি–

(১) কীভাবে তা সাধিত হল; তিনি তার হাত ধরলেন; তবে তা রোগ নির্ণয়ের জন্য নয়, যেমনটা ডাক্তাররা পালস দেখে করে থাকেন; বরং তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য। এটা তার দয়া ও কোমলতাকে প্রতিফলিত করে। খ্রীষ্ট আমাদের দুর্বলতার প্রতি সহমর্মী হয়েই আমাদের স্পর্শ করেন। তাঁর হাত প্রসারণের এই দৃষ্টান্ত আমাদের আত্মিক সুস্থতা লাভের প্রতীকী চিত্র প্রকাশ করে; যে সুস্থতা আমরা লাভ করি খ্রীষ্টের বাক্যে, তাঁরই ক্ষমতার প্রয়োগ দ্বারা। তা খ্রীষ্টের কাছে আমাদের আত্মনিবেদনের চিত্রও ফুটিয়ে তোলে। শাস্ত্র তাঁর বাক্য বিবৃত করে, আত্মা আমাদের সেই স্পর্শ এনে দেয়। আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে, হাত ধরে সুস্থ করে।

(২) কীভাবে তার সুস্থতার প্রমাণ মিলল– 'জ্বর ছেড়ে যাবার পর পিতরের শাশুড়ি উঠে তাঁদের সেবা করলেন।' এর দ্বারা আমরা (ক) ঈশ্বরের অনুগ্রহের শক্তির বিষয়টি অনুধাবন করতে পারি। কারণ যারা প্রাকৃতিক নিয়মে বা ক্ষমতায় জ্বর থেকে সুস্থ হন তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তারা দুর্বল-নিঃসাড় বোধ করেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে কিছু করার প্রয়োজনীয় শক্তি নিজের ভেতর খুঁজে পান না। তাই এখানে আমরা দেখি পিতরের শাশুড়ির সুস্থতায় যে ক্ষমতা ব্যবহৃত হয়েছিল– তা ছিল প্রাকৃতিক নিয়মের ঊর্ধ্বে; তিনি স্বাভাবিকভাবেই উঠে দাঁড়ালেন এবং বাড়ির কাজকর্মে যোগ দিলেন। (খ) এই অনুগ্রহ পবিত্রীকৃত হয়েছিল এবং সেই অনুগ্রহ বাস্তবিকই ছিল পূর্ণতাপ্রাপ্ত। যদিও তা দেখা গেল তার জ্বর থেকে নিষ্কৃতি পাবার মাধ্যমে; তবুও তিনি এর গুরুত্ব, কার্যকরণ অনুসন্ধান না করেই টেবিলে অপেক্ষা করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন; যদি প্রয়োজন হয় তবে সেবাকারীর মতো যাতে সাহায্য করতে পারেন। খ্রীষ্ট যাদের সম্মানিত করেন তারা অবশ্যই বিনম্র হবে; এভাবেই তারা নিজেদের তাঁর কাছে সমর্পণ করবে। তিনি তাই করেছিলেন– যা তার পক্ষে সম্ভবপর ছিল। খ্রীষ্ট যাদের সুস্থ করেন তাদের তার সেবায় নিয়োজিত হওয়াটা জরুরি– তাঁর বিনম্র সেবাকারীর মতো, তাদের সব দিনে।

খ. এখানে খ্রীষ্টের অনেককে সুস্থ করার বিষয়ে একটি সাধারণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পিতরের শাশুড়ির এই সুস্থতা আরও অনেক রোগীকে তার সামনে এনে উপস্থিত করেছিল। 'তিনি তাকে সুস্থ করেছেন, তবে আমাকে কেন নয়? তিনি আমারই মতো একজনকে সুস্থ করেছেন, তবে আমি কেন নই?' এখন এখানে আমাদের উদ্দেশে বলা হয়েছে,

১. তিনি কী করলেন (১৬ পদ)।

(১) তিনি অনেক ভূতাশ্রিতকে সুস্থ করলেন; তাঁর কথা দ্বারা অনেক মন্দ আত্মায় পাওয়া লোককে সুস্থ করলেন। এই রোগের ক্ষেত্রে শয়তান স্বর্গীয় অনুমতি পেয়েছিল। ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে শয়তান ঈশ্বরভক্তের জীবনে শারীরিক দুর্ভোগরূপ পরীক্ষা নিয়ে আসতে সমর্থ ছিল (ইয়োবের গায়ে দেখা দেওয়া ফোঁড়ার ক্ষেত্রে আমরা তেমনটা দেখি)। ভূতগ্রস্তের দেহকে শয়তান নিজের এজেন্সি বানিয়ে রাখতো। এই রোগ মূলত মানসিক হলেও খ্রীষ্টের সময় পৃথিবীতে এই রোগের প্রকাশ দেখা যেত সাধারণ্যের চিন্তাতীত অবস্থায় তা লোকের শরীরকে যন্ত্রণা দিত; কারণ শয়তানই সেই দেহকে অধিগ্রহণ করতো এবং আসন গেড়ে বসত– 'সে ভয়ঙ্কর ক্ষোভ নিয়ে আসলো, কারণ সে জানতো তার সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে।' ঈশ্বর শয়তানকে এই কাজের অনুমোদন

দিয়েছিলেন যেন খ্রীষ্ট শয়তানের ওপর তাঁর ক্ষমতার প্রকাশে নিরপেক্ষ ও পর্যাপ্ত সুযোগ লাভ করেন এবং পৃথিবীতে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ও আয়োজন যেন প্রকাশিত হয়– যা শয়তানকে নিরস্ত্রীকৃত করে এবং তার কর্তৃত্ব হরণ করে। তাঁর ক্ষমতা শয়তানের দর্প ও ক্ষমতাকে চূর্ণ করে এবং তার কাজগুলো ধ্বংস করে। মোটকথা, খ্রীষ্টের সাফল্য যেন আরও গৌরবান্বিত রূপে প্রকাশিত হয়, সেজন্যেই ঈশ্বর এমন পরিকল্পনা সাজিয়েছিলেন।

(২) তিনি সব অসুস্থদের আরোগ্য করেছিলেন, সবাইকে– কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই; সেই রোগ যত তুচ্ছ কিংবা তার অবস্থা যত খারাপই হোক না কেন।

২. লক্ষ্য করুন, শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণী কীভাবে পূর্ণ হল (১৭ পদ)। পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা দানে খ্রীষ্টের অগ্রসরমানতা ছিল প্রশংসাব্যঞ্জক এবং তা তাঁর উপস্থিতিকে প্রামাণ্য করে তুলেছিল; কারণ এই ভবিষ্যদ্বাণী কেবল তাঁর সম্পর্কেই লেখা হয়েছিল (যিশাইয় ৫৩:৪); 'নিশ্চিতভাবেই তিনি আমাদের দুঃখ বহন করলেন এবং আমাদের কষ্ট কাঁধে তুলে নিলেন।' ১ পিতর ২:২৪ পর্বের অনুরূপ বলা হয়েছে। তবে সেখানে তা অনূদিত হয়েছে এভাবে– 'তিনি আমার পাপ তুলে নিলেন।'

অবশ্য এখানে তা একটু ভিন্নভাবে উদ্ধৃত হয়েছে, 'তিনি আমাদের দুর্বলতা তুলে নিলেন।' আমাদের পাপ আমাদের অসুস্থতা ও দুঃখের কারণ। খ্রীষ্ট তাঁর মৃত্যুর গুণে আমাদের পাপ দূর করলেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় করা চিহ্ন-কাজের মাধ্যমে আমাদের রোগ -ব্যাধি তুলে নিলেন। যেহেতু পুরাতন নিয়মে ভবিষ্যদ্বাণীকৃত আরোগ্যকাজ সম্পন্ন হয়েছে তাই আমরা বলতে পারি যে, তিনি তখন আমাদের অসুস্থতা তুলে নিলেন যখন তিনি ক্রুশে নিজের দেহে আমাদের সব পাপ তুলে নিলেন। কারণ পাপ আমাদের দুঃখ ও অসুস্থতার কারণ। বর্তমানে হাজারো রোগব্যাধির মাঝে আমাদের বাস করতে হলেও সুসমাচারের এই একটি লাইনই আমাদের তা সহ্য করতে উৎসাহিত করে– যা অন্য যেকোনও দার্শনিকের লেখা থেকে শ্রেষ্ঠ – 'যীশু খ্রীষ্ট আমাদের রোগ তুলে নিয়েছেন এবং আমাদের দুঃখ বহন করেছেন।' তিনি তা আমাদেরও আগে তুলে নিয়েছেন; যদিও তিনি কখনও অসুস্থ হন নি, তবুও তিনি ক্ষুধার্ত হয়েছিলেন তার পিপাসাবোধ ছিল। তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং আত্মায় কষ্ট পেতেন; গভীর দুঃখে তাঁর মন ভেঙে পড়েছিল, তিনি তাঁর শৌর্যে আমাদের জন্য তা বয়েছিলেন এবং তা ছিল আমাদের প্রতি তাঁর সহমর্মিতার কারণে। এর মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের দুর্বলতা অনুধাবন করতে চেয়েছিলেন এবং এভাবে দুঃখভোগের মাধ্যমে তিনি আমাদের কাছ থেকে সেই দুর্বলতাকে তুলে নিলেন। তাই এখন আমাদের মানবীয় দুর্বলতার দরুন দুঃভোগের সুযোগ নেই, যদি না তা আমাদের নিজেদের দোষের কারণে নেমে আসে। লক্ষ্য করুন, কত দৃঢ়তার সাথে একথা বর্ণিত হয়েছে যে, 'তিনি আমাদের দুর্বলতা তুলে নিলেন এবং আমাদের অসুস্থতা দূর করলেন'; বাস্তবিকই এজন্য তিনি ছিলেন সমর্থ ও আন্তরিক। চিকিৎসক হিসেবে আমাদের দুর্বলতা ও অসুস্থতার বিষয়ে অবস্থান গ্রহণের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন যথেষ্ট উদ্যোগী। মানব জীবনের দুর্যোগ-দুর্বিপাক তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন এবং বিশেষত তা তাঁরই তত্ত্বাবধানে রয়েছে। তাঁর এই নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা তাঁর আরোগ্য কাজের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানেও তাঁর সেই ক্ষমতা বা মমতার কোথাও এতটুকু ঘাটতি পড়েনি, কারণ আমরা নিশ্চিত যে, অধিকতর মন্দকাজ না করলে আমরা অবশ্যই স্বর্গে যাচ্ছি।

মথি ৮:১৮-২২

খ্রীষ্ট এখানে,

ক. চারদিকে লোকের ভিড় দেখে শিষ্যদের তিবিরিয়া সাগরের অন্য পাড়ে যাবার নির্দেশ দিলেন; এই শিষ্যরা তাঁর কাছে নৌকা নিয়ে এসেছিল এবং তাদের নৌকা প্রস্তুত দেখে খ্রীষ্ট এই নির্দেশটি দিলেন (১৮ পদ)। এতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, ধার্মিকতার সূর্য কেবল একটি জায়গায় স্থির থাকেন না বরং পুরো দেশের ওপরে আলো বিলান; তিনি অবশ্যই ভাল কিছু করার জন্যেই যাচ্ছিলেন; কারণ মন্দতায় আক্রান্ত সেই আত্মাগুলো তাঁকে কাতরস্বরে ডাকছিল, 'প্রভু, আসুন, আমাদের সাহায্য করুন' (প্রেরিত ১৬:৯)। তিনি যখন দেখলেন তাঁর পাশে ভিড় বেড়ে যাচ্ছে তখন অন্য স্থানে যেতে মনস্থ করলেন। যদিও এর দ্বারা বোঝা যায় যে, লোকেরা চেয়েছিল খ্রীষ্ট তাদের পাশে থাকুন। তবে খ্রীষ্ট জানতেন তাদের সাথে আরও অনেকেই তাঁকে পেতে কামনা করছে এবং তাদের কাছে তাঁর যাওয়াটাও জরুরি। তাঁর গমনের ক্ষেত্রে তাই কোন গ্রহণযোগ্যতা বা প্রয়োজনীয়তার প্রশ্ন ছিল না বরং একটি কারণ ছিল– তাঁকে অন্যত্রও যেতে হবে। এভাবে তিনি সেই জনতাকে এড়াতে চাইলেন, নইলে তাদের প্রবল আগ্রহ হয়তো তাদের তাঁকে অনুসরণ করতে বাধ্য করতো এবং তাঁকে তাদের সামনে রাখতে চাইতো যখন প্রচার কাজের জন্য তিনি অন্যত্র যাবার তাড়না অনুভব করছিলেন। স্বভাবতই সাহায্য পেলে অনেকে খুশি হয়; তবে কেউ যদি তা পাশেরজনকে পৌঁছে দিতে আকাঙ্ক্ষী না হয় তবে খ্রীষ্ট তাকে ত্যাগ করেন। এখানে স্পষ্টতই লক্ষণীয়, সেই লোকেরা খ্রীষ্টের সান্নিধ্য পেতে চাইছিল কিন্তু তাঁকে অনুসরণ করে অন্য পাড়ে যেতে আগ্রহী ছিল না।

খ. খ্রীষ্ট এখানে দু'জন ব্যক্তির সাথে কথা বললেন– যারা অন্য পাড়ে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। এ ছাড়া বাকি লোকদের ক্ষেত্রে আমরা ভিন্ন অবস্থান নিতে দেখি। যদিও তারা বড় জমায়েত আকারে তাঁকে অনুসরণ করে এ-পর্যন্ত এসেছিল তবুও তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভে তাদের কোন ইচ্ছে ছিল না। কারণ তা হলে তাদের 'খ্রীষ্টের শিষ্য' পরিচয়টি গ্রহণ করতে হতো; অর্থাৎ তাঁকে স্বীকৃতি দিতে হতো– যা করতে তাদের মনে দ্বিধা ও লজ্জা ছিল। ফলে তাঁর সাথে হৃদ্যতা স্থাপনেও তারা পিছপা হল। এখানে তাই সেই প্রতিবন্ধকতার একটি নমুনা আমরা দেখি– যা খ্রীষ্টের সান্নিধ্যে আসতে তথা তাঁর অনুগামী হতে মনকে দ্বিধায় ভোগায়। বস্তুত এই উদাহরণ আমাদের জন্য সাবধানবাণী বিশেষ; যেন খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে আমাদের কোন পিছুটান না থাকে এবং তাঁর ওপরই আমাদের সত্যিকারের ভিত্তি স্থাপন করি– যেভাবে আমাদের স্থাপনা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু এখানে এমন দু'জনের কথা বলা হয়েছে যারা তাঁর নৈকট্য লাভে আগ্রহী ছিল।

খ্রীষ্ট এখানে ভিন্ন প্রকৃতির দুই লোকের সাথে মিলিত হলেন, যাদের একজন ছিল দ্রুত, উত্তেজিত এবং অপরজন ছিল জড়বুদ্ধি এবং বিষাদাক্রান্ত। এখানে উভয়ের জন্যই তাঁর নির্দেশনা প্রণীত হল এবং তা আমাদের জন্যও অনুপম শিক্ষা উপস্থিত করে।

১. এখানে আমরা প্রথমজনের বিষয়ে পড়ি– যে চটজলদি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল। এই ব্যক্তিটি ছিলেন একজন ধর্ম-শিক্ষক (১৯ পদ), একজন জ্ঞানী-শিক্ষিত ব্যক্তি; ইনি ছিলেন তাদেরই একজন– যারা মোশির ব্যবস্থা অধ্যয়ন করেছিল এবং তার ব্যাখ্যা করতে সক্ষম ছিল। শাস্ত্রে আমরা এই ধর্ম-শিক্ষকগোষ্ঠীকে পাই ভণ্ড, ব্যবস্থার অপব্যাখ্যা দানকারী

হিসেবে। ফলে স্বভাবতই তারা ফরীশীদের সাথে খ্রীষ্ট ও তাঁর শিক্ষার শত্রু হিসেবে দাঁড়িয়েছিল। 'কোথায় সেই ধর্ম-শিক্ষক?' (১ করিন্থীয় ১:২০)। দৃশ্যত এই ধর্ম-শিক্ষক পুরোপুরি বিরুদ্ধস্রোতে দাঁড়িয়ে, বিরলভাবে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তবুও এখানে খ্রীষ্টের শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য তাঁর আকুতি লক্ষণীয়– যা স্পষ্টতই ভাববাদীদের মাঝে মন্দ-আত্মার উপস্থিতিকেই মূর্ত করে তোলে– ভাববাদীদের মাঝে একটি আত্মা। এখন লক্ষ্য করুন,

(১) তিনি কীভাবে তাঁর ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন, 'প্রভু আপনি যেখানে যাবেন আমিও সেখানে যাব।' এর চেয়ে আরও ভালভাবে নিজের আকুতি প্রকাশ করা যায় কিনা– তা আমার জানা নেই। ধর্ম-শিক্ষকের আত্মনিবেদনের পুরোটাই ছিল খ্রীষ্টের প্রতি-যা ছিল–

(ক) পুরোপুরি প্রস্তুত এবং তা সার্বিক নিরপেক্ষতার একটি চিত্র ফুটিয়ে তোলে, কারণ খ্রীষ্ট তাকে আহ্বান করেন নি বা তাঁর কোন শিষ্যের তাকে এই পরামর্শ দেন নি। কিন্তু তিনি স্বজ্ঞানে খ্রীষ্টের ঘনিষ্ঠ শিষ্য হতে ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন। এই সিদ্ধান্ত কেউ তার ওপর চাপিয়ে দেয় নি, তিনি নিজে থেকেই তা নিয়েছিলেন।

(খ) তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ– এক্ষেত্রে তার অবস্থানের প্রেক্ষিতে এমনটাই বলা যায়। কারণ তিনি বলেন নি, 'আপনাকে অনুসরণ করতে ইচ্ছা হয়;' তার স্থলে বললেন, 'আমি মনস্থ করেছি, আমি আপনাকে অনুসরণ করব।'

(গ) তার এই আগ্রহ ছিল অসীম এবং তার কোন মাত্রা ছিল না– 'আপনি যেখানে যাবেন আমিও সেখানে যাব।' তা কেবল সাগরের অন্য পাড়ে যাওয়াতেই সীমাবদ্ধ ছিল না; কিন্তু যদি তার জন্য গোটা পৃথিবী চষে বেড়াতে হয় তবুও তিনি তাতে সম্মত ছিলেন। এ পর্যন্ত এসে আমরা এই লোকটিকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলে ভাবতে পারি; কিন্তু ধর্ম-শিক্ষকের আন্তরিক ইচ্ছার বিপরীতে খ্রীষ্ট যা বললেন– তা আমাদের কাছে সেই ধর্ম-শিক্ষকের আসল অভিপ্রায় তুলে ধরে। খ্রীষ্টের উত্তরের মাধ্যমে আমরা দেখি যে, ধর্ম-শিক্ষকের গৃহীত সিদ্ধান্ত ছিল অবিবেচনাপ্রসূত; কারণ তার দৃষ্টি ছিল নিচের দিকে এবং ততোধিক লালসাযুক্ত। তিনি তা প্রত্যক্ষভাবে না ভাবলেও খ্রীষ্টের করা চিহ্ন-কাজ দেখে স্বভাবতই তিনি আশা করেছিলেন যে, খ্রীষ্ট এই পৃথিবীয় তাঁর রাজত্ব স্থাপন করবেন; তাই তিনি সময়মতো তাঁর সাথে যোগ দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। মনে রাখুন, ধর্মীয় ক্ষেত্রে এমন অনেক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়– যা ভাল কোন বিবেচনা থেকে আসে না বরং তা হয় ভাবাবেগতাড়িত। চটজলদি গৃহীত এই প্রকার সিদ্ধান্ত প্রকৃতপক্ষে হঠকারিতারই অন্য নাম। শেষ পর্যন্ত তা স্থায়িত্ব পায় না এবং তা কোন কাজেও আসে না– অকালপক্ক আমের স্বাদ ভাল হয় না।

(২) দেখুন, খ্রীষ্ট কীভাবে তার প্রত্যুত্তর করলেন; একথা বলে তিনি বুঝতে চাইলেন ধর্ম-শিক্ষকের আসলেই তাঁকে অনুসরণ করার ইচ্ছা আছে কিনা (২০ পদ)। তিনি তাকে জানালেন যে, মনুষ্যপুত্র– যাঁকে সে অনুসরণ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে 'তাঁর মাথা রাখারই জায়গা নেই' (২০ পদ)। এখন, খ্রীষ্টের এই চরম দারিদ্র্য থেকে আমরা পর্যবেক্ষণ করি

(ক) একটি অবাক করা ব্যাপার যে, ঈশ্বরের পুত্র পৃথিবীতে আসলেন দরিদ্রের বেশে, এমন একজনের মতো যার বিশ্রামের জন্যও উপযুক্ত জায়গার অভাব ছিল– যা সাধারণত নিম্নস্তরের প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা যায়। তবে অর্থনৈতিক অবস্থার মতো তিনি যদি আমাদের প্রবৃত্তিও নিতেন তবে তিনি সবচেয়ে সেরা জায়গাটিই বেছে নিতেন; কিন্তু না, তিনি তা

করলেন না। তিনি বেছে নিলেন চরম দারিদ্র্য। দেখুন প্রথমত, নিচু স্তরের প্রাণীগুলোরও কত ভাল ব্যবস্থা রয়েছে: 'শিয়ালের গর্ত আছে'; যদিও শিয়াল মানুষের উপকারে আসে না বরং ক্ষতি করে, তবুও ঈশ্বর তাদের থাকার জন্য গর্তের ব্যবস্থা করেছেন; ফলে মানুষ তাদের নির্মূল করতে চাইলেও দুর্গরূপ গর্তে থেকে তারা তাদের প্রাণ রক্ষা করে। আকাশের পাখিরা যদিও নিজেদের জন্য কোন চিন্তা করে না, তবুও তাদের যত্ন নেওয়া হয় এবং তাদেরও বাসা আছে (গীত ১০৪:১৭)। তারা গাছে বাসা বাঁধে। এদের কোন কোনটি অবশ্য মানুষের বাসা-বাড়িতেও থাকে– 'তোমার বেদির কাছে চড়াই পাখি ঘর বেঁধেছে' (গীত ৮৪:৩)। দ্বিতীয়ত, শিয়াল ও পাখির তুলনায় খ্রীষ্টের অবস্থা ছিল প্রকৃতই দীনহীন! তাঁর এই অবস্থা আমাদের নিজেদের প্রয়োজনের জন্য ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করতে শেখায়। পশু-পাখির প্রতিও যে ঈশ্বরের দৃষ্টি রয়েছে তা আমাদের প্রকৃতই উৎসাহিত করে যেন আমরা আমাদের প্রয়োজনের জন্য কেবল তাঁর উপর নির্ভর করি। সেই লক্ষ্যে অগ্রসর হতে খ্রীষ্টের উদাহরণ তো আমাদের সামনে রয়েছেই। মনে রাখুন, কেবল আমাদের জন্যই পৃথিবীতে থাকাকালীন খ্রীষ্ট নিজেকে চরম দারিদ্র্যের মাঝে ঠেলে দিয়েছিলেন। তাঁর কোন স্থায়ী আবাস ছিল না, বিশ্রামেরও কোন নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। নিজের বলতে তাঁর কোন বাড়ি ছিল না– যেখানে তিনি মাথা রাখতে পারতেন; এমনকি মাথা গোঁজার জন্য তাঁর একটা বালিশ পর্যন্ত ছিল না। তিনি ও তাঁর শিষ্যেরা চলতেন অন্যদের সেবা ও আতিথ্যে (লূক ৮:২)। কেবল নিজের বিনম্রতা প্রকাশ করার জন্য কিংবা শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণতা দেবার জন্যই খ্রীষ্ট এরকম চরম দরিদ্রের জীবন বেছে নেননি উপরন্তু তিনি চাইলেন যেন আমরা তাঁরই মতো জাগতিক ধন-সম্পদের মায়ামুক্ত থাকি এবং এক্ষেত্রে পবিত্রতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হই– 'যেন তিনি আমাদের জন্য ভাল কিছু কিনতে পারেন এবং আমাদের ধনী করতে পারেন' (২ করিন্থীয় ৮:৯)।

(খ) এক্ষেত্রে খ্রীষ্ট যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা এত অসাধারণ যে, এমন পরিস্থিতিতে তা ছিল সত্যিই আশ্চর্যের। যখন সেই ধর্ম-শিক্ষক খ্রীষ্টের কাছে তার আবেদন জানালেন তখন যে কারও এমনটা ভাবাই ছিল স্বাভাবিক যে, খ্রীষ্ট তাকে উৎসাহ দিয়ে বলবেন, 'এসো, আমার কাছে এসে বস।' কারণ জেলেদের চেয়ে নিশ্চিতভাবেই এই ধর্ম-শিক্ষক তার জ্ঞান ও বুদ্ধিতে খ্রীষ্টের সেবায় আরও বেশি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পারতেন। কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর অন্তর দেখেছিলেন এবং তা থেকেই তাঁর এই উত্তরটি বেরিয়ে এসেছিল। বস্তুত এটি আমাদের শেখায়– কী প্রকার মনোভাব নিয়ে খ্রীষ্টের কাছে আসতে হবে। প্রথমত, ধর্ম -শিক্ষকের সিদ্ধান্ত ছিল তাৎক্ষণিকভাবে নেওয়া এবং এই স্থলে খ্রীষ্ট আমাদের পেতে চান ধীর, বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্তের দ্বারা– 'আমরা মনস্থ করেছি তাঁর পথে থাকব এবং তাতে স্থির থাকবো' (লূক ১৪:২৮); এর মূল্য বুঝে তারপরই এগুবো এবং এই সিদ্ধান্ত আমরা জেনে শুনেই নেব। কারণ, যারা আবেগতাড়িত হয়ে কোন পথ বেছে নেয়, তারা আবেগ ফুরিয়ে গেলে কিংবা সমস্যায় পড়লে তা ছেড়ে যেতে বিন্দুমাত্র ভাবে না। তাই কেউ যদি খ্রীষ্টের পথে আসতে চায় তবে তাকে সময় নিয়ে তার সিদ্ধান্ত নিতে বলুন। তাকে জানতে দিন– এই পথে কত কষ্ট এবং সমস্যা অপেক্ষমান। তাকে বোঝান, খ্রীষ্টের পথে অগ্রসর হতে গেলে কতটা দৃঢ়চেতা হতে হবে। ত্বরিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কাউকে খুশি করার জন্য কিংবা কাউকে চমকে দেওয়ার জন্য। কিন্তু খ্রীষ্টের সান্নিধ্য লাভের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কাউকে চমকে দেওয়ার কিছু নেই। 'যে বিষয়ে সবাই আগে থেকেই অবগত– তা নতুন

করে বললে কারও মনে বিস্ময়ের উদ্রেক হয় না'। দ্বিতীয়ত, ধর্ম-শিক্ষকের দৃষ্টি ছিল প্রার্থিব সম্মান-সম্পদের দিকে, তার মূল লক্ষ্য ছিল লালসায় মোড়ানো। তিনি খ্রীষ্টের চিহ্ন-কাজের মাহাত্ম্য দেখে ভাবলেন– খ্রীষ্ট এর প্রতিদানে নির্ঘাত বড় কিছু পেতে চলেছেন; শীঘ্রই রাজত্ব -গৌরব তাঁর আয়ত্তে আসবে। ফলে সেই চিন্তা থেকে তিনি তাঁকে অনুসরণ করে ধনী হিসেবে নিজের অবস্থান পোক্ত করতে চাইলেন। কিন্তু খ্রীষ্ট তার ভুল ভেঙে দিলেন এবং তাকে বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর এরকম ধনী হবার কোন সম্ভাবনা নেই; যেখানে তার মাথা গোঁজারই জায়গা নেই, সেখানে এটা তো আরও অসম্ভব। তাই তিনি যদি তাঁকে অনুসরণ করেন তবে তিনি যা চাইছেন তা কখনো পাবেন না। মনে রাখুন, কেউ যদি জাগতিক অর্থসম্পদের মোহে তাঁর অনুসরণ করে কিংবা স্বর্গ ছাড়া অন্য কিছুর প্রত্যাশা করে– তবে খ্রীষ্ট তাকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করবেন না। খ্রীষ্টের কাছ থেকে নিজের প্রত্যাশার উত্তর পেয়ে ধর্ম-শিক্ষকের মুখ কালো করে চলে যাওয়াটাই প্রমাণ করে যে, তিনি প্রকৃতই সম্পদ-সম্মানের মোহে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। স্পষ্টতই খ্রীষ্ট তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। ধর্ম-শিক্ষক বুঝে গেলেন যে, তার স্বপ্ন কখনও সত্যি হবে না। ফলশ্রুতিতে তিনি আর খ্রীষ্টের সাথে থাকাকে শ্রেয়জ্ঞান করলেন না। অর্থাৎ মুখে তিনি খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলেও তার মনের অভিপ্রায় ছিল ভিন্ন। বাস্তবিকই খ্রীষ্টের কাছে দুরভিসন্ধিকারী অনুসারীর কোন স্থান নেই।

২. এখানে আমরা আরেকজনের বিষয়ে দেখতে পাই যিনি কাজের ক্ষেত্রে ছিলেন খুবই ধীরগতি। কারণ দেখিয়ে দেরি করাটা একদিকে যেমন খুবই খারাপ লক্ষণ তেমনি তা সিদ্ধান্তের দৃঢ়তাকেও নষ্ট করে দেয়– যেহেতু তাতে আন্তরিকতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। সময় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, কালকের জন্য কোন কাজ ফেলে রাখা উচিত নয়। যা আজই করা প্রয়োজন তা দেরি না করে শীঘ্রই করে ফেলতে হবে। এখন আমরা যার বিষয়ে বলছি তিনি ইতোমধ্যে খ্রীষ্টের শিষ্য হিসেবে তাঁকে অনুসরণ করছেন (২১ পদ)। ক্লিমেন্স আলেকজান্দ্রিনাস তার প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থে (ঐতিহ্যিক ইতিহাস সংরক্ষণ পদ্ধতিতে রচিত) আমাদের বলেন যে, ইনি ছিলেন ফিলিপ; তাকে আগেরজনের চেয়ে যোগ্য এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনে করা হয়, কারণ তিনি অত্যুৎসাহী-উদ্ধত ছিলেন না। অত্যুৎসাহীরা ঈশ্বরের পথে প্রতিশ্রুতিশীল বলে বিবেচিত হন না; উপরন্তু তাদের ভাবনায় 'জাগতিকতা' প্রায়শই প্রথম স্থানে চলে আসে। লক্ষ্য করুন,

(১) এই শিষ্য যে অজুহাত দিয়েছিলেন– যা তাৎক্ষণিকভাবে খ্রীষ্টের অনুগমনের ক্ষেত্রে তার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল (২১ পদ)– 'প্রভু, আমার পিতাকে দাফন করে আসতে দিন; আপনার অনুসরণ করতে এবং তাতে স্থির হওয়ার আগে আমার মৃত পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে আমাকে তার শেষকৃত্য করে আসতে দিন। ততক্ষণ আপনি অন্যদের সাথে কথা বলতে থাকুন এবং আমার স্থলে কাউকে নিন।' অনেকের মতে তার পিতা সেসময় মুমূর্ষু ছিলেন অথবা মারা গেছেন। আবার অন্যরা বলেন যে, তিনি ছিলেন বয়োবৃদ্ধ; ফলে স্বাভাবিক নিয়মে চলাফেরা করতে পারছিলেন না। তাই ফিলিপ তার পিতার দেখাশোনা করার জন্য তার কাছে ফিরে যেতে খ্রীষ্টের অনুমতি চাইলেন; যেন পিতার মৃত্যুর সময় তিনি তার পাশে থাকতে পারেন এবং পিতাকে কবরস্থ করতে পারেন। এ ছাড়া পিতার প্রতি কর্তব্যের পালা সমাধা হলে পর তিনি পুনরায় খ্রীষ্টের অনুগমন করবার প্রত্যাশা ব্যক্ত করলেন। ফিলিপের– প্রদর্শিত এই কারণকে যদিও ভ্রান্তহীন বলে মনে হয় তবুও খ্রীষ্ট

তাতে সায় দিলেন না। কারণ, ফিলিপ যে দায়িত্বের কথা উত্থাপন করেছিলেন তাতে মানসিকভাবে তারও খুব একটা সায় ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তার মন পড়ে ছিল খ্রীষ্টের কাছে। ফলে যদিও তিনি তার পিতার প্রতি দায়িত্বের বিষয়টি অনুভব করেছিলেন এবং খ্রীষ্টের কাছে তা পালনের অনুমতি চাইছিলেন তবুও খ্রীষ্টের সঙ্গ ত্যাগে তার মন সায় দিচ্ছিল না। বস্তুত ফিলিপ এক প্রকার দোটানায় পড়ে গিয়েছিলেন। তবে তিনি মোটেও খ্রীষ্টের অনুগমনে পিছপা হওয়ার জন্য এই অজুহাত দেন নি। মনে রাখুন, যে তার কাজের প্রতি আন্তরিক সে কখনো কোন অজুহাত খোঁজে না। খালি পর্বের মানে হচ্ছে সেটা আগে থেকেই শূন্য ছিল– বিশ্রাম চাওয়া কেবল তারই থাকে যে কাজের প্রতি আন্তরিক। আমরা একে তার পিতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকে এসেছে বলে ধরে নিতে পারি, তবুও এখন পর্যন্ত তিনি খ্রীষ্টকেই প্রথম স্থান দিয়ে রেখেছেন। মনে রাখুন, অনেকেই পারিবারিক কিংবা ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে ঈশ্বরের প্রতি অবিচল থাকতে ব্যর্থ হয়। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই তারা ঈশ্বরের প্রতি তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে বিস্মৃত হয় এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনে তাদের আগ্রহ পৃথিবীর রঙচঙে বিষয়-আশয়ের কাছে হেরে যায়। তাই এক্ষেত্রে বিশ্বাসীদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আরও সচেতন থাকতে হবে।

(২) খ্রীষ্ট তার এই অজুহাতকে আমলে না নিয়ে বললেন (২২ পদ); 'আমাকে অনুসরণ কর'; সন্দেহ নেই, তাঁর এই কথা অন্যদের মতো ফিলিপকেও মানসিক শক্তি জুগিয়েছিল। ফলে তিনি তাঁকে অনুসরণ করলেন এবং তাতেই নিবিষ্ট থাকলেন– যেমনটা রুত নয়মীর ক্ষেত্রে করেছিলেন। অথচ একটু আগেই আমরা দেখি পুরো ভিন্ন চিত্র; সেখানে সেই ধর্ম-শিক্ষক নয়মীর ছেলের বৌ অর্পার মতো খ্রীষ্টকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। খ্রীষ্টের 'আমাকে অনুসরণ কর'– এই কথার প্রেক্ষিতে তার উত্তর ছিল, 'আমি আপনাকে অনুসরণ করব।' এই দুই ব্যক্তির তুলনা করতে গেলে আমরা বুঝতে সমর্থ হই যে, আমরা খ্রীষ্টের আহ্বানের শক্তিতেই তাঁর অনুগামী হই; তাঁকে অনুসরণ করি। সেটা কোন প্রতিশ্রুতি বা ব্যক্তিক অভিপ্রায় থেকে সম্ভবপর হয় না। খ্রীষ্টকে অনুসরণ করাটা এমন নয় যে, কেউ ইচ্ছা করল, তা পেতে দৌড়াল; আর তাঁকে পেয়ে গেল। এক্ষেত্রে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও আহ্বান মূল ভূমিকা পালন করে। ঈশ্বর যদি কাউকে আহ্বান না করেন তবে তার পক্ষে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তিনি তাকেই আহ্বান করেন যাকে তিনি চান (রোমীয় ৯:১৬)। তাই অযথা শ্রমক্ষেপণ এখানে নিষ্ফলই।

মনে রাখুন, যদিও বাছাইকৃতদের অনেকে অজুহাত দাঁড় করায় এবং তাঁর আহ্বানের প্রত্যুত্তরে দেরি করতে চায় তবুও খ্রীষ্ট এখানে তাঁর উত্তর দ্বারা সব অজুহাত দূরীভূত করলেন, তাদের অনিচ্ছাকে জয় করলেন এবং তাঁর চরণে তাদের নিয়ে আসলেন। খ্রীষ্ট যখন কাউকে আহ্বান করেন তখন তিনি যে বিজয়ী হবেন তা নিশ্চিত সত্য। খ্রীষ্ট তাঁর আহ্বানকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করতে বদ্ধপরিকর (১ শমূয়েল ৩:১০)। খ্রীষ্টের এই উক্তিতে ফিলিপের দেওয়া অজুহাত একপাশে স্থবির হয়ে পড়ে রইল– 'মৃতরাই মৃতদের কবর দিক।' এখানে খ্রীষ্ট একটি প্রতীকী উত্তর দিলেন, কারণ বাস্তবে একজন মৃত ব্যক্তি অপর মৃতকে দাফন করার ক্ষমতা রাখে না। 'খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতে গিয়ে পিছু হটার চিন্তা যতটা অবাস্তব তার চেয়ে কোন মৃতের পক্ষে অপর মৃতকে দাফন করাটা ঢের বাস্তব।' অর্থাৎ খ্রীষ্টের সান্নিধ্যে পথ চলা শুরু করে কারও পক্ষে পিছিয়ে আসাটা খুবই কঠিন। খ্রীষ্টের এই উক্তি আরও একটি অর্থ নির্দেশ করে– যারা আত্মিকভাবে মৃত তারা

জাগতিকভাবে মৃতদের কবর দিক। 'জাগতিক বিষয়-আশয় জগতের লোকদের জন্যই ফেলে আস, নিজেকে তার মাঝে টেনো না। যদিও মৃতকে দাফন করা, বিশেষত মৃত পিতাকে দাফন করা একটি ভাল কাজ, কিন্তু তা এই সময়ে তোমার জন্য প্রযোজ্য নয়। যারা আহ্বান পায় নি কিংবা অযোগ্য, তারাই বরং এই কাজ করুক। তোমার এক্ষেত্রে অল্পই করার আছে, তাই তা করতে গিয়ে মূল কাজকে পেছনে ফেলে দিও না।' মনে রাখুন, পিতামাতারও আগে আমাদের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত হতে হবে; যদিও পিতামাতার প্রতি কর্তব্যপালন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই মহৎ বলে গণিত হয়। ব্যবস্থা মতে নাসরতীয়রা তাদের পিতামাতার মৃত্যুতে শোক করতে পারতো না, কারণ তারা ছিল ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্রীকৃত (বংশাবলি ৬:৬-৮); এমনকি মহা-পুরোহিতও মৃতদেহ ছুঁয়ে নিজেকে অপবিত্র করতো না; এমনকি সেই মৃতদেহ তার নিজ বাবা-মায়ের হলেও (লেবীয় ২১:১১)। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের এই শিক্ষা দিলেন যে, তারা ঈশ্বরের সাথে পিতা-মাতার দ্বন্দ্বে পিতামাতাকে ঘৃণা করবে; উপরন্তু ঈশ্বরকে পিতামাতার চেয়েও বেশি ভালবাসবে, প্রাধান্য দেবে। যদি দেখা যায়, আমাদের কাছের মানুষেরা ঈশ্বরের পথে হাঁটতে, তাঁর জন্যে কাজ করতে বা তাঁর পথে দুঃখভোগ করার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে– তবে উভয়ের তুলনায় আমরা ঈশ্বরকেই প্রাধান্য দেব।

মথি ৮:২৩-২৭

খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের তিবিরিয়া সাগরের অন্য পাড়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন (১৮ পদ)। সাগরের অন্য পাড়ে ছিল গাদারীয়দের বাস। নৃতাত্ত্বিকভাবে এরা ছিল 'গ্যাদ' উপজাতির এবং ভৌগোলিকভাবে যর্দন নদীর পূর্ব পাশে ছিল এদের অবস্থান। খ্রীষ্ট সেখানে মন্দতায় আশ্রিত অনুন্নত মানুষদের উদ্ধার করতে চললেন; যদিও তিনি আগেই দিব্যচোখে দেখতে পেয়েছিলেন যে, সেখানে গিয়ে তিনি অসম্মানিত হবেন। এখন

১. তিনি সেখানে যেতে জলপথ বেছে নিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অবস্থান বিচারে গাদারীয়দের এলাকা খুব বেশি দূরত্বে ছিল না। তিনি যদি চাইতেন তবে হাঁটাপথেও যেতে পারতেন; কিন্তু তবুও তিনি সাগর পাড়ি দিতেই মনস্থ করলেন। কারণ এর মধ্য দিয়ে তিনি দেখাতে চাইলেন যে, ভূমির মতো সাগরের ওপরও তার একচ্ছত্র ক্ষমতা রয়েছে। সেই সাথে স্বর্গ ও পৃথিবীর সব কিছুর ওপরই যে তাঁর ক্ষমতা রয়েছে তা দেখাতে চাইলেন। যারা জাহাজে চড়ে সাগর পাড়ি দেন এবং পথিমধ্যে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হন তাদের মনে এই ঘটনাটি যথেষ্টই উৎসাহের সঞ্চার করবে যে, তাদের এমন একজন পরিত্রাণকর্তা আছেন, যিনি জানেন সাগরে কী ঘটবে। ফলে সাগরে প্রবল ঝড় উঠলেও তিনি তাদের প্রার্থনা শ্রবণ করে তাদের রক্ষা করবেন। কিন্তু লক্ষণীয়, তিনি কোন প্রমোদতরী বা বড় জাহাজ নিয়ে সাগরে পাল তুললেন না; বরং দরিদ্রের বেশে শিষ্যদের মাছ-ধরার নৌকায় চেপে রওনা হলেন।

২. তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে অনুসরণ করল। কেবল বারোজন তাঁর ঘনিষ্ঠ হল, বাকীরা তীরে থেকে গেল। বাস্তবিকই তারা পায়ে হেঁটে নিরাপদ ভ্রমণের স্থলে জলপথের বিপদসংকুল পথযাত্রাকে স্বাগত জানায় নি। মনে রাখুন, তারা, শুধুমাত্র তারাই খ্রীষ্টের সত্যিকারের শিষ্য বলে বিবেচিত হবে -যারা প্রভুর সাথে সাগরে বাধা-বিঘ্নতার মাঝে

যেতেও কুণ্ঠিত হবে না; উল্টো কঠিন বিপদকে মেনে নিতে উৎসাহী হবে। অনেকেই বিপদসংকুল জলপথ না ধরে স্থলপথে স্বর্গে যেতে চায় এবং সেই নিরাপদ পথে থাকতেই মনস্থ করে। এর অবশ্য একটা কারণও রয়েছে– সেখান থেকে চাইলেই পিছু হটা যায়। কিন্তু যারা প্রকৃতই খ্রীষ্টের অনুগমন করে তারা বিলাসবহুল বাড়িতে থেকে আয়েশ করার চেয়ে খ্রীষ্টের জন্য সমস্যাকে বন্ধু জ্ঞান করে কঠিন বিপদ কিংবা জেলের জীবনকে মেনে নিতেও রাজি থাকে। এখন লক্ষ্য করুন,

ক. এই পথযাত্রায় শিষ্যদের ওপর কঠিন বিপদ এবং অনিশ্চয়তা নেমে এল। তারা খ্রীষ্টের বলা সত্যিকারের বিপদের মুখোমুখি হল (২০ পদ)।

১. 'তারা ঝড়ের কবলে পড়লেন'– (২৪ পদ)। খ্রীষ্ট এই ঝড়ের আগমনকে রুখতে পারতেন এবং তাকে অন্য পথে চলে যেতে দিতে পারতেন কিন্তু তাহলে তার গৌরব প্রকাশ করা সম্ভব হতো না এবং শিষ্যদের বিশ্বাসের স্থিরতাও পরীক্ষা করা যেত না। নিজেদের মাঝে খ্রীষ্টের উপস্থিতি সত্ত্বেও তারা ঝড়ের কবলে পড়লেন। বাস্তবিকই এই ঝড়ের প্রচণ্ডতা ছিল ব্যাপক। পুরাতন নিয়মে আমরা যোনাকে এ রকম ঝড়ের কবলে পড়তে দেখি। (যোনা ১১:৪)। অনেকে এমনটা প্রত্যাশা করতে পারে, খ্রীষ্ট যেহেতু তাদের সাথে আছেন সেহেতু তাদের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক থাকবে; কোন ঝড় আসবে না। কিন্তু এখানে আমরা পুরো ভিন্ন চিত্র দেখি। যা আমাদের বলে দেয়, খ্রীষ্টের সান্নিধ্যে আমরা এই পৃথিবীতে নিশ্চিতভাবেই ঝড়ের মুখে পড়ব। তার মণ্ডলীর ওপর ঝড় ধেয়ে আসবে (যিশাইয় ৫৪:১১) । উঁচু অঞ্চলে বাসকারী লোকেরা সাধারণত প্রতিকূল পরিস্থিতি-আবহাওয়ার মুখে পড়ে না। ফলে তারা মোটামুটি চিরস্থায়ী বিশ্রাম উপভোগ করে। কিন্তু নিম্নাঞ্চলের বাসিন্দাদের 'সিডর' কিংবা 'আইলা'কে নিয়েই বেঁচে থাকতে হয়।

২. খ্রীষ্ট এই ঝড়ের সময় ঘুমিয়ে ছিলেন। আমরা কোথাও খ্রীষ্টকে ঘুমাতে দেখি না, কিন্তু এখানে তা লক্ষ্য করি। তিনি সারারাত ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করতেন এবং প্রায়ই সামনের দিকে লক্ষ্য রাখতেন। এর ফলে শারীরিক ক্লান্তিবশত তিনি ঘুমিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই ঘুম যোনার মতো ঝড় থেকে বাঁচবার জন্য নয় বরং পবিত্র প্রশান্তির জন্য, তাঁর পিতার প্রতি নির্ভরতার জন্য। তাঁর এই ঘুমিয়ে পড়াটা প্রমাণ করে যে, তিনি সত্যিই মানুষ ছিলেন। তবে 'দৈহিকভাবে মানুষ হলেও স্বভাবে তিনি ছিলেন ঈশ্বর'। যেকারণে তিনি আমাদের মতো পাপের স্বভাব বা প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত ছিলেন না। তাঁর কর্মক্লান্তিই তাঁকে ঘুমাতে বাধ্য করেছিল; তাঁর বিশ্রামের দরকার ছিল। কেউ তাঁকে বিরক্ত করবে কিংবা শীঘ্রই তাঁকে জেগে উঠতে হবে– এই ভাবনা তাঁর বিশ্রাম গ্রহণকে প্রভাবিত করতে পারে নি। তাঁর এই বিশ্রাম ছিল আশঙ্কামুক্ত, নিশ্চিন্ত। যারা পবিত্র হৃদয়ে বালিশে মাথা রাখতে পারে, তারা ঝড়ের মধ্যেও নির্ভয়ে-শান্তিতে ঘুমাতে পারে (গীত ৪:৮)। জেলের ভেতর পিতরও এভাবে নির্ভয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন (প্রেরিত ১২:৬)। খ্রীষ্ট তখন ঘুমিয়ে ছিলেন; কারণ তিনি তাঁর শিষ্যদের বিশ্বাসের গভীরতা পরখ করে দেখতে চাইলেন। কিংবা হতে পারে তিনি তাদের বিশ্বাসে ঘাটতি দেখেছিলেন। তিনি নিজেকে সতেজ করে তোলার জন্য গভীর ঘুমে তলিয়ে যান নি; বরং তন্দ্রার মতো বিশ্রাম নিচ্ছিলেন– যেন চাইলেই জেগে উঠতে পারেন।

৩. বিশ্বাসে দরিদ্র শিষ্যেরা যদিও সাগরে চলতে অভ্যস্ত ছিলেন তথাপি তারা সেসময় সাগরের উত্তাল অবস্থা দেখে ভীত হয়ে উঠলেন এবং নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের প্রভুকে জাগিয়ে তুললেন (২৫ পদ)। এ ছাড়া তারা আর কার কাছেই বা যাবে? তারা তাঁকে

কাছে পেয়েছিল– এটা তাদের জন্য ছিল মস্ত উৎসাহের ব্যাপার। তারা তাদের এই প্রার্থনা দ্বারা তাঁকে জাগাল, 'প্রভু, আমাদের রক্ষা করুন, আমরা যে মারা পড়লাম।' মনে রাখুন, যারা প্রার্থনার বিষয়ে শিখতে চায় তাদের অবশ্যই সাগরে যেতে হবে। ভয়ঙ্কর বিপদ লোকদের তাঁর কাছে নিয়ে যায়– যিনি তাদের সাহায্য করতে পারেন। তাদের এই প্রার্থনায় স্পষ্টতই বেঁচে থাকার আকুতি ধরা পড়ে, 'প্রভু, আমাদের রক্ষা করুন, আমরা যে মরলাম।'

(১) তাদের আবেদন ছিল, 'প্রভু আমাদের বাঁচান'। তাদের মনে এই বিশ্বাস ছিল, খ্রীষ্ট তাদের বাঁচাতে পারেন। সেকারণেই তারা তাঁর কাছে বিনতি জানাল। পৃথিবীতে খ্রীষ্টের কাজই ছিল– আমাদের রক্ষা করা। 'কিন্তু যারা সদাপ্রভুকে ডাকবে কেবল তারাই রক্ষা পাবে' (প্রেরিত ২:২১)। যারা বিশ্বাসে অনন্ত জীবনের প্রতি আগ্রহী হয়, খ্রীষ্ট তাদের তাঁর রক্ত দিয়ে নিজের করে নেন। ফলে বিনম্র আত্মবিশ্বাসে তারা তাঁর কাছে জাগতিক সমস্যার জন্য নিজেদের সমর্পণ করবে। লক্ষ্য করুন, তারা তাঁকে 'প্রভু' বলে ডাকল, তারপর প্রার্থনা জানাল, 'আমাদের বাঁচান'। মনে রাখুন, যারা বাঁচতে চায় এবং সেজন্য প্রভুর কাছে আকুতি জানায় খ্রীষ্ট কেবল তাদেরই রক্ষা করেন; কারণ তিনি মহান রাজা ও পরিত্রাণকর্তা।

(২) তাদের ভীত উচ্চারণ ছিল, 'আমরা যে মারা পড়লাম'; যা ছিল (ক) তাদের ভয়ের ভাষ্য। তারা দেখেছিল, তাদের ওপর কী বিপদ চেপে বসেছে এবং 'যা হয় হবে' ভেবে হাল ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর তারা মৃত্যুর প্রহর গুনছিল। তারা যে নিজ চোখে তাদের মৃত্যুদশা দেখতে পাচ্ছিল তা এই বাক্যে লক্ষ্য করা যায়, 'আমরা মারা যাচ্ছি; আমাদের সবকিছুই এখন আপনার হাতে। এখন আমাদের রক্ষা করুন, করুণা করুন।' (খ) তাদের স্বরে ব্যাকুলতা ঝরে পড়ছিল; তারা এমন একজনের মতো প্রার্থনা করছিলেন যে উত্তর পেতে উদগ্রীব; কারণ তারা প্রাণভিক্ষা চাইছিল। এভাবে আমাদেরও প্রার্থনায় যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে এবং তাতে স্থির থাকতে হবে। যেহেতু খ্রীষ্ট ঘুমিয়ে আছেন সেহেতু প্রার্থনার মাধ্যমে আমাদের তাঁকে জাগিয়ে তুলতে হবে। জেগে উঠে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেবেন।

খ. খ্রীষ্টের ক্ষমতা ও অনুগ্রহ তাঁর শিষ্যদের প্রতিকারে ব্যবহৃত হল। একজন সতেজ মানুষের মতো খ্রীষ্ট জেগে উঠলেন (গীত ৭৮:৬৫)। মণ্ডলীর ওপর যখন ঝড় আসে তখন খ্রীষ্ট এভাবে ঘুমিয়ে থাকলেও তাতে স্থির থাকেন না; নিরূপিত সময়ে মণ্ডলীর সাহায্যে তিনি জেগে ওঠেন (গীত ১০২:১৩)।

১. তিনি শিষ্যদের ধমক দিলেন (২৬ পদ)– 'ওহে অল্পবিশ্বাসীরা, কেন তোমরা ভয় পাচ্ছ?' শিষ্যেরা যে তাদের প্রার্থনায় তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছেন সেজন্য তিনি তাদের দোষী করলেন না বরং দোষী করলেন এই কারণে যে, তারা অতিমাত্রায় ভয় পেয়েছিল। খ্রীষ্ট প্রথমে তাদের সমালোচনা করলেন এবং তারপর তাদের সাহায্য করলেন; এটাই তার কার্যপ্রক্রিয়া। তিনি তাঁর অনুগ্রহ দানের ক্ষেত্রে প্রথমে আমাদের সমালোচনা করেন এবং তারপর তা দেন। লক্ষ্য করুন,

(১) তাঁর অপছন্দ ছিল তাদের ভয়। 'তোমরা কেন ভীত? আমার মনে সন্দেহ জাগছে যে, আসলেই তোমরা আমার শিষ্য কি না। ভয় তো পাবে সিয়োনের পাপীরা, ঝড়ের সাথে লড়াই করে নিষ্ক্রান্ত তো হবে অবিশ্বাসীরা, তবে তোমরা কেন? তোমাদের ভয়ের কারণ অনুসন্ধান কর এবং তা ঝেড়ে ফেল।'

(২) তিনি তাদের ভয়ের কারণ ও তার সংক্রমণ আবিষ্কার করে বললেন– 'ওহে অল্প-

বিশ্বাসীরা'। অনেকের বিশ্বাস এ রকম দুর্বল অবস্থায় রয়েছে; বাস্তবিকই বাধা-সমস্যা এলে তা টলে যায়। মনে রাখুন, (ক) ঝড়ের কবলে পড়ে শিষ্যরা চিৎকার জুড়ে দিয়েছিল। তাদের মাঝে যে ঈর্ষার মনোভাব ছিল তা-ই তাদের ওপর এই দুঃখভোগ নিয়ে এসেছিল– যা খারাপ বই ভাল ফল বয়ে আনে না। (খ) ঝড়ের সময়ে নিজেদের কৃতকর্মের কারণেও আমাদের ওপর ভয় চেপে বসতে পারে। এই ভয় আমাদের আত্মাকে বিশ্বাসে অটল থাকতে বাধা দেয় এবং মনকে বিক্ষিপ্ত করে তোলে। কেবল বিশ্বাসেই আমরা ঝড়ের মধ্য দিয়েও নীরব তীর দেখতে পাই এবং এই আশায় বুক বাঁধতে সক্ষম হই যে, আমরা এই প্রতিকূল আবহবাকে অনুকূলে নিয়ে আসতে পারবো। (গ) ঝড়ের সময় শিষ্যদের ভীতি এবং তাদের অবিশ্বাস খ্রীষ্টকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল, কারণ এর ফলে তারা তাঁকে অসম্মানিত করার পাশাপাশি নিজেদের জন্যও বিরক্তির উদ্রেক করেছিল।

২. 'খ্রীষ্ট বাতাসকে ধমক দিলেন।' এর আগে তিনি অনুগ্রহের ঈশ্বর ও হৃদয়ের রাজা হিসেবে শিষ্যদের ধমক দিয়েছিলেন; কারণ তিনি তাঁর শিষ্যদের সংশোধনের পথে নিয়ে আসতে চান। আর এখানে তিনি প্রকৃতির ঈশ্বর ও পৃথিবীর রাজা হিসেবে বাতাসকে ধমক দিলেন; কারণ তিনি আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আন্তরিক। এ সেই শক্তি যা সমুদ্রের গর্জনকে নীরব করে দেয় এবং সব ভীত কোলাহলকে থামিয়ে দেয় (গীত ৬৫:৭)। দেখুন,

(১) কত সহজে তা সাধিত হল– কেবল একটি কথার দ্বারা। মোশি একটি লাঠি দ্বারা জলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যিহোশূয় দিয়েছিলেন নিয়ম-সিন্দুক দ্বারা, এলিয় ভাববাদীর পোশাক দ্বারা, কিন্তু খ্রীষ্ট তা করলেন কেবল মুখের কথায়। দেখুন সৃষ্টজগতের সবকিছুই তার আদেশের অধীন। এই অনুপম সত্য একাধারে তাঁর সম্মান ও তাঁর সাথে যারা চলে তাদের আনন্দের বিষয়ে বলে।

(২) কতটা কার্যকরভাবে তা সাধিত হল। 'তখন সবকিছু খুব শান্ত হয়ে গেল'। সাধারণত ঝড়ের পরও জলে তার আলোড়ন থেকেই যায় এবং সেই আলোড়ন থামতেও সময় লাগে। কিন্তু খ্রীষ্টের কথায় কেবল ঝড় থেমেই গেল না উপরন্তু এর সব পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও থেমে গেল। মনের ভয় এবং সন্দেহের ঝড় খ্রীষ্টের ক্ষমতায় এসে কিছু সময় পরেই তা স্বাভাবিক হয়ে আসে।

৩. এই ঘটনা শিষ্যদের অবাক করে দিয়েছিল (২৭ পদ); 'ইনি কি রকম লোক!' তারা সাগরে অনেক পথ চলেছে এবং কখনো এমনটা দেখেনি যে, ঝড় থেমে যাওয়ার পর দ্রুতই সবকিছু এমন শান্ত হয়ে যায়। এই চিহ্নকাজে তাদের বিস্মিত হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। কারণ, 'ঈশ্বরই তা করেছেন এবং আমাদের কাছে তা খুব অবাক লাগে'। লক্ষ্য করুন,

(১) খ্রীষ্টের প্রতি তাদের প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টি– 'ইনি কী রকম লোক!' মনে রাখুন, খ্রীষ্ট হচ্ছেন অনন্য; তাঁর সবকিছুই প্রশংসার যোগ্য। তাঁর মতো এত জ্ঞানী, শক্তিমান, বন্ধুসুলভ আর কেউ নেই।

(২) তাদের এই বিস্ময়ের কারণ: 'এমনকি বাতাস ও সাগরও তাঁর কথা শোনে!' খ্রীষ্ট এখানে সাগর ও বাতাসের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার জন্য প্রশংসিত হলেন। কেউ কেউ রোগ সারিয়ে তুলতে সক্ষম হলেও তাঁর মতো বাতাসকে নিজের বশীভূত করতে পারে না। বাতাসকে নিয়ন্ত্রণ করা তো দূরের কথা, 'আমরা বাতাসের পথই জানি না' (যোনা ৩:৮)। 'ঈশ্বর তাঁর ভাণ্ডার থেকে বাতাসকে বের করে আনেন' (গীত ১৩৫:৭) এবং যখন তা

বেরোয় তখন তিনি সেই 'বাতাসকে তাঁর মুঠোয় ধরেন' (হিতোপদেশ ৩০:৪)। একমাত্র তিনিই তা করতে পারেন। তিনি পারেন না এমন কিছুই নেই। আমাদের আত্মবিশ্বাস ও সান্ত্বনার ভিত্তিও তিনি– 'সদাপ্রভুই আমাদের আশ্রয় পাহাড়' (যিশাইয় ২৬:৪)। তাঁর এই 'পরিচয়' আমাদের পাশে বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। প্রভু বন্যার ওপর বসে আছেন এবং তিনি অনেক জলের আলোড়নের শব্দের চেয়েও শক্তিশালী। সাগরকে শান্ত করার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট প্রমাণ করলেন যে, তিনিই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। ফলে যে জল তাঁর আদেশে চলে যায় (গীত ১০৪:৭, ৮) তা এখন তাঁর ধমকে তা শান্ত হয়ে গেল।

মথি ৮:২৮-৩৪

খ্রীষ্ট এখানে ভয়ঙ্কর-দর্শন দুই মন্দ-আত্মাগ্রস্তক সুস্থ করলেন। বিভিন্ন চিহ্ন-কাজের মাধ্যমে এই অধ্যায়ে আমরা তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতার প্রকাশ দেখি। রোগব্যাধি ও প্রকৃতির ওপর তাঁর এই ক্ষমতা আমাদের খুবই অবাক করে; কারণ কোন মানুষের পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব ছিল না। পরিশেষে মন্দ-আত্মার ওপরও যে তাঁর ক্ষমতা রয়েছে তার প্রমাণ আমরা এখানে দু'জন ভূতগ্রস্তের সুস্থতার মধ্য দিয়ে দেখি। স্বভাবতই তাঁর এই চিহ্ন-কাজ আমাদের অতিমাত্রায় বিস্মিত করে। কারণ এই ঘটনাটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এই বার্তা তুলে ধরে– খ্রীষ্টের যে কেবল স্বর্গ, পৃথিবীর এবং সব গভীর স্থানের ক্ষমতা রয়েছে তা নয়, এমনকি নরকের চাবিও তাঁর কাছে আছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মধ্য দিয়েই 'প্রভুত্ব' এবং 'ক্ষমতার' সৃষ্টি হয়েছিল; এমনকি তিনি যখন মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে লজ্জাপূর্ণ জীবন কাটাচ্ছিলেন তখনও তা তাঁকে পূর্ণ গৌরবের সাথে প্রকাশ করেছিল (ইফিষীয় ১:২১)। তিনি আকাশের খারাপ শাসনকর্তাদের ক্ষমতা নষ্ট করেছেন (কলসীয় ২:১৫)। বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁর এই কাজ সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল (১৬ পদ)। তারা দেখেছিল, খ্রীষ্টের কথায় ভূতগ্রস্তরাও সুস্থ হয়। তাই এই ঘটনাটি খ্রীষ্টের অপরাপর চিহ্ন-কাজের পাশে একটি বিশেষ 'তাৎপর্য' নিয়ে আছে। প্রথমত, এই চিহ্ন-কাজটি সাধিত হয়েছিল গার্গেসেনেস- এর দেশে। কেউ কেউ মনে করেন, তারা পুরানো গির্গাসীয়দের বাকি এলাকায় ছিল (দ্বিতীয় বিবরণ ৭:১)। যদিও খ্রীষ্টকে মূলত ইস্রায়েলের হারানো মেষদের জন্য পাঠানো হয়েছিল, তবুও পথিমধ্যে তিনি সীমান্তবাসীদের অনেকের মাঝে তাঁর মহিমা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর এই বিজয় ছিল শয়তানের ক্ষমতার বিরুদ্ধে। তিনি যে অবিশ্বাসীদের মধ্য থেকে অনেককে জয় করবেন এই ঘটনা তারই একটি নির্দশন।

এখন, তাঁর এই চিহ্ন-কাজ শয়তানের ক্ষমতার ওপর খ্রীষ্টের জয়লাভের একটি চিত্র ফুটিয়ে তোলে। এর মধ্য দিয়ে আমরা দেখি, কীভাবে তিনি শয়তানকে শক্তিহীন ও অধিকারচ্যুত করবেন। এ ছাড়াও এই প্রতীকী ঘটনার পাশে 'মন্দ আত্মারা মানুষের প্রতি কীরকম শত্রুভাবাপন্ন'– সেই চিত্রটিও আমরা আবিষ্কার করি। লক্ষ্য করুন, এখানে 'মন্দ-আত্মার ভিড়' সম্পর্কে বলা হয়েছে। প্রথমে তাদের বর্তমান অবস্থান ও কাজ (মানবদেহে) এবং পরবর্তীতে তাদের সর্বশেষ দুষ্কর্ম ও অবস্থানের (শূকরের পালে) বিষয়টি বিবৃত হয়েছে।

ক. ভূতেরা যাদের অধিগ্রহণ করেছিল সেই লোকদ্বয়ের অবস্থা ছিল শোচনীয়। এই দু'জন– কেউ কেউ মনে করেন এদের একজন পুরুষ ও অন্যজন মহিলা ছিলেন; কারণ

অপর সুসমাচার-লেখক এই ঘটনায় একজন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন (লূক ৮:২৬-৩৯)।

১. তারা কবরস্থানে থাকতো; খ্রীষ্টের সাথে মিলিত হতে তারা সেই কবরস্থান থেকেই বের হয়ে এসেছিল। শয়তানের কাছে বিচারের ক্ষমতা না থাকলেও তার রয়েছে মৃত্যুর ক্ষমতা। সে মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে। ফলে সে তার বিজয়ের এই ট্রফিগুলোর (মৃতদেহ) সাথে কথা বলতে আনন্দ বোধ করে। কিন্তু 'গলগথা' অর্থাৎ 'মাথার খুলির স্থানে' খ্রীষ্ট যেভাবে বিজয় লাভ করেছিলেন সেভাবে এখানেও তিনি তাকে পরাস্ত করলেন। তিনি সেই শয়তানকে পরাজিত করলেন যে নিজেকে এখানকার সর্বময় কর্তৃত্ব ও বিজয়ের অধিকারী বলে দাবি করতো। কবরের কথা বললে দুর্বলচিত্তের লোকেরা ভয় ও দুঃখবোধে জড়সড় হয়ে যায়। ফলে সেই ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিদ্বয়ের উপস্থিতি অত্র এলাকার লোকজনের মনে ভয়ের সৃষ্টি করেছিল। 'কবরাতঙ্কের' সাথে ভূতে ধরা দুই ব্যক্তির ভয়ঙ্কর চেহারাও যোগ হওয়ায় লোকেরা স্বাভাবিকভাবেই তাদের এড়িয়ে চলতো। কেউ সচরাচর 'ভূতপল্লীর' পথ ধরে যেত না।

২. তারা ছিল দেখতে ভয়ঙ্কর; তারা যে কেবল নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল– তা নয়; উল্টো তারা অন্যদেরও অনিষ্ট করতো। অনেককে ভয় দেখাতো, আবার কারও কারও ক্ষতি করতো। তাই কেউ সেই পথ ধরে যেতে সাহস পেত না। মনে রাখুন, শয়তান মানুষের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে এবং তার প্রকাশ ঘটাতে সে একজনের কাছে অন্যকে ঘৃণিত করে তোলে। তবে সেই ঘৃণার ভাব বা শত্রুতা শয়তান তার দলের লোকদের প্রতি দেখায় না। সে বরং তাদের সহযোগিতা, স্নেহ দেয়– এটাই হচ্ছে শয়তানের শত্রুতার প্রকৃতি। সে মানুষের একজনকে অপরের কাছে নেকড়ে-ভল্লুকের (হোমো হোমিনি লিপাসা) সদৃশ করে তোলে। শয়তান মানুষের ভেতরে থেকে আত্মিকভাবে রাজত্ব করে। তার এই রাজকার্যে সে অস্ত্র হিসেবে শারীরিক কামনা-বাসনা যেমন: গর্ব, ঘৃণা, ঈর্ষা, প্রতিহিংসা প্রভৃতি ব্যবহার করে। এই কর্মপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সে তাদের মানবসমাজে 'অযোগ্য' গণিত করে। ফলে এই ভূতে পাওয়া লোকদ্বয়ের মতো লোকেরা তাদের এড়িয়ে চলে এবং তাদের সাথে কোন ব্যবহারিক সম্পর্কও গড়ে তোলে না।

৩. তারা খ্রীষ্টের কাছে উদ্ধত অনুরোধ রাখল এবং তাঁর প্রতি সমস্ত আগ্রহ অস্বীকার করল (২৯ পদ)। এটা হচ্ছে শয়তানের ওপর ঈশ্বরের ক্ষমতার প্রকাশ। যদিও মন্দ আত্মারা তাদের পরিণতি সম্পর্কে জানতো, তবুও তারা খ্রীষ্টের সাথে (যিনি তাদের দেখা করতে আদেশ দিয়েছিলেন) মিলিত হওয়া থেকে নিজেদের নিবৃত্ত করে নি। এভাবে এই অপবিত্র আত্মাকে নিজের উপস্থিতিতে টেনে আনার মাধ্যমে আমরা খ্রীষ্টের 'ওপর ক্ষমতার' বিষয়ে দেখতে পাই। এই মন্দ আত্মারা তাঁকে আর যে কোন কিছুর চেয়ে বেশি ভয় পেত; কারণ 'তাঁর শিকল তাদের ধরে রাখতে সমর্থ ছিল', যেটা মানুষের তৈরি শেকল দিয়ে সম্ভব ছিল না। বাস্তবিকই এই মন্দ-আত্মাগ্রস্তদর শিকল দিয়েও বেঁধে রাখা যেত না। অথচ খ্রীষ্টের সামনে এসে এরাই তাঁর ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে তাঁর বিচারের বিরোধিতা করতে লাগল– 'ঈশ্বরের পুত্র যীশু, আমাদের সাথে আপনার কী দরকার?' এখানে আমরা দেখি,

(১) শয়তান এখানে ঈশ্বরভক্তের মতো স্বীকারোক্তি দিল– 'যীশু, ঈশ্বরের পুত্র'; একটি চমৎকার কথা এবং তা সেই সময়ে যখন এই সত্য প্রস্ফুটিত হচ্ছে। অথচ এই মহান উক্তিটি কোন রক্তমাংসের মানুষ প্রকাশ করে নি (পিতর ১৬:১৭)। এমনকি 'শয়তানও

জানতো, বিশ্বাস করতো এবং স্বীকারও করতো যে খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র', কিন্তু তবুও তার অবস্থান বা কাজের হেরফের হয় নি। তাই সে খ্রীষ্টের সাথে শত্রুতায় লিপ্ত হল। আর তা করতে গিয়ে সে মানুষকে কষ্ট দিতে লাগল এবং তা খুবই খারাপভাবে– যা তাদের দুঃখভোগকে উত্তরোত্তর বাড়িয়ে তুলতো; তা না হলে তারা তো খ্রীষ্টকে অস্বীকারও করতে পারতো? মনে রাখুন, জ্ঞান নয়, ভালবাসাই শয়তান ও ঈশ্বরভক্তের মাঝে পার্থক্য গড়ে দেয়। শয়তান নরকের প্রথমজাত তাই সে খ্রীষ্টকে জানে, ফলে ঘৃণাও করে এবং সে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে চায় না। আমরা স্মরণ করতে পারি, কিছু কাল আগে এই শয়তানই খ্রীষ্টের পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল– 'তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হয়ে থাক' (৪: ৩)। কিন্তু এখন সে সুর পাল্টে অকপটে সেই সত্যিটাই বলছে। মনে রাখুন, পরীক্ষার সময় ঈশ্বরের সন্তানেরাও শয়তান কর্তৃক অনুরূপ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে পারে। শয়তান তাদের মনে এই সন্দেহ ঢুকিয়ে দিতে পারে যে, ঈশ্বরের সাথে তাদের আদৌ কোন সম্বন্ধ আছে কি না। কিন্তু পবিত্র আত্মা সেসময় ঈশ্বরের সন্তানদের শয়তানের সমস্ত কূটচাল ছিন্ন করে বেড়িয়ে আসতে সাহায্য করবেন। ফলে তাদের মনে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের উপস্থিতি থাকবে না।

(২) ভূতেরা যে দু'টো ঔদ্ধত্যপূর্ণ বাক্য উচ্চারণ করেছিল, তার মাঝে–

(ক) একটি হচ্ছে অবাধ্য উচ্চারণ– 'আমাদের সাথে আপনার কী দরকার?' এখন প্রথমত, একথা সত্য যে, শয়তানের সাথে খ্রীষ্টের কোন সম্বন্ধ বা কাজ নেই, কারণ তিনি পরিত্রাণকর্তা। 'তিনি পতিত স্বর্গদূতদের সাহায্য করেন না কিংবা তাদের ধরেনও না' (ইব্রীয় ২:১৬)। এদের সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই, কখনো ছিলও না। তাঁর কাছ থেকে কোন সুবিধালাভের আশাও তারা করে না। এটা খ্রীষ্টের ভালবাসার কত চমৎকার প্রকাশ যে, পতিত মানুষদের সাথে তাঁর সম্বন্ধ বা কাজ আছে কিন্তু পতিত স্বর্গদূতদের সাথে তাঁর কোন সম্বন্ধ নেই। শয়তানকে শক্তিহীন করার যে ক্ষমতা তাঁর ছিল যদিও তা পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশের সময় তখনও আসে নি, তবুও এই ঘটনার ফলে শয়তানের সর্বশেষ পরিণতির একটি মহরা অনুষ্ঠিত হল। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, খ্রীষ্টের ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত থাকার পরও তাঁর প্রতি মন্দ-আত্মাদের কোন আগ্রহ জাগ্রত হয় নি। মনে রাখুন, খ্রীষ্টের সাথে শয়তানের কোন সম্বন্ধ না থাকলেও সে তাঁকে 'ঈশ্বরের পুত্র' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। দ্বিতীয়ত, মন্দ-আত্মারা চায় নি যে, খ্রীষ্ট তাদের কোনোভাবে শাসন করুন। তারা তাঁকে ঘৃণা করতো, তাঁর প্রতি শত্রুতার মনোভাব পোষণ করতো। তারা তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল এবং সেকারণেই তাঁর রাজত্ব ও প্রতাপের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। দেখুন, তারা কী ভাষা ব্যবহার করেছিল। তারা বলেছিল যে, খ্রীষ্টের সুসমাচারের সাথে তাদের কোন কাজ নেই। যেহেতু তাঁর নিয়ম ও নিদর্শন শয়তানের জোয়াল ভেঙে দিয়ে ঈশ্বরের সাথে মানুষের যোগাযোগ-সম্বন্ধ গড়ে তোলে, সেহেতু সে চায় না– খ্রীষ্ট তাদের ওপর রাজত্ব করুন। সেকথা তারা খ্রীষ্টকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিল– 'আমাদের কাছ থেকে দূরে যান'। এই মন্দ-আত্মারা তাদের পিতা শয়তানের ইচ্ছেমতো চলতো এবং তার ভাষায় কথা বলতো। তৃতীয়ত, এটা সত্য যে, খ্রীষ্টের বিচারের বিরুদ্ধে শয়তান কিছুই করতে পারে না; কারণ তারা জানে খ্রীষ্ট কী করতে পারেন অথবা কী করতে যাচ্ছেন। তাই তারা কিন্তু এটা বলেনি যে, 'আমাদের নিয়ে আপনি কী করতে চান?' তারা বিচারক হিসেবে খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করে নি; কারণ তারা জানতো, খ্রীষ্টের বিচারের বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই।

(খ) তারা ভয়পূর্ণ স্বরে খ্রীষ্টের সমালোচনা করল– 'আপনি কি আমাদের এই

লোকদের ভেতর থেকে বের করে দিতে ও আমাদের যন্ত্রণা দিতে এসেছেন? এদের যে ক্ষতি আমরা করতে পারতাম তা থেকেও কি আপনি আমাদের অব্যাহতি দেবেন?' মনে রাখুন, খারাপ কিছু করতে না পারলে শয়তানের দুঃখ হয়, কারণ সে মানুষের ধ্বংস দেখতে চায়, দুঃখ দেখতে চায়। আমরা কি তাই মন্দ আচরণ থেকে বিরত থেকে স্বর্গকে কাছে আনব না এবং যেকোনো মূল্যে ভাল কাজে নিবিষ্ট থাকব না? না হলে আমরাও তো সময়ের আগে যন্ত্রণা ভোগ করব!

মনে রাখুন, প্রথমত শয়তান তার পরিণতি অর্থাৎ অনন্তকালীন যন্ত্রণাভোগের কথা জানে। শেষ বিচারের দিনে তার শাস্তির সময় নির্ধারণ করা আছে; নিশ্চিতভাবেই সেদিন তার ষোলকলা পূর্ণ হবে– 'তোফতের মতো পোড়াবার জায়গা অনেক আগেই সাজিয়ে রাখা হয়েছে' (যিশাইয় ৩০:৩৩; মথি ২৫:৪১); 'কারণ তাদের সেই বিচারের দিনের জন্য রাখা হয়েছে' (২ পিতর ২:৪)। 'যে মন্দ-আত্মারা স্বর্গীয় অনুমতির বলে পৃথিবীর এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করতে পারতো' (ইয়োব ১:৭) তারা আজ শিকলে বন্দি। যদিও এখন পর্যন্ত তাদের ক্ষমতার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, তবুও সেই দিন দূরে নয় যেদিন তারা বন্দিত্ব ও শাস্তিকে বরণ করে নেবে। এখন তারা আরামে থাকলেও সেদিন যন্ত্রণার দরুন তারা কোন আরাম পাবে না। এই শাস্তি তাদের জন্যই নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যদিও তারা কখনও যন্ত্রণা পেতে চায় না। কিন্তু এখানে আমরা দেখি, তারা চাইলো যেন তাদের সময়ের আগে যন্ত্রণা দেওয়া না হয়। কারণ যদিও তারা জানে না কবে বিচার হবে তবুও তারা এটা জানতো এটা 'সেই সময়' নয়। দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্টের প্রতিটি হস্তক্ষেপে শয়তানের চোখেমুখে বিচারকালীন দুর্দশাজনিত ভয় ফুটে ওঠে। খ্রীষ্টের অত্যুজ্জ্বল আলো এবং তাঁর নির্দেশ তাদের এভাবে শাস্তির কথা মনে করিয়ে দিত– 'শয়তান তাঁকে বিশ্বাস করে এবং তাঁর ভয়ে কাঁপে' (যাকোব ২:১৯)। ঈশ্বর ও মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ফলে শয়তান নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পীড়নের মুখে পড়ে। বিচারের মুখে পড়লে নিকৃষ্ট, বেপরোয়া পাপীও ভয়ের ভাব গোপন করতে পারে না।

খ. এবারে আমরা দেখব, তারা মানুষের ভেতর থেকে বেরিয়ে গিয়ে কী করল। 'ভূতেরা সেই লোকদের ভেতর থেকে বেরিয়ে গিয়ে শূকরের পালের ভেতর প্রবেশ করল' (৩০ পদ); বলা বাহুল্য, ভূতেরা নিজেদের জন্য সম্ভাব্য সেরা জায়গাটিই বেছে নিয়েছিল। এই গির্গাসীয়রা যদিও যর্দনের অন্য পাড়ে বাস করতো, তবুও তারা ছিল যিহূদী। তাহলে এই শূকরের সাথে তাদের কী সম্বন্ধ ছিল যেখানে ব্যবস্থা তাদের পরিষ্কারভাবে তা ছুঁতে ও খেতে নিষেধ করেছিল? সম্ভবত, সীমান্তে থাকার দরুন তাদের অনেক অবিশ্বাসীর সাথে মিশতে হতো; এই শূকরগুলো হয়তো তাদেরই ছিল অথবা তারা এগুলোকে বিক্রির জন্য রেখেছিল। আবার এমনও হতে পারে, রোমীয়দের সাথে পণ্য বিনিময়ের জন্য তারা এগুলো রেখেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রোমীয়রা শূকরের মাংস পছন্দ করতো; পাশাপাশি যিহূদীদের সাথে তাদের পণ্য বিনিময়ের ব্যবসাও তখন রমরমা চলছিল। এখন দেখুন,

১. কীভাবে মন্দ-আত্মারা শূকরগুলোকে অধিগ্রহণ করল, যা প্রকৃতই তাদের উপযুক্ত ছিল; কারণ এতে কোন বিপদের সম্ভাবনা ছিল না। তবে আশ্রয় হিসেবে শূকরের পালকে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে শয়তানের একটি উদ্দেশ্য ছিল। আর তা হচ্ছে– শূকরের পালের ক্ষতি করা। তাই তারা সময়ক্ষেপণ না করে নির্দ্বিধায় খ্রীষ্টের কাছে শূকরের পালের ভেতর প্রবেশ করার অনুমতি চাইলো। এখানে,

(১) তারা শূকরের পালের ভেতর যাওয়ার অনুমতি চাইলো (৩১ পদ)। তারা তাঁর কাছে অনুনয় করল, 'আপনি যদি আমাদের দূরই করে দিতে চান তবে ঐ শূকরের পালে যেতে দিন।'

(ক) যেহেতু মন্দ-আত্মারা সব সময় খারাপ কিছু করার তালে থাকে সেহেতু সেখানেও তারা একটি বদ মতলব আঁটল– 'খারাপ কাজ না করলে দুষ্টদের ঘুম হয় না; কাউকে উচোট খাওয়াতে না পারলে তাদের ঘুম আসে না' (হিতোপদেশ ৪:১৬)। মূলত সেকারণেই তারা খ্রীষ্টের কাছে অনুমতি চাইলো, 'শাস্তি না দিয়ে আমাদের ঐ শূকরের পালে যেতে দিন।' মন্দ-আত্মারা যখন দেখে শারীরিকভাবে মানুষের ক্ষতি করা সম্ভব হচ্ছে না তখন সে তাদের সম্পদের ক্ষতি করতে উদ্যত হয়। কারণ এর মধ্য দিয়েই তারা মানুষের মনোজগতকে অস্থির করে তুলতে পারে। আর এই অস্থিরতার দরুন লোকেরা খ্রীষ্টকে বোঝা হিসেবে গণ্য করতেও দ্বিধা করবে না। 'শয়তান যে ঘৃণার চাতুর্যপূর্ণ অস্ত্র' ধারণ করে– তা এখানে পরিলক্ষিত হয়।

(খ) তারা নিজেদের ওপর খ্রীষ্টের ক্ষমতাকে কাজ করতে দিয়েছিল। কারণ তারা জানতো যে, তাঁর অনুমতি ছাড়া তারা কিছুতেই শূকরের পালের ক্ষতি করতে পারবে না। ঈশ্বরের সব প্রজার জন্য এই ঘটনা উৎসাহের কারণ যে, যদিও শয়তানের ক্ষমতা অনেক, তবুও তা সীমাবদ্ধ এবং কোনোমতেই তা খ্রীষ্টের সমান নয়; বরং তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তাঁর অনুমতি ছাড়া শয়তান বেশি দূর যেতে পারে না। বস্তুত এখানে শয়তানের অহংকার মুখ থুবড়ে পড়ে।

(২) 'যাও'– খ্রীষ্টের এই নির্দেশে ভূতেরা সেই লোকদের ছেড়ে গেল (৩২)। আইউবকে আঘাত করার জন্য গমনোদ্যত শয়তানকে ঈশ্বর যেভাবে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন, সেভাবে খ্রীষ্টও এখানে মন্দ-আত্মাদের বললেন– 'যাও'। মনে রাখুন, ঈশ্বর প্রায়ই তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য শয়তানকে তার কাজ করার অনুমতি দেন এবং শয়তানের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে অবগত থাকার পরও তাকে খারাপ কাজে যেতে দেন। শয়তান কেবল খ্রীষ্টের অধীনই নয় উপরন্তু তাঁর প্রজা। 'তাঁর রাজ্য তাদের ওপরে, তাদের খারাপ কাজের বিরুদ্ধে দেখা দেবে। তারা যতই খারাপ কাজ করবে ততই তাঁর রাজ্য দৃশ্যমান হবে। এভাবে তাদের ক্ষোভ খ্রীষ্টকেই প্রশংসিত করবে।' লক্ষ্য করুন খ্রীষ্ট তাদের অনুমতি দিলেন,

(ক) কারণ সুদ্দূকীরা ভূত বিশ্বাস করতো না এবং ভূত যে আসলেই আছে সেটাও তারা স্বীকার করতো না। কারণ তারা তাদের দেখতে পেত না। এখন খ্রীষ্টের এই চিহ্ন-কাজের মধ্য দিয়ে মন্দশক্তির ক্ষমতা, ঘৃণা ও সংখ্যার প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেও যদি তারা তা অস্বীকার করে তারা ক্ষমার অযোগ্য অবিশ্বস্ততায় পড়বে। বাতাসকে দেখা না গেলেও তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায়। কিন্তু যখন প্রবল বাতাস বড়সড় একটা গাছ উপড়ে আমাদের বাড়ির উপর এনে ফেলে তখন আমরা এর ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করি। অর্থাৎ ঘটনা না ঘটা পর্যন্ত আমরা কিছু বিশ্বাস করি না।

(খ) কারণ তিনি গাদারীয়দের শাস্তি দিতে চাইলেন, যেহেতু যিহূদী হওয়া সত্ত্বেও তারা শূকর খাবার স্বাধীনতা গ্রহণ করে ব্যবস্থাকে অসম্মান করেছিল। যাহোক, খ্রীষ্ট তাদের দেখাতে চাইলেন, শূকর পালনের মধ্য দিয়ে তারা কত জঘন্য কাজ করেছিল। এ ছাড়াও তিনি তাদের এই ধারণা দিলেন যে, তিনি চাইলে তাদেরকে শূকরের পরিণতি ভোগ করতে

হতে পারে; কারণ নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা শ্বাসরোধ করে শূকরকে হত্যা করেছিল। শয়তান খ্রীষ্টের কথার প্রতি বাধ্য থেকে মানুষের দেহ থেকে নেমে এসে শূকরের ভেতরে ঠাঁই নিল। দেখুন, শয়তান কত পরিশ্রমী শত্রু এবং কত দ্রুত সে কাজ করে। সে খারাপ কাজ করার জন্য কোন সময়ক্ষেপণ করল না। দেখুন,

২. 'তখন তারা বের হয়ে শীঘ্রই শূকরের মধ্যে গেল।' তারা এদের জীবন রক্ষার অনুরোধ জানায় নি এবং সেকারণেই সেগুলো ঢালু পার দিয়ে জোরে দৌড়ে গেল এবং সাগরের জলে ডুবে মরল; সবগুলো মরল, সংখ্যার বিচারে প্রায় দুই হাজার (মার্ক ৫: ১৩)। মনে রাখুন, শয়তান অধিগ্রহণের জায়গা খুঁজছিল ধ্বংসের জন্য। এভাবে শয়তান মানুষকে দ্রুতই পাপের পথে নিয়ে যায় এবং পরিত্রাণের বিরুদ্ধে যেতে তাদের উদ্বুদ্ধ করে। নিশ্চিত আনন্দকে সে তাদের কাছে দুঃখ হিসেবে উপস্থাপন করে। ফলে সেই বোকারা তাদের আত্মঘাতী কামনা দ্বারা শয়তানের নির্দেশনায় স্ববিরোধী হয়ে ওঠে। তখন এই পৃথিবীকেই তারা তাদের মোক্ষ হিসেবে নির্ধারণ করে। এভাবে শয়তান তাদের শীঘ্রই ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়; কারণ সে 'এপল্লো' এবং 'এবাদ্দন'– শ্রেষ্ঠ ধ্বংসকারী। যারা তার ইচ্ছামতো চলে, তারা নিশ্চিতভাবেই ধ্বংস হবে। শয়তানের চাওয়াও সেটাই– প্রথমে গ্রাস করা তার-পর ডুবিয়ে মারা। এখানে আমরা দেখি শূকরগুলো শয়তানের ইচ্ছার অধীন হল। ফলে দ্রুতই তারা রোষের হ্রদে ডুবে মরল। দেখুন,

৩. শূকরের মালিকদের ওপর এই ঘটনার কী প্রভাব পড়ল। শূকর পালকেরা শীঘ্রই এই খবর তাদের কাছে পৌঁছে দিল। নিজেদের সাধ্যমতো তারা সেই অভূতপূর্ব ঘটনার বর্ণনা দিল। তারা তাদের রিপোর্টে বিশেষভাবে সেই মন্দ-আত্মাগ্রস্তদর কথা বলল (৩২ পদ)। খ্রীষ্ট শহরে না গেলেও তাঁর চিহ্ন-কাজের খবর শহরে পৌঁছে গেল। খ্রীষ্ট আসলে দেখতে চাইছিলেন এই ঘটনায় লোকেরা কী প্রতিক্রিয়া দেখায়।

এখন, (১) লোকেরা তাঁকে দেখতে আসলো। তাদের আগ্রহই তাদের খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে এসেছিল। পুরো শহর তাঁর সাথে মিলিত হতে ভেঙে পড়ল; কারণ এরকম একজনের সাথে দেখা করার লোভ তারা সামলাতে পারে নি। তারা তাঁকে দেখতে আসলো যেন ভবিষ্যতে বলার মতো কিছু জমিয়ে রাখতে পারে যে, এমন একজনকে তারা দেখেছে যিনি আশ্চর্য ও অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন। এভাবে অনেকেই সত্যিকারের আকর্ষণ কিংবা তাঁকে জানার বাসনা ছাড়াই তাঁর কাছে গেল।

(২) সম্পদের প্রতি মোহগ্রস্থতা থেকে তারা খ্রীষ্টকে চলে যেতে বলল। নিজেদের শহরে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর স্থলে কিংবা অসুস্থদের তাঁর কাছে নিয়ে আসার স্থলে তারা তাঁকে চলে যেতে বলল! তাদের মুখ থেকে যেন শয়তানের সেই কথাটিই ধ্বনিত হল– 'আমাদের সাথে আপনার কী দরকার?' এখন, শয়তান যে লক্ষ্য স্থির করেছিল তা সফল হল। শূকরের পাল ধ্বংসের মধ্য দিয়ে সে লোকদের বিশ্বাস করাল যে, খ্রীষ্টের কাছ থেকে ধ্বংস ছাড়া আর কিছু আশা করা যায় না। ফলে লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াল। ঈশ্বরের বিষয়ে কঠিন ভাবনার প্রয়োগে শয়তান যেভাবে আমাদের প্রথম আদি পিতা-মাতাকে ফুসলিয়ে কুপথে নিয়ে গিয়েছিল সেভাবে এই গাদারীয়দেরও সে খ্রীষ্টের থেকে দূরে রাখল। সে তাদের এই মন্ত্রণা দিল– 'খ্রীষ্ট তোমাদের পশুপালগুলোকে ধ্বংস করতে এসেছেন। যদিও তিনি ভাল কাজও করেন তবুও ভালর চেয়ে খারাপই বেশি করেন। একজন ভূতগ্রস্থের সুস্থতার বিনিময়ে দুই হাজার শূকরের মৃত্যু– ভাবা যায়!' এভাবেই শয়তান

ঈশ্বরের জমিতে শ্যামাঘাস বুনে দেয়। বিশ্বাসীদের মাঝে ভুল ধারণা ও শিক্ষা ঢুকিয়ে দিয়ে পরে সে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসকেই দোষারোপ করে; আর চেষ্টা করে অবিশ্বাসীরাও যেন তাদের ভুল বোঝে। গাদারীয়রা চাইলো, খ্রীষ্ট যেন তাদের ছেড়ে চলে যান; নইলে তিনি থাকলে মোশির মিশরে থাকাকালে যেমন হয়েছিল তেমনি হয়তো আরও কোন শাস্তি আসবে।

মনে রাখুন, যারা তাদের ত্রাণকর্তার চেয়ে শূকরকে মূল্যবান বলে ভাবে– তাদের সংখ্যা বেশি। সেকারণে খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতেও তারা কুণ্ঠিত হয় না। তারা তাঁর পরিত্রাণকেও অগ্রাহ্য করে। তারা চায়, খ্রীষ্ট যেন তাদের হৃদয় ছেড়ে চলে যান। তারা এমনকি, তাঁর বাক্যকেও তাদের হৃদয়ে বাস করতে দিতে চায় না; কারণ তারা জানে যে, খ্রীষ্ট ও তাঁর বাক্য হৃদয়ের কামনা-বাসনাকে মেরে ফেলতে সক্ষম। দৃশ্যত এই প্রকার লোকেরা জাগতিকতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেতে চায় না। ফলে যারা এখন সর্বশক্তিমানকে বলছে 'আমাদের কাছ থেকে চলে যান', বিচারের দিনে তাদেরকেই খ্রীষ্ট বলবেন, 'আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও, তোমরা অভিশপ্ত।'

মথি লিখিত সুসমাচার
অধ্যায় ৯

এই অধ্যায়ে আমরা প্রভু যীশুর ক্ষমতা ও দয়ার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিষয়ে পড়ি; যা আমাদের বিশ্বাসে এই দৃঢ়তা এনে দেয়– যারা তাঁর মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে আসে তিনি তাদের রক্ষা করতে পারেন এবং তিনি তা করেনও। তিনি চান যেন আমরা উদ্ধার পাই এবং তাঁর হেফাজতে থাকি; তাঁর ক্ষমতা এবং দয়া এখানে কয়েকটি চমৎকার ক্ষেত্রে (মানবদেহ ও আত্মা) সুন্দর কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হল–

(১) মানবদেহে, তিনি অবশরোগীকে সুস্থ করলেন (২-৮ পদ); যিহূদী-নেতার মেয়েকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুললেন এবং রক্তস্রাবে আক্রান্ত রোগীকে সুস্থ করলেন (১৮-২৬); দু'জন অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন (২৭-৩১); একজন ভূতগ্রস্থকে সুস্থ করলেন (৩২-৩৪); সবরকম রোগ ভাল করলেন (৩৫ পদ)।

(২) পাপ ক্ষমা করার মাধ্যমে লোকদের আত্মিক আরোগ্য দান করলেন (২ পদ); তিনি মথিকে আহ্বান করলেন এবং খোলাখুলিভাবে কর-আদায়কারী ও পাপীদের সাথে ওঠা -বসা করলেন (৯-১৩); শিষ্যদের উপবাসর বিষয়ে আরও শিক্ষা দিলেন (১৪-১৭); সুসমাচার প্রচার করলেন এবং লোকদের প্রতি মমতা করলেন; এ ছাড়াও তাদের জন্য প্রচার কারী পাঠালেন (৩৫-৩৮)। এভাবে তিনি তাঁর সত্যিকারের পরিচয় তুলে ধরলেন। আসলে তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, ক্ষমতাবান, দক্ষ চিকিৎসক– যা শরীর ও আত্মা– উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাঁর কাছে উভয় রোগেরই প্রতিষেধক ছিল। তাই আমরা যেন শারীরিক ও আত্মিক দু'ভাবেই নিজেদের তাঁর কাছে সমর্পণ করি; এবং তাঁকে তাঁর প্রাপ্য গৌরব দিই। আমাদের শরীর ও আত্মা– উভয়ের উপর তাঁর যে ক্ষমতা রয়েছে তা-ই আমাদের তাঁর প্রতি সমর্পিত জীবনে উৎসাহী করে।

মথি ৯:১-৮

এই অধ্যায়ের প্রথম বাক্যটি আমাদের গাদারীয়দের এলাকা থেকে খ্রীষ্টের প্রস্থানের বিষয়টি অবগত করে; যা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ের একেবারে শেষে দেখেছি– শূকর হারানোর বেদনায় তারা 'বিরাট প্রাপ্তিকে' তুচ্ছজ্ঞান করে খ্রীষ্টকে তাদের ছেড়ে চলে যেতে অনুরোধ জানিয়েছিল। এখন এরই ধারাবাহিকতায় 'তিনি নৌকায় উঠে সাগর পার হলেন'। তারা তাকে চলে যেতে বলেছিল এবং খ্রীষ্ট তাদের কথা রেখেছিলেন; আমরা তাঁকে সেখানে দ্বিতীয়বার যেতে দেখি না। এখানে লক্ষণীয়,

১. তাঁর বিচার– তিনি তাদের ছেড়ে গেলেন। মনে রাখুন, খ্রীষ্টকে যেখানে স্বাগত জানানো হয় না সেখানে তিনি বেশিক্ষণ অপেক্ষা করেন না। ধার্মিকতার বিচারে যারা তাঁকে নিয়ে বিব্রতবোধ করে তিনি তাদের ছেড়ে যান কিন্তু যারা তাঁকে আমন্ত্রণ জানায়, তাঁর সাথে থাকার ইচ্ছা পোষণ করে তিনি তাদের জন্যই অপেক্ষা করেন। অবিশ্বাসীরা যদি খ্রীষ্টের কাছ থেকে দূরে চলে যায়, তবে তিনিও তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যান; এটাই তাদের জন্য তার দেওয়া শাস্তি (১ কলসীয় ৭:১৫)।

২. তাঁর ধৈর্য– এখানে আমরা খ্রীষ্টের সহিষ্ণুতার বিষয়ে দেখি। গাদারীয়দের এলাকা ছেড়ে আসার সময় তিনি তাদের ধ্বংস করে আসেননি, তাদের দৃষ্টান্তমূলক কোন শাস্তিও দেন নি; অথচ অবস্থাদৃষ্টে সেটাই তাদের প্রাপ্য ছিল; কারণ তারা তাঁকে অবজ্ঞা করেছিল। অথচ তিনি চাইলেই তাদের শূকরের পেছনে পাঠিয়ে দিতে পারতেন, যারা ইতোমধ্যে শয়তানের ক্ষমতায় পূর্ণ হয়েছিল। তারা যে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাতে তাদের প্রতি তিনি সহজেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে পারতেন; কিন্তু তিনি তা করলেন না; কোন রাগ না দেখিয়ে তিনি কেবল নৌকায় উঠলেন এবং সাগর পার হয়ে গেলেন। এটা ছিল তাঁর ধৈর্য প্রদর্শনের সময়; তিনি মানুষের জীবনকে ধ্বংস করতে আসেননি কিন্তু এসেছিলেন যেন তারা পরিত্রাণ পায়; তিনি তাদের রক্ষা করতে এসেছিলেন; মেরে না ফেলে তিনি তাদের সুস্থ করতে এসেছিলেন। আর তা ছিল সুসমাচারের ভিত্তি গাঁথবার জন্য; ফলে তাঁর বিচারেও তিনি একেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তবুও কেউ কেউ এই ঘটনার কিছু সময় পর রোমীয়দের সাথে যিহূদীদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সময় রোমীয়রা যে প্রথমে গাদারীয়দের শহর অবরোধ করেছিল– সেই শাস্তিকে খ্রীষ্টের বিচার বলে রায় দেন। মনে রাখুন, যারা খ্রীষ্টকে তাদের মধ্য থেকে চলে যেতে বলে তারা নিজেদের ওপর দুঃখ-দুর্দশা ডেকে আনে। ঈশ্বর যদি আমাদের ত্যাগ করেন তবে এর চেয়ে দুর্দশাজনক আর কিছুই হতে পারে না।

'খ্রীষ্ট নিজের শহর কফরনাহুমে আসলেন', সে সময় যেটা ছিল তাঁর মূল আবাসস্থল (মার্ক ২:১); এবং সেকারণে একে তাঁর নিজের শহর বলা হতো। যদিও তিনি নিজে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, 'কোনও ভাববাদী নিজ শহরে সম্মান পায় না', তবুও তিনি সেখানেই ফিরে আসলেন, কারণ তিনি কখনও নিজের জন্য সম্মান কামনা করেন নি, উপরন্তু বিনম্রতায় অটল ছিলেন; যেকারণে তিনি লোকদের অবজ্ঞা পেতে প্রস্তুত ছিলেন। এই অধ্যায়ে কফরনাহুমে সংঘটিত সব ঘটনা গ্রন্থিত হয়েছে; এবং সেগুলো সেকারণেই এখানে একসাথে বিবৃত হয়েছে; যদিও সুসমাচার-লেখকেরা অন্যত্র ব্যতিক্রম করেছেন। গাদারীয়রা যখন খ্রীষ্টকে তাদের কাছ থেকে চলে যেতে বলল তখন কফরনাহুমের লোকেরা তাদের গ্রহণ করল। যদি খ্রীষ্টকে কেউ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় তবে অন্যের মধ্য দিয়ে তিনি গৌরবান্বিত হন, সেটি জায়গার বিচারেও সত্য– যেমনটা আমরা এখানে দেখি।

এখন প্রথম ঘটনার দিকে লক্ষ্য করা যাক, খ্রীষ্ট কফরনাহুমে ফিরে যাবার পর, যেভাবে এই পদগুলোতে বর্ণিত হয়েছে– 'তিনি একজন অবশরোগীকে সুস্থ করলেন।' এতে আমরা পর্যবেক্ষণ করি,

ক. রোগীর বন্ধুদের বিশ্বাস– যারা খ্রীষ্টের কাছে রোগীকে নিয়ে এসেছিল। বাস্তবিকই এই রোগীর অবস্থা এমন ছিল যে, সে নিজে নিজে খ্রীষ্টের কাছে আসতে সমর্থ ছিল না। ফলে তাকে বয়ে নিয়ে আসা হল। মনে রাখুন, এমনকি অচল, পঙ্গু কাউকে যদি তাঁর কাছে নিয়ে আসা হয়, তবুও তারা খ্রীষ্টের কাছে প্রত্যাখ্যাত হবে না। আমরা যদি সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে পারি তবে তিনি আমাদের গ্রহণ করবেন। আমরা যদি শারীরিকভাবে কাজে অসমর্থ হয়ে পড়ি, তবুও তাঁর কাছে আমাদের গুরুত্ব কমে যায় না। খ্রীষ্ট তাদের বিশ্বাসকে চাক্ষুস করেছিলেন। ছোট শিশুরা নিজে থেকে খ্রীষ্টের কাছে আসতে পারে না, কিন্তু যারা তাদের নিয়ে আসে খ্রীষ্ট তাদের বিশ্বাস লক্ষ্য করেন এবং তা নিরর্থক নয় বরং যথেষ্টই অর্থপূর্ণ। খ্রীষ্ট তাদের বিশ্বাস দেখলেন, এমনকি সেই অবশরোগীরও। খ্রীষ্ট তাদের বিশ্বাসের প্রকৃতি দেখলেন। যদিও তার অসুস্থতা হতে পারে তার মানসিক সক্ষমতাকে ক্ষুণ্ন

করেছিল এবং বুদ্ধিবৃত্তিক কাজকেও বাধাগ্রস্ত করেছিল। এখন তাদের বিশ্বাস ছিল–

১. দৃঢ়; তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতো যে, খ্রীষ্ট রোগীকে সুস্থ করতে পারবেন এবং তিনি তা করবেনও; অন্যথায় তারা এত লোকের সামনে খ্রীষ্টের কাছে রোগীকে বয়ে আনত না।

২. বিনম্র; যদিও অসুস্থ লোকটি পদক্ষেপ ফেলতে সমর্থ ছিল না, তবুও তারা খ্রীষ্টকে তার কাছে নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করে নি; উল্টো তাকেই খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে এসেছিল। তাই খ্রীষ্ট কখন আসবেন সেই অপেক্ষায় না থেকে নিজেদেরই তাঁর কাছে এগিয়ে যেতে হবে।

৩. কার্যকর; খ্রীষ্টের ক্ষমতায় তাদের বিশ্বাস ছিল। তবে কেবল বিশ্বাস আনয়ন করেই তারা থেমে যায় নি, উপরন্তু তারা বিছানায় পড়ে থাকা লোকটিকে খ্রীষ্টের কাছে বয়ে এনেছিল– যা ছিল প্রকৃতই কষ্টসাধ্য। মনে রাখুন, শক্ত বিশ্বাস কখনও পরিশ্রমে বাধা পায় না।

খ. খ্রীষ্ট এই বলে তাকে দয়া করলেন, 'সাহস কর; তোমার পাপ ক্ষমা করা হল।' এটা ছিল সেই রোগীর প্রতি সবচেয়ে বড় আশীর্বাদের বাণী– যা তাকে রোগমুক্ত করতে যথেষ্ট ছিল। আমরা এখানে খ্রীষ্টের উদ্দেশে কোন কথা উচ্চারিত হতে দেখি না; বোধকরি সেই রোগী তার অসুস্থতার জন্য নিজের হয়ে কোন কথা বলতে পারতো না এবং যারা তাকে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে এসেছিল তারা কথার চেয়ে কাজেই বেশি আগ্রহী ছিল। তারা তাকে খ্রীষ্টের সামনে এনে রাখল। আর সেটাকেই তারা যথেষ্ট মনে করল। খ্রীষ্টের কাছে নিজেদের কিংবা বন্ধুদের নিয়ে আসাটা অনর্থক নয়, যেমনটা আমরা তার দয়ার কাজগুলোতে দেখি। অসুখী তার পাপের জন্য কাঁদে এবং অনুগ্রহে বিচারের চেয়ে নিঃশর্ত মুক্তি প্রদানের কাজ দ্রুত সম্পন্ন হয়। এখানে খ্রীষ্টের কথায় আমরা দেখি–

১. একটি দয়ার্দ্র সম্বোধন– 'সন্তান'। মনে রাখুন, ঈশ্বর আমাদের তাঁর 'সন্তান' হিসেবে ডেকে উৎসাহিত করেন যেন আমরা তাঁর কথার প্রতি আকৃষ্ট হই এবং তা পালনে ব্রতী হই (ইব্রীয় ১২:৫)।

২. অনন্য উৎসাহের বাণী– 'সাহস কর। মন তা দিয়ে পূর্ণ কর। নিজের আত্মাতে আনন্দ কর।' সম্ভবত এই দরিদ্র লোকটিকে যখন সবার সামনে দিয়ে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসা হল তখন স্বভাবতই সে সবার মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিল; সে হয়তো ভয় পাচ্ছিল যে, তাকে না আবার গালমন্দ করা হয়। কিন্তু খ্রীষ্ট তাকে নিরস্ত না করে বরং উৎসাহ দিলেন। তাকে বললেন, 'সাহস কর; সব ঠিক হয়ে যাবে'। অর্থাৎ সে মিছিমিছি খ্রীষ্টের সামনে পড়ে থাকবে না; বরং তাঁকে গৌরব দেওয়ার এক উপলক্ষ সে পাবে। তাঁর প্রতি সমস্ত মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করার মাধ্যমেই সে সুস্থ হয়ে উঠবে।

৩. এবং সেই উৎসাহের পেছনে একটি চমৎকার কারণ প্রদর্শিত হল– 'তোমার পাপ ক্ষমা করা হল।' তাঁর এই কথায় দৃষ্ট হয়,

(১) এটা ছিল তাকে শারীরিক রোগ থেকে সারিয়ে তোলার সূচনা। 'তোমার পাপ ক্ষমা করা হল এবং সে কারণে তুমি সুস্থ হও।' মনে রাখুন, পাপ হচ্ছে রোগের কারণ। সেইমতে পাপ থেকে নিস্তার পাওয়াটা রোগ থেকে রক্ষা পাবারও নিশ্চয়তা দেয়। কখনও এমনটি দেখা যায় না যে, কারও পাপ ক্ষমা করা হল কিন্তু তার রোগ সেরে গেল না; কিংবা কেউ রোগমুক্ত হল কিন্তু পাপের ক্ষমা পেল না। তাই আমরা যদি ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ

সম্বন্ধ পুনঃস্থাপন করতে চাই এবং তাঁর চিরস্থায়ী সান্ত্বনা পেতে চাই তবে পাপের ক্ষমা লাভের বিকল্প কিছু নেই। এক্ষেত্রে হিষ্কিয়ের প্রতি যা ঘটেছিল– তা আমাদের মনে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করে (যিশাইয় ৩৮:১৭)। অথবা–

(২) মনে সাহস আনার যে নির্দেশ এখানে দেওয়া হয়েছে, তার কারণ হিসেবে তা বিবৃত হয়েছে– 'যতক্ষণ না তুমি এর মূল্য বোঝো ততক্ষণ আমি তোমাকে সুস্থ করব না। যেহেতু আমি তোমাকে নিশ্চিত করছি যে, তোমার পাপ ক্ষমা করা হয়েছে, সেহেতু তোমার কি মনে সাহস এনে বিশ্বাসে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে কোন বাধা থাকতে পারে?' মনে রাখুন, অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে যারা পাপের ক্ষমার প্রমাণ পায় তারা প্রকৃতই আনন্দে মেতে উঠবে। কারও ভ্রূকুটি, হেঁয়ালি তাদের এই উদ্‌যাপন– আনন্দে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না (যিশাইয় ৩৩:২৪)।

গ. খ্রীষ্টের কথায় ধর্ম-শিক্ষকরা মনে মনে যা ভেবেছিল (৩ পদ); তারা নিজেদের মনে বলল– 'এই লোকটা ঈশ্বর-নিন্দা করল।' দেখুন, স্বর্গীয় ক্ষমতার এক অনন্য প্রকাশকে কীভাবে নরকের কালো অভিধা দিয়ে কলংকিত করা হল! খ্রীষ্টের পাপকে ক্ষমা করাকে এখানে 'ঈশ্বর-নিন্দা' বলে অভিহিত করা হল। খ্রীষ্ট যদি সেই ক্ষমতা না পেতেন তবে সেটা তাই হতো। কিন্তু যেহেতু সেই ক্ষমতা তাঁর ছিল সেহেতু ধর্ম-শিক্ষকদের এই 'ঈশ্বর-নিন্দা-আখ্যা' ছিল ভুল; কারণ তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রত্যাদেশ না পেয়েও পাপ ক্ষমা করতো।

ঘ. এখানে, খ্রীষ্ট তাদের এই অপ্রয়োজনীয় মনোভাবনার কী প্রত্যুত্তর করলেন– সে বিষয়ে দেখি।

১. তিনি তাদের এই কথাকে আমলে নিলেন। যদিও তারা তা নিজেদের মনে বলছিল তবুও তিনি তাদের কথা পড়তে পেরেছিলেন। মনে রাখুন, আমাদের প্রভু যীশু আমাদের মনে কী চলে তার সবই জানেন। চিন্তাকে আমরা গোপন এবং আকস্মিক বলে জানি, তবুও তা তাঁর কাছে গোপন থাকে না; এবং তিনি তাৎক্ষণিকভাবেই তা জানতে পারেন, কারণ খ্রীষ্ট হচ্ছেন অনন্ত বাক্য (ইব্রীয় ৪:১২, ১৩)। তিনি দূর থেকে আমাদের মনের চিন্তা বুঝতে পারেন (গীত ১৩৯:২)। তিনি তাদের বলতে পারতেন, (যা কেউ বলতে পারে নি) 'আপনারা কেন মনে মনে খারাপ চিন্তা করছেন?' মনে রাখুন, পাপের চিন্তা করার মাধ্যমে খারাপির পথ প্রশস্ত হয়– যা খ্রীষ্টকে ক্ষুব্ধ করে। হৃদয়ের অধিকর্তা হিসেবে তাঁকে এর মাধ্যমে অগৌরব দেওয়া হয় এবং তাঁর উপস্থিতিকে অবজ্ঞা করা হয়। স্বভাবতই তিনি এতে বিরক্ত হন। আর সেই বিরক্তি হেতু তিনি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাদের প্রতি তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এদের মনের চিন্তাভাবনা সবসময় খারাপের দিকে ঝুঁকে থাকে (আদি ৬:৫)। পাপের শুরু ও শেষ– উভয়ই হৃদয়ে এবং তা আর ভিন্ন কোথাও যায় না। ফলে তা আর সব কিছুর চেয়ে বিপদজনক।

২. তিনি তাদের চিন্তার প্রত্যুত্তর করলেন (৫,৬ পদ)। লক্ষ্য করুন,

(১) তিনি কীভাবে তাঁর অনুগ্রহ রাজ্যের ক্ষমতা ঘোষণা করলেন। তিনি ব্যক্ত করলেন যে মনুষ্যপুত্র মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পাপের ক্ষমা করতে পারেন, কারণ ঈশ্বর তাঁকে বিচারের ভার দেবার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং 'মনুষ্যপুত্র' হিসেবে তাঁকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে (যোহন ৫:২২, ২৭)। যদি তাঁর অনন্তজীবন দানের ক্ষমতা থাকে যেমনটা তার নিশ্চিতভাবে আছে (যোহন ১৭:২), তবে তাঁর পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতাও

আছে; কারণ পাপ হচ্ছে একপ্রকার বোঝাস্বরূপ যা সরাতে হবে, নইলে আমরা কখনো স্বর্গে যেতে পারি না। এটা দরিদ্র পাপীর জন্য কতটা উৎসাহের বিষয়! খ্রীষ্টের পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা তাদের পাপ স্বীকার করতে উৎসাহ জোগায়। কারণ তাদের মনে তখন এই বিশ্বাস পুঞ্জীভূত হয় যে, খ্রীষ্ট তাঁর ক্ষমতায় তাদের পাপ তুলে নেবেন, যেহেতু তিনি আমাদের অস্তিত্বের সাথে মিশে আছেন। যদি এই পৃথিবীতে তাঁর ক্ষমতা থাকে, তবে এর চেয়ে বেশি এখন তিনি ঈশ্বরের ডান পাশে বসে সেই ক্ষমতা ধারণ করছেন– 'ত্রাণকর্তা হিসেবে তিনি পাপের ক্ষমা দিচ্ছেন' (প্রেরিত ৫:৩১)।

(২) তিনি কীভাবে এই ক্ষমতার প্রমাণ দিলেন। প্রকৃতির ওপর তাঁর যে ক্ষমতা ছিল তার প্রকাশ আমরা তাঁর আরোগ্যকাজের মধ্য দিয়ে লক্ষ্য করি। তিনি এখন তা-ই করলেন। 'কোনটা সহজ, তোমার পাপ ক্ষমা করা হল? না ওঠো বিছানা তুলে হেঁটে বেড়াও?' যে ক্ষমতার বলে তিনি রোগমুক্ত করতে পারেন সেই ক্ষমতার গুণে তিনি পাপেরও ক্ষমা দিতে পারেন। তাঁর এই ক্ষমতা ঈশ্বরের কাছ থেকেই এসেছে। এছাড়া ভাববাদীরাও তাঁর এই ক্ষমতার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন। এখন

(ক) খ্রীষ্টের এই কথা প্রমাণ করে যে, তিনি একটি স্বর্গীয় মিশন নিয়ে এসেছেন। তাঁর চিহ্ন-কাজসমূহ বিশেষত আশ্চর্য উপায়ে করা তাঁর বিভিন্ন আরোগ্য কাজ একটি সত্যের প্রতিই নির্দেশ করে যে, 'তিনি ঈশ্বরের পুত্র'; চিহ্ন-কাজের মধ্য দিয়ে এটা প্রমাণিত হতো যে, তিনি ঈশ্বর-প্রেরিত। এছাড়াও যে দয়া তাঁর মাঝে দেখা যেত তা প্রমাণ করে যে তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত আমাদের রক্ষাকারী। সত্যের ঈশ্বর তাঁর কোন কাজকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে দেন না। তিনি একে মিথ্যে দ্বারা কলুষিতও করতে দেন না।

(খ) এখানে তাঁর ক্ষমতার প্রকাশে স্বচ্ছতার প্রমাণ মেলে। অবশরোগকে যেখানে পাপের ফল হিসেবে ভাবা হতো সেখানে তিনি সেই রোগ দূরীভূত করে প্রমাণ করলেন যে, তিনি মূল রোগটাকেই আরোগ্য করছেন। পাপ-রোগের দৃশ্যমান উপসর্গ দূরীকরণের মাধ্যমে তিনি তা কার্যকরভাবেই করলেন। ফলে এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা রোগ ও পাপের মিল লক্ষ্য করি। কারণ যিনি পাপের শাস্তি মওকুফের ক্ষমতা রাখেন তিনি পাপও ক্ষমা করতে পারেন। ধর্ম-শিক্ষকদের অবস্থান ছিল ব্যবস্থাকেন্দ্রিক ধার্মিকতায় এবং এসবের উপরেই তাদের আত্মবিশ্বাস স্থাপিত ছিল। কিন্তু তাদের এই কপট ধার্মিকতা কিংবা ব্যবস্থা পাপের ক্ষমাদানের ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা রাখতে অক্ষম ছিল। ফলশ্রুতিতে খ্রীষ্টের করা এই চিহ্ন-কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর শিক্ষাও সম্মানিত হল। আর আমরা জানতে পারলাম, পৃথিবীতে খ্রীষ্টের আগমনের উদ্দেশ্যই ছিল আমাদের রক্ষা করা।

৬. লোকটি তখনই সুস্থ হল। খ্রীষ্ট ধর্ম-শিক্ষকদের নিষ্ফল চিন্তাকে নিরস্ত করলেন কিন্তু রোগীকে সুস্থ করলেন। কোন সমালোচনা যেন আমাদের হাতের কাজকে থামিয়ে না দেয়– সে বিষয়ে আমাদের যত্নবান হতে হবে। তিনি সেই অবশরোগীকে বললেন, 'ওঠো, তোমার বিছানা তুলে নাও; আর বাড়িতে ফিরে যাও।' খ্রীষ্টের এই ক্ষমতাপূর্ণ কথা রোগীকে উঠে দাঁড়ানোর শক্তি জোগালো (৭ পদ)। ফলে সে তখনই উঠে বাড়ি চলে গেল। এখন

১. খ্রীষ্ট তাকে তার বিছানা নিয়ে উঠে যেতে বললেন এটা দেখানোর জন্য যে, সে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়েছে এবং তাকে আর বয়ে নিয়ে যাওয়ার আবশ্যকতা নেই; উপরন্তু সে নিজেই হেঁটে যেতে পারবে।

২. তিনি তাকে তার বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন যেন সে তার পরিবারের জন্য আশীর্বাদসরূপ

হয়, যেখানে সে দীর্ঘদিন বোঝা হয়ে ছিল। কিন্তু এখন আর তাকে বোঝা হয়ে থাকতে হবে না। তার দেখাশোনা করার জন্য আর কাউকে প্রয়োজন হবে না। যে সম্মান সে হারিয়ে ফেলেছিল তা এখন পুনরুদ্ধার হল। অবশরোগীটি তার হারানো সম্মান ফিরে পেল।

চ. এই ঘটনা জনতাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল– সে বিষয়ে আমরা দেখি ৮ পদ। 'লোকেরা অবাক হল এবং ঈশ্বরকে গৌরব দিল।' মনে রাখুন, আমাদের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের করা সব আশ্চর্য কাজ যেন ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করার জন্যই ব্যবহৃত হয়। কারণ এই ক্ষমতা একমাত্র তাঁর। লোকেরা ঈশ্বরকে গৌরব দিল কারণ খ্রীষ্ট এই দরিদ্র লোকটির জন্য সত্যিই অনেক মহান কাজ করেছিলেন। মনে রাখুন, অন্যদের প্রতি অনুগ্রহের ফল হচ্ছে প্রশংসা ও স্বীকৃতি। তাই আমাদেরও অন্যদের কাজের প্রশংসা করতে আগ্রহী হতে হবে। খ্রীষ্টের এই চিহ্ন-কাজ প্রত্যক্ষ করে যদিও এই জনতার মাঝে কেবল গুটিকয়েকটি লোকই তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তবুও তারা তাঁর প্রশংসা করেছিল। তবে সেটা ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে নয় কিন্তু এমন একজন লোক হিসেবে যাকে ঈশ্বর ক্ষমতা দিয়েছেন। মনে রাখুন, ঈশ্বর অবশ্যই গৌরবান্বিত হবেন, বিশেষত যে ক্ষমতা তিনি মানুষকে ভাল কাজ করার জন্য দিয়েছেন তার মধ্য দিয়ে। কারণ এসব ক্ষমতা তাঁরই। তা তাঁরই মধ্যে নিহিত আছে। এক্ষেত্রে মানুষ হচ্ছে অনেকটা ফাউনটেন পেনের মতো; যার ভেতরের কালিটুকু (অর্থাৎ ভাল কাজের ক্ষমতা) ঈশ্বরের। দৃশ্যত মানুষ কেবল ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করার অধিকারটুকু রাখে।

মথি ৯:৯-১৩

এই পদগুলোতে আমরা দরিদ্র করআদায়কারীর প্রতি খ্রীষ্টের দয়া ও আনুকূল্যের প্রকাশ দেখতে পাই। নির্দিষ্ট করে বললে মথির প্রতি। তিনি লোকদের দেহের ওপর যা করেছিলেন তা তাদের আত্মার জন্য একটি দয়ার পথ রচনা করেছিল। এখন এখানে দেখুন,

ক. মথির প্রতি তাঁর আহ্বান। ইনি এই সুসমাচারের লেখক। মার্ক ও লূক তাঁকে 'লেবি' বলে সম্বোধন করেছেন। একজন ব্যক্তির দু'টি নামে পরিচিতি পাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার; হতে পারে কর-আদায়কারী হিসেবে 'মথি' নামটি লোক-সমাদৃত ছিল এবং সেকারণেই মথি তার বিনম্রতার কারণে নিজেকে সেই নামে উল্লেখ করেছেন– যা 'লেবি' নামের চেয়ে কম সম্মানিত। কেউ কেউ মনে করেন, খ্রীষ্ট তাকে প্রেরিত হিসেবে ডাকার সময় 'মথি' নামটি দিয়েছিলেন, যেমন শিমোনকে তিনি দিয়েছিলেন 'পিতর' নামটি। 'মথি' নামের অর্থ ঈশ্বরের দান। পরিচালকেরাও মণ্ডলীর জন্য ঈশ্বরের দানস্বরূপ; তাদের পরিচর্যা কাজ এবং তাদের সামর্থ্যই প্রমাণ করে যে, তাদের মাঝে ঈশ্বরের তালন্ত আছে। এখন লক্ষ্য করুন,

১. খ্রীষ্ট মথিকে আহ্বান করার সময় কী অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন। 'তিনি কর আদায় করার ঘরে বসেছিলেন।' কারণ তিনি ছিলেন একজন কর আদায়কারী (লূক ৫: ২৭)। কফরনাহুম বন্দরে তার অফিস ছিল অথবা তিনি পণ্যশুল্ক গ্রহণ করতেন; আবার এমনও হতে পারে তিনি ভূমিকর-গ্রাহক ছিলেন। এখন

(১) তাকে ডাকা হল, যেমনটা বাকিদেরও ডাকা হয়েছিল (৪:১৮)। মনে রাখুন,

শয়তান তাদেরকেই তার পরীক্ষার জন্য বেছে নেয়– যারা নিষ্ক্রিয়, শ্রমবিমুখ। অপরদিকে খ্রীষ্ট তাদেরকেই আহ্বান জানান যারা কাজের মধ্যে থাকে। কিন্তু,

(২) এই আহবান এমন এক পেশার লোকের প্রতি করা হল, যে পেশায় বর্তমান সময়ের মতো তখনও দুর্নীতি ও অনিয়ম, প্রলোভনের চর্চা ছিল। সাধারণত এই পেশাজীবীদের মাঝে ভাল লোক খুঁজতে যাওয়াটা অযথা সময় ক্ষেপণের মতো ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতো। খ্রীষ্ট যাকেই আহ্বান করেছেন তাদের পরবর্তী জীবন একেবারে পাল্টে গিয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে আমরা পৌলের কথা বলতে পারি (১ তীমথিয় ১:১৩)। খ্রীষ্টের আহ্বানের অনুগ্রহের প্রভাব অসাধারণ এবং তা দেখায় যে, সব প্রকার লোকের প্রতি ঈশ্বরের দৃষ্টি রয়েছে। এই পৃথিবীতে স্ব-আহ্বান দ্বারা কেউ নিজেকে তার অবিশ্বাসের জন্য বিচার করতে পারে না; কারণ কোন আহ্বানই পাপে পূর্ণ নয়। কিন্তু কেবল অল্পই তা থেকে রক্ষা পাবে যদিও তা যথেষ্ট নিয়মানুগ নয়।

২. এই আহ্বানে 'নিষেধের' ক্ষমতা বিবৃত হয়েছে। আমরা মথিকে খ্রীষ্টের দিকে তাকাতে কিংবা তাঁকে অনুসরণ করতে দেখি না; যদিও তার কয়েকজন আত্মীয় এরই মাঝে খ্রীষ্টের শিষ্য হয়েছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্ট তাকে তাঁর পবিত্র অনুগ্রহ দ্বারা তাকে নিষেধ করলেন। খ্রীষ্টকে এমন লোকদের মাঝে পাওয়া গেল– যারা তাঁকে খোঁজে নি। খ্রীষ্ট-ই প্রথমে কথা বললেন। 'আমরা তাঁকে বেছে নিইনি, কিন্তু তিনিই আমাদের বেছে নিয়েছেন'; তিনি মথিকে বলেন, 'আমার পেছনে আস'; এবং খ্রীষ্টের আহ্বানে সেই একই স্বর্গীয় ক্ষমতা মথিকে মনপরিবর্তনে উদ্যোগী করেছিল; যা আমরা তার পরবর্তী পদক্ষেপে দেখি (৬ পদ) – 'তিনি উঠে যীশুর পেছনে গেলেন'; যেটা আমরা অবশরোগীকে করতে দেখি।

মনে রাখুন, একটি রক্ষাকারী পরিবর্তন সাধিত হয় রূহে। এক্ষেত্রে খ্রীষ্ট একজন লেখকের মতো যিনি ইচ্ছেমতো চরিত্রগুলোকে সাজাতে পারেন। ফলত তাঁর কথা এখানে মথিকে পথ নির্দেশ করল। তাঁর সুসমাচার হচ্ছে ঈশ্বরের পরিত্রাণদানকারী ক্ষমতা (রোমীয় ১:১৬)। মথিকে যে আহ্বান জানানো হল তা কার্যকরী হল, কারণ তিনি সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন; তিনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তখনই খ্রীষ্টকে অনুসরণ করেছিলেন। দৃশ্যত খ্রীষ্টের এই আহ্বান প্রত্যাখ্যাত হয় নি; মথি তাঁর বাধ্য থাকা নিয়ে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করেন নি। স্বর্গীয় অনুগ্রহের ক্ষমতার কাছে সব আপত্তি ধুয়ে-মুছে যায়; কারণ সেই আহ্বানে সত্যিকারের আনন্দ দানকারী উত্তর নিহিত থাকে। খ্রীষ্টের আহ্বান পেয়ে মথি তার অবস্থান নিয়ে ভাবলেন না কিংবা তাতে সাড়া দিলে তার কী লাভ হবে সেটা নিয়েও ভাবিত হলেন না। তিনি কোন লোকের সাথে পরামর্শ করলেন না (গালা ১:১৫, ১৬)। তিনি তার পদমর্যাদা ত্যাগ করে তার আশা খ্রীষ্টতে নিবদ্ধ করলেন। যদিও আমরা খ্রীষ্টের জেলে-শিষ্যদের কিছু পরে পুনরায় মাছ ধরায় ফিরে যেতে দেখি, তথাপি আমরা কোথাও পড়ি না যে, মথি তার পুরানো পেশায় ফিরে গিয়েছিলেন।

খ. এর ফলে খ্রীষ্ট কর-আদায়কারী ও পাপীদের সাথে মিশলেন। মথিকে আহ্বান কর-ার মাধ্যমে তিনি নিজেকে সেই পেশার লোকজনদের জন্যও মমতাকারী হিসেবে প্রকাশ করলেন। যীশু এরপর 'বাড়িটিতে খেতে বসলেন' (১০ পদ)। অন্য সুসমাচার-লেখক আমাদের জানান যে, মথি একটি বড় ভোজের আয়োজন করেছিলেন– যা দরিদ্র জেলেরা আহ্বান পাবার কালে করতে সমর্থ ছিল না। কিন্তু মথি যখন নিজে সেই ঘটনাটি বর্ণনা করলেন তখন তিনি কেবল বললেন, 'যীশু বাড়িটিতে খেতে বসলেন'। তিনি বললেন না

যে, সেটা তার নিজের বাড়ি বা এটা একটা বড় ভোজ। কিন্তু তিনি বললেন, 'তিনি বাড়িটিতে খেতে বসলেন।' খ্রীষ্ট কর আদায়কারীদের যে আনুকূল্য দেখিয়েছিলেন তার পুরো বয়ান না দিয়ে এবং নিজের বিষয়ে বলা থেকে বিরত থেকে তার স্থলে খ্রীষ্টকেই 'মুখ্য' বিবেচনা করলেন। মনে রাখুন, নিজেদের ভাল কাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে যতটা সম্ভ ব কমিয়ে বলা-ই শ্রেয়।

এখন দেখুন,

১. মথি যখন খ্রীষ্টকে আমন্ত্রণ জানালেন তখন তাঁর সাথে তাঁর শিষ্যদেরও আমন্ত্রণ করলেন। মনে রাখুন, যারা খ্রীষ্টকে স্বাগত জানায় তারা অবশ্যই তাঁর জন্যে তাঁর সবকিছুকে স্বাগত জানায় এবং তাদের হৃদয়ে একটি কক্ষ খ্রীষ্টের জন্য বরাদ্দ করে।

২. তিনি অনেক কর-আদায়কারী এবং পাপীকে খ্রীষ্টের সাথে মিলিত হবার জন্য সেই ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। মথি তার এই কাজের মাধ্যমে একটি মূল জিনিসের দিকে আলোকপাত করলেন– তিনি তার পুরানো পেশাজীবী বন্ধুদেরও খ্রীষ্টের সামনে আনলেন। তিনি অভিজ্ঞতা থেকে জানতেন, খ্রীষ্টের অনুগ্রহ কী করতে পারে এবং তা তাদের নিরাশ করবে না। মনে রাখুন, যারা কার্যকরভাবে খ্রীষ্টের কাছে নিজেদের উপস্থাপন করে– তারা এই আশা করতে পারে যে, অন্যরাও তাঁর কাছে আসবে এবং সেজন্য তাদেরও কিছু করার প্রয়োজন উপলব্ধি করবে। 'সত্য অনুগ্রহ' তার ফল একা খায় না কিন্তু অন্যদেরও নিমন্ত্রণ করে। মন পরিবর্তনের ফলে যাদের সাথে মথির (কর-আদায়কারী) যোগাযোগ চুকে গেল তারাই এখন মথির বাড়িতে পূর্ণ সমাবেশ করল; এদেরই কেউ কেউ নিশ্চিতভাবে তার মতোই খ্রীষ্টকে অনুসরণ করেছিল। এভাবে আন্দ্রিয় ও ফিলিপও খ্রীষ্টকে অনুসরণ করেছিলেন (যোহন ১:৪১, ৪৫; ৪:২৯; দেখুন বিচারকর্তৃকগণ ১৪:৯)।

গ. এই ঘটনায় ফরীশীরা অসন্তুষ্ট হল (১১ পদ)। তারা এতে আপত্তি জানাল, 'তোমাদের শিক্ষক কর-আদায়কারী ও পাপীদের সাথে খাওয়া দাওয়া করেন কেন?' এখানে দেখুন,

১. খ্রীষ্ট তাদের এই কথায় প্রতিক্রিয়া দেখালেন। এটা তার কোন ক্ষুদ্র দুঃখভোগ ছিল না যে, তিনি পাপীদের দ্বন্দ্বের সাথে পরীক্ষায় উপনীত হলেন; মানুষের মাঝে কারও জন্য কেউ এত বড় দ্বন্দ্বে উপনীত হয় নি যেমনটা খ্রীষ্ট ঈশ্বর ও মানুষের মাঝের দ্বন্দ্বের মীমাংসায় নিবেদিত হয়েছিলেন। এভাবে তিনি নিজেকে নিচু করলেন; তাঁর প্রাপ্য স্বর্গীয় সম্মান নিলেন না– যা তাঁর কথায় এবং এরই মাঝে তিনি যা বলেছিলেন তাতে সিদ্ধ হয়। কারণ যদিও তিনি কখনো কোন খারাপ কথা বলেন নি কিংবা কোন পাপ করেন নি তবুও ফরীশীরা তাঁর 'কথায় ও কাজে' সেসময় খুঁত ধরেছিল। এভাবে খ্রীষ্ট আমাদের শিক্ষা দেন যেন আমরা এরকম সমালোচনার জন্য প্রস্তুত থাকি এবং তা যেন ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করি।

২. ফরীশীরা খ্রীষ্টের সাথে বাদানুবাদে লিপ্ত হল; যারা ছিল মানুষের মাঝে একটি গর্বিত প্রজন্ম, যারা নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ ভাবতো আর অন্যদের তুচ্ছ জ্ঞান করতো। ভাববাদীদের সময়েও ঠিক একই রকম ঘটনা ঘটেছিল– যারা বলেছিল– 'নিজে নিজে দাঁড়াও, আমার কাছে এসো না; আমি তোমার চেয়ে পবিত্রতর।' পাপীদের এড়িয়ে চলার ক্ষেত্রে ফরীশীদের যে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা দেখা যেত তা কিন্তু পাপকে এড়িয়ে চলার ক্ষেত্রে দেখা যেত না। পোশাকী পবিত্রতা রক্ষায় তাদের মতো এত আগ্রহী একজনকেও খুঁজে পাওয়া যেত না, কিংবা তাদের চ্যালেঞ্জ জানায়– এমন কারও সাক্ষাত পাওয়ার কথা তখন চিন্তাও করা যেত

না। তারা কেবল তাদের পূর্বপুরুষদের নিয়মকানুন মেনে চলায় আগ্রহী ছিল এবং তারা সেই একই শক্তিতে তাদেরই মতো নিজেদের পরিচালিত করতো।

৩. তারা তাদের আপত্তির কথা সরাসরি খ্রীষ্টকে বলল না; কারণ খ্রীষ্টকে তা বলার সৎ সাহসটুকু তাদের ছিল না। উল্টো তারা তা বলল তাঁর শিষ্যদের কাছে। যদিও তারা একই রকম মানসিকতার অধিকারী ছিল, তবুও সেই কথার উদ্দেশ্য ছিল তাদের গুরুর কাছে; কারণ তারা তাদের ওস্তাদকেই অনুসরণ করতো। তারা শিষ্যদের এই শিক্ষা দিল যে, 'একজন ভাববাদী হিসেবে খ্রীষ্টের এই খারাপ লোকদের সাথে মেশাটা ঠিক মানায় না। তাঁকে তার পবিত্রতার কথা মাথায় রেখে এদের সাথে দূরত্ব বজায় রাখা উচিত।' কিন্তু যেহেতু তারা খ্রীষ্টের কাছ থেকে এর আগেও সমুচিত উত্তর পেয়েছিল তাই তারা এই কথা তাঁর শিষ্যদের বলল। মনে রাখুন, খ্রীষ্টানদের এ সম্বন্ধে অবগত থাকা জরুরি যে, তারা যেন খ্রীষ্টকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে পারে। তাঁর শিক্ষা ও নিয়ম সম্বন্ধে কেউ যদি প্রশ্ন করে তবে তারা যেন তাদের সমুচিত উত্তর দিতে পারে (১ পিতর ৩:১৫)। যখন তিনি আমাদের জন্য স্বর্গে একজন উকিল তখন আমাদেরও তার জন্য পৃথিবীয় মুখপাত্র হিসেবে কথা বলা প্রয়োজন এবং কেউ তাঁর নিন্দা করলে মনে করতে হবে তা আমাদেরই উদ্দেশে।

৪. কর-আদায়কারী ও পাপীদের সাথে তাঁর খাওয়া-দাওয়া করাকে দোষের দৃষ্টিতে দেখা হল এই বলে যে, খারাপ লোকদের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়া ঈশ্বরের ব্যবস্থাবিরোধী (গীত ১১৯:১১৫; ১:১); হয়তো খ্রীষ্টকে অভিযুক্ত করার মাধ্যমে তারা শিষ্যদেরও অভিযুক্ত করতে চাইলো এবং বোঝাতে চাইলো, খ্রীষ্ট তাদের পাপের দিকে প্ররোচিত করছেন; কারণ তারা মেলামেশার ক্ষেত্রে আরও বিচক্ষণ হতে পারতো। যেহেতু তারা নির্ভুলভাবে সমুদ্রপথে ও স্থলপথে দিকনির্ণয় করতে পারে সেহেতু ঈশ্বরের পথে চলার ক্ষেত্রে তারা কেন ভুল কম্পাস বেছে নিয়েছে! ফরীশীরা তাদের মনে এই বোধ উস্কে দিতে চাইলো যে, খ্রীষ্টের নির্দেশনা মেনে নিয়ে তারা হয়তো দিকনির্ণয়ে ভুল করছে। যেহেতু কর আদায়কারীদের সাথে মেলামেশা করাটা পূর্বপুরুষদের নিয়ম বা প্রথাবিরুদ্ধ, সেকারণেই ফরীশীরা এতে দোষ খুঁজে পেল। ফলে তারা খ্রীষ্টের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। এবারে দেখা যাক তাদের ক্ষুব্ধতার উৎসগুলো কী–

(১) ফরীশীরা সবসময় খ্রীষ্টের দোষ ধরতে চাইতো এবং তাঁকে ভুল প্রমাণে উদ্যত হতো। মনে রাখুন, এটা খুবই সহজ ও সাধারণ একটি বিষয় যে, ভাল কথা ও কাজের ওপর সর্বযুগে কালিমা লেপনের চেষ্টা চলে।

(২) তারা পাপী কিংবা কর আদায়কারীদের ভাল চাইতো না, উপরন্তু তাদের প্রতি খ্রীষ্টের আনুকূল্যকেও তারা প্রশ্নবিদ্ধ করল। পাপীদের মনে ফেরানোর দৃশ্য দেখতেও তাদের মনে কুণ্ঠাবোধ ছিল। মনে রাখুন, এতেই বোঝা যায় যে, তাদের মাঝে ঈশ্বরের অনুগ্রহ অনুপস্থিত ছিল। যারা অন্যের মাঝে ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপস্থিতিকে সহ্য করতে পারে না, উপরন্তু এর বিরোধিতা করে, অসন্তুষ্ট হয়– তারা মূলত ঈশ্বরের অনুগ্রহবিবর্জিত।

ঘ. খ্রীষ্ট যেভাবে নিজেকে এবং তাঁর শিষ্যদের পাপীদের সাথে মেশার 'দোষ' থেকে রক্ষা করলেন। দৃশ্যত শিষ্যেরা তখন তত্ত্বকথা কিংবা বিশ্বাসে খুব একটা সমর্থ ছিলেন না। ফলে ফরীশীদের প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণে তারা অগ্রসর হয়েছিলেন এবং সেকারণেই তা খ্রীষ্টের কাছে এসেছিলেন। আর তিনি তা শুনেছিলেন (১২ পদ)। অথবা তিনি হয়তো শিষ্যদের সাথে ফরীশীদের কথোপকথন শুনে ফেলেছিলেন। তিনি একাই নিজেকে

উত্তোলিত করলেন এবং তার নিজের স্বপক্ষে বললেন এবং আমাদের জন্যও এক উত্তর তৈরি করে রাখলেন। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি দু'টো বিষয়ের ওপর আলোকপাত করলেন–

১. কর আদায়কারীদের জন্য তাঁর মমত্ববোধের প্রয়োজনীয়তা ও আবশ্যকতা– যা তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেছিল এবং সেকারণে তিনি তাদের সাথে তাঁর মেলামেশাকে প্রশ্নমুক্ত রাখতে উদ্যত হলেন। এটা ছিল দারিদ্রের চরম প্রয়োজনীয়তা। যেহেতু তিনি পতিত মানুষদের জন্যই এসেছিলেন সেহেতু তাদের সাথে মেলামেশায়ও তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করলেন। খ্রীষ্ট এখানে স্পষ্ট করে দিলেন, তাঁর কাজের মূল উপাদান হচ্ছে পাপীরা। এখানে,

(১) তিনি প্রমাণ করলেন যে, ঈশ্বরের রাজ্যে করআদায়কারীদের মতো পাপীদেরও প্রয়োজন আছে– 'সুস্থদের জন্য ডাক্তারের দরকার নেই কিন্তু অসুস্থদের জন্য আছে।' কর আদায়কারীরা ছিল অসুস্থ। তাই তাদের সুস্থ হবার জন্যে সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ফরীশীরা সেদিকে মনোযোগ দেয় নি। মনে রাখুন,

(ক) পাপ হচ্ছে আত্মার অসুস্থতা; পাপীরা হচ্ছে আত্মিকভাবে অসুস্থ। দুর্নীতি হচ্ছে সেই রূহেরই রোগ, এ থেকেই খারাপ কাজ সাধিত হয়ে থাকে। অথবা তা রোগের উপসর্গ। তা ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত করে, তাঁর প্রতি মনোযোগকে স্থানচ্যুত করে, দুর্বল করে, মনে অশান্তির সৃষ্টি করে, নষ্ট করে, মেরে ফেলে। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তা অনিরাময়যোগ্য নয়।

(খ) যীশু খ্রীষ্ট হচ্ছেন আত্মার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। শারীরিকভাবে অসুস্থদের সুস্থ করে তিনি তাঁর ক্ষমতাকে আরও মূর্ত করে তুলেছেন। 'তাঁর ডানার নিচে রয়েছে আরোগ্যক্ষমতা'। তিনি বিশ্বস্ত, দক্ষ এবং অনুগ্রহে পূর্ণ একজন চিকিৎসক এবং অসুস্থদের সুস্থ করে তোলাই তাঁর কাজ। জ্ঞানী এবং ভাল লোকেরা চিকিৎসকের মতো যেভাবে সমাজের রোগ সারিয়ে তুলতে সচেষ্ট থাকে সেভাবে খ্রীষ্টও মানুষের শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি দূর করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এ প্রসঙ্গে সেনেকা বলেন– একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক রোগীর প্রতি সত্যিকারের মমতা পোষণ করে থাকেন এবং তাকে সারিয়ে তুলতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেন।

(গ) পাপরোগে আক্রান্ত আত্মার এই চিকিৎসকের দারস্থ হওয়া প্রয়োজন, কারণ তাদের রোগ খুবই বিপদজনক; প্রাকৃতিকভাবে তা সারানো সম্ভব নয়। কোন মানুষই এক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করতে পারে না, তাই আমাদের খ্রীষ্টের সাহায্য প্রয়োজন। তাঁকে ছাড়া আমরা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ পরিগণিত হই। সচেতন পাপীরা তাদের প্রয়োজনের ব্যাপারটা বোঝে এবং সেভাবে নিজেদেরকে তাঁর কাছে সমর্পণ করে।

(ঘ) এখানে সেসব লোকের কথাও বোঝা যায়– যারা মনে করতো যে, তাদের জীবনে খ্রীষ্টের কোন প্রয়োজন নেই; উপরন্তু তারা নিজেরাই তাঁকে ছাড়া এগুবার জন্য যথেষ্ট– যেমন, লায়দিকেয়া মণ্ডলী মনে করেছিল (প্রকা ৩:১৭)। এভাবে ফরীশীরা খ্রীষ্টের শিক্ষা থেকে কিছু নিতে চাইতো না; তবে তা এই কারণে নয় যে, তারা তাদের জীবনে খ্রীষ্টের প্রয়োজনীয়তা বুঝতো না, কিন্তু তারা ভাবতো– খ্রীষ্টে তাদের কোন প্রাপ্তি নেই (যোহন ৯:৪০, ৪১)।

(২) তিনি প্রমাণ করলেন যে, পাপীদের প্রয়োজন তাঁর এই মেলামেশাকে ত্বরান্বিত

করেছে। সেকারণেই তিনি তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করছেন এবং তাদের দোষারোপও করছেন না, কারণ তাদের সেই 'প্রয়োজন' একে অনুগ্রহ প্রদানের উপলক্ষে পরিণত করেছিল। তবে ধর্মীয় কাজের ক্ষেত্রে এই রকম দয়ার কাজে আনুষ্ঠিকতার দাগ লেগে থাকে। ফলে সেই কাজে সত্যিকারের বদান্যতা ও উদারতা লক্ষ্য করা যায় না। বাস্তবে যেমন 'ভাবানোর' চেয়ে 'করে দেখানোটাই' কার্যকর বলে বিবেচিত হয়, তেমনি শাস্ত্র দায়িত্ব পালনেও আমাদের সতর্ক-সজাগ থাকতে হবে, যেন সেখানে প্রকৃত দয়ার কোন ঘাটতি না থাকে। অর্থাৎ মৌখিক নয়, প্রায়োগিক 'দয়া-ই' হবে বিশ্বাসীদের প্রিয় অবলম্বন। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে নেয়া সিদ্ধান্ত অনেক সময় প্রথাবিরুদ্ধ হলেও তা সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ এর উদ্দেশ্যই হচ্ছে– মানুষের ভাল করা। সেকারণে এর গুরুত্বও অপরিসীম। ব্যক্তিগত ধর্মচর্চায় কঠোর নিয়মানুবর্তী হওয়াটা সহজ কিন্তু মানুষের সেবায় নিজেকে নিবেদন করাটা বাস্তবিকই কঠিন বলে বিবেচিত হয়। মোটকথা হচ্ছে বাস্তবতাবোধ; অর্থাৎ শিক্ষাকে হতে হবে বস্তুজ্ঞানসম্পন্ন এবং বাস্তবতার আলোকে 'চোখে দেখা ভাইয়ের' ওপরই তা প্রয়োগ করতে হবে। খ্রীষ্ট এখানে সেই বিষয়টিই প্রমাণ করলেন (১৩ পদ) এবং তা করতে গিয়ে তিনি হোশেয় ৬:৬ পদটি উদ্ধৃত করলেন, 'দয়াতেই আমি সন্তুষ্ট, পশু কোরবানিতে নয়'। তাঁর এই শিক্ষা তদানীন্তন সমাজে কর আদায়কারীদের সাথে সাধারণ মানুষের যে বৈষম্য তৈরি করেছিল তা দূর করে ফরীশীদের উল্লাসিত হওয়াকে নিরুৎসাহিত করে। কারণ 'কাউকে অনুগ্রহ করা পশু উৎসর্গের চেয়েও বেশি ফল বয়ে আনে।' কর আদায়কারীদের সাথে খ্রীষ্টের আলোচনা ছিল সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের চেয়েও বেশি কিছু এবং সেকারণে তিনি তাঁর কাজটি করার আগে সে সম্পর্কে আগাম ব্যাখ্যা দিয়ে রাখলেন। শামুয়েলও অনুরূপ কাজ করেছিলেন (১ শমূয়েল ১৫:২২, ২৩)। তাই নিজেদের আত্মিক জীবনের 'ভাল' করাটা যদি ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান, যেমন– উৎসর্গের চেয়েও উৎকৃষ্টতর হয় তবে অন্যদের 'ভাল' করাটা তো আরও মহান ও তাৎপর্যপূর্ণ। পাপীদের সাথে খ্রীষ্টের মেলামেশা এখানে 'অনুগ্রহ' হিসেবে দেখানো হয়েছে; আত্মার উন্নতি সাধনের জন্য 'মেলামেশা' তাকেই এখানে উৎসাহিত করা হয়েছে; এবং এই কাজের মাধ্যমে আমরা বিমূর্ত ক্ষমাকে চোখের সামনে উপস্থিত হতে দেখি। যেহেতু এই মেলামেশা একটি আত্মাকে মৃত্যু থেকে জীবনে ফিরিয়ে আনে (যাকোব ৫:২০) সেহেতু এর গুরুত্বও অপরিসীম। দেখুন, খ্রীষ্ট শাস্ত্রের এই উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে কী বললেন, 'যান, গিয়ে ভাল করে আমার একথার মানে খুঁজে দেখুন'। মনে রাখুন, পবিত্র শাস্ত্র কেবল পড়লেই চলবে না, উপরন্তু এর সঠিক অর্থও বুঝতে হবে। এর ফলে আমরা এর সত্যিকারের প্রয়োগ সম্বন্ধে জানতে পারি এবং নিজেদের ভুলগুলো শুধরে নিজেদের জীবনে তা চর্চা করতে পারি।

(ক) খ্রীষ্ট শাস্ত্রের যে পদটি উদ্ধৃত করলেন তা কেবল পবিত্রতার বিষয়ে দেখানোর জন্য নয় কিংবা নির্দিষ্ট মতামত বা সন্দেহেপূর্ণ আপত্তির উত্তর দেবার জন্যও নয়; বরং আমরা যেন অন্যদের ভাল করতে উদ্যোগী হই– সেই শিক্ষা দিতেই তিনি তা উদ্ধৃত করলেন। তাঁর শিক্ষা কেবল ধার্মিকতা ও শান্তিতে চলার জন্য (গা বাঁচিয়ে) নয় বরং এতিম ও বিধবাদের দেখাশোনা করার জন্যও।

(খ) খ্রীষ্ট এর মাধ্যমে ফরীশীদের ভণ্ডামিকে দোষী সাব্যস্ত করলেন– যারা ধর্মীয় শিক্ষার অপব্যাখ্যা করতো। বাস্তবিকই যে ব্যাখ্যা মূল শিক্ষার ধারে কাছেও ছিল না (২৩:২৩)। তারা ধার্মিকতার সেই আবরণটুকু নিতেই ব্যস্ত ছিল– যা তাদের মনে গর্ব এনে

দিয়েছিল। তাদের আশা, লোভ ও ঘৃণাকে বাড়িয়ে তুলেছিল। ফলে খ্রীষ্ট যখন তাদের লালসাকে দোষী সাব্যস্ত করলেন তখন তারা তাঁর শিক্ষাকে ঘৃণা করল।

২. তিনি এখানে তাঁর কাজের বিষয়ে বললেন– 'আমি ধার্মিকদের জন্য আসিনি কিন্তু পাপীরা যাতে মন ফেরায় সেজন্য এসেছি।' সেকারণেই তিনি কর আদায়কারীদের সাথে মেলামেশা করছেন। লক্ষ্য করুন,

(১) তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য। আর তা হচ্ছে, অনুতাপের বাণী প্রচার করা। এটাই ছিল তার প্রথম প্রচার -ভাষ্য (৪:১৭)- যা তাঁর সব শিক্ষার মূল। মনে রাখুন, সুসমাচার হচ্ছে অনুতাপের আহ্বান জানানোর ডাক। তা আমাদের মন পরিবর্তন করে সঠিক পথ বেছে নিতে বলে।

(২) যার সাথে তাঁর আগমন হেতু জড়িত; তা ধার্মিকদের সাথে নয় কিন্তু পাপীদের সাথে। অর্থাৎ (ক) যদি মানুষের সন্তানেরা পাপী না হতো তবে খ্রীষ্টের এই পৃথিবীতে আসার কোন যৌক্তিক কারণ থাকত না। তিনি হচ্ছেন পরিত্রাণকর্তা এবং তা পতিত মানুষের জন্য। যদি প্রথম মানুষ আদম তার ধার্মিকতা অক্ষুণ্ন রাখতে পারতো তবে দ্বিতীয় আদমের আসার প্রয়োজন ছিল না। (খ) সেকারণে তাঁর মূল কাজ ছিল জঘন্য পাপীদের সাথে, যা ছিল খুবই বিপদজনক। তবে একজন যোগ্য চিকিৎসক হিসেবে খ্রীষ্ট নিজেকে পাপরোগের সংক্রমণমুক্ত ছিলেন। খ্রীষ্ট পাপীদের রক্ষা করতে এই পৃথিবীয় এসেছিলেন বিশেষত যারা জঘন্য অপরাধী (১ তীমথিয় ১:১৫); যারা নিজেদের 'ধার্মিক' বলে পরিচয় দেয় এবং তাঁর শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করে তাদের চেয়ে খ্রীষ্টের কাছে দুঃখার্ত পাপীর মূল্য অনেক বেশি। (গ) যে পাপী তার পাপ সম্পর্কে বেশি সচেতন সে খ্রীষ্টকে ও তাঁর সুসমাচারকে আরও বেশি করে নিজের জন্য চাইবে; এবং যেখানে তাঁকে পাওয়া যাবে সেখানেই তার সান্নিধ্য পেতে ছুঁটে যাবে। যারা ধার্মিক হিসেবে অনর্থক গর্ববোধ করে, খ্রীষ্টের আগমন তাদের জন্য নয়; কারণ তারা তাদের স্বীয় অহংবোধ থেকে খ্রীষ্টের নিন্দা করতেও কুণ্ঠিত হয় না। অপরদিকে যারা নিজেদের পাপী বলে স্বীকার করে, বিনম্র হয়– খ্রীষ্ট তাদের কাছে অবশ্যই ধরা দেবেন; কারণ তাদের কাছেই তো তিনি পরম প্রার্থিত হিসেবে বরেণ্য হবেন।

মথি ৯:১৪-১৭

খ্রীষ্ট ও তাঁর শিষ্যদের কাজ নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে আলোচনার পথ খুলে গেল; এভাবে প্রায়ই সত্যের বিষয়ে আগ্রহ মেটানো হয়, এমনকি তা বিপক্ষের দ্বারা প্রশ্ন উত্থাপনের ফলেও হয়ে থাকে। এভাবে খ্রীষ্টের প্রজ্ঞা মন্দের মধ্য দিয়ে ভাল জিনিসটিই বয়ে আনতে সমর্থ হয়। এই অধ্যায়ের এটি হচ্ছে তৃতীয় পরিচ্ছেদ; তাঁর আলোচনার মূলেই ছিল পাপের ক্ষমা এবং পাপীদের গ্রহণ করার জন্য তাঁর উন্মুখ হয়ে থাকার বিষয়টি। আর তা ধর্ম-শিক্ষক ও ফরীশীদের আপত্তির ফলে আমন্ত্রিত হয়েছিল। তাই এখানে তাঁর 'দলীয়' যে বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হল– তা দলের জন্য তাঁর মমতার প্রকাশ ঘটায়। দেখুন,

ক. যোহনের শিষ্যেরা খ্রীষ্টের শিষ্যদের উপবাস না রাখার বিষয়টি নিয়ে আপত্তি তুলেছিল। দৃশ্যত এবারও শিষ্যেরা প্রশ্নের মুখোমুখি হল। এর আগে কর আদায়কারী ও

পাপীদের সাথে তাদের খাওয়া-দাওয়া নিয়ে আপত্তি তুলেছিল ফরীশীরা; আর এবার স্বয়ং যোহনের শিষ্যেরা তাদের উপবাস না রাখার বিষয়ে আপত্তি তুলল। প্রথমবার ফরীশীরা শিষ্যদের কাছে খ্রীষ্টের বিশ্বস্ততা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাদের এই পরামর্শ দিয়েছিল যে, তাদের পথ পরিবর্তন করা দরকার। এখন আমরা দেখি যে, যোহনের শিষ্যেরা খ্রীষ্টের কাছে তাঁর শিষ্যদের 'কর্তব্যে অবহেলার' ব্যাখ্যা চাইছেন। অন্য সুসমাচার-লেখকের লেখায় দেখা যায় যে, ফরীশীদের শিষ্যরা এ সময় যোহনের শিষ্যদের সাথে যোগ দিয়েছিল (মার্ক ২:১৮ এবং লূক ৫:৩৩)। ফলে এটা ভাবার স্বভাবতই কারণ বিদ্যমান যে, যোহনের শিষ্যদের তারা প্ররোচিত করেছিল। এক্ষেত্রে যোহনের শিষ্যদের তারা অনেকটা কথকের মতো ব্যবহার করেছিল; কারণ খ্রীষ্ট ও তাঁর শিষ্যদের কাছে তা অনেক সমাদর পেত। ফলে ফরীশীরা নিঃসন্দেহ ছিল যে, যোহনের শিষ্যেরা খ্রীষ্টকে 'প্রকৃত সমস্যা' উপহার দিতে সক্ষম হবে।

মনে রাখুন, এটা নতুন কিছু নয় যে, খারাপ লোকেরা ভাল লোকের কানে মন্ত্রণা দিয়ে একের সাথে অন্যের বিরোধ লাগিয়ে দেয়। যদি ঈশ্বরের লোকেরা তাদের ভাবাবেগে পার্থক্য দেখতে পায় তখন তা তাদের ভুল পথে নিয়ে যেতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে এবং তা একের সাথে অন্যের বিরোধ বাঁধিয়ে দেয়। একজন থেকে সহজেই তা অন্যকে বিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ হয়। ফলে তা সহজেই তাদের জন্য ধ্বংস বয়ে আনে। যদি যোহন এবং খ্রীষ্টের শিষ্যদের মাঝে সংঘর্ষ হতো তাহলে বোঝা যেত, ফরীশীরা তাদের দিকে ঢিল ছুঁড়ে তাদের কার্যোদ্ধার করতে পেরেছে। এখন তাদের অভিযোগ ছিল, 'আমরা ও ফরীশীরা এত উপবাস রাখি কিন্তু আপনার শিষ্যেরা কেন উপবাস রাখেন না?' স্বভাবতই তা ধর্মীয় অনুশাসন সম্বন্ধীয়– যা পবিত্র ভালবাসার নিশ্চয়তা থেকে করা হয়। অথচ এখানে আমরা সেই কর্তব্যপরায়ণতাকে দেখি ঝগড়া বাঁধানোর উপকরণ হিসেবে। লক্ষ্য করুন,

১. তারা কীভাবে নিজেদের উপবাস রাখার বিষয়টি ব্যক্ত করেছিল– 'আমরা এবং ফরীশীরা এত উপবাস রাখি।' উপবাসকে প্রায় সব ধর্মেই পবিত্র করা হয়েছে। বিশেষ উপলক্ষকে সামনে রেখে এই ধর্মীয় কাজের বিধান যিহূদী ধর্মেও ছিল। তবে ফরীশীরা এই কাজটি বেশ মন দিয়ে করতো। এদের অনেকেই সপ্তাহে দু'দিন উপবাস রাখতো; কিন্তু তারপরও তাদের স্বভাবের বদল হয় নি। তারা ছিল ভণ্ড তথা খারাপ লোক। মনে রাখুন, মিথ্যে এবং আনুষ্ঠানিক ধর্মগুরুরা অনেক সময় অন্যদের চেয়ে বাহ্যিক উপাসনায় বেশি সময় দেয় এবং তা সাধিত হয় কঠোর নিয়মানুবর্তিতায়। অপর দিকে যোহনের শিষ্যরাও প্রায়ই উপবাস রাখতো। তারা বিশেষভাবে তাদের গুরুর এই কাজকে অনুসরণ করতো কারণ তিনি পানাহারের জন্য আসেননি (১১:১৮ পদ) এবং স্বভাবতই লোকেরা তাদের গুরুর কাজকে অনুকরণ করতে পছন্দ করে। তার মতো হতে চায়, যদিও এদের ক্ষেত্রে তা হয় নি; কারণ তাদের শিক্ষক অনুতাপের বাণী প্রচারে বেশি জোর দিয়েছিলেন। মনে রাখুন, ধর্মের খণ্ডিত উপস্থাপনায় তারাই বেশি মনোযোগী হয়– যারা মূলত নিয়মের অধীন; অপরদিকে যারা ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতায় চলে, তাঁর অনুগ্রহকে হৃদয়ে ধারণ করে তারা কখনও শৃঙ্খলিত হয় না; বরং আলোকিত মানুষ হিসেবে অন্যকে আলো বিলিয়ে যায়। তাই আমাদেরও ঈশ্বরের অনুগ্রহের জীবন বেছে নেওয়া উচিত। এখন, তারা খ্রীষ্টের কাছে এসে জানালো যে, তারা প্রায়ই উপবাস রাখে। অর্থাৎ নিজেদের ধার্মিকতার প্রচারকেই তারা প্রথম স্থান দিল। মনে রাখুন, বেশিরভাগ মানুষই নিজের ভাল কাজের বিষয়ে বলতে চায় (হিতোপদেশ ২০:৬)। ধর্মনেতাদের মাঝে একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়– তারা তাদের

ধর্মীয় নিয়মানুবর্তিতা বিশেষত যদি তাদের মাঝে অসাধারণ কিছু থেকে থাকে– সে বিষয়ে উচ্চকণ্ঠ হয়। তারা যে কেবল মানুষের কাছেই নিজেদের ধার্মিকতার বিষয়ে বলে তা নয়, উপরন্তু ঈশ্বরের কাছেও তা বলে আত্মপক্ষ সমর্থনে উদ্ধত-উচ্চকিত হয়।

২. কীভাবে তারা খ্রীষ্টের শিষ্যদের অভিযুক্ত করল যে, তারা তাদের মতো প্রায়ই উপবাস রাখে না– 'আপনার শিষ্যেরা উপবাস রাখে না।' দৃশ্যতঃ খ্রীষ্ট যে তাঁর শিষ্যদের গোপনে উপবাস রাখার বিষয়ে বলেছেন– সে শিক্ষায় তারা কর্ণপাত করে নি। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের এ-ও বলেছিলেন যেন তারা লোকদের দেখানোর জন্য উপবাস না রাখে। তাই যোহনের শিষ্যদের এই দাবি মোটেই ভ্রান্তহীন নয় যে, 'তারা উপবাস রাখে না'। কারণ খ্রীষ্টের শিষ্যেরা তো আর মুখ কালো করে উপবাস রাখেন নি। ফলে বাইরে থেকে তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না যে, খ্রীষ্টের শিষ্যেরা আসলেই উপবাস রাখেন কি না। মনে রাখুন, আমরা অবশ্যই কারও ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে 'দৃশ্যমান উদাহরণ' দেখে সিদ্ধান্ত দেব না। তবুও এটা ধারণা করা হয়েছিল যে, খ্রীষ্টের শিষ্যেরা প্রায়ই উপবাস রাখতেন না; কিংবা তাদের মতো বেশি দিন রাখতেন না। তাই তারা একথা ভাবার অবকাশ পেয়েছিল যে, তারা খ্রীষ্টের শিষ্যদের চেয়ে বেশি ধার্মিক। মনে রাখুন, মিথ্যে ধর্মনেতারা নিজেদেরকে ধর্মীয় কাজের মানদণ্ড হিসেবে তুলে ধরতে চায়। ফলে এর দ্বারা তারা অন্যকে কিংবা সবকিছুকে মাপতে চায়। তবে তাদের এই পরিমাপের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে 'উনি আমার চেয়ে কম ধার্মিক'– এটা প্রমাণ করা।

৩. কীভাবে তারা এই অভিযোগটি খ্রীষ্টের কাছে উত্থাপন করল। মনে রাখুন, যদি খ্রীষ্টের শিষ্যেরা কোনওভাবে দোষ করতো তবে প্রথমে খ্রীষ্ট নিজে তা দেখতেন বা তাদের ভুল ধরিয়ে দিতেন। অথচ তারা এই বলে পরিহাস করল– 'ও যীশু, এরাই কি তোমার খ্রীষ্টান?' তাই আমাদের এএভাবে চলতে হবে যেন তা লোকদের কাছে আদর্শ নয়। লক্ষ্য করুন, এর আগে শিষ্যদের কাছে খ্রীষ্টের বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছিল (১১ পদ)। কিন্তু এখন খ্রীষ্টের কাছে তাঁর শিষ্যদের বিরুদ্ধে বলা হল (১৪ পদ)। প্রকৃতপক্ষে এটাই হচ্ছে সেই তরিকা– যা ভালবাসাকে মেরে ফেলে এবং বিপথে নিয়ে যায়। তা লোকদের মণ্ডলীর পরিচালকের বিরুদ্ধে দাঁড় করায় এবং পরিচালককে লোকদের বিপক্ষে দাঁড় করায়; এমনকি বন্ধুকেও শত্রুতে রূপ দেয়।

খ. খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের পক্ষে যা বললেন। খ্রীষ্ট যোহনের শিষ্যদের করা আগের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে যেন বলতে চাইলেন, 'তোমরা কেন এত উপবাস রাখ? মানছি, তোমরা নিয়মমাফিক উপবাস রাখতে পার; কিন্তু তোমাদের মনে কি একবারও এই প্রশ্ন জাগেনি যে, কেন আমরা উপবাস রাখি। আসলে ধার্মিকতার বাহ্যিক প্রকাশের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত লোভই তোমাদের উপবাস রাখার মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বুঝতে দেয় নি।' দৃশ্যত খ্রীষ্ট এখানে তাঁর শিষ্যদের চর্চার ওপর আলোকপাত করলেন; যে বিষয়ে তাদের কিছুই বলার ছিল না। তবে এখানে আমরা দেখি, উত্তর খ্রীষ্টের মুখে তৈরিই ছিল। মনে রাখুন, খ্রীষ্টের প্রজ্ঞা যেভাবে সেসময় মানবসন্তানের মাঝে যাচাইকৃত হয়েছিল সেভাবে এখনও তা আমাদের মধ্য দিয়ে পরীক্ষিত হচ্ছে। খ্রীষ্টের শিক্ষা ও নিয়মমতে আমরা যা করি তা আমাদের পক্ষে খ্রীষ্টকে বলার মতো 'জবাব' তুলে দেয়। তাই আমাদের সততা ও ধার্মিকতা যেন খ্রীষ্টকে গৌরবান্বিত করে– সেদিকে আমাদের মনোযোগী হতে হবে।

'কিন্তু প্রভু আমার জন্য উত্তর করলেন'– হার্বার্ট।

খ্রীষ্ট এখানে তাঁর শিষ্যদের উপবাস না রাখার স্বপক্ষে দু'টি কথা বললেন,

১. এখন উপবাস রাখার সময় নয় (১৫ পদ); 'বর সাথে থাকতে কি বরের সাথীরা শোক করতে পারে?' লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের উত্তরটি ছিল একদম বাঁধানো, তা যথার্থতার সাথে তাঁর শিষ্যদের কাজের স্বপক্ষে বলে। তিনি যোহনের সংগঠনকেও দোষারোপ করলেন না কিংবা তার শিষ্যদের চর্চাকেও। ফরীশীরা যখন এই অজুহাতে খ্রীষ্টকে একহাত নিতে গেল তখন ভেবেছিল– এবার অন্তত তিনি কাউকে না কাউকে দোষারোপ করবেনই– হয় তাঁর শিষ্যদের নচেৎ যোহনের শিষ্যদের। কিন্তু তাদের সেই আশা চুরমার হয়ে গেল, যেহেতু খ্রীষ্ট কাউকেই দোষ দিলেন না। মনে রাখুন, যখন অন্যায্যভাবে আমাদের নিন্দা করা হয় তখন আমাদের নিজেদের স্বচ্ছ অবস্থান ফুটিয়ে তোলার দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। কোনভাবেই নিন্দাকারীর সাথে তর্কে কিংবা পাল্টা কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে যোগ দেয়া যাবে না। কারণ এতে করে পরিবেশ নষ্ট হবে না, বরং আয়ত্তের মধ্যে থাকবে। তখন আমরা আমাদের চর্চার সুষ্ঠু মূল্যায়নে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পাব।

এখন, বিয়ের অনুষ্ঠানের ধারাবাহিক আনন্দযজ্ঞ থেকে খ্রীষ্ট তাঁর যুক্তিটি নিলেন। সাধারণত বিয়েতে কাউকে দুঃখ পেতে কিংবা দুঃখভোগ করতে দেখা যায় না। শলোমনের বিয়েতেও আমরা অনুরূপ ঘটনা দেখি (বিচারকর্তৃকগণ ১৪:১৭)। এখন,

(১) খ্রীষ্টের শিষ্যরা ছিল বরের সাথী, যারা বিয়ের ভোজে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত ছিল। ফলে স্বভাবতই সেখানে তাদের স্বাগত জানানো হয়েছে, যেখানে সেই 'বান্দির সন্তান' ফরীশীর শিষ্যরা আমন্ত্রিত হয় নি (গালা ৪:২৫, ৩১)। ফলত এরা লাগাতার অন্ধকার ও ভয়ের অধীনে চলাফেরা করছে। মনে রাখুন, খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত অনুসারীরা– যাদের আনন্দের আত্মা ছিল- তারা এই উদযাপন-আনন্দের অংশীদার ছিল। অপরদিকে দাসত্ব ও ভয়ের আত্মাপ্রাপ্ত ফরীশীরা কিন্তু তাদের মতো উল্লসিত হতে পারছিল না (হোশেয় ৯:১)।

(২) 'বর' এসময় শিষ্যদের পাশেই ছিলেন। কিন্তু যোহনের শিষ্যেরা এখন বরের সান্নিধ্য-বঞ্চিত। তাদের শিক্ষক এখন জেলে বন্দি এবং সেখানে তিনি বিপদের মধ্যে দিন গুজরান করছেন সেকারণে তারা প্রায়ই উপবাস রাখতো। খ্রীষ্টের শিষ্যদের সামনেও এমন দিন আসবে যখন তাদের কাছ থেকে বরকে নিয়ে যাওয়া হবে; তখন তারা তাঁর অনুপস্থিতিতে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়বে এবং তখন তাঁরা উপবাস রাখবে। সেই সময় তারা তাঁর অনুপস্থিতিজনিত শোক পালন করবে (যোহন ১৬:৬)। তাঁর বিদায়ে তাদের ওপর সত্যিকারের দুঃখভোগ নেমে আসবে; ফলে এর জন্যে তারা শোক করবে এবং প্রার্থনা করবে– প্রকৃতপক্ষে এটাই হচ্ছে ধর্মীয় উপবাস। মনে রাখুন,

(ক) যীশু খ্রীষ্ট হচ্ছেন তাঁর মণ্ডলীর বর এবং তাঁর শিষ্যেরা হচ্ছে বরের সাথী। যোহনের শিষ্যদের কাছে খ্রীষ্ট নিজের বিষয়ে বলতে গিয়ে 'বর' পরিচয়টি তুলে ধরলেন; কারণ যোহন তা ব্যবহার করেছিলেন। তিনি নিজেকে 'বরের বন্ধু' বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাই খ্রীষ্ট এখানে যোহনের শিষ্যদের একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিলেন– যদি তারা তাঁর দেওয়া এই সূত্র বুঝতে পারে, অর্থাৎ তাদের গুরুর কথা স্মরণ করতে পারে তাহলেই তারা এর উত্তর পেয়ে যাবে।

(খ) যারা বরের সাথী তাদের এই পৃথিবীতে অনেক পরিবর্তন এবং বিকল্পের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তারা একাধারে অনুগ্রহ এবং বিচারের গান গাইবে।

(গ) এটা সেই লোকদের সাথে আনন্দ অথবা দুঃখের কথা বলে, যা তারা বরের

অনুপস্থিতিতে বেশি অথবা কম করে পাবে। যখন তিনি তাদের সাথে আছেন ঈশ্বরের 'আলোর থাম' তাদের মাথার ওপর জ্বলছিল এবং সবই ভালভাবে চলছিল; কিন্তু যখন তাঁকে তুলে নেওয়া হল, যদিও তা অল্প সময়ের জন্যে; তথাপি তারা সমস্যায় পড়ল এবং তাদের পা ভারী হয়ে আসল। সূর্যের নৈকট্য বা উপস্থিতি দিন এবং গ্রীস্ম তৈরি করে, তার অনুপস্থিতি এবং দূরত্ব তৈরি করে শীত। তাই বলা যায়, খ্রীষ্টই মণ্ডলীর সকল আনন্দের উৎস।

(ঘ) প্রত্যেক কাজেরই একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে (দেখুন উপদেশক ৭:১৪; যাকোব ৫:১৩); তাই যেমন আনন্দ করার তেমনি শোক করারও সময় রয়েছে। সেই সময়জ্ঞানকে মাথায় রেখেই আমাদের জীবনকে পরিচালিত করা উচিত– যা সঠিক সময়ে সঠিক ফল দিতে সাহায্য করে। উপবাস রাখার ক্ষেত্রে আমাদের ওপর ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ রয়েছে তার নিয়ম আমাদের পালন করতে হবে; যখন তিনি আমাদের শোক করতে বলবেন তখন আমরা শোক করব এবং তাঁর নির্দেশনার মধ্য দিয়ে আমরা 'কখন তা করতে হবে'– সে বিষয়ে জানতে পারি। যেভাবে আমরা শোক করার ক্ষেত্রে প্রভুর নির্দেশনা অনুসরণ করি সেভাবে আমাদের ওপর অর্পিত অপরাপর দায়িত্বের ক্ষেত্রেও তা অনুসরণীয় বলে গণ্য করতে হবে (১৭:২১; প্রেরিত ১২:২)।

২. উপবাস রাখার ক্ষেত্রে যে কঠোর অনুশাসন মেনে চলতে হয়– তার জন্য শিষ্যেরা তখনও প্রস্তুত ছিল না। সেবিষয়ে বলতে গিয়ে এখানে দু'টি উপমা টানা হয়েছে– 'কেউ পুরানো কোর্তায় নতুন কাপড়ের তালি দেয় না,' যা স্বভাবতই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও সামর্থ্যের বিষয়ে বলে (১৬ পদ)। অন্যটি হচ্ছে, 'পুরানো চামড়ার থলেতে (বোতলে) কেউ টাটকা আঙ্গুর রস রাখে না' (১৭ পদ)। ফরীশী ও যোহনের শিষ্যদের মতো খ্রীষ্টের শিষ্যেরা তখন এই অনুশীলন করতে সমর্থ ছিল না। এক্ষেত্রে ড. হুইটবি– প্রদর্শিত ব্যাখ্যার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে– যিহূদীদের মাঝে কেবল ফরীশী ও এসেনস্– এরই কোন বিবাদ ছিল না। তারা ভাববাদীদের মতো কঠোর অনুশাসন মেনে চলতো; অর্থাৎ তারা ভাববাদীদের মতো হতে চাইত। যদিও ভাববাদীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই পাহাড়ে, মরুভূমিতে বাস করেছেন এবং তাদের অনেকেই ছিলেন নাসরতীয়, তবুও ফরীশীরা একটি একাডেমি গড়ে তুলেছিল যেখানে 'ধর্মীয় অনুশাসন' শিক্ষা দেওয়া হতো। ফলে সেখান থেকেই তাদের মধ্যে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাস গড়ে উঠতো। স্বভাবতই এই প্রতিষ্ঠান থেকে ফরীশীরা তো বটেই, যোহনের শিষ্যদের অনেকে এসেছিল। এদের তুলনায় খ্রীষ্টের শিষ্যরা সদ্যই তাঁর আহ্বান পেয়েছে এবং সত্যিকারভাবে কঠোর নিয়ম মেনে ধর্ম পালনে তখনও অভ্যস্ত হয়ে ওঠে নি; ফলে তারা নিয়ম করে উপবাস রাখায়ও অভ্যস্ত হয়ে ওঠে নি। যদিও সেই একই কারণে তাদের অন্য কাজগুলোকেও অপরিণত বলে মনে হয়, তবুও পরবর্তী সময়ে এরাই ধর্মীয় কাজে অভ্যস্ত ও যথেষ্ট যোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। মনে রাখুন,

(১) কোন কোন ধর্মীয় কাজ খুব কঠিন বলে মনে হয়। বাস্তবিকই এর একটির চেয়ে অন্যটি আরও বেশি কঠিন; বিশেষত 'নতুন কাপড়' এবং 'নতুন মদের' কাছে। কারণ এ কাজে সুস্থির অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, যেহেতু তা শারীরিক কামনা-বাসনাকে অসন্তুষ্ট করে। 'রোজা' হচ্ছে তেমনই একটি কঠিন ধর্মীয় দায়িত্ব।

(২) খ্রীষ্টের শিষ্যদের মাঝে যারা আজ 'পরিণত', একসময় তারাও 'শিশু' ছিলেন। খ্রীষ্টের বাগানের সব গাছই বড় নয় কিংবা তার সব পণ্ডিতই একরকম নয়।

(৩) ধর্মীয় অনুশীলনে যোগদানের ক্ষেত্রে যুব খ্রীষ্টানদের সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেয়া হবে; যেভাবে বয়স উপযোগী খাদ্য পরিবেশন করা হয় (১ করি ৩:২; ইব্রীয় ৫:১২); তাই তাদের উপর বাড়তি কাজ চাপিয়ে দেওয়া হবে না। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের বলেন নি যে, তিনি তাদের ওপর কঠিন বোঝা চাপিয়ে দেবেন (যোহন ১৬:১২)। ধর্মীয় অঙ্গনে তরুণ-শুরুকারী প্রথমেই কঠিন কাজে পড়বে না। কারণ তা না হলে তারা হতোদ্যম হয়ে পড়বে। ইস্রায়েল জাতিকে মিশর থেকে বের করে নিয়ে আসার সময় ঈশ্বর যেভাবে তাদের পলেষ্টিয়দের এলাকা দিয়ে নিয়ে যাননি (যাত্রা ১৩:১৭, ১৮) এবং যেভাবে যাকোব তার সন্তান ও পশুপালের প্রতি যত্ন নিয়েছিলেন (আদি ৩৩:১৩), সেভাবেই খ্রীষ্ট তাঁর পরিবারের ছোট্ট, ভাববাদীনতম সদস্যদের যত্ন নেন এবং তাঁর মেষদের সাথে একত্র করেন। তিনি তাদের নরম জমিতে চড়ান। শুরুতেই কারও ভুল ধরলে অনেক সময় সেই বোতল ভেঙে গিয়ে আঙ্গুর রস নষ্ট হয়ে যায়, বার বার ব্যর্থ হতে হতে তারা শেষ পর্যন্ত হালই ছেড়ে দেয়। বস্তুত তা কোন ফল বয়ে আনতে পারে না। মনে রাখুন, ধার্মিকতার জন্য ভাল কাজ করা ভাল। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় একটু 'বেশি' করতে গেলে তা অকার্যকর হয়ে উঠতে পারে।

মথি ৯:১৮-২৬ পদ

এখানে একই সাথে দু'টি চিহ্ন-কাজ বর্ণিত হয়েছে; প্রথমটি হচ্ছে যায়ীরের মৃত কন্যাকে জীবিত করে তোলা এবং দ্বিতীয়টি একজন স্ত্রীলোক– যে দীর্ঘদিন যাবত রক্তস্রাব রোগে ভুগছিল– তাকে সুস্থ করা। তিনি যখন যায়ীরের বাড়িতে যাচ্ছিলেন তখন মাঝপথে এই ঘটনাটি ঘটল– যা প্রমাণ করে যে খ্রীষ্টের চিহ্ন-কাজগুলোর ব্যাপ্তি এবং এগুলোর একটির সাথে অপরটির সমন্বয় ছিল অসাধারণ। অর্থাৎ যে কাজের জন্য তাঁকে পাঠানো হয়েছিল তা তাঁর নিত্যদিনের কাজে পরিণত হয়েছিল। দৃশ্যত মানুষের মঙ্গল সাধনের জন্যই তিনি এসেছিলেন; যে-কারণে এই চিহ্ন-কাজসমূহ তাঁর শিক্ষা ও নিদর্শনের পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছিল। 'তিনি যখন এই কথা বলছিলেন' (১৮ পদ)– অর্থাৎ ফরীশীদের দোষারোপের বিরুদ্ধে তিনি যা বলছিলেন তা স্পষ্টতই তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল। স্বভাবতই এর ফলে তারা অসন্তুষ্ট হয়েছিল; যদিও তাঁর শিক্ষা শুনে প্রকৃত অর্থে যারা ধার্মিক তারা সানন্দে দয়া ও উপাসনা-কাজে যোগ দিতে অভাবনীয় প্রেরণা লাভ করে। এখানে,

ক. খ্রীষ্টের কাছে যিহূদীদের একজন নেতা আসলেন (১৮ পদ)। ইনি ছিলেন যিহূদীদের সমাজ-গৃহের সম্মানিত নেতা। তিনি আসলেন এবং খ্রীষ্টের সামনে উবুড় হয়ে তাঁকে সম্মান জানালেন। যিহূদীদের নেতাদের কেউ কি তাঁর ওপর বিশ্বাস এনেছিল? হ্যাঁ, এখানে তার একটি উদাহরণ আমরা দেখতে পাই। ফলত এই যিহূদীনেতার বিশ্বাস বাকী যিহূদীনেতাদের অভিযুক্ত করল। এই নেতার বারো বছরের একটি মেয়ে ছিল। সে সদ্যই মৃত্যুবরণ করেছে। সন্তানের প্রতি তার ভালবাসাই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে তাকে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসল। মনে রাখুন, সমস্যা কিংবা বিপদ এলে আমরা তা ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করি। যেভাবে এই যিহূদীনেতা তার মেয়ের মৃত্যুতে খ্রীষ্টের কাছে ছুটে এসেছিলেন সেভাবে আমরাও ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্কের মৃত্যু হেতু খ্রীষ্টের কাছে নিজেদের সমর্পণ করি। কারণ তিনিই আমাদের 'জীবন'। তাই আমাদের পরিবারে কোন দুঃখভোগ

নেমে এলে আমরা যেন বিহ্বল হয়ে বসে না পড়ি; বরং ইয়োবের মতো উবুড় হয়ে তাঁর উপাসনায় নিবিষ্ট হই। এখন লক্ষ্য করুন,

১. খ্রীষ্টের সামনে যায়ীরের বিনম্রতা প্রকাশিত হল। তিনি খ্রীষ্টের কাছে একটি সমস্যা নিয়ে আসলেন এবং তিনি নিজে আসলেন; তার চাকরকে পাঠালেন না। মনে রাখুন, ব্যক্তিগতভাবে প্রভু যীশুর সামনে যাওয়ায় তার মতো বড় নেতার কিন্তু মানহানি ঘটলো না। তিনি তাঁর সামনে উবুড় হলেন, হাঁটু গেড়ে তাঁকে সম্মান জানালেন। খ্রীষ্টের কাছে তার এই আত্মনিবেদন ছিল সম্পূর্ণ সমর্পিত। মনে রাখুন, যারা খ্রীষ্টের কাছ থেকে অনুগ্রহ পেতে চায় তারা অবশ্যই খ্রীষ্টকে সম্মান জানাবে।

২. তার কথায়ই তার বিশ্বাস প্রতিফলিত হল– 'আমার মেয়েটি এইমাত্র মারা গেছে'। অর্থাৎ জগতের কোন চিকিৎসক এখন আর তাকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করতে যাবে না। যদিও মেয়েটির জন্য চিকিৎসকের সেবার প্রয়োজন ফুরিয়েছে তবুও খ্রীষ্টের (যিনি মৃত্যুপরবর্তী চিকিৎসক) জন্য তা দেরি হয়ে যায় নি; কারণ তিনিই 'পুনরুত্থান ও জীবন'। দৃশ্যত খ্রীষ্টের এই ক্ষমতায় যায়ীরের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল; সেকারণেই তিনি বললেন, 'কিন্তু আপনি এসে তার ওপর হাত রাখুন; তাতে সে আবার বেঁচে উঠবে।' বাস্তবিকই প্রকৃতির নিয়মে মৃতকে পুনরায় বাঁচিয়ে তোলাটা অসম্ভব; কিন্তু খ্রীষ্ট (যিনি নিজেই ছিলেন 'জীবন') তা পারতেন। তিনি তাঁর সন্তুষ্টি মতো যখন যা খুশি করতে সমর্থ ছিলেন। তবে বর্তমানে খ্রীষ্ট যেহেতু স্বাভাবিক নিয়মে কাজ করেন সেহেতু এখন আমাদের ঘনিষ্ঠ কেউ মারা গেলে আমরা তাঁর কাছে এই অনুরোধ নিয়ে আসি না– প্রভু, একে বাঁচিয়ে তুলুন। যদিও খ্রীষ্টের কাছে কোন কিছুই অসম্ভব নয় তবুও তিনি নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে ভেস্তে দিতে চান না। তাই খ্রীষ্টে আমাদের আশা ও বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে তাঁর কাছে আমরা এরকম অযৌক্তিক আব্দার নিয়ে যাই না; যেহেতু মানবজীবনের এই 'পরিণতি' তিনি নিজেই স্থির করে রেখেছেন। এর ফলে আমরা বুঝতে সমর্থ হই– আমরা তাদের কাছে যাব কিন্তু তারা আমাদের মাঝে ফিরে আসবে না। তবে খ্রীষ্ট যখন এই পৃথিবীতে চিহ্ন-কাজ করছিলেন তখন এইপ্রকার বিশ্বাস সমর্থনযোগ্য না হলেও তা যথেষ্টই প্রশংসার যোগ্য ছিল।

খ. তার আবেদনের প্রেক্ষিতে খ্রীষ্ট ত্বরিত উত্তরদানে প্রস্তুত ছিলেন (১৯ পদ); 'তখন যীশু এবং তাঁর শিষ্যেরা উঠে যায়ীরের বাড়ির পথে চললেন'। যিহূদীনেতার অনুরোধের জবাবে খ্রীষ্ট কেবল তার বারো বছরের মেয়েকে মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে তুলতেই সম্মত হলেন না উপরন্তু তার বাড়ি যেতেও উদ্যত হলেন। নিশ্চিতভাবেই তিনি কখনো যাকোবের বংশধরদের একথা বলেন নি যে, 'তোমরা অনর্থক আমার কাছে আস।' তিনি সেই অভিজাতব্যক্তি, যিনি তাঁকে বলেছিলেন, 'আসুন, আমার ছেলেটি মরবার মতো হয়েছে' তখন তিনি তার সাথে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন (যোহন ৪:৪৮-৫০)। অথচ তিনি সমাজগৃহের এই নেতার সাথে তার বাড়ির পথে রওয়ানা হলেন, যিনি বলেছিলে, 'প্রভু, আপনি আসলে আমার মেয়েটি বেঁচে উঠবে।' খ্রীষ্ট তাঁর চিহ্ন-কাজ করার ক্ষেত্রে যে নিয়ম মেনে চলতেন তার বিচিত্রিতা অনেককে অবাক করলেও তার পেছনে সঙ্গত কারণও ছিল। মূলত এক্ষেত্রে তিনি লোকদের 'আত্মনিবেদনকে' যোগ্যতা হিসেবে ধরেছিলেন। যেহেতু তিনি মানুষের মনে অবস্থা জানেন সেহেতু তিনি সত্যিকার অন্বেষণকারীদের বেছে নিতেন এবং সেই অনুযায়ীই তাদের পথ দেখাতেন। লক্ষ্য করুন, যায়ীরের বাড়িতে যাবার সময় খ্রীষ্টকে

তাঁর শিষ্যেরা অনুসরণ করল। তিনি তাদের বেছে নিয়েছিলেন যেন তারা তাঁর শিক্ষা ও কাজে সমৃদ্ধ হয়ে তাঁর পক্ষে সুসমাচারের প্রচারক হিসেবে কাজ করতে পারে। ফলে শিষ্যদের এই আত্মনিবেদন কোন রাজ্য বা প্রার্থিব সম্মানের জন্য ছিল না।

গ. এ সময়ে আমরা সেই দরিদ্র মহিলা যিনি রক্তস্রাবে কষ্ট পাচ্ছিলেন তার সুস্থতার বিষয়ে দেখি। তাকে 'দরিদ্র' বলছি এই কারণে যে, রোগমুক্তি পেতে তিনি তার সব সম্পদ চিকিৎসকের পেছনে খরচ করে ফেলেছিলেন। কিন্তু তারপরও তার কোন লাভ হয় নি। তিনি সুস্থ হন নি। ফলে এই রোগ তাকে শারীরিকভাবে তো বটেই আর্থিকভাবেও চরম ক্ষতির মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল। একসময় তার অনেক ছিল কিন্তু এখন প্রকৃতই তিনি নিঃস্ব হয়ে গেছেন। দীর্ঘ বারোটি বছর তিনি এই রক্তস্রাব রোগে ভুগছিলেন (২০ পদ)। এই রোগের ফলে শরীর শুধু দুর্বল-অপুষ্ট-অবসন্নই হয়ে পড়ে না উপরন্তু তা রোগীকে সমাজের চোখে 'অপবিত্র' বলে অযাচিত নিন্দা এনে দেয়। ফলে তার জন্য ঈশ্বরের ঘরের উপাসনা দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই প্রতিবন্ধকতা খ্রীষ্টের সাথে মিলিত হওয়া থেকে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলো না। তিনি খ্রীষ্টের কাছে নিজেকে নিবেদন করলেন এবং খ্রীষ্টের ভেতর থেকে শক্তি বেরিয়ে এসে তাঁকে সুস্থ করল। এই অসাধারণ ঘটনা বাস্তবিকই যায়ীরের বিশ্বাসকে আরও উদ্বুদ্ধ করেছিল; তার মনে গভীর উৎসাহ এনে দিয়েছিল। যারা বিশ্বাসে দুর্বল তাদের প্রতিও খ্রীষ্টের দৃষ্টি আছে। তিনি তাদের পরামর্শ দেন এবং প্রাচুর্যপূর্ণভাবে তাদের সমস্যার সমাধান দেন। লক্ষ্য করুন,

১. খ্রীষ্টের ক্ষমতার ওপর এই স্ত্রীলোকের বিশ্বাস কেমন গভীর ছিল। তার রোগ ছিল প্রকৃতিগত; কিন্তু লজ্জাবশত তিনি তা খ্রীষ্টের কাছে প্রকাশ্যে বলতে চাইলেন না– যা আমরা অন্যদের করতে দেখি। কিন্তু এ স্থলে তিনি একটি অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি তাঁর পোশাক স্পর্শ করলেন যেন এর মধ্য দিয়েই তার সুস্থতা ফিরে পান। হতে পারে তার বিশ্বাসের সাথে কল্পনা মিশে এরকম উপায় আবিষ্কার করেছিল; কারণ খ্রীষ্টের কাছ থেকে এভাবে কেউ সুস্থতা লাভ করেছে– তেমন উদাহরণ তার সামনে ছিল না। আবার হতে পারে, তার মাথায় ইলিশায়ের ঘটনাটি গেঁথে ছিল। যাঁর হাড়ের স্পর্শে একজন মৃতব্যক্তি বেঁচে উঠেছিল (২ রাজাবলি ১৩:২১)। কিন্তু স্ত্রীলোকটির এই কাজ ছিল লোকের অলক্ষে; ফলে কেউ তা বুঝতে পারে নি। কিন্তু খ্রীষ্ট ঠিকই তা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি স্ত্রীলোকটির বিশ্বাস ও বুদ্ধির প্রকাশ লক্ষ্য করে তাকে গ্রহণ করলেন; তাকে অনুগ্রহ করলেন। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তা প্রকাশ করলেন না; কারণ 'তাঁর ঠোঁট থেকে ফোঁটা ফোঁটা মধু ঝরে' (শলোমন ৪:১১)। স্ত্রীলোকটির মনে এই বিশ্বাস ছিল যে, তিনি যদি কেবল খ্রীষ্টের পোশাকের প্রান্তটা ছুঁতে পারেন তবে তার রোগ সেরে যাবে। মনে রাখুন, খ্রীষ্টের সবকিছুই উচ্চমানের– 'তাঁর মাথা বেয়ে অভিষেক তেল চুইয়ে পড়ে পোশাকের গলার ওপর' (গীত ১৩৩:২)। খ্রীষ্টের কাছেই অনুগ্রহের পূর্ণতা রয়েছে– যা থেকে আমরা সবটাই গ্রহণ করতে পারি (যোহন ১:১৬)।

২. এই স্ত্রীলোকটির প্রতি খ্রীষ্টের অসীম মমতা প্রকাশ পেল। তিনি তার সুস্থ হওয়ার প্রক্রিয়াকে বানচাল করেন নি, কিন্তু এই লজ্জিত রোগীকে গ্রহণ করলেন এএভাবে– যে অজ্ঞাতে সুস্থ হল। যদিও সে ভাবতে পারে নি যে, খ্রীষ্ট তা ধরে ফেলবেন। তাই সুস্থ হয়ে সে যখন চলে যেতে উদ্যত হল তখন খ্রীষ্ট তাকে এভাবে নীরব প্রস্থানে অনুমতি দিলেন না। তিনি যে কেবল তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা বর্ণনা করতে চাইলেন তা নয়, উপরন্তু তিনি

স্ত্রীলোকটির বিশ্বাসকে সম্মানিত করতে মনস্থ করলেন। তিনি তাকে বললেন যে, তার বিশ্বাসই তাকে প্রশংসিত ও সম্মানিত করল। 'তিনি ফিরে তাকে দেখতে পেলেন' (২২ পদ) অর্থাৎ তাকে খুঁজে নিলেন। মনে রাখুন, বিনম্র খ্রীষ্টানদের জন্য এ এক মহা উৎসাহের ব্যাপার যে, স্বর্গের উদ্দেশে নিজেদের কাজ সমর্পণ করে মানুষের কাছ থেকে নিজেদের আড়াল করতে চাইলেও খ্রীষ্ট তাদের দেখতে পান। এখন,

(১) 'কন্যা, সাহস কর'– এ কথা বলে তিনি সেই স্ত্রীলোকের অন্তর আনন্দে ভরিয়ে দিলেন। কারণ, গোপনে কাজ করার ফলে তিনি ভয়ে জড়সড় হয়ে ছিলেন; কিন্তু খ্রীষ্ট এখানে তার ভয় ভেঙে দিলেন; উপরন্তু তাকে উৎসাহিত করলেন।

(ক) খ্রীষ্ট তাকে 'কন্যা' সম্বোধন করলেন, কারণ তিনি তার প্রতি পিতাসুলভ কোমলতায় কথা বললেন– যেমনটা তিনি সেই অবশরোগীকে বলেছিলেন (২ পদ)। মনে রাখুন, খ্রীষ্ট সিয়োন-কন্যাদের ভয় দূর করে দিতে আসলেন; কারণ তারা দুঃখে পূর্ণ আত্মার অধীনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছিল– যেমনটা হান্না ছিলেন (১ শমূয়েল ১:১৫)। বিশ্বাসকারী স্ত্রীলোকেরা খ্রীষ্টের কন্যা এবং তিনি তাদের নিজের করে নেন।

(খ) তিনি তাকে বললেন, 'সাহস কর'। খ্রীষ্ট স্ত্রীলোকটিকে 'কন্যা' সম্বোধন করে তার অন্তরে অসীম উৎসাহ এনে দিয়েছিলেন। মনে রাখুন, গ্রহণযোগ্যতার মাঝেই ঈশ্বরভক্তদের সাহসের ভিত্তি নিহিত। 'সাহস কর'– এই উক্তির মধ্য দিয়ে তিনি তার মনকে শান্ত করলেন। মনে রাখুন, খ্রীষ্ট তাঁর লোকদের সান্ত্বনা দেন এবং এর মধ্য দিয়ে তাদের বিক্ষিপ্ত মনকে শান্ত করেন– 'তিনি শোককারীদের সান্ত্বনা দেন' (যিশাইয় ৫৭:১৯)।

(২) তিনি স্ত্রীলোকের বিশ্বাসকে সম্মানিত করলেন। বিশ্বাসী তার বিশ্বাস দ্বারা খ্রীষ্টকে সম্মানিত করে; আর খ্রীষ্ট বিশ্বাসীকে সম্মানিত করেন তাঁর অনুগ্রহ প্রদানের মাধ্যমে– 'তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করল।' এভাবে সেই স্ত্রীলোকটি তার বিশ্বাসের প্রশংসাপত্র লাভ করল। খ্রীষ্ট এরকম বিনম্র বিশ্বাসীকেই খোঁজেন এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করেন। যেভাবে এখানে এই স্ত্রীলোকটির প্রতি করা হয়েছিল– যিনি জানতেন না তার বিশ্বাস কতটা গভীর ছিল। তার সান্ত্বনা পাবার আরেকটি কারণ ছিল যে, তার বিশ্বাসই তাকে 'সুস্থ' করেছে। লক্ষ্য করুন,

(ক) সে আত্মিক সুস্থতালাভ করল– যা ছিল প্রকৃতই অনুগ্রহের ফল। মনে রাখুন, যদিও আমরা অস্থায়ী অনুগ্রহ, যেমন– প্রয়োজনীয় খাবার, পোশাক প্রভৃতি পেয়ে অধিক আনন্দিত হই তবুও তা খ্রীষ্টের কাছ থেকে পাওয়া স্থায়ী অনুগ্রহের আনন্দের পাশে ম্লান হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে আত্মিক সুস্থতালাভের সাথে জাগতিক কোন আনন্দের তুলনা চলে না। কারণ খ্রীষ্টের স্থায়ী অনুগ্রহের অধীন হওয়ার ফলে আমরা তখন খ্রীষ্টের দেওয়া জীবনরুটি খাই, ধার্মিকতার পোশাক পরিধান করি এবং ঈশ্বরতে বিশ্রাম নিই। এই স্বাচ্ছন্দ্য আর সব কিছুকেই হার মানায়। যখন আমাদের আত্মার উন্নতি হয় তখন আমাদের শরীর-স্বাস্থ্যেরও উন্নতি ঘটে (যিশাইয় ৩৮:১৬, ১৭)।

(খ) তার শারীরিক সুস্থতা ছিল তার বিশ্বাসের ফল এবং তার বিশ্বাসের স্বীকৃতি তাকে আনন্দিত করে তুলল; প্রকৃতই যা ছিল সান্ত্বনাদায়ী সুস্থতা। যাদের ভেতর থেকে মন্দ আত্মা দূরীভূত হয়, তারা খ্রীষ্টের ক্ষমতার সাহায্য পাবে। অবশ্য কেউ কেউ অন্যদের বিশ্বাস দ্বারাও সুস্থ হয় (যেমন ২ পদ)। কিন্তু এখানে সেই স্ত্রীলোকটি নিজ বিশ্বাসে রোগ থেকে মুক্তি পেলেন। মনে রাখুন, অস্থায়ী অনুগ্রহ তখনই স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেয় যখন তা বিশ্বাসে

গৃহীত হয়। ঈশ্বরের অনুগ্রহ চাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা যদি বিশ্বাস সহকারে প্রার্থনা করি এবং ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় আস্থা রাখি; যদি তাঁর উপর আমাদের নির্ভরতা থাকে এবং যদি আমরা তা ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশার্থে চাই, তখন আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারব– 'তা বিশ্বাসে গ্রহণ করা হল।'

ঘ. যায়ীরের বাড়িতে গিয়ে তিনি যে পরিস্থিতি অবলোকন করলেন (২৩ পদ) তা হল– তিনি সেখানে লোকের ভিড় দেখলেন। সেখানে বংশীবাদকেরাও এসে জড় হয়েছিল। খ্রীষ্ট দেখলেন, তারা সবাই হৈচৈ করছে। সাধারণত কারও মৃত্যুর পর আত্মীয়-বন্ধু-পড়শি-অনাত্মীয়রা বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ে। তাদের হয়তো মনে পড়ে যায়– 'এই লোকটির জন্য আরও কিছু হয়তো করা যেত।' ফলে তাদের আক্ষেপ মাত্রাহীন কান্নায় সংক্রমিত হয়। অথচ লোকটি যখন বেঁচে ছিল তখন যদি তার সাথে সঠিক আচরণটুকু করা হতো, তবে তাদের এখন আক্ষেপ প্রকাশের সুযোগ থাকতো না। খুব স্বাভাবিকভাবেই কেউ মারা গেলে পাড়া প্রতিবেশীরা এসে ভিড় জমায়। তারা এসে সেই বাড়ির পিতামাতাকে সান্ত্বনা দেয় এবং সৎকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যিহূদীরা এই কাজে বিলম্ব করতো না।

এখানে আমরা দেখি যায়ীদের বাড়িতে সেই বংশীবাদকেরাও এসে জুড়েছিল– যারা অবিশ্বাসীদের প্রথানুযায়ী করুণ সুর বাজাত। এভাবে তারা উপস্থিত জনতার ব্যথাবোধকে আরও বাড়িয়ে তুলত। ফলে শোকাকুল সমাবেশ অনেকটা আইরিশদের মতো 'আহারে আহারে' রবে বিলাপ জুড়ে দিত। এদের এই অসময়ে দুঃখপ্রকাশের একটিই অর্থ করা যেতে পারে– 'তাদের কোন আশা নেই।' দেখুন, কীভাবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পারস্পরিক হৃদ্যতা এনে দেয়– যেখানে অধার্মিক পরিচালকেরা তা ক্ষয় করে থাকে। অবিশ্বাসীদের মতবাদ সেই দুঃখবোধকে গুরুতর করে তোলে– যা খ্রীষ্টীয় ধর্মে নেই। কিংবা এমনও হতে পারে– এই বংশীবাদকেরা শোকসন্তপ্ত পরিবারের দুঃবোধকে আড়াল করে তাদের মন আনন্দে ভরিয়ে তুলতে চাইত। কিন্তু ভিনেগারে যেভাবে ক্ষার থাকে সেভাবে তাদের গান সেই পরিবারের মনকে হালকা না করে ভারীই করে তুলেছিল। লক্ষ্য করুন, শোক প্রকাশের ক্ষেত্রে এখানে আমরা মৃতের পরিবারকে যথেষ্ট সংযত আচরণ করতে দেখি; কিন্তু যারা প্রকৃতই এই পরিবারের বাইরের লোক-তাদের মাঝেই যেন শোকপ্রকাশের তাগিদটা বেশি করে অনুভূত হচ্ছিল। ফলে তাদের এই মাত্রাহীন শোকপ্রকাশ যে 'আরোপিত' ছিল-তা নির্দ্বিধায় বলে দেওয়া যায়। মনে রাখুন, কারও অনুপস্থিতিতে তার প্রতি ভালবাসার কথা বলার ক্ষেত্রে উচ্চস্বরে শোকপ্রকাশই যথেষ্ট নয়; কারণ 'নদী যেখানে অগভীর সেখানেই বেশি শব্দ করে।' প্রকৃতপক্ষে লোকচক্ষুর আড়ালে করা দুঃখবোধই অকৃত্রিম। তবে এখানে তাদের বিলাপ স্পষ্টতই বলে দিচ্ছিল যে, সেই বালিকাটি সত্যি সত্যিই মারা গিয়েছিল; তাই সে সম্পর্কে সমস্ত জল্পনা-কল্পনাকে দূর করে দেয়।

ঙ. খ্রীষ্ট এই ব্যস্ততা ও হৈচৈকে ধমক দিলেন (২৪ পদ)। তিনি বললেন, 'তোমরা বাইরে যাও।' মনে রাখুন, পৃথিবীর দুঃখবোধ প্রবলতর হলে খ্রীষ্টের প্রবেশ কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। তারা রাহেলের মতো গভীর দুঃখে নিজেদের মন কঠিন করে ফেলেছিল– 'যে কিছুতেই শান্ত হচ্ছিল না।' তাই খ্রীষ্ট এখানে তাদের সেই দুঃখবোধকে বাইরে ফেলে দিতে বললেন। তিনি তাদের নির্দেশ দিলেন– 'তোমরা বাইরে যাও। ইস্রায়েলের সান্ত্বনার জন্য জায়গা করে দাও।' খ্রীষ্টের এই আদেশ প্রকৃতই প্রার্থিব দুঃখবোধজনিত সন্দেহ ও আস্থাহীনতাকে পরাজিত করে। তিনি যখন কারও হৃদয়ে প্রবেশ করেন তখন তার মন

থেকে অবিশ্বাস দূরীভূত হয়। লোকেরা কেন দুঃখপ্রকাশ করবে না, তার পক্ষে একটি যুক্তি প্রদর্শন করলেন– 'কারণ সে মরেনি, কেবল ঘুমুচ্ছে।'

১. যে মেয়েটি অনতিবিলম্বে জীবিত হয়ে উঠবে তার ক্ষেত্রে এই কথাটি খাটে। যদিও সে প্রকৃতই মৃত্যুবরণ করেছিল তবুও সে ছিল খ্রীষ্টের ক্ষমতাধীন। খ্রীষ্ট জানতেন যে, তিনি কী করতে যাচ্ছেন; তাই তিনি বললেন– সে মরেনি, ঘুমুচ্ছে কেবল। মৃত্যু ও ঘুমের মাঝে সামান্যই পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু স্থায়িত্বের বিচারে একে কেবল 'স্বপ্ন' হিসেবে গণ্য করা যায়। মেয়েটির এই মৃত্যু ছিল অল্প সময়ের এবং সে-কারণেই তা ছিল ঘুম– অনেকটা একরাতের বিশ্রামের মতো। যেহেতু খ্রীষ্ট মৃতকে বাঁচিয়ে তুলতে পারতেন সেহেতু তিনি একে যেভাবে খুশি সম্বোধন করতে পারতেন (রোমীয় ৪:১৭)।

২. এ কথা সব মৃতের ক্ষেত্রে সত্য, বিশেষত যারা প্রভুতে মারা যায়। মনে রাখুন,

(১) মৃত্যু হচ্ছে 'ঘুম'। এ কথা সব জাতি ও ভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই মৃত্যু ভীতিপ্রদ হলেও তা এড়ানো যায় না। খ্রীষ্ট তাই মৃত্যুকে 'ঘুম' হিসেবে অভিহিত করে তার ভয়াল দিকটিকে আড়াল করলেন; উপরন্তু একে 'স্বাভাবিক' বলে উল্লেখ করলেন যেন আমরা এর ডাকে সাড়া দিতে সম্মত হই। নিন্দিত রাজাদের ক্ষেত্রেও এমনটা বলা হয়ে থাকে যে– তারা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে চলে গেছেন। তারা ঘুমিয়ে আছেন এবং নিরূপিত সময়ে তারা উঠবে এবং অবমাননা কুড়াবে (দানিয়েল ১২:২)। তবে এটা আত্মার ঘুম নয়; কারণ আত্মার কাজ কখনো মুখ থুবড়ে পড়ে না। তার জায়গায় একে আমরা শরীরে ঘুম বলতে পারি। যা একভাবে, স্থির হয়ে, নীরবে, অসম্মানের সাথে ধূলিতে শুয়ে থাকে। তাদের তখনকার অবস্থা হয় অন্ধকার ও অনিশ্চয়তায় মোড়ানো। যদিও ঘুম হচ্ছে সংক্ষিপ্ত মৃত্যু, তবুও ঈশ্বরভক্তের মৃত্যুকে 'ঘুম' হিসেবে বিশেষায়িত করা হয় (যিশাইয় ৫৭:২)। তারা খ্রীষ্টে ঘুমিয়ে থাকে (১ থিষলনীকীয় ৪:১৪); তারা কেবল দিনের কষ্ট ও শ্রম থেকেই বিশ্রাম পায় না; বরং তারা মৃত্যু থেকে উত্থিত হওয়ার উজ্জীবিত আশায় বুক বেঁধে বিশ্রাম নেয়। তারা সেই ভোরে জেগে ওঠার অপেক্ষায় থাকে যখন তারা জেগে উঠবে সতেজ হয়ে। যেদিন তারা নতুন এক জীবনে প্রবেশ করবে। সেদিন তারা সম্মান ও গৌরবের সাথে জেগে উঠবে। এরপর তাদের আর কখনও ঘুমাতে হবে না।

(২) এই বিবেচনাবোধ আমাদের প্রিয়জনের মৃত্যুতে দুঃখার্ত হওয়া থেকে নিবৃত্ত করে– 'মনে কোরো না যে, তারা হারিয়ে গেছে। বরং বল, তারা একটু আগে গেছে। এ-ও বোলো না যে, তারা মারা গেছে; বরং একথা বল যে, তারা প্রভুতে ঘুমিয়ে আছে।' এরপরও যদি খ্রীষ্টের কোন বিশ্বাসীকে প্রিয়জনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করতে দেখা যায় তবে বুঝতে হবে যে, সে খ্রীষ্টের অনুগ্রহকেই ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারে নি– 'তাহলে তো বলতে হয়, খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যারা মারা গেছে তারা বিনষ্ট হয়েছে' (১ করিন্থীয় ১৫:১৮)। সে-কারণেই খ্রীষ্ট এই আস্থাহীনতায় আক্রান্ত অবিশ্বাসীদের প্রতি বলছেন, 'তোমরা বাইরে যাও।'

এখানে ভেবে দেখা প্রয়োজন, তাঁর অনুগ্রহের বাক্য– যা ভবিষ্যত গৌরব ও সম্মানের বিষয়ে বলে তা তখনকার মতো এখনও কি পরিহাসের ব্যাপারে পরিণত হচ্ছে? দৃশ্যত 'খ্রীষ্টের কথা শুনে লোকেরা হাসাহাসি করতে লাগল।' এই লোকেরা ছিল কফরনাহুমের অধিবাসী। ফলে তারা খ্রীষ্টের স্বভাব সম্পর্কে জানতো যে, তিনি কখনও অহেতুক বোকার মতো কিছু বলেন না। তারা জানতো তিনি কতগুলো মহান কাজ করেছেন। তাই খ্রীষ্টের

কথার গূঢ় অর্থ বুঝতে ব্যর্থ হলেও তারা অন্তত খ্রীষ্টের পরবর্তী কাজ দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারতো। কিন্তু তারা তা না করে হাসাহাসি করতে লাগল। মনে রাখুন, খ্রীষ্টের কথা ও কাজ অনেক সময় দুর্বোধ্য ঠেকলেও তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা যাবে না। স্বর্গীয় রহস্য বোঝার জন্য আমরা অবশ্যই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করব; এমনকি তা আমাদের কাছে দ্বান্দ্বিক মনে হলেও। তবে লোকদের এই পরিহাস পরোক্ষভাবে মেয়েটির মৃত্যুর প্রামাণিকতাকেও প্রশ্নের উর্ধ্বে রাখল।

চ. সেই মৃত বালিকাটি খ্রীষ্টের ক্ষমতায় জীবন ফিরে পেল (২৫ পদ)। লোকেরা অন্যত্র চলে গেল; মনে রাখুন, যারা খ্রীষ্টের ক্ষমতার প্রতি আস্থাশীল নয় এবং তাঁর কার্যক্ষমতাকে উপেক্ষা করে তা নিয়ে হাসাহাসি করে, তারা খ্রীষ্টের কাজ দেখার অধিকার ধারণ করে না; তাঁর কাজের সাক্ষী হতে পারে না। কারণ খ্রীষ্টের গৌরব কেবল প্রকাশার্থেই নয় বরং তাতে ক্ষমতার সৌন্দর্যও নিহিত থাকে। নায়িন গ্রামের সেই বিধবা-পুত্র এবং লাসার ছিল প্রকাশ্যে উত্থিত মৃত ব্যক্তি। কিন্তু এই মৃতবালিকার উত্থান হয়েছিল গোপনে। কারণ যদিও তিনি কফরনাহুমে কিছু চিহ্ন-কাজ করেছিলেন তবুও তিনি এই গ্রামকে তাঁর 'জীবনদানের কাজ' দেখার যোগ্য মনে করলেন না। বাস্তবিকই যারা মুক্তোর মূল্য বোঝে না তাদের সামনে তা ছিটানোর কোন অর্থ হয় না।

খ্রীষ্ট সেই 'ঘরের ভেতরে গেলেন এবং তার হাত ধরলেন তাতে সে উঠে বসল।' খ্রীষ্টের হাতের স্পর্শ মেয়েটিকে বাঁচিয়ে তুলল এবং তাকে উঠতে সাহায্য করল। এক্ষণে তাঁর বলা 'ও ঘুমিয়ে আছে' অর্থপূর্ণ হল। যিহূদী পুরোহিতেরা কখনো মৃতের সংস্পর্শে আসতো না (লেবীয় ২১:১০, ১১); কিন্তু খ্রীষ্ট (যিনি আমাদের মহা-পুরোহিত) তাকে স্পর্শ করলেন। লেবীয়-নিয়মের ফলে পুরোহিত মৃতব্যক্তিকে তার অপবিত্রতার কারণে ত্যাগ করতো এবং সে কারণে তার কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখত যেন গায়ে গা লেগে না যায়। কিন্তু খ্রীষ্ট– যাঁর মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা ছিল– তিনি এসব ছোঁয়াছুঁয়ির বাইরে ছিলেন এবং সে কারণে তাদের স্পর্শ করতে তাঁর কোন দ্বিধা ছিল না। তিনি তার হাত ধরলেন এবং তাতে সে বেঁচে উঠল। দেখুন, কত সহজে, কত কার্যকরভাবে এই চিহ্ন-কাজটি সাধিত হয়েছিল! মৃতকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য এলিয় এবং ইলিশায়কে প্রার্থনা করতে হয়েছিল (১ রাজাবলি ১৭:২১; ২ রাজাবলি ৪:৩৩); কিন্তু এখানে আমরা দেখি, খ্রীষ্ট তাঁর স্পর্শে মৃতকে বাঁচিয়ে তুললেন। বস্তুত ভাববাদীরা ঈশ্বরের দাস হিসেবে যে কাজ করেছিলেন তা খ্রীষ্ট এখানে করলেন ঈশ্বর হিসেবে, ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে। মনে রাখুন, যীশু খ্রীষ্ট হচ্ছেন আত্মার প্রভু। ফলে আত্মারা তাঁর আদেশ মেনে চলে। উল্লেখ্য, মৃত আত্মারা 'আত্মিক জীবনে' জীবিত হয় না, যদি না খ্রীষ্ট তাদের হাত ধরে জাগান। তিনি আমাদের উঠতে সাহায্য করেন নতুবা আমরা ঠায় পড়ে থাকতাম।

ছ. যদিও তা গোপনে সাধিত হয়েছিল (২৬ পদ)। তবুও 'এই ঘটনার কথা বাইরের সব এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল।' তবে লোকেরা এই ঘটনাকে নিজেদের আত্মিক জীবনের সমৃদ্ধি অর্জনে কাজে লাগানোর চেয়ে মুখরোচক আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ রাখল। মনে রাখুন, খ্রীষ্টের কাজ নিয়ে আলোচনার লক্ষ্য যতটা না খ্রীষ্টের দিকে উদ্বুদ্ধ হবার বাসনা তার থেকেও বেশি স্বাভাবিক গালগল্পে মুখ ভরিয়ে রাখা। সন্দেহ নেই, যারা খ্রীষ্টের কাজের বিষয়ে শোনে তাদের চেয়ে যারা তা চাক্ষুস করে, তারা অনেক বেশি আন্দোলিত হয়। যদিও বর্তমান সময়ে আমরা স্বচোখে 'খ্রীষ্টের চিহ্ন-কাজ' দেখি না তবুও তার সত্য ইতিহাস

পড়ে আমরা যে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি তাতেই আমরা 'ধন্য' বলে পরিগণিত হই– 'তারা ধন্য যারা তা না দেখেও আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে' (যোহন ২০:২৯)।

মথি ৯:২৭-৩৪

এই পদগুলোতে আমরা খ্রীষ্টের করা আরও দু'টি চিহ্ন-কাজের বিষয়ে দেখি।

ক. দুজন অন্ধকে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন (২৭-৩১ পদ)। খ্রীষ্ট যেভাবে জীবনের 'ফাউন্টেন', সেভাবে তিনি আলোরও; এবং যেভাবে তিনি মৃতকে জীবন দিয়ে নিজেকে দেখালেন যে প্রথমবারের মতো একজন মানুষ তার মাধ্যমে জীবন পেল সেভাবে অন্ধকে আলো দেওয়ার মাধ্যমে তিনি নিজেকে দেখালেন, ইনিই তিনি যিনি অন্ধকার থেকে আলোকে আলাদা করতে প্রথমে আদেশ দিয়েছিলেন; যেভাবে প্রথম মানবদেহে প্রাণবায়ু দিয়েছিলেন। লক্ষ্য করুন,

১. খ্রীষ্টের সামনে এই দুই অন্ধের নাছোড়বান্দা উপস্থিতি। তিনি যখন যিহূদীনেতার বাড়ি থেকে তাঁর নিজ আবাসে ফিরে আসছিলেন তখন এই অন্ধেরা তাঁকে অনুসরণ করল– যেভাবে ভিক্ষুকেরা করে থাকে। তারা তাঁর কাছে চিৎকার করে তাদের বিনতি জানাচ্ছিল (২৭ পদ)। খ্রীষ্ট যেহেতু খুব সহজে ও কার্যকরভাবে কাউকে রোগমুক্ত করতে পারতেন উপরন্তু এর জন্য কোন ফি নিতেন না, সেহেতু তাঁর কাছে প্রচুর রোগীর সমাগম ঘটত। ফলে অন্যান্য অভিধার পাশাপাশি 'চক্ষুবিশেষজ্ঞ' হিসেবেও তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়েছিল। দেখুন,

(১) অন্ধেরা খ্রীষ্টকে যে 'অভিধা' দিয়েছিল, 'দায়ূদের সন্তান, আমাদের প্রতি দয়া করুন।' দায়ূদের কাছে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল যে, তার বংশে খ্রীষ্ট (মেসাইয়া) আসবেন। স্বভাবতই সেই প্রতিজ্ঞার কথা সবাই জানতো এবং সে কারণেই খ্রীষ্টকে দায়ূদ-সন্তান হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো। এর ফলে সবাই 'মেসাইয়ার' আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল। এই অন্ধেরা জানতো যে, তাদের প্রতীক্ষিত 'খ্রীষ্ট' এসেছেন; শুধু তাই নয় তারা সেকথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণাও করেছিল– যে ঘোষণা বা স্বীকৃতি পুরোহিত ও ফরীশী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আসে নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ, পুরোহিতেরা এবং ফরীশীরা তাদের বোকামি ও পাপের কারণে খ্রীষ্টের 'পরিচয়' স্বীকার করে নি। উপরন্তু তারা তাঁকে সহ্য করতে পারতো না। অথচ এই অন্ধেরা– যারা দেখতে পেত না, তারা খ্রীষ্টের চিহ্ন-কাজ ও শিক্ষার বিষয়ে শুনেই তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। মনে রাখুন, যারা শারীরিকভাবে দৃষ্টিশক্তিবঞ্চিত তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাঁর নিদর্শন বুঝতে পেরে আলোকিত হবে। ফলে জ্ঞানী ও বিচক্ষণেরা যা দেখতে পায় না তারা তা-ই দেখতে পাবে। তারা ঈশ্বরের মহান নিদর্শনকে অনুধাবন করতে সমর্থ হবে। এর মধ্য দিয়ে তারা বস্তুজগতের জ্ঞান-ঋদ্ধ বিচক্ষণদের করুণা করবে; কারণ তারা খ্রীষ্টকে 'দেখতে পায় নি।'

(২) তারা বিনতি জানাল– 'আমাদের প্রতি দয়া করুন।' ভাববাদীরা এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, 'দায়ূদের সন্তান রহমে পূর্ণ হবেন' (গীত ৭২:১২, ১৩) এবং 'তাঁর মাঝে ঈশ্বরের দয়া প্রতিফলিত হবে' (লূক ১:৭৮)। মনে রাখুন, আমাদের প্রয়োজন বা সমস্যা যাই হোক প্রভু যীশুর কাছ থেকে অনুগ্রহ পেলে আমাদের আর কিছুই চাইবার নেই। যদি তিনি আমাদের প্রতি দয়া করেন, তবে আমরা সুস্থ হব কি হব না– এই প্রশ্ন

তৎক্ষণাৎ উড়ে যায়। খ্রীষ্টের করা দয়ার কাজগুলোতে যেভাবে আমরা 'আবেদনকারীকে' শতভাগ সমর্পিত হতে দেখি সেভাবে আমাদেরও খ্রীষ্টের প্রজ্ঞার কাছে নিজেদের সমর্পণ করতে হবে। এই অন্ধেরা খ্রীষ্টের কাছে ব্যক্তিগতভাবে কিছু চায় নি; অর্থাৎ তারা এমনটা বলেনি যে– 'আমার প্রতি দয়া করুন।' মনে রাখুন, যারা অভিন্ন সমস্যার মাঝে রয়েছে, সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য তাদের আবেদনও হবে অভিন্ন। সহদুঃখভোগকারী সেজন্যই যৌথ আবেদনকারী হয়; যেহেতু মানুষের প্রয়োজন যুগিয়ে দেবার জন্য তাঁর যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে।

(৩) অন্ধ লোকদ্বয় যে তাঁর পেছন পেছন চিৎকার করতে করতে চলছিল– তা তাদের অনুরোধের প্রতি একাগ্রতা ফুটিয়ে তোলে। এখানে লক্ষণীয়, 'তিনি প্রথমে তাদের লক্ষ্য করেন নি'; কারণ তিনি তাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা নিচ্ছিলেন। যদিও তিনি জানতেন যে, এদের বিশ্বাস বেশ শক্ত, তবুও তিনি নিরুত্তর রইলেন। তাঁর এই নিস্পৃহতা অন্ধদের প্রার্থনাকে দ্রুততর করল এবং তা তাঁর সুস্থতার কাজকে আরও মূল্যবান করে প্রকাশ করল; কারণ তাদের চিৎকারে আশপাশের মানুষও বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়েছিল। অন্ধদের এই ঐকান্তিকতা আমাদের প্রার্থনায় দৃঢ়-অটল থাকতে শেখায় এবং তা আমাদের কখনো হাল ছেড়ে না দিতে বলে। অনেক প্রার্থনার তাৎক্ষণিক উত্তর না পেলেও আমাদের তাঁর উত্তরের অপেক্ষায় গভীর আগ্রহ নিয়ে বাধ্য থাকতে হবে। এমনকি কখনও যদি মনে হয়, খ্রীষ্ট আমাদের এড়িয়ে চলছেন, তখনও বুদ্ধিমানের মতো হাল না ছেড়ে তাঁকে বারংবার নিজের প্রয়োজনের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেওয়াটাই হবে উত্তম পদক্ষেপ। খ্রীষ্ট কিন্তু সেই লোকদের প্রকাশ্যে রাস্তার মধ্যে সুস্থ করবেন না, কারণ তিনি এই আরোগ্য-কাজকে গোপন রাখতে চেয়েছিলেন (৩০ পদ)। কিন্তু যখন তিনি বাড়িতে ঢুকলেন তারা তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর কাছে আসল। মনে রাখুন, বিশ্বাসী এবং নাছোড়বান্দা আবেদনকারীদের জন্য খ্রীষ্টের দরজা সবসময়ের জন্য খোলা। খ্রীষ্ট যখন অবসর নিতে চাইলেন তখন তাদের তাঁর পেছন পেছন ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়াটা অভদ্রজনোচিত মনে হলেও আমাদের প্রভু যীশুর মমতা তাদের স্বাগত জানিয়েছিল।

২. বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি– যা খ্রীষ্ট এই ঘটনায় তাদের মধ্য থেকে বের করে এনেছিলেন। যখন তারা তাঁর কাছে অনুগ্রহের জন্য আসল, তখন তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, আমি এই কাজ করতে পারি?' মনে রাখুন, বিশ্বাস হচ্ছে খ্রীষ্টের আনুকূল্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। যারা খ্রীষ্টের অনুগ্রহ পেতে চায় নিশ্চিতভাবেই তাদের তাঁর ক্ষমতায় আস্থাবান হতে হবে। এই অন্ধেরা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করেছিল এবং চিৎকার করতে করতে তাঁর পেছন পেছন গিয়েছিল, তবুও তাদের প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'তোমরা কি বিশ্বাস কর?' প্রকৃতি আকুলতায় কাজ করলেও অনুগ্রহের কাজ হয় বিশ্বাসে। আত্মিক আশীর্বাদ কেবল বিশ্বাসেই লাভ করা যায়। 'খ্রীষ্ট দায়ূদের সন্তান'– তাদের এই ধারণা তাদের বিশ্বাসকে খ্রীষ্ট ও তাঁর অনুগ্রহের সাথে ঘনিষ্ঠ করেছিল। কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর ক্ষমতার প্রতি তাদের বিশ্বাসের অবস্থা কীরূপ তার স্বীকারোক্তি চাইলেন, 'আমি যে এই কাজ করতে পারি– তা কি তোমরা বিশ্বাস কর?' তিনি তা করলেন তাদের অনুগ্রহ ও আনুকূল্য দেবার জন্য, তাদের সুস্থ করার জন্যই– যেভাবে তিনি অবশরোগীকে সুস্থ করেছিলেন এবং মৃতকে জীবিত করেছিলেন। মনে রাখুন, বিশ্বাসের নির্দিষ্ট অনুশীলন ভাল ফল দেয়; তা ঈশ্বরের ক্ষমতার সাধারণ নিশ্চয়তার প্রতি আত্মনিবেদনে এবং তাঁর সাধারণ

প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস স্থাপনে সাহায্য করে। 'তোমরা কী মনে কর, আমি ভাববাদী হিসেবে তোমাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেব, না যাঁর ক্ষমতা আছে সেই ঈশ্বর হিসেবে তোমাদের চোখ খুলে দেব? এই ক্ষমতা যে কেবল আমার– সেটাকি তোমরা বিশ্বাস কর?' নিছক অন্ধদের বিশ্বাস যাচাই করার জন্য খ্রীষ্ট একথা বলেন নি; বরং তিনি বোঝাতে চাইলেন যে, তিনি কেবল দায়ূদ-সন্তানই নন উপরন্তু ঈশ্বরের পুত্রও; কারণ অন্ধকে আলো ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ কেবল ঈশ্বরই করতে পারেন (গীত ১৪৬:৮); তিনি দেখার চোখ তৈরি করেন (যাত্রা ৪:১১); যেখানে ইয়োব নিজেকে 'অন্ধের চোখ' বলে অভিহিত করেন (ইয়োব ২৯:১৫)। বাস্তবিকই অন্ধের দৃষ্টিশক্তিদানে আর কেউ সক্ষম ছিল না– যা খ্রীষ্ট এখানে করে দেখালেন। অন্ধদের উদ্দেশে বলা খ্রীষ্টের সেই কথা এখন আমাদের উদ্দেশেও খাটে– আমরা কি বিশ্বাস করি খ্রীষ্ট আমাদের সবক্ষেত্রে পরিচালনা দিতে সক্ষম? খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার ক্ষেত্রে আমাদের কেবল তাঁর ক্ষমতার বিষয়েই নিশ্চিত হলে চলবে না উপরন্তু আমাদের তাঁর প্রতি নিবেদিত ও উৎসাহী থাকতে হবে।

দৃশ্যত অন্ধেরা দ্বিধাহীনভাবে, সময়ক্ষেপণ না করেই খ্রীষ্টের প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছিল– 'হ্যাঁ, প্রভু।' যদিও তিনি তাদের কিছু সময়ের জন্য এক উত্তেজনাকর অবস্থার মধ্যে রাখলেন এবং প্রথমেই তাদের সাহায্য করলেন না তবুও তারা সততার সাথে তাঁর প্রজ্ঞার উপর আস্থা রাখল। তাঁর মৌনতাকে তারা তাঁর দুর্বলতা জ্ঞান না করে তাঁর সামর্থ্যের প্রতি আস্থাবান থাকল। মনে রাখুন, অনুগ্রহের ধন– যা খ্রীষ্টের ক্ষমতায় উত্তোলিত হয়ে থাকে– তা কেবল বিশ্বাসীদের কাছেই ধরা দেবে (গীত ৩১:১৯)।

৩. খ্রীষ্ট তাদের সুস্থ করলেন– 'তিনি তাদের চোখ স্পর্শ করলেন' (২৯ পদ)। তিনি এটা করলেন তাদের বিশ্বাসকে উৎসাহিত করার জন্য– যা তাঁর সময়ক্ষেপণের দ্বারা প্রকাশিত হল। তিনি তাদের পরীক্ষা করলেন এবং দেখাতে চাইলেন যে, অনুগ্রহের বাক্য দ্বারা তিনি অন্ধ আত্মাকেও আলো দিতে পারেন। তিনি তাদের বিশ্বাসের দরুন সুস্থ করেন। এক্ষেত্রে নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনার বিশ্বাসের অবস্থা কী? এখানে লক্ষণীয় যে, অন্ধেরা খ্রীষ্টের কাছে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার আহ্বান জানালে, খ্রীষ্ট তাদের বিশ্বাসের খোঁজ করেছিলেন (২৮ পদ)– 'তোমরা কি বিশ্বাস কর আমি তা পারি?' তিনি তাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে জানতে চান নি; কিংবা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার বিনিময়ে তারা তাঁকে কিছু দিতে পারবে কিনা তা-ও জিজ্ঞেস করেন নি; কিন্তু তিনি তাদের বিশ্বাসের অবস্থা জানতে চাইলেন। আর যখন তারা খ্রীষ্টের কাছে বিশ্বাসে নিজেদের সমর্পণ করল, তখন তিনি যেন তাদের উদ্দেশে বললেন, 'আমি জানি তোমাদের বিশ্বাস কেমন এবং যে ক্ষমতার ওপর তোমাদের এত বিশ্বাস– তা তোমাদের জন্য ব্যবহৃত হবে। তোমরা যেমন বিশ্বাস করেছ তেমন ফল পাবে।' তাঁর এই উক্তি প্রকাশ করে,

(১) খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের বিশ্বাস সত্যায়িত ও প্রশংসিত করতে চান। মনে রাখুন, সত্যিকারের বিশ্বাসীদের জন্য এ পরম সান্ত্বনার যে, খ্রীষ্ট তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে অবগত আছেন এবং তিনি তাতে সন্তুষ্ট। যদি তা দুর্বল হয়ে পড়ে (যদিও অন্যরা এর পার্থক্য ধরতে পারে না) তবুও তিনি তাদের অগ্রাহ্য করেন না।

(২) তাদের বিশ্বাস তাঁকে প্ররোচিত করল– 'তোমরা যেমন বিশ্বাস করলে তেমনই তোমাদের জন্য করা হল।' মনে রাখুন, যারা খ্রীষ্টের কাছে নিজেদের সমর্পণ করে– তারা তাঁর সাথে তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী বাস করবে; তাদের কল্পনার দরুন নয়, কিংবা তাদের

পেশার কারণে নয় কিন্তু তাদের বিশ্বাসের কারণে। স্পষ্টতই, অবিশ্বাসীরা ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশা করতে পারে না। কিন্তু সত্যিকারের বিশ্বাসীরা নিশ্চিত জানে যে, সুসমাচারে উল্লেখিত সব প্রতিশ্রুতি তাদের জন্য বাস্তবায়িত হবে। তবে সেক্ষেত্রে আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করবে বিশ্বাসের শক্তিমত্তার উপর। আমরা খ্রীষ্টে সংকীর্ণ নই; তাই আমরা কখনও সঙ্কীর্ণ হয়ে থাকব না।

৪. তিনি তাদের এই ঘটনার কথা গোপন রাখতে নির্দেশ দিলেন (৩০ পদ), 'দেখ যেন কেউ জানতে না পারে।' তিনি তাদের এই দায়িত্ব দিলেন যেন

(১) আমাদের কাছে তাঁর এই বিনম্রতা ও নিজেকে নিচু করার মানসিকতা আমাদের জন্য উদাহরণ হয়। তিনি চান, আমরা যেন সেটা তাঁর কাছ থেকেই শিখি। মনে রাখুন, আমরা ভাল কাজ করি ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করার জন্য, নিজেরা প্রশংসা পাবার জন্য নয়। সে কারণেই ভাল কাজ করার ক্ষেত্রে আমাদের আরও বেশি সতর্ক থাকতে হবে যেন তা লোক-দেখানো হয়ে না পড়ে (হিতোপদেশ ২০:৬; ২৫:২৬)। এভাবে খ্রীষ্ট 'ভাল কাজের প্রকাশকে' দ্বিতীয় করলেন– 'তোমার ডান হাত কী করছে তা বাঁ হাতকে জানতে দিয়ো না।'

(২) কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন যে, খ্রীষ্ট তাঁর কাজকে গোপন রাখার কথা বলে মূলত কফরনাহুমের লোকদের প্রতি তাঁর অসন্তুষ্টিই ব্যক্ত করেছেন; কারণ অনেক চিহ্ন-কাজ দেখেও তারা তাঁকে বিশ্বাস করে নি। মনে রাখুন, যাদের খ্রীষ্টের কাজ ঘোষণা করে বেড়ানোর কথা তাদের নীরবতা যেকোন এলাকা ও জনতার বিচারে দাঁড়াবে। এর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট আমাদের কাছে একটি বার্তা পৌঁছে দিলেন– যারা তাঁকে গ্রহণ না করে অবিশ্বস্ততায় পড়ে থাকতে মনস্থ করবে তিনিও তাদের অস্বীকার করবেন। এ ছাড়াও যারা তাঁর আলো দেখবে না বলে চোখ ফিরিয়ে নেবে– তিনি তাদের কাছ থেকে তাঁর আলো সরিয়ে নেবেন।

(৩) তিনি তা করলেন 'সাবধানতার' জন্য; কারণ তাঁর অনেক কাজ তখনও বাকী ছিল। তিনি চাইলেন না তাঁর কাজ নিয়ে বেশি আলোচনা হোক। খ্রীষ্ট জানতেন, তাঁর সম্পর্কে যত বেশি প্রশংসা করা হবে ততোধিক ঈর্ষান্বিত হয়ে যিহূদীনেতারা তাঁর বিরুদ্ধে লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলবে।

(৪) ড. হুইটবি এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য একটি কারণ উল্লেখ করেছেন– কেন খ্রীষ্ট মাঝে মাঝে তাঁর চিহ্ন-কাজ গোপন করতে চাইতেন এবং তা প্রকাশ করতে নিষেধ করে দিতেন। এর কারণ: তিনি যিহূদীদের মাঝে যে 'আত্মপ্রকাশের' সংস্কৃতি ছিল-তাতে যোগ দিতে চাইলেন না। এ ছাড়াও তিনি তাদের হাতে এই অস্ত্র তুলে দিতে চাইলেন না যে, তিনি লোকদের রোমীয় শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত করতে যাচ্ছেন (যোহন ৬: ১৫)। কিন্তু তাঁর পুনরুত্থানের পর (তাঁর মিশন সম্পন্ন হওয়ার পর) যখন তাঁর আত্মিক রাজ্য স্থাপিত হল তখন সেই শঙ্কা দূর হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে খ্রীষ্টের শিষ্যেরা তখন সব জাতির লোকদের কাছে তা প্রকাশ করতে লাগল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, খ্রীষ্ট অবিশ্বাসী ও গাদারীয়দের মাঝে করা চিহ্ন-কাজসমূহের কথা প্রকাশের অনুমতি দিয়েছিলেন; কারণ তাদের নিয়ে কোন বিপদের ভয় ছিল না– সম্মান হচ্ছে ছায়ার মতো-যা অনুসরণ করতে গেলে মিলিয়ে যায়। তাই যারা জাগতিক সম্মানের পেছনে ছোটে তারা শেষমেষ ব্যর্থ হয়। (৩১) তথাপি তারা এই ঘটনার কথা সর্বত্র ছড়িয়ে

দিল। এটা ছিল ঈর্ষান্বিত কাজের চেয়েও বেশি কিছু, যা সতর্কভাবে করা হয় না এবং যদিও তা সততার সাথে খ্রীষ্টকেই সম্মানিত করেছিল তবুও তা যাচাই করা হয় নি। তাদের প্রতি যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তা তারা পালন করে নি। যখন আমরা ঈশ্বরের গৌরবের পথে চলতে মনস্থ করি, তখন লক্ষ্য রাখতে হবে আমাদের সব কাজ যেন ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী হয়।

খ. একজন বোবা সুস্থ হল– যাকে মন্দ-আত্মা অধিগ্রহণ করেছিল। এখানে আমরা দেখি,

১. তার ঘটনাটি– যা ছিল খুবই দুঃখজনক। মন্দ আত্মা তার মাঝে একটি বিশেষ সমস্যা তৈরি করেছিল– সে কথা বলতে পারতো না (৩২ পদ)। দেখুন, এই পৃথিবীর রাজ্যের প্রকৃতি ও ভীতি কতটা ভিন্ন ছিল! একটু আগেই আমরা দুজন অন্ধকে দেখেছি কিন্তু এখন আমরা একজন বোবার সাথে সাক্ষাত করছি। তাই ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কতটা কৃতজ্ঞ থাকা উচিত যে, আমরা দেখতে ও কথা বলতে পারি। দেখুন, মানবজাতির বিরুদ্ধে শয়তানের খারাপির নজির এবং কত উপায়ে সে তা দেখিয়ে থাকে। এই লোকটির বধিরতা ছিল মন্দ আত্মায় আক্রান্ত হওয়ার ফল। কিন্তু সে যে বলতে পারতো না তা একদিক দিয়ে ভালই হয়েছিল; তা না হলে সে হয়তো সেই মন্দ-আত্মাদের মতো বলে বসতো– (৮:২৯ পদ), 'আমার সাথে আপনার কী দরকার?' এ দু'টি ঘটনার তুলনা করলে এই লোকের বোবা হয়ে থাকাই ভাল ছিল, নইলে সে হয়তো ঈশ্বরের নিন্দা করে বসতো। শয়তান যখন কারও ভেতরে জায়গা করে নেয় তখন তা ভাল কাজে বধির করে দেয়; প্রশংসা ও প্রার্থনা থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখে– যা শত্রু হিসেবে শয়তান করে থাকে। এই দরিদ্র সৃষ্টিকে তারা খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসল– যারা একটু আগে 'নিজ বিশ্বাসে' সুস্থতা লাভের ঘটনাটি দেখেছিল। কেবল তা-ই নয়– 'তারা তাদের বন্ধুদের বিশ্বাসে আনীত হল।' এক্ষেত্রে যারা অন্যকে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসে তাদের প্রতিও যে খ্রীষ্টের দৃষ্টি আছে– সে বিষয়টিই প্রকাশিত হয়। 'লোকেরা তাঁর কাছে সেই বোবা লোকটিকে আনল।' দেখুন, খ্রীষ্ট কতটা উদ্যমের সাথে পরপর ভাল কাজ করে গেলেন। কত ত্বরিত তিনি একটি কাজ শেষ হতেই আরেকটি কাজ করলেন! 'অনুগ্রহের ধন, বিস্ময়কর অনুগ্রহ তাতেই লুকানো থাকে– যা সতত বয়ে চলে কিন্তু কখনও ক্লান্ত হয় না।'

২. তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তাকে সুস্থ করলেন (৩৩ পদ)– 'সেই ভূত তাকে ছেড়ে গেল; আর বোবা লোকটি কথা বলতে শুরু করল।' মনে রাখুন, খ্রীষ্ট একেবারে মূল থেকে সুস্থ করেন এবং সেই কারণকে উপড়ে ফেলেন, যেহেতু তিনি জানেন রোগের সত্যিকার কারণ কী। তিনি জলে লবণ মিশিয়ে তা পরিষ্কৃত করেন। খ্রীষ্ট যখন তাঁর অনুগ্রহে সেই আত্মা থেকে ভূতকে বের করে দিলেন অর্থাৎ রোগের মূলকে উৎপাটিত করলেন তখন সেই লোকটি কথা বলতে শুরু করল। পৌল যখন মন পরিবর্তন করলেন তখন তিনি প্রার্থনা করছিলেন; তখন তার কণ্ঠের জড়তা কেটে গিয়েছিল।

৩. এর ফলে, আশপাশে কী প্রতিক্রিয়া দেখা গেল–

(১) সেই লোকেরা বিস্মিত হল এবং সেটাই ছিল স্বাভাবিক; যদিও 'অনেকেই বিস্মিত হয় কিন্তু অল্পই বিশ্বাস করে'। সাধারণের প্রশংসা শীঘ্রই অন্য উচ্চতায় পৌঁছায়। তবে একথা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, 'এই অসাধারণ কাজের জন্য নতুন একটি গান, নতুন নিয়মের জ্ঞান অবশ্যই গাওয়া হবে' (গীত ৯৮:১)। তারা বলল, 'ইস্রায়েল দেশে এমন

কাজ আর কখনও দেখা যায় নি' এবং সেই কারণে তা আর কোথাও দেখা যায় নি; কারণ ইস্রায়েলের মতো আর কেউই এত অসাধারণ কাজ দেখতে পায় নি। ইস্রায়েলের মাঝে যারা চিহ্ন-কাজের জন্য বিখ্যাত ছিলেন– লোকেরা তাদের সম্পর্কে জানত; কিন্তু খ্রীষ্ট তাদের সবাইকে ছাড়িয়ে গেলেন। মোশি যে চিহ্ন-কাজ করেছিলেন– তা ইস্রায়েলের লোকেরা শাস্ত্র থেকে জেনেছিল, কিন্তু খ্রীষ্টের কাজ তারা নিজেদের চোখে দেখতে পেয়েছিল।

(২) 'ফরীশীরা একে নিন্দিত করল' (৩৪ পদ)। যখন তারা লোকের উচ্ছ্বাস কিংবা তাঁর কাজের মাহাত্ম্য কমিয়ে দেখাতে গিয়ে ভাষা হারিয়ে ফেলেছিল তখন তারা এক দ্বান্দ্বিক মত প্রকাশ করল, যা প্রকৃতই একে অর্থহীন করে তোলার প্রয়াস থেকে বিবৃত হল। তারা বলল, শয়তানের সাহায্য নিয়ে খ্রীষ্ট তা করেছেন– 'সে মন্দ-আত্মাদের রাজার সাহায্যে ভূত ছাড়ায়।' পরবর্তীতে আমরা এ প্রসঙ্গে খ্রীষ্টের প্রতিক্রিয়া ও প্রত্যুত্তর দেখব (১২:২৫)। তবে এখানে লক্ষ্য করুন, কীভাবে ভণ্ড লোকেরা দিন দিন আরও খারাপের দিকে যায় (২ তীমথিয় ৩:১৩) এবং তাদের এই অগ্রসরমানতা তাদের পাপ এবং শাস্তি উভয়ের কথা বলে। খ্রীষ্ট কেন পাপ ক্ষমা করার কথা বললেন, কেন পাপীদের সাথে মেলামেশা করলেন এবং কেনই বা তাঁর শিষ্যেরা উপবাস রাখেন না– সেসব বিষয়ে ফরীশীরা এরই মাঝে তাঁকে দোষারোপ করেছিল (৩ পদ ; ১১ পদ ; ১৪ পদ)। যদিও তা যথেষ্ট ঘৃণার্হ ছিল, তবুও তাদের প্রতি খ্রীষ্টের মমতার অন্ত ছিল না, তাদের প্রতি তাঁর করুণার শেষ ছিল না। কিন্তু তাদের এই মিথ্যেপ্রয়াস শেষ অব্দি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। তবে হ্যাঁ, তারা নরকের শয়তানকে নিজেদের জীবনে কাজ করতে দিয়েছিল। তাদের এই কাজ ছিল শয়তানের পূজা। সে কারণেই খ্রীষ্টের কাছে তা ক্ষমার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে; যেহেতু খ্রীষ্টের প্রতি লোকদের বিস্ময়কে ভিন্ন পথে পরিচালিত করতে তারা খ্রীষ্টের ক্ষমতাকে নিন্দিত করে বলেছিল– 'সে মন্দ-আত্মাদের রাজার সাহায্যে ভূত ছাড়ায়।'

মথি ৯:৩৫-৩৮

এখানে, ক. খ্রীষ্টের পূর্ববর্তী প্রচার এবং চিহ্ন-কাজের সমাপ্তি টানা হয়েছে (৩৫ পদ); 'তিনি শহরে শহরে ও গ্রামে গ্রামে গিয়ে সমাজ-ঘরে শিক্ষা দিতে ও স্বর্গ-রাজ্যের সুসংবাদ প্রচার করতে লাগলেন।' এরকমটা আমরা এর আগেও দেখেছি (৪:২৩)। তা আমাদের কাছে খ্রীষ্টের নির্দিষ্ট ক'টি প্রচারের কথা তুলে ধরে (৫ ও ৬ অধ্যায়) এবং তাঁর আশ্চর্য কাজের বিষয়ে বলে। এই ঘটনার সমাপ্তি টানতে গিয়ে (যেভাবে 'প্রমাণিত' কিছুর কথা বলা হয়) এখানে তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে পুনরুক্ত হয়েছে। এভাবে সুসমাচার লেখক হয়তো বলছেন– 'খ্রীষ্ট যে বিষয়ে প্রচার করেছিলেন এবং যেসব চিহ্ন-কাজ করেছিলেন তার বর্ণনা পড়ে হয়তো আপনি তাঁর মূল শিক্ষাটি ধরতে পেরেছেন। মূলত তাঁর শিক্ষা ও চিহ্ন-কাজ একে অপরের পরিপূরক; তাই তাঁর শিক্ষা ও চিহ্ন-কাজের বিষয়ে এখানে লেখা হল– যেন আপনি তাঁকে অধ্যয়ন করতে পারেন এবং তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন।' কেউ কেউ মনে করেন, এটা ছিল তাঁর দ্বিতীয়বারের মতো গালীল-যাত্রা। গতবার তিনি যাদের

কাছে প্রচার করেছিলেন এবারও তাদের কাছে পুনঃ প্রচার করলেন। যদিও ফরীশীরা তাঁকে অগ্রাহ্য করেছিল এবং তাঁকে তুচ্ছ করেছিল, তবুও তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে গেলেন– তিনি স্বর্গ-রাজ্যের সুখবর প্রচার করে গেলেন। তিনি লোকদের অনুগ্রহ ও গৌরবের রাজ্যের বিষয়ে বললেন। প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল সত্যিকারেই সুসমাচার, সুখবর, মহা আনন্দের উদযাপন।

দেখুন, খ্রীষ্ট কীভাবে তাঁর প্রচার কাজের প্রতি সম্মান দেখালেন।

১. তিনি অবহেলিত শহরে গেলেন। তিনি কেবল মহান এবং ধনী শহরগুলোতেই গেলেন না কিন্তু গরীব , অসহায় গ্রামগুলোতেও গেলেন; সেখানে তিনি প্রচার ও আরোগ্যকাজ দু'টোই করলেন। এই পৃথিবীয় যারা আত্মায় দীন, তারা খ্রীষ্টের কাছে গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের কাছেও তা হতে হবে– তাদের আত্মার আবেদন আমাদের শুনতে হবে। ধনী ও গরিবেরা একত্রে তাঁর সাথে সাক্ষাত করল, অভিজাত ও তুচ্ছ সবাই তাঁর কাছে আসল– 'তারা ইস্রায়েলের গ্রামের লোকদের জন্য প্রভুর পরিত্রাণ-কাজের কথা বলছে' (বিচারকর্তৃকগণ ৫:১১)।

২. তিনি লোকদের সমাজ-ঘরে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি যিহূদীদের শিক্ষা দিলেন। এর মধ্য দিয়ে:

(১) তিনি দুঃখার্ত মানুষের কাছে সাক্ষ্য দিলেন, এমনকি তখনও, যখন তাদের মাঝে দুর্নীতি গেড়ে বসেছিল। খ্রীষ্টের এই উদাহরণমতে আমরা অবশ্যই অবিশ্বাসীদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করব না।

(২) তিনি সেখানে প্রচারের সুযোগ গ্রহণ করেছিলের; কারণ লোকেরা সেখানে ঈশ্বরের বাক্য শোনার আগ্রহ নিয়ে মিলিত হতো। এইভাবে, সুসমাচার-মণ্ডলীর ভিত্তি গাঁথা হয়েছিল এবং খ্রীষ্টীয় সভাগুলোও সেভাবেই গড়ে উঠল। 'প্রেরিতেরা প্রায়ই যিহূদীদের সমাজ-ঘরে গিয়ে বাণী-প্রচার করতেন।' মনে রাখবেন, বিজ্ঞতার জ্ঞান সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে সৃজনশীল উপায়ে কাজ করে।

খ. এটা হচ্ছে পরবর্তী অধ্যায়ের সূচনা– যেখানে তিনি তাঁর শিষ্যদের প্রচার কাজে পাঠালেন। 'তিনি লোকদের দেখলেন' (৩৬ পদ)। খ্রীষ্ট কেবল তাঁর অনুসারীদের কিংবা তাঁর সামনে উপস্থিত জনতাকেই নয়; বরং যাদের তিনি অতিক্রম করে এসেছেন– সেই বিপুল সংখ্যক মানুষকেও দেখলেন। তিনি তাদের পুনরায় পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পেলেন– তারা কত অসহায় এবং ক্লান্ত। কি বিপুল সংখ্যক লোক প্রতিটি সমাজ-ঘরে উপচে পড়ছে। এই লোকেরা ছিল অব্রাহামকে করা ঈশ্বরের আশীর্বাদের ফল– তারা অগণিত হবে। অব্রাহামের বংশধরদের অসহায়ত্ব লক্ষ্য করে,

১. তিনি তাদের প্রতি মমতা করলেন (৩৬ পদ); তিনি তাদের প্রতি মমতার দৃষ্টিতে তাকালেন; এবং তা মোটেই অল্প সময়ের জন্য নয়– যেভাবে তিনি সেই অন্ধ, পঙ্গুর প্রতি মমতা করেছিলেন। মূলত তাঁর এই মমতা ছিল আত্মিক অর্থে। তিনি দেখলেন– তারা কত অযত্নে এবং অবহেলায় পড়ে আছে। ঈশ্বরের সুদৃষ্টির অভাবে তারা ধ্বংস হতে বসেছে। মনে রাখুন, যীশু খ্রীষ্টের কাছে এই আত্মারা মূল্যবান ছিল; কারণ এই পতিতদের জন্যই তিনি স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন। ক্রুশের ওপর তাঁর মৃত্যুবরণও মানুষের প্রতি তাঁর অপরিসীম মমত্ববোধ থেকেই। খ্রীষ্টের অনুগ্রহ যারা লাভ করে তারা নিজেদের প্রতি কম মমতা দেখাবে; খ্রীষ্টও তাদের প্রতি বেশি মমতা দেখান যারা নিজেদের কম মমতা

দেখায়। তাই খ্রীষ্টানদের অবিশ্বাসীদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করা উচিত, যেহেতু খ্রীষ্ট নিজে তা করে গেছেন।

দেখুন, এই মমতা কেন আসল।

(১) কারণ তারা ছিল নির্জীব, বিচ্ছিন্ন এবং উদ্বেগাকুল। তারা দলহীন ছিল বলে একজনের কাছ থেকে অপরজন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল– 'সেই বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে' (সখরিয় ১১:১৪)। তারা সাহায্য চায় তাদের আত্মার জন্য, যদিও তারা ভাল কিছুই পায় নি। ধর্ম-শিক্ষকরা কিংবা ফরীশীরা তাদের ভেতর অর্থহীন কিছু প্রথা ও নিয়মকানুন বুনে দিয়েছিল; তাদের উপর পূর্বপুরুষের প্রথা চাপিয়ে দিয়েছিল। উপরন্তু অনেক ভুলের দিকে তাদের ঠেলে দিয়েছিল, যেখানে তারা তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানতো না কিংবা স্বর্গীয় আজ্ঞার মূল অর্থ ও প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য বুঝতে পারতো না। সেই কারণে তারা নির্জীব হয়ে পড়েছিল। আর এই নির্জীব অবস্থা থেকে নিজেদের আত্মাকে সতেজ করে তুলতে 'জীবনরুটি' ছাড়া আর কী আছে? তুষ ও ছাইয়ের মতো ইতস্তত বিচরণে যে জীবনকে তারা আরাধ্য করেছে তা কি তাদের পরিত্রাণ দিতে কিংবা আত্মিক আরোগ্যদানে সক্ষম হয়েছে? ঈশ্বরভক্ত ক্লান্ত হয় তখন– যখন তার কাজ সমাধা হয়, পরীক্ষায় পাস করে যায়, ক্লেশ বহন করে। কিন্তু যে আত্মা সত্যের বাক্য শিক্ষা পায় না, সে এমনিতেই ক্লান্ত-নির্জীব হয়ে থাকে।

(২) তারা রাখালবিহীন ভেড়ার পালের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এই প্রকাশভঙ্গি নেয়া হয়েছে (১ রাজাবলি ২২:১৭); এবং এই কথাটুকু প্রকাশ করে যে, সেই লোকদের বিশ্বস্ত দিক নির্দেশকের অভাব ছিল। দলবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে পালের ভেড়ার মতো সমস্যায় আর কোন প্রাণীই পড়ে না। আর যখন তা হয়, তখন সে অসহায় হয়ে পড়ে। সে বাড়ির পথ খুঁজে পায় না, এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াতে গিয়ে সত্যিকার বিপদের মুখে পড়ে। পাপে পূর্ণ আত্মারা হচ্ছে হারানো ভেড়ার মতো; সত্যিকারভাবেই তাদের এমন একজন মেষপালকের অভাব ছিল, যিনি তাদের বাড়ির পথে নিয়ে আসতে পারেন। যিহূদীদের ধর্মশিক্ষকেরা তখন এই মেষপালকের ভূমিকায় ছিল; তথাপি খ্রীষ্ট দেখলেন, তারা রাখালবিহীন ছিল। প্রকৃতপক্ষে রাখাল হিসেবে যিহূদীনেতারা ভাল ছিল না। তারা ছিল এমন মন্দ রাখালের মতো– যে তার ভেড়ার পালকে বিপথে পরিচালিত করে তাদের ক্ষতিই করে থাকে। যেখানে তাদের এই ভেড়াগুলোকে হিংস্র পশুর আক্রমণ ও পাখির অত্যাচার থেকে বাঁচানোর কথা, সেখানে তারা এদের আরও বিপদের মধ্যেই ঠেলে দিচ্ছিল (যিরমিয় ২৩:১, (যিহিষ্কেল ৩৪:২ দেখুন)। মনে রাখুন, এই লোকদের অবস্থা ছিল খুবই করুণ; সত্যিকার অর্থে তাদের কোন পরিচালক ছিল না অথবা যারা ছিল তারা ছিল প্রতারক। এই ভণ্ড রাখালেরা নিজেদের বিষয়ে অধিক মনোযোগী ছিল– খ্রীষ্ট কিংবা অসহায় লোকদের বিষয়ে নয়।

২. তিনি তাঁর প্রেরিতদের বললেন যেন তারা এদের জন্য প্রার্থনা করে। লোকদের প্রতি মমতাপূর্ণ হয়ে তিনি তাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। ফলে প্রেরিতদের পাঠানোর আগে তিনি নিজে দীর্ঘ সময় প্রার্থনায় কাটিয়েছিলেন (লূক ৬:১২, ১৩)। মনে রাখুন, আমরা যাদের প্রতি মমতা অনুভব করি, তাদের জন্য আমাদের প্রার্থনা করতে হবে। ঈশ্বরের কাছে বলতে হবে যেন তিনি এদের জন্য তাঁর প্রেরিতদের পাঠিয়ে দেন।

(১) খ্রীষ্টের কথায় একধরনের 'অসহায়ত্ব' ফুটে উঠল– 'ফসল সত্যিই অনেক কিন্তু

কাজ করবার লোক কম।' লোকেরা ভাল প্রচারের প্রত্যাশা করছিল কিন্তু প্রচারকের সংখ্যা ছিল অল্প। ফলে অনেক কাজ বাকী রয়ে গিয়েছিল। লোকেরা আরও শিক্ষালাভের প্রত্যাশা করেছিল।

(ক) এটা সত্যিই উৎসাহের ব্যাপার যে, ফসল অনেক। এদের 'প্রয়োজন' আমাদের অবাক করে না, কিন্তু তাদের প্রত্যাশা প্রচার কারীদের উদ্বুদ্ধ করে। তারা যে অসুস্থ শিক্ষা পেত তার জায়গায় তাদের সুস্থ শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। খ্রীষ্টের শিক্ষা শুনে লোকদের চাওয়া বেড়ে গিয়েছিল এবং তা সত্যিই তাঁর কাজের ফল। মনে রাখুন, এটা খুবই আশীর্বাদের বিষয়, লোকেরা ভাল বাণী-প্রচার শুনতে ভালবাসে। 'সেই ক্ষেত তখন ঢাকা ছিল এবং সেখানে আশা এসে ভালভাবে জমেছিল।' তা ছিল চমৎকার সুযোগ– যা দ্বিগুণ যত্ন এবং পরিশ্রম প্রত্যাশা করে। যেহেতু বিপুল সংখ্যক লোক তাদের হীন অবস্থার উত্তরণ দেখতে চায় সেহেতু ফসল কাটবার দিনটি হবে ব্যস্ততম দিন।

(খ) চাষীর স্বল্পতা লক্ষ্য করে খ্রীষ্ট তাদের প্রতি মমতা করলেন। তাঁর এই মমতা ছিল নিখাদ। কারণ, চাষীর অভাবে ফসলের ক্ষেত নষ্ট হয়ে যাবার ভয় বেড়ে যাচ্ছিল। মনে রাখুন, লোকের অভাবে মণ্ডলীর কাজ যদি শ্লথ হয়ে পড়ে, তবে যারা কাজের লোক তারা দ্বিগুণ বেগে কাজে ঝাপিয়ে পড়বেন।

(২) এ-স্থলে তাদের দায়িত্ব (৩৮ পদ)– 'এদের জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর যেন ঈশ্বর কাজের লোক পাঠিয়ে দেন।' মনে রাখুন, যখন সবকিছু নিরুৎসাহের হয়ে পড়ে তখন আমরা অবশ্যই বেশি করে প্রার্থনায় সময় কাটাব। এর ফলে, আমরা মন থেকে ভয় দূর করে দিতে পারি। 'ঈশ্বরভক্তেরা দুর্দশায় তাঁর কাছে সমর্পিত হয়।' তাই মণ্ডলীর কার্যক্রম যে কাজের লোকের অভাবে ধীরগতির হয়ে পড়ছে– সে বিষয়টিও আমরা প্রার্থনায় তাঁর কাছে রাখব। আর তা করতে গিয়ে অযথা সময়ক্ষেপণ করা চলবে না। মনে রাখুন,

(ক) ঈশ্বর হচ্ছেন ফসলক্ষেতের মালিক; 'আমার পিতা হচ্ছেন গৃহস্বামী' (যোহন ১৫:১)। 'তিনি আঙ্গুর ক্ষেতের মালিক' (যিশাইয় ৫:৭)। এই সম্মান একমাত্র ঈশ্বরের, যে তাঁর ফসল তাঁর গৃহে জমা করবেন; কারণ তিনিই এই ফসলক্ষেতের তত্ত্বাবধান করেন (১ করিন্থীয় ৩:৯; ইশা ২১:১০)। তিনি সেই ক্ষেতের সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং এর কর্মীদের প্রতিও লক্ষ্য রাখেন। তাই তাঁর কর্মীদের জন্য এটা পরম সান্ত্বনার যে, তিনি নিজেই তাদের পরিচালনা দেবেন।

(খ) প্রচারকেরা ঈশ্বরের ফসলক্ষেতের চাষী। তারা লোকদের কাছে তাঁর দেওয়া নাজতের সুখবর পৌঁছে দেবে। এ কাজে ঈশ্বর নিজে তাদের পরিচালনা দেবেন। তবে এক্ষেত্রে তাদের নিয়মানুবর্তী হতে হবে। তাদের কাজে আবশ্যিকভাবে ধারাবাহিকতাটুকু থাকতে হবে। একাজে তারা পরম আনন্দ লাভ করবে– 'সুসমাচার প্রচারকেরা ফসলক্ষেতে আনন্দের সাথে কাজ করবে' (যিশাইয় ৯:২, ৩) এবং 'যে ফসল কাটে সে বেতন পায়' (যাকোব ৫:৪)।

(গ) কাজ করবার লোকদের পাঠানোটা ঈশ্বরের কাজ। ঈশ্বর পরিচালকদের গড়েন (ইফি ৪:১১); এই দায়িত্বে তাঁর নিয়োগ পেতে হয়। ঈশ্বর যাদের যোগ্য মনে করেন তাদেরকেই এই কাজের জন্য আহ্বান করেন। পাশাপাশি যারা অযোগ্য, যাদের আহ্বান করা হয় নি তারা অযথা ছুটোছুটি করলেও এ কাজে কোন বেতন পাবে না– 'তাদের যদি পাঠানো না-ই হয়, তবে কীভাবে তারা প্রচার করবে?

(ঘ) বিশ্বাসীদের প্রার্থনায় খ্রীষ্ট ও অবিশ্বাসীদের প্রতি মমতার প্রকাশ পরিলক্ষিত হবে। ঈশ্বরের উদ্দেশে তাদের মিনতিতেই লোকদের প্রতি তাদের ভালবাসা কেমন তা প্রকাশ পাবে– বিশেষত যখন ফসল অনেক এবং তিনি আরও দক্ষ-বিশ্বস্ত কাজের লোক পাঠাবেন। তবে ঈশ্বরের ধন্যবাদ যে, মন পরিবর্তনের মাধ্যমে এই পাপীরাও তাঁর আহ্বান পাবার জন্য বিবেচনায় আসবে। এদেরই অনেককে তিনি 'কাজের আত্মা' দেবেন এবং এ কাজে তাদের সফলও করবেন। তিনি তাদের লোকদের জয় করার শক্তি যুগিয়ে দেবেন। তিনি যেখানে বলবেন সেখানেই তারা যাবে। কোন ওজর-আপত্তি তুলবে না; কারণ ব্যক্তিগত পাপ-দুর্বলতা, বিরুদ্ধ পরিবেশ প্রচার কারীকে ফসলক্ষেতে যেতে নিবৃত্ত করে। কিন্তু আমরা অবশ্যই প্রার্থনা করব যেন সব দ্বন্দ্ব, দোদুল্যমানতা আমাদের মন থেকে বিদায় নেয়। এর চির অবসান হয়। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের চাষী করে পাঠানোর আগে তাদের এ কথা বললেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি তাদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করে রাখলেন। মনে রাখুন, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী উভয়ের প্রতি ঈশ্বরের মমত্ববোধ আমাদেরও তেমনটা করতে উদ্দীপিত করে। যদিও 'তিনি নম্রদের অন্তরের ইচ্ছার কথা শোনেন, তাদের সাহস দেন এবং তাদের প্রার্থনা শোনেন' (গীত ১০:১৭), তবুও এখানে আমরা দেখি, খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর পতিত মানুষদের প্রতি মমতা করলেন। খ্রীষ্ট তাঁর বেছে নেওয়া শিষ্যদের প্রার্থনা করতে বলেছিলেন– প্রথমত, তাদের নিজেদের বিষয়ে। ঈশ্বর তাদের যে কাজের জন্য পাঠাচ্ছেন সেই কাজের জন্য– কারণ খ্রীষ্ট তাদের চাষী হিসেবে পাঠালেন (যিশাইয় ৬:৮)। মনে রাখুন, ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ আমাদের প্রার্থনার মাধ্যমে উত্তর দেয়। তা আমাদের সফল হতে সাহায্য করে। পৌল ছিলেন ঈশ্বরের বেছে নেয়া প্রজা, কারণ তিনি প্রার্থনা করছিলেন (প্রেরিত ৯:১১)। দ্বিতীয়ত, যেন তিনি আরও চাষীকে পাঠিয়ে দেন। মনে রাখুন, কেবল সাধারণ বিশ্বাসীরা নয়, উপরন্তু যারা পরিচালক– তারাও প্রার্থনা করবেন যেন আরও পরিচালক আসে। যদিও আত্মশ্লাঘার কারণে অনেকে একাই সব করে ফেলতে চান। তবুও খ্রীষ্ট এখানে বলেন, 'প্রার্থনা কর, যেন আরও কাজের লোক আসে'। সাধারণত পরিচালকের সংখ্যা কম হলে শীঘ্রই প্রকাশ্যে আসা যায়। কিন্তু যারা প্রকৃত-পরিচালক, যারা খ্রীষ্টের বিষয়ে অন্বেষণ করে, তারা আরও কাজের লোকের প্রত্যাশা করবে– যেন বেশি কাজ করা সম্ভব হয়। যদিও এতে করে কীর্তিও নতুনদের ভূমিকায় ঢেকে যেতে পারে, তবুও...।

মথি লিখিত সুসমাচার
অধ্যায় ১০

যীশু খ্রীষ্ট এখানে তাঁর বারোজন শিষ্যকে 'প্রেরিত' পদ দান করলেন এবং আসন্ন প্রচার যাত্রায় তাদের কর্মপদ্ধতি কী হবে সে বিষয়ে তাদের উদ্দেশে একটি নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখলেন। দৃশ্যত যীশু খ্রীষ্টের পার্শ্বজন হওয়ার সুবাদে এই শিষ্যরা খুব কাছ থেকে তাঁর কর্মপদ্ধতি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ লাভ করেছিলেন; অর্থাৎ তিনি কীভাবে প্রচার করেন, কী করে অনুপ্রেরণাদায়ী শিক্ষায় 'নতুন নিয়ম' স্থাপন করেন এবং অভূতপূর্ব চিহ্ন-কাজ সাধনের মাধ্যমে কীভাবে সুসমাচারের নির্ভুলতা প্রমাণ করেন ইত্যাদি। এ যাবত লব্ধ শিক্ষা তাদের কতটা ঋদ্ধ করেছে, খ্রীষ্টের সান্নিধ্যে তাঁর কাজ দেখে তারা কতটা প্রশিক্ষিত হয়েছেন– সেটা প্রমাণ করার সুযোগ তারা এখন পেতে যাচ্ছেন। সময় এসেছে– অর্জিত অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে খ্রীষ্টের কর্মপদ্ধতিকে অনুসরণ করার। কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর দূরদর্শী বিবেচনা থেকে অনুধাবন করেছিলেন যে, প্রচার যাত্রার জন্য শিষ্যদের প্রস্তুতি এখনও সর্বাঙ্গীন হয় নি। কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য যে পরিকল্পনা, কর্মকৌশল ও বুদ্ধিদীপ্ততা থাকা জরুরি তা তাদের ছিল না। তাই সমাগত প্রচার যাত্রার জন্য শিষ্যদের পুরোপুরি প্রস্তুত করে তুলতে যীশু খ্রীষ্ট একটি অনন্যসাধারণ 'ব্যবস্থা শিক্ষা' দিলেন।

তাঁর এই শিক্ষায় বিবৃত হল প্রচার যাত্রার পরিকল্পনা, কর্মকৌশলসহ বিবেচ্য সব বিষয়। তাঁর এই শিক্ষায় কেবল যে বাস্তব সমস্যারই সমাধান ছিল তা নয়, উপরন্তু অনুকূল-প্রতিকূল– উভয় পরিস্থিতিতেই স্বর্গীয় সাহায্যের প্রতি নির্ভরতা স্থাপনের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশও উপস্থিত ছিল। ফলে খ্রীষ্টের এই শিক্ষা তাঁর শিষ্যদের বাস্তব পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্য প্রয়োজনীয় বুদ্ধিমত্তার পাশাপাশি স্বর্গীয় সাহায্যের প্রতি নির্ভরতা বাড়াতে আত্মিক শক্তিরও যোগান দিয়েছিল। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের যবনিকায় খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের তাদের আহ্বান করেছিলেন যেন তারা ঈশ্বরের কাছে চাষীরূপ প্রচারকারীর অপর্যাপ্ততার বিষয়টি তুলে ধরেন। ঈশ্বরের কাছে আরও প্রচারকারীকে পাঠিয়ে দেবার সেই অনুরোধের ফল আমরা এখানে প্রত্যক্ষ করি; আর তা এলও খুব দ্রুত। শিষ্যদের কাছে প্রার্থনার এই ত্বরিৎ উত্তর মোটেও অপ্রত্যাশিত ছিল না; কারণ তারা দেখেছিলেন, খ্রীষ্টের কথা ও কাজ বিস্ময়কর সমন্বয় রেখে চলে। তিনি যা বলেন তা ঘটতে বেশি সময় লাগে না। এই অনুপ্রেরণাদায়ী 'তাৎক্ষণিকতা' আমাদের উৎসাহিত করে, খ্রীষ্টের নির্দেশ মতো আমরা যা কিছু চাইব তা আমাদের জন্য করা হবে। এখন, এই অধ্যায়ের মূল বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন–

(১) শিষ্যেরা নতুন দায়িত্ব পেলেন। খ্রীষ্ট তাদের 'প্রেরিত' পদ দিয়ে তাদের কাজ বুঝিয়ে দিলেন (১ পদ);

(২) 'প্রেরিত' হিসেবে যাদের বেছে নেওয়া হল (২-৪ পদ)।

(৩) খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের সুনির্দিষ্ট এবং পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা দিলেন। তারা কী কাজ করবেন, কোথায় করবেন, কাদের মাঝে তারা প্রচার ও চিহ্ন-কাজ করবেন, কার্যক্ষেত্রে তাদের আচরণ-অভিব্যক্তি কেমন হবে এবং কোন্ প্রক্রিয়ায় তারা তাদের পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করবেন (৫-১৫ পদ)।

(৪) শিষ্যদের কঠিন দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। খ্রীষ্ট এখানে তাঁর শিষ্যদের কাছে দুঃখভোগের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে এর বিপরীতে তাদের করণীয় বলে দিলেন। সুসমাচার প্রচারের জন্য নেমে আসা দুঃখভোগকে জয় করার জন্য খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিলেন (১৬-৪২)। সুসমাচার প্রচার সংগঠনের ঊষালগ্নে প্রেরিতদের প্রতি নিবেদিত খ্রীষ্টের এই শিক্ষার আবেদন এখনও বর্তমান। 'সচলায়তন' এই শিক্ষা থেকে সুসমাচার প্রচারকেরা এখন পর্যন্ত শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে চলেছেন। খ্রীষ্ট তাঁর প্রেরিতদের চোখে সম্ভাবনা ও সাফল্যের যে ছবিটি এঁকে দিয়েছিলেন তা 'চিরআগামীকে' সুসমাচার প্রচারে ব্রতী করে চলেছে। দ্বিধা নেই, আগামীদিনের প্রচার কারীরাও নিশ্চিতভাবে একে নতুন প্রেক্ষিতে আবিষ্কার করবেন; পবিত্র আত্মার সাহচর্যে নতুনতর উদ্যম ও প্রেরণায় অগণিত প্রচারযাত্রায় অংশ নেবেন। যুগের শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্ট তাদের পাশে থাকবেন– এই প্রতিশ্রুতির চেয়ে বড় প্রেরণা এখন আর কিছুই হতে পারে না; কারণ যুগপর্যায়ের প্রচারকদের ক্ষেত্রে তাঁর এই প্রতিশ্রুতি কতটা কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে সেটা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি।

মথি ১০:১-৪

এখানে,

ক. খ্রীষ্ট যাদের তাঁর প্রতিনিধি, দূত বা প্রেরিত হিসেবে মনোনয়ন দিলেন, তাদের পরিচয় বর্ণিত হয়েছে। এরা ছিলেন তাঁর শিষ্য (১ পদ)– যাদের তিনি কিছুকাল আগে তাঁর শিষ্য হতে আহ্বান করেন। খ্রীষ্টের সেই অব্যর্থ আহ্বানের প্রত্যুত্তর তারা করেছিলেন তাঁকে অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে। বলা বাহুল্য, তাঁর আহ্বানের ত্বরিৎ প্রতিক্রিয়ায় এই 'অনুসরণ' কেবল কিছু সময়ের জন্য ছিল না বরং এরপর থেকে তারা তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গী বনে যান। তিনি যে তাদের বলেছিলেন, তাদের তিনি 'মানুষ-ধরা জেলে' করবেন– সেই প্রতিশ্রুতিটি এখন বাস্তবায়িত হতে চলেছে। মনে রাখুন, কাউকে সম্মান ও অনুগ্রহ প্রদানের ক্ষেত্রে খ্রীষ্ট একটি গঠনমূলক প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন। এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের কাছ থেকে সম্মান ও অনুগ্রহ– উভয়ই আসে পর্যায়ক্রমে, ব্যক্তির যোগ্যতা ও উপর্যুক্ততার নিরিখে। এ অনেকটা ভোরের আলোর মতো; যা বেলা বাড়ার সাথে সাথে আপন আলোতে পূর্ণ মাত্রায় উদ্ভাসিত হয়। দৃশ্যত খ্রীষ্ট তাঁর বারোজন শিষ্যের ক্ষেত্রেও এই প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করলেন। তিনি তাদের সম্মান ও অনুগ্রহ দান করলেন। আর এ সবই তিনি করলেন যখন

১. তাদের বাস্তব পরীক্ষাক্ষেত্রে নামতে হচ্ছে। যদিও খ্রীষ্ট জানেন মানুষের মনে কী আছে, যদিও তিনি প্রথম থেকেই জানতেন তাদের মনে কী আছে (যোহন ৬:৭০), তবুও তিনি এই প্রক্রিয়াটি বেছে নিলেন যেন তা তাঁর মণ্ডলীর জন্য উদাহরণ হয়। মনে রাখুন, পরিচর্যা হচ্ছে একটি মহান আস্থার জায়গা, তাই এখানকার কর্মভার নেওয়ার পূর্বে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে পরীক্ষাসিদ্ধ হয়ে আসতে হবে। অর্থাৎ তাদের প্রথম করণীয়টি হচ্ছে নিজেদের প্রমাণ করা। এ বিষয়ে পুস্তকও স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দেয়, 'তাদের যাচাই করে নিতে হবে' (১ তীমথিয় ৩:১০)। তাই অবিবেচকের মতো হুট করে কিছু না ভেবেই কারও উপর হাত রেখে তাকে পরিচর্যার কোন পদে নিযুক্ত না করে প্রথমে তাকে লক্ষ্য করুন। একজন

শিক্ষানবিস, প্রার্থী বা প্রোপোসেন্ট (ফরাসি মণ্ডলীতে ব্যবহৃত টার্ম) হিসেবে তার কাজকে পর্যবেক্ষণ করুন; কারণ কারও পাপ সামনে চলে আসলে অন্যরা তা অনুসরণ করে (১ তীমথিয় ৫:২২)।

২. তারা সুসমাচার প্রচারের বৃহৎ কর্মযজ্ঞের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। অর্থাৎ খ্রীষ্ট তাদের তাঁর মহান কাজের জন্য গড়ে তুলছেন। মনে রাখুন, খ্রীষ্ট যাদের যে কাজের জন্য উপযুক্ত মনে করে আহ্বান করেন, তাদের তিনি প্রথমে তাঁর মানদণ্ডের নিরিখে, একটি পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যোগ্য করে গড়ে তোলেন, যেন তারা সেই কাজের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হতে পারে। তিনি তাদের প্রস্তুত করলেন

(১) তাঁর সাথে রেখে। মনে রাখুন, মিনিস্ট্রির জন্য সবচেয়ে ভাল প্রস্তুতি হচ্ছে খ্রীষ্টের সাথে যোগাযোগ রাখা। যারা খ্রীষ্টের সেবা করতে চায় প্রথমেই তাদের তাঁর সাথে চলতে হবে (যোহন ১২:২৬)। খ্রীষ্ট পৌলের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন; অযিহূদীদের কাছে সুসমাচার তুলে ধরে পৌলও প্রমাণ করেছিলেন যে খ্রীষ্ট তাঁর সাথে আছেন– 'ঈশ্বরের পুত্র আমার কাছে প্রকাশিত হলেন যেন আমি অযিহূদীদের মাঝে সুসমাচার প্রচার করি' (গালা ১:১৬)। সক্রিয় বিশ্বাস তথা প্রার্থনা ও ধ্যানের নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে খ্রীষ্টের সাথে সহভাগিতা অটুট থাকে এবং খ্রীষ্টের সাথে এই যোগাযোগ সম্বন্ধ থাকাটাও তার মিনিস্ট্রির কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা বলে বিবেচিত হয়।

(২) শিক্ষা দিয়ে; শিষ্যেরা খ্রীষ্টের সাথে ছিলেন শিক্ষার্থী হিসেবে। খ্রীষ্ট নিজের মতো করে নিভৃতে তাদের শিক্ষা দিতেন। সাধারণ্যে দেওয়া শিক্ষার খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে তিনি তাদের সাথে আলোচনা করতেন। তাঁর শিক্ষার যথার্থতা ও দরকারি ব্যাখ্যা তুলে ধরতে তিনি তাদের সামনে শাস্ত্র মেলে ধরতেন। শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য বোঝার জন্য তিনি তাদের মানস-চোখ খুলে দিতেন। ফলে তাদের কাছে স্বর্গ-রাজ্যের যে রহস্য তিনি প্রকাশ করেছিলেন তা তাদের কাছে সরল ও সহজবোধ্য হয়ে উঠেছিল। মনে রাখুন, যারা শিক্ষক হতে চান কিংবা এ বিষয়ে আহ্বান পেয়েছেন তাদের প্রথমেই মনোযোগী ছাত্র হতে হবে; তাদের অবশ্যই 'গ্রহণ' করতে হবে যেন তারা সেটা অন্যদের 'দিতে' পারেন। এর মধ্য দিয়ে তারা অন্যদের শিক্ষাদানের যোগ্য হয়ে উঠতে সমর্থ হবেন (২ তীমথিয় ২:২)। সুসমাচার প্রচারের দায়িত্ব লাভের আগে তারা সুসমাচারের সত্যকে গভীরভাবে অনুধাবন, আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন; ফলে তাদের ভেতর সুসমাচারের প্রতি সুদৃঢ় দায়বদ্ধতা জন্ম নিয়েছিল। সেই কারণেই শিক্ষক হিসেবে কাউকে নিযুক্ত করার আগে যাচাই করে দেখতে হবে ব্যক্তিটি যোগ্য কি না, কারণ তা না হলে সেটা ঈশ্বর এবং তাঁর মণ্ডলীকে বিদ্রূপ করার সমতুল্য হবে। বোকার হাত দিয়ে কি কেউ কোন বার্তা পৌঁছাতে চায়? (হিতোপদেশ ২৬: ৬)। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের প্রচার-কাজে পাঠানোর আগে শিক্ষা দিয়ে নিয়েছিলেন (৫: ২)। পরবর্তীতে তাদের দায়িত্ব সম্প্রসারণের সময়ও তিনি তাদের সম্পূরক নির্দেশনা দেন (প্রেরিত ১:৩)।

খ. খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করলেন:

১. তিনি তাদের তাঁর কাছে ডাকলেন (১ পদ)। এর আগে তিনি তাদের আহ্বান করেছিলেন তাঁকে অনুসরণ করার জন্য। এবার 'তিনি তাদের তাঁর কাছে ডাকলেন'; তাদের তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভের সুযোগ করে দিলেন এবং এই আশ্বাসটুকু তাদের মাঝে ছড়িয়ে দিলেন যে, তাঁর সহভাগিতা থেকে তিনি তাদের কখনও বঞ্চিত করবেন না, দূরে ঠেলে

দেবেন না; যেমনটা তারা এ-পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করে এসেছেন। শিষ্যদের খ্রীষ্ট-সান্নিধ্য লাভ তথা স্বর্গীয় অনুগ্রহের ভাগী হওয়ার এই দৃষ্টান্ত সেই পরম সত্যকেই প্রকাশ করে– যারা নিজেদের বিনম্র করে তাদের এভাবে উঁচুতে তোলা হবে। ব্যবস্থার অধীনে থাকা পুরোহিতদের ঈশ্বরের নিকটবর্তী হতে বলা হয়েছিল। ঈশ্বরের এই নৈকট্য প্রদানের আহ্বান কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রতি ছিল না। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝা যায়, তিনি চেয়েছিলেন পুরোহিতেরা তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকুক। সুসমাচার প্রচার কারীদের প্রতিও ঈশ্বরের সেই অভিন্ন আহ্বান উচ্চারিত হচ্ছে, যেহেতু খ্রীষ্টের নিকটবর্তী হতে তাদের আহ্বান করা হয়েছে। খ্রীষ্টের এই সম্মানসূচক আহ্বান শিষ্যদের মাঝে যে কর্তব্যবোধের জন্ম দেয় সেটাই তাদের পবিত্র জীবনযাপনে ব্রতী করে। খ্রীষ্টের আনুকূল্যপ্রসূত তৃপ্তি যেমন তাদের পবিত্র থাকতে উদ্বুদ্ধ করে, তেমনি ঈশ্বরের প্রতি ভয়যুক্ত শ্রদ্ধাবোধ তাদের কাজের প্রতি মনোযোগী হতে সাহায্য করে। খ্রীষ্ট চান যেন তাঁর শিষ্যরা তাদের জীবন দিয়ে তাঁর পবিত্রতার স্বরূপ প্রকাশ করে। লক্ষণীয়, খ্রীষ্টের কাছে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পেতে শিষ্যেরা স্বেচ্ছায় তাঁর কাছে গিয়েছিলেন (৫:১); কিন্তু এখন খ্রীষ্ট নিজেই তাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবার জন্য ডাকলেন। মনে রাখুন, খ্রীষ্টের অনুসারীদের মাঝে শিক্ষাদানের চেয়ে শেখার প্রতিই বেশি আন্তরিক দেখা যাবে। নিজেদের অজ্ঞতার বিষয়টি মাথায় রেখে আমরা অবশ্যই আরও বেশি করে শিক্ষা লাভের সুযোগের অনুসন্ধান করব এবং একই দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে অন্যকে শিক্ষাদানের আগে সেই সুস্পষ্ট আহ্বানের অপেক্ষায় থাকব; কারণ কেউ নিজে থেকে এ কাজের সম্মান গ্রহণ করতে পারে না।

২. তিনি তাদের তাঁর নামে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দিলেন। নিজের নামে শিষ্যদের এই ক্ষমতাদানের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে ঈশ্বরের পথে ফেরানো; অর্থাৎ মানুষকে সুসমাচারের প্রতি মনোযোগী হতে আহ্বান জানানো। প্রকৃতই তাঁর এই ক্ষমতার উৎস, কর্মব্যাপ্তি ও গন্তব্য ছিল অভিন্ন– ঈশ্বরের কাছ থেকে, ঈশ্বরের দিকে। মানুষকে পরিত্রাণের প্রতি আহ্বান জানাবার যে অধিকার তারা লাভ করেছিলেন তার নিশ্চয়তা বিধানে খ্রীষ্ট তাদের ভূত ছাড়াবার এবং সব প্রকার রোগ আরোগ্য করার ক্ষমতা দিলেন। মনে রাখুন, কর্তৃত্বপূর্ণ সব ক্ষমতাই আসে খ্রীষ্টের কাছ থেকে। কোন সীমাবদ্ধতা ছাড়াই পৃথিবীর সর্বময় ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হয়েছে। তিনি তাঁর অধীনেই তাদের সেই ক্ষমতা দিলেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর শিষ্যদের তাঁর সম্মানের ভাগী করলেন যেভাবে মোশি যিহোশূয়কে করেছিলেন। মনে রাখুন, মধ্যস্থ হিসেবে তিনি যে ক্ষমতা ধারণ করতেন, তা তাঁর শিষ্যদের মাঝে কার্যকরভাবে প্রবাহিত করার মাধ্যমে তিনি একাধারে এই ক্ষমতার অব্যর্থতা এবং এর উপর তাঁর নিরঙ্কুশ প্রভাবের বিষয়টি প্রকাশ করলেন। তাঁর এই 'ক্ষমতায়ন' প্রকৃতই শিষ্যদের তাঁর মতো চিহ্ন-কাজ করতে সমর্থ করে তুলেছিল। মনে রাখুন, সুসমাচারের লক্ষ্যই হচ্ছে শয়তানের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ এবং পৃথিবীকে আরোগ্য করা। এই প্রচারকেরা চলার পথে কাজে আসবে এরকম কোন বাহ্যিক সুবিধাদি ছাড়াই রওয়ানা হয়েছিলেন। তাদের সাথে কোন টাকা-পয়সা, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কিংবা নামের পাশে সম্মানসূচক উপাধিও ছিল না। তারা কুলীনের বেশে রওয়ানা হলেন। তাদের এরূপ গমন স্বর্গীয় সাহায্য ও ক্ষমতার প্রতি তাদের নির্ভরতাকে ফুটিয়ে তোলে, যে নির্ভরতা ধর্ম-শিক্ষকদের ক্ষেত্রে দেখা যেত না। ধর্মতত্ত্বের ওপর প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি না থাকা সত্ত্বেও কেবল এই 'নির্ভরতার' গুণেই স্বর্গীয় দায়িত্ব পালনে তারা ধর্ম-শিক্ষকদের ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।

(১) খ্রীষ্ট তাদের মন্দ-আত্মাদের ওপর ক্ষমতা দিলেন যেন তারা লোকদের মধ্য থেকে তাদের দূর করতে পারেন। মনে রাখুন, সুসমাচার প্রচারকদের ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে শয়তান ও তার রাজ্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। মন্দ আত্মা হিসেবে শয়তান লোকদের ভ্রান্ত শিক্ষা দিয়ে (প্রকাশিত বাক্য ১৬:১৩) পাপ করিয়ে যাচ্ছে (২ পিতর ২:১০)। দৃশ্যত ভ্রান্ত শিক্ষা প্রদান এবং লোকদের দিয়ে পাপ করিয়ে নেওয়া– এ দু'টি ধারায় শয়তানের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। স্বভাবতই উভয় ক্ষেত্রেই শয়তান তার বিরোধী শক্তি হিসেবে খ্রীষ্টের প্রচারকদের পায়। প্রচারকদের কাজ শয়তানের কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ ও অভিযুক্ত করে। খ্রীষ্ট তাঁর প্রচারকদের ক্ষমতা দিলেন যেন তারা মানুষের দেহ থেকে এইসব মন্দ-আত্মাকে তাড়িয়ে দিতে পারেন। তাদের এই অভিযান আসলে শয়তানের যাবতীয় কাজ তথা তার সাম্রাজ্যের পতনের বিষয়টি-ই চিত্রিত করে; যে পতনের চিত্রায়ণকে সম্পূর্ণতা দিতে ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন।

(২) তিনি তাদের সবধরনের রোগীকে সুস্থ করার ক্ষমতা দিলেন। তিনি তাদের এইসব চিহ্ন-কাজের ক্ষমতা দিলেন যেন এর মধ্য দিয়ে তাদের মতবাদ সত্যায়িত হয়। অর্থাৎ তারা যে সুসমাচার প্রচার করছেন, তা যে ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে সেই সত্যকে সমুন্নত করতেই তারা এইসব চিহ্ন-কাজ করবেন। তাদের এই চিহ্ন-কাজসমূহ সুসমাচারের উপযোগিতা, বিশ্বস্ততা, ভ্রান্তহীনতা প্রমাণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করবে; পাশাপাশি তা সুসমাচারের উপস্থাপনকে করে তুলবে সর্বার্থে বর্ণিল-বর্ণাঢ্য। বাস্তবিকই সুসমাচারের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নোর্ধ্ব, এর উদ্দেশ্য পৃথিবীর আর সব কিছুর চেয়ে মূল্যবান; আর তা হচ্ছে মানুষকে সুস্থ করা– দৈহিক ও আত্মিক উভয় দিক দিয়েই। মোশি যেসব চিহ্ন-কাজ করেছিলেন তার বেশির ভাগেরই উদ্দেশ্য ছিল ধ্বংস সাধন। বাস্তবিকই এসবই ছিল প্রদর্শনমূলক। কিন্তু খ্রীষ্টের করা চিহ্ন-কাজ এবং তাঁর শিষ্যদের একাজের জন্য নিয়োগদান– সবই ছিল সুসমাচারকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার স্বার্থে– যেন লোকেরা সেই চিহ্ন-কাজ দেখে খ্রীষ্টের দিকে ফেরে এবং তাঁকে পৃথিবীর একজন মহান পরিত্রাণকর্তা হিসেবে স্বীকার করে।

এ পর্যন্ত আমরা খ্রীষ্টের শিক্ষা শুনে এবং তাঁর করা বিভিন্ন চিহ্ন-কাজ দেখে লোকদের বিস্মিত হতে দেখি; কিন্তু শিষ্যেরা যখন তাদের সামনে খ্রীষ্টের মতো চিহ্ন-কাজ করতে শুরু করবেন তখন তারা হয়তো তাঁর ক্ষমতার ব্যাপ্তি এবং নিজেদের জীবনে তাঁর অনিবার্যতা সম্পর্কে ভাবতে আরও মনোযোগী হবে– শিষ্যদের রোগ ভাল করার ক্ষমতাদানের পেছনে এই অভিপ্রায়ও কাজ করেছে। লক্ষ্য করুন, কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই 'সব ধরনের রোগ' আরোগ্য করার ক্ষমতাদানের কথাটি এখানে কতটা দৃঢ়তার সাথে বর্ণিত হয়েছে। স্থূল অর্থে, এমন কোন রোগ ছিল না যা তাদের আরোগ্যদায়ী ক্ষমতাবহির্ভূত উপরন্তু দুরারোগ্য, চিকিৎসক-ফেরত– সব ধরনের রোগের প্রতিকারই তাদের সেই ক্ষমতার মাঝে নিহিত ছিল। মনে রাখুন, সুসমাচারের অনুগ্রহে প্রতিটি সমস্যা ও কষ্টের প্রতিষেধক হিসেবে পরিত্রাণ এবং সান্ত্বনা রয়েছে। অর্থাৎ একমাত্র সুসমাচারই মানুষের ভেতরের রোগকে সারিয়ে তুলতে পারে। এই আত্মিক রোগই হচ্ছে প্রকৃত রোগ। আত্মিক দেহের কোন রোগই চিরস্থায়ী কিংবা অনিরাময়যোগ্য নয়। প্রয়োজন কেবল খ্রীষ্টের ক্ষমতার স্পর্শ। তাতেই আত্মার রোগ সেরে যাবে। তাই কেউ যেন একথা না বলেন যে, তার সামনে কোন আশা নেই কিংবা তার হতাশা সমুদ্রসম; ফলে তা থেকে পরিত্রাণ পাবার কোন পথ তিনি

খুঁজে পাচ্ছেন না।

গ. খ্রীষ্ট যাদের 'প্রেরিত' পদ দিলেন এখানে তাদের বিষয়ে বলা হয়েছে। আভিধানিকভাবে 'প্রেরিত' শব্দটির মানে হচ্ছে 'দূত'– অর্থাৎ যাকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়। খ্রীষ্ট তাঁর দূত হিসেবে যাদের 'বিশেষ দায়িত্ব' দিলেন এবং সেই দায়িত্ব পালনের জন্য ক্ষমতায়ন করলেন তাদের-ই আমরা 'প্রেরিত' পরিচয়ে পাই। কাজের আঙ্গিক বিবেচনায় প্রেরিতদের সাথে স্বর্গদূতদের চমৎকার সাযুজ্য রয়েছে; কারণ প্রেরিত কিংবা স্বর্গদূত– উভয়কেই বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে, প্রতিনিধি করে পাঠানো হয়। সেই অর্থে সব বিশ্বস্ত প্রচারকারীই খ্রীষ্টের কাছ থেকে বিশেষ দায়িত্ব লাভ করেছেন। তবে যাদের তিনি প্রথমে পাঠিয়েছিলেন তারা তাঁর 'শিষ্য' পরিচয়ে বিশেষ সম্মানের ভাগী হয়েছিলেন। এই সম্মান খ্রীষ্ট-ই তাদের দিয়েছিলেন– 'তিনিই কিছু লোককে শিষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছেন' (ইফিষীয় ৪:১১)। গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব একই সাথে ব্যক্তিকে সম্মানিত ও দায়বদ্ধ করে তোলে। অর্থাৎ যত বড় দায়িত্ব তত বেশি জবাবদিহি ও দায়বদ্ধতা। সেই অর্থে যারা খ্রীষ্টের 'প্রেরিত' হবার সম্মান লাভ করেছিলেন তাদের কাজ ছিল খুবই কঠিন; কারণ তখন তাদের দপ্তর কেবল গড়ে উঠছিল। স্থূল অর্থে, মণ্ডলীর প্রাথমিক অবস্থায় খ্রীষ্টের রাজ্যের মন্ত্রিত্ব প্রেরিতদের চরম ব্যস্ততার মাঝে বেঁধে ফেলেছিল। খ্রীষ্ট নিজেও এরকম কর্মব্যস্ত সময় কাটিয়েছিলেন। ফলে প্রেরিতদের সামনে তিনি নিজেকে আদর্শ ও যোগ্য 'প্রেরিত' হিসেবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। উল্লেখ্য, খ্রীষ্টও নিজেকে 'প্রেরিত' বলে দাবি করেছিলেন। পিতা যেভাবে তাঁকে পাঠিয়েছেন (ইব্রীয় ৩:১), সেভাবে তিনিও তাদের পাঠালেন (যোহন ২০:২১)। কাজের আঙ্গিক বিবেচনায় প্রেরিত ও ভাববাদীর মাঝে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়; কারণ ভাববাদীদের অভিহিত করা হয় ঈশ্বরের বার্তাবাহক হিসেবে।

১. প্রেরিতেরা ছিলেন বারো জন। মূলত এই 'বারো' সংখ্যাটি ইস্রায়েল জাতির বারো বংশ তথা যাকোবের বারোজন ছেলের মধ্য দিয়ে যে বারোটি বংশ জন্ম নিয়েছিল– সেকথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সুসমাচারের মণ্ডলী তাই নিশ্চিতভাবেই ঈশ্বরের 'ইস্রায়ে' হবে; যার আত্মিক বংশপিতা হবেন প্রেরিতেরা। অবিশ্বস্ততা ও শারীরিক কামনা-বাসনার কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে ইস্রায়েল পূর্ণমাত্রায় জগতকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছিল; সেজন্যে তাকে প্রত্যাখ্যান করে ঈশ্বর এই বারোজনকে দিয়ে আরেকটি ইস্রায়েল গড়ে তুলবার পরিকল্পনা করলেন (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রকৃত ইসরাইলে যোগ দিতে প্রথমে যিহূদীদেরই আহ্বান করা হয়েছিল)। খ্রীষ্টের কাছ থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতার বলে তারাই ইস্রায়েলের বারোটি বংশের বিচার করবেন (লূক ২২:৩০)। এরাই হচ্ছে সেই বারোটি তারা যাদের দিয়ে মণ্ডলীর রাজমুকুট গাঁথা হয়েছে (প্রকাশিত বাক্য ১২:১)। নতুন যিরূশালেমের ভিত্তিও এঁরাই (প্রকাশিত বাক্য ২১:১২, ১৪)। এ ছাড়া হারোণের বুক-ঢাকনের বারোটি মূল্যবান পাথর, প্রদর্শনরুটির টেবিলে রাখা বারো টুকরি রুটি এবং এলিমের ধারের বারোটি জলের কূপ-ও এদের প্রতি নির্দেশ করে। বস্তুত, সেই বিখ্যাত বিচারক-প্যানেলটি এদেরই সমন্বয়ে গঠিত (একে সম্পূর্ণতা দিতে পরে পৌল এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন) যারা রাজাদের রাজা যীশু খ্রীষ্টের সাথে মানুষের যোগাযোগ-সম্বন্ধের প্রকৃতি নিয়ে তদন্ত করবেন। এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই, খ্রীষ্ট তাদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করলেন। শিষ্যেরা এমন একজনের কাছ থেকে সেই দায়িত্ব, ক্ষমতা গ্রহণ করলেন যিনি সবকিছুর বিচার করতে সক্ষম।

২. এখানে তাদের নাম নথিবদ্ধ হয়েছে, যা প্রকৃতই তাদের সম্মানিত করেছে। তবে

এটাই তাদের উদযাপন-আনন্দের একমাত্র উপলক্ষ নয়, কারণ তাদের আনন্দকে পূর্ণমাত্রায় পৌঁছে দিতে ইতোমধ্যে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটে গেছে– পৃথিবীর মহান ও সম্মানিত নামগুলো যেখানে ধুলায় অস্তিত্ব হারায়, সেখানে 'তাদের নাম স্বর্গে লেখা হয়েছে' (লূক ১০:২০)। লক্ষ্য করুন,

(১) খ্রীষ্টের বারোজন প্রেরিতের কয়েকজনের বিষয়ে বিশেষ জানতে পারা যায় না। শাস্ত্রের তাদের সম্পর্কে বিশদ লেখা নেই, কেবল তাদের নামটুকু ছাড়া; যেমন: বর্থলময়, কনানীয় শিমোন। তবে একারণে তাদের প্রেরিতীয় ভূমিকা নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। সন্দেহাতীতভাবেই তারা ছিলেন খ্রীষ্ট এবং তাঁর মণ্ডলীর বিশ্বস্ত সেবাকারী। মনে রাখুন, খ্রীষ্টের সব সেবাকারীই যে খ্যাতি অর্জন করবেন তা নয়। এমনকি খ্রীষ্টের রাজ্যে তাদের অবদানও প্রয়োজনীয় প্রশংসা কুড়াতে ব্যর্থ হতে পারে। এতে হতাশ হবার কিছু নেই, কারণ এটাই শেষ নয়।

(২) তাদের নাম এখানে এসেছে জোড়ায় জোড়ায়; কারণ শিষ্যদের প্রথম প্রচারযাত্রায় খ্রীষ্ট তাদের দু'জন দু'জন করে পাঠিয়েছিলেন। কর্মক্ষেত্রে একক প্রচেষ্টার চেয়ে যৌথ ও সমন্বিত উদ্যোগ অধিক কার্যকর– এই বিবেচনা থেকেই খ্রীষ্ট হয়তো শিষ্যদের কাউকে একা না পাঠিয়ে দু'জন করে পাঠিয়েছিলেন। এর ফলে, তারা সহজেই একে অন্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতে এবং উভয়ে যূথবদ্ধভাবে খ্রীষ্টের জন্য অধিক কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন। যেমন- কেউ কোন কাজের কথা ভুলে গেলে সহজেই তা আরেকজন স্মরণ করিয়ে দিতেন। সাক্ষী হিসেবে যেহেতু দু'জনের মতামত গুরুত্ব পায় সেহেতু সুসমাচারের ভ্রান্তহীনতা প্রমাণে খ্রীষ্ট হয়তো একজন সাক্ষীর ওপর ভরসা করতে চান নি। লক্ষণীয়, এর মাঝে তিনটি দলের সদস্য ছিলেন তিন 'ভ্রাতৃদ্বয়'– পিতর ও আন্দ্রিয়, যাকোব ও যোহন, যাকোব ও থদ্দেয় (লেব্বিয়াস)। মনে রাখুন, বন্ধুত্ব ও সহভাগিতা সম্পর্ক ধরে রাখায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং তা ধর্মীয় কাজে ব্রতী-উদ্যমী হতে সাহায্য করে। জাগতিক ভ্রাতৃপরিচয় যখন আত্মিক অর্থেও অটুট থাকে তখন তা সীমাহীন উৎসাহের ব্যাপার বলে বিবেচিত হয়; কারণ পরস্পরের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে উৎসারিত এই যূথবদ্ধতা একে অন্যকে সহায়তা দিয়ে সমর্থ করে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

(৩) পিতরের নামটি এখানে প্রথমে এসেছে কারণ তাঁকে প্রথমে আহ্বান করা হয়েছিল কিংবা এই কারণে যে, তিনি তাদের মাঝে অগ্রসর শিষ্য ছিলেন। বিভিন্ন উপলক্ষে বাকিদের চেয়ে তাঁকেই বেশি কথা বলতে দেখা যায়। আরেকটি কারণ হতে পারে যে, তিনি খৎনা-করানোদের প্রেরিত হতে যাচ্ছেন। কিন্তু তা তাঁকে বাকিদের উপর কোন কর্তৃত্ব এনে দেয় নি; এমনকি একে উপজীব্য করে পবিত্র মহাবিদ্যালয়ের বাকী সদস্যদের চেয়ে তিনি বাড়তি সুবিধা দাবি করেন নি; তাকে উচ্চম্মন্য হতেও দেখা যায় না। খ্রীষ্টের কাছের শিষ্য, যাঁর নাম প্রথমেই উঠে আসে তিনি সেই সুবিধা নেননি।

(৪) মথিকে (এই খণ্ডের লেখক) এখানে থোমার সাথে যোগ করা হয়েছে (৩ পদ)। কিন্তু মার্ক এবং লূকের বর্ণনার সাথে এখানে একটি ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় (মার্ক ৩:১৮; লূক ৬:১৫)। সেখানে মথির নামটি আগে এসেছে এবং নামের বিন্যাস দেখে মনে হয় যে, মথিকে থোমার আগে কর্মভার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে মথির বর্ণনায় থোমার নামটি আগে এসেছে। মনে রাখুন, খ্রীষ্টের অনুসারীরা একে অন্যকে সম্মানিত করতে প্রস্তুত থাকেন। মার্ক ও লূকের লেখায় তাঁকে কেবল 'মথি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু মথি

এখানে নিজের নামের আগে 'কর আদায়কারী' কথাটি লিখলেন। তার এই অভিব্যক্তি মূলত তাঁর বিনম্রতাকেই প্রকাশ করছে। মথি এখানে তাঁর নিজের বিষয়ে এই মত উল্লেখ করে যেন জানাতে চাইলেন– খ্রীষ্ট তাঁকে কর আদায়ের মতো একটি অসম্মানজনক পেশা থেকে তাঁর প্রেরিত হতে আহ্বান করেছিলেন। মনে রাখুন, যারা সেই পাথর অর্থাৎ খ্রীষ্টের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাসত্বের লজ্জা ফেলে সম্মানের দিকে অগ্রসর হয়েছেন তাদের মাঝে মাঝেই স্মরণ করা উচিত যে, খ্রীষ্টের আহ্বান পাবার আগে তারা কেমন ছিলেন। এর প্রয়োজন রয়েছে, কারণ তা তাদের বিনম্র করে তোলে এবং এর মধ্য দিয়ে আরও বেশি স্বর্গীয় অনুগ্রহ লাভের পথ করে দেয়। ফলে এই বিনম্রতা শেষ পর্যন্ত তাদের পরম গৌরব এনে দেয়। মনে রাখুন, প্রেরিত মথি ছিলেন একজন কর-আদায়কারী।

(৫) মথি এখানে শিমোনকে কনানীয় শিমোন (যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যদের সবাই যেহেতু যিহূদী ছিলেন তাই শিমোন কনানের আদি আধিবাসী নন; বরং তিনি ছিলেন গালীলের কান্না গ্রামের অধিবাসী। তার জন্মও সম্ভবত এখানেই) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। হতে পারে এই অভিধা তিনি পেয়েছেন তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য কিংবা কোন মৌলবাদী সংগঠনের (জিলট) সাথে জড়িত থাকার কারণে। যাহোক, তাঁর এই অভিধাটি মূলত তাকে চিহ্নিত করার জন্যই প্রয়োগ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রভুর শিষ্যদের মাঝে তাঁকে নিয়ে দু'জন শিমোন ছিলেন (অপরজন শিমোন পিতর)।

(৬) সব জায়গায়ই যিহূদা ইষ্কারিয়োতের নামটি শেষে এসেছে। নিঃসন্দেহে খ্রীষ্ট তাঁর এই অভাগা শিষ্যের ব্যাপারে অবগত ছিলেন। তিনি জানতেন যে, সে তাঁর সাথে প্রতারণা করবে। তারপরও তিনি তাকে তাঁর প্রেরিত করে নিতে কুণ্ঠিত হন নি। এই কাজের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর মণ্ডলীর জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন যেন এরকম ঘটনায় কেউ নিরুৎসাহিত হয়ে না পড়েন। মণ্ডলীর উপর এই ধরনের আঘাত মোটেও অপ্রত্যাশিত নয়, কারণ ভাল সমাজ থেকেও জঘন্য কুৎসা রটতে পারে। সেই কারণেই কারও অসততা, প্রতারণার ঘটনা যেন মণ্ডলীর কাছে অপ্রত্যাশিত বিস্ময় হয়ে না আসে। বাস্তবিকই এরকম কলঙ্কের দাগ আমাদের দয়ার উৎসবকে ম্লান করে দেয়। গমের মধ্যে পোকা কিংবা ভেড়ার পালে নেকড়ে থাকলে যা হয় ব্যাপারটা অনেকটা তেমনই। কিন্তু সেই আবিষ্কার এবং পৃথক হবার দিন আসছে যেখানে ভণ্ডদের মুখোশ খুলে যাবে এবং তাদের নিচে ফেলে দেওয়া হবে। যেহেতু যিহূদার মন্দতা তখনও পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি অর্থাৎ তা সুপ্ত অবস্থায় ছিল সেহেতু তার প্রতি বাকি প্রেরিতদের আচরণ স্বাভাবিকই ছিল এবং তা যিহূদাকে বারোজন থেকে পৃথক করে দেয় নি। তাকে তাদের রোষানলে কখনও পড়তে হয় নি; খ্রীষ্ট কেন তাকে 'প্রেরিত' পদ দিলেন তা নিয়ে শিষ্যদের কেউ প্রশ্ন তোলেনি।

মথি ১০:৫-১৫

খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের ওপর দায়িত্বভার অর্পণের পর কী কী নির্দেশনা দিলেন এখানে আমরা সে বিষয়ে দেখি। তাদের সেই দায়িত্বভার টানা বক্তৃতার মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল নাকি বিভিন্ন সময়ে কয়েক দফায় আলোচনার মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল– সেটা এখানে প্রতিপাদ্য নয়; কারণ এখানে মূল বিষয় হচ্ছে 'তিনি তাদের আদেশ দিলেন'। যাকোব তাঁর ছেলেদের যে আশীর্বাদ করেছিলেন তাকে বলা হয় তাদের প্রতি তাঁর আদেশ। খ্রীষ্টও

এখানে তাঁর শিষ্যদের এসব আদেশ দেওয়ার মাধ্যমে তাদের আশীর্বাদযুক্ত করলেন। লক্ষ্য করুন,

ক. কাদের মাঝে তিনি তাঁর শিষ্যদের পাঠাচ্ছেন। এই প্রতিনিধিদের নির্দেশ দেওয়া হল তারা কোন কোন এলাকায় যেতে পারবেন।

১. অযিহূদী কিংবা শমরীয়দের কোন এলাকায় নয়। তাদের ওপর যত প্রলোভনই আসুক না কেন তারা অবশ্যই অযিহূদীদের পথে যাবে না কিংবা ইস্রায়েলের ভূমির বাইরে কোন রাস্তা ধরে যাবে না। যতক্ষণ না যিহূদীরা সুসমাচার প্রত্যাখ্যান করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অযিহূদীদের কাছে সুসমাচার নিয়ে যাওয়া চলবে না। সেভাবে শমরীয়দের কাছেও (এরা হচ্ছে মিশ্র জাতির পরবর্তী প্রজন্ম– যাদের আসেরিয়ার রাজা শমরীয়ায় স্থাপন করেছিলেন। দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান ছিল যিহূদিয়া এবং গালীলের মাঝখানে; যদিও তারা শমরীয়দের রাস্তা এড়িয়ে অগ্রসর হতে পারবে না তবুও তারা যেন তাদের কোন শহরে বা গ্রামে প্রবেশ না করে) তারা সুসমাচার নিয়ে যাবেন না। খ্রীষ্ট নিজেকে অযিহূদী কিংবা শমরীয়দের জন্য নন বলেছেন এবং সেই কারণেই তাঁর প্রেরিতেরা তাদের কাছে প্রচার করবে না। যদি কোন এলাকা থেকে সুসমাচার লুকানো থাকে তবে খ্রীষ্টও নিজেকে সেই এলাকা থেকে লুকিয়ে রাখেন। তবে এই আত্মনিয়ন্ত্রণ কেবল তাদের প্রথম মিশনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল; কারণ পরবর্তীতে তাদেরকে সমগ্র পৃথিবীতে সব জাতির লোকদের কাছে প্রচার করবার ও শিক্ষা দেবার জন্য পাঠানো হয়েছিল।

২. কিন্তু তাদেরকে পাঠানো হয়েছিল ইস্রায়েলের হারানো মেষদের কাছে। তাদের কাছেই খ্রীষ্টকে পাঠানো হয়েছিল; খ্রীষ্টের মিনিস্ট্রি ছিল তাদের কাছে পরিত্রাণের সুখবর পৌঁছে দেওয়া (১৫:২৪); কারণ ঈশ্বরের কথার সত্যতা প্রমাণে খ্রীষ্ট খৎনা-করানো যিহূদীদের সেবাকারী হয়েছিলেন (রোমীয় ১৫:৮) এবং সেই কারণেই তিনি তাঁর প্রেরিতদের যারা তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেন তাদের সেখানে যেতে বারণ করেছিলেন। পরিত্রাণের সুখবর প্রথমে যাবে যিহূদীদের কাছে (প্রেরিত ৩:২৬)। মনে রাখুন, ইস্রায়েলের জন্য খ্রীষ্টের একটি সুনির্দিষ্ট এবং মমতাপূর্ণ উদ্বেগ ছিল; ঈশ্বরের বেছে নেবার দিক থেকে পূর্বপুরুষদের জন্য তারা ঈশ্বরের ভালবাসার পাত্র ছিল (রোমীয় ১১:২৮)। হারানো ভেড়ার প্রতি যেভাবে রাখাল সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়, সেভাবে তিনিও তাদের প্রতি তাকিয়েছিলেন; কারণ তিনি ছিলেন তাদের জন্য ঈশ্বর-প্রেরিত একজন রাখাল, যিনি তাদের ভুল ও পাপের বিপথ-শৃঙ্খল থেকে বের করে এনে জমা করতে চেয়েছিলেন; সেইপথ থেকে যা তাদের বিপথে ছাইয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল এবং যার মধ্য থেকে বের করে আনা না হলে তারা চিরকাল বিপথেই ঘুরে বেড়াবে (দেখুন যিরমিয় ২:৬)। অযিহূদীরাও অবশ্য হারানো ভেড়া ছিল (১ পিতর ২:২৫)। তবে তাদের সম্পর্কে খ্রীষ্টের এমনটা বলার কারণ ছিল যেন শিষ্যেরা তাদের কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করেন। ইস্রায়েলের সন্তানদের কাছে তারা যে মিশন নিয়ে যাচ্ছেন তার প্রতি তারা যেন আন্তরিক ও যত্নবান থাকেন। পাশাপাশি যাদের তারা সুসমাচার দেবেন সেই ইস্রায়েল জাতির লোকদের সাহায্য করতে উদ্যোগী হন।

খ. যে বিষয়ে প্রচার করার জন্য তাদের পাঠানো হয়েছিল। তিনি তাদের একটি সুনির্দিষ্ট বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। 'তোমরা যেতে যেতে এইকথা প্রচার কোরো' (৭ পদ) বলে তিনি সেই বার্তাটি প্রকাশ করলেন। তাদেরকে পাঠানো হয়েছিল ভ্রাম্যমান প্রচারক

হিসেবে; ফলে তারা যেখানে যাবেন সেখানেই সুসমাচারের শুরুর কথাটি ঘোষণা করবেন– 'স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট'। তার মানে এই নয় যে, এই কথার বাইরে তাঁরা আর কিছুই বলেন নি, কিন্তু এটাই ছিল তাদের প্রচারের সারকথা। এই বিষয়ের উপরে তাঁরা তাঁদের প্রচারকে বিস্তৃত করতেন যেন লোকে জানতে পায় যে, খ্রীষ্টের রাজ্য, যিনি স্বর্গ থেকে নেমে আসা প্রভু, তিনি এখন পূর্ববর্তী শাস্ত্রে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর কাজ শুরু করেছেন। আর তা শুরু হয়েছে পাপে পূর্ণ জীবনের জন্য মানুষের অনুতাপের মাধ্যমে, যার ফলে স্বর্গে প্রবেশের সুযোগ লাভ করা সম্ভবপর হয়। মার্ক ৬:১২ পদে এ বিষয়ে বলা হয়েছে, 'তখন শিষ্যরা গিয়ে প্রচার করলেন যেন লোকেরা তাদের পাপের জন্য অনুতাপ করে, মন পরিবর্তন করে মন ফিরায়'; যা ছিল এই মতবাদের সঠিক ব্যবহার ও প্রয়োগ; যে মতবাদ স্বর্গ-রাজ্যের নিকটবর্তী হওয়ার কথা প্রকাশ করে। নিশ্চিতভাবে সেই কারণেই লোকেরা খ্রীষ্টের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আরও বেশি করে শোনা ও জানার আগ্রহ প্রকাশ করবে এবং অবশ্যই তাঁর মতবাদ গ্রহণে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং তাঁর জোয়ালে কাঁধ দিতে আগ্রহী হবে।

এই প্রচার ছিল ভোরের আলোর মতো, যা উদিত সূর্যের কথা ঘোষণা করে। তাদের এই প্রচারের সাথে যোনার প্রচারের কী 'অসম্ভব' পার্থক্য! যেখানে যোনার প্রচারের বিষয়বস্তু ছিল 'ধ্বংসের দিন এই এল বলে' (যোনা ৩:৪) সেখানে খ্রীষ্টের শিষ্যরা পুরো ভিন্নতর এক বার্তা লোকদের কাছে পৌঁছে দিলেন– 'স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট,' 'পরিত্রাণ কাছে এসে গেছে,' 'যারা তাঁকে ভয় করে সত্যিই তাঁর উদ্ধার করবার সময় তাদের কাছে এসে গেছে' (গীত ৮৫:৯, ১০), আর সেই উদ্ধারের কথাই শিষ্যরা প্রচার করলেন– 'স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট'। এতে রাজার ব্যক্তিগত উপস্থিতি খুব বেশি ছিল না, উপরন্তু এর উপর অন্ধ ভালবাসারও কোন প্রভাব ছিল না। কিন্তু একটি আত্মিক রাজ্য যা স্থাপিত হতে চলেছে, তা যখন তাঁর শারীরিক উপস্থিতি অদৃশ্য হল তখনই মানুষের হৃদয়ে স্থাপিত হল।

এখন, এটা ছিল সেই একই বাণী– যা বাপ্তিস্মদাতা যোহন এবং যীশু খ্রীষ্ট উভয়েই এর আগে প্রচার করেছেন। মনে রাখুন, মানুষের কাছে সত্যিকারের ভাল শিক্ষা বারংবার পৌঁছে দিতে হবে এবং এর ফলে যারা এর আগেও তা শুনেছে এবং যাদের কাছে প্রচার করা হয়েছে তারা হয়তো নতুন করে সেই প্রচার শুনে আলোড়িত হতে পারে, এর পাশাপাশি যারা কখনও শোনেনি তারা তো আছেই। খ্রীষ্ট, সুসমাচারে, গতকাল যেমন ছিলেন, আজও তেমনই আছেন এবং চিরকাল তেমনই থাকবেন (ইব্রীয় ১৩:৮)। এরপরে যখন পবিত্র আত্মা নিশ্চিতভাবেই সবার উপর আসলেন এবং খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হল, তখন সেই স্বর্গ-রাজ্য এল, যার কথা এখানে বলা হয়েছে 'সন্নিকট'। কিন্তু সেই স্বর্গ-রাজ্য এখন পর্যন্ত আমাদের প্রচারের বিষয়বস্তু হয়ে আছে, 'আজ পরিত্রাণের দিন'; আমরা অবশ্যই লোকদের বলব যে, তাদের জন্য পরিত্রাণ এসেছে এবং তাদের সামনে এর সুযোগ এবং তা গ্রহণের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে আমরা তাদের তা গ্রহণ করতে আহ্বান জানাব। গৌরবের রাজ্য যে ঘনিয়ে আসছে তা আমরা সন্নিকট বলে উচ্চারণ করতে পারি এবং তা বলে লোকদের কাছে পরিত্রাণের জন্য তাদের বিবেচনাকে ত্বরান্বিত ও একাগ্র করে তুলতে পারি।

গ. তিনি তাদের চিহ্ন-কাজের যে ক্ষমতা দিলেন তা এখানে বিবৃত হয়েছে (৮ পদ)। উল্লেখ্য, তাঁদের করা চিহ্ন-কাজ তাঁদের মতবাদের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিল। খ্রীষ্ট যখন তাঁর শিষ্যদের তাঁরই মতো অভিন্ন মতবাদ প্রচার করতে পাঠালেন, তখন তিনি মতবাদের

ভ্রান্তহীনতা প্রমাণে তাদের ক্ষমতায়ন করলেন। তিনি তাদের সেই অভিন্ন স্বর্গীয় সিলমোহর দ্বারা চিহ্ন-কাজের ক্ষমতা দিলেন– যা কখনও একটি মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। যেহেতু স্বর্গ-রাজ্য এখন এসে গেছে সেহেতু তার প্রামাণিকতার স্বার্থে কোন চিহ্ন-কাজ করার প্রয়োজন নেই, কারণ যে ভিত্তি আগেই গাঁথা হয়ে গেছে তার উপর পুনরায় ভিত্তি গাঁথার কোন অর্থ নেই। এখন পরিত্রাণ-প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়েছে এবং খ্রীষ্টের মতবাদ নিজেকে সত্যায়িত করার জন্য যথেষ্ট; ফলে খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যেরা যেসব চিহ্ন-কাজ করেছিলেন তা দেখার অভিপ্রায় পোষণ করাটা ঈশ্বরকে পরীক্ষা করার সমতুল্য– 'তারা চিহ্ন দেখতে চায়'। তাদের এখানে নির্দেশনা দেওয়া হল,

১. তাঁরা যেন তাদের প্রাপ্ত ক্ষমতা ভাল কাজে ব্যবহার করেন; কোন মতেই যেন তা অনর্থক ব্যবহৃত না হয়, অনেকটা গিয়ে পাহাড়কে স্থানচ্যুত করার মতো অথবা স্বর্গ থেকে যেন তারা আগুন নেমে আসতে আহ্বান না জানান। তার স্থলে তাঁরা অসুস্থদের সুস্থ করবেন, নাপবিত্র কু'রোগীদের পবিত্র পবিত্র করবেন। তাঁদেরকে বাইরে পাঠানো হল লোকদের জন্য আশীর্বাদ হিসেবে, যেন তাঁরা তাঁদের ভালবাসা, খাঁটিত্ব এবং বুদ্ধিদীপ্ততায় সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষকে পরিত্রাণের সান্নিধ্য দান করতে পারেন। সেই সাথে তারা যেন সেই স্বর্গ রাজ্য– যা তারা স্থাপন করতে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন তার বিষয়ে প্রচার করেন। এর দ্বারা দেখা যাবে যে, তাঁরা সেই ঈশ্বরের সেবাকারী, যিনি ভাল এবং সর্বদা ভাল কাজই করেন এবং যাঁর সব কাজের মধ্য দিয়ে একটি কথাই ধ্বনিত হয়– ক্ষমা। তাঁরা যে মতবাদ প্রচার করছেন তার উদ্দেশ্য দ্বারাও তাঁরা যে ঈশ্বরের সেবাকারী তা প্রকাশিত হয়; কারণ তা ছিল অসুস্থ আত্মাকে আরোগ্য করার নিমিত্তে এবং যারা পাপে মৃত তাদের উত্থানের নিমিত্তে; এবং সেই কারণে হতে পারে বলা হয়েছে যে, তারা মৃতদের উত্থিত করেছেন; কারণ যদিও আমরা খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের আগে তাদের কাউকে জীবিত করে তোলার বিষয়ে পড়ি না তবুও তারা অনেককে আত্মিক জীবনদানে সক্রিয়-সমর্থ ছিলেন।

২. বিনামূল্যে সব ভাল কাজ করতে বলা হল, 'বিনামূল্যে পেয়েছ, বিনামূল্যেই দিয়ো।' যাদের সব রোগ ভাল করার ক্ষমতা ছিল, তাদের নিজেকে ধনী করে তোলার সুযোগও ছিল; নিশ্চিত সুস্থতা লাভের জন্য কেউ কি কখনও টাকার বিষয়ে চিন্তা করে? সেই কারণেই এখানে খ্রীষ্ট তাদের সতর্ক করে দিলেন যেন যে স্বর্গীয় ক্ষমতা তাদের দেওয়া হয়েছে– যা কিনা পরিত্রাণের ঘোষণাকে জোরালো করার জন্য তাদের দেওয়া হয়েছে– তা তাঁরা জাগতিক কোন মুনাফার সাথে বিনিময় না করেন। তাঁরা অবশ্যই বিনামূল্যে আরোগ্য করবে এবং তাঁদের এই বিনামূল্যের কাজ লোকদের অভিমুখে সুসমাচারের রাজ্যের স্বরূপ-প্রকৃতি তুলে ধরবে– যা কেবল অনুগ্রহেই প্রাপ্ত নয় উপরন্তু একেবারে বিনামূল্যে, 'বিনামূল্যে তাঁর অনুগ্রহে' (রোমীয় ৩:২৪); 'এসো, বিনা পয়সায়, বিনামূল্যে আঙ্গুর রস আর দুধ কেনো' (যিশাইয় ৫৫:১)। সেই কারণটি হচ্ছে, 'কারণ তোমরা তা বিনামূল্যে পেয়েছ'। অসুস্থদের আরোগ্য করতে তাঁরা যে ক্ষমতা পেয়েছেন তা পেতে তাঁদের কোন খরচ করতে হয় নি আর সেই কারণেই তাঁরা অবশ্যই তাঁদের এই কাজের জন্য জাগতিক কোন লাভের প্রত্যাশা করবেন না। জাদুকর শিমোনের মনে যদি বিনামূল্যে অনুরূপ আরোগ্য ও চিহ্ন-কাজ করবার ইচ্ছে থাকতো, তবে সে পবিত্র আত্মার উদ্দেশে উপহার হিসেবে টাকা এনে রাখতো না; তার মনোবৃত্তি ছিল ব্যবসায়িক– যা তার কাজে প্রতিফলিত হয়েছিল (প্রেরিত

৮:১৮)। মনে রাখুন, খ্রীষ্ট যে আমাদের জন্য বিনামূল্যে ভাল কাজ করেছেন সেই বিবেচনা থেকেই আমাদেরও অন্যদের প্রতি ভাল কাজ করতে হবে– পুরোপুরি বিনামূল্যে।

ঘ. এখন খ্রীষ্ট তাদের যে নির্দেশনা দিলেন তা নিশ্চিতভাবেই তাদের এই আসন্ন যাত্রার জন্য দেওয়া হয়েছিল; বিষয়টা বোঝার জন্য আমরা একজন রাষ্ট্রদূতের কথা ভাবতে পারি যাকে বাইরের কোন দেশে নিজ অ্যাম্বেসির দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হচ্ছে। সেই অনুযায়ী,

১. তারা কীভাবে চলবেন– তা তারা নিজেরা ঠিক করবেন না, বরং কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মেনেই তারা চলবেন (৯, ১০ পদ)– 'পথে কোন সোনা বা রুপা নিয়ো না।' যেহেতু তারা কোন ভূসম্পত্তি গড়তে যাচ্ছেন না, সেহেতু তারা এ কাজে তাদের যে সীমিত সম্বল রয়েছে তা ব্যয় করবে না। বর্তমান মিশনে তা সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হল এবং খ্রীষ্ট তাদের শিক্ষা দেবেন,

(১) মানবীয় বিচক্ষণতার সঞ্চালনে কাজ করতে। তারা এখন সংক্ষিপ্ত একটি ভ্রমণে যাচ্ছেন এবং শীঘ্রই তারা তাদের প্রভুর কাছে ফিরে আসবেন, তাদের হেডকোয়ার্টারে পুনরায় ফিরে এসে মিলিত হবেন; আর সেই কারণেই কেন তারা এই অকারণ-দুর্ভাবনা নিজের উপর চাপাবেন! যেখানে তাদের তা ব্যবহারের কোন উপলক্ষও থাকছে না সেখানে কেন তারা বৈষয়িক হবেন?

(২) তারা চলবেন স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের প্রতি নির্ভর করে। তারা সঠিক জীবনযাপনের শিক্ষা লাভ করেছিলেন, 'কীভাবে বেঁচে থাকবে সে বিষয়ে চিন্তা কোরো না' (৬:২৫ প্রভৃতি)। মনে রাখুন, যারা খ্রীষ্টের বার্তা নিয়ে যায়, তারা অন্যদের যা প্রয়োজন অর্থাৎ মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যা দরকার– তা পাবেন, কারণ তারা তাঁর উপর নিজেদের খাবারের জন্য নির্ভর করেন। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যারা তাঁর জন্য কাজ করেন তিনি তাদের অভাবে রাখবেন না। তিনি যাদের নিয়োগ দেন, তারা যেমন বিশেষ সুরক্ষা লাভ করে তেমনি বিশেষ নির্দেশনারও অধীন হয়। খ্রীষ্টের আহূত সেবাকারীরা উপচে পড়বার মতো করে খাবার পায়; যখন আমরা ঈশ্বরের সম্মুখে বিশ্বস্ততার সাথে দাঁড়াই এবং আমাদের কর্তব্য পালন করি এবং যত্নের সাথে আমাদের কাজগুলো সফলভাবে সম্পন্ন করি, তখন আমরা আমাদের যত্ন নেবার জন্য ঈশ্বরকে আহ্বান করি; যিনি যিহোবা যিরি। তাই ঈশ্বরকে নিজেদের প্রয়োজন যুগিয়ে দেবার ভার দিন এবং তিনিই আমাদের হয়ে সেসবের জন্য চিন্তা করবেন।

২. তারা প্রত্যাশা করবে যে, যাদের কাছে তাদের পাঠানো হচ্ছে তারাই তাদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করবে (১০ পদ)। যে কাজ করে, সে খাবার পায়। তারা অবশ্যই আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে খাবার পাবার প্রত্যাশা করবে না, যেভাবে এলিয় পেয়েছিলেন। কিন্তু সেজন্য তারা অবশ্যই ঈশ্বরের উপর নির্ভর করবে যে, তিনি সেই লোকদের– যাদের কাছে তারা যাচ্ছেন– তাদের এ কাজে ব্যবহার করবেন। তিনি তাদের প্রতি লোকদের অন্তর নরম করবেন, দয়ার্দ্র করবেন এবং তারাই তাদের প্রয়োজনাদি মেটাবে। যদিও যারা ভিন্ন উপায়ে সেবা করবে তারা অবশ্যই সেই উপায়ে ধনী হবার প্রত্যাশা করবে না, তবুও তারা স্বচ্ছন্দে জীবনযাপনের প্রত্যাশা করবে (১ করিন্থীয় ৯:১৩, ১৪)। এটা তাদের জন্য খাটে যে, তারা তাদের কাজের মধ্য দিয়েই জীবনধারণ করবে। পরিচর্যাকারীরা কাজের লোক এবং তাদের নিশ্চিতভাবেই তা হতে হবে, তাদের পরিশ্রমী হতে হবে। তাই তারা কাজ করার মধ্য দিয়েই তাদের খাবারের সন্ধান পাবে; সুতরাং

এজন্য তাদের অন্য কারও উপার্জন বা পরিশ্রমের উপর নির্ভর করতে হবে না; বা কারও উপর তা অর্জনের ভার চাপিয়ে দেওয়া হবে না। খ্রীষ্ট যেভাবে চান যে, তাঁর শিষ্যরা ঈশ্বরের প্রতি আস্থাবান হবে তেমনি তারা তাদের দেশবাসীর প্রতিও আস্থাবান হবেন। সেই সাথে তারা নিজেদের স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন নিয়ে কোন সন্দেহ পোষণ করবে না। যদি আপনি লোকদের কাছে প্রচার করেন এবং তাদের মাঝে ভাল কিছু করার প্রচেষ্টা করেন তবে নিশ্চিতভাবেই তারা আপনাকে আপনার চাহিদা অনুযায়ী কিংবা তার চেয়ে বেশি পরিমাণেই খাবার-পানীয় প্রদান করবে; এবং যদি তারা তা করে, তবে কখনো বিলাসিতার প্রত্যাশা করবেন না। ঈশ্বর আপনাকে পরবর্তীতে যে মজুরি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা কিন্তু এর মধ্য দিয়েই শুরু হয়ে গেল।

ঙ. তারা তাদের চলতি পথে কীভাবে কোন স্থান বেছে নেবেন সেই কথা এখানে বিবৃত হয়েছে। দেখুন, তারা কী পর্যবেক্ষণ করবেন (১১-১৫)। কোথায় যেতে হবে তা না জেনেই শিষ্যেরা বিদেশ-বিভূইয়ে যাত্রা করেছিলেন। তাদের এই যাত্রার পেছনে কারও আমন্ত্রণ ছিল না; তারা কাউকে চিনতেনও না। অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে এবং কাউকে না জেনেই সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ভূমির দিকে তারা যাত্রা করলেন। ফলে তাদের মনে এই প্রশ্নগুলো আসা স্বাভাবিক– তারা কোন্ নিয়মের অধীনে চলবে? তারা কোন্ রুট ধরে যাবে? খ্রীষ্ট কিন্তু তাদের পূর্ণ নির্দেশনা ছাড়া পাঠালেন না এবং এখানে সেই নির্দেশনা বিবৃত হল।

১. তাদের এখানে নির্দেশ করা হল যে, সেই অপরিচিত মানুষদের সাথে তারা কীভাবে আচরণ করবে এবং তা কীভাবে করতে হবে:

(১) 'যে কোন শহরে বা গ্রামে তোমরা যাবে সেখানে এমন একজন লোকের সন্ধান কোরো যে এ কাজের উপযুক্ত।'

(ক) এটা ধারণা করা যায় যে, প্রত্যেক জায়গাতেই এমন যোগ্য লোক ছিলেন, যারা সুসমাচার ও এর প্রচারকারীকে গ্রহণে অন্যদের চেয়ে বেশি আন্তরিক ছিলেন। যদিও সময়টা ছিল দুর্নীতি এবং অধর্মের। মনে রাখুন, খারাপ সময় বা স্থানেও আমরা আনন্দের সাথে আশা করতে পারি যে, সেখানে কেউ না কেউ থাকবে যারা তাদের প্রতিবেশীদের চেয়ে আলাদা এবং নিজেদের আলাদা করে রেখেছে। স্রোতের বিপরীতে সাঁতরে, তুষের মাঝে থেকেও তারা নিজেদের গম-কণার পরিচয়টি অক্ষুণ্ন রেখেছে। নিরোর পরিবারেও একজন ঈশ্বরভক্ত লোক ছিলেন। অনুসন্ধান করুন কে যোগ্য– যার মাঝে ঈশ্বরের প্রতি ভয় রয়েছে এবং তাঁর প্রতি দৃষ্টি রয়েছে। তাদের মাঝে যে প্রকৃত আলো ও জ্ঞান রয়েছে তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যাবে। তাদের জীবনে নিশ্চিতভাবেই 'ভাল' কিছু দেখা যাবে। সেরারা সুসমাচারের প্রস্তাবের আনুকূল্যকে মূল্যায়ন করা থেকে দূরে থাকে, আবার কেউ কেউ অন্যদের থেকে নিজেদের পৃথক করে খুবই স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে প্রেরিতদের এবং তাদের বার্তাকে সহায়তা করবে এবং সেই মুক্তোকে তারা পায়ে মাড়াবে না। মনে রাখুন, লোকদের সাথে কী প্রকার আচরণ করতে হবে সে বিষয়ে শিষ্যদের যে বিধি-নিষেধ দেওয়া হল তা তাদের জন্য একাধারে নির্দেশনা ও উৎসাহ। ঈশ্বরের বাক্যের আশা দেখতে পেয়ে যারা একে গ্রহণ করেছে তারা নিজেরা উপকৃত হয়েছে; পাশাপাশি খ্রীষ্টের এই নির্দেশনায় আরও একটি আশা অনুরণিত হয় যে, সত্যিকারেই কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

(খ) তাদেরকে অবশ্যই অনুসন্ধান করতে হবে। তারা ভাল কোন বাড়ির খোঁজ করবে না। যেহেতু তাদের কাছে কোন টাকা-পয়সা ছিল না, সেহেতু তারা কোন হোটেলের দিকে

এগুবে না (৯ পদ), কিংবা তা পাওয়ার আশাও তারা করবে না (৮ পদ)। কিন্তু তারা অবশ্যই কারও বাড়ির আতিথ্য গ্রহণের খোঁজ করবে, তাদের সাথে যারা তাদের ভালভাবে আপ্যায়ন করবে এবং এর জন্য কোন খরচ চাইবে না; কেবল চাইবে প্রেরিত বা ভাববাদীর পুরস্কার, আর তা হচ্ছে– তাদের প্রার্থনা এবং প্রচার। মনে রাখুন, যারা সুসমাচারকে আপ্যায়িত করে তারা এর জন্য কোন খরচ কিংবা বৈষয়িক প্রতিশ্রুতি চাইবে না। তারা যোগ্য লোকের অনুসন্ধান করবে; এক্ষেত্রে তারা বিত্ত-শিক্ষা-সম্মানকে মানদণ্ড হিসেবে ধরবে না বরং তারা সৎ-ভাল লোকেরই খোঁজ করবে। মনে রাখুন, খ্রীষ্টের শিষ্যরা যেখানেই যাবে তাঁরা অবশ্যই ভাল লোকদের কাছে থাকবার জায়গার সন্ধান করবে এবং তাঁরা তাঁদের সাথে পরিজনের মতো হবে। ঈশ্বরকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমে আমরা তাঁর লোকদেরও নিজেদের করে নিই। সেই কারণেই বিশ্বাসীদের সাথে সহভাগিতা স্থাপন, তাদের আত্মীয় জ্ঞান করাটা আমাদের ক্ষেত্রে সহজ হয়ে যায়। এর ফলে, আমাদের আনন্দও পূর্ণমাত্রায় পৌঁছায়, যেহেতু আমরা স্বেচ্ছায় তা বেছে নিয়েছি। পৌল তাঁর সব যাত্রায় ভাইদের খুঁজে বের করতেন, যদি সেখানে কেউ থাকতো (প্রেরিত ২৮: ১৪)। এ থেকে বোঝা যায়, যদি তারা যোগ্য লোকের সন্ধান করেন, তবে তাদের আবিষ্কার করবেনই। যারা তাদের প্রতিবেশীদের চেয়ে ভাল তাদের জীবনযাপনেই তার প্রকাশ দেখা যাবে এবং যে কেউ তাদের কথা বলতে পারবে। তাদের জীবন হবে সৎ, ভাল মানুষের এবং স্বচ্ছ। তাদের চরিত্র দক্ষিণ হস্তের তৈলে অভিষিক্ত, ফলে তাদের সততার সংবাদ তাদেরকে না জানিয়েই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। সবাই জানতো সেই ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার বাড়িটি কোথায় (১ শমূয়েল ৯:১৮)।

(গ) যাদের বাড়ি তারা খুঁজে পাবেন সেই যোগ্য লোকদের বাড়িতে তারা নিয়মিত থাকবেন; যা প্রকাশ করে যে, তারা প্রতিটি শহরে অল্পদিনের জন্যই অবস্থান করবেন। ফলে তাদের আবাসস্থল পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়বে না। কিন্তু যে বাড়িটিতে তারা প্রথমে থামবেন সেই শহর ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত তারা সেখানেই অবস্থান করবেন। খ্রীষ্ট তাদেরকে অন্যদের মতো (যারা কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই মাঝে মাঝে বাসা বদল করে) করতে বারণ করে দিলেন। মনে রাখুন, এটা খ্রীষ্টের শিষ্যদেরই কাজ যে, তারা নিজেদের অপছন্দ কিংবা সমস্যাকে প্রাধান্য না দিয়ে যা শ্রেষ্ঠ তাতে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং তাতে স্থির থাকেন– এখান থেকে সেই শিক্ষাই মেলে।

(২) অপরিচিত বাড়ির ক্ষেত্রে: যখন তারা তাদের পর্যবেক্ষণ দ্বারা সেই যোগ্য বাড়িটি খুঁজে পাবে, তখন তারা সেখানে ঢুকবার সময় মঙ্গলবাদ জানাবে। 'এই স্বাভাবিক ভদ্র আচরণগুলো তোমরা লোকের সাথে পরিচয়ের শুরুতে করবে; তা তোমাদের বিনম্রতার স্মারক হিসেবে প্রকাশিত হবে। মনে কোরো না যে, তুমি তাকে পরিহাস করছো, তোমাকে বাড়িতে স্বাগত জানাতে তাকে প্ররোচিত করছো; অর্থাৎ তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কিংবা তা আমন্ত্রিতের সতর্ক সম্ভাষণও নয়। সেই পরিবারকে মঙ্গলবাদ জানিয়ো।

(ক) যেন এর ফলে আলোচনার পথ খুলে যায় এবং তোমার বার্তার সাথে তুমি তাদের পরিচয় করিয়ে দিতে পার' (সাধারণ আলাপচারিতার অনুষঙ্গ থেকে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেগুলো ভদ্র বলে আদৃত সেগুলো গ্রহণ করতে পারি)।

(খ) যেন এর মধ্য দিয়ে বাড়ির কর্তার অভিব্যক্তিটুকু বুঝে নিতে পার। তোমাকে স্বাগত জানানো হবে কি হবে না– সেটা তুমি তার মঙ্গলবাদ গ্রহণের ভঙ্গি দেখেই বুঝে

যাবে। এর মধ্য দিয়ে তুমি দেখতে পাবে যে তা কেবল লজ্জায় পড়ে কিংবা শীতল অভ্যর্থনায় গৃহীত হল কিনা অথবা তাৎক্ষণিক জবাবও পেয়ে যাবে। যে দয়া সহকারে তোমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করবে না সে তোমার বার্তাও গ্রহণ করবে না; কারণ যে ছোট কাজে অদক্ষ কিংবা অবিশ্বস্ত সে বড় কাজেও তেমনটাই থেকে যায় (লূক ১৬:১০)।

(গ) যেন তুমি এর মধ্য দিয়ে নিজেকে তাদের ভাল মতামতের কাছে নিবেদন করতে পার। সেই পরিবারকে মঙ্গলবাদ জানাও, যেন তারা দেখতে পায় যে, যদিও তুমি সিরিয়াস তবুও তুমি বিষণ্ন নও।' মনে রাখুন, ধর্ম আমাদের সভ্য এবং মার্জিত আচরণ করতে শিক্ষা দেয় এবং আশপাশের সবাইকে সন্তুষ্ট করতে বলে। যদিও প্রেরিতদের সাথে ঈশ্বরের পুত্র খ্রীষ্টের দেওয়া কর্তৃত্ব ছিল তবুও তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, তারা যখন সেই যোগ্য বাড়ির সামনে আসবেন তখন তার কর্তাকে আদেশ করবেন না, কিন্তু শুভেচ্ছা জানাবেন। কারণ, ভালবাসার দরুন বরং মিনতি জানানো হচ্ছে প্রচার-কাজের উপায় (ফিলিমন ৮,৯)। খ্রীষ্ট স্নেহের দড়ি ও ভালবাসার বাঁধন দিয়ে তাদের চালাতেন; লোকেরা প্রথমে স্নেহের দড়িতে খ্রীষ্টের সামনে উপনীত হয় এবং তিনি তাদের ভালবাসার বাঁধনে ধরেন (হোশেয় ১১:৪)। পিতর যখন অযিহূদী কর্নীলীয়কে প্রথম সুসমাচার দেন তখন তিনি প্রথমে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন (প্রেরিত ১০:২৫); কারণ যিহূদীরা যেভাবে অভ্যর্থনা জানাতো সেভাবে অযিহূদীরাও তার প্রত্যুত্তর করতো।

তাঁরা যখন স্বর্গীয় জ্ঞানে তাড়িত হয়ে পরিবারকে মঙ্গলবাদ জানাতেন তখন তারা অবশ্যই তার উত্তর দ্বারা সেই পরিবারের বিষয় বিবেচনা করতে পারতেন এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হতেন। মনে রাখুন, আমরা ভাল লোকদের এবং ভাল পরিচর্যাকারীদের কীভাবে আপ্যায়িত করি তা পর্যবেক্ষণের জন্য ঈশ্বরের চোখ আমাদের উপর রয়েছে। 'যদি বাড়িটি যোগ্য হয়, তবে তোমার শান্তি সেই বাড়ির উপর আসুক এবং তাতে অবস্থান নিক; কিন্তু যদি তার উল্টোটি হয় তবে তোমার শান্তি তোমার কাছে ফিরে আসুক' (১৩ পদ)। ফলত তখনই দেখা যাবে, যে বাড়িটি তারা খুঁজে বের করেছেন তা আসলেই যোগ্য কিনা (১১ পদ), অর্থাৎ অযোগ্যকে যোগ্য বলে খুঁজে পাবার সম্ভাবনা তাদের ছিল। মনে রাখুন, মনোযোগের সাথে শ্রবণ করাটা বুদ্ধিমানের কাজ বলে বিবেচিত হলেও তার সার্থকতা ফলাফলের উপর নির্ভর করে; অর্থাৎ লব্ধ জ্ঞান কীভাবে ব্যবহৃত হল তার স্বাভাবিক রিপোর্ট ও মতামতই বলে দেবে তা কি বোকামি হল না বুদ্ধিপূর্বক করা হল। কোন বিষয়ে বিবেচনা কিংবা পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক হতে হবে। নিজের পথ সম্পর্কে ভালভাবে জানা-বোঝাটাই সতর্কতার জ্ঞান। এখন এই নিয়মটি প্রস্তাব করে–

প্রথমত, প্রেরিতদের সন্তুষ্টির জন্য। স্বাভাবিক মঙ্গলবাদ ছিল, 'আপনার উপর শান্তি আসুক'; এটি, যেভাবে তারা ব্যবহার করতেন তা সুসমাচারের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এটা ছিল ঈশ্বরের শান্তি, স্বর্গ-রাজ্যের শান্তি, যা তারা অন্যের জন্য কামনা করতেন। এখন, খ্রীষ্ট তাদের কাছে 'শান্তি ফিরে আসার' বিষয়টি বলে অযোগ্যের কাছে সম্ভাষণ জানাবার সম্ভাবনাটুকু পরিষ্কার করলেন। খ্রীষ্ট তাদের বললেন যে, এই সুসমাচারের প্রার্থনা (যেহেতু এর সময় এখন এসেছে) সবার জন্যই করা হবে। তা সবার কাছে অসীমভাবে যাবে। তবে তাদের মধ্যে কারা এই সুসমাচার গ্রহণ করবে তা নির্ধারণের ভার ঈশ্বরের কাছে ছেড়ে দিতে হবে। কারণ তিনি লোকের অন্তর দেখেন এবং প্রত্যেকের সত্যিকার চরিত্র সম্পর্কে জানেন। একমাত্র তিনিই জানেন– কে শান্তিরূপ সুসমাচার গ্রহণ করবে। যদি সেই বাড়িটি

যোগ্য হয় তবে তা তোমার আশীর্বচনের সুবিধা লাভ করবে। যদি ক্ষতিকর কিছু না ঘটে তবে তুমি তার সুবিধা হারাবে না; কিন্তু তা তোমার কাছে ফিরে আসবে। তুচ্ছ করার জন্য শত্রুর জন্য দায়ূদের করা প্রার্থনা তার কাছে ফেরত এসেছিল (গীত ৩৫:১৩)।

মনে রাখুন, আমাদের সবাইকে দয়ার সাথে বিবেচনা করতে হবে; সবার জন্য আন্তরিক প্রার্থনা করতে হবে এবং অন্যদের সাথে ভদ্র আচরণ করতে হবে; কারণ তা আমাদের কর্তব্য। তারপর এর কী প্রতিফলন ঘটে– তা না ভেবে ঈশ্বরের উপর এর ভার ছেড়ে দিন, কারণ এটা তাঁর কাজ।

দ্বিতীয়ত, কারণ তাদের কাছে এই নির্দেশ ছিল– 'যদি তোমার শুভেচ্ছা জানানোর পর দেখ যে তারা প্রকৃতই যোগ্য তবে তাদেরকে তোমার সান্নিধ্য দাও এবং তোমাদের শান্তি তাদের উপর নেমে আসবে; তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার কর, সেই শান্তি– যা যীশুর। কিন্তু যদি তারা সেটা রুক্ষতার সাথে প্রত্যাখ্যান করে এবং তোমাদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয় তবে তোমাদের শান্তি যেভাবে তুমি বেশি করে তাদের প্রতি ঢেলে দিয়েছ তা তোমার প্রতিই ফিরে আসুক। তুমি যা বলেছ তা ফিরিয়ে নাও এবং এর প্রত্যুত্তরে তাদেরকে পেছন দেখিয়ে ফিরে এসো। এর মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের তোমাদের আনুকূল্য লাভের অযোগ্য করে তুলেছে এবং তোমাদের সান্নিধ্য থেকে নিজেদের ছিন্ন করেছে।' মনে রাখুন, মহান দয়া প্রায়ই একটি অবজ্ঞায় হারিয়ে যায়– যা বাহ্যিকভাবে ক্ষুদ্র কিংবা তুচ্ছ বলে মনে হয়, যখন মানুষ তার কার্যক্ষেত্রে থাকে কিংবা নিজেদের আচরণের বশবর্তী থাকে। এভাবে এষৌ তার জন্মের অধিকার হারিয়েছিল (আদি ২৫:৩৪) এবং শৌল হারিয়েছিল তার রাজ্য (১ শমূয়েল ১৩:১৩, ১৪)।

২. তাদের এখানে নির্দেশ দেওয়া হল, কীভাবে তারা এটি যারা গ্রহণ করবে না তাদের প্রতি তা করবে। তা করা হবে যারা তাদের গ্রহণ করবে না কিংবা তাদের কথা শুনবে না তাদের প্রতি (১৪ পদ)। প্রেরিতেরা চিন্তা করে থাকবেন যে, প্রচার করার জন্য এখন তাঁদের কাছে সত্যিকারের মতবাদ রয়েছে এবং চিহ্ন-কাজ করবার জন্য সত্যিকারের ক্ষমতা রয়েছে– যা তাঁদের মতবাদের নিশ্চয়তাকে সত্যায়িত করবে– এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁরা অবশ্যই চিরন্তনভাবে আপ্যায়িত হবেন এবং তাঁদের স্বাগতও জানানো হবে; সেই কারণেই তাঁদের বলা হল যে, এমন অনেককে তাঁরা পাবে যারা তাঁদের তুচ্ছ গণ্য করবে এবং তাঁদের ও তাঁদের শিক্ষাকে অবজ্ঞা করবে। মনে রাখুন, সুসমাচারের শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে ক্ষমতাধর প্রচারকেরাও এমন লোকদের প্রত্যাশা করবেন যারা তাদের প্রয়োজনীয় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে না, তাদের কথা শুনতে আগ্রহ দেখাবে না। অনেকেই বধির বনে থাকবে এমনকি আনন্দ-ধ্বনিতেও কান দেবে না; এবং উদ্দীপকের স্বর মনোযোগ সহকারে শুনবে না। কোনভাবেই উদ্দীপিত না হবার জন্য মূর্খের মতো পণ করে থাকবে। লক্ষ্য করুন, 'তারা তোমাকে গ্রহণ করবে না এবং তোমার কথা শুনবে না'। মনে রাখুন, সুসমাচার কিংবা এর প্রচারকের অবমাননা স্বভাবতই একই বিষয় এবং তারা এই দুইয়ের কোনোটি করার মাধ্যমে খ্রীষ্টকেই অবজ্ঞা করে এবং তারা তাঁর অবজ্ঞাকারী হিসেবে গণিত হবে।

এখন এই ক্ষেত্রে আমরা পাই,

(১) প্রেরিতদের কী করতে হবে– সে বিষয়ে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা অবশ্যই সেই বাড়ি তথা গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে। মনে রাখুন, যারা সুসমাচার গ্রহণে নিরস্ত

হয় তাদের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে সুসমাচার অপেক্ষা করে না। তাঁদের বিদায়ের সময় তাঁরা তাদের পায়ের ধুলো সেই গ্রামে ঝেড়ে আসবে।

(ক) তাদের খারাপির প্রতি ঘৃণার প্রকাশ হিসেবে; তারা যেখানে যাবে সেই জায়গা তার ধুলোয় দূষিত হয়ে পড়বে– তা কতটা খারাপ! তাই তারা একে নোংরা জ্ঞান করে তাদের পায়ের ধুলো সেখানে ঝেড়ে ফেলবে। প্রেরিতেরা তাঁদের সাথে কোন সহভাগিতা বা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তৈরি করবে না; এমনকি তাঁরা তাদের গ্রাম ছেড়ে যাবার সময় তাঁদের পায়ের ধুলো ঝেড়ে আসবে; তাঁরা তাঁদের সাথে সেই গ্রামে যাবার কোন চিহ্নও রাখবে না। 'বিপথে যাওয়া লোকদের কাজ আমি ঘৃণার চোখে দেখি; সেগুলো আমাকে আঁকড়ে ধরতে পারবে না' (গীত ১০১:৩)। ভাববাদী বেথেলে কোন কিছু খাওয়া ও পান করা থেকে বিরত থাকতেন (১ রাজাবলি ১৩:৯)।

(খ) এর মধ্য দিয়ে তাঁরা তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভের অভিযোগ রেখে আসবে। তাদের ভিত্তি ও অবস্থান যে ধুলোর মতো নিকৃষ্ট এবং ঈশ্বর যে তাদের ঝেড়ে ফেলবেন এটা তারই প্রতীকী চিত্র। প্রেরিতদের পায়ের ধুলো– যা তাঁরা তাদের পেছনে রেখে আসবেন– তা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে এবং তাদের কাছে যে সুসমাচার প্রচারিত হয়েছে তার প্রমাণ হিসেবে দাঁড়াবে (মার্ক ৬:১১; তুলনা করুন যাকোব ৫:৩); এর প্রয়োগ দেখুন প্রেরিত ১৩:৫১; ১৮:৬ পদে। মনে রাখুন, যারা ঈশ্বরকে এবং তাঁর সুসমাচারকে অবজ্ঞা করে তারা মূল্যহীন হবে।

(২) সুসমাচার গ্রহণে তাদের এই অসম্মতি তাদের কঠিন বিচারের মুখোমুখি করবে (১৫ পদ); শেষ বিচারের দিনে তাদের অবস্থার চেয়ে সদোম যা কিনা খারাপ লোকদের আবাস ছিল তার অবস্থা অনেক সহ্যকর হবে। মনে রাখুন,

(ক) শেষ বিচারের দিন ঘনিয়ে আসছে– যখন যারা সুসমাচারকে প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের সবাই নিশ্চিতভাবেই সেজন্য দোষী সাব্যস্ত হবে; তা এখন তারা যেভাবেই সুসমাচারকে পরিহাস করুক না কেন। তারা জীবনরক্ষাকারী যে শিক্ষায় কান দেয় নি তার প্রতিটি বাক্যে নিজেদের ধ্বংসের বিষয়ে শুনতে পাবে। তাদের বিচার সেইদিন পর্যন্ত মুলতবি রয়েছে।

(খ) সেই দিনে বিভিন্ন মাত্রায় শাস্তি প্রদান করা হবে। নরকের সব ব্যথাই সহ্যের বাইরে; কিন্তু এর কোন কোনটি একটির চেয়ে ভয়ঙ্কর মাত্রায় দেখা দেবে। কোন কোনও পাপী অন্যদের চেয়ে নরকের গভীরে ডুবে যাবে এবং একের পর এক আরও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কাছে তারা পরাজিত হবে।

(গ) সুসমাচারকে অবজ্ঞা করার ফলে তাদের উপর যে শাস্তি নেমে আসবে তা সদোম ও ঘমোরার চেয়ে ভয়ঙ্কর হবে; তাদের ভীষণভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হবে। সদোম সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে তাকে অনন্ত আগুনের প্রতিশোধে পুড়তে হবে (যিহূদা ৭)। কিন্তু সেই প্রতিশোধ আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়ে মহান পরিত্রাণের অবজ্ঞাকারীদের উপর নেমে আসবে। সদোম ও ঘমোরা ছিল খারাপি ও নীচতায় তলিয়ে গিয়েছিল (আদি ১৩:১৩); তাদের কাছে যে স্বর্গদূতদের পাঠানো হয়েছিল তাদের তারা গ্রহণ করে নি। উপরন্তু তাদের প্রতি মন্দ অভীপ্সা প্রকাশ করেছিল এবং মনোযোগ সহকারে তাদের কথা শোনেনি (১৪ পদ)। তবুও তাদের উপর নেমে আসা শাস্তি যারা খ্রীষ্টের সুসমাচারকে অবজ্ঞা করেছে এবং মনোযোগ সহকারে তা শোনেনি, তাদের চেয়ে সহ্যকর হবে। তাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের

ক্রোধ আরও ভয়ানকভাবে জ্বলবে এবং নিজেদের কাজের প্রতিফল তাদের ভীষণ কষ্ট দেবে। 'পুত্র, মনে রেখ, যারা অনন্তজীবনের বিষয়ে শুনেও তাতে কান না দিয়ে মৃত্যুকে বেছে নিয়েছে আমি তাদের কানে ভীতিকর আওয়াজ তুলব; কারণ তাদের কাছে তো আমি আমার প্রচারকদের পাঠিয়েছিলাম।' ইস্রায়েলের খারাপি, যখন ঈশ্বর তাদের কাছে তার সেবাকারী ভাববাদীদের পাঠিয়েছিলেন তাদের উপস্থিতি সেদিন তাদের দোষের কথা ঘোষণা করবে এবং এর ভিত্তিতে সদোমের দোষের চেয়ে ইস্রায়েলের দোষকে বড় করে দেখা হবে ((যিহিষ্কেল ১৬:৪৮, ৪৯); তার মাত্রা এখন আরও বেশি হয়ে দেখা দিতে যাচ্ছে, কারণ তিনি তাঁর নিজ পুত্রকে তাদের কাছে পাঠালেন যিনি ভাববাদীদের চেয়েও মহান।

মথি ১০:১৬-৪২

এই পরিচ্ছেদের পদ সমূহ খ্রীষ্টের শিষ্যরা তাদের কার্যক্ষেত্রে কী রকম দুঃখভোগের মুখোমুখি হবেন তা তুলে ধরে। এখানে তার আগাম বার্তা অনুরণিত হয়েছে যেন তারা তা প্রত্যাশা করেন এবং সেজন্য প্রস্তুত থাকেন। দুঃখভোগকে তারা কীভাবে বহন করবেন এবং তার মধ্য দিয়ে তারা কীভাবে তাদের কাজ চালিয়ে যাবেন– সে বিষয়ে এখানে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। খ্রীষ্টের শিক্ষার এই অংশটির মাহাত্ম্য বা প্রয়োজনীয়তা কেবল শিষ্যদের বর্তমান মিশনের জন্যই নয় বরং তা অনেক দূর বিস্তৃত হয়েছে। কারণ আমরা কোথাও দেখি না যে, তারা কোন শক্ত প্রতিবন্ধকতা কিংবা নির্যাতনের মুখোমুখি হয়েছেন– যখন খ্রীষ্ট তাদের সাথে ছিলেন কিংবা তারা সেই বাধার মোকাবিলা করতে দৃঢ় সমর্থ ছিলেন। কিন্তু এখানে তাদের ভবিষ্যতের সমস্যাসংকুল কার্যক্ষেত্রের বিষয়ে আগাম জানানো হল, যখন খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের পর তাদের কাজের পরিধি আরও বেড়ে যাবে এবং স্বর্গ রাজ্য– যা সন্নিকট ছিল– তা সত্যিকারেই স্থাপিত হবে। বস্তুত তারা যখন ক্ষমতা ও জাঁকজমকের বাহ্যিক দিক ছাড়া আর কিছু ভাবেননি, তখন খ্রীষ্ট তাদের বললেন, তারা অবশ্যই দুঃখভোগের জন্য প্রস্তুতি নেবে। যে কাজের জন্য তাদের আহ্বান করা হয়েছিল, তার জন্য তাদের নির্যাতন সহ্য করতে হবে। যেখানে তারা রাজপ্রাসাদে থাকার প্রত্যাশা করেছিল সেখানে তাদের জেলে দেওয়া হবে। সামনের দিনগুলোতে আমরা কী ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে পারি সে সম্পর্কে আগাম জেনে রাখাটা খুবই কাজে দেয়। এর ফলে আমরা তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারি এবং কোন গর্ব পুষে রাখা থেকে বিরত থাকতে পারি, নচেৎ পরবর্তী সময়ে বাহারি সাজ খুলে ফেলার আবশ্যকতা দেখা দিলে গভীর লজ্জায় পড়তে হতে পারে।

এখানে আমাদের দু'টি বিষয়ে একত্রে বলা হয়েছে, ক. সমস্যার পূর্বাভাস এবং খ. সেই সমস্যা মোকাবিলায় দরকারি পরামর্শ, উৎসাহ এবং ব্যবস্থাপত্র।

ক. এখানে বিপদ সম্পর্কে আগাম জানিয়ে দেওয়া হল– শিষ্যরা নিজেদের কার্যক্ষেত্রে যার মুখোমুখি হবেন। খ্রীষ্ট তাঁর নিজের দুঃখভোগের মতো তার শিষ্যদের দুঃখভোগও আগাম দেখতে পেয়েছিলেন তবুও তিনি তাদের সেই বিপদসংকুল পথে এগিয়ে যেতে বললেন, যেমনটা তিনি নিজে গিয়েছিলেন; এবং তিনি তাদের তা আগাম বলে দিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাদের এ বিষয়ে বললেন যেন সেই সমস্যাগুলো তাদের কাছে বিস্ময় হয়ে না আসে, তাদের বিশ্বাসকে স্থবির করে না দেয়; উপরন্তু তার এই পূর্বাভাস যেন তাদের

মনে সাফল্যকে করায়ত্ত করতে প্রয়োজনীয় বিশ্বাস ও ভরসার সঞ্চার করে।

তিনি তাদের বললেন যে, কী ধরনের এবং কাদের কাছ থেকে এই দুঃখভোগ আসবে।

১. তারা কী ধরনের দুঃখভোগ করবে: নিশ্চিত করে বলাটা কঠিন– 'কারণ দেখ, আমি তোমাদের ভেড়ার মতো নেকড়ে বাঘের মধ্যে পাঠাচ্ছি' (১৬ পদ)। নিষ্ঠুর, হিংস্র নেকড়ের পালের মধ্যে দাঁড়িয়ে দরিদ্র, অসহায়, অরক্ষিত ভেড়াটি ছিন্নভিন্ন হওয়ার অন্তিম দশা কল্পনা করে উদ্বিগ্ন হওয়া ভিন্ন আর কী প্রত্যাশা করতে পারে? মনে রাখুন, মন্দ লোকেরা হচ্ছে নেকড়ের মতো– যার প্রকৃতিই হচ্ছে লোভীর মতো গ্রাস করা ও ধ্বংস সাধন করা। ঈশ্বরের লোকেরা এবং বিশেষভাবে তাঁর প্রচারকেরা হচ্ছেন এদের মাঝে ভেড়ার মতো। যাদের প্রকৃতি ও চরিত্র এদের পুরো বিপরীত, যা তাদের চিনিয়ে দেয়, কোন বাধার প্রত্যাশা না করে তাদের সহজেই আক্রান্ত করা যায়। তাদের এ ধরনের ভীতিকর অবস্থায় ফেলে দেওয়া দেখে মনে হতে পারে খ্রীষ্টের ভেতর দয়ার অস্তিত্ব নেই, তাদের প্রতি যারা তাদের সবকিছু ত্যাগ করে তার অনুগামী হয়েছিল; কিন্তু তিনি জানতেন তার ভেড়াদের জন্য কী গৌরব সংরক্ষণ করে রাখা আছে। যখন সেই মহান দিনে তারা তার ডান পাশে বসবে, তা হবে তাদের এই দুঃখভোগের জন্য অনুপম ক্ষতিপূরণ– যা তারা কার্যক্ষেত্রে সহ্য করেছে। 'তারা ভেড়ার মতো নেকড়ের পালের মধ্যে'– যা প্রকৃতই আতঙ্কিত হবার মতো ব্যাপার; কিন্তু 'খ্রীষ্ট তাদের পাঠাচ্ছেন' এটা হচ্ছে স্বস্তিদায়ক; কারণ যিনি পাঠাচ্ছেন তিনিই তাদের রক্ষা করবেন এবং তাদের বহন করবেন। কিন্তু যেন তারা সেই বিপদের বিষয়ে জানতে পারে, সেজন্য তিনি তাদের নির্দিষ্ট করে বলে দিলেন তারা কীসের জন্য প্রস্তুত থাকবে।

(১) তারা ঘৃণিত হবার জন্য প্রস্তুত থাকবে (২২ পদ); 'আমার জন্যে লোকে তোমাদের ঘৃণা করবে'; যাবতীয় নির্যাতন বিপদের মূলে রয়েছে এই ঘৃণা; যা তিক্তও বটে। মনে রাখুন, খ্রীষ্ট যাদের ভালবাসেন তাদের পৃথিবী ঘৃণা করবে; যেমন যাদের আইনসভা অনুগ্রহ দেখায় তাদের দেশবাসী শাপ দেয়। যদি পৃথিবী কোন কারণ ছাড়াই খ্রীষ্টকে ঘৃণা করতে পারে (যোহন ১৫:২৫) তবে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, যারা তাঁর জন্য কাজ করছে এবং তাঁর ছবি বহন করছে তাদেরও পৃথিবী ঘৃণা করবে। লোকে যা ঘৃণ্য, খারাপ তাকে ঘৃণা করে এবং তাদেরকে পৃথিবীর আবর্জনা, জঞ্জাল বলেই গণ্য করা হয় (১ করিন্থীয় ৪:১৩)। আমরা যা ক্ষতিকর তা ঘৃণা করি– 'এবং তাদেরকে দেশে সমস্যা সৃষ্টিকারী বলে গণ্য করা হয়' (১ রাজাবলি ১৮:১৭); 'তাদের প্রতিবেশীদের নির্যাতনকারীরূপে গণ্য করা হয়' (প্রকাশিত বাক্য ১১:১০)। ঘৃণিত হওয়াটা অবশ্যই মারাত্মক কিছু এবং তা মন্দ উদ্দেশ্যের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়; কিন্তু খ্রীষ্টের জন্য ঘৃণিত হওয়ার তাৎপর্য অন্য রকম, যেমনটা এখানে বলা হয়েছে– ঘৃণার সত্যিকার কারণ সম্বন্ধে। সেই ঘৃণা যেভাবেই করা হোক না কেন, যারা প্রকৃতই খ্রীষ্টের জন্য ঘৃণিত হয় এখানে বলা কথা তাদের সান্ত্বনা দেয়। এটা হচ্ছে ভাল কারণ এবং তারা ভাল বন্ধু পায় যার সাথে এ নিয়ে কথোপকথন চালানো যায় এবং তাঁর কাছে তা রাখতে পারে।

(২) তারা ধৃত হবার প্রত্যাশা করবে এবং তাদের অপরাধীর মতো জবাবদিহি করা হবে। তাদের অবিশ্রান্ত ঘৃণা হচ্ছে প্রতিরোধহীন এবং তারা কেবল চেষ্টাই করবে না উপরন্তু তা করেও দেখাবে– 'তারা তোমাদের মহাসভার সামনে বিচারের জন্য নিয়ে যাবে' (১৭, ১৮ পদ); তারা তাদের বিচারকের সামনে উপস্থিত করবে– যা জনগণের শান্তি রক্ষায় বিধি -ব্যবস্থা নেয়। মনে রাখুন, বিচার ও আইনের মারপ্যাচে ফেলে ভাল লোকদের প্রতি

প্রায়শই অন্যায় ব্যবহার করা হয়। পৃথিবীয় ন্যায়বিচার ও সততার জায়গায় দুষ্টতা রয়েছে এবং তা কেবল দুষ্টদের শাস্তি দেওয়ার জন্য (উপদেশক ৩:১৬)। তারা অবশ্যই সমস্যার দিকে তাকাবে। তবে এই আঘাত কেবল মহাসভার হীনম্মন্য ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছ থেকেই নয় উপরন্তু রাজা, শাসক এবং বিচারপতিদের কাছ থেকেও আসবে। খ্রীষ্টের শিষ্যদের তাদের সামনে উপস্থিত করতে নেওয়া হবে কালো আইনের আশ্রয়; দৃশ্যত সাহাবিরা পরবর্তী সময়ে এরকম অবস্থার মুখোমুখি হয়েছিলেন। বাস্তবিকই যা ছিল ভীতিকর এবং বিপদজনক; কারণ রাজার ক্রোধ গর্জনকারী সিংহের মতো। প্রেরিতদের কার্যবিবরণে (প্রেরিত পুস্তকে) আমরা খ্রীষ্টের এই আগাম ভাষণের পূর্ণতা দেখি।

(৩) তাদের মেরে ফেলা হবে; তারা এই প্রত্যাশাও করবে (২১ পদ); তারা তাদের খুন করবে, এই পৃথিবীতে, সাড়ম্বরে যেন মহৎ কাজ করছে সেভাবে তাদের মেরে ফেলতে উদ্যত হবে। মৃত্যুভয় দেখিয়ে তারা প্রচারকদের নিরস্ত করতে চাইবে। তাদের শত্রুদের ঘৃণার পারদ উঁচুতে উঠলে তারা এর মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ ঘটাবে। এটা হচ্ছে 'ঈশ্বরভক্তের রক্ত' যার জন্য তারা পিপাসিত: তথাপি ঈশ্বরভক্তের বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতা দৃঢ়তার সাথে সেই পরিণতি গ্রহণে অপেক্ষা করে– 'আমি নিজেকে আমার আদর্শের চেয়ে বেশি প্রিয় জ্ঞান করি না।' খ্রীষ্টের জ্ঞান একে সাহায্য করে। সাক্ষ্যমরের রক্ত কী করে সত্যের কথা সোচ্চার করে এবং মণ্ডলীর বীজ বুনে দেয়, তা জেনে তারা সানন্দে একে গ্রহণ করেন। এই অভিজাত সেনারা, যারা জীবনকে তুচ্ছ করে মৃত্যুকে মেনে নিতে ভয় পায় না তাদের দ্বারা শয়তান পরাজিত হয় এবং খ্রীষ্টের রাজ্য এবং এর পরিকল্পনার অগ্রগমন আরও বেগবান হয় (প্রকাশিত বাক্য ১১: ১১)। শত্রুরা নিজেদের মনকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য তাদের অপরাধী বানিয়ে মৃত্যুর শাস্তি দেয়, কিন্তু মূলত তা হচ্ছে আত্মত্যাগ (ফিলিপীয় ২:১৭; ২ তীমথিয় ৪:৬); পোড়ানো-উৎসর্গর মতো, ঈশ্বরের সম্মানের প্রতি কৃতজ্ঞতার উৎসর্গের মতো এবং যা সাধিত হয় তার সত্যে এবং তাঁরই কারণে।

(৪) এই দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে তারা সবচেয়ে নিন্দনীয় এবং অ বিশ্বাসকর নামের ভাগী হবেন এবং তাদের চরিত্রের উপর কালিমা লেপন করা হবে। তারা এজন্য প্রস্তুত থাকবেন। নির্যাতনকারীরা এই পৃথিবীতেই লজ্জিত হবে, যদি তারা নিজেদের দুষ্কর্ম ঢাকতে প্রতারণার আশ্রয় না নেয় এবং লোকদের প্রকৃত নিষ্ঠুরতার বিষয়টি বিবেচনা করার সুযোগ না দেয়। যতরকম দুরভিসন্ধি করা সম্ভব অর্থাৎ লোকেরা তাদের নামে যতভাবে কালিমা লেপন করতে উদ্যত হবে তা এখানে বর্ণিত হয়েছে– তারা তাদের বলে মন্দ-আত্মাদের রাজা হিসেবে অভিহিত করে (২৫ পদ)। তারা তাদের অন্ধকার পৃথিবীর ইচ্ছের অধীন রিংলিডার হিসেবে প্রকাশ করতে চাইবে এবং যখন প্রত্যেকেই ভাববে যে, শয়তানকে তার ঘৃণা করা উচিত সেভাবে তারা মানবজাতির সামনে তাদের নিন্দনীয় করে তোলার প্রয়াস পাবে। দেখুন, দেখে বিস্মিত হোন কীভাবে পৃথিবী খ্রীষ্টের শিষ্যদের উপর মিথ্যে অভিধা চাপিয়ে দেয়:

(ক) শয়তানের নিশ্চিত শত্রুদের সে কী করে তার বন্ধু পরিচয়ে লোকসম্মুখে প্রচার করে। প্রেরিতেরা– যাঁরা শয়তানের রাজ্যকে দূরীভূত করেন– তাদেরই কিনা 'শয়তান' বলে অভিহিত করা হয়! এভাবে লোকে তাদের কর্তব্যজ্ঞানের উপর আঘাত হানবে। তবে তা কেবল তাদের অজানা বিষয় দ্বারাই নয় উপরন্তু যে শয়তানের বিরুদ্ধে তারা লড়াই করেছেন তারই দোসর হিসেবে তাদের পরিচয় তুলে ধরার মাধ্যমে তাদের কর্তব্য, বিশ্বাস ও

অবস্থানকে কলঙ্কিত করার ঘৃণ্য চেষ্টা তারা করবে। লোকেরা তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতো, যেহেতু তাদের কাছে তেমনটাই জানানো হতো। নির্যাতনকারীরা প্রথমেই ঘটনায় রং মাখিয়ে লোকদের তাদের প্রতি ঘৃণা ছুঁড়ে দিতে প্রলুব্ধ করতো।

(খ) যারা শয়তানের সত্যিকার সেবাকারী তাদেরকেই লোকে শয়তানের শত্রু বলে ভাবার অবকাশ পায়! এবং তারা যখন তার বিরুদ্ধবাদী হিসেবে তার সাথে লড়াইয়ের ভান করতো, তার চেয়ে তার পক্ষে তারা যে কাজ করতো তা এর মতো কার্যকর হতো না। বেশির ভাগ সময় শয়তানের কাছের মানুষেরা আরও অনেককে শয়তানের সন্তান বানানোর পাঁয়তারা চালিয়ে যায় এবং যারা শয়তানকে অন্যদের পোশাকে রাঙাতে চায়, তারা তাদের অন্তরকে শয়তানকে শাসন করতে দেয়। তবে উৎসাহের ব্যাপার এই যে, এমন একদিন আসছে যখন (একে অনুসরণ করা হয়েছে ২৬ পদে) লুকানো সবকিছুই আলোতে বেরিয়ে আসবে।

(৫) এসব দুঃখভোগ এখানে ছোরা এবং বিভাজনের দ্বারা চিত্রিত হয়েছে (৩৪, ৩৫ পদ)। 'একথা ভেব না আমি শান্তি দিতে এসেছি'– ক্ষণস্থায়ী শান্তি এবং বাহ্যিক সম্পদ; তারা ভেবেছিলেন খ্রীষ্ট তাঁর সব শিষ্যকে পৃথিবীতে ক্ষমতা এবং সম্পদ দিতে এসেছেন। 'না' খ্রীষ্ট বলেন, 'আমি তাদের শান্তি দেবার লক্ষ্য নিয়ে আসিনি।' স্বর্গের শান্তির বিষয়ে তারা নিশ্চিত থাকতে পারেন কিন্তু প্রার্থিব শান্তির বিষয়ে নয়। খ্রীষ্ট আমাদের যে শান্তি দিতে এসেছিলেন তা ঈশ্বরের, বিবেকবুদ্ধিতে শান্তি, ভাইদের সাথে শান্তি; কিন্তু 'এই পৃথিবীতে তোমরা দুঃখভোগের মুখে পড়বে।' মনে রাখুন, তারা সুসমাচারের উদ্দেশ্য বুঝতে ভুল করেছিলেন– যারা ভেবেছিলেন তাদের এই ব্রত তাদের সব কিছু থেকে নিরাপদ রাখবে; কারণ তা নিশ্চিতভাবেই তাদের কাছে তুলে ধরা হয়েছিল, যে তারা এই পৃথিবীর দুঃখভোগ থেকে নিরাপদ নয়। যদি গোটা পৃথিবী খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে তবে সেখানে চিরন্তন শান্তি বইতে থাকবে কিন্তু যেখানে অনেকেই তাকে গ্রহণ করে নি (এবং তারা কেবল এই পৃথিবীর সন্তানই নয় বরং সাপের বংশধরও), ঈশ্বরের সন্তানদের (যাদের পৃথিবী থেকে আলাদা করা হয়েছে) অবজ্ঞা করেছে, সেখানে তারা অবশ্যই তাদের শত্রুদের প্রতিফল লাভের বিষয়টি অনুভব করবে; তারা দুঃখভোগই প্রত্যাশা করবে।

(ক) 'শান্তির দিকে নয় বরং ছোরার দিকে দেখ।' খ্রীষ্ট বাক্যের ছোরা দিতে এসেছিলেন, যেন তার শিষ্যরা তা দিয়ে পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে এবং 'বিজয়ী কাজ এই ছোরা সম্পন্ন করেছে' (প্রকাশিত বাক্য ৬:৪; ১৯:২১) এবং নির্যাতনের ছোরা, যা দিয়ে পৃথিবী শিষ্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসে; কারণ শিষ্যদের বলা শাস্ত্র তাদের হৃদয়কে দোষী সাব্যস্ত করে (প্রেরিত ৭:৫৪), খ্রীষ্টের সাক্ষীদের সাক্ষ্য তাদের বিচলিত ও দোষী করে (প্রকাশিত বাক্য ১১:১০) এবং এই ছোরা নিষ্ঠুর কাজ সমাধা করে। খ্রীষ্ট সেই সুসমাচার পাঠিয়েছিলেন– যা এই ছোরার কাজ দেখার উপলক্ষ এনে দিয়েছিল এবং সে কারণেই হয়তো এই ছোরার কথা বলা হয়েছে। তিনি তাঁর মণ্ডলীকে আদেশ করেন যেন তা দুঃখভোগের ভেতর দিয়ে যায়, কারণ এর মধ্য দিয়ে তাঁর লোকেরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পাশাপাশি যে অনুগ্রহ তিনি তাদের করেছেন তার জন্য তাঁকে প্রশংসা দেবার সুযোগ পাবে। তারা দুঃখভোগ করবেন যেন তাঁর শত্রুদের পাপের কোটাও এর ভেতর দিয়ে সম্পূর্ণ হতে পারে।

(খ) 'শান্তির কথা ভেব না কিন্তু দেখ সব ভাগ হয়ে যাচ্ছে' (৩৫ পদ)। 'আমি

লোকদের মাঝে বিরোধ বাধিয়ে দিতে এসেছি।' সুসমাচার প্রচারের এই প্রভাব মোটেই সুসমাচারের দায় নয়, কিন্তু যারা তা গ্রহণ করে না দোষটা তাদেরই। যখন কেউ যে বিষয়ে বলা হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে এবং অন্যরা বিশ্বাস করে না তখন যারা তা গ্রহণ করবে তাদের বিশ্বাস প্রত্যাখ্যানকারীদের দোষী সাব্যস্ত করবে এবং সে কারণেই এই বিশ্বাসের জন্যই একে অন্যকে শত্রু হিসেবে আবিষ্কার করবে। মনে রাখুন, ধর্মীয় ভিন্নতা হেতু যে দ্বন্দ্ব উপনীত হয় তার চেয়ে সহিংস ও নির্দয় দ্বন্দ্ব আর কিছু হতে পারে না। নির্যাতনকারীর মতো শত্রু যেমন আর হয় না তেমনি সেই নির্যাতিতের মতো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এভাবে খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের বললেন যে, তারা কী দুঃখভোগ করবেন এবং এই কঠিন কথাগুলো বলাটাও ছিল কষ্টকর। যদি তারা সেগুলো বহন করতে পারেন তবে তারা যেকোন কিছু সহ্য করতে পারবেন। মনে রাখুন, তাঁর কাজ করতে গিয়ে আমরা কী রকম রোষের মুখোমুখি হব– সে বিষয়ে বলে দিয়ে খ্রীষ্ট আমাদের সাথে বিশ্বস্ত ও নিরপেক্ষ আচরণ করলেন এবং তিনি চান যেন আমরাও সেরকম বিশ্বস্তভাবে তাঁর জন্য কাজ করি, তাঁর কাজের সুযোগ লাভের মূল্য দিতে শিখি এবং তাঁর বিশ্বস্ত আচরণের মূল্য দিই।

২. তাদের এখানে বলা হল যে, কাদের কাছ থেকে এবং কাদের দ্বারা তারা এই কঠিন দুঃখভোগ প্রত্যাশা করবে। নিশ্চিতভাবেই নরক নিজেই সুসমাচারের বিরোধিতা করবে এবং বদরূহেরা, সেই অনিশ্চয়তা ও হতাশাচ্ছন্ন আত্মারা– যাদের মহান নাজাতে বিন্দুমাত্র অংশ-গ্রহণ নেই, তারা মূর্তিমান হবে। ঈশ্বরের সাথে পৃথিবীর সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের তথা মানুষের কাছে সুসমাচার পৌঁছে দেওয়ার সময় উপরে বর্ণিত দুঃখভোগসমূহ সুসমাচার প্রচারকদের উপর নেমে আসবে। আর তা আসবে তাদের কাছ থেকে, যাদের কাছে তারা সুসমাচার নিয়ে যাবেন। এভাবে রক্তপাত করে তারা নির্দোষ লোককে ঘৃণা করে এবং সৎ লোককে হত্যা করবার চেষ্টা করে (হিতোপদেশ ২৯:১০) এবং সে কারণেই স্বর্গ পৃথিবীর বিরোধিতা করে, কারণ পৃথিবী নরকের ক্ষমতার অধীন (ইফিষীয় ২:২)।

খ্রীষ্টের শিষ্যরা এই কঠিন দুঃখভোগ করবেন–

(১) মানুষের কাছ থেকে (১৭ পদ)। 'লোকের বিষয়ে সাবধান হও; তোমাদের নিজেদের সুরক্ষার অধীনে দাঁড়ানোর প্রয়োজন দেখা দেবে; এমনকি তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমারই মতো একই প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন'– যা মূলত অধঃপতিত এবং নৈতিকতা বিবর্জিত প্রকৃতির বিষয়ে বলে (হোমো হোমিনি লোপাস, যার অর্থ মানুষ মানুষের কাছে নেকড়ের ন্যায়)। এই প্রবৃত্তির সংশ্লিষ্টতায় মানুষ মানবীয় ধূর্ততা ও কূটনীতি পোষণ করে এবং পশুর মতো নিষ্ঠুর ও অসভ্য আচরণ করে। আর তা মনুষ্যত্বকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে। মনে রাখুন, নির্যাতনের ক্রোধ এবং বৈরিতা মানুষকে পশুতে ও মন্দ-আত্মার অধীনে পরিণত করে। পৌল ইফিষে মানুষের রূপ নিয়ে থাকা পশুর সাথে লড়াই করেছিলেন (১ করিন্থীয় ১৫:৩২)। এটা অত্যন্ত পীড়াদায়ক ক্রান্তিলগ্ন– যেখানে পৃথিবী এসে উপনীত হয়েছে, যখন মানুষের কাছ থেকে সাবধান হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। এটা খ্রীষ্টের সেবকদের দুঃখভোগকে গুরুতর করে তোলে যে, তাদের শত্রুরা তাদের মধ্য থেকে উঠে আসছে– যারা তাদের মতোই হাড়মাংসের মানুষ, একই রক্তে গড়া। নির্যাতনকারীরা এই নিরিখে পশুর চেয়েও খারাপ বলে অভিহিত হয়– যা তারা নিজেদের প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার জন্য শিকার করে। এক্ষেত্রে অসভ্য ভালুকেরাও নিজেদের বিষয়ে একমত হয়ে থাকে। মানুষ আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়– এই ভাবনাটি খুবই কষ্টদায়ক (গীত ১২৪)।

যাদের কাছ থেকে আমাদের নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও সহমর্মিতা পাওয়ার কথা সেই মানুষই আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে (১ করিন্থীয় ২:১৪); 'তারা এই পৃথিবীর মানুষ' (গীত ১৭:১৪) । ঈশ্বরভক্তরা মানুষের চেয়ে বেশি কিছু, কারণ তাদের মানুষের মাঝ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে; সে কারণেই তারা মানুষের কাছে ঘৃণা পেয়ে থাকেন। মানুষের প্রকৃতি, যদি তা পবিত্রীকৃত না হয়– তবে তা খারাপ স্বভাবে পূর্ণ হয়– যা পৃথিবীর ও শয়তানের। তারা মানুষ এবং সে কারণেই তারা পরনির্ভর, মুমূর্ষু ও নিম্নপদস্থ সৃষ্টি। তারা মানুষ কিন্তু তারা মানুষের গুণাবলি ধারণ করে না (গীত ৯:২০) এবং 'আমি, আমিই তোমাদের সান্ত্বনা দিই, তোমরা কেন মানুষকে ভয় করছ? তারা তো মরে যাবে।' (যিশাইয় ৫১:১২)। তাই ড. হেমন্ড বলেন, 'মানুষের কাছ থেকে সাবধান হোন।' যারা খ্রীষ্টকে অবজ্ঞা করেছিল– যিহূদীদের সানহেদ্রিমের সেই লোকদের কাছ থেকে সাবধান হোন (১ পিতর ২:৪)।

(২) যেসব মানুষ বাইরে ঈশ্বরভক্তের পোশাক পরে ভাববাদী হিসেবে ঈশ্বরের বাক্য বলে বেড়ায় এবং ধর্মীয় বিষয়ে লোকদের পথ দেখায়– তাদের কাছ থেকে সাবধান হোন। 'তারা তাদের সমাজ গৃহে , যেখানে তারা ঈশ্বরের উপাসনার জন্য মিলিত হয় এবং যেখানে তারা তাদের উপাসনার কাজকর্ম অনুশীলন করে থাকে সেখানে তোমাদের বেত মারবে।' খ্রীষ্টের প্রচারকদের বেত মারার মধ্য দিয়ে তারা দেখাবে যে, তারা ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করছে। পৌলকে সমাজ-ঘরে পাঁচবার বেত্রাঘাত করা হয়েছিল (২ করিন্থীয় ১১:২৪)। যিহূদীরা মোশির জন্যে প্রবল আগ্রহের অধীনে খ্রীষ্ট এবং তাঁর অনুসারীদের উপর অত্যুৎসাহী হয়ে চড়াও হতো এবং তাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশকেও তারা নিজেদের ধর্মীয় দায়িত্ব বলে মনে করতো। মনে রাখুন, খ্রীষ্টের শিষ্যরা বিবেচনাবোধসম্পন্ন নির্যাতনকারীদের কাছ থেকেই অধিক দুঃখভোগ করেছেন; তারা তাদের সমাজ-ঘরে বেত্রাঘাত করতো, বাইরে ছুঁড়ে মারতো, খুন করতো আর ভাবতো– তারা ঈশ্বরের কাজ করছে (যোহন ১৬:২) এবং বলতো, 'ঈশ্বর এখন গৌরবান্বিত হলেন' (যিশাইয় ৬৬:৫; সখরিয় ১১:৪৫)। কিন্তু সমাজগৃহ এই প্রকার নির্যাতনের মাধ্যমে ঈশ্বরের সেবা করা থেকে দূরেই থাকবে কারণ নিঃসন্দেহে তা নির্যাতন, তা ধর্মবহির্ভূত বিষয় এবং তা সমাজগৃহ কে অপবিত্র করে।

(৩) মহান, ক্ষমতাবান মানুষদের কাছ থেকে: যিহূদীরা কেবল তাদের বেত্রাঘাতই করতো না উপরন্তু তাদের আরও ভয়ানক শাস্তি দেবার জন্য নিজেদের ক্ষমতার বাইরে গমন করতো। কিন্তু যখন তারা নিজেদের ক্ষমতাবলে তাদের নির্যাতন করতে পারতো না, তখন তারা তাদের রোমান শাসনকর্তাদের হাতে তুলে দিত; যেমনটা তারা খ্রীষ্টের বেলায় করেছিল (যোহন ১৮:৩০)। 'তারা তোমাদের রাজা ও শাসনকর্তাদের কাছে নিয়ে যাবে' (১৮ পদ)– যারা ক্ষমতা ধারণ করেন এবং আরও খারাপ ব্যবহার বা কঠিন শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। শাসনকর্তারা এবং রাজারা খ্রীষ্টের কাছ থেকে তাদের ক্ষমতা গ্রহণ করেন (হিতোপদেশ ৮:১৫) এবং তারা নিশ্চিতভাবেই তাঁর সেবক এবং তাঁর মণ্ডলীর রক্ষাকারী এবং সেবাকারী পিতা; কিন্তু প্রায়ই তারা তাদের ক্ষমতাকে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবহার করে থাকে, যা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মতো ব্যাপার– তারা মণ্ডলীর উৎপীড়ক হিসেবে আবির্ভূত হয়। পৃথিবীর রাজারা নিজেদের খ্রীষ্টের রাজ্যের বিরুদ্ধে স্থাপন করে (গীত ২:১, ২; প্রেরিত ৪:২৫,২৬)। মনে রাখুন, প্রায়ই এমনটা দেখা যায়, অনেক ভাল লোকও মহান লোকদের নিজেদের শত্রু হিসেবে পায়।

(৪) সব মানুষের কাছ থেকে (২২ পদ): 'সব লোক তোমাদের ঘৃণা করবে।' সব খারাপ লোক এবং তা হচ্ছে মানুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং এদের সংখ্যাও বেশি। গোটা পৃথিবী খারাপিতে ভরে গেছে। অর্থাৎ এখানে সাধারণীকরণ করা হয়েছে। খুব অল্প লোকই আছে যারা খ্রীষ্টের ধার্মিকতা ভালবেসে গ্রহণ করে, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, মান্য করে; যাদের আমরা বলতে পারি 'বন্ধু,' যারা বাকি ঘৃণাকারীদের চেয়ে আলাদা, যাদের পৃথিবী ঘৃণা করে। তারা সবাই বিপথে গিয়েছে এবং তাই আমার লোকদের খেয়ে ফেলছে (গীত ১৪:৩) । কেউ ঈশ্বরের পক্ষ ছেড়ে গেলে যতটা না তার চেয়ে ঈশ্বরভক্তদের বিরুদ্ধেই তাদের বেশি দেখা যায়; কখনও কখনও এটা অন্য সময়ের চেয়ে আরও সাধারণ ব্যাপার হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু এই বিষবাষ্প কিছুটা হলেও সব অবাধ্য সন্তানের ভেতর লুকিয়ে থাকে। পৃথিবী তোমাকে ঘৃণা করবে; কারণ পৃথিবীর লোক বিস্মিত হয়ে জন্তুর পেছনে যায় (প্রকাশিত বাক্য ১৩:৩)। প্রতিটি মানুষ মিথ্যাবাদী এবং সে কারণেই তারা সত্যকে ঘৃণা করে।

(৫) তাদের স্বজনদের কাছ থেকে। ভাই ভাইকে খুন করার জন্য ধরিয়ে দেবে (২১ পদ)। একজন মানুষ এই মতদ্বৈধতায় তার পিতার বিরুদ্ধে যাবে; শুধু তাই নয়, যারা দুর্বলতর এবং কোমল মানসিকতার, একই লিঙ্গের তারাও নির্যাতনকারী ও নির্যাতিতরূপে প্রকাশিত হবে। নির্যাতনকারী কন্যা তার বিশ্বস্ত মায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে– যেখানে স্বভাবতই তার সন্তানসুলভ দায়িত্ব পালনের কথা। অনেকে ভাবতে পারেন, মা ও মেয়ের মাঝে সম্পর্কের তিক্ততা মারাত্মক আকার ধারণ করবে না, কিন্তু যদি বউ শাশুড়ির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায় তবে তো পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে মোড় নিতে বাধ্য, যেহেতু বউ-শাশুড়ির শীতল সম্পর্ক প্রায়ই তর্ক বাধানোর উপলক্ষ খোঁজে (৩৫ পদ)। সাধারণভাবে, একজন মানুষের নিজের পরিবারের লোকেরাই তার শত্রু হবে (৩৬ পদ)। খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার জন্য শিষ্যরা তাদের বন্ধু-স্বজনকে শত্রু হিসেবে আবিষ্কার করবে। তারা তার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হবে এবং সুসমাচারের দরুন তিনি যখন কোন নির্যাতনের মুখোমুখি হবেন তখন তার আপন ভাই কিংবা পিতা আগ বাড়িয়ে নির্যাতনকারীদের সাথে যোগ দেবে।

মনে রাখুন, আত্মীয়তার মধ্যে ভালবাসা ও কর্তব্যের যে মজবুত বাঁধন রয়েছে– তা প্রায়শই খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিক্ষার কারণে বৈরিতায় ভেঙে যায়। এটা আসলে সঙ্কীর্ণ মানসিকতার ক্ষমতা, যা সত্য ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মিথ্যে ব্যাপারে অতি আগ্রহ দেখায়। এই উন্নাসিকতায় তারা সবচেয়ে পবিত্র, প্রার্থিত ও আবেদন সৃষ্টিকারী সুসমাচারকে প্রত্যাখ্যান করে। যারা ঈশ্বর এবং তাঁর অভিষিক্তের বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রদর্শন করে তারা তাদের শেকল ভেঙে ফেলে (গীত ২:২,৩)। খ্রীষ্টের কনেরা তাদের নিজ মায়ের সন্তানদের রাগের দরুন ভীষণ কষ্ট ভোগ করে (সোলায়ামন ১:৬)। এরকম দুঃখভোগ খুবই বেদনাদায়ক; এর চেয়ে ক্ষত আর কিছুই আঁকতে পারে না, কিন্তু তা করেছে আমারই সমান একজন মানুষ (গীত ৫৫:১২, ১৩); এবং এই ধরনের বৈরিতায় সাধারণত কোন দয়া দেখানো হয় না; ভাইয়ের দ্বারা অপমানিত হওয়া ভাই শক্তিশালী শহরের চেয়েও শক্ত (হিতোপদেশ ১৮:১৯)। শহীদতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রাচীন কিংবা আধুনিক উভয় প্রেক্ষাপটেই অভিন্ন ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। পুরো বিষয়ের উপর এটা দেখা যায় যে, যারা খ্রীষ্টে পবিত্রভাবে জীবন কাটায় তাদের জন্য দুঃখভোগ নিশ্চিত এবং অনেক ক্ষতি স্বীকারের মধ্য দিয়ে তারা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হন।

খ. এইসব বিপদের পূর্বাভাসের সাথে এখানে আমাদের জন্য পরামর্শ, সান্ত্বনা ও

ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়েছে যেন আমরা পরীক্ষার সময় সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি। চলুন দেখি তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়েছেন:

১. কীভাবে আমাদের চলতে হবে সে বিষয়ে:

(১) 'সাপের মতো ধূর্ত হও' (১৬ পদ)। 'তোমরা তা হবে (কেউ একে নিছক অনুমতি হিসেবে দেখেন); তোমরা প্রয়োজনমতো সতর্ক হবে– যা তোমাদের কবুতরের মতো বিপদমুক্ত করবে।' এই শিক্ষা আমাদের সেই সতর্কতার জ্ঞানের বিষয়ে বলে– যা বুঝতে হবে তাঁর পথ দ্বারা, যেহেতু তা সবসময়ের জন্য কার্যকর। বিশেষত দুঃখভোগের সময় এই জ্ঞান প্রয়োগ করতে হবে। 'যেহেতু তোমরা নেকড়ের পালে পড়া ভেড়ার মতো, তাই সাপের মতো ধূর্ত হও'; সেই জ্ঞানী হওয়াটা শিয়ালের মতো নয়, যার স্বভাবই হচ্ছে অন্যকে ঠকানো; বরং সাপের মতো, যার কৌশল হচ্ছে তাদের রক্ষার জন্য এবং তা তাদের নিরাপত্তার জন্য পরিবর্তিত হয়। খ্রীষ্টের শিষ্যরা সাপের মতো ঘৃণিত এবং নির্যাতিত হয়, তাদের জন্য ধ্বংস বরাদ্দ করা হয় এবং সে কারণেই তাদের সাপের মতো ধূর্ত হতে হবে। মনে রাখুন, এটা খ্রীষ্টের ইচ্ছা যে, তাঁর লোকেরা এবং প্রচারকেরা পৃথিবীতে সমস্যার মুখোমুখি হবে– যা তাদের জন্য স্বাভাবিক। তবে তাদের অপ্রয়োজনে নিজেদের প্রদর্শন করার দরকার নেই; বরং নিজেদের সুরক্ষার জন্যই তারা স্বচ্ছতার সাথে আইনানুগ জীবনযাপন করবে। খ্রীষ্ট আমাদের এই জ্ঞানের একটি উদাহরণ দিয়েছেন (২১:২৪, ২৫; ২২:১৭, ১৮, ১৯; যোহন ৭:৬, ৭)। নির্যাতনের সময় তিনি কোন কোনও ক্ষেত্রে শত্রুদের হাত গলে পালানোর সুযোগ করে দেন। পৌলের জ্ঞানের একটি নজির দেখুন (প্রেরিত ২৩:৬, ৭)। খ্রীষ্টের কারণে আমরা জীবনের সব স্বাচ্ছন্দ্য এমনকি জীবন হারাবার সম্ভাবনাকেও মেনে নিই, কিন্তু এর জন্যে আমাদের সেসব ব্যাপারে অমিতব্যয়ী হওয়া যাবে না। এটা হচ্ছে সেই জ্ঞান– যার দ্বারা সাপ তার মাথার নিরাপত্তা বিধান করে, যেন তা চূর্ণ না হয়, মন্ত্রপড়া সাপুড়ের স্বর না শোনার জন্য যে নিজেই তার কান বন্ধ করে রাখে (গীত ৫৮:৪, ৫) এবং আশ্রয়ের জন্য পাথরের খাঁজকে বেছে নেয়; এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা সাপের মতো ধূর্ত হতে পারি। আমাদের জ্ঞানী হতে হবে, নিজের মাথাকে আমরা সমস্যার দিকে আগ বাড়িয়ে গলিয়ে দেব না; আমরা জ্ঞানপূর্ণ আচরণ করব যেন শয়তানের সময়ে নীরব থাকা যায় এবং তাকে কোন সুযোগ তুলে না দেয়া যায়; এর মাধ্যমেই আমরা নিজেদের সাহায্য করতে পারি।

(২) 'কবুতরের মতো সরল হও', 'নম্র, শান্ত হও এবং উদ্বেগে আক্রান্ত হয়ো না। কাউকে আঘাত তো করা যাবেই না উপরন্তু কারও সম্পর্কে ক্ষতিকর কিছু করার কথা মাথায়ও এনো না; তিক্ততা ভুলে যাও। কবুতরের মতো নরম স্বভাব ধারণ কর, কারণ তিক্ততা-ক্ষোভের মনোভাব তোমার কাজকে বাধাগ্রস্ত করবে।' তাদের পাঠানো হয়েছে নেকড়ের মাঝে সেকারণেই তাদেরকে সাপের মতো সতর্ক থাকতে হবে কিন্তু যেহেতু তাদের ভেড়ার মতো করে পাঠানো হচ্ছে সেহেতু তাদের কবুতরের মতো নরম স্বভাবের হতে হবে। আমরা অবশ্যই জ্ঞানী হব, তবে তা নিজেদের খারাপ করার জন্য নয় কিন্তু অন্য যে কারও চেয়ে বেশি সঠিক হওয়ার জন্য। আমাদের অবশ্যই কবুতরের সারল্য ব্যবহার করতে হবে যেন বিশটি আঘাত সহ্য করা যায়, তথাপি ভুল করেও সাপের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কোন আঘাত ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। মনে রাখুন, খ্রীষ্টের শিষ্যদের সবসময়ের জন্য যত্নবান হতে হবে যেন তারা নির্দোষ থাকতে পারেন। কেউ যেন তাদের কথায় ও কাজে

কোন দোষ খুঁজে না পায়। শত্রুর বিষয়ে ভাবিত না হয়ে তাদের নিজ দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। আমাদের কবুতরের মতো অন্তঃকরণ প্রয়োজন যেন শিকারের পাখির মতো অবরুদ্ধ হয়েও আমরা তাদের ক্ষেপিয়ে না তুলি কিংবা নিজেরাও ক্ষেপে না যাই। দায়ূদ কবুতরের ডানার জন্য লোভ করেছিলেন যেন তিনি উড়ে গিয়ে বিশ্রাম নিতে পারেন; কিন্তু তিনি বাজপাখির ডানা চাননি। খ্রীষ্টের আত্মিক বংশধরেরা কবুতরের মতো এবং সব বিশ্বাসী খ্রীষ্টের আত্মার অংশী, যা কবুতরের মতো, যা তৈরি কেবল ভালবাসার জন্যই যুদ্ধের জন্য নয়।

(৩) 'মানুষের বিষয়ে সতর্ক হও' (১৭ পদ)। 'সব সময় নিজের রক্ষাকবচ পরিধান করে থাক এবং বিপদজনক সঙ্গ ত্যাগ কর, তুমি যা করছ বা বলছ সে বিষয়ে মনোযোগী হও এবং যাচাই না করে কারও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ো না; যা শোভন বলে প্রতীয়মান হয়– তার বিষয়ে ঈর্ষান্বিত হও'– 'বন্ধুর উপর বিশ্বাস স্থাপন কোরো না, এমনকি যে স্ত্রী তোমার বুকের মধ্যে শুয়ে থাকে তার কাছে কথা বলতে সাবধান থেকো (মীখা ৭:৫) ।' মনে রাখুন, হৃদ্যতার আতিশয্যে অনেকে সতর্ক থাকতে ভুলে যায়, ফলে সমস্যায় পড়ে। আমরা এখানে শিক্ষালাভ করি মানুষের প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শনে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কতটা অভাগা এক পৃথিবীতে আমরা বাস করি যেখানে আমরা জানি না কাকে বিশ্বাস করতে হবে। এখানেই আমাদের প্রভুর এক শিষ্য চুমু দ্বারা তাকে ধরিয়ে দিয়েছিল; তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। আমাদের তাই মানুষের বিষয়ে সাবধান হতে হবে, মিথ্যে ভাইদের কাছ থেকেও।

(৪) 'কী বলতে হবে তা নিয়ে ভেব না' (১৯ পদ): 'যখন তোমাদের বিচারকদের সামনে নিয়ে উপস্থিত করবে, তখন ভদ্রতার সাথে ব্যবহার কোরো কিন্তু একথা ভেবে নিজেকে কষ্ট দিয়ো না কীভাবে তা থেকে বেরিয়ে আসবে। প্রাসঙ্গিক ভাবনা আসতে পারে, কিন্তু উদ্বিগ্ন হয়ো না। বিভ্রান্তিকর, অমূলক ভাবনা ভেবে অস্থির হয়ে উঠ না। এ বিষয়ে চিন্তার ভার ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দাও, যেভাবে তোমরা খাবার ও পান করার চিন্তা তার কাছে সঁপে দাও সেভাবে।' আত্মপ্রসাদ লাভের জন্য ভাল বক্তব্য তৈরিতে অধ্যয়ন করবেন না; স্বাভাবিক কথনভঙ্গি বা উপস্থাপনায় অভিনবত্ব আনার জন্য তাতে মনোযোগী হবার কারণ নেই, তাতে আপনার বুদ্ধিদীপ্ততা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করবেন না এবং এজন্য টানা শ্রম দিয়ে সময় নষ্ট করবেন না, কারণ তা ব্যক্তির পাণ্ডিত্য জাহিরের ক্ষেত্রেই প্রবৃত্ত থাকে। প্রকৃতপক্ষে এর পেছনে যৌক্তিক উদ্দেশ্য থাকে না, বলা চলে তা লোক-দেখানো ও ব্যক্তিগত; এর উদ্দেশ্য নিজেকে প্রকাশ; যা সোনা তাকে নতুন করে ঘষে মেজে সোনা বলে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দরকার নেই। এক্ষেত্রে আপনার অধিকতর মনোযোগী হওয়াটা এটাই প্রকাশ করে যে, ঈশ্বরের বাক্য নিজের পক্ষে বলার জন্য যথেষ্ট নয়, আসলে যা লজ্জার ব্যাপার। আপনি যখন জানেন যে, কি বিষয়ে আপনাকে বলতে হবে তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা বলতে শুরু করুন। মূলত, আপনি যা চর্চা করেন উপযুক্ত সময়ে সেটাই আপনার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে। সেই তিন চ্যাম্পিয়নের মতো আর কেউ রাজা ও শাসকদের সামনে অত ভাল করে কথা বলতে পারেননি, যারা এ বিষয়ে আগে থেকে চিন্তা করেন নি– 'তখন শদ্রক, মৈশক ও অবেদ-নগো জবাবে রাজাকে বললেন, "হে মহারাজ নবুখদ্‌নিৎসর, এই ব্যাপারে আপনাকে উত্তর দেবার কোন দরকার আমরা মনে করি না"' (দানিয়েল ৩:১৬; গীত ১১৯:৪৬)। মনে রাখুন, খ্রীষ্টের শিষ্যরা অবশ্যই কীভাবে উপযুক্ত

কথা বলতে হবে– তা ভাবার চেয়ে কী করে উপযুক্ত কাজ করা যায় সে বিষয়ে বেশি ভাবিত হবেন; নিজেদের ধার্মিকতাকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরার চেয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে বিশ্বস্ত জীবনযাপনে তাদের অধিক মনোযোগী হতে হবে। আমাদের জীবন শ্রেষ্ঠ তর অনুশোচনায় গড়া, তা বাগাড়ম্বরের জন্য নয়।

(৫) 'যে গ্রামে তোমাদের নির্যাতন করা হবে সে গ্রাম ছেড়ে তোমরা অন্যত্র চলে যেয়ো' (২৩ পদ)। 'এভাবে যারা তোমাদের এবং তোমাদের শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করবে তাদেরও তোমরা প্রত্যাখ্যান করবে এবং কেউ যখন তোমাদের ও তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করবে না তখন তোমরাও অন্যত্র কাজ করার প্রয়াস পাবে। এই স্থানান্তরের মাধ্যমে তোমাদের নিরাপত্তাও বিধান হবে।'

মনে রাখুন, আসন্ন বিপদের ক্ষেত্রে খ্রীষ্টের শিষ্যরা পশ্চাদ যীশুরণের মাধ্যমে নিজেদের নিরাপদ করবে, যখন ঈশ্বর তাঁর প্রত্যাদেশে 'তাদের জন্য পালাবার পথ' খুলে রেখেছেন। যিনি পালিয়ে যাবেন তাকে হয়তো আবারও লড়াই করতে হবে। খ্রীষ্টের সৈনিকদের জন্য এই যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ মোটেও অগৌরবের নয়; কারণ তারা তো তাদের বৈশিষ্ট্য, কাজ থামিয়ে দিচ্ছেন না। তারা সংকটাপন্ন পথ থেকে কেবল স্থানত্যাগ করছেন– তারা তাদের কর্তব্য সম্পর্কে বিস্মৃত হচ্ছেন না; নিজেদের কাজও থামিয়ে দিচ্ছেন না। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের জন্য কতটা চিন্তা করেন! তিনি তাদের পশ্চাদ যীশুরণ এবং আশ্রয়ের স্থানের বিষয় বলে দিচ্ছেন; এবং সেইমতো কাজ করার আদেশও দিচ্ছেন; এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় যে, নির্যাতনের স্বরূপ একই সময়ে সব জায়গায় একই রকম থাকবে না। কিন্তু যখন একটি গ্রাম তাদের জন্য উত্তপ্ত হয়ে উঠবে তখন তাদের জন্য আরেকটি শীতল ছাউনি সংরক্ষিত থাকবে; এবং একটু নিরাপদ আশ্রয়; যে আনুকূল্য তাদের জন্য ব্যবহৃত হবে তা অল্প কিংবা অসম্মানের নয়। তবে এই বিধান পাপে পূর্ণ কিংবা বেআইনি কাজ করে পালিয়ে যাওয়ার কথা বলছে না বরং তা সর্বদা এর বিরুদ্ধে; তা এই প্রকার লোকদের পলায়নে ব্যবহৃত হবে না, কারণ তা ঈশ্বরের 'খোলা দরজা' নয়। খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যেরা– উভয়ের বেলায় আমরা এই নিয়মের প্রয়োগ দেখতে পাই। সুনির্দিষ্ট ঘটনাবলিতে তাদের এই নিয়মের প্রয়োগের নির্দেশনায় জ্ঞান এবং বিশ্বস্ততা জয়ী হয়েছে।

(৬) 'তাদের ভয় কোরো না (২৬ পদ), কারণ তারা কেবল তোমাদের দেহটাকে মেরে ফেলতে পারে' (২৮ পদ)। মনে রাখুন, খ্রীষ্টের শিষ্যদের দায়িত্ব এবং আগ্রহ থাকবে যে, তারা তাদের শক্তিধর শত্রুকেও ভয় করবে না। যারা সত্যিকারভাবে ঈশ্বরকে ভয় করে তারা মানুষকে ভয় করবে না; এবং যারা ন্যূনতম পাপকেও ভয় পায়, তাদের মহা সমস্যাকে ভয় পাবার কোন কারণ নেই। মানুষের ভয়ই মানুষকে ফাঁদে ফেলে যে ভয় বিব্রতকর– তা আমাদের শান্তিকে বিঘ্নিত করে; ভয় সাধারণত জটিল সমস্যায় ফেলে দেয়, যা আমাদের সামনে পাপের কারণে আসে এবং সে কারণেই আমাদের যত্নের সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে থাকতে চেষ্টা করতে হবে, প্রার্থনা করতে হবে। সময়কে কঠিন করে তুলবেন না, শত্রুকে কখনও চরম নিষ্ঠুর করে তুলবেন না এবং কোন উপলক্ষকে হুমকির পর্যায়ে নিয়ে ফেলবেন না। তবে আমাদের ভয় পাওয়ার কারণ নেই। যদিও পৃথিবী আমাদের ত্যাগ করে তবুও আমরা ভয় করব না; কারণ আমাদের কাছে সবচেয়ে ভাল বিষয়টিই আছে, আর তা হচ্ছে ঈশ্বরের সান্নিধ্য। আমাদের জন্য যা শ্রেষ্ঠ তর আশা এবং এই আশা তাঁর অনুগ্রহের মধ্য দিয়েই আসে।

হ্যাঁ, এটা বলা খুব সহজ কিন্তু যখন বিপদ এগিয়ে আসে, উৎপীড়ন এবং নির্যাতন নেমে আসে, অন্ধকার কারাপ্রকোষ্ঠে তাদের ছুড়ে ফেলা হয়, বন্দি হিসেবে জাহাজে করে নিয়ে যাওয়া হয়, কুঠারাঘাত কিংবা ফাঁসিকাঠের মুখে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়, আগুন ও জ্বালানি কাঠের বোঝা তাদের গায়ে ঠেসে ধরা হয়– তখন তা কার্যকর করা খুবই কঠিন। কারণ এগুলো আতঙ্কিত হবার মতো ব্যাপার, তা সবলতর হৃদয়কেও কাঁপিয়ে দিতে সক্ষম এবং তা পেছনমুখী হতে প্ররোচিত করে। বিশেষত যখন তা সরল হয় তখন সেগুলোকে কয়েক কদম পিছু হটার মাধ্যমে এড়ানো যায় এবং সেই কারণে এই পরীক্ষার বিরুদ্ধে আমাদের সমর্থ করে তুলতে এখানে গুরুত্বপূর্ণ ক'টি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

(ক) এই ভয়ের বিপরীতে একটি ভাল কারণ, তা বলে দেয় যে শত্রুর ক্ষমতা সীমিত, তারা কেবল দেহকেই মেরে ফেলতে পারে, যা তারা পূর্ণমাত্রায় ক্রোধান্ধ হলে করে থাকে। তারা ততদূরই অগ্রসর হতে পারে যতখানি ঈশ্বর তাদের অনুমতি দেন, কিন্তু এর বেশি নয়। তারা আত্মাকে মেরে ফেলতে পারে না কিংবা এর কোন ক্ষতিও সাধন করতে পারে না। সেই আত্মা প্রকৃত অর্থে যা মানুষের প্রকৃত পরিচয় অর্থাৎ আত্মিক পরিচয়-তাকে বিনষ্ট করতে পারে না। এর মধ্য দিয়ে দেখা যায়, মৃত্যুতে আত্মা ঘুমিয়ে পড়ে না (যেভাবে কেউ স্বপ্ন দেখে) কিংবা চিন্তা ও সচেতনতা নির্জীব হয়ে পড়ে না; কারণ তখন দেহের হত্যাকাণ্ড রূহেরও হত্যাকাণ্ড হবে। আত্মা খুন হয় যখন তা ঈশ্বর ও তাঁর ভালবাসা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যা হচ্ছে এর জীবন এবং তা তার রাগের বাহন (জলযান) হিসেবে তৈরি। এখন, লোকদের ক্ষমতা তা ছুঁতে পারে না; তা এর বাইরে। সমস্যা, নির্যাতন, দুঃখভোগ আমাদের পুরো পৃথিবী থেকে আলাদা করতে পারে কিন্তু ঈশ্বর ও আমাদের মাঝে যে সম্পর্ক– তা ছিন্ন করতে পারে না। তাঁকে ভালবাসতে, তাঁর কাছ থেকে ভালবাসা পাওয়া কেউ ঠেকাতে পারে না (রোমীয় ৮:৩৫, ৩৭)। যদি সেকারণেই আমাদের মূল্যবান রত্ন হিসেবে আমরা আমাদের আত্মা সম্পর্কে বেশি সজাগ থাকি তবে আমরা মানুষের ভয়ে ভীত হব না। কারণ তারা এই অমূল্য রত্নকে চুরি করে নিয়ে যেতে পারে না; তারা কেবল দেহটাকেই মেরে ফেলতে পারে– যা এমনিতেই একসময় মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু আত্মাকে তারা মেরে ফেলতে অক্ষম। তারা কেবল কাঠামোটাকে ধ্বংস করতে সক্ষম। একজন অবিশ্বাসী এই কথায় উদ্ধত হয়ে অন্যকে নিয়ে লিখেছিলেন, 'আপনি অ্যানাজারকুসের ব্যাপারে খারাপ চিন্তা করতে পারেন কিন্তু অ্যানাজারকুসকে আঘাত করতে পারেন না।' দামি মুক্তা অস্পৃশ্য থেকে যায়। সেনেকা এর অর্থ বের করার ভার নেন যে, 'আপনি একজন জ্ঞানী এবং ভাল মানুষকে আঘাত করতে পারেন না, কারণ মৃত্যু তার কাছে কোন ভয়ের ব্যাপার নয়।' যদি আমরা শান্ত ও সমাহিতভাব নিয়ে সেই চূড়ান্ত আঘাতের মোকাবিলা করতে পারি তবে নির্দয়-পীড়নকারীর ক্ষতি করার কিছুই থাকে না। এই চূড়ান্ত আঘাতের মধ্য দিয়ে নির্যাতনকারী কেবল যে আইন ভাঙ্গে তা নয়, উপরন্তু যার মাঝে তার সৌভাগ্য নিহিত ছিল সেই সাম্রাজ্যকেও সে চুরমার করে। আমরা জানি যে, 'মৃত্যু আমাদের প্রধান শত্রু নয়, কারণ তা আত্মার ক্ষতি সাধন করতে অক্ষম এবং তা আঘাত ফিরিয়ে দেবার উপলক্ষও তৈরি করে না'– সেনেকা।

(খ) এর বিরুদ্ধে একটি ভাল প্রতিষেধক রয়েছে এবং তা হচ্ছে ঈশ্বরকে ভয় করা। তাকে ভয় করুন যিনি দেহ ও আত্মাকে ধ্বংস করে নরকে ফেলতে পারেন। মনে রাখুন,

প্রথমত, নরক হচ্ছে দেহ ও আত্মার ধ্বংস। তা ভিন্ন কোন সত্তার জন্য নয় বরং ভাল-

মন্দ উভয়ের জন্যই। এই ধ্বংস হচ্ছে সব মানুষের, 'আত্মা যদি হারিয়ে যায় তাহলে দেহও হারিয়ে গেছে।' তারা একত্রে পাপ করেছে, পাপ করার ক্ষেত্রে দেহই আত্মাকে প্রলোভিত করেছিল এবং এর সরঞ্জাম পাপে এবং তারা অবশ্যই অনন্তকাল ধরে একসাথে দুঃখভোগ করবে।

দ্বিতীয়ত, এই ধ্বংস আসবে ঈশ্বরের ক্ষমতা থেকে। তিনি ধ্বংস করতে সক্ষম; এই ধ্বংস আসে তার গৌরবান্বিত ক্ষমতা থেকে (২ থিষলনীকীয় ১:৯); তিনি এর মধ্য দিয়ে তাঁর ক্ষমতাকে পরিচিত করে তুলবেন; কেবল তার শাসনক্ষমতা নয় কিন্তু তার সক্ষমতা যা শাসন বিধান করে (রোমীয় ৯:২২)।

তৃতীয়ত, ঈশ্বর সেই কারণেই ভয়ের পাত্র, এমনকি মহান সাধকদের কাছেও। ঈশ্বরের প্রতি ভয়ের কথা জেনে আমরা মানুষকে তার পথে স্থির থাকতে, তাঁকে ভয় করার জন্য প্ররোচিত করি। যদি তাঁর ভয় এরকম প্রবল হয় তবে তার রাগ ও ভয় জাগানো। তাই তাঁর ক্রোধের কথা চিন্তা করে হলেও তাঁর প্রতি মনে ভয় পোষণ করা উচিত। কারণ কেউই তার ক্রোধের ক্ষমতা সম্পর্কে জানে না (গীত ৯০:১১)। যখন আদম নির্দোষ অবস্থায়ও হুমকির দ্বারা ভীত ছিল, সেখানে খ্রীষ্টের কোন শিষ্য যেন একথা না ভাবে যে, পবিত্র ভয়ের প্রতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করার কোন দরকার নেই। মানুষের মধ্যে সে সুখী যে সর্বত্র ভয় করে চলে। অব্রাহামের ঈশ্বর যিনি তখন মৃত ছিলেন, তাকে বলা হতো ইসহাকের ভয়, তবে তিনি এখন জীবিত আছেন (আদি ৩১:৪২, ৫৩)।

চতুর্থত, ঈশ্বরের ভয় এবং তাঁর ক্ষমতা আত্মায় কাজ করে, তা মানুষের প্রতি ভয়কে প্রতিরোধ করে (শাসন করে)। ঈশ্বরের রোষানলে পড়ার চেয়ে পুরো পৃথিবীর রোষে পড়া অনেক ভাল। সেই কারণে যেভাবে তা নিজে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সঠিক, তেমনি তা আমাদের জন্য নিরাপদ– মানুষকে মান্য করার চেয়ে ঈশ্বরের বাধ্য থাকা উচিত (প্রেরিত ৪:১৯)। যারা মানুষের ভয়ে ভীত তারা মারা যাবে, কারণ তারা ভুলে গেছে ঈশ্বরই তাদের সৃষ্টি করেছেন (যিশাইয় ৫১:১২, ১৩; নহিমিয়া ৪:১৪)।

(৭) এখন তোমাদের অন্ধকারে বলছি কিন্তু একসময় তা আলোতে বলা হবে (২৭ পদ); 'তোমরা যে বিপদের মধ্য দিয়েই যাও, অনন্তকালীন সুসমাচারকে পৃথিবীর কাছে প্রকাশ ও ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে তোমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাও; সেটা তোমার কাজ, এটা মাথায় রেখ। শত্রুদের পরিকল্পনা কেবল তোমাকে ধ্বংস করা নয়, বরং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তোমাকে সুসমাচার প্রচার করা থেকে বিরত রাখাই তার উদ্দেশ্য। মূল লক্ষ্য সেটাই– সুসমাচার যেন প্রচারিত না হয়।' আমি তোমাদের যা বলছি তোমরা তা বলবে। মনে রাখুন, প্রেরিতেরা আমাদের কাছে যা প্রকাশ করেছেন তা হচ্ছে সেই একই ব্যাপার যা তারা খ্রীষ্টের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন (ইব্রীয় ২:৩)। খ্রীষ্ট তাদের যা বলেছেন তারা তাই ব্যক্ত করেছেন– তার সবকিছুই এবং এর কিছুই তারা বাদ দেন নি। সেই প্রতিনিধিরা তাদের নির্দেশনা গ্রহণ করেছিলেন গোপনে, অন্ধকারে, কানে, কোনে বসে, উদাহরণের মাধ্যমে। খ্রীষ্ট অনেক কথাই প্রকাশ্যে বলেছেন এবং লোকদের যে শিক্ষা দিতেন তার সাথে গোপনে যা বলতেন তার তারতম্য ঘটতো না (যোহন ১৮:২০)। কিন্তু নির্দিষ্ট নির্দেশনা যা তিনি তার পুনরুত্থানের পর শিষ্যদের দিয়েছিলেন– যা ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় সংশ্লিষ্ট ছিল– তা কানে কানে বলা হয়েছিল (প্রেরিত ১:৩), কারণ তখন তিনি নিজেকে প্রকাশ্যে দেখান নি। কিন্তু তারা সেই কথা প্রচার করেছিলেন জনসমক্ষে, আলোতে

এবং ঘরের উপরে; কারণ সুসমাচারের শিক্ষা সবাই জানতে পারবে (হিতোপদেশ ১:২০, ২১; ৮:২, ৩)। সেই কারণেই যে কান তাঁর কথা শুনেছে– তা তাঁকে বাইরের লোকদের কাছে তুলে ধরুক। মণ্ডলীতে অযিহূদীদের গ্রহণের ব্যাপারে প্রথম নির্দেশনা ছিল বাড়ির উপর (প্রেরিত ১০:৯)। মনে রাখুন, খ্রীষ্টের সুসমাচারে এমন কোন অংশ নেই– যা লুকোছাপা করার প্রয়োজন আছে; ঈশ্বরের সব পরামর্শ প্রকাশিত হবে (প্রেরিত ২০:২৭); জনতার প্রকার যত ভিন্নই হোক না কেন সুসমাচারকে সম্পূর্ণ ও সরলভাবে প্রকাশ করতে কখনও কুণ্ঠিত হবেন না।

২. উৎসাহ ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় বাতলে দেবার মাধ্যমে। এখানে সেই উদ্দেশ্যে অনেক কিছু বলা হয়েছে এবং ক্ষুদ্র সব বিষয়ে, তাতে অনেক কঠিন সমস্যা যার সাথে তাদের চলতে হবে, তাদের কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে এইসব কঠিন সমস্যার মধ্য দিয়ে চলতে হবে এবং তাদের বর্তমান দুর্বলতা, যা প্রকৃতই আছে, সেই হিসেবে কোন ক্ষমতার সমর্থন ছাড়া তারা যেন অপ্রতুলভাবে বহন করতে পারে, এমনকি এরকম ব্যবহারের প্রত্যাশা থাকবে; খ্রীষ্ট সেই কারণেই তাদের দেখালেন যে, কেন তাদের আনন্দিত হতে হবে।

(১) এখানে একটি বাক্য তাদের বর্তমান মিশনের ক্ষেত্রে অদ্ভুত বলে দৃষ্ট হয় (২৩ পদ)। ইস্রায়েলের সব গ্রাম ও শহরে তোমাদের কাজ শেষ হবার আগেই মনুষ্যপুত্র আসবেন। তারা এই মনুষ্যপুত্রের রাজ্য কাছে এসে গেছে বলে প্রচার করতেন। তারা এই বলে প্রার্থনা করতেন– তোমার রাজ্য আসুক: এখন ইস্রায়েলের সব গ্রাম ও শহরে তাদের কাজ শেষ হবার আগে– এভাবে প্রার্থনা এবং প্রচার কাজ সম্পন্ন হবার আগে, যা খ্রীষ্টের বিজয় ডঙ্কা বাজাবে– পবিত্র আত্মা তাদের উপর নেমে আসবেন। এটা ছিল একটি উৎসাহের বাণী,

(ক) তারা যা বলবে তা ভালভাবে ঘটবে, তারা বলেছিলেন মনুষ্যপুত্র আসছেন এবং দেখ তিনি এসেছেন। খ্রীষ্ট তাঁর সংবাদবাহকদের কথাকে নিশ্চিত করেন (যিশাইয় ৪৪:২৬)। (খ) তা ভালভাবে শীঘ্রই ঘটবে। মনে রাখুন, এটা ভেবে খ্রীষ্টের কর্মীরা সান্ত্বনা পাবেন যে, তাদের কাজের সময় কমিয়ে আনা হবে এবং তা শীঘ্রই শেষ হবে; ভাড়া করে আনা লোকের দিন রয়েছে, কাজ এবং লড়াই অল্প সময়ের মধ্যে সমাধা হবে।

(গ) তখন তারা উচ্চতর অবস্থানে অগ্রসর হবেন। যখন মনুষ্যপুত্র আসবেন তখন তারা উপর থেকে মহাক্ষমতা লাভ করবেন; এখন তাদের অন্যত্র পাঠানো হচ্ছে প্রতিনিধি বা মুখপাত্র হিসেবে কিন্তু অল্প সময়ে তাদের কাজের বিস্তৃতি ঘটবে এবং পূর্ণক্ষমতা পেয়ে রাজদূত হিসেবে তারা গোটা পৃথিবীতে যাবেন।

(২) এখানে তাদের স্বাভাবিক কাজকর্মের সাথে জড়িত কতগুলো কথা বলা হয়েছে এবং সেই সমস্যাগুলো সম্পর্কে– যা তারা এই কাজ করতে গিয়ে প্রত্যক্ষ করবেন। যা প্রকৃতই সান্ত্বনা ও উৎসাহ জোগায়।

(ক) তাদের দুঃখভোগ হবে তাদের ও অযিহূদীদের কাছে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য (১৮ পদ)। 'যিহূদীদের বিচারসভাগুলো যখন তোমাদের রোমীয় শাসকদের কাছে হস্তান্তর করবে– যেন তারা তোমাদের মেরে ফেলতে পারে, তোমার জীবন এভাবে এক বিচারাসন থেকে অন্যত্র যাবে– তখন তা তোমাকে আরও বেশি লোকজনের কাছে সাক্ষ্য দেবার সুযোগ করে দেবে এবং তা তোমাদের কাছে সুযোগ হয়ে আসবে যেন তোমরা অযিহূদীদের কাছেও সুসমাচার দিতে পার, যেভাবে যিহূদীদের কাছে দিয়েছ। শুধু তা-ই নয়, এইসব

সমস্যা মোকাবিলা করার মধ্য দিয়ে তুমি তাদের কাছে তোমার সাক্ষ্যের সত্যতা ও অ-নবার্যতা তুলে ধরতে সক্ষম হবে। মনে রাখুন, ঈশ্বরের লোকেরা এবং বিশেষভাবে ঈশ্বরের প্রচারকেরা হচ্ছেন তাঁর সাক্ষী (যিশাইয় ৪৩:১০), তা কেবল তাদের কাজেই নয়, উপরন্তু তাদের দুঃখভোগেও পরিলক্ষিত হয়। সে কারণেই তাদের বলা হয় শহীদ– খ্রীষ্টের কারণে সাক্ষ্যমৃত্যুবরণকারী। আর তা প্রকাশ করে যে, তাঁর সত্য হচ্ছে সন্দেহের উর্ধ্বে, তা বিশ্বাসযোগ্য এবং মূল্যবান; এবং তাঁর জন্য সাক্ষী হওয়ার মধ্য দিয়ে তারা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় যারা তাঁকে এবং তাঁর সুসমাচারকে অগ্রাহ্য করেছে; তাই তারা নিজেরাই তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হয়। উভয় দিক থেকেই তাদের সাক্ষ্য এদের বিরুদ্ধে যায় এবং সেই সাক্ষ্য সেই মহান দিনে যখন সাধুরা পৃথিবীর বিচার করবেন সেদিন একে ভিত্তি হিসেবে ধরা হবে; এবং সেই শাসনের কারণ হবে, 'তোমরা এদের অগ্রাহ্য করেছ, তার মানে আমাকেই অগ্রাহ্য করেছ।' এখন, যদি তাদের দুঃখভোগও একটি সাক্ষ্য হয়, তাহলে কত আনন্দের সাথেই না তারা তা বহন করতে প্রস্তুত থাকবে! কারণ তারা না আসা পর্যন্ত তাদের সাক্ষ্য শেষ হবে না (প্রকাশিত বাক্য ১১:৭)। যদি তারা খ্রীষ্টের সাক্ষী হয় তবে তারা এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকবে যে, তাদের দায়িত্ব বহন করা হবে।

(খ) তারা সব উপলক্ষে ঈশ্বরের সান্নিধ্য-সাহায্য পাবে এবং তার পবিত্র আত্মার তাৎক্ষণিক সাহায্য লাভ করবে। নির্দিষ্ট করে বললে, শাসক ও রাজাদের সামনে তাদের যখন আত্মসাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডাকা হবে তখন কী বলতে হবে তা তাদের যোগানো হবে; তাদের মুখে ভাষা যোগানো হবে; খ্রীষ্টই এই নিশ্চয়তা দিয়েছেন। খ্রীষ্টের শিষ্যদের পৃথিবীর অশিক্ষিত, অবহেলিত, মূর্খদের মাঝ থেকে বেছে নেওয়া হয়েছিল এবং সেকারণেই তারা নিজেদের সক্ষমতার প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়তে পারেন, বিশেষভাবে যখন তারা শিক্ষিত মহান মানুষদের সামনে গিয়ে কিছু বলতে চাইবেন। মোশিকে যখন ফরৌণের কাছে পাঠানো হয়েছিল তখন তিনি অনুযোগ করে বলেছিলেন, আমার কথা জড়িয়ে যায়, আমি তোতলা (যাত্রা ৪:১০)। যিরমিয়কে রাজ্যগুলোতে যেতে বলায় তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন, আমি তো নিতান্তই শিশু (যিরমিয় ১:৬, ১০)। এখন এই পরামর্শে যে উত্তরটি আসে, প্রথমত তাদের কাছে এখানে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে যে, কী বলতে হবে তা তাদের যুগিয়ে দেওয়া হবে, তবে তা আগেভাগে নয় বরং উপযুক্ত সময়ে তা যোগানো হবে। কোন প্রস্তুতি ছাড়াই তারা কথা বলবেন এবং তবুও তারা আলোচ্য বিষয়ের উপর অনেক বেশিই বলতে সক্ষম হবেন। যদি সে বিষয়ে তাদের প্রচুর পড়াশোনা, আগাম অধ্যয়ন না-ও থাকে তবুও তারা তা বলতে সমর্থ হবেন। মনে রাখুন, ঈশ্বর যখন আমাদের তাঁর পক্ষে কথা বলার জন্য ডেকে আনেন, আমরা যেন তাঁর উপর নির্ভর করি যে, তিনি আমাদের কী বলতে হবে তা শিখিয়ে দেবেন। এমনকি তখনও যখন আমরা ব্যাপক অক্ষমতা এবং নিরুৎসাহের সাথে বুঝতে থাকি। দ্বিতীয়ত, তাদের এখানে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে যে, অনুগ্রহের আত্মা তাদের জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করবেন। এটা এমন নয় যে, 'তোমরা বলছো, কিন্তু তোমার পিতার আত্মাই তোমার মধ্য দিয়ে কথা বলছেন' (২০ পদ)। এরকম উপলক্ষে তাদের অসহায়ভাবে ছেড়ে দেওয়া হবে না কিন্তু ঈশ্বর তাদের ভার নেবেন; তার জ্ঞানের আত্মা তাদের মধ্য দিয়ে কথা বলবেন, যেভাবে কখনও কখনও তাঁর প্রত্যাদেশ বিস্ময়করভাবে তাদের সাথে কথা বলে এবং উভয়ের সাথে একত্রে তাদের বিবেক-বুদ্ধিকে গ্রন্থিত করে– এমনকি তাদের নির্যাতনকারীদের সম্পর্কেও। ঈশ্বর তাদের সামর্থ্য

দিয়েছেন– তা কেবল তাঁর উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলার জন্য নয় কিন্তু তারা যা বলেন তা যেন তাদের পবিত্র আগ্রহ-বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষা থেকেই বলেন। সেই একই আত্মা তাদের পুলপিটে, বিচারসভায় সাহায্য করেছেন। ঈশ্বরের সাহায্য ছাড়া তারা তা করতে পারেন না, তিনি আইন-উপদেষ্টা হিসেবে তাদের সুপরামর্শ দেন– যেভাবে তিনি মোশিকে বলে দিয়েছিলেন (যাত্রা ৪:১২)– 'যাও, আমি তোমার সাথে থাকব তোমার মুখ ও হৃদয়ে থেকে।'

(গ) যে শেষ পর্যন্ত তাতে স্থির থাকবে সে রক্ষা পাবে (২২ পদ)। যারা কষ্ট সহ্য করেন তাদের জন্য এটা পরম সান্ত্বনার বাণী। প্রথমত, এইসব সমস্যার শেষ আছে; তাদের দীর্ঘ সময় তা সহ্য করতে হবে কিন্তু তা অনন্তকাল ধরে নয়। খ্রীষ্ট নিজেকে একথা দ্বারা সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং তাই তার শিষ্যরাও এই কথায় নিজেদের সান্ত্বনা দিতে পারেন: 'আমার বিষয়ে যা লেখা আছে তা পূর্ণ হতে যাচ্ছে' (লূক ২২:৩৭)। ঈশ্বর এগুলোকেও শেষ অবস্থায় আনবেন, পূর্ণ করবেন। মনে রাখুন, আমাদের সমস্যাগুলোর সময়ের বিশ্বাসকৃত দর্শন হবে এর ব্যবহার সংশ্লিষ্ট– তা আমাদের তাতে স্থির থাকতে সাহায্য করবে। ক্লান্ত লোক বিশ্রাম পাবে যখন মন্দ লোক সমস্যা নিয়ে আসা বন্ধ করে দেবে (ইয়োব ৩:১৭)। ঈশ্বর একটি প্রত্যাশিত শেষ দেখাবেন (যিরমিয় ২৯:১১)। দুঃখের দিনগুলোর মতো সমস্যাগুলো সহ্যের অতিরিক্ত মনে হতে পারে কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, সেগুলো বেশিদিন থাকবে না।

দ্বিতীয়ত, যখন তারা তা নিয়মিত করবে তখন তারা সহ্য করতে পারবে। যেহেতু তারা পৃথিবীতে অনন্তকাল ধরে বেঁচে থাকবে না, তাই তা সহ্য করার মতো হবে; তাদের তা সহ্য করতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত তা করে যেতে হবে, কারণ নির্যাতনভোগী এর মধ্য দিয়েই অনন্তকালীন জীবনের জন্য তৈরি হয়। সেই শক্তি হবে সেই দিন অনুসারে (১ করিন্থীয় ১০:১৩)।

তৃতীয়ত, যারা শেষ পর্যন্ত সহ্য করে যাবে তারা সবাই অনন্তকালীন ক্ষতিপূরণ হিসেবে কাঙ্ক্ষিত পরিত্রাণ লাভ করবে। ঝড়ো আবহাওয়া, পথও নোংরা কিন্তু এর পরিণতি সবার জন্য প্রশান্তিই বয়ে আনবে। গৌরবের মুকুট পাবার যে আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাস তা যুগে যুগে ঈশ্বরভক্তদের প্রেরণা, সাহস যুগিয়েছে– এ থেকেই তারা দুঃখভোগ করার প্রয়োজনীয় শক্তি পেয়েছেন (২ করিন্থীয় ৪:১৬; ১৭, ১৮; ইব্রীয় ১০:৩৪)। এটা কেবল আমাদের কষ্ট সহ্য করতেই উৎসাহ দেয় না উপরন্তু তা আমাদের শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে আরও ব্যস্ত, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে তোলে; সেই লক্ষ্যই আমাদের অবিচল রাখে। যারা অল্প সময়ের জন্য স্থির থাকে কিন্তু পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে ছিটকে যায়, তারা অনর্থক দৌড়াদৌড়ি করে এবং তারা যা কিছু পাবার উদ্দেশ্যে কাজ করে তা হারাবে। যারা লক্ষ্যটাকেই হারিয়েছে তারা কী করে সাফল্যের আশা করে! এর স্থলে যারা একে সংরক্ষণ করে তারা পুরস্কারের বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারে এবং কেবল তারাই সেই পুরস্কার পাবে। 'তুমি মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বস্ত থেক' এবং যারা তা করবে তারা জীবনমুকুট পাবে।

(ঘ) খ্রীষ্টের শিষ্যরা যতপ্রকার কঠিন পরীক্ষা আছে তার মুখোমুখি হবে, তবে তা এর আগে তাদের প্রভু যা মোকাবিলা করেছেন তার চেয়ে বেশি নয় (২৪, ২৫ পদ)। শিষ্যরা তাদের প্রভুর চেয়ে বড় নয়। আমরা একে পাই একটি কারণ হিসেবে, কেন তারা ক্ষুদ্র কাজ করতেও ইতস্তত করবে না– অন্যের পা ধুয়ে দিতে আপত্তি করবে না, বরং হাসিমুখেই তা

করবে (যোহন ১৩:১৬)। এখানে একে দেওয়া হয়েছে একটি কারণ হিসেবে, কেন তারা কঠিনতম দুঃখভোগে পড়বে না। তাদের এই কথাটি মনে করিয়ে দেওয়া হল (যোহন ১৫:২০)। এটা একটি বহুল পরিচিত প্রবাদ যে, চাকর তার মনিবের চেয়ে বড় নয় এবং সে কারণেই সে তার চেয়ে বেশি বেতন পাবার প্রত্যাশা না করুক।

মনে রাখুন, প্রথমত, যীশু খ্রীষ্ট আমাদের প্রভু, আমাদের শিক্ষাগুরু এবং আমরা তাঁর শিষ্য, আমরা তাঁর কাছ থেকে শিখি। তিনি আমাদের জীবনের প্রভু-শাসনকর্তা এবং আমরা তাঁর সেবক হিসেবে তাঁকে মান্য করি: তিনি বাড়ির মালিক, মণ্ডলীর একচ্ছত্র অধিপতি। দ্বিতীয়ত, যীশু খ্রীষ্ট– আমাদের প্রভু ও মনিব– পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম পীড়ন, কটুবাক্য সহ্য করেছেন, তারা তাঁকে বলেছে বেলসবুল, মাছিদের দেবতা, যা মন্দ-আত্মাদের প্রধানের নাম, তার সাথে জড়িয়ে তারা বলেছে তিনি 'বাহিনী'। মানুষের খারাপির এরূপ উদাহরণ আমাদের বিস্মিত করে। এভাবেই লোকেরা খ্রীষ্টকে অগ্রাহ্য এবং তাঁর ক্ষমতাকে অবজ্ঞা করেছে। যদিও এভাবে অগ্রাহ্য হতে তিনি নিজেই নিজেকে নিচু করেছিলেন– গৌরবের ঈশ্বর মাছিদের ঈশ্বর হিসেবে, ইস্রায়েলের রাজা ইকরোনের ঈশ্বর হিসেবে, জীবন ও আলোর শাহেনশাহ মৃত্যু এবং অন্ধকারের ক্ষমতার রাজা হিসেবে কলঙ্কিত হবেন। শয়তানের চিরশত্রু এবং নিধনকারী হওয়া সত্ত্বেও লোকেরা তাঁকে শয়তানের দলে ভিড়িয়ে দিয়েছিল; তথাপি তিনি পাপীদের সত্যিকারের দ্বান্দ্বিকতাকে সহ্য করলেন। তৃতীয়ত, খ্রীষ্ট এই পৃথিবীর যে অসুস্থ প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছেন সেই বিবেচনায় আমরাও যেন এরকম ব্যবহার পেতে প্রস্তুত থাকি এবং তা যেন আমাদের কাছে চমকের কারণ হয়ে না আসে উপরন্তু সাহসিকতা ও ধৈর্যের সাথে আমরা যেন তা সহ্য করতে তৈরি থাকি। একে যেন আমরা অদ্ভুত বলে না ভাবি, যারা তাঁকে ঘৃণা করেছে তারা যে তাঁর জন্য আমাদেরও ঘৃণা করবে এতে আর অস্বাভাবিকতার কী আছে? অধিকন্তু একে কঠিন বলেও ভাবা যাবে না; কারণ তার মতো গৌরবের ভাগী হতে 'অতি দ্রুত' করার মতো কিছু কিংবা সংক্ষিপ্ত কোন পথ খোলা নেই। তবে তারা পরবর্তীতে শীঘ্রই সেই গৌরবের ভাগী হবে কিন্তু এখন তাদের তাঁর মতো দুঃখভোগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে হবে। খ্রীষ্ট তিক্ত পেয়ালায় শুরু করেছিলেন, তাই আমাদেরও তাঁর অনুসরণ করাকে ব্রত হিসেবে নিতে হবে; তাঁর ক্রুশবহন আমাদের এ কাজকে সহজ করেছে।

(ঙ) লুকানো সব কিছুই প্রকাশিত হবে (২৬ পদ)। আমরা এখানে বুঝি প্রথমত, পৃথিবীর সব মানুষের কাছে সুসমাচার প্রকাশিত হবে। 'তোমরাই তা বলবে (২৭ পদ), কারণ তা প্রকাশ পাবে। সত্য– যাকে এখন রহস্যময় মনে হচ্ছে, মানুষের সন্তানের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে তা সবাই জানতে পারবে, সব জাতি তাদের নিজেদের ভাষায়' (প্রেরিত ২:১১)। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত এই পরিত্রাণ দেখতে পাবে। মনে রাখুন, যারা খ্রীষ্টের কাজ করছেন তাদের জন্য এটা পরম উৎসাহের যে, এই কাজ নিশ্চিতভাবেই সম্পন্ন হবে। একে যদি লাঙলের সাথে তুলনা করা হয় তবে বলা চলে ঈশ্বরই এর গতিবৃদ্ধি করবেন। অথবা দ্বিতীয়ত, নির্যাতনের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের শিষ্যদের নির্দোষিতা কতখানি তা স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। এই শুচি-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যারা 'বেলসবুল' তাদের সত্যিকারের চরিত্র প্রকাশিত হয়ে পড়বে। এই প্রকার লোক এখন মিথ্যা রং মেখে অন্যের ঈর্ষা জাগিয়ে ছদ্মবেশ ধরে আছে; যেভাবেই হোক তাদের নির্দোষিতা এবং মহানুভবতা ঢেকে রাখা হয়েছে। কিন্তু তাদের মূল চরিত্র প্রকাশিত হবে। কখনও কখনও এই পৃথিবীতে তা ব্যাপক

আকারে ঘটে, যখন নির্যাতনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরভক্তদের ধার্মিকতা গড়ে তোলা হয়। আর তা করা হয় আলোর মতো বাইরে রশ্মি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। যেভাবে তা সেই মহান দিনেও ঘটবে যখন তাদের গৌরব সমগ্র পৃথিবীর কাছে উন্মোচিত হবে– মানুষ ও স্বর্গদূতদের সামনে, তাদের সামনে যারা এখন চশমা পড়ে আছে (১ করিন্থীয় ৪:৯)। তাদের সব সমালোচনা গুটিয়ে বাইরে ফেলে দেওয়া হবে এবং তাদের অনুগ্রহ এবং কাজ যা এখন ঢেকে রাখা হয়েছে তা প্রকাশিত হবে (১ করিন্থীয় ৪:৫)। মনে রাখুন, ঈশ্বরের লোকদের জন্য এটি গভীর উৎসাহের ব্যাপার যে, সেই শেষ দিবসে যখন ধার্মিকতা সূর্যের ন্যায় চারপাশে আলো বিলাবে তখন মানুষের নিন্দা-ভর্ৎসনাগুলো মুছে গিয়ে, দেহ যেভাবে পুনরায় উঠবে সেভাবে তাদের খ্যাতিও পুনরুত্থিত হবে। খ্রীষ্টের প্রচারকেরা তাঁর সত্যকে বিশ্বস্ততার সাথে প্রকাশ করুক এবং এর মূল্যায়নের ভার তাঁর কাছে ছেড়ে দিক যেন ঠিক সময়ে তাদের সততা তিনি প্রকাশ করেন।

(চ) ঈশ্বরভক্তদের জন্য ঈশ্বরের নির্দশনের উপস্থিতির প্রমাণ হচ্ছে তাদের দুঃভোগ (২৯– ৩১)। আমাদের প্রথম মূলনীতিগুলোর দারস্থ হওয়াই তাই শ্রেয় এবং নির্দিষ্টভাবে ঈশ্বরের চিরন্তন নিদর্শনের যে মতবাদ রয়েছে তার কাছে, যা সব সৃষ্টি এবং তাদের সব কাজকর্মে প্রকাশিত হয়; এমনকি সবচেয়ে ক্ষুদ্র, সূক্ষ্মতম সৃষ্টির মধ্যেও। প্রকৃতির আলো আমাদের এই শিক্ষা দেয় এবং তা সব মানুষের জন্য উৎসাহজনক কিন্তু বিশেষভাবে ভাল লোকেরা তা আরও বেশি করে উপলব্ধি করতে পারে– যারা বিশ্বাসে ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকতে পারে এবং তাদের জন্য তাঁর ভালবাসা রয়েছে। এখানে দেখুন,

প্রথমত, নির্দশনের সাধারণ পরিমাণ সব সৃষ্টির কাছে, এমনকি 'ক্ষুদ্র চড়াই পাখির প্রতিও তার দৃষ্টি আছে' (২৯ পদ)। এইসব ছোট প্রাণীগুলোকে ক্ষুদ্র মনে করা হয়। এদের একটিকে মূল্যবান ভাবা হয় না, বাজারে তা বিক্রিও হয় জোড়ায়– যার বাজারমূল্য পঞ্চাশ টাকা (দু'শো টাকায় আপনি পাঁচটা কিনতে পারবেন; লূক ১২:৬)। তবুও তা স্বর্গীয় যত্নবঞ্চিত নয়, এদের একটিও ঈশ্বরের তত্ত্বধান ছাড়া মাটিতে পড়ে না: অর্থাৎ

১. তারা খাবারের জন্য মাঠে নেমে আসে না, খুদকুড়ো, ধান-ভুট্টোদানা খুটে খাওয়ার জন্য; কিন্তু তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তাঁর নির্দশনের মধ্য দিয়ে সমান্তরাল স্থানে তাদের জন্য তা তৈরি করে রাখেন (লূক ১২:৬)। দৃশ্যত, তাদের একটির কথাও ঈশ্বর বিস্মৃত হন না– তাকে খাদ্য দিতে। তিনি তাদের খাওয়ান (৬:২৬)। এখন তিনি, যিনি চড়ুইদের খাওয়ান তিনি তাঁর লোকদের অভুক্ত রাখবেন না।

২. তারা মাঠের উপর মরে পড়ে থাকে না, স্বাভাবিক অথবা নিষ্ঠুর মৃত্যুতে, ঈশ্বরের অজ্ঞাতে; যদিও তারা সৃষ্টিজগতের ক্ষুদ্র অংশ তবুও তাদেরও মৃত্যু স্বর্গীয় নিদর্শনের মনোযোগের মধ্য দিয়ে আসে; তাহলে তার শিষ্যদের ক্ষেত্রেও যে তা তাঁর নির্দশনের মধ্য দিয়ে আসবে তা কত না নিশ্চয়! লক্ষ্য করুন, যে পাখিরা উপরে উড়ে তারা যখন মারা যায় তখন সেগুলো মাটিতে পড়ে যায়– মৃত্যু উঁচুকে মাটিতে নামিয়ে আনে। কেউ কেউ মনে করেন যে, খ্রীষ্ট এখানে দুইটি চড়ুইয়ের কথা বলে পরোক্ষভাবে কু'রোগীকে পরিষ্কৃত করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত দু'টি পাখির কথা বলেছেন (লেবীয় ১৪:৪-৬); দু'টি পাখিকে একত্রে বলা হতো চড়ুই (এসপারোস); এদের একটিকে মেরে ফেলায় তা মাটিতে পড়ে যেত এবং অপরটিকে উড়ে যেতে দেওয়া হতো। এখন, দু'টির মৃত্যু প্রত্যক্ষ করা যেত দৈবাৎ; লোকেরা তাদের সন্তুষ্টিমতো কাজ বেছে নেয়; কিন্তু ঈশ্বরের নিদর্শন তাতেই মনস্থ এবং

সাজানো থাকে।

ঈশ্বর, যাঁর এই চড়ুই পাখির প্রতিও দৃষ্টি আছে, কারণ তারা তাঁর সৃষ্টি, তাহলে আপনার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আরও বেশি করেই থাকবে কারণ আপনি তাঁর সন্তান। যদি আপনার পিতার ইচ্ছার বাইরে একটি চড়ুই পাখিও মারা না যায়, তাহলে মানুষও নিশ্চিতভাবে তাঁর ইচ্ছার বাইরে মারা পড়বে না। একটি পাখির শিকারের জালে আটকা পড়া কিংবা গুলিতে মারা পড়া এবং সেভাবে বাজারে বিক্রি হওয়াটা নির্দেশনা অনুযায়ীই হয়ে থাকে; আপনার শত্রুরা হচ্ছেন ধরুন সেই শিকারির মতো, আপনার জন্য ফাঁদ পেতে আছে এবং লুকিয়ে আপনাকে গুলি করার ক্ষণ গুনছে কিন্তু তারা আপনাকে হরণ করতে কিংবা আঘাত করতে পারবে না, যদি ঈশ্বর তাদের ছেড়ে না দেন। সে কারণেই মৃত্যুকে ভয় পাবেন না, কারণ আপনার উপর আপনার শত্রুদের কোন ক্ষমতা নেই উপরন্তু তা তাদের সাধ্যের বাইরে; উপর থেকে তাদের যতটুকু ক্ষমতা দেওয়া হয় তারা ততখানিই অগ্রসর হতে পারে। ঈশ্বর তাদের ফাঁদ-ফন্দি-নিশানা ভেঙে ফেলতে পারেন (গীত ৩৮:১২– ১৫; ৬৪:৪,৭) এবং আমাদের আত্মাকে পাখির মতো পালিয়ে যাবার পথ করে দিতে পারেন (গীত ১২৪:৭)। সে কারণেই ভয় কর না (৩১ পদ)। মনে রাখুন, ঈশ্বরের নির্দশনের মতবাদে ঈশ্বরের লোকদের ভয়কে নীরব করে দেওয়ার প্রতিষেধক আছে: 'তোমরা তো অনেক চড়ুই পাখির চেয়েও মূল্যবান।' সব মানুষই তাই কারণ অন্য সব প্রাণীকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের জন্য এবং এদের তার পায়ের নিচে রাখা হয়েছে (গীত ৮:৬-৮); তাই খ্রীষ্টের শিষ্যরা তো আরও বেশি করে এই অমূল্যতার ভাগী, মূল্যবান। যারা পৃথিবীর বিস্ময়, অনন্য সাধারণ তুচ্ছ অবজ্ঞায় তাদের কিছুই যায় আসে না, যেমন একটা চড়ুই পাখিকে আমলে না নিলেও তাতে তার কিছু আসে যায় না।

দ্বিতীয়ত, সুনির্দিষ্ট জ্ঞান– যা খ্রীষ্টের শিষ্যদের বিষয়ে নির্দেশিত হয়েছে– বিশেষভাবে তাদের দুঃখভোগের কথা (৩০ পদ), কিন্তু 'এমনকি তোমার চুলগুলোও তাঁর গোনা আছে।' এটি প্রচলিত প্রবাদ, একথা প্রকাশ করে যে, ঈশ্বর তাঁর লোকদের যাবতীয় সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখেন। যারা খুবই তুচ্ছ এবং কম সম্মান পেয়ে থাকে তাদের প্রতিও তিনি দৃষ্টি রাখেন। এটা কোন অনুসন্ধিৎসু অনুসন্ধানের ব্যাপার নয় কিন্তু উৎসাহের ব্যাপার যে, ঈশ্বরভক্তরা তাঁর প্রতি সর্বতো নির্ভরতা স্থাপন করেন– যা তাদের ঈশ্বরের যত্ন ও তাঁর বিধানের অধীনে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। ঈশ্বরের যত্ন ও তত্ত্বাবধান সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও এখানে মূলত তাদের কথাই বলা হয়েছে যারা অনন্ত মন তথা অনন্ত জীবনের বিষয়ে ভাবে। ঈশ্বর যদি তাদের চুলেরও হিসেব রাখেন তাহলে তাদের মাথা গুনতেও তার অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ফলে তাদের জীবন, আত্মার স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তিনি আরও বেশি করেই খেয়াল রাখেন। এটা প্রকাশ করে যে, ঈশ্বরের লোকেরা তাঁর জন্য যা করে তার চেয়েও তিনি তাদের প্রতি অধিক যত্নবান। মানুষ তাদের টাকাপয়সা, সম্পদ, মেষপালের হিসেব রাখতে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু তারা নিজেদের চুলটা পর্যন্ত গুনতে পারে না; কতটা পড়ে গেছে এবং কয়টা অবশিষ্ট আছে তারা তা গুনতে অপারগ, তারা এই হিসেব জানার অভাববোধও করে না, কিন্তু ঈশ্বর তাঁর লোকদের চুলের হিসেব রাখেন এবং তাদের একটা চুলও তিনি ধ্বংস হতে দেবেন না (লূক ২১:১৮); তুচ্ছ আঘাতও তাদের উপর এসে পড়বে না। মূল্যবান বিবেচনায় ঈশ্বরভক্তরা তাঁর কাছে কত মূল্যবান– তাদের জীবন এবং মৃত্যু সবই।

(ছ) তিনি দ্রুত বিজয়ের দিনে তাদের নিজের করে নেবেন যারা এখন পরীক্ষার সময় তাঁকে নিজের করে নিয়েছে। যখন কেউ এই পরীক্ষার সময় তাঁকে অস্বীকার করে তখন সেই শেষ দিবসে তিনিও তাদের চিনবেন না, সোজাকথায় তিনি তাদের অগ্রাহ্য করবেন; তারা তাঁর কাছে প্রত্যাখ্যাত হবে (৩২, ৩৩)। মনে রাখুন, প্রথমত, এটা আমাদের দায়িত্ব এবং যদি আমরা তা করি তবে তা আমাদের জন্য নিরুত্তর সম্মান এবং আনন্দ বয়ে আনবে; আর তা করা যায় কেবল মানুষের কাছে যীশুকে তুলে ধরার মাধ্যমে; তাকে স্বীকার করার মাধ্যমে।

১. এটা আমাদের দায়িত্ব– কেবল খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করাই নয় উপরন্তু তাঁর জন্য দুঃখভোগের মাধ্যমে তাঁকে স্বীকার করা, যখন আমাদের তা করতে ডাকা হবে। এটা তাঁকে সেবা দেওয়া ও গৌরবান্বিত করার মতোই ব্যাপার। আমরা যেন কখনো খ্রীষ্টের সাথে আমাদের সম্পর্কের জন্য লজ্জিত না হই– তাঁর উপর আমাদের নির্ভরতা, উপস্থিতি, এমনকি তাঁর কাছ থেকে আমাদের প্রত্যাশার জন্যও। এই কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের বিশ্বাসে কতটা কর্তব্য নিষ্ঠা রয়েছে তা প্রকাশ পায়; এতে করে তাঁর নাম গৌরবান্বিত হবে এবং অন্যেরা এ বিষয়ে জানতে পারবে।

২. যাহোক, এটা আমাদের সমালোচনা ও সমস্যার প্রত্যুত্তর করতে শেখায়, আমরা এর জন্য প্রচুর ক্ষতিপূরণ পাব; পুনরুত্থিত হলে পর, যখন সেই কাজ আমাদের হয়ে কথা বলবে, যা আমাদের এনে দেবে সম্মান ও আনন্দ। কারণ আমরা খ্রীষ্টের প্রশ্নের জবাবে কুকড়ে যাব না (এর চেয়ে বেশি আনন্দের আর কী হতে পারে?); আমরা বরং তাঁর এই কথা শুনতে পাব, 'আমি একে স্বীকার করছি, যদিও সে পৃথিবীতে মূল্যহীন দরিদ্র ছিল, তবুও সে আমার বন্ধু, প্রিয়; সে আমার, কারণ সে আমাকে ভালবাসত, আমাতে মুগ্ধ থাকত; একে আমি আমার রক্ত দিয়ে কিনেছি, এ হচ্ছে আমার আত্মার কাজের ফল; আমি তাকে আমার পিতার সামনে স্বীকার করব, যখন সে আমার প্রতি তার কাজে বিশ্বস্ত থেকেছে; আমি তার বিষয়ে ভাল কথা বলব যখন আমার পিতার সামনে তাকে দেখা যাবে শেষ বিচারের জন্য; আমি তাকে উপহার দেব, তার বিষয়ে পিতার সামনে বলব।' যারা খ্রীষ্টকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেয় তিনিও তাদের এভাবে সম্মানিত করবেন। তারা তাঁকে মানুষের সামনে সম্মানিত করে; যা খুবই নগণ্য ব্যাপার; কিন্তু তিনি তাদের ঈশ্বরের সামনে সম্মানিত করবেন– যা অনেক বড় ব্যাপার। দ্বিতীয়ত, এটা খুবই বিপদজনক ব্যাপার যে, কেউ লোকের সামনে খ্রীষ্টকে অস্বীকার করে বা প্রভু বলে পরিচয় দিতে অসম্মত হয়; কারণ তাদেরকে সেই মহান দিনে অস্বীকার করা হবে– যখন তাঁকে তাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে, তখনই তিনি তাদের তাঁর সেবাকারী হিসেবে নিজেকে তাদের প্রভুর বলে স্বীকার করবেন না: 'আমি বলছি, আমি তোমাদের চিনি না' (৭:২৩)। প্রথম যুগের খ্রীষ্টানত্বের যখন লোকমুখে স্বীকার করাটা ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ (যা তাদের কাছে এই পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রিয় ছিল) তখন এটা ছিল দায়িত্ববোধের পরীক্ষার চেয়েও বেশি কিছু; কারণ এরপর পৃথিবীতে স্বাধীনভাবে ধর্মপালন করাটা অনেক সহজ হয়ে গেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, পরবর্তী যে কোন সময়ের চেয়ে তখনকার অবস্থা অনেক কঠিন ছিল।

(জ) শিষ্য হিসেবে তাদের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা এবং তার প্রকৃতি যেন সুসংহত হয়, যার ফলে তাদের কাছে এই দুঃখভোগও অনেক হালকা এবং সহজ বলে মনে হবে। তা বলা হল যেন তারা দুঃখভোগের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে কারণ খ্রীষ্ট তাদের বেছে

নিয়েছেন তাঁর অনুসারী হিসেবে (৩৭-৩৯ পদ)। তিনি তাদের প্রথমে বললেন যে, তারা তাঁর কাছে মূল্যহীন নয়, যদি তারা তাঁর জন্য কাজ করতে আন্তরিক হয়। মানুষ তার স্বাভাবিক কাজকর্মে যেসব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় তার মোকাবিলা করতে দ্বিধায় ভোগে না এবং যে লক্ষ্য তারা নিজেরাই নির্ধারণ করে সেই চ্যালেঞ্জ জিততে বাধার পাহাড় সরিয়ে ফেলার বলও তাদের হয়। তখন তারা আনন্দের সাথে সব সৃজনশীলতা দিয়ে তা মোকাবিলা করতে উদ্যত হয়; তখন আর সুবিধা-সুযোগের দোহাই তারা দেয় না।

এখন, খ্রীষ্টের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে তারা সুখ-আত্মসম্মান বিসর্জন দেয়, এর কাছে তারা নিজেদের মূল্যহীন ঘোষণা করে, খ্রীষ্টের প্রতি তাদের আগ্রহ জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নয়, অন্য সব দাবি-চাওয়া-কাজ-আগ্রহের পাশে খ্রীষ্টের জন্য কাজ করার আকাঙ্ক্ষাই তাদের কাছে অধিক গুরুত্ব বহন করে। তারা দরদামে জয়ী হবার প্রত্যাশা করে না, কারণ তারা এই সব বিষয়ের জন্য আসে না। এখন এভাবে সব নির্দেশিত হয়েছে, যদি ধর্ম কোনোটিকে মূল্যবান করতে পারে তবে তা প্রত্যেককেই মূল্যবান করে তুলতে পারে; এবং সেই কারণেই যারা এর সত্যে বিশ্বাস করে, তারা শীঘ্রই এর মূল্য নেবার জন্য আসবে; এবং যারা একে নিজেদের কাজ এবং লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছে তাদের জন্য প্রতিটি জিনিসই তাদের কাছে অর্পণ করা হবে। যারা খ্রীষ্টকে এইসব জিনিসের জন্য খ্রীষ্টকে বেছে নেবে না তারা নিশ্চিতভাবেই শাস্তি ভোগ করবে, খ্রীষ্ট তাদের সেজন্য ত্যাগ করবেন। মনে রাখুন, এটা ভাবা খুবই উৎসাহের যে, আমরা যাই ত্যাগ করি অথবা হারাই অথবা খ্রীষ্টে দুঃখভোগ করি না কেন আমাদের নিজেদের জন্য কঠিন দাবি জানাতে হবে না। আমরা যেরকম কাজ করব তেমন পুরস্কারই লাভ করব। আমরা এই বিশ্বাসে স্বস্তি পেতে পারি যে, আমরা এর জন্য যা দিচ্ছি তা খুবই মূল্যবান। সেই বিবেচ্য বিষয়গুলো হল, আমরা অবশ্যই খ্রীষ্টকে বেছে নেব।

প্রথমত, আমাদের কাছের এবং প্রিয় সম্পর্কগুলোর কাছে: পিতা, মাতা কিংবা ভাইবোনের চেয়ে তাঁকে বেশি মূল্য দেব। এই সম্পর্কের মাঝে, কারণ হিংসার একটি ছোট্ট জায়গা সেখানে রয়েছে, স্বভাবতই এই সম্পর্কের মাঝে ভালবাসা বেশি থাকে এবং সেই কারণেই এগুলোর কথা বলা হচ্ছে, বিশেষভাবে সেই সম্পর্কগুলো– যা আমাদের সবচেয়ে প্রভাবিত করে থাকে। শিশুরা তাদের পিতামাতাকে অবশ্যই ভালবাসবে এবং পিতামাতারা তাদের শিশুদের অবশ্যই ভালবাসবেন; কিন্তু যদি তারা তাদের খ্রীষ্টের চেয়ে বেশি ভালবাসে, তবে তারা তাঁর কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তাই খ্রীষ্টের এই কথা থেকে আমরা যেন ভুল ভুঝে আমাদের সম্পর্কগুলোকে তুচ্ছ না করি, তাদের ঘৃণা না করি (২১, ৩৫, ৩৬)। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, তাদের ভালবাসার কাছে খ্রীষ্টের ভালবাসা যেন দুর্বল হয়ে না যায়। খ্রীষ্টানদের নিশ্চিতভাবেই লেবীয়র মতো হতে হবে যে, তার পিতাকে বলেছিল, আমি তাকে দেখিনি (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩:৯)।

দ্বিতীয়ত, আমাদের নির্ভাবনা, নিরাপত্তা, আরামের সম্মুখে: আমরা অবশ্যই আমাদের ক্রুশ তুলে নেব এবং তাঁকে অনুসরণ করব, এ ছাড়া আর কোন ভাবেই আমরা তাঁর কাছে মূল্যবান বলে গণিত হতে পারি না। এখানে লক্ষ্য করুন, (ক) যারা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে তারা অবশ্যই তাদের ক্রুশ বহন করবে। (খ) ক্রুশ বহন করার মাধ্যমে আমরা খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করি এবং তাঁর মতো দুঃখভোগ করি। (গ) এ আমাদের জন্য উৎসাহের ব্যাপার যে, ক্রুশের সাথে মিলিত হওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা খ্রীষ্টকেই অনুসরণ করি-যিনি

আমাদের পথ দেখিয়েছেন। যদি আমরা আমাদের দুঃখভোগের মাঝে তাঁকে বিশ্বস্ততার সাথে অনুসরণ করি তবে তিনি যেভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন সেভাবে আমাদেরও পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন; এর মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের তাঁর গৌরবের ভাগী হতে বলেন।

তৃতীয়ত, জীবনের সামনে (৩৯ পদ): 'যে তার জীবন আকড়ে ধরতে চায়, সে তা হারাবে'; খ্রীষ্টকে অস্বীকার করার পর যে মনে করে সে তার জীবন রক্ষা করতে পারল সে বোকামি করে, কারণ তা অনন্ত মৃত্যুতে হারাবে; কিন্তু যে খ্রীষ্টের জন্য নিজের জীবন নিবেদন করে সে তা রক্ষা করে, কারণ সে খ্রীষ্টকে অস্বীকারকারীর চেয়ে বেশি কাজ দেখায়, তা তার অনন্তজীবন নিশ্চিত করে; নিঃসন্দেহে সে ব্যাখ্যাতীত সুবিধা পাবে।

(ঝ) খ্রীষ্ট নিজে হৃদ্যতার সাথে তাদের কারণগুলো বিবেচনা করবেন, যেমন তিনি যে তাদের বন্ধু তা তিনি দেখাবেন এবং তারা অন্যদের প্রতি যে দয়া দেখাবে তা-ও তিনি তাদের ফেরত দেবেন (৪০-৪২ পদ)। 'যে তোমাকে গ্রহণ করে সে আমাকেই গ্রহণ করে'।

প্রথমত, এটা এখানে প্রয়োগ করা হল যে, যদিও সাধারণ্যে তারা প্রত্যাখ্যাত হবেন, তবুও তারা এমন কিছু লোকের সাথে মিলিত হবেন– যারা তাদের গ্রহণ ও আপ্যায়িত করবে। তারা তাদের হৃদয়ে সেই মঙ্গলবার্তাকে স্বাগত জানাবে এবং তার বাহকদের নিজেদের বাড়িতে আতিথ্য করবে– তা কেবল সেই সুসমাচারের জন্য। এ কারণেই সুসমাচারকে 'বাজারজাত' করা হল, কারণ কেউ কেউ তা আগ্রহভরে দেখবে। খারাপ সময়েও অনুগ্রহের নির্বাচনের ভিত্তিতে কেউ কেউ খণ্ডিতভাবে ভাল হয়ে থাকে। খ্রীষ্টের প্রচারকেরা অনর্থক পরিশ্রম করছেন না।

দ্বিতীয়ত, যীশু খ্রীষ্ট তাঁর বিশ্বস্ত সেবকদের প্রতি যা ঘটে তা নিজের ওপর ঘটেছে বলে ধরেন। তারা দয়ায় থাকলে কিংবা নিষ্ঠুরতা পেলে তিনিও সমানভাবে তা অনুভব করেন, তাদেরকে যা বলে সম্বোধন করা হয় তিনিও নিজেকে তা সম্বোধন করা হয়েছে বলে ধরেন। 'যে তোমাদের গ্রহণ করে সে আমাকে গ্রহণ করে।' একজন রাষ্ট্রদূতকে সম্মান কিংবা অবজ্ঞা করলে তাকে যিনি পাঠিয়েছেন সেই রাষ্ট্রপ্রধানকেই সম্মান কিংবা অবজ্ঞা করা হয় এবং এই সেবকেরা হচ্ছেন খ্রীষ্টের একপ্রকার দূতবিশেষ। দেখুন, কীভাবে খ্রীষ্ট তাদের দ্বারা আপ্যায়িত হন, যারা তাঁর প্রতি তাদের শ্রদ্ধাকে যাচাই করে নেয়। তাঁর লোকেরা এবং প্রচারকদের আমরা সবসময় সাথে পাই এবং তিনি তাদের সাথে সবসময় থাকেন; এমনকি যুগের শেষ দিন পর্যন্ত। উপরন্তু তিনি তাদের অনন্য সম্মানও দান করেছেন– 'যে আমাকে গ্রহণ করে সে আমার প্রেরিতদেরও গ্রহণ করুক।' মনে রাখুন, খ্রীষ্ট কেবল একে তাঁর উপর ঘটছে বলে ধরেই নেন না উপরন্তু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের তা নিজের প্রতি ঘটছে বলে ধরেন। খ্রীষ্টের প্রচারকদের আপ্যায়িত করার মাধ্যমে তারা কোন অজানা স্বর্গদূতকে আপ্যায়িত করায় না, কিন্তু খ্রীষ্টকে তথা ঈশ্বরকেও নিজের অজ্ঞাতে আপ্যায়িত করে (২৫:৩৭)– 'আপনাকে দেখে কখন আমরা খেতে দিয়েছিলাম?'

তৃতীয়ত, খ্রীষ্টের শিষ্যদের প্রতি যে দয়া দেখানো হবে– তা ক্ষুদ্র বলে দেখা হবে না। যদি উপলক্ষ না আসে কিংবা এর বেশি করার সাধ্য না থাকে তবুও তা গৃহীত হবে– যদি তা এক গ্লাস জলের হয়। 'এই ছোটদের মধ্য থেকে একজনকে যদি কেউ এক গ্লাস জল পান করায়' (৪২ পদ)। এই ছোটরা হচ্ছে দরিদ্র এবং দুর্বল– যারা প্রায়ই খাবারের অভাবে পড়ে এবং অল্পেই তুষ্ট হয়। সর্বোচ্চতা হতে পারে এমন যে, এক গ্লাস জল খাওয়ানোটাও

বিরাট সাহায্য, আনুকূল্য দেখানোর সমতুল্য। মনে রাখুন, খ্রীষ্টের শিষ্যদের দয়া দেখালে তা খ্রীষ্টের খাতায় জমা হয়, তবে তা সেই দয়ার খরচের উপর নয় কিন্তু দাতার ভালবাসা তাতে কতটা ছিল খ্রীষ্ট তা-ই দেখেন। সেই বিবেচনায় গরীব বিধবার দান কেবল উৎরেই যায় নি, উপরন্তু তাকে অনেক মহিমান্বিত করা হয়েছিল (লূক ২১:৩, ৪)। এভাবে তারা, যারা সত্যিকারে অনুগ্রহে ধনী তারা প্রচুর ভাল কাজ করে, যদিও তারা আর্থিকভাবে অসমর্থ, দরিদ্র।

চতুর্থত, খ্রীষ্টের শিষ্যদের যে দয়া দেখানো হয়– তা তিনি গ্রহণ করেন। সেটা করতে হবে তাঁর প্রতি দৃষ্টি রেখে এবং তাঁর জন্যে। একজন ভাববাদীকে গ্রহণ করা হয় ভাববাদীর নাম দিয়েই এবং একজন ধার্মিক ব্যক্তিকেও একজন ধার্মিকের নাম দ্বারাই গ্রহণ করা হয়। ঠিক তেমনিভাবে এই ছোটদের একজনকে তাঁর শিষ্য পরিচয়ে গ্রহণ করা হবে। তবে তা এই কারণে নয় যে, তারা শিক্ষিত, কৌতুককর; এমনও নয় যে, তারা আমাদের আত্মীয় বা প্রতিবেশী কিন্তু যেহেতু তারা ধার্মিক এবং খ্রীষ্টের বৈশিষ্ট্য বহন করছেন সেকারণেই তাদের গ্রহণ করতে হবে। কারণ তারা ভাববাদীর শিষ্য এবং সেজন্যই তাদের খ্রীষ্টের কাজে পাঠানো হয়েছে। খ্রীষ্টের শিষ্যদের দয়া দেখালে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং এর মধ্য দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করা যায়। এটা এক ধরনের বিশ্বাসের কাজ– যা তাকে সম্মানিত করে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তাঁর প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠি ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি আমাদের ব্যাপারে নিজে থেকে আগ্রহ দেখান না। 'যদি তুমি আমার কাছে যে কোন কাজে বাধ্য থাকতে আগ্রহ প্রকাশ কর, তাহলে তুমি কেবল সেই কাজটুকুই করছ না, উপরন্তু তুমি আমাকে সন্তুষ্ট করে ফেললে যে, তুমি আমার জন্যই তা করছ'– সেনেকা।

মথি লিখিত সুসমাচার
অধ্যায় ১১

এই অধ্যায়ে আমরা দেখি,

(১) সুসমাচার প্রচারের মহান কাজে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কতটা অক্লান্ত-ধীরস্থির। তিনি এক্ষেত্রে কী পরিমাণ আন্তরিক তা সুসমাচার প্রচার কাজে তাঁর আত্মনিবেদনের মাঝেই ফুটে ওঠে (১ পদ)।

(২) যোহনের শিষ্যদের সাথে তাঁর নিজের বিষয়ে আলোচনা, অর্থাৎ তিনিই যে খ্রীষ্ট সে বিষয়ে তিনি তাদের বলছেন (২-৬)।

(৩) বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বিষয়ে যীশু খ্রীষ্ট সম্মানসূচক সাক্ষ্য দিলেন (৭-১৫ পদ)।

(৪) তাঁর সময়কার লোকদের কথা বলতে গিয়ে খ্রীষ্টের কণ্ঠে গভীর হতাশা ঝরে পড়ল। সাধারণভাবে তিনি সেই লোকদের কূপমণ্ডূকতা ও বধির অন্তরের সমালোচনা করলেন; যোহন এবং তাঁর– উভয়ের অভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যে আশাব্যঞ্জক সাড়া মেলেনি সেসব তো বললেনই উপরন্তু তিনি এর পাশাপাশি কথিত মন্দ স্থানসমূহের কথা উল্লেখ করে বললেন যে, এইসব কাজ সেখানে করা হলে আরও ভাল ফল পাওয়া সম্ভব হতো (১৬–২৪ পদ)।

(৫) তিনি বললেন যে, তাদের দুঃখজনক পরিণতি বরণ করতে হবে; এখানে তিনি তাঁর পিতাকে ধন্যবাদ দিলেন যে, তিনি সুসমাচারের রহস্য প্রকাশের জন্য প্রাচুর্য ও জ্ঞানপূর্ণ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন (২৫, ২৬ পদ)।

(৬) দরিদ্র পাপীদের তিনি তাঁর কাছে আসতে, তাঁর শিক্ষা শুনতে, তাঁর অধীনস্থ হতে এবং তাঁর দ্বারা রক্ষা পেতে তিনি অমূল্য আহ্বান ও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন (২৭-৩০ পদ)। এই অধ্যায়ে যেমন আছে তেমনটা আর কোথাও নেই যেখানে সুসমাচার আমাদের সতর্ক করার জন্য ভয় প্রদর্শন করে এবং সুসমাচারের অনুগ্রহ সুমিষ্ট উৎসাহ দেয়, যা আমাদের সামনে স্থাপন করে জীবন এবং মৃত্যু, দয়া ও অভিশাপ।

মথি ১১:১-৬

এই অধ্যায়ের প্রথম পদ টিকে কেউ কেউ আগের অধ্যায়ের সাথে জুড়ে দেন এবং এই পদ দিয়ে তা শেষ করেন (উপর্যুক্ততার সাথে);

১. আগের অধ্যায়ে খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের যে ব্যবস্থা শিক্ষা দিয়েছেন তাকে এখানে বলা হয়েছে 'আদেশ' হিসেবে। মনে রাখুন, খ্রীষ্টের নির্দেশই আদেশ বলে বিবেচিত হয়। শিষ্যদের কেবল সুসমাচার প্রচারের অনুমতিই দেয়া হয় নি, উপরন্তু তাদের কাজের আদেশও দেয়া হয়েছিল। তারা তাদের স্বাধীনতার জন্য যা ছেড়ে এসেছিলেন– এটা তার প্রতি সম্মান জানানোর কোন ব্যাপার ছিল না, কারণ 'তাদের তা করতেই হতো' (১ করিন্থীয় ৯:১৬)। এসব আদেশে তিনি তাদের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা যুক্ত করা হয়েছে, কারণ অনুগ্রহের চুক্তি হচ্ছে তাঁর কথা– যা তিনি আদেশ করেন (গীত ১০৫:৮)।

তিনি আদেশের প্রান্ত গড়েছেন। মনে রাখুন, খ্রীষ্ট যে নির্দেশনা দেন তা পূর্ণাঙ্গ; কারণ তিনি নিজে কাজ করেছেন; উপলব্ধি করেছেন কাজের প্রকৃতি; তিনি ও তাঁর কাজ একত্রে যায়।

২. খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের যা বলার তা বলে ফেলার পর সেখানে থেকে চলে যেতেন। দেখে মনে হয়, তারা তাদের প্রভুকে ছেড়ে যেতে চাইতো না যতক্ষণ না তিনি তাদের কাছ থেকে নিজেকে আলাদা করে নিতেন, অন্যত্র চলে যেতেন। ব্যাপারটা অনেকটা সেবিকার মতো যে তার হাত ছেড়ে দেয় যেন শিশু নিজে থেকে হাঁটতে শেখে। খ্রীষ্ট হয়তো এখন তাদের শিক্ষা দিতে চাইলেন, তাঁর শারীরিক উপস্থিতি ছাড়া কী করে বেঁচে থাকতে হবে এবং কীভাবে কাজ করতে হবে। তাদের জন্য এর উপযোগিতাও ছিল, যেহেতু খ্রীষ্ট এভাবে অন্যত্র চলে যাবেন সেহেতু তারা যেন তাঁর দীর্ঘ বিদায়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে; এবং তা হবে পবিত্র আত্মার সাহায্যে– 'তাদের নিজ হাত তাদের জন্য পর্যাপ্ত হয়ে উঠবে' (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩:৭); আর তারা সবসময় শিশুও থাকবে না। তারা সেই ব্যবস্থার কতটুকু অনুসরণ করেছিল সেই বিষয়ে আমরা খুব অল্পই বিবৃত হতে দেখি। তারা বিদেশে গিয়েছিলেন, কোন সন্দেহ নেই; সম্ভবত যিহূদিয়ায় (কারণ এ পর্যন্ত গালীলে সবচেয়ে বেশি প্রচার কাজ সংগঠিত হয়েছে) তারা খ্রীষ্টের মতবাদ প্রচার করেছিলেন এবং তাঁর নামে চিহ্ন-কাজ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রতি তাদের ঘনিষ্ঠ নির্ভরতা তখনও বলবৎ ছিল; দৃশ্যত তাঁর এই অধীনতাকে তারা হাতছাড়া করেন নি। খ্রীষ্টের প্রতি তাদের এই নির্ভরতা এসেছিল তাদের চর্চা থেকে, কারণ এভাবেই তারা তাদের মহান কাজের জন্য বিভিন্ন স্তরে প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন।

৩. খ্রীষ্ট তাদের ছেড়ে সেই গ্রামগুলোয় শিক্ষা দিতে ও প্রচার করতে গেলেন যেখানে তাঁর শিষ্যেরা আগেই রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল (১০:১-৮); তিনি এমনটা করলেন যেন লোকের প্রত্যাশা বেড়ে যায় এবং তাঁর আপ্যায়নের জন্য পথ প্রস্তুত হয়। এভাবে প্রভুর পথ প্রস্তুত করা হয়েছে; যোহন তা প্রস্তুত করে রেখেছিলেন লোকদের অনুতাপের জন্য নিয়ে এসে, কিন্তু তিনি কোন চিহ্ন-কাজ করেন নি। শিষ্যরা তাদের সুসমাচার যে ভ্রান্ত নয় তার নিশ্চয়তা বিধানে চিহ্ন-কাজ করেছেন। মনে রাখুন, অনুতাপ এবং বিশ্বাস লোকদের স্বর্গ-রাজ্যের দয়া লাভে প্রস্তুত করে, যা খ্রীষ্ট দেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট যখন তাঁর শিষ্যদের চিহ্ন-কাজের ক্ষমতা দিলেন তখন তিনি নিজেকে শিক্ষাদান এবং প্রচার কাজে নিয়োজিত করলেন। বস্তুত শিক্ষাদান ও প্রচার কাজের চেয়ে চিহ্ন-কাজকে অনেক বেশি সম্মানের বলে দেখা হতো। তবে তা ছিল নির্দেশের অধীনে করা কাজ। অসুস্থকে সুস্থ করা ছিল দেহকে রক্ষা করা কিন্তু সুসমাচার প্রচার করা হয় যেন আত্মা রক্ষা পায়। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের প্রচার করতে নির্দেশ দিয়েছেন (১০:৭), তবুও তিনি নিজে প্রচার করা থেকে নিবৃত্ত হলেন না। তিনি তাদের কাজের জন্য স্থাপন করলেন; তবে তা তাঁর নিজের আরামের জন্য নয় কিন্তু সেই দেশের আরামের জন্য। ফলে তাদের কাজে নিযুক্ত করার পরও তিনি কাজ থেকে অবসর নিলেন না। যারা কেবল নিজেকে নিষ্ক্রীয়, ভারমুক্ত রাখার জন্য অন্যের কাঁধে কাজের বোঝা চাপিয়ে দেয় খ্রীষ্ট তাদের পছন্দ করেন না।

মনে রাখুন, প্রভুর কাজের জন্য লোকসংখ্যা বৃদ্ধি কিংবা তা অনেক হয়ে গিয়েছে দেখে এ কাজে আমাদের কোন ওজোর আপত্তি খাটবে না। কিন্তু তা দেখে উৎসাহিত হয়ে কাজের গতি বাড়িয়ে নেওয়াটাই সমীচীন। অন্যরা যত ব্যস্ত থাকবে আমরা তার চেয়েও বেশি ব্যস্ত থাকব এবং সব তুচ্ছ কাজেও বড় কাজের মতো আন্তরিকতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব। কোন

কাজকেই ছোট মনে করব না। লক্ষ্য করুন, তিনি তাদের গ্রামগুলোতে প্রচার করতে গেলেন– যা ছিল জনবহুল স্থান; তিনি সুসমাচারের জাল সেখানে পাতেন যেখানে বেশি মাছ এসে জমা হয়। সুবুদ্ধি গ্রামগুলোতে কাঁদছে (হিতোপদেশ ১:২১), গ্রামের প্রবেশদ্বারে (হিতোপদেশ ৮:৩), যিহূদীদের গ্রামগুলোতে, এমনকি তাদের কাছে, যাদের কাছে তিনি হালকা হয়েছেন, যারা তাঁর প্রথম আহ্বানকে অবজ্ঞা করেছে।

তিনি কী প্রচার করেছিলেন– তা আমাদের বলা হয় নি কিন্তু এটা অনুমিত যে, তা তাঁর পাহাড়ে দেওয়া শিক্ষার অনুরূপ ছিল। কিন্তু এখানে এরপর লিপিবদ্ধ হয়েছে একটি বার্তা– যা বাপ্তিস্মদাতা যোহন খ্রীষ্টের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং এতে তাঁর প্রত্যাবর্তন (২-৬)। এর আগে আমরা দেখি যে, যীশু যোহনের দুঃখভোগের বিষয়ে শুনেছিলেন (৪:১২)। এখন আমরা অবগত হলাম যে, যোহন জেল থেকে খ্রীষ্টের কাজের বিষয়ে শুনেছিলেন। তিনি জেলে বসে খ্রীষ্টের কাজের বিষয়ে শুনেছিলেন; এবং কোন সন্দেহ নেই এসব কাজের বিষয়ে শুনে তিনি খুশিই হয়েছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন বরের একজন সত্যিকারের বন্ধু (যোহন ৩:২৯)।

মনে রাখুন, যখন মূল্যবান অস্ত্রটি দৃশ্যপটের বাইরে, তখন ঈশ্বর জানেন কী করে আরও অনেককে এর স্থলে দাঁড় করাতে হয়। যোহন জেলে থাকার পরও কাজ থেমে থাকে নি; এই যে তার অনুপস্থিতিতেও কাজ এগিয়ে চলেছে তাতে তিনি দুঃখিত হন নি; বরং এ ছিল তার জন্য স্বস্তির ব্যাপার, বিশেষত তার বন্ধুত্বের কাছে। দুঃখের সময় ঈশ্বরের লোকদের কাছে খ্রীষ্টের কাজের কথা শোনার চেয়ে প্রীতিকর আর কিছু হতে পারে না; বিশেষভাবে তারা যখন নিজেদের আত্মায় তা অভিজ্ঞতা করবে। ঈশ্বরের রাজ্যের অগ্রগতির সংবাদ জেলখানাকে প্রাসাদে পরিণত করে। খ্রীষ্ট কোন না কোনওভাবে তাঁর রাজ্য বিস্তারের কাজে দুঃখভোগকারীর প্রতি তাঁর ভালবাসার প্রকাশ ঘটান। যোহন খ্রীষ্টের কাজ দেখতে পান নি কিন্তু তিনি আনন্দের সাথে সেসব বিষয়ে শুনেছিলেন। 'ধন্য তারা যারা না দেখে কেবল শুনে বিশ্বাস করে এবং তাতে নিজেদের সমর্পণ করে।'

এখন বাপ্তিস্মদাতা যোহন খ্রীষ্টের কাজের বিষয়ে শুনে তার দুই শিষ্যকে তাঁর কাছে পাঠালেন; এবং তাদের মাঝে ঠিক কী কথাবার্তা হয়েছিল তা এখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে,

ক. তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করার জন্য যে প্রশ্নটি এনেছিলেন– 'যার আসবার কথা আছে আপনিই কি তিনি, না আমরা অন্য কারও জন্য অপেক্ষা করব?' এটা ছিল মারাত্মক এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন; 'দয়া করে বলুন, আপনিই সেই প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট কি না।'

১. 'খ্রীষ্ট যে আসবেন'– সেই বিশ্বাস থেকেই তারা এরূপ প্রশ্নটি করেছিলেন। তাদের অভিব্যক্তিতে খ্রীষ্টের আসবার বিষয়ে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাটি অনুরণিত হল। এটা ছিল সেই নামগুলোর একটি– যার দ্বারা তিনি পুরাতন নিয়মের ঈশ্বরভক্তদের কাছে কাঙ্ক্ষিত ছিলেন, 'যিনি সদাপ্রভুর নামে আসছেন অথবা আসবেন' (গীত ১১৮:২৬)। তিনি এখন এসেছেন কিন্তু এখন আমরা তাঁর আরও একটি আগমনের প্রত্যাশায় রয়েছি।

২. তাদের প্রশ্নের ধরনে বোঝা যায় যে, যদি তিনি সেই প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট না হতেন তবে তারা আরেকজনের জন্য অপেক্ষা করতেন। মনে রাখুন, আমরা অবশ্যই তাঁর দ্বিতীয় আগমনের জন্য উদ্বিগ্ন হব না; কিংবা এটা বলব না, যতক্ষণ আমরা তাতে আনন্দ না করি ততক্ষণ আমরা তাঁর সম্পর্কে আরও বেশি করে প্রত্যাশা করব না। যদি তিনি দেরি করেন, তবে অপেক্ষা করুন; কারণ যার আসবার কথা আছে তিনি আসবেন, যদিও তা আমাদের

সময় না-ও হতে পারে।

৩. অনুরূপভাবে এটাও প্রকাশ পায় যে, যদি তারা সন্তুষ্ট হয় যে, তিনিই সেই খ্রীষ্ট, তবে তাদের মনে আর সংশয় থাকবে না। তারা সন্তুষ্ট হবে এবং তারা আর কারও জন্য অপেক্ষা করবেন না।

৪. তারা সে কারণেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনিই কি তিনি?' এ বিষয়ে যোহন নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করেছেন, 'আমি খ্রীষ্ট নই' (যোহন ১:২০)। এখন,

(১) কেউ কেউ মনে করেন যে, যোহন তার নিজের সন্তুষ্টির জন্য এই প্রশ্ন দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। এটা সত্য যে, তিনি খ্রীষ্টের জন্য মহান সাক্ষ্য বহন করেছিলেন; তিনি তাঁকে 'ঈশ্বরের পুত্র' (যোহন ১:৩৪), 'ঈশ্বরের প্রেরিত' (যোহন ৩:৩৪) ও 'ঈশ্বরের মেষ' (২৯ পদ) বলে ঘোষণা করেছিলেন, 'তিনি পবিত্র আত্মায় তোমাদের বাপ্তিস্ম দেবেন' (৩৩ পদ)। নিঃসন্দেহে এটা ছিল মহান সাক্ষ্য। কিন্তু তিনি এর চেয়েও বেশি নিশ্চয়তা লাভের বাসনা করেছিলেন যে, তিনিই সেই খ্রীষ্ট, যাঁর সম্পর্কে দীর্ঘ দিনের প্রতিজ্ঞা ও প্রত্যাশা ছিল। মনে রাখুন, খ্রীষ্টের বিষয়ে এবং তাঁর মাধ্যমে পাওয়া পরিত্রাণের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া ভাল ব্যাপার। খ্রীষ্ট সেই বাহ্যিক ক্ষমতা এবং জাঁকজমকের মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হন নি যেমনটা সবার প্রত্যাশা ছিল; তাঁর নিজের শিষ্যরাই এই ভুল করেছিলেন এবং হতে পারে যোহনের সেই একই ভুল করেছিলেন। সেটা বুঝতে পেরেই হয়তো খ্রীষ্ট এই অনুসন্ধানপর্বের শেষে বলেছিলেন, 'ধন্য সে যে আমাকে নিয়ে সন্দেহ না করে।' মনে রাখুন, এটা কঠিন, এমনকি ভাল লোকের জন্যও কষ্টদায়ক ভুলগুলো এড়ানো সম্ভব হয় না।

(২) নিজের বর্তমান অবস্থার কারণেই হয়তো যোহনের মনে এরকম সংশয় দেখা দিয়েছিল। তিনি ছিলেন একজন বন্দি, স্বভাবতই তার মনে এই ভাবনা এসে তাকে পরীক্ষা করছিল যে, যীশু যদি প্রকৃতই খ্রীষ্ট হয়ে থাকেন তাহলে যখন তিনি শুনলেন যে, তাঁর অগ্রদূত আমি সমস্যার মধ্যে রয়েছি এবং অনির্দিষ্ট কালের জন্য আমি এর মধ্যে রয়েছি, তবুও তিনি আমার কথা ভাবলেন না, একবার দেখতেও আসলেন না, কিংবা কাউকে আমার কাছে পাঠালেনও না, আমার বিষয়ে জানতেও চাইলেন না, আমার জেলজীবনকে পরিতৃপ্তিতে ভরিয়ে দেওয়ার জন্য কিংবা শীঘ্রই আমাকে মুক্ত করার কোন প্রচেষ্টা নিলেন না কেন? সন্দেহাতীতভাবেই খ্রীষ্ট কেন যোহনকে দেখতে জেলখানায় যাননি তার একটি কারণ বিদ্যমান ছিল; তিনি হয়তো চাননি যে যোহনের সাথে তাঁর মৈত্রীর ব্যাপারটি প্রকাশিত হয়ে পড়ুক। কিন্তু যোহন বিষয়টি তাঁর অবহেলা হিসেবেই দেখলেন এবং হতে পারে এটাই খ্রীষ্টে তাঁর বিশ্বাসে ফাটল ধরিয়েছিল। মনে রাখুন,

(ক) প্রকৃত বিশ্বাসের মাঝেও অবিশ্বাসের লেশ থাকতে পারে। মনে রাখুন, সেরারা সবসময় একই রকম শক্তিমান থাকে না।

(খ) খ্রীষ্টের জন্য সমস্যা, বিশেষত যখন তারা লাগাতারভাবে কোন স্বস্তিদায়ী সমাধান ছাড়াই তা ভোগ করে যেতে থাকে তখন তার মোকাবিলা করা প্রায়শই কঠিন হয়ে পড়ে।

(গ) ভাল লোকের অবশিষ্ট অবিশ্বাস কখনও কখনও পরীক্ষার কোন মুহূর্তে তা মূলে আঘাত করে বসে এবং সবচেয়ে মৌলিক সত্যকেই তখন সে প্রশ্নবিদ্ধ করে বসে– যা সে অনেক ভেবেচিন্তে গ্রহণ করেছিল– 'প্রভু কি সত্যিই আমাদের কখনও ছেড়ে যাবেন না? কিন্তু আমরা আশা করব যে, যোহনের বিশ্বাস এক্ষেত্রে অকৃতকার্য হয় নি, তিনি কেবল

খ্রীষ্টের আগমনের বিষয়টিকেই জোরালো এবং নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। মনে রাখুন, ঈশ্বরভক্তরা শক্তিশালী ও তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার জন্য সেরা সাহায্যের প্রত্যাশা করেন, যেন নিজেকে পরীক্ষার বিপরীতে শক্তভাবে দাঁড়ানোর জন্য তৈরি করতে পারেন অর্থাৎ অবিশ্বস্ত হয়ে না পড়েন। অব্রাহাম বিশ্বাস করেছিলেন এবং তবুও একটি চিহ্ন দেখবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন (আদি ১৫:৬, ৮), যেমনটা চেয়েছিলেন গিদিয়োনও (বিচারকর্তৃকগণ ৬:৩৬)।

(৩) অন্যরা মনে করেন যে, যোহন তাঁর শিষ্যদের খ্রীষ্টের কাছে এই প্রশ্নটি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন যতটা না তাঁর আগ্রহে তার চেয়ে বেশি তাঁর শিষ্যদের উৎসাহে। লক্ষ্য করুন, যদিও তিনি ছিলেন একজন কয়েদি তবুও তারা তাঁর সাথে যোগাযোগ রেখেছিলেন। তারা তাঁর কথা শুনতেন এবং তাঁর কাছ পরামর্শ, নির্দেশনা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকতেন; কারণ তারা তাঁকে ভালবাসতেন। ফলত, তাঁকে ত্যাগ করতে চাননি।

(ক) তারা জ্ঞানে খাটো ছিলেন এবং তাদের বিশ্বাসে দৃঢ়তা ছিল না; সেই কারণেই তাদের নির্দেশনা ও নিশ্চয়তার প্রয়োজন পড়েছিল। এই ব্যাপারে কোন একভাবে তারা তাদের প্রভুর দরুন পক্ষপাতী এবং আমাদের প্রভুর প্রতি ইর্ষান্বিত হয়ে পড়েছিলেন; তারা যীশুকে 'খ্রীষ্ট' বলে স্বীকৃতি দিতে আন্তরিক ছিলেন না, কারণ যোহন তাঁর আড়ালে পড়ে গিয়েছিলেন। ফলে তারা তাদের নিজ প্রভুকেও বিশ্বাস করতে আন্তরিক ছিলেন না, যেহেতু তাদের মনে হয়েছিল– যোহন নিজের এবং তাদের বিরুদ্ধে কথা বলেন। ভাল লোকেরা নিজেদের আগ্রহে নিজেদের বিচারকে অনুগ্রহযুক্ত করতে চায়, এটাকে তারা ভাল মনে করে। এখন, যোহন তাদের ভুল সংশোধন করে থাকবেন এবং তাদের কাছে খ্রীষ্টের বিষয়ে নিজের সন্তুষ্টি প্রকাশ করে থাকবেন; যেমনটা তিনি ছিলেন। মনে রাখুন, শক্তিশালী পক্ষকে দুর্বলের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বিবেচনা করতে হয় এবং দুর্বলের সাহায্যের জন্য যা প্রয়োজন তিনি তা করবেন: সেক্ষেত্রে আমরা অপারগ হলে যিনি প্রকৃতই সাহায্য করতে সক্ষম তাঁর কাছে তাদের পাঠাই। 'যখন কেউ পরিবর্তিত হয়, তখন তাকে শক্তিশালী কোরো।'

(খ) যোহন তার শিষ্যদের খ্রীষ্টের কাছে পাঠানোর জন্য আন্তরিক পরিশ্রমী ছিলেন, যেভাবে গ্রামার স্কুল থেকে কাউকে একাডেমিতে পাঠানো হয়। হতে পারে তিনি নিজের ভবিষ্যত দেখতে পেয়েছিলেন যে, তিনি মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছেন এবং সেই কারণেই তার শিষ্যদের ভাল আশ্রয় হিসেবে খ্রীষ্টের কাছে পাঠালেন। তাঁর অভিভাবকত্বে তাদের দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হতে চাইলেন। মনে রাখুন, প্রত্যেককে খ্রীষ্টের দিকে নির্দেশিত করা প্রচারকের ধর্ম। যারা খ্রীষ্টের শিক্ষার নিশ্চয়তার বিষয়ে জানে তারা অবশ্যই নিজেদের তাঁর সম্মুখে নিবেদন করবে, যিনি বোধগম্যতা প্রদানের জন্য এসেছেন। যারা অনুগ্রহে বেড়ে ওঠে তারা নিশ্চিতভাবেই অনুসন্ধিৎসু হবে।

খ. এখানে তাদের প্রশ্নের উত্তরে খ্রীষ্ট কী বললেন তা বিবৃত হয়েছে (৪-৬)। এখানে তা সরাসরি ফুটে ওঠে নি যেমন যখন তিনি বলেন, 'আমি, যিনি তোমাদের সাথে কথা বলছেন আমিই তিনি;' কিন্তু এটাই ছিল প্রকৃত উত্তর, যথার্থই যা সত্য উত্তর। খ্রীষ্ট চান যেন আমরা সুসমাচারের সত্যকে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের নিরিখে আবিষ্কার করি এবং গভীর জ্ঞান লাভের জন্য তীব্র ক্ষুধা অনুভব করি, এর পেছনে সময় দিই।

১. তিনি তাদের সাথে তাঁর কাজের সূত্র ধরে কথা বললেন, তারা যা দেখেছে এবং শুনেছে, যা তারা যোহনকে বলবে, এর মধ্য দিয়ে তিনি হয়তো একটি পটভূমি তৈরি

করলেন যেন তারা যা শুনতে উদগ্রীব সেই উত্তর তাদের মুখ দিয়েই বেরিয়ে আসে; সেইমতোই তিনি তাদের নির্দেশনা দিলেন যেন এ থেকেই তারা তাদের সন্তোষজনক উত্তরটি লাভ করে। 'যাও এবং তাকে বল তোমরা যা শুনেছ এবং দেখেছ।' মনে রাখুন, আমাদের অনুভূতিগুলো যেসব বিষয়ের প্রতি আবেদন সৃষ্টি করে তা মূল বিষয়ের প্রতিই নির্দেশ করে। সেই কারণেই প্রকৃত অবস্থিতির উপর পোপের মতবাদ সত্যের বিষয়ে একমত হয় না, যেমনটা যীশুর মধ্যে ছিল; কারণ খ্রীষ্ট, আমাদের আমরা যা শুনি এবং দেখি তার দিকে নির্দেশ করেন। 'যাও এবং যোহনকে গিয়ে বল:

(১) খ্রীষ্টের চিহ্ন-কাজের ক্ষমতার বিষয়ে কী দেখেছ; তোমরা দেখেছ কীভাবে যীশুর কথায় অন্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে, খোঁড়া হাঁটতে শুরু করেছে ইত্যাদি।' খ্রীষ্টের চিহ্ন-কাজগুলো করা হয়েছে জনসমক্ষে, সবার চোখের সামনে; কারণ লোকেরা সবচেয়ে নিরেট এবং নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের প্রতিও আস্থা পেত না। সত্য কখনও নিজেকে গোপন করার চেষ্টা করে না। এর দ্বারা তাদের বুঝতে হবে যে,

(ক) তা স্বর্গীয় ক্ষমতার কাজ। কেউ নয় কেবল প্রকৃতির ঈশ্বরই এভাবে প্রকৃতির ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ ও শাসন করতে পারেন। এটা নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে– 'অন্ধের চোখ খুলে দেওয়া কেবল ঈশ্বরের পক্ষেই সম্ভব' (গীত ১৪৬:৮)। চিহ্ন-কাজগুলো সে কারণেই স্বর্গীয় অনুমোদনের কথা প্রকাশ করে এবং এর সাথে যে শিক্ষা সংযুক্ত করা হয়েছে– তা অবশ্যই ঈশ্বরের হবে, কারণ তাঁর ক্ষমতা কখনো তাঁর সত্যের সাথে দ্বন্দ্ব তৈরি করে না; কিংবা এটা কল্পনাও করা যায় না যে, তিনি মিথ্যের উপর তাঁর অনুমোদন দেবেন; যাহোক, মিথ্যে বিস্ময়, মিথ্যে শিক্ষার ভ্রান্তহীনতা প্রমাণে ব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু সত্য চিহ্ন-কাজ স্বর্গীয় কাজের বিষয়টিই নিশ্চিত করে; আসলে খ্রীষ্টের চিহ্ন-কাজগুলো সেই রকমই ছিল। তাই তারা তিনি যে ঈশ্বরপ্রেরিত এবং তাঁর দেওয়া শিক্ষা যে ঈশ্বরেরই– সে বিষয়ে সন্দেহ করার কোন অবকাশই পেল না।

(খ) একটি স্বর্গীয় ভবিষ্যতবাণীর পূর্ণতার বিষয়ে। এটা আগে বলা হয়েছিল যে, (যিশাইয় ৩৫:৫, ৬) 'আমাদের ঈশ্বর আসবেন এবং তখন অন্ধদের চোখ খুলে যাবে।' এখন খ্রীষ্টের কাজগুলো যদি ভাববাদীর কথার সাথে মিলে যায়, যা তাদের জন্য মিলিয়ে দেখা খুবই সহজ কাজ ছিল, তখন কোন সন্দেহ নেই যে, ইনিই আমাদের ঈশ্বর– যাঁর জন্য আমরা অপেক্ষা করে আছি; যিনি আমাদের জন্য ক্ষতিপূরণ নিয়ে আসবেন। ইনিই তিনি, যিনি বহু প্রতীক্ষিত– প্রার্থিত।

(২) তাঁর সুসমাচারের প্রচারের বিষয়ে যা শুনেছ- যা তাঁর চিহ্ন-কাজগুলোকে সমর্থন দেয়।' বিশ্বাস যদিও দেখার মাধ্যমে নিশ্চিত হয় কিন্তু তা আসে শোনার মধ্য দিয়ে। তাকে বলুন যে,

(ক) দরিদ্র সুসমাচার প্রচার করছে' (তা-ই কেউ পড়েন)। এ কথা প্রমাণ করে, খ্রীষ্টের মিশন ছিল স্বর্গীয়। যাদের তিনি তাঁর রাজ্যের ভিত্তি গাঁথবার জন্য নিয়োগ দিয়েছেন তারা ছিলেন জাগতিক সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র মানুষ। তবে খ্রীষ্টের জন্য কাজের নিয়োগপ্রাপ্তিতে তাদের দারিদ্র্যকে যোগ্যতা হিসেবে ধরা হয় নি বরং স্বর্গীয় ক্ষমতার দ্বারাই তাদের বেছে নেওয়া হয়েছিল।

(খ) দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা হচ্ছে। খ্রীষ্টের শ্রোতারা ছিল এরকম নিম্নবর্গের মানুষ। উল্লেখ্য, ধর্ম-শিক্ষক ও ফরীশীরা তাদের হেয় জ্ঞান করতো; ফলে শিক্ষা

ও পরামর্শের জন্য তাদের পক্ষে ধর্ম-শিক্ষক-ফরীশীদের কাছে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এর মাঝে বিদ্যমান আরও একটি কারণ ছিল, কোন বিনিময় ছাড়া তারা শিক্ষা ও পরামর্শ দিতেন না। ফলত, এই দরিদ্র মানুষের কাছে খ্রীষ্টের প্রচার করাটাকে ধর্ম-শিক্ষক-ফরীশীরা ভাল দৃষ্টিতে দেখেন নি; যদিও তারা নিজেরাই তাঁকে হেয় জ্ঞান করেছিলেন। পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাজ-রাজাদের কাছে পাঠানো হতো, কিন্তু খ্রীষ্ট লোকদের জনসভায় প্রচার করলেন। এটা আগেই বলা হয়েছিল যে, দলবদ্ধ মানুষ তাঁর জন্য অপেক্ষা করবে (সখরিয় ১১:১১)। মনে রাখুন, সমাজের নিচু তলার মানুষের সাথে খ্রীষ্টের একাত্মতা এবং সহানুভূতি– দুই-ই ছিল অমূল্য, আর তা প্রমাণ করে যে, ইনিই তিনি, যিনি পৃথিবীর জন্য আমাদের ঈশ্বরের কোমল অনুগ্রহ-ক্ষমা নিয়ে আসবেন। এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, 'দায়ূদের পুত্র হবেন দরিদ্রদের রাজা' (গীত ৭২:২, ৪, ১২, ১৩)। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তা যতটা না জাগতিক দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক দীনতার কারণে গরীব তারচেয়ে বেশি আত্মায় যারা দরিদ্র তাদের কথাই এখানে বিধৃত হয়েছে এবং যেন শাস্ত্রের এই কথাটি পূর্ণ হয় (যিশাইয় ৬১:১)– 'তিনি আমাকে নিযুক্ত করেছেন যেন আমি গরীবদের কাছে সুসমাচার প্রচার করি।' মনে রাখুন, এটা খ্রীষ্টের স্বর্গীয় মিশনের একটি প্রমাণ যে, তাঁর শিক্ষা-ই ছিল সুসমাচার; যারা তাদের পাপের জন্য দুঃখের মধ্যে থেকে সত্যিকারভাবে নিজেদের নম্র করে– এই সুসমাচার তাদেরই জন্য। প্রকৃতপক্ষে সত্যিকারভাবে বিনম্র তারাই যারা নিজেদের তুচ্ছ করে। তাদের কাছে এটা পরিবেশিত হল; কারণ তাদের জন্য ঈশ্বর সবসময়ই বলেছেন যে, তার কাছে ক্ষমা বরাদ্দ আছে।

(গ) দরিদ্ররা সুসমাচার গ্রহণ করছে'– এই সুসমাচার তাদের ধারণ করে, পরিবর্তন করে, তারা এই সুসমাচার গ্রহণ করে এবং এতেই আনন্দ করে, এর শিক্ষা দ্বারা নিজেদের সাজায় এবং ছাঁচে ফেলার মতো করেই এর কাছে নিজেদের সমর্পণ করে। মনে রাখুন, সুসমাচারের বিস্ময়কর কাজই এর স্বর্গীয় উৎপত্তির প্রমাণ। গরীবেরা এর দিকে আগ্রহী হয়েছে। ভাববাদীরা দরিদ্রদের বিষয়ে অভিযোগ জানাতেন যে, তারা প্রভুর পথের বিষয়ে শেখেনি (যিরমিয় ৫:৪)। তারা নিজেদের জন্য ভাল কোন কিছুই করতে পারে নি; কিন্তু খ্রীষ্টের সুসমাচার তাদের মনে জ্ঞানের স্পৃহা জাগিয়ে তুলল, তাদের শিক্ষা দেবার পথ আবিষ্কার করল।

২. তিনি তাদের প্রতি একটি আশীর্বচন উচ্চারণ করলেন যারা তাঁর বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে নি (৬ পদ)। খ্রীষ্টের মিশনবিষয়ক এই প্রমাণগুলো খুবই পরিষ্কার; ফলে এ নিয়ে যারা স্বেচ্ছায় মনে সন্দেহ আনেনি, তাঁর বিষয়ে সমালোচনা, নিন্দা করে নি কিন্তু তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করেছে, তারা ধন্য। মনে রাখুন,

(১) খ্রীষ্টের মাঝে এমন কতগুলো বিষয় আছে– যা চিন্তার বাইরে; গভীরভাবে চিন্তা করেও যার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। প্রজ্ঞার অনুপস্থিতি অসচেতন ব্যক্তিদের কাছে সন্দেহের উদ্রেক করে, কারণ একে ধারণ করার শক্তি তাদের নেই; ফলে না বুঝেই কোন কোনও ঘটনার ভুল ব্যাখ্যা করে তারা সুসমাচারের বিষয়গুলোকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে। এই 'ক্ষুদ্র' ঘটনাগুলো হচ্ছে– তাঁর উপস্থিতি, নাসরতে তাঁর শিক্ষাগ্রহণ, তাঁর জীবনের দারিদ্র্য, তাঁর শিষ্যরা অপেক্ষাকৃত নিচু তলার মানুষ, তাঁর বিষয়ে মহান মানুষদের নীরব ভূমিকা, তাঁর শিক্ষার কঠোরতা, তাঁর শিক্ষায় আসা রক্ত ও মাংসের দ্বান্দ্বিকতা, তাঁর নামে কাজে নামার পর ধেয়ে আসা দুঃখভোগ প্রভৃতি বিষয় অনেককে তাঁর কাছ থেকে দূরে

সরিয়ে রাখে। অথচ অন্যসব বিষয়ে তারাই তাঁর ভিতরে ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ থাকে ও তা বিশ্বাসও করে। এভাবে তাঁর বিষয়ে সন্দেহের পাথর (১ পিতর ২:৮) লালন করার জন্য অনেকের পতন হবে– এমনকি ইস্রায়েলীয়দের মাঝেই (লূক ২:৩৪)।

(২) তারা ধন্য, যাদের মনে এইসব বিষয়ে কোন সন্দেহ আসে না। 'তারা ধন্য'। এই অভিব্যক্তি প্রকাশ করে যে, এইসব অবিশ্বাস, সন্দেহকে জয় করাটা কঠিন কাজ এবং সেগুলোকে জয় করতে না পারাটাও বিপদজনক; কিন্তু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে যাদের মনে এসব বিষয় কোন বাধার সৃষ্টি করবে না, যারা তাতে মুখ ঘুরিয়ে নেবে না, তাদের বিশ্বাসকে অনেক বেশি বেশি করে পাওয়া যাবে– প্রশংসা, গৌরব এবং সম্মানদানের জন্য।

মথি ১১:৭-১৫

খ্রীষ্টের মুখ থেকে এখানে আমরা বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বিষয়ে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা শুনি; তবে তা কেবল তাঁর সম্মানকে উজ্জীবিত করার জন্য নয়, উপরন্তু তাঁর কাজকে উজ্জীবিত করার জন্য। খ্রীষ্টের কোন কোন শিষ্য হতে পারে যোহনের পাঠানো প্রশ্ন থেকে তাঁর বিষয়ে প্রতিবিম্ব আঁকার উপলক্ষ করতে চেয়েছিলেন যে, তিনি দুর্বল এবং তাঁর মনে দোটানা চলছে এবং নিজের সাথেই তাঁর দ্বন্দ্ব চলছে– এগুলোকে থামাতেই খ্রীষ্ট তাঁর বিষয়ে এভাবে প্রশংসা করলেন। মনে রাখুন, আমাদের ভাইদের সীমাবদ্ধতা, চিন্তার ত্রুটি কিংবা চরিত্র নিয়ে কথা বলা আমাদের দায়িত্ব; কিন্তু তা কেবল তা সারিয়ে তোলার জন্য নয় উপরন্তু তাদের মধ্য থেকে ঈর্ষা ও মন্দ চিন্তাকে দূর করার জন্য। এক্ষেত্রে আমরা সম্ভাব্য সব উপলক্ষকে বেছে নেব– বিশেষত কারও দুর্বল দিক খুঁজে পেলে তা কাটিয়ে ওঠার জন্য তাকে উৎসাহ দেব। যারা প্রশংসাযোগ্য তাদের বিষয়ে ভাল বলব; যে ফল তারা ধারণ করে আছে তা-ই তাদের দেব। বাপ্তিস্মদাতা যোহন যখন খ্রীষ্টের বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন তখন খ্রীষ্ট ছিলেন নিভৃতে এবং তখনও তাঁর কাজ শুরু করেন নি। এখন, খ্রীষ্ট যখন প্রকাশ্যে দেখা দিলেন এবং তাঁর দীপ্তিতে যোহন ঢেকে গেলেন তখন তিনি যোহনের বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন।

মনে রাখুন, নিজেদের বিষয়ে যাদের নিশ্চিত আগ্রহ আছে তারা একে অন্যের সাহায্যার্থে তাদের ভাল দিকগুলো উন্মোচন করবে, তাদের প্রশংসা করবে; কারণ তার দৃঢ়তা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে এর প্রয়োজন আছে। বিরুদ্ধ পরিবেশ, সমালোচনা সবসময়ই যে ফলপ্রসূ হবে তেমনটা ভাবার কোন কারণ নেই। খ্রীষ্ট এখানে যোহনকে তার প্রাপ্য সম্মান দিলেন। যোহন খ্রীষ্টকে সম্মানিত করতে নিজেকে নিচু করেছিলেন (যোহন ৩:২০, ৩০; মথি ৩:১১), নিজেকে তিনি কিছুই মনে করেন নি কিন্তু খ্রীষ্টকেই সব কিছু বলে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু এখন খ্রীষ্ট তাঁর বিষয়ে এই প্রশংসাপত্র দিয়ে তাকে সম্মানিত করলেন। মনে রাখুন, যারা নিজেদের বিনম্র করে তাদের উঁচুতে তোলা হবে এবং যারা খ্রীষ্টকে সম্মান দেখায় তারা সম্মানিত হবে। যারা তাঁকে মানুষের সামনে স্বীকার করে, তিনিও তাদের স্বীকার করবেন এবং কখনও কখনও তা মানুষের সামনেও– এমনকি এই পৃথিবীতেই। যোহন এখন তাঁর সাক্ষ্যদান শেষ করেছেন এবং খ্রীষ্ট তাঁকে প্রশংসিত করলেন। মনে রাখুন, খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের জন্য সম্মান সংরক্ষণ করে রেখেছেন; যখন তারা

তাদের কাজ শেষ করবে তখন তিনি তা দেবেন (যোহন ১২:২৬)।

এখন যোহনের বিষয়ে খ্রীষ্টের এই প্রশংসাসূচক কথাবার্তার দিকে লক্ষ্য করুন।

ক. খ্রীষ্ট যোহনের বিষয়ে এভাবে সম্মানের সাথে বললেন– যোহনের শিষ্যদের শুনিয়ে নয় কিন্তু যখন তারা চলে গেলেন, তাদের যাওয়ার কিছু পরে (লূক ৭:২৪)। এ থেকে বোঝা যায়, তিনি যোহন সম্পর্কে মোটেই তোষামোদ করেন নি; তিনি চাইলেন না, তারা তাঁর মুখের প্রশংসার কথা যোহনকে গিয়ে বলুক। মনে রাখুন, যদিও আমরা কাউকে উৎসাহিত করার জন্য তার প্রাপ্য প্রশংসা দিতে অগ্রসর হব তবুও তা বলার সময় লক্ষ্য রাখব যেন তা তোষামোদি, লোকদেখানো না হয়, কিংবা তাদের ফুলিয়ে উপরে তোলাটা যেন তাদের জন্য কাল হয়ে না দাঁড়ায়। যারা অন্যান্য ক্ষেত্রে পৃথিবীর কাছে বিব্রত তারা নিজেদের প্রশংসা ভালভাবে বহন করতে পারে না। গর্ব হচ্ছে দূষিত মানসিক প্রকৃতি, যা আমরা তো প্রয়োগ করবই না এমনকি অন্যদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করব না।

খ. খ্রীষ্ট যোহনের বিষয়ে যা বলেছিলেন তা কেবল তাকে প্রশংসিত করার জন্যই নয় কিন্তু লোকের সুবিধার জন্য, যোহনের প্রচারকাজের স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য– যা অত্যন্ত কার্যকরভাবে করা হয়েছিল কিন্তু এখন বিস্ময়করভাবে অন্যান্য বিষয়ের মতো এ সম্পর্কেও সবাই বিস্মৃত হয়েছে। তারা একটা সময়ের জন্য তা করেছিল– 'কিন্তু একটি সময় তারা তার আলোতে আনন্দ করে' (যোহন ৫:৩৫)। 'এখন বিবেচনা করুন মরুভূমিতে আপনারা কী দেখতে গিয়েছিলেন? নিজেকে এই প্রশ্নটি করুন।'

১. যোহন মরুভূমিতে প্রচার করেছিলেন এবং সেখানে লোকেরা ভিড় করেছিল, যদিও তা একটি দূরবর্তী এলাকা ছিল এবং জায়গাটা মোটেও সুবিধার ছিল না। যদি শিক্ষকেরা এক কোনে স্থানান্তরিত হন তবে তাদের ছাড়া চলার চেয়ে তাদের পিছনে যাওয়া ভাল। এখন, তাঁর শিক্ষা যদি মূল্যবান হয়ে থাকে এবং তা শুনতে শ্রমও ব্যয় হয় তবে নিশ্চিতভাবে এটা ছিল মূল্যবান– যা নতুন করে সংগ্রহ করতে যত্নের প্রয়োজন ছিল। যে শিক্ষা লাভের জন্য বড় বড় বাধা ডিঙাতে হয় সেই শিক্ষায় আমরা অনেক বেশি লাভবান হই।

২. তারা তাঁর কাছে গিয়েছিল তাঁকে দেখতে; তবে তা যতটা না তাঁর অসাধারণ নির্দেশনায় নিজেদের আত্মাকে সমৃদ্ধ করার জন্য তার চেয়েও বেশি তাঁর চেহারায় কী অসাধারণত্ব ছিল, তাঁর ব্যক্তিত্ব কেমন– তা দেখতে। বিবেকবোধ জাগ্রত করার চেয়ে বরং তারা কৌতূহলের বশেই তাঁকে দেখতে গিয়েছিল। মনে রাখুন, অনেকেই বাক্যের কাছে আসে কেবল দেখার এবং দেখানোর জন্য; কিন্তু তা শিক্ষা লাভ কিংবা পাঠ নেওয়ার জন্য নয়। পরিত্রাণের বিষয়ে জ্ঞানী হওয়ার চেয়ে বরং কথা বলার বিষয় খুঁজতেই তারা আসে। খ্রীষ্ট এখানে তাদের কথাই বলেছেন, 'আপনারা কী দেখতে গিয়েছিলেন?' মনে রাখুন, যারা বাক্যের কাছে আসে তাদের মূল্যায়নে দু'টো বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা হয়– তাদের উদ্দেশ্য কী ছিল এবং তাদের কতটুকু উন্নতি সাধিত হয়েছে। শিক্ষালাভ শেষ হলে তার প্রতি মনোযোগও শেষ হয়ে যায় না; বরং তখন আরও বেশি মনোযোগ ও চেষ্টা চালানোর কাজ কেবল শুরু হয়। শীঘ্রই এই কথা জিজ্ঞেস করা হবে, 'এই রকম সত্যিকারের নির্দেশের ক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা কী ছিল? কী আকর্ষণে তার পেছনে গিয়েছিলেন? এটা কি কেবল প্রথা মাফিক, কাউকে সঙ্গ দিতে কিংবা এটা কি ঈশ্বরকে সম্মান জানানোর উদ্দেশ্য থেকে ও তাকে পাওয়ার ইচ্ছা থেকে? সেখান থেকে কী নিয়েছিলেন? কোন জ্ঞান, অনুগ্রহ, সান্ত্বনা?

কী দেখতে গিয়েছিলেন?' মনে রাখুন, যখন আমরা বাক্য পড়ি ও শুনি তখন আমাদের করণীয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত।

গ. আসুন দেখা যাক, যোহনের বিষয়ে খ্রীষ্ট প্রশংসাসূচক কী বলেছিলেন। তারা জানতো না খ্রীষ্টের প্রশ্নের উত্তরে কী বলতে হবে; 'ঠিক আছে,' খ্রীষ্ট বললেন, 'আমি আপনাদের বলছি বাপ্তিস্মদাতা যোহন কেমন মানুষ ছিলেন।'

১. 'তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অবিচল এবং তিনি বাতাসে দোলা নলখাগড়া ছিলেন না; আপনাদের চিন্তায় এমনটা থাকলেও তিনি আসলে তা ছিলেন না। তিনি তাঁর নীতিতে নড়বড়ে ছিলেন না কিংবা তাঁর কথাবার্তাও অসামঞ্জস্য ছিল না; কিন্তু তিনি নিজের অবস্থানে দৃষ্টান্তযোগ্যভাবে স্থির, অবিচল বিশ্বস্ত ছিলেন।' যারা নলখাগড়ার মতো পাতলা তারা এর মতো দুলবেই; কিন্তু যোহন আত্মায় শক্তিশালী ছিলেন (ইফিষীয় ৪:১৪)। যখন বিপুল জনতা তাঁর অনুকূলে উল্লাস করছিল তখনকার মতো হেরোদের ক্রোধের ঝড় আছড়ে পড়লেও, বিরুদ্ধ পরিবেশেও তিনি আগের মতোই স্থির ছিলেন, সব অবস্থায় একইরকম ছিলেন। খ্রীষ্ট বিষয়ক যে সাক্ষ্য তিনি বহন করেছিলেন তা নলখাগড়া ছিল না বরং তিনি সেই মানুষ ছিলেন যিনি আজ যেমন আছেন আগামীকালও তেমনই থাকবেন। এটা মোরগের মতো সকালে ডাকবার মতো করে নিজের অস্তিত্ব জানান দেয় না, বরং তাঁর বিশ্বস্ততা চিরকাল স্থায়ী (যোহন ১:২০); তিনি যাকে স্বীকার করেন তাকে অস্বীকার করেন না; এবং তাতে স্থির থাকেন (যোহন ৩:২৮)। সে কারণেই তার শিষ্যেরা খ্রীষ্টের কাছে যে প্রশ্ন নিয়ে গিয়েছিলেন তা তিনি যে সত্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন তার সাথে কোন সন্দেহের বশবর্তী হয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি করবার জন্য ছিল না– যে কারণে লোকেরা তাঁর কাছে ভিড় জমিয়েছিল, কারণ তিনি নলখাগড়া ছিলেন না। মনে রাখুন, অবিচল দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সাথে দীর্ঘ দৌড়ে আমাদের কাজে কোন কিছু হারানোর নেই; মানুষের হাস্যোজ্জ্বল সমর্থন কিংবা তাদের ভ্রূকুটির ভয় আমাদের লক্ষ্য থেকে সরাতে পারে না।

২. তিনি ছিলেন একজন আত্মবিস্মৃত ব্যক্তি এবং পৃথিবীর দৃষ্টিতে তা তেমন আলোচ্য বিষয় ছিল না। 'তোমরা কি এটা দেখতে গিয়েছিলে যে তিনি কোন সুন্দর দামি কাপড় পরে আছেন কি না? যদি তাই হয় তবে তোমরা মরুভূমিতে তাঁকে দেখতে যাওনি, কিন্তু ভিড় জমাতে গিয়েছিলে। তোমরা এমন একজনকে দেখতে গিয়েছিলে যাঁর পোশাক ছিল উটের লোম এবং কোমর-বাধনি ছিল চামড়ার; তাঁর বাহ্যিক চেহারা এবং অভ্যাস দেখিয়েছিল যে, তিনি পৃথিবীর আড়ম্বরতা-জাঁকজমকের কাছে মৃত ছিলেন; এমনকি সেই ভাবনার ধারে কাছেও তিনি ছিলেন না। তাঁর পোশাক একই সাথে তাঁর আবাস এবং শিক্ষার বিষয়ে বলে– **এক.** তিনি মরুভূমির বাসিন্দা ছিলেন এবং **দুই.** তিনি অনুতাপের বাণী প্রচার করছেন। তাই মানবীয় সুখানুভূতির কাছে যিনি আগন্তুক ভিন্ন আর কিছু ছিলেন না তিনি স্রেফ জেলে বন্দি হবার ভয়ে নিজের মন পরিবর্তন করে ফেলবেন এবং খ্রীষ্টের পরিচয়কে প্রশ্নবিদ্ধ করবেন– এমনটা ভাবার কোন কারণ নেই।' মনে রাখুন, যারা সংযমী জীবনযাপন করেন তাদের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা, নির্যাতনের কারণে স্বপথ ত্যাগ করার সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প। তিনি রাজবাড়ির সদস্যদের মতো সুন্দর পোশাক পরা লোক ছিলেন না।

মনে রাখুন, লোকের অভিব্যক্তি, বেশভূষায় তাদের চরিত্রের স্বরূপ ও অবস্থা ফুটে ওঠে। যারা প্রচারক তারা অবশ্যই লোকের তোষামোদে কিংবা তাদের চাওয়াকে প্রাধান্য দেবেন না, অনুরূপভাবে প্রভাবিতও হবেন না; কিংবা এমন কিছু করবেন না যা সাধারণের

বলে গণ্য হয়, সুন্দর কাপড়চোপড়ের প্রতি উচ্চাভিলাষী হবেন না, দামি প্রাসাদে থাকার কথা মাথায়ও আনবেন না। অর্থাৎ সাধারণের চিন্তা তাদের থাকবে না। বিচক্ষণতা আমাদের অংশের হতে শিক্ষা দেয়। যোহনকে দেখা গিয়েছিল কর্কশ এবং অসন্তুষ্ট তবুও তারা তাঁকে ঘিরে ভিড় জমিয়েছিল। মনে রাখুন, ঈশ্বরের বাক্যের সাথে থাকার ক্ষেত্রে পুরানো আগ্রহের চিন্তা আমাদের বর্তমান কাজকে প্রভাবিত করে; তা তাড়াহুড়া বাধিয়ে দেয়। তাই কখনও বলবেন না, আমরা মিছেমিছি অনেক কিছু করেছি এবং দুঃখভোগ করেছি, অনর্থের পেছনে দৌড়েছি এবং মিথ্যেই পরিশ্রম করেছি।

৩. তাঁর মহান প্রশংসার বাণীর সবটুকুই ছিল তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব এবং তাঁর কাজ সম্পর্কে, যা তাঁর ব্যক্তিগত দান অথবা যোগ্যতা– যা হতে পারতো তার চেয়েও বেশি সম্মানের; এবং সে কারণেই এটা বিস্তৃত হয়ে একটি পূর্ণ প্রশস্তিতে পরিণত হয়েছে।

(১) তিনি ছিলেন একজন ভাববাদী, এবং ভাববাদীর চেয়েও বেশি কিছু (৯ পদ)। তাই তিনি তাঁর সম্পর্কে বললেন যিনি নিজেই ছিলেন মহানবী, যাঁর বিষয়ে সব ভাববাদীই সাক্ষ্য দিয়েছেন। যোহন তাঁর নিজের বিষয়ে বলেছেন তিনি সেই ভাববাদী নন, সেই মহানবী নন, নিজে খ্রীষ্টও নন। খ্রীষ্ট (সঙ্গতিপূর্ণ বিচারে) তাঁর নিজের বিষয়ে বললেন যে, তিনি ছিলেন ভাববাদীর চেয়েও বেশি কিছু। তিনি নিজেকে খ্রীষ্টের সামনে নিচু করেছিলেন এবং খ্রীষ্ট তাকে সব ভাববাদীদের চেয়ে উঁচুতে তুললেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের অগ্রদূত রাজা ছিলেন না, কিন্তু ছিলেন একজন ভাববাদী। এ থেকে বোঝা যায়, খ্রীষ্টের রাজ্য প্রার্থিব ক্ষমতাশাসিত রাজ্য নয়; কিন্তু তাঁর সমসাময়িক সংবাদবাহক ছিলেন এমন একজন, যিনি পুরাতন নিয়মের সব ভাববাদীকে ছাপিয়ে গেছেন। যদিও অন্য ভাববাদীরা ধার্মিকতার সাথে কাজ করেছেন কিন্তু যোহন তাঁদের সবাইকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন; তাঁরা দূর থেকে খ্রীষ্টের দিন দেখেছিলেন; কিন্তু যোহন সেই দিনের শুরুটা দেখেছেন; তিনি দেখেছেন সূর্যোদয় এবং লোকদের খ্রীষ্টের বিষয়ে বলেছেন। তিনি তাদের এমন একজনের কথা বলেছিলেন যিনি তাদের মাঝে দাঁড়ানো। তারা খ্রীষ্টের বিষয়ে বলেছেন কিন্তু যোহন তাঁকে নির্দেশ করেছেন; তারা বলেছিলেন একজন কুমারী গর্ভবতী হবেন; আর তিনি বললেন, 'ওই দেখ ঈশ্বরের মেষ!'

(২) তিনি ছিলেন সেই ব্যক্তি– খ্রীষ্টের অগ্রদূত হিসেবে যাঁর কথা শাস্ত্রে আগেই বলা হয়েছিল (১০ পদ); 'ইনিই তিনি যাঁর সম্পর্কে শাস্ত্রে লেখা হয়েছে'। অন্য ভাববাদীদের মাধ্যমে তাঁর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল এবং সেকারণেই তিনি ছিলেন তাদের চেয়ে মহান। মালাখি বাপ্তিস্মদাতা যোহন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'দেখ, আমি আমার সংবাদবাহককে তোমার আগে পাঠাচ্ছি।' এখানে তাঁর উপর খ্রীষ্টের সম্মানের খানিকটা প্রযুক্ত হয়েছিল যে, পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা তাঁর সম্পর্কে বলেছেন এবং লিখেছেন এবং এই সম্মান সব ঈশ্বরভক্তের যাঁদের নাম মেষশিশুর জীবনবইয়ে লেখা হয়েছে। খ্রীষ্ট তাঁর বার্তাবাহক হিসেবে যোহনকে সব ভাববাদীর উপরে স্থান দেওয়ার মাধ্যমে তাকে উঁচুতে তুললেন। তিনি ছিলেন একজন মহান দূত যাঁকে মহান দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল– একজন বার্তাবাহক, যিনি হাজারের মাঝে একজন। এই সম্মান তিনি তাঁর কাছ থেকে পেলেন যার সংবাদ তিনি ঘোষণা করেছেন। 'তিনি আমার বার্তাবাহক যাঁকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন।' তাঁর কাজ ছিল খ্রীষ্টের পথ প্রস্তুত করা, পরিত্রাণকর্তাকে গ্রহণের জন্য লোকদের বিন্যস্ত করা। মূলত একাজ তিনি করেছিলেন তাদের পাপ এবং নিরানন্দকে

আবিষ্কার করে দেখিয়ে দিয়ে এবং তাদের যে একজন পরিত্রাণকর্তার প্রয়োজন আছে– সে বিষয়টি তুলে ধরার মাধ্যমে। একথা তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে বলেছেন (যোহন ১:২৩) কিন্তু খ্রীষ্ট এখন সেটা তাঁর বিষয়ে বলছেন। কেবল যোহনকে সম্মানিত করাই এর উদ্দেশ্য ছিল না উপরন্তু লোকে যেন সেই শিক্ষার দিকে উজ্জীবিত হয়। মনে রাখুন, ঈশ্বরের বিশেষ বিবেচনার সৌন্দর্যের বেশির ভাগই তাদের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ এবং একতার সাথে বিন্যস্ত থাকে এবং তাঁর কথা একে অন্যকে বলে দেয়। যে বিষয়টি যোহনকে পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের চেয়ে এগিয়ে রেখেছিল– তা হচ্ছে তিনি খ্রীষ্টের কিছু আগে এসেছেন– অর্থাৎ তিনি তাঁর সমসাময়িক। মনে রাখুন, যারা খ্রীষ্টের কাছের তারা সত্যিকারভাবেই অনেক বেশি সম্মানিত হয়।

(৩) বাপ্তিস্মদাতা যোহনের চেয়ে নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণকারী আর কোন মানুষ মহান নন (১১ পদ)। খ্রীষ্ট জানতেন কীভাবে কাউকে উপযুক্ত সম্মান ও মূল্য দিতে হয় এবং তিনি যোহনকে তাঁর আগে যাঁরা এসেছেন তাঁদের আগে রাখলেন। 'তাঁদের' আগে– যাঁরা নারীর গর্ভের সাধারণ প্রজন্ম হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছে। ঈশ্বর তাঁর মণ্ডলীর কাজে যাঁদের দায়িত্ব দিতে আহ্বান করেছিলেন এবং উর্ধ্বে তুলেছিলেন, যোহন ছিলেন তাঁদের সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ , এমনকি মোশিকে অতিক্রম করেও। কারণ তিনি পরিত্রাণের সুসমাচারের সংবাদ, পাপের ক্ষমার বাণী সেই লোকদের কাছে তুলে ধরতে শুরু করেছিলেন যারা ছিল প্রকৃতই অনুতপ্ত; এবং তিনি স্বর্গ থেকে এমন সব প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন– যা তাঁর পূর্বেকার ভাববাদীদের চেয়েও মহান ছিল; কারণ তিনি দেখেছিলেন স্বর্গ তাঁর সামনে খুলে গেছে এবং পবিত্র আত্মা নেমে এলেন। তিনি তাঁর কাজে মহাসাফল্য অর্জন করেছিলেন। প্রায় পুরো দেশই তাঁর সামনে এসে জড় হয়েছিল; যোহন যেমনটা করতে সমর্থ হয়েছিলেন সেরকমভাবে এই অভূতপূর্ব জনসমাগম তৈরি করতে এবং তাঁর মতো কাজ নিয়ে আর কেউ আসেন নি; কিংবা এরকম অভ্যর্থনা জানানোর জন্য তাঁদের মনোনীতও করা হয় নি, ফলে তাঁরা তা দাবিও করতে পারেননি। নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণকারী অনেকেই পৃথিবীতে মহাসম্মানের জায়গায় বসেছেন, কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁদের সবার আগে যোহনকে রাখলেন। মনে রাখুন, মহানত্ব চেহারা কিংবা বাহ্যিক চমৎকারিত্ব দ্বারা মাপা যায় না; কিন্তু তাঁরাই হচ্ছেন মহামানব যাঁরা ঈশ্বরের পথে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন এবং তা হচ্ছে সবচেয়ে সেরা অনুগ্রহ। তারা যোহনের মতো, তিনি যেমন ছিলেন– ঈশ্বরের চোখে মহান (লূক ১:১৫)।

তবুও যোহন সম্পর্কে এই অকুণ্ঠ প্রশংসার একটি বিস্ময়কর সীমাবদ্ধতা ছিল, 'কিন্তু স্বর্গ-রাজ্যের মধ্যে যে সবচেয়ে ছোট তিনিও যোহনের চেয়ে মহান।'

(ক) গৌরবের রাজ্যে। যোহন ছিলেন একজন মহান এবং ভাল মানুষ, তবুও তাঁর মাঝে অসম্পূর্ণতা এবং সীমাবদ্ধতা ছিল এবং সে কারণেই তাঁকে গৌরবান্বিত ঈশ্বরভক্তদের চেয়ে এখানে ছোট করে দেখানো হয়েছে। কেবল আত্মাই মানুষকে সিদ্ধতা-পূর্ণতা দিতে পারেন। মনে রাখুন, প্রথমত, স্বর্গে গৌরবের শ্রেণীবিভাগ আছে, কেউ কেউ সেখানে অপরের চেয়ে কম গৌরবান্বিত; যদিও প্রত্যেক পাত্রই ভরা তবুও সবগুলো বড় এবং একই রকম ধারণ-ক্ষমতা সম্পন্ন নয়। দ্বিতীয়ত, স্বর্গের ছোট সদস্যও মহান এবং তিনি অনেক জানেন, ভালবাসেন এবং ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার কাজ অনেক বেশি করে থাকেন এবং তাঁর কাছ থেকে বেশি গ্রহণও করেন, যা এই পৃথিবীর সর্বোচ্চ উপহারের চেয়ে সেরা। পৃথিবীর ঈশ্বরভক্তরা প্রত্যেকে অসাধারণ (গীত ১৬:৩), কিন্তু যারা স্বর্গের তারা আরও বেশি

অসাধারণ। এই পৃথিবীর সেরারাও স্বর্গদূতদের চেয়ে নিচু (গীত ৮:৫), আর যারা স্বর্গ-রাজ্যে ছোট তারা স্বর্গদূতদের সমান, যা আমাদের সেই অনুগ্রহের রাজ্যে বড় করে তোলে, যেখানে দুর্বলও দায়ূদের মতো হবে (সখরিয় ১২:৮)।

(খ) স্বর্গ-রাজ্যে। এখানে ঈশ্বরের অনুগ্রহের রাজ্যের কথা বোঝানো হয়েছে। সুসমাচারই যে এর ক্ষমতা এবং খাঁটিত্ব সঠিকভাবে বণ্টন করে– তা সহজেই বোঝা যায়। যিনি এর অল্প পরিমাণও পান তিনি যোহনের চেয়ে মহান। কেউ কেউ এর অর্থ করেন যে, এখানে খ্রীষ্টের কথা বলা হয়েছে, যিনি যোহনের চেয়ে বয়সে ছোট ছিলেন এবং তাই এইরকম অভিমত– যোহনের চেয়ে ছোট। খ্রীষ্ট এখানে নিজের বিষয়ে কমিয়ে বলেছেন, 'আমি খুবই ক্ষুদ্র এবং মহান কেউ নই', তবুও তিনি যোহনের চেয়ে মহান ছিলেন। যোহনের সেকথাই বলেছেন (যোহন ১:১৫)– 'যিনি আমার পরে আসছেন তিনি আমার চেয়ে মহান।' কিন্তু তার এই কথাকে যদি নতুন নিয়মের প্রেরিত এবং প্রচারকদের সাথে মিলিয়ে দেখা হয় তবে তা বোঝা সহজ হয়। যাঁরা সুসমাচারসংক্রান্ত ভাববাদী, তাঁদের সাথে যোহনের তুলনা তাঁদের ব্যক্তিগত পবিত্রতার কথা প্রতিষ্ঠিত করে না, কিন্তু তা তাঁদের কাজের গুরুত্বের কথাই তুলে ধরে; যোহন খ্রীষ্টের আসবার কথা প্রচার করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা প্রচার করেন যে, খ্রীষ্ট কেবল আসেনইনি উপরন্তু ক্রুশাহত ও গৌরবান্বিত হয়েছেন। যোহন এসেছিলেন সুসমাচারের দিনের প্রভাতলগ্নে এবং এর দ্বারাই তিনি তাঁর আগেকার ভাববাদীদের অতিক্রম করে গিয়েছিলেন; কিন্তু সেই দিনের দুপুরে তাঁকে দৃশ্যপট থেকে তুলে নেওয়া হল, পর্দা ছিঁড়ে যাওয়ার আগে, খ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করার আগে, পুনরায় উত্থিত হওয়ার আগে, পবিত্র আত্মার নেমে আসবার আগে। ছোট সদস্য হিসেবে প্রেরিত ও প্রচারকেরা মহান আবিষ্কারসহ যে দায়িত্ব পেয়েছিলেন তা ছিল যোহনের চেয়ে মহান। যোহন কোন চিহ্ন-কাজ করেন নি; প্রেরিতেরা অনেক চিহ্ন-কাজ করেছিলেন। এই মনোনয়নের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে পুরাতন নিয়মের পর নতুন নিয়মের প্রায়োগিক আবশ্যকতার উপর। নতুন নিয়মের প্রচারকেরা সে কারণেই অন্য সবাইকে অতিক্রম করেছেন, কারণ তাদের কাজের ক্ষেত্র ও প্রচেষ্টা তা-ই ছিল (২ করিন্থীয় ৩:৬, প্রভৃতি)। ভাববাদী হিসেবে যোহন তাঁর কাজের প্রেক্ষিতে মহান ছিলেন। তাঁর কর্তব্যই তাঁকে চরম অবস্থার মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই ছোট সদস্যরা ছিলেন সর্বোচ্চ দায়িত্বের অধিকারী– যে দায়িত্ব পূর্বেকার সব দায়িত্বের চেয়ে মহান; 'পর্বতের বামন যা দেখে তা উপত্যকার দৈত্যও দেখতে পায় না।' মনে রাখুন, খ্রীষ্টের মাধ্যমে মানুষের সত্যিকার মহানত্ব আসে; যে সম্মান ও উপাধি সে পায় তা খ্রীষ্টের প্রাচুর্যপূর্ণ অভিব্যক্তিতে প্রকাশিত হয়। তিনি যতটুকু তাঁকে মহান করতে চান তার চেয়ে কেউ অত মহান হতে পারে না। এটা কি একটা চমৎকার কারণ নয়, যেজন্য আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব যে, তিনি আমাদের দলকে তাঁর স্বর্গ-রাজ্যের দিনে ধরেছেন– ভালবাসা এবং আলোর এরকম অগ্রগামিতা দিয়ে! এবং সেই অগ্রগামিতাকে 'মহান' বলে ধরা হবে যদি আমরা অর্থপূর্ণভাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ গ্রহণ করি।

(৪) বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বিষয়ে মহাপ্রশংসা ছিল– বরফ ভাঙার এই দায়িত্ব ঈশ্বরই তাকে দিয়েছিলেন; স্বর্গ-রাজ্যের জন্য লোকদের প্রস্তুত করার এই কঠিন কাজ তিনি বিস্ময়করভাবে সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করেছেন। বাপ্তিস্মদাতাকে প্রথম দেখতে পাওয়ার দিন থেকে এখন পর্যন্ত (যা দু'বছরের বেশি ছিল না) একটি মহান দায়িত্ব চমৎকারভাবে

সম্পন্ন হয়েছে; প্রকৃতপক্ষে এর গতি ছিল খুবই দ্রুত– যা স্বল্পতম সময়ে খ্রীষ্টকে কেন্দ্রীয় চরিত্রে দাঁড় করিয়ে দিল। স্বর্গ-রাজ্য 'আগ্রাসন' সহ্য করে। এই আগ্রাসনের স্বরূপ অনেকটা একদল সৈন্যের ঝড়ের বেগে আগ্রাসী হয়ে একটি শহর দখল করে নেওয়ার মতো; কিংবা একটি বাড়িতে প্রচুর লোকের ভিড় হলে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয় সেরকম 'চাপ'– এর মতো। এই প্রকার আগ্রাসন মূলত জোরের ওপর হয়ে থাকে। এর মানে হচ্ছে আমরা একটি সমান্তরাল স্থানে আছি (লূক ১৬:১৬)। 'তারপর থেকে ঈশ্বরের রাজের সুসমাচার প্রচার করা হচ্ছে এবং সবাই আগ্রহী হয়ে জোরের সঙ্গে সেই রাজ্যে ঢুকছে।' যোহনের প্রচারের ফলে প্রচুর লোক এসেছিল এবং তাঁর শিষ্য হয়েছিল। কিন্তু এই লোকেরা,

(ক) উদ্দেশ্যের প্রতি পরিষ্কার ছিল না; তারা ছিল সন্দেহযুক্ত; যারা এই রাজ্যে একটু স্থানলাভের জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করেছিল (যে কেউ এমনটা ভাবতে পারেন) তাদের অধিকার ছিল না। কারণ এখানে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, এরা বিনা অধিকারে প্রবেশকারীদের মতো বেঁকে চুরে ঢুকতে চাচ্ছে। অথচ এই প্রক্রিয়াটি আইনসিদ্ধ নয় বরং একটি ভুলে পূর্ণ এবং শক্তিপ্রয়োগের উদাহরণবিশেষ। 'যখন রাজ্যের সন্তানেরা এ থেকে বিতাড়িত হল এবং অনেকে পূর্ব ও পশ্চিম থেকে আসলো, তখন তা আগ্রাসনের কষ্ট ভোগ করল।' একে ২১:৩১, ৩২ পর্বের সাথে তুলনা করুন। করআদায়কারীরা এবং ব্যভিচারিণীরা যোহনকে বিশ্বাস করেছিল– যাকে ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকরা প্রত্যাখ্যান করেছিল। সে কারণেই তারা তাদের আগে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করেছে– 'এটা তাদের মাথার উপর রাখ, যখন তারা তা তুচ্ছ করে।' মনে রাখুন, উৎকৃষ্টতার চেয়ে 'ভাল স্বভাবের' স্বর্গে যাওয়াটা নিয়মের ব্যত্যয় নয়। সুসমাচারের শৈশবাবস্থায় করা এই প্রশংসা প্রকৃতই মহান। কারণ তা অনেককে পবিত্রতায় বিশ্বাস এনেছিল– যাদের পক্ষে সেখানে প্রবেশ করাটা ছিল অসম্ভব।

(খ) একটি নাছোরবান্দা জনতা। যারা যোহনের প্রচার অনুসরণ করেছিল তাদের মধ্যে এই আগ্রাসন শক্তি, তেজ, পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল; এছাড়া তাদের পক্ষে সেই 'দূরত্বটুকু' অতিক্রম করা সম্ভব হতো না। এটা আমাদের এটাও দেখায়, যারা তাদের ধর্মের জন্য স্বর্গ গড়তে চায় তাদের কী পরিমাণ আগ্রহ ও ব্যাকুলতা থাকা প্রয়োজন। মনে রাখুন, যারা স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করবে তাদের অবশ্যই কষ্ট করতে হবে; সেই রাজ্য একটি পবিত্র আগ্রাসন সহ্য করে; নিজেকে অবশ্যই অস্বীকার করতে হবে, মনের ঝোঁক ও ঔৎসুক্য, কাঠামো এবং মনের বিরক্তি অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে; তা করতে গেলে অবশ্যই কঠিন পরিস্থিতি, দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে যেতে হবে, খারাপ প্রকৃতির ওপর বল প্রয়োগ করতে হবে। আমরা অবশ্যই দৌড়াবো, সংগ্রাম করব, লড়াই করব, বেদনার মধ্যে থাকব; কারণ এরকম পুরস্কারপ্রাপ্তির কাছে সব কিছুই তখন তুচ্ছ হয়ে যাবে; সেই পুরস্কার পাওয়া ও না পাওয়ার মাঝে যে প্রতিকূলতা– তা প্রতিরোধ করতে শিখব, কারণ এর ফল আনন্দদায়ক। 'আগ্রাসন' মানেই হচ্ছে জোর করে আদায় করা। যারা মহান পরিত্রাণের প্রতি আগ্রহী হবে তাদেরকে একটি শক্ত বাসনা সামনের দিকে নিয়ে যাবে; যেকোন শর্তে তারা তা পেতে চাইবে; ফলে কোন প্রতিবন্ধকতাকে তারা কষ্টকর মনে করবে না, কিংবা তাদের মুঠো তারা বন্ধ করবে না– একটি আশীর্বাদ ছাড়া (আদি ৩২:২৬)। যারা তাদের আহ্বান ও নির্বাচনকে নিশ্চিত করতে পারবে তারা অবশ্যই এর প্রতি নিষ্ঠাবান হবে, এর উপর নিজেদের শ্রম ঢেলে দেবে। স্বর্গ-রাজ্যের পরিকল্পনায় তা সহজভাবে, হালকা প্রচেষ্টায়

পাওয়ার অবকাশ নেই কিন্তু যারা পরিশ্রমী তারাই জয়যুক্ত হবে। এটা একটি অনুগ্রহপূর্ণ দর্শন। আমরা একে বড় পরিসরে দেখতে পাই, তা কোন রাগের যুক্তিতে অন্যদের স্বর্গ-রাজ্যের বাইরে ফেলে দেবার জন্য তৃষ্ণার্ত নয় বরং একটি পবিত্র যুক্তিতে এর ভেতরে যাবার জন্য তাদের তৃষ্ণার্ত করে তোলে!

(৫) যোহনের কাজ ছিল সুসমাচারের শুরু; শাস্ত্রের তা এভাবেই অভিহিত হয়েছে (মার্ক ১:১; প্রেরিত ১:২২)। এখানে দু'টি ধারায় তা দেখানো হল:

(ক) যোহনের মধ্য দিয়ে পুরাতন নিয়মের কার্যকারিতা মৃত্যুবরণ করতে শুরু করল (১৩ পদ)। দীর্ঘ সময় ধরে পূর্ণ শক্তিতে ও ধার্মিকতায় যে কাজ চলে এসেছে তা কিন্তু তখন থেকে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে শুরু করল। যদিও খ্রীষ্ট মৃত্যু পর্যন্ত মোশির ব্যবস্থার প্রতি তাঁর বাধ্যতা দেখিয়ে গেছেন তথাপি স্বর্গ-রাজ্য নিকটে আসায় এবং তার পরিষ্কার বক্তব্যের কাছে পুরাতন নিয়মের আবিষ্কারগুলো অতীত হয়ে যেতে শুরু করেছিল। কারণ সুসমাচারের আলো (প্রকৃতির মতো) অগ্রবর্তী হয়ে তার নিয়মের জন্য পথ করে নিচ্ছিল, সে কারণেই পুরাতন নিয়মে কৃত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো শেষের মুখ দেখল। এ কেবল সম্পূর্ণতার শেষ, মেয়াদের নয়। যোহন পর্যন্ত যত ভাববাদী এসেছেন এবং যত ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে সেসব তিনি আমাদের সামনে প্রকাশ করলেন। তিনি দেখালেন যে, এসবই তাঁর এবং তাঁর রাজ্যের বিষয়ে বলে।

লক্ষ্য করুন, ভাববাদীদের মতো যাঁর আসবার কথা আছে তাঁর বিষয়ে পঞ্চপুস্তক পুস্তকও ভবিষ্যদ্বাণী বলেছে। খ্রীষ্ট মোশির শাস্ত্র থেকে নিজের বিষয়ে লেখা কথা বুঝিয়ে দিলেন (লূক ২৪:২৭)। দৃশ্যত মোশির থেকেই তাঁর বিষয়ে লেখার শুরু– সেখানে খ্রীষ্টের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল মিশ্র কাজের বোবা চিহ্নের মাধ্যমে। এর চেয়ে ভাববাদীদের স্বর ছিল অনেক স্পষ্ট এবং প্রদর্শিত, তা কেবল যে কথার পূর্বানুমান– তা নয় উপরন্তু ব্যক্তি ধরে, প্রকৃত অবস্থা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আমরা নতুন নিয়মের শিক্ষা দ্বারা পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে ব্যাখ্যা করার জন্য উভয়কেই পেয়েছি। পুরাতন নিয়মের এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো নতুন নিয়মের শিক্ষাকে আরও নিশ্চিত ও অলংকৃত করে (ইব্রীয় ১:১); 'সেই দুই করুবের মতো, তারা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকে।' মোশির মধ্য দিয়ে বহু আগে ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছিল এবং যোহনের আগে প্রায় তিনশত বছরের দীর্ঘ সময়ে কোন ভাববাদী আসেননি। তবুও ভাববাদীদের শাস্ত্র এবং পঞ্চপুস্তক উভয়ে যোহনের সময় পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণী বলে আসছিল; কারণ ব্যবস্থা তখনও পরিলক্ষিত হচ্ছিল এবং মোশি এবং ভাববাদীদের শাস্ত্র তখনও পড়া হতো।

মনে রাখুন, আজকের দিনেও শাস্ত্র আমাদের শিক্ষা দেয়, যদিও এর লেখকেরা চলে গিয়েছেন। মোশি এবং ভাববাদীরা মারা গেছেন, প্রেরিতেরা এবং সুসমাচার প্রচারকেরা মারা গেছেন (সখরিয় ১:৫) কিন্তু 'প্রভুর বাক্য চিরকাল টিকে থাকে' (১ পিতর ১:২৫)। যদিও এর লেখকেরা নীরব হয়ে গেছেন, তাদের অস্তিত্ব এখন ধুলোয় তবুও শাস্ত্র অদ্যাবধি আমাদের পথ দেখিয়ে চলেছে। দ্বিতীয়ত, কীভাবে এই আলো একপাশে স্থাপিত হল; যখন তিনি বললেন, 'তারা যোহন পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন,' তিনি এর দ্বারা প্রকাশ করলেন যে, তাদের গৌরব সেই অতিক্রমকারী গৌরবে ঢাকা পড়েছে; তাদের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ নিষ্ক্রান্ত হল যোহনের এই সাক্ষ্যে, 'ঐ দেখ ঈশ্বরের মেষশিশু!' এমনকি সূর্য ওঠার আগে ভোরের আলো মোমের আলোকে নিষ্প্রভ করে দেয়। খ্রীষ্টের আসবার বিষয়ে তাদের করা

ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল যখন যোহন বললেন, 'তিনি এসেছেন।'

(খ) তাঁর মধ্য দিয়ে নতুন নিয়মের দিনের আবির্ভাব শুরু হল (১৪ পদ), 'ইনি এলিয় যাঁর আসবার কথা ছিল।' যোহন ছিলেন বাঁধনের মতো– যা দু'টি নিয়মকে গ্রন্থিত করেছিল। নূহ যেমন উভয় বিশ্বকে সংযোগ করার যোগসূত্র ছিলেন, তেমনি তিনিও ছিলেন দু'টি নিয়মকে যূথবদ্ধ করার যোগসূত্র। পুরাতন নিয়মের সমাপনী ভবিষ্যদ্বাণীটি ছিল, 'দেখ আমি তোমাদের কাছে এলিয়কে পাঠাব' (মালাখি ৪:৫, ৬)। এই কথাগুলো যোহন পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে টিকে ছিল এবং তারপর তা রূপ নেয় ইতিহাসে– তারা ভবিষ্যদ্বাণী বলা বন্ধ করে।

প্রথমত, খ্রীষ্ট যোহনের বিষয়ে একটি মহান সত্য প্রকাশ করেছেন– যোহন হচ্ছেন নতুন নিয়মের এলিয়; তাঁর ব্যক্তিসত্তায় তিনি এলিয় ছিলেন না– যেভাবে লালসামত্ত যিহূদীরা প্রত্যাশা করেছিল। তিনি সেই ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছেন (যোহন ১:২১)। কিন্তু শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তিনিই ছিলেন সেই প্রার্থিতজন, যিনি আসবেন এলিয়ের ক্ষমতা এবং আত্মায় (লূক ১:১৭), তাঁর মতো মেজাজ এবং কথাবার্তার অধিকারী হয়ে, যিনি ভয়ের কথা বলে অনুতাপের বাণী প্রচার করবেন এবং পিতাদের হৃদয়কে সন্তানদের দিকে ফেরাবেন।

দ্বিতীয়ত, তিনি এ বিষয়ে সহজ-সত্যি কথাটাই বললেন; যদিও লোকদের পক্ষে তা অনুধাবন করাটা সহজ ছিল না। কারণ, তারা যে খ্রীষ্টের ক্ষণস্থায়ী পার্থিব রাজ্যের বিষয়ে নিজেদের প্রত্যাশাকে আকড়ে ধরে আছে সেটা তাদের অভিব্যক্তিতেই ফুটে উঠেছিল। 'যদি আমার এই সাক্ষ্য গ্রহণ করতে চান'; খ্রীষ্ট তাঁর এ কথায় 'যদি' শব্দটি প্রয়োগ করে যারা তাঁর সাক্ষ্যকে স্বাগত জানাবার ক্ষেত্রে সংশয়ে দুলছিল তাদের সমালোচনা করলেন। বাস্তবিকই লোকদের সামনে তা গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখ্যানের দু'টো বিকল্পই উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু খ্রীষ্ট এখানে তাদের সেই 'আবেগকে' দোষী করলেন যা তাদের মহাসত্য গ্রহণে নিবৃত্ত করছিল। ফলে তাদের শুনবার আগ্রহ গ্রহণে ফলপ্রসূ হচ্ছিল না। 'যদি তোমরা সেই প্রতিজ্ঞাত এলিয় হিসেবে তাঁকে তথা তাঁর শিক্ষাকে গ্রহণ কর, তবে তোমাদের প্রভুর দিকে ফেরাতে প্রস্তুত করার জন্য তিনি তোমাদের জন্য একজন এলিয় হবেন।' সুসমাচারের সত্যের কার্যকারিতা নির্ভর করে তা কীভাবে গ্রহণ করা হল তাঁর উপর। গ্রহণ করলে পরিত্রাণ না করলে অনন্ত মৃত্যু। খ্রীষ্ট হচ্ছেন পরিত্রাণকর্তা এবং যোহন একজন এলিয়– বিশেষত তাদের কাছে যারা তাদের বিষয়ে বলা সত্য গ্রহণ করে।

শেষ পর্যন্ত, আমাদের প্রভু যীশু এই আলোচনা শেষ করলেন একটি গাম্ভীর্যপূর্ণ মনোযোগ চাওয়ার মাধ্যমে (১৫ পদ)– 'যার কান আছে সে শুনুক।' এ থেকে বোঝা যায়, যেসব বিষয় অস্পষ্ট ঠেকে, বুঝতে কষ্ট হয়– সেসব বোঝার জন্য বাড়তি মনোযোগ প্রযুক্ত করতে হয়। সুসমাচারের সত্যকে যারা ভালভাবে বুঝতে চাইবে, এর ফল ভোগ করতে চাইবে তাদের এর প্রতি আকৃষ্ট-আকাঙ্ক্ষী হতে হবে। 'সব লোক এ বিষয়ে দেখুক, যদি যোহন প্রতিজ্ঞাত এলিয় হন তাহলে নিশ্চিতভাবেই এখানে একটি মহাবিপ্লব সাধিত হতে চলেছে। খ্রীষ্টের রাজ্য এখন খুবই নিকটে, ঘরের দুয়ারে অবস্থান করছে। পৃথিবী শীঘ্রই একটি আনন্দদায়ী পরিবর্তনের মধ্যে বিস্মিত হবে। তাই এই সব বিষয়ে আপনার গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা থাকা প্রয়োজন এবং সে কারণেই আমি যা বলছি তা আপনাকে মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে।' মনে রাখুন, ঈশ্বরের বিষয়গুলো মহান এবং সাধারণ্যে তা জানানোর

জন্য প্রত্যেকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। অর্থাৎ, ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে বেশি কিছু চান না, কিন্তু যে কাজের ভার তিনি আমাদের দিয়েছেন আমরা যেন তার সঠিক ব্যবহার ও উন্নতি সাধন করি। ঈশ্বর চান, যাদের তিনি কান দিয়েছেন তারা শুনুক, আর যারা বলার ক্ষমতা পেয়েছে তারা উদাত্ত কণ্ঠে সুসমাচারের বিষয়ে বলুক। মানুষ যে অজ্ঞ তার কারণ কেবল এই নয় যে, তারা ক্ষমতালিপ্সু বরং তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। মূলত সে কারণেই তারা শুনতে চায় না, বধির এডার সাপের মতো তারা তাদের কান বন্ধ করে ফেলে।

মথি ১১:১৬-২৪

খ্রীষ্ট যোহন ও তাঁর কাজের বিষয়ে প্রশংসা করে যাচ্ছিলেন কিন্তু এখানে হঠাৎ-ই তিনি তা থামিয়ে দিলেন; তাঁর কথোপকথন মোড় নিল সমালোচনায়; তিনি তাদের সমালোচনা করলেন– যারা বাপ্তিস্মদাতা যোহনের পাশাপাশি খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যদের– উভয়ের কাজকে অর্থহীনভাবে প্রত্যক্ষ করেছিল। সেই প্রজন্মের দিকে তাকালে আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি কী প্রকার লোকদের সাথে খ্রীষ্ট এদের তুলনা করেছিলেন (১৬-১৯ পদ)। এখানে তিনি যেসব নির্দিষ্ট স্থানের দৃষ্টান্ত টেনেছেন তাতে আমরা পর্যবেক্ষণ করে দেখি যে, তিনি তাদেরকে কাদের সাথে তুলনা করেছেন (২০-২৪ পদ)।

ক. 'সেই কালের' লোকদের কথায় এখানে সেসময়ের যিহূদীদের কথা বোঝানো হয়েছে। সেখানে অনেকেই স্বর্গ-রাজ্যে যেতে জোর করেছিল; তথাপি মূল জনস্রোত তখনও অবিশ্বাস এবং একগুঁয়েমিতে পড়ে ছিল। যোহন ছিলেন একজন মহৎ এবং ভাল মানুষ, কিন্তু যে প্রজন্ম থেকে তাঁর দলকে বেছে নেওয়া হয়েছিল– তা ছিল নিস্ফলা এবং অলাভজনক। 'যোগ্য' হলে নিশ্চিতভাবেই তারা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারত। মনে রাখুন, ভাল প্রচারকেরা যেখানে বাস করেন সেখানকার খারাপির কারণে তাদের কাজের সুন্দর বিষয়গুলোও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। নোহের প্রশংসা করে বলা হয়েছিল যে, তিনি তাঁর প্রজন্মের লোকদের মাঝে ধার্মিক ছিলেন। যোহনের প্রশংসা করে খ্রীষ্ট তাদের দোষারোপ করলেন– যারা তাঁকে নিজেদের মাঝে পেয়েও তাঁর প্রচার শুনে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসে নি, তাতে লাভবান হতে চায় নি। মনে রাখুন, লোকেরা যত প্রশংসাযোগ্যই হোক, যদি তারা তাঁকে তুচ্ছ করে তবে বিচারের দিনে তাদের এই 'দোষ' বড় হয়ে উঠবে।

আমাদের প্রভু যীশু এখানে সেই বিষয়টি বোঝাতে একটি উদাহরণ টানলেন– সঠিক উপমা খুঁজে পেতে তাঁর অভিব্যক্তিতে যেন শূন্যতা ধ্বনিত হল– 'একালের লোকদের আমি কীসের সাথে তুলনা করব?' মনে রাখুন, যারা তাদের মাঝে প্রচারিত ভাল প্রচারকে তুচ্ছ করে দোষ করে সেখানে এর চেয়ে বড় বিমূর্ততা আর কিছুই হতে পারে না; এবং তারা এর জন্যে কখনো ভাল বলে গণ্য হয় না। এটা বলা কঠিন যে তারা কার মতো। উদাহরণটি নেওয়া হয়েছে যিহূদী ছেলেমেয়েদের সাধারণ প্রথাগত খেলা থেকে– যেখানে তারা নিজেদের মতো করে বড়দের মতো বিয়ে, অন্ত্যষ্টিক্রিয়ার মতো অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে। খেলার ছলে আনন্দিত ও ব্যথিত হয়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা রসিকতায়ই পর্যবসিত হয়; কোন ফল দেয় না, প্রভাবও ফেলতে সমর্থ হয় না। বাপ্তিস্মদাতা যোহন এবং যীশু খ্রীষ্ট তাদের প্রজন্মের কাছে যে কাজ করেছিলেন তার প্রভাবও এর চেয়ে বেশি ছিল না। তিনি বিশেষভাবে ধর্ম-শিক্ষক ও ফরীশীদের উপর তাঁর কথা প্রতিফলিত করলেন– যারা

নিজেদের বিষয়ে উচ্চ ধারণা পোষণ করতো; সে কারণেই তাদেরকে ক্ষুদ্র বলে দেখানোর জন্য তিনি তাদের শিশুদের সাথে তুলনা করলেন এবং তাদের আচরণকে শিশুদের খেলার সাথে তুলনা করলেন।

উদাহরণটি ভালভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে একে উন্মুক্ত করলে এবং এতে সন্নিবেশিত পাঁচটি পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে।

মনে রাখুন, ১. স্বর্গীয় ঈশ্বর দরিদ্র আত্মাদের মন পরিবর্তন এবং তাদের পরিত্রাণদানের জন্য বৈচিত্র্যপূর্ণ অর্থ এবং প্রক্রিয়া ব্যবহার করেন; তিনি চান যেন সব মানুষ পরিত্রাণ পায় এবং সেকারণে এই বিধানকে সমুন্নত রাখতে কোন পাথরকে না ছুঁয়ে তিনি তা ছেড়ে যান না। তার লক্ষ্যবস্তু সেরা, তা ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে আমাদের ইচ্ছাকে বাধ্যতায় গলিয়ে ফেলে এবং এই লক্ষ্যে তিনি আমাদের প্রতি ভালবাসা থেকে নিজের বিষয়ে প্রকাশ করেছেন। তাদের প্রতি ভালবাসার আকর্ষণ থেকে তিনি তাদের নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের উপায় অবলম্বন করেন, যা একটির চেয়ে অন্যটি আলাদা হয়ে থাকে; যদিও সবগুলোই একই লক্ষ্যের প্রতি নির্দেশ করে এবং ঈশ্বর এর মাঝে সবটিকেই একই নকশায় বহন করেন। উদাহরণটিতে দেখানো হয়েছে, আমাদের প্রতি তাঁর বাঁশি বাজছে এবং তাঁর বিলাপের গান গীত হচ্ছে। বস্তুত, সুসমাচারের মূল্যবান প্রতিশ্রুতি দানের মাধ্যমে তিনি আমাদের উদ্দেশে বাঁশি বাজিয়ে থাকেন– যা আমাদের ভয়ের সাথে লড়তে, কাজ করতে সাহায্য করে। কারণ আমরা আশ্বস্ত হই যে, তিনি আমাদের পাপের ভার তুলে নেবেন এবং তাঁর কাছে টেনে নেবেন। তিনি আমাদের প্রতি বাঁশি বাজান প্রাচুর্যপূর্ণ এবং ক্ষমাপূর্ণ নির্দশনের মধ্য দিয়ে। পাশাপাশি বিলাপের গান দুর্ভাগ্যজনক, বেদনাদায়ী নিদর্শনের দ্বারা। দৃশ্যত, 'তিনি এর একটিকে অন্যটির বিরুদ্ধে স্থাপন করেছেন।' তিনি তাঁর প্রচারকদের তাদের স্বর পরিবর্তন করতে শিক্ষা দিয়েছেন (গালা ৪:২০)– কখনও কখনও সিনাই পর্বত থেকে বজ্র হুংকার, কখনও কখনও সিয়োন পর্বত থেকে টানা হালকা স্বরের মধ্য দিয়ে।

উদাহরণটির ব্যাখ্যা স্থাপিত হয়েছে যোহন এবং খ্রীষ্টের প্রচার কাজের ভিন্ন মেজাজের উপর, যারা ছিলেন সেই প্রজন্মের দুই মহান আলোকবর্তিকা।

(১) একদিকে যোহন তাদের কাছে এসে দুঃখের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, তাদের সাথে কিছু খেলেন না, পানও করলেন না; লোকদের সাথে পরিচিতের মতো কথা বললেন না কিংবা যূথবদ্ধ হয়ে স্বাভাবিক খাওয়া-দাওয়াও করলেন না, কিন্তু একাকী মরুভূমিতে তার আবাসে থাকলেন, যেখানে তাঁর খাবার ছিল ফড়িং ও বনমধু। এখন, কেউ এভাবে কাজ করার কথা ভাবতেই পারেন, কারণ তাঁর এরূপ কঠোর এবং সংযমী জীবন ছিল তাঁর প্রচারের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ: এবং 'সেই প্রচারক সানন্দে ভাল কাজ করবেন যার আলোচনা তার শিক্ষা মতোই।' তারপরও সেই প্রচার, এমনকি এরকম প্রচারকের প্রচারও সবসময় কার্যকর হয় না।

(২) অন্যদিকে মনুষ্যপুত্র এসে তাদের সাথে খাওয়া-দাওয়া করলেন এবং এভাবে তাদের উদ্দেশে বাঁশি বাজালেন। খ্রীষ্ট সব ধরনের লোকের সাথে পরিচিতের মতো কথা বললেন; এক্ষেত্রে কোন অদ্ভুত কঠোরতা এবং নিয়মানুবর্তিতা দেখালেন না; তার মধ্যে প্রবেশ করা ছিল সহজ এবং তিনি ছিলেন বন্ধুবৎসল, কোন সান্নিধ্যে তিনি লজ্জিত হতেন না; প্রায়ই তাঁকে আনন্দভোজে অংশ নিতে দেখা যেত– ফরীশী এবং কর-আদায়কারী উভয়ের সাথে। এর উদ্দেশ্য ছিল সেই লোকদের জয় করা– যারা যোহনের অন্তর্মুখী

স্বভাবের কারণে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে আসে নি। যারা যোহনের ভয় জাগানো কথায় সতর্ক -শংকিত হয় নি তারা যেন খ্রীষ্টের হাসিমুখ দেখে ঈশ্বরের প্রতি ফিরে, সেজন্যই খ্রীষ্ট সবার সাথে মিশলেন। সাধু পৌল মূলত তাঁর কাছ থেকেই শিখেছিলেন– যে লোক যেমন তার কাছে সেভাবেই ঈশ্বরের বাক্য তুলে দিতে হবে (১ করিন্থীয় ৯:২২)। এখন, আমাদের প্রভু যীশু তাঁর স্বাধীনতার দ্বারা যোহনকে দোষারোপ করতে উদ্যত হন নি, কারণ দু'জনের কাজের ধরনেই ভিন্নতা ছিল। এক্ষেত্রে যোহন তাঁকে যতটা অভিযুক্ত করেছেন খ্রীষ্ট তার চাইতে বেশি কিছু করলেন না। মনে রাখুন, আমরা কখনও নিজেদের অনুশীলনের মাধ্যমে ধার্মিকতার বিষয়ে পরিষ্কার হতে পারি না, তবুও আমরা অবশ্যই অন্যকে এর দ্বারা বিচার করব না। কাজের ক্ষেত্রে অনেক ভিন্নতা, ব্যতিক্রম থাকতে পারে কিন্তু উদ্দেশ্য তো একই– তা সেই একই ঈশ্বরকে প্রচার করে, যিনি প্রত্যেকের কাছে তাঁর মতো করেই নিজেকে উপস্থাপন করেন (১ করিন্থীয় ১২:৬) এবং আত্মার এই বৈচিত্র্যপূর্ণ গ্রন্থনা প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছে যেন তারা এর দ্বারা উপকৃত হয় (৭ পদ)। লক্ষ্য করুন, বিশেষত, ঈশ্বর তাঁর প্রচারকদের বিভিন্ন রকম উপহার দিয়েছেন; কারও সক্ষমতা এবং বুদ্ধিদীপ্ততা একই উপায়ে সুবিন্যস্ত, অন্যদেরগুলো আবার আলাদাভাবে লক্ষ্য করা যায়; কেউ কেউ বোয়েনার্গস– বজ্রধ্বনির পুত্রেরা; আবার অন্যরা বার্ণবা– সান্ত্বনার সন্তানেরা। তবুও এদের সবাই সেই একই লক্ষ্যে একই আত্মায় কাজ করেন (১ করিন্থীয় ১২:১১) এবং সেকারণেই আমরা কারও পথকে প্রশ্নবিদ্ধ করব না কিন্তু উভয়কেই প্রশংসা করব। আর সবকিছুর জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করব, যিনি এভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন মানসিকতার লোকদের আহ্বান জানান। এতে করে পাপীরা হয়তো নমনীয় হবে কিংবা ক্ষমালাভের অযোগ্য বলে নিজেদের চিহ্নিত করবে; তবে যাই হোক না কেন শেষ অবধি ঈশ্বরই গৌরবান্বিত হবেন।

মনে রাখুন,

২. ঈশ্বর পাপীদের মন পরিবর্তনের জন্য যেসব বিচিত্র প্রক্রিয়া গ্রহণ করেন তার মধ্যে অনেকগুলোই নিস্ফলা, অকার্যকর প্রতিপন্ন হতে পারে– 'তবুও তোমরা নাচলে না, বুক চাপড়ালে না। কোন আবেদনেই তোমরা আকৃষ্ট হলে না, তোমরা তাতে নিবিষ্ট হলে না।' বস্তুত, কোন বিষয়ে সবার প্রতিক্রিয়া, অভিব্যক্তি একরকম হয় না। ফলে ভিন্ন রুচি ও অভিপ্রায়কে জয় করার জন্য তাদের মনোস্তত্ব বুঝে সেই অনুযায়ী কর্মকৌশল নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এর মধ্য দিয়েই হয়তো তাদের অভিন্ন মহান লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাওয়াটা সম্ভব হবে। এখন লোকেরা যদি ব্যবস্থার বাধ্য না হয়, প্রতিজ্ঞার আমন্ত্রণে সাড়া না দেয়, হুমকিতে ভীত না হয় তবে তারা মহান বিষয় শুনেও জেগে উঠবে না, কিংবা সুমিষ্ট বিষয়েও প্রলোভিত হবে না, ভীষণ ভয়ের ব্যাপারেও সাবধান হবে না, সাধারণ বিষয়ও বুঝবে না; যদি তারা শাস্ত্রের কথা মনোযোগ দিয়ে না শোনে তবে কোন কারণ, কোন অভিজ্ঞতা, নির্দশন, কোন জ্ঞানবাক্য, কোন আগ্রহ তাদেরকে আকর্ষণ করতে পারে না, এর চেয়ে বেশি প্রচেষ্টা আর কী দিয়ে করা সম্ভব? 'আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলার জন্য হাপর ভীষণভাবে বাতাস দিচ্ছে; কিন্তু মিছেই খাদ বের করার এই চেষ্টা; যেহেতু দুষ্টদের বের করা যাচ্ছে না' (যিরমিয় ৬:২৯)। ঈশ্বরভক্তের পরিশ্রম নিস্ফল হয়েছে (যিশাইয় ৪৯:৪) এবং এটা অনেক বড় ক্ষতি– 'ঈশ্বরের দয়া অনর্থক গ্রহণ করা হয়েছে' (২ করিন্থীয় ৬:১)। মনে রাখুন, শাস্ত্রের উদ্ধৃতিগুলো বিশ্বস্ত প্রচারকদের সান্ত্বনা দেয় যেন তিনি তাঁর কাজের অল্প ফল দেখে

মুষড়ে না পড়েন, বরং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রচারকাজকে প্রত্যাশিত গন্তব্যের দিকে গতিশীল রাখবেন। 'কে আমাদের কথায় বিশ্বাস করেছে?' নিহত লোকদের রক্ত, বীরদের মাংস, খ্রীষ্ট, যোহন এবং এই মহান কমান্ডারদের ধনুকও প্রায়ই খালি ফিরে আসে (২ শমূয়েল ১:২২)। আমাদের কাজ যদি আশানুরূপ ফলপ্রসূ না হয় তবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই, যেহেতু আমরা শুকনো হাড়গোড়ের কাছে ক্ষুদ্র উদ্দেশ্যে ভাববাদী হিসেবে কথা বলছি।

৩. মন্দ লোকেরা ঈশ্বরের অনুগ্রহকে কাজে লাগাতে পারে না, উপরন্তু এর দায়ভারও তারা ঈশ্বরভক্তদের ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে, কারণ ঈশ্বরভক্ত কর্তৃক অনুগ্রহের সঠিক ব্যবহার তাদের দোষী করে তোলে। দৃশ্যত, মন্দ লোকেরা নিজেদের ভাল করতে পারে না। উল্টো ঈশ্বরের বাক্যের বিরুদ্ধে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ভ্রান্তি উত্তোলনের মাধ্যমে এর বিশ্বস্ত প্রচারকদেরও ক্ষতি করে থাকে। তারা কোনোমতেই ঈশ্বরের সাথে সম্মত হয় না, তাঁকে অনুসরণ করে না, তাঁর সামনে নীত হয় না উপরন্তু তাঁকে দ্বান্দ্বিক করে তুলতে অগ্রসর হয়। খ্রীষ্টের কালের প্রজন্ম সেই কাজটিই করেছিল; কারণ তারা খ্রীষ্ট এবং যোহনকে বিশ্বাস তথা গ্রহণ করতে সম্মত হয় নি। দৃশ্যত, মানবীয় স্বার্থ চরিতার্থ করতেই তারা এমনটা করেছিল। তারা তাদের তুচ্ছ করতে ও অসম্মান করতে নিজেদের স্থাপন করেছিল; লোকদের কাছে তাদের 'ভীতিকর' বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল:

(১) যোহনের বেলায় তারা বলেছিল, 'ওকে ভূতে পেয়েছে।' তারা তাঁর কঠোর নিয়মানুবর্তিতা এবং দুঃখভোগরত আত্মবিমুখ চর্চার নিন্দা করেছিল এবং একে শয়তানের অভিব্যক্তি বলে অভিহিত করতেও পিছপা হয় নি। 'আমরা কেন তার প্রতি মনোযোগ দেব; সে একজন দরিদ্র মানসিক বিকারগ্রস্ত লোক, যে সবসময় ঘোরাচ্ছন্ন থাকে এবং সে অতিমাত্রায় উত্তেজিত কল্পনা দ্বারা তাড়িত হয়।'

(২) পাশাপাশি যীশু খ্রীষ্টের বেলায় তারা তাঁর মুক্তমনা অভিব্যক্তি এবং সবার সাথে স্বাভাবিকভাবে মেশার প্রবণতাকে আখ্যায়িত করেছিল এই বলে, 'ঐ দেখ একজন পেটুক ও মদখোর।' কোন প্রতিফলনই এর চেয়ে মন্দ এবং অসন্তুষ্টিদায়ক হতে পারে না; কারণ এটা হচ্ছে সেই বিদ্রোহী সন্তানের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ (দ্বিতীয় বিবরণ ২১:২০)– 'সে পেটুক ও মদখোর।' বাস্তবিকই এর চেয়ে মিথ্যে এবং অন্যায্য আর কিছুই হতে পারে না; কারণ খ্রীষ্ট নিজেকে সন্তুষ্ট করেন নি (রোমীয় ১৫:৩)। পৃথিবীর প্রলোভনকে প্রতিহত করে খ্রীষ্ট যেভাবে নিয়ন্ত্রিত, সংযমী জীবনযাপন করেছেন তা আর কেউ করতে পারে নি; তিনি ছিলেন নির্দোষ এবং পাপীদের চেয়ে আলাদা, আর এখানে তাকে দেখানো হয়েছে পাপীদের দলভুক্ত এবং তাদের দ্বারা দূষিত ব্যক্তি হিসেবে। মনে রাখুন যে, নির্দোষিতার ওপর কালিমা লেপনের কোন সুযোগ নেই এবং যে মহানুভবতার কোন তুলনা নেই, তা-ও সবসময় এরকম জিহ্বা-উৎসারিত মিথ্যে সমালোচনা আটকাতে পারে না। এমনকি মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ এবং তার শিক্ষণীয়, উদাহরণযোগ্য, সঠিক কাজগুলোও কোন কোনও ক্ষেত্রে তার নেতিবাচক সমালোচনার কারণ হতে পারে। আমাদের ভাল কাজই সমালোচনাকারীর উত্তর হতে পারে– যেভাবে দায়ূদ দিয়েছিলেন উপবাস রেখে (গীত ৬৯:১০)। কোন কোনও দিক থেকে ভাবলে তা সত্য যে, খ্রীষ্ট ছিলেন কর-আদায়কারী এবং পাপীদের বন্ধু; এরকম বন্ধুর দেখা তারা কখনও পায় নি, কারণ পাপীদের, মহাপাপীদের এমনকি জঘন্য পাপীদের উদ্ধার করতেই তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তিনি তাদের সাথে মিশেছিলেন, যদিও ফরীশীরাও তাঁর সহভাগিতাবঞ্চিত হয় নি। কিন্তু যারা তাঁর

মেলামেশাকে এভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে অনুগ্রহ লাভ থেকে নিজেদের বিরত রেখেছিল তারা অনন্তকালীনভাবে খ্রীষ্টের সান্নিধ্যবঞ্চিত হবে।

৪. অনুগ্রহের অধীনে লোকদের মহাফলহীনতা এবং স্বেচ্ছাচারিতার এটা হচ্ছে একটা কারণ যে, তারা হচ্ছে এমন ছেলেমেয়েদের মতো যারা বাজারে বসে; তারা শিশু হিসেবে বোকার হদ্দ, শিশুদের মতো পদক্ষেপ ফেলে চিন্তাহীনভাবে খেলার ছলে এগোয়। তারা যদি এর স্থলে বড় মানুষের মতো নিজেদের নিয়ে ভাবতো তাহলে তাদের কিছু আশা থাকত। তারা যেখানে বসে সেই বাজার হচ্ছে বেকারদের সময় কাটাবার জায়গা (২০:৩); অন্যদের কাছে জাগতিক ব্যবসায়ের স্থান (যাকোব ৪:১৩); সবার কাছেই এই স্থানটি কোলাহল কিংবা বিনোদনের স্থান হিসেবে প্রসিদ্ধ; যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন যে, কেন লোকেরা অনুগ্রহের দানের অল্প উপকারই পায়, তখন আপনি আপনার উত্তরে খুঁজে পাবেন যে, তারা অলস এবং তুচ্ছ এবং ব্যথা পাবে বলে ভালও বাসে না; অথবা তাদের মাথা, হাত হৃদয় প্রার্থিব চিন্তায় পরিপূর্ণ, যা বাক্যের কণ্ঠ রোধ করে থাকে এবং শেষাবধি তাদের আত্মাকেও মৃতে পরিণত করে ((যিহিষ্কেল ৩৩:৩১; আমোষ ৮:৫)। কিংবা তারা অন্য সব কিছু থেকে নিজেদের চিন্তা ভাবনা সরিয়ে আনার জন্য অধ্যয়ন করে– যা খুবই মারাত্মক; এভাবে তারা বাজারে বসে থাকে; এইসব বিষয় নিয়েই তাদের হৃদয় আমোদ করে এবং এগুলোর দ্বারা তারা স্বীয় সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত থাকে।

মনে রাখুন, ৫. যদিও অনুগ্রহের পথ এভাবে অনেকের দ্বারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তুচ্ছ ও অপব্যবহৃত হয়, তবুও একটি বিষয় বাকী থাকে– যার মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ তাদের উন্নতি করতে পারে এবং তাদের পরিকল্পনাগুলোকে উত্তর দিতে পারে। আর সেটা হচ্ছে, ঈশ্বরের গৌরব এবং তাদের নিজ নিজ আত্মার ভাল করা। কিন্তু তাঁর সন্তানদের বিষয়ে জ্ঞানকে পরীক্ষা করা হয়েছে। খ্রীষ্ট হচ্ছেন জ্ঞান, তাঁর মধ্যে জ্ঞানের ধন লুকানো আছে। ঈশ্বরভক্তরা হচ্ছেন ঈশ্বরের পরিবারের লোক, তাঁর সন্তান। 'তিনি খ্রীষ্টকে সেই সন্তানদের দিয়েছেন' (ইব্রীয় ২:১৩)। সুসমাচার হচ্ছে জ্ঞান, এই জ্ঞান সবকিছুর উর্ধ্বে; সত্যিকারের বিশ্বাসীরা এর দ্বারা নতুন করে জন্মগ্রহণ করেছে এবং তাদের জন্ম উপর থেকেও হয়েছে। তারা হচ্ছে জ্ঞানী সন্তান। তারা নিজেদের ও প্রকৃত আগ্রহের প্রতি জ্ঞানপূর্ণ আচরণ করেছে। কিন্তু সেই সন্তানদের মতো নয় যারা বাজারচকে বসে আড্ডা দেয়। এই জ্ঞানের সন্তানেরা তাদের জ্ঞানের ন্যায্যতা প্রমাণ করে; তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহের নির্দেশের সাথে সম্মত হয়, এর চাওয়ার প্রত্যুত্তর করে। তারা চমৎকারভাবে এর আকর্ষণ অনুভব করে এবং এর বিভিন্ন রকম কর্মপদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। সর্বোপরি খ্রীষ্টের জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশের প্রক্রিয়ায় তারা আস্থা পোষণ করে। এটা এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে (লূক ৭:২৯)। যোহনের কাছ থেকে বাপ্তিস্ম গ্রহণের মাধ্যমে করআদায়কারীরা ঈশ্বরকে ন্যায়বান বলে স্বীকার করেছিল এবং পরবর্তীতে খ্রীষ্টের সুসমাচারকে আকড়ে ধরেছিল। মনে রাখুন, অনুগ্রহের পথের সাফল্য ঈশ্বরের জ্ঞানকে এইসব পথের পছন্দের মাঝে 'ন্যায্য' বলে স্বীকার করে। এটা প্রকৃতই তাদের বিরুদ্ধাচরণ– যারা তাঁকে বোকার মতো অভিযুক্ত করেছিল। প্রতিটি রোগীর সুস্থতা নির্ভর করে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলার উপর, তা প্রমাণ করে যে চিকিৎসকের জ্ঞান খাঁটি; এবং সে কারণেই পৌল খ্রীষ্টের সুসমাচারের দরুন লজ্জা বোধ করেন নি, কারণ এটা অন্যদের কাছে যা-ই হোক না কেন, তার কাছে ছিল জীবন– 'সুসমাচারই হচ্ছে ঈশ্বরের পরিত্রাণদানের ক্ষমতা' (রোমীয় ১: ১৬)। অনুরূপভাবে যারাই এই সুসমাচারের সংস্পর্শে

এসেছে তারা জীবনের অধিকারী হয়েছে। তাদের বিশ্বাস ঈশ্বরের পরিত্রাণদানের ক্ষমতাকে স্বীকার করে, যেখানে অন্যরা খ্রীষ্টের ক্রুশকে বাধা, বোকামি হিসেবে গণ্য করে (১ করিন্থীয় ১:২৩, ২৪)। সে কারণে তারা একেই জ্ঞান বলে গণ্য করে এবং এর প্রতিই নিজেদের সমর্পণ করে ও একে নিজেদের লক্ষ্য বলে ঠিক করে (১ করিন্থীয় ২:২) এবং এর কার্যকারিতার দরুন এতেই তারা গর্ববোধ করে (গালা ৬:১৪)। এখানেই জ্ঞান তাঁর সন্তানদের ন্যায্যতার বিষয়ে বলে। জ্ঞানের সন্তানেরা হচ্ছে পৃথিবীতে জ্ঞানের সাক্ষী (যিশাইয় ৪৩:১০) এবং সেই দিন এই ন্যায্যতার জ্ঞান ঈশ্বরভক্তদের মাঝে গৌরবান্বিত হবে এবং যারা একে বিশ্বাস করে তাদের সবার মাঝে প্রশংসিত হবে (২ থিষলনীকীয় ১:১০)। যদি কারও অবিশ্বাস খ্রীষ্টের মিথ্যে সমালোচনা করে তবে অন্যদের বিশ্বাস তার নির্ভুল সত্যতাকে তুলে ধরে তাকে সম্মানিত করবে এবং তাঁর প্রকৃত পরিচয় উর্ধ্বে তুলে বলবে, 'ইনি জ্ঞানে পূর্ণ' (১ করিন্থীয় ১:২৫)। আমরা তা করি বা না-ই করি তা করা হবেই; তা কেবল ঈশ্বরের ন্যায়বিচারহেতুই নয় কিন্তু তাঁর বিজ্ঞতার কারণেই তাঁর জ্ঞান 'ন্যায্য' বলে প্রমাণিত হবে– 'যখন তিনি বলেন, যখন তিনি বিচার করেন।'

ঠিক সেভাবেই খ্রীষ্ট সেকালের লোকদের এই অভিধা দিলেন এবং বৈশিষ্ট্যের নিরিখে সেই প্রজন্ম এখনও শেষ হয়ে যায় নি, বরং ধারাবাহিকভাবে এদের মতানুসারীরা রয়ে গেছে; কারণ তখন স্বভাবে তারা যেমন ছিল এখনও তার কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটেনি; 'যেসব বিষয়ে বলা হয়েছে তা কেউ বিশ্বাস করে আর কেউ বিশ্বাস করে না' (প্রেরিত ২৮:২৪)।

খ. নির্দিষ্ট স্থানগুলোর বিষয়ে আসা যাক, যেখানে খ্রীষ্ট অনেক পরিচিত ছিলেন। সেই কালের লোকদের বিষয়ে তিনি যা বলেছিলেন তা এখানে নির্দিষ্ট কতগুলো স্থানের ক্ষেত্রেও বললেন– তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। তিনি তাদের 'ধিক্কার' দিয়ে বলতে শুরু করলেন (২০ পদ)। তিনি তাদের কাছে বেশ আগে থেকেই প্রচার করা শুরু করেছিলেন (৪:১৭), কিন্তু এর মাঝে তিনি তাদের 'ধিক্কার' দেন নি। মনে রাখুন, প্রথমে ভদ্র ভাষায় না বুঝিয়ে কখনো রূঢ় ও অপ্রীতিকর পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত নয়। লোকদের ধিক্কার জানাতে খ্রীষ্ট উন্মুখ হন নি; যতক্ষণ পর্যন্ত না পাপীরা মন্দ পথের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করে তাঁর কাছ থেকে তা ডেকে এনেছিল। এর আগে তিনি মুক্তভাবে তাদের শিক্ষা দিয়েছেন, ধিক্কার দেন নি। জ্ঞান প্রথমে আমন্ত্রণ জানায় কিন্তু যখন তার আমন্ত্রণকে তুচ্ছ করা হয় তখন সে তাদের ধিক্কার দেয় (হিতোপদেশ ১:২০, ২৪)। যারা শুরুই করে ধিক্কারবাক্য দিয়ে, তারা খ্রীষ্টের পদ্ধতি অনুসরণ করে না। এখন লক্ষ্য করুন,

১. পাপ তাদের অভিযুক্ত করে। নৈতিক আইনের বিরুদ্ধে কেউ নয়; তবুও সুসমাচার পাপীদের আপিলে সায় দিয়ে তাদের মুক্তি দিতে পারে। আর তারা কিনা সেই সুসমাচারের বিরুদ্ধেই পাপ করল! যে সুসমাচার তাদের কাছে 'প্রতিবিধানমূলক আইন' হয়ে এসেছে তা প্রত্যক্ষ করেও তারা অনুতপ্ত নয় দেখে খ্রীষ্ট তাদের ধিক্কার জানালেন। খ্রীষ্ট তাদের সমালোচনা করলেন, কারণ এরূপ লজ্জাজনক, গর্হিত অপরাধ করেও তারা অনুতাপ করে নি। মনে রাখুন, সুসমাচার পেয়েও যারা স্বেচ্ছায় অনুতপ্ত হয় না তারা গর্হিত অপরাধ করে। তারা অনন্তকাল ধরে এভাবে ধিক্কার পেতে থাকবে। বাপ্তিস্মদাতা যোহন এবং যীশু খ্রীষ্ট- উভয়ের মহান শিক্ষা এবং যে প্রেরিতেরা তা প্রচার করেছিলেন তা ছিল অনুতাপের বাণী। তাঁদের প্রচারে 'অনুতাপকে' গুরুত্বপূর্ণ সহকারে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বিলাপ ও বাঁশির সুরের মধ্য দিয়ে যে বাণী উচ্চারিত হয়েছিল– তা ছিল লোকদের প্রতি পাপের পথ থেকে

ফেরার আহ্বান সম্বলিত। তা মন ফিরিয়ে পাপ ত্যাগ করে ঈশ্বরের দিকে ফেরার কথা বলেছে; কিন্তু তারা সেটা গ্রহণ করে নি। তিনি বলেন নি কারণ তারা বিশ্বাস করে নি (যদিও বিশ্বাস করার মতো উপযুক্ত কারণ তাদের ছিল)। কোন কোনও রাজা খ্রীষ্টকে ঈশ্বরপ্রেরিত একজন শিক্ষক হিসেবে বিশ্বাস করতেন; কিন্তু যেহেতু তারা অনুতাপ করেন নি, সেহেতু তাদের বিশ্বাস তাদের হৃদয়ের শুদ্ধতার কথা স্বীকার করে নি এবং তাদের জীবনের বদলে যাওয়াকে প্রকাশ করে নি। খ্রীষ্ট তাদের পাপের জন্য সমালোচনা করেছিলেন যেন তাদেরকে অনুতাপের পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়; কিন্তু যখন তারা অনুতাপ করল না, তখন তিনি তাদের সে জন্য ধিক্কার দিলেন। তাদের প্রত্যাখ্যানের প্রত্যুত্তরে তিনি তাদের ধিক্কার দিলেন যেন তারা নিজেদের ধিক্কার জানায় এবং দেরিতে হলেও এতে তাদের বোকামি দৃষ্টিগোচর হয়– অনেকটা তার মতো যে একাকী নিজের অ-নরাময়যোগ্য দুঃখের বিষয়ে ভাবে।

২. পাপের বৃদ্ধি; তারা ছিল সেই সব শহরের বাসিন্দা যেখানে খ্রীষ্ট অনেক চিহ্ন-কাজ করেছিলেন; কারণ কিছুকালের জন্য সেখানে তার মূল আবাস ছিল। মনে রাখুন, কিছু কিছু স্থান আছে যেগুলো অনুগ্রহের পথকে প্রচুর করে ক্ষমতায়, খাঁটিত্বে অন্য এলাকার চেয়ে অধিক উপভোগ করতে পারে। ঈশ্বর হচ্ছেন মুক্ত মধ্যস্থতাকারী এবং তিনি তাঁর কাজে তাঁর আওতা ব্যবহার করেন। প্রকৃতির ঈশ্বর এবং অনুগ্রহের ঈশ্বর– উভয় প্রক্রিয়াতেই তিনি কাজ করেন। তাঁর এই অনুগ্রহ সাধারণ এবং পার্থক্য নিরূপণকারী অনুগ্রহ। খ্রীষ্টের মহান কাজের দ্বারা তাদের পরিবর্তিত হওয়া উচিত ছিল, কেবল তাঁর শিক্ষা গ্রহণেই নয় উপরন্তু তাঁর আইনের প্রতি বাধ্যতা স্থাপনে এবং আত্মিক রোগ হতে আরোগ্য লাভেও উৎসাহী হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু বাহ্যত এখানে তার কোন প্রতিফলন দেখা যায় না। মনে রাখুন, শক্তিশালী উদ্দীপক আমাদের অনুতাপে উৎসাহিত করে। অনুতাপহীনতা হচ্ছে খারাপির চূড়ান্ত এবং তা মনোভাবের কাঠিন্যই প্রকাশ করে। খ্রীষ্ট আমাদের মাঝে করা তাঁর মহান ও প্রাচুর্য্যপূর্ণ কাজের হিসেব রাখেন– 'তাঁর এই দয়াই আমাদের অনুতাপের পথে নিয়ে আসে' (রোমীয় ২:৪)।

(১) এখানে কোরাসিন এবং বৈথসৈদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে (২১, ২২); এদের প্রত্যেকেই আলাদা আলাদাভাবে খ্রীষ্টের কাছ থেকে ধিক্কার কুড়িয়েছে, 'তোমাকে ধিক, কোরাসিন; তোমাকে ধিক, বৈথসৈদা'। খ্রীষ্ট পৃথিবীতে এসেছেন আমাদের দয়া করার জন্য; কিন্তু সেই অনুগ্রহকে যদি তুচ্ছ করা হয় তবে তাঁর কাছে ধিক্কার মজুদ আছে এবং তাঁর ধিক্কার আর সবকিছুর চেয়ে ভয়ঙ্কর। এই দু'টি শহর গালীল সাগরের তীরে অবস্থিত ছিল, প্রথমটি পূর্বে এবং দ্বিতীয়টি পশ্চিমে। উভয়ই ছিল জনবহুল এবং সমৃদ্ধ স্থান। ফিলিপ দ্যা টেটরার্ক সদ্যই বৈথসৈদাকে শহরে উত্তীর্ণ করেছেন। এর মধ্য থেকে খ্রীষ্ট তাঁর ন্যূনতম তিনজন শিষ্যকে বেছে নিয়েছেন; এভাবে কত মহৎভাবে এই স্থানগুলো তাঁর আনুকূল্য পেয়েছিল! তবুও তারা তাদের পরিদর্শনের দিনের বিষয়ে জানেনি। তারা এই ধিক্কারের অধীন হল– যা শীঘ্রই তাদের আঘাত করবে। অর্থাৎ এর অল্পকাল পরে তারা ধ্বংস হবে এবং লোকচক্ষুর আড়ালে পড়ে থাকা গ্রামের মতো তারা ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। কত মারাত্মকভাবে পাপ শহরকে ধ্বংস করে এবং কত নিশ্চিতভাবে খ্রীষ্টের কথা পূর্ণ হয়।

এখন কোরাসিন এবং বৈথসৈদাকে এখানে সোর ও সিদোনের লোকদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এই দুই সমুদ্রতীরবর্তী শহর সম্পর্কে আমরা পুরাতন নিয়মে অনেকবার পড়ি,

যে শহরদ্বয়কে ধ্বংসের জন্য আনা হয়েছিল কিন্তু পরে পুনরায় তা জেগে উঠতে থাকে; এই শহরগুলোর সীমান্ত গালীলের সাথে, কিন্তু প্রতিমা পূজা এবং মন্দতার জন্য তা যিহূদীদের মাঝে খুবই মন্দ নাম বলে পরিচিত ছিল। খ্রীষ্ট কখনও কখনও সোর এবং সীদোনের সমুদ্রোপকূল ধরে গিয়েছিলেন (১৫:২১)। কিন্তু সেদিকে কখনও যাননি। যদি তিনি তা করতেন তবে যিহূদীরা একে খুব খারাপভাবে নিত। সে কারণেই খ্রীষ্ট তাদের নীচু করার জন্য যুক্তি দিয়ে বললেন যে,

(ক) যদি তাদের কাছে একইভাবে সুসমাচার প্রচার করা হতো এবং সেই চিহ্ন-কাজগুলো করা হতো তবে সোর এবং সিডন কোরাসিন এবং বৈথসৈদার মতো নির্বিকার থাকতো না, বরং অনুতাপ করতো এবং তাও অনেক আগেই, যেভাবে নীনবীর লোকেরা করেছিল, ছাই এবং চট পরে। খ্রীষ্ট, যিনি সবার হৃদয়ের বিষয়ে জানেন, তিনি জানতেন যে, যদি তিনি তাদের মাঝে বাস করতেন এবং তাদের ওখানে যেতেন এবং তাদের মাঝে প্রচার করতেন তবে তিনি যেখানে ছিলেন তার চেয়ে সেখানে আরও অনেক ভাল কাজ করতে পারতেন; তবুও তিনি যেখানে কাজ করছিলেন তাঁর প্রচারকদের উৎসাহিত করতে কিছুকালের জন্য তা চালিয়ে গেলেন; যদিও তারা যেরকম সাফল্য প্রত্যাশা করেছিল তা লাভ করতে পারেননি। মনে রাখুন, অবাধ্যতার সন্তানদের মাঝে কেউ কেউ অন্যদের চেয়ে খুব সহজেই বেরিয়ে আসে এবং এটা তাদের অননুতপ্ততার ব্যাপক বৃদ্ধি– যারা প্রাচুর্যপূর্ণভাবে অনুগ্রহের পথকে উপভোগ করে। এর কারণ কেবল এই নয় যে, সেখানে অনেকে একই পথে বসে ছিল– যা তাদের কাছে দেওয়া হয়েছিল উপরন্তু কারণ এই যে, সেখানে অনেকে ছিল যারা এতে অংশী হতে পারত, যদি তারা একই পথকে উপলব্ধি করতে সমর্থ হতো (দেখুন (যিহিষ্কেল ৩:৬, ৭)। আমাদের অনুতাপ হচ্ছে ধীরগতির এবং তা দেরি হয়ে যায়, কিন্তু তাদের অনুতাপ ছিল দ্রুত; তারা অনেক আগেই অনুতাপ করতো। আমাদের অনুতাপ হচ্ছে ক্ষুদ্র ও অতিরিক্ত মিহি; তাদেরটি হতে পারতো গভীর এবং আন্তরিক, চট পরে ছাই মাখার মধ্য দিয়ে। তথাপি আমরা লক্ষ্য করি, সোর এবং সীদোনের অধিবাসীরা তাদের পাপের কারণে ধ্বংস হয়েছে; কিন্তু যদি তারা অনুগ্রহের পথ দেখতে পেত তবে নিশ্চয়ই মন ফেরাত; কারণ ঈশ্বর কারও কাছে ঋণী থাকেন না।

(খ) সে কারণেই সোর এবং সিডনকে কোরাসিন ও বৈথসৈদার মতো অতটা অসুখীভাবে দেখা যাবে না, কিন্তু 'বিচারের দিনে তাদের অবস্থা এদের চেয়ে সহ্য করার মতো হবে' (২২ পদ)। মনে রাখুন, প্রথমত, বিচারের দিনে– মনুষ্যপুত্রের অনন্তকালীন রাজ্যে– সুখ অথবা দুঃখভোগের নিয়তি নিষ্পত্তি হবে এবং প্রত্যেকেই তা পাবে ভিন্নভাবে। সে কারণেই একে বলা হয়েছে অনন্তকালীন বিচার (ইব্রীয় ৬:২ পদ), কারণ তাতে অনন্তকাল স্থায়ী রাজ্যের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে। দ্বিতীয়ত, সেই বিচারে অনুগ্রহের সব পথ– যেগুলো এই পৃথিবীতে পর্যবেক্ষণের অধীনে ব্যবহৃত হয়েছে– তা হিসেবে নেওয়া হবে এবং তা অনুসন্ধান করা হবে, তা কেবল আমরা কতটা খারাপ তা নয় কিন্তু আমরা কতটা ভাল থাকব সেই বিচারও– 'যদি তা আমাদের নিজেদের ভুলের কারণে না হয়' (যিশাইয় ৫:৩, ৪)। তৃতীয়ত, যদিও সব অভিযুক্ত ধ্বংস হবে, আর তা হবে অসহনীয়, তবুও যাদের কাছে খ্রীষ্টের অনুগ্রহ এবং ক্ষমতার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছিল তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তা অন্য সকলের চেয়ে অসহনীয় শাস্তি লাভ করবে। সুসমাচারের আলো এবং শব্দ মানুষের সক্ষমতাকে উন্মোচিত করবে এবং যারা তা শুনবে এবং দেখবে তাদের ধারণক্ষমতাকে বৃদ্ধি

করবে; হয় তারা স্বর্গীয় অনুগ্রহে নিজেদের সমৃদ্ধ করবে নইলে (যদি সেই অনুগ্রহ নীরব থাকে) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি– যা অসহনীয় তাকে অর্থাৎ স্বর্গীয় ক্রোধকে নিজের ওপর আবিষ্কার করবে। যদি আত্মসমালোচনা 'নরকের অত্যাচার' হয়, তবে যাদের কাছে এভাবে স্বর্গকে কাছে পাবার নিরপেক্ষ সুযোগ রয়েছে তাদের জন্য সেই 'নরককে' আমন্ত্রণ জানানো কতটা জরুরি! সন্তান, তা মনে রেখ।

(২) কফরনাহুমকে দোষারোপ করা হয়েছে একটু গুরুত্ব দিয়ে (২৩ পদ), 'এবং তুমি কফরনাহুম, তোমার হাত ধর এবং নিজের নিয়তি শোনো'। কফরনাহুম, ইস্রায়েলের শহরগুলোর উপরে ছিল, তা খ্রীষ্টের বেশিরভাগ আবাস হিসেবে গৌরবান্বিত হয়েছিল। এটা ছিল পুরাতনের শিলোর মতো সেই স্থান– যা তিনি তাঁর নামকে স্থাপন করবার জন্য বেছে নিয়েছিলেন। এর জন্য একে মনোনীত করা হয়েছিল (যিরমিয় ৭:১২, ১৪)। খ্রীষ্টের চিহ্ন-কাজগুলো এখানে ছিল সকাল-বিকাল নাশতা করার মতো ব্যাপার এবং সে কারণেই পুরাতনের মান্নার মতো সেগুলো তুচ্ছ করা হয়েছিল এবং একে 'হালকা নাশতা' বলে অভিহিত করা হয়। অনেক সান্ত্বনাদায়ী এবং চমৎকার সব অনুগ্রহের বক্তৃতা খ্রীষ্ট এখানে তাদের ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রেক্ষিতে দিয়েছিলেন এবং তাই তিনি তাদের শোনালেন ক্রোধের ভয়ের বাণী: যারা এর আগেরটি শোনেনি তারা পরেরটি শুনে তা অনুধাবন করতে পারবে।

এখানে কফরনাহুমের পরিণতি বিবৃত হয়েছে,

(ক) তা সম্পূর্ণরূপে বলা হয়েছে; 'যাকে স্বর্গ পর্যন্ত তোলার কথা তাকে নিচে কবরে ফেলে দেওয়া হবে।' প্রথমত, যারা সুসমাচারের ক্ষমতা ও পবিত্রতাকে অনুধাবন করেছে তারা স্বর্গ পর্যন্ত উঁচুতে উঠে গেছে; তাদের বর্তমানে সম্মান দেওয়া হয়েছে এবং অনন্তকালের জন্য তারা মহা অগ্রগামিতা লাভ করবে; তারা স্বর্গের দিকে যাত্রা করেছে; কিন্তু যদি একে অবজ্ঞা করে পৃথিবী লগ্ন হয়ে থাকে; তারা নিজেদের ধন্যবাদ দিতে পারে যে, তাদের স্বর্গ পর্যন্ত তোলা হয় নি। দ্বিতীয়ত, সুসমাচারের অগ্রগামিতা এবং অগ্রসরতার অবজ্ঞা পাপীদের নরকের গভীরে ঠেলে দেবে। আমাদের বাহ্যিক সুযোগগুলো আমাদের কোনমতেই রক্ষা করতে পারবে না যদি আমাদের হৃদয় এবং জীবন তাতে একমত পোষণ না করে, তারা প্রকৃত চেহারা ফুটিয়ে তুলবে: উঁচু পাহাড়ের চূড়া যেমন, সেখান থেকে পড়ে গেলে নিশ্চিত মৃত্যু এসে আলিঙ্গন করবে; তাই আমরা যেন উঁচু মানসিকতা পোষণ না করে ভয়পূর্ণ অনুশীলন চালিয়ে যাই, উদ্যমহীন, শ্রমবিমুখ না হয়ে বরং কর্মঠ হই (ইয়োব (২০:৬, ৭)।

(খ) এখানে এর সাথে সদোমের পরিণতির কথা তুলনা করা হয়েছে– যা ছিল খুবই পরিচিত ও উদাহরণযোগ্য পাপময় স্থান– পাপ এবং এর কারণে অনিবার্য পরিণতি উভয়ের জন্য; অন্য আর সব শহরের চেয়ে এ ব্যাপারে তা কুখ্যাত ছিল। তবুও খ্রীষ্ট এখানে আমাদের বলেন,

প্রথমত, সেই কফরনাহুম, যে অনুগ্রহের দেখা পেয়েছিল তা পেলে সদোম রক্ষা পেত। যদি এসব চিহ্ন-কাজ সদোমের খারাপদের সামনে করা হতো তবে তারা মন ফেরাত এবং ক্ষমার প্রতি যত্নবান স্মৃতিফলক হিসেবে তাদের শহর এখন পর্যন্ত টিকে থাকতো– যেভাবে এখন তা ধ্বংসের বিচারের অধীন হয়েছে (যিহূদা ৭ পদ)। মনে রাখুন, খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে সত্যিকারের অনুতাপ এমনকি জঘন্য পাপীও ক্ষমা লাভ করতে পারে এবং নেমে আসা শাস্তিকে বিরত করতে পারে। কিন্তু সদোমের ক্ষেত্রে এমন বিকল্প ছিল না। স্বর্গদূতদের

সদোমে পাঠানো হয়েছিল কিন্তু তবুও তা টেকেনি; কিন্তু খ্রীষ্ট যদি সেখানে যেতেন তবে তা টিকে থাকতো। আমাদের জন্য এ পরম উৎসাহের ব্যাপার যে, পৃথিবী তার অসহায়ত্বের জন্য খ্রীষ্টের দারস্থ হতে পারছে, কোন স্বর্গদূতের কাছে নয়! (ইব্রীয় ২:৫)। তাঁর চিহ্ন-কাজ দেখে এখানকার লোকদের মতো দল পাকিয়ে কাউকে ব্যঙ্গ করতেও দেখা যেত না।

দ্বিতীয়ত, সদোমের ধ্বংস সেই মহান দিনে অনেকটা সহনীয় হবে যেটা কফরনাহুমের বেলায় হবে না। উত্তর দেবার জন্য সদোমের তাও অনেক 'অজুহাত' আছে কিন্তু খ্রীষ্টকে অবজ্ঞা করার পর এক্ষেত্রে কফরনাহুমের কিছুই বলার থাকবে না। এই সুসমাচার যদি পরিত্রাণকর্তা খ্রীষ্টকে 'খুনী', 'মৃত্যু' হিসেবে চিত্রিত করে তবে তা-ই সই; কারণ এটা হচ্ছে তাদের কাছে মৃত্যুজনক গন্ধ যা তাদের মৃত্যুতে নিয়ে যায়, তা-ই মহামৃত্যু (২ করিন্থীয় ২:১৬)। যারা তাঁর সুসমাচার কিংবা তাঁর পাঠানো প্রচারকদের গ্রহণ করে নি খ্রীষ্ট তাদের ক্ষেত্রেও ঠিক একই কথাই বলেছিলেন। যেসব স্থানে শিষ্যেরা তাদের মঙ্গলবাদের উত্তর পান নি সেসব স্থানের প্রতিও খ্রীষ্ট অভিন্ন ধ্বংসের কথা বলেছেন (১০:১৫)– 'সেই শহরের চেয়ে সদোমের লোকদের অবস্থা অনেকটা সহনীয় হবে।' বর্তমানে আমরা যারা লিখিত বাক্য পড়ছি, সুসমাচারের বিধানের আলোকে চলছি এবং পবিত্র আত্মার পরিচালনায় বাস করছি তারা যেন ভুল করেও এই 'অগ্রগামিতাকে' সম্বল করে কোরাসিন, বৈথসৈদা এবং কফরনাহুমের মতো উচ্চম্মন্য হয়ে না পড়ি; কারণ মহান দিনে কাজের বিচার করা হবে। পরিশেষে এটুকুই বলা যায়, এই সময়ের অধ্যাপকেরা স্বর্গে যান আর নরকে যান, এই সব স্থানের কাছে তারা মহাঋণী হবেন। যদি তারা স্বর্গে যান তবে তারা স্বর্গীয় ক্ষমার কাছে দায়বদ্ধ হবেন, যেহেতু এই ক্ষমাই তাদের সেই সমৃদ্ধ পথের দিকে নিয়ে গেছে। আর যদি তাদের গন্তব্য হয় নরক তবে স্বর্গীয় বিচারের কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হবে যে, কেন তারা সমৃদ্ধ পথে হাঁটেননি।

মথি ১১:২৫-৩০

এই পদগুলোতে আমরা খ্রীষ্টকে স্বর্গের দিকে তাকিয়ে, তাঁর পিতাকে পরিত্রাণের চুক্তির নিরাপত্তা ও শাসনের জন্য ধন্যবাদ জানাতে দেখি; এবং সেইসাথে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে অনুগ্রহের চুক্তির উপকার লাভের সুযোগ গ্রহণের জন্য সব মানুষের প্রতি তিনি একটি আহ্বান জানালেন।

ক. খ্রীষ্ট এখানে ঈশ্বরকে তাঁর প্রাপ্য ধন্যবাদ দিলেন, যেহেতু তিনি তাঁর সুসমাচারের রহস্য শিশুর মতো লোকদের কাছে প্রকাশ করেছেন (২৫, ২৬)। যীশু উত্তর করলেন এবং বললেন। একে বলা হয় একটি উত্তর, যদিও আর কোন কথা এর আগে তাঁর নিজের বলে লিপিবদ্ধ হয় নি, কারণ এটা ছিল খুবই স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ একটি প্রত্যুত্তর, যা বিষণ্ন বিবেচনার কাছে অতিবাহিত হয়েছে এবং তা উপযুক্তভাবে তার বিরুদ্ধে ভারসাম্য তৈরি করেছে। সেই ঘৃণ্য শহরগুলোর পাপ এবং ধ্বংস, কোন সন্দেহ নেই, তা ছিল খ্রীষ্টের কাছে দুঃখের; যেভাবে তিনি যিরূশালেমের জন্য কেঁদেছিলেন সেভাবে তিনি তাদের জন্য না কেঁদে পারেননি (লূক ১৯:৪১); এই চিন্তা করলে সে কারণেই তাঁর নিজেকে উজ্জীবিত করার প্রয়োজন ছিল; এবং সেই উজ্জীবিত করার কাজ ভালভাবে সারতে তিনি একে ধন্যবাদ দানের মাঝে রাখলেন। শিশুর মতো লোকদের সুসমাচার গ্রহণের মধ্য দিয়ে 'ইস্রায়েলের সবাই তাঁর কাছে জড়' না হলেও তিনি গৌরবান্বিত হয়েছিলেন। মনে রাখুন, ঈশ্বরের দিকে

উর্ধ্বে তাকিয়ে আমরা মহা উৎসাহ লাভ করতে পারি, যখন চারপাশে তাকিয়ে শুধু হতাশই হই। এটা দেখা খুবই দুঃখের যে, বেশির ভাগ মানুষ তাদের নিজেদের সুখের বিষয়ে বিস্মৃত হয়েছে, কিন্তু এটা ভাবা উৎসাহদায়ক যে আমাদের জ্ঞানী এবং বিশ্বস্ত ঈশ্বর যেভাবেই হোক অত্যন্ত কার্যকরভাবে তাঁর নিজ গৌরবের পরিকল্পনাকে নিরাপদ করবেন। যীশু উত্তরে বললেন, 'আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই।' মনে রাখুন, অন্ধকার এবং বিক্ষিপ্ত মনের ক্ষেত্রে ধন্যবাদ দান হচ্ছে একটি কার্যকর উপায় এবং তা হতাশাকে চুপ করিয়ে দিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। প্রশংসা গান ঝিমিয়ে পড়া আত্মায় প্রাণসঞ্চারকারী মাধ্যম– যা হৃদ্যতাপূর্ণ রাজ্যের এবং তা বিষণ্নতা দূর করতে সহায়তা করে। যখন ভয় ও দুঃখবোধকে আমাদের উত্তর দেবার মতো উত্তর প্রস্তুত না থাকে তখন আমাদের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাবার পথ খোলা থাকে, 'পিতা, তোমাকে ধন্যবাদ দিই;' ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন কারণ, এর চেয়েও খারাপ কিছু ঘটতে পারতো।

এখন খ্রীষ্টের এই ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাঝে আমরা দেখতে পাই,

১. তিনি ঈশ্বরকে যে অভিধা দিলেন, 'হে পিতা, তুমি স্বর্গ ও পৃথিবীর মালিক।' মনে রাখুন,

(১) ঈশ্বরের নিকটে আসার জন্য প্রশংসা কিংবা প্রার্থনায় আমাদের তাঁর প্রতি 'পিতা'র দৃষ্টিতে তাকানো এবং সেই সম্পর্ককে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরা উচিত। তবে সেটা কেবল যখন আমরা তাঁর কাছে ক্ষমা চাই তখনই নয় উপরন্তু যখন আমরা যে ক্ষমা পেয়েছি তাঁর জন্য তাকে ধন্যবাদ দিতে বসি তখনও। ক্ষমা তখনই দ্বিগুণ মিষ্ট হয় এবং প্রশংসায় মনকে বাড়িয়ে তোলার ক্ষেত্রে ক্ষমতাসম্পন্ন হয়– যখন তা ঈশ্বরের ভালবাসার নিদর্শন হিসেবে গৃহীত হয় এবং এবং পিতার হাত থেকে উপহার নেবার মতো করে আমরা তা পাই: 'পিতাকে ধন্যবাদ জানানো' (কলসীয় ১:১২)। 'পিতা তোমাকে ধন্যবাদ'– এ কথার মাধ্যমে সন্তান পিতার প্রতি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং আরও দয়া পাবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে তোলে।

(২) পিতা হিসেবে ঈশ্বরের কাছে যখন আমরা আসি আমরা অবশ্যই এই কথা মনে রাখব যে, তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু; যা আমাদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক তাঁর কাছে আসার বিষয়টি দাবি করে। যদিও তিনি সবার ওপর রাজত্ব করেন, তবুও তার সামনে যেতে আমাদের আত্মবিশ্বাস থাকবে, কারণ তিনি আমাদের। তিনিই আমাদের যাবতীয় প্রত্যাশা মেটাতে এবং শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। তাঁর কাছ থেকে আমরা সবসময় ভাল জিনিসটিই পেয়ে থাকি। মল্কিষেদকের মধ্যে অনেক আগে থেকেই ঈশ্বর অনুগ্রহের বাহক অথবা স্বর্গ ও পৃথিবীর মনিব হিসেবে ছিলেন। তাই তাঁর প্রতি আমাদের ধন্যবাদ সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়া উচিত। আমরা অবশ্যই তাঁকে তাঁর প্রাপ্য গৌরব এবং তাঁর বাহক হিসেবে উপযুক্ত ধন্যবাদ দেব।

২. তিনি তাঁর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কারণ উল্লেখ করলেন যে, তিনি জ্ঞানীদের কাছ থেকে যেসব বিষয় লুকিয়ে রেখেছেন তা শিশুর মতো এই লোকদের কাছে প্রকাশ করেছেন। এই বিষয়গুলো, তিনি বলেন নি কোন বিষয়গুলো, কিন্তু তার অর্থ দেখা যাচ্ছে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ বিষয়– যা সুসমাচারের এবং সেই মহান বিষয়গুলো– যা আমাদের শান্তির বিধান করে (লূক ১৯:৪২)। তিনি এভাবে স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে এসবের বিষয়ে বললেন, এসব জিনিস, কারণ সেইসব জিনিস তাতেই পূর্ণ হয়েছিল এবং তা আমাদেরও পূর্ণ করে: অন্য আর কোন

বিষয়ই এর মতো নয়।

মনে রাখুন, (১) অনন্তকালীন সুসমাচারের বিষয়গুলো বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল– যারা শিক্ষা ও প্রার্থিব বৈষয়িক ব্যাপারে অবস্থানগতভাবে সুবিদিত ছিল। সবচেয়ে বিদ্বান, মহাপ্রতিভাবানও সুসমাচারের রহস্যের কাছে আগন্তুক বলে আবিষ্কৃত হতে পারে। 'পৃথিবী জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে জানে নি' (১ করিন্থীয় ১:২১); অধিকন্তু তথাকথিত মিথ্যা বিজ্ঞান দ্বারা (১ তীমথিয় ৬:২০) এর বিপরীতে অবস্থান নিয়েছিল। যারা বৈষয়িক ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ, প্রকৃতিস্থ এবং যথেষ্ট সাংসারিক তারা স্বভাবতই আত্মিক বিষয়ের খুব কমই অভিজ্ঞতা করে। মানুষ প্রকৃতির বিভিন্ন রহস্যের গভীরে ঝাঁপ দিতে পারে এবং সম্পদের বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে সম্যক সমাধান বিশ্লেষণ করতে পারে তবুও তারা স্বর্গ-রাজ্যের ব্যাপারে অজ্ঞ থাকে; কারণ তাদের এসব রহস্যের ক্ষমতার অভিজ্ঞতা হয় নি।

(২) পৃথিবীর বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানীরা যেখানে সুসমাচারের রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞ থেকেছে এমনকি খ্রীষ্টে শিশুর মতো লোকেরা সেখানেই নিজেদের পবিত্রকারী জ্ঞান লাভ করে উদ্ধার পেয়েছে: 'কিন্তু তুমি শিশুর মতো এই লোকদের কাছে তা প্রকাশ করেছ।' খ্রীষ্টের শিষ্যরাও এইরকম ছিলেন: তারা জন্মেছিল নীচু বংশে এবং কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেন নি; তারা কোন বিদ্বান-শিল্পী-রাজনীতিবিদ ছিলেন না; বরং তারা ছিলেন অশিক্ষিত ও অজ্ঞ মানুষ (প্রেরিত ৪:১৩)। এভাবে জ্ঞানের রহস্য– যা প্রকৃত অবস্থার চেয়ে দ্বিগুণ হয়ে (ইয়োব ১১:৬) শিশুদের কাছে ধরা দিল; যা তাদের মুখের শক্তিমত্তা থেকে উৎসারিত হয়েছিল তা নিহিত– গোপন ছিল (গীত ৮:২) এবং ঈশ্বরের প্রশংসা সেখানে সিদ্ধ হল। পৃথিবীর জ্ঞানীদের সুসমাচারের শিক্ষক হিসেবে বেছে নেওয়া হয় নি কিন্তু পৃথিবীর চোখে তুচ্ছ বলে পরিগণিত লোকেরাই এর শিক্ষক মনোনীত হয়েছিলেন (১ করিন্থীয় ২:৬, ৮, ১০)।

(৩) জ্ঞানী এবং শিশুদের এই পার্থক্য দৃশ্যত ঈশ্বরের নিজের তৈরি।

(ক) তিনিই এইসব বিষয় জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছেন। তিনি তাদের শিক্ষা, বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা, অন্য যে কারও চেয়ে মানবীয় বিষয়গুলোকে বোঝার ক্ষমতা বেশি করে দিয়েছেন এবং তারা সেই কারণে গর্বিতও ছিল এবং তাতেই স্থির হয়ে ছিল এবং আর কোথাও তারা তাকায় নি; এবং সে কারণেই ঈশ্বর তাদের জ্ঞানের আত্মা এবং প্রকাশিত বাক্য দিতে অসম্মত হলেন। তারপর যদিও তারা সুসমাচারের শিক্ষা শুনেছিল, তবুও তাদের কাছে তা অদ্ভুত ঠেকেছিল। ঈশ্বর তাদের অবজ্ঞা এবং ভুলের লেখক নন কিন্তু তিনি তাদের উপরই তাদের ভার ছেড়ে দিলেন এবং তাদের পাপ তাদের শাস্তি হয়ে দাঁড়াল। প্রভু এই কাজে ধার্মিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন (দেখুন যোহন ১২:৩৯, ৪০; রোমীয় ১১:৭; প্রেরিত ২৮:২৬, ২৭)। তারা যদি তাদের জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তা দিয়ে ঈশ্বরকে সম্মানিত করতো তবে তিনি তাদের এইসব গোপন বিষয়ের জ্ঞান দিতেন; কিন্তু যেহেতু তারা তাদের কামনা-বাসনার সেবা করেছিল, তাই তিনি তাদের হৃদয়ের কাছে সেইসব জিনিস দুর্বোধ্য করে রাখলেন।

(খ) তিনিই শিশুর মতো লোকদের কাছে তা প্রকাশ করেছেন। 'আমাদের শিশুদের কাছে বিষয়গুলো প্রকাশিত হবে' (দ্বিতীয় বিবরণ ২৯:২৯)। তাদের মনে তিনি সেসব বিষয় বোঝার ক্ষমতা দিলেন যেন তারা তা গ্রহণ করে; এবং সেই সব বিষয়ের উপযোগিতা-

আবেদনও তারা বুঝতে পারে। এভাবে তিনি গর্বিতদের দমন করলেন এবং বিনম্রদের অনুগ্রহ দিলেন (যাকোব (৪:৬)।

(৪) এই প্রয়োগ অবশ্যই স্বর্গীয় শাসন অনুযায়ী হয়েছিল। খ্রীষ্ট নিজেকে তাতে নির্দেশ করলেন– 'পিতা তোমার দৃষ্টিতে একেই ভাল বলে মনে হয়েছে।' খ্রীষ্ট এখানে এই বিষয়ে তাঁর পিতার ইচ্ছাকে অনুমোদন করলেন। ঈশ্বর সেই পথ বেছে নেন যার দ্বারা তিনি নিজেকে গৌরবান্বিত করতে পারেন। তাই তাঁর কাজ করার জন্য আমাদের যে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে চান তাঁকে তা করতে দিন; তাঁর অনুগ্রহ একমাত্র তাঁর একার, তিনি তা যাকে খুশি দিতে পারেন। কেন তিনি পিতরের মতো একজন জেলেকে শিষ্য হিসেবে বেছে নিলেন, আর কেনইবা নীকদিমের মতো একজন ফরীশী এবং যিহূদীদের একজন শাসককে বেছে নিলেন না– সে প্রশ্ন করা অবান্তর; কারণ একেই তাঁর দৃষ্টিতে ভাল মনে হয়েছিল। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের কথোকথন শুনে তাদের দেখানোর জন্য এই কথা বলেছিলেন যেন তারা একথা না ভাবে যে, তাদের বাছাই করার পেছনে তাদের কৃতিত্ব রয়েছে। তারা যেন বুঝতে পারে, তাদের এই সম্মান, পৃথকত্ব ঈশ্বর হতেই হয়েছে। তিনিই তাদের আলাদা করার জন্য তৈরি করেছিলেন।

(৫) স্বর্গীয় অনুগ্রহের এই প্রক্রিয়ায় বন্টনের জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত; কারণ প্রভু যীশুই তা যাবতীয় ধন্যবাদের সাথে করেছিলেন। আমরা অবশ্যই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাব যে,

(ক) এইসব বিষয় প্রকাশিত হয়েছে; বিভিন্ন সময়ের এবং প্রজন্মের কাছে যা রহস্য হয়ে ছিল– তা এখানে গ্রন্থিত হয়েছে; সেগুলো এখন প্রকাশিত, তা কেবল অল্প ক'জনের কাছে নয় কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র প্রকাশ করার জন্য।

(খ) সেগুলো শিশুর মতো লোকদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে; যারা বিনম্র এবং সরল তাদের এই পরিত্রাণ দ্বারা সৌন্দর্যায়িত করা হয়েছে এবং এই সম্মান তাদের দেওয়া হয়েছে– যাদের পৃথিবী অবজ্ঞা করে।

(গ) এটা 'তাদের কাছে ক্ষমা এসেছে'– এই কথাকে ফুটিয়ে তোলে। জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের 'ক্ষমার' তৃষ্ণা না থাকায় তাদের কাছ থেকে স্বর্গীয় রহস্য লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। এ থেকে উভয়ের পার্থক্য অনুধাবন করা যায়। ইয়োবের কাছ থেকে তাঁর ভাল জিনিসগুলো কেড়ে নেবার পরও প্রভুর গৌরব করেছিলেন। তাই আমরা এসব বিষয়কে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের কাছে লুকিয়ে রেখে শিশুর মতো লোকদের কাছে তা প্রকাশ করার কারণটি অনুধাবন করতে পারি। সেটা তাদের দুঃখ-দুর্দশা নয় কিন্তু এটা এমন এক প্রক্রিয়া যা দ্বারা নিজেকে তুচ্ছ করা হয়, গর্বিত চিন্তা ভূপাতিত হয়, সর্বপ্রকার দৈহিক অভিলাষ নীরব হয়ে যায় এবং স্বর্গীয় ক্ষমতা এবং জ্ঞান আরও উজ্জ্বল আলো দিতে প্রতিস্থাপিত হয় (১ করিন্থীয় ১:২৭, ৩১)।

খ. খ্রীষ্ট এখানে সবার কাছে সুসমাচারের মধ্য দিয়ে উপকৃত হবার একটি প্রাচুর্যপূর্ণ প্রস্তাব রেখেছেন– যার ফল এখন শিশুর মতো লোকেরা ভোগ করছে (২৫ পদ)। এখানে লক্ষ্য করুন,

১. গাম্ভীর্যপূর্ণ ভূমিকা– যা এই আহ্বান বা আমন্ত্রণের পথ নির্দেশ করে; উভয়ই এর প্রতি আমাদের মনোযোগকে আদেশ করে এবং এর সাথে আমাদের আকাঙ্খা হতে উৎসাহিত করে। এর মধ্য দিয়ে আমরা শক্ত সান্ত্বনা পেতে পারি– যে আশাকে আমাদের

সামনে রাখা হয়েছে তার শরণ নিয়ে। খ্রীষ্ট তাঁর ক্ষমতাকে পূর্বনিধারণ করেছেন, পরিচালিত করেছেন তার যোগ্যতাকে। আমরা দেখতে পাব যে, এই প্রস্তাব দেওয়ার জন্য তাঁকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে;

এখানে তিনি আমাদের জন্য দু'টো জিনিস রাখলেন (২৭ পদ)।

(১) পিতার কাছ থেকে পাওয়া তাঁর কর্মভার: 'আমার পিতা সবকিছুই আমার হাতে দিয়েছেন।' খ্রীষ্ট ঈশ্বর হিসেবে পিতার মতোই ক্ষমতা ও গৌরব ধারণ করেন; কিন্তু মধ্যস্থ হিসেবে তিনি তাঁর ক্ষমতা এবং গৌরব গ্রহণ করেন পিতার কাছ থেকে; সব বিচার তাঁর কাছে দায়বদ্ধ। ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে একটি নতুন চুক্তি তৈরির জন্য এবং ধর্মত্যাগীদের কাছে শান্তি এবং সুখের বারতা দেবার জন্য তাঁকে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে। এভাবে তিনি যেটাকে ভাল মনে করেছেন সেই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই তিনি সেই মহান সম্পর্কে কথা ঘোষণা ও স্থাপন করেছেন। নিঃসন্দেহে এ কাজের জন্য তাঁকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। তিনি ছিলেন পবিত্র এবং তাঁর বিষয়েই পঞ্চপুস্তক ও ভাববাদীদের শাস্ত্রে বলা হয়েছিল। তাঁর মাঝে স্বর্গ ও পৃথিবী– উভয়ের ক্ষমতা ছিল (২৮:১৮); সব মানুষের উপর ক্ষমতা ছিল (যোহন ১৭:২); বিচার পরিচালনা করার ক্ষমতাও তাঁর (যোহন ৫:২২, ২৭)। এটা আমাদের খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার জন্য তাঁর কাছে আসতে উৎসাহিত করে। পাশাপাশি যে যে কারণে আমরা তাঁর কাছে আসি তা দিতে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, কারণ পিতা তাঁর হাতে সবকিছুই দিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি যে সবার প্রভু তা প্রকাশ পায়। সব ক্ষমতা, সব সম্পদ তাঁর হাতে।

লক্ষ্য করুন, পিতা সবকিছুই প্রভু যীশুর হাতে দিয়েছেন; তাই আমাদের সব কাজ– যা সম্পন্ন হয়েছে, যা আমাদের– তার সবকিছুই তাঁর হাতে অর্পণ করতে হবে। ঈশ্বর তাঁকে আমাদের জন্য 'রেফারি' ও আশীর্বাদধন্য একজন করেছেন। উভয় পরিচয়ে তিনি আমাদের উপর তাঁর হাত রাখেন। তাই আসুন, তাঁর নির্দেশনা নিয়ে আমাদের যা করা প্রয়োজন তা করতে সম্মত হই। খ্রীষ্টের পরিচালনাধীনে নিজেকে সঁপে দিই, কারণ তিনি সব দুঃখের দ্বন্দ্ব সরিয়ে আমাদের তাঁর বাঁধনে জড়াবেন যেন পুরস্কার পাই।

(২) 'পিতার সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ তা; পিতা ছাড়া পুত্রকে কেউ জানে না এবং পুত্র ছাড়া পিতাকে কেউ জানে না।' এটা আমাদের মনে প্রভূত সন্তুষ্টি এনে দেয় এবং তা পর্যাপ্তভাবে। প্রতিনিধিরা কেবল তাদের কর্মভার দ্বারাই পারিচালিত হয় না কিন্তু তারা প্রয়োজনীয় নির্দেশনাও পায়, যা তাদের আলোচনার সময় কৌশলী হতে সাহায্য করে। আমাদের প্রভু যীশুর উভয়ই ছিল, কেবল কর্তৃত্বই নয় কিন্তু তা বোঝানোর, সম্পন্ন করার মতো সক্ষমতাও। আমাদের মহান পরিত্রাণকাজের লেনদেনে মূল পার্টি হচ্ছেন পিতা এবং পুত্র; 'শান্তির পরামর্শ তাঁদের মাঝে রয়েছে' (সখরিয় ৬:১৩)। সে কারণেই আমরা পরিত্রাণের ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হতে পারি, যেহেতু সম্পর্কে নিরিখে একজন অন্যজনকে ভালভাবে বোঝেন, পিতা পুত্রকে জানেন এবং পুত্রও পিতাকে জানেন (আমরা একে পিতা ও পুত্রের পারস্পরিক বোঝাপড়া বলতে পারি)। সে কারণেই এতে কোন ভুলচুক হতে পারে না; যা মানুষের মাঝে প্রায়শই ঘটে থাকে– যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা, ছন্দপতন হয়, ভুল বোঝাবুঝি। পিতার সাথে পুত্রের রয়েছে অনন্তকালীন ঘনিষ্ঠ তা; তিনি ছিলেন ক্যাবিনেট কাউনসিলের একজন সেক্রেটারি (যোহন ৫০:১৮)। তিনি ছিলেন তাঁর দ্বারা এমন একজন যিনি তাতেই নিবিষ্ট (হিতোপদেশ ৮:৩০); তাই কেউই পুত্রের চেয়ে পিতাকে বেশি জানে

না, তিনি যোগ করেন, 'পুত্র তাকেই প্রকাশ করবেন।' মনে রাখুন,

(ক) মানুষের সুখ নির্ভর করে ঈশ্বরের সাথে তাঁর সম্পর্কের উপর; এটা অনন্তকালীন জীবন, এটা হচ্ছে ভারসামপূর্ণ সত্তার ত্রুটিহীনতা।

(খ) যাদের সাথে ঈশ্বরের সান্নিধ্য রয়েছে তারা অবশ্যই যীশু খ্রীষ্টের কাছে নিজেদের সমর্পণ করবে; কারণ জ্ঞানের আলো– যা ঈশ্বরের গৌরব– তা খ্রীষ্টের মুখে উজ্জ্বলভাবে জ্বলে (২ করিন্থীয় ৪:৬)। আমরা খ্রীষ্টের বাধ্য হব, কারণ ঈশ্বর, পিতার ইচ্ছা এবং ভালবাসার যে প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করেছি– যা আদমের পাপের পর মানুষ হারিয়েছিল, কোন সান্ত্বনাদায়ী সম্পর্ক পবিত্র ঈশ্বরের সাথে পাপী মানুষের ছিল না– তা একজন মধ্যস্থের দ্বারা পুনঃস্থাপিত হয়েছে (যোহন ১৪:৬)।

২. এখানে, আমাদের জন্য একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবটি নিজেই আমন্ত্রণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এই গাম্ভীর্যদ্যোতক ভূমিকার পর আমরা মহান কোন কিছুর প্রত্যাশা করতে পারি; এবং একথা বিশ্বস্ত এবং সব গ্রহণের চেয়ে মূল্যবান– 'তাঁর কথাতেই আমরা রক্ষা পাই।' আমাদের এখানে খ্রীষ্ট, আমাদের পুরোহিত, রাজা এবং ভাববাদীর কাছে উদ্ধার হতে সমর্পিত হবার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবং এই নির্দেশমতে তাঁর দ্বারা শাসিত হতে এবং তাঁর দ্বারা শিক্ষা লাভ করতে আহ্বান জানানো হচ্ছে।

(১) আমরা অবশ্যই বিশ্রামের জন্য খ্রীষ্টের কাছে আসব এবং নিজেদের তাঁর কাছে স্থাপন করব (২৮ পদ), 'হে পরিশ্রান্তরা আমার কাছে আস।'

লক্ষ্য করুন, (ক) যে প্রকার লোকদের এখানে আমন্ত্রণ করা হয়েছে: যারা পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত। এইপ্রকার লোকদের জন্য তাঁর উদ্বেগ রয়েছে (যিশাইয় ৫০:৪)। 'ভারাক্রান্ত' বলতে এখানে তাদের কথা বোঝানো হয়েছে যারা পূর্বপুরুষদের কঠিন নিয়মের জন্য অভিযোগ করে; প্রকৃতই যা ছিল অসহনীয় জোয়ালবিশেষ এবং তা প্রবীণদের প্রথা অনুযায়ী গড়ে উঠেছিল (লূক ১১:৪৬)। এই ভারাক্রান্তরা খ্রীষ্টের কাছে আসুক এবং তাদের বোঝা হালকা করুক। খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীকে এই জোয়াল, লালসাজাত নিয়মের বোঝা থেকে মুক্ত করতে এসেছেন। তিনি তাঁর চার্চকে উপাসনার সবচেয়ে পবিত্র এবং আত্মিক উপায়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে এসেছেন। তবে এই 'বোঝাকে' যদি আমরা পাপের বোঝা হিসেবে ধরি তবে এর অর্থ আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। 'বোঝা' শব্দটি দ্বারা পাপের ক্ষমতা ও দোষ– উভয়ই টের পাওয়া যায়। মনে রাখুন, খ্রীষ্টের কাছে বিশ্রামের জন্য তাদেরই আহ্বান করা হচ্ছে– যারা পাপকে বোঝা হিসেবে গণ্য করে এবং একে ঝেড়ে ফেলতে চায়, যারা পাপের মন্দতার কাছে একদণ্ডও থাকতে চায় না কিন্তু আত্মায় এর জন্য কষ্ট, ভারাক্রান্ত হয়ে আছে, যারা সত্যিকারভাবে পাপের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, মানবীয় কাজ এবং জাগতিকতার বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে, যারা নিজেদের জীর্ণ দশা বুঝতে পারে এবং পাপের কারণে ধেয়ে আসা বিপদ অনুধাবন করতে পারে এবং যারা এর জন্য বেদনা অনুভব করে ও ভীত হয়– যেমন, ইফরাহিম (যিরমিয় ৩১:১৮-২০), হারানো ছেলেটি (লূক ১৫:১৭), কর-আদায়কারী (লূক ১৮:১৩), পিতরের শ্রোতারা (প্রেরিত ২:৩৭), পৌল (প্রেরিত ৯:৪, ৬, ৯), সেই জেলার (প্রেরিত ১৬:২৯, ৩০)। এটা ক্ষমা ও শান্তির জন্য প্রয়োজনীয় কাজ। সান্ত্বনাদায়ী আত্মা অবশ্যই প্রথমে চেতনা দেবেন (যোহন (১৬:৮); আমি ক্লান্ত হলে তবেই না সুস্থ হব।

(খ) এই আমন্ত্রণটি: 'আমার কাছে আস।' আমরা যা পেয়েছি এটা সেই মহিমাপূর্ণ

খ্রীষ্টের মহানুভবতার প্রদর্শনী (২৭ পদ)। এর মধ্য দিয়ে তিনি প্রকাশ করেন যে, তিনি প্রভু সবার। যিনি আমাদের মনে ভয় জাগান এখানে তাঁকে দেখুন, তিনি কী স্বর্ণখচিত রাজদণ্ড নিয়ে আছেন, যেন আমরা এর শীর্ষভাগ স্পর্শ করি এবং বাঁচি। মনে রাখুন, যারা পাপের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে, উদ্বিগ্ন তাদের দায়িত্বই হচ্ছে খ্রীষ্টের কাছে আসা। তার বিপরীতে যা সেগুলোকে ত্যাগ করা অথবা তার সাথে যা যুদ্ধ করে সেগুলোকে ছেড়ে আসা তাদের আশু কর্তব্য। আমরা অবশ্যই তাঁকে আমাদের ত্রাণকর্তা চিকিৎসক, উকিল হিসেবে গ্রহণ করব এবং নিজেদের তাঁর শাসন এবং পরিচালনার অধীনে ছেড়ে দেব। মুক্তভাবে চাইব, তিনি তাঁর নিজ উপায়ে তাঁর শর্তানুযায়ী আমাদের রক্ষা করুন। আসুন এবং নিজেদের বোঝা তাঁর উপর অর্পণ করুন– 'কনে বলছেন, যারা পিপাসিত তারা এসো'; তাই যার ইচ্ছা সে তাঁর কাছে আসুক।

(গ) যারা তাঁর সমীপে আসবে তাদের জন্য দেওয়া প্রতিশ্রুতি; 'আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব।' খ্রীষ্ট আমাদের নূহ– যাঁর নাম বিশ্রামের কথা চিত্রিত করে; কারণ তাঁর কাছেই আমরা বিশ্রাম পাই (আদি ৫:২৯; ৮:৯)। প্রকৃতই যারা পরিশ্রান্ত এবং বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে তাদের কাছে বিশ্রাম খুবই প্রয়োজনীয় বলে গণ্য হয় (আদি ৪৯:১৫; উপদেশক ৫:১২)। মনে রাখুন, যীশু খ্রীষ্ট সেই দুঃখার্ত আত্মাগুলোকে নিশ্চিত বিশ্রাম দেবেন। যে বিশ্রাম পাবার জন্য তারা বিশ্বাসে তাঁর কাছে আসে তিনি তাদের তা দেন– পাপের ভয় থেকে বিশ্রাম, বিবেকের শান্তি, পাপের দৌরাত্ম্য থেকে বিশ্রাম, পাপের কাছে আত্মার প্রাত্যহিক নির্ভরশীলতা এবং এর শাসন থেকে বিশ্রাম। এই 'বিশ্রাম' মানে ঈশ্বরের উদ্দেশে সমর্পিত জীবন (গীত ১১:৬, ৭) এবং তা ঈশ্বরের লোকদের অপেক্ষায় থাকে (ইব্রীয় ৪:৯)। এর শুরু অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে এবং এর সিদ্ধতা গৌরব লাভে।

(২) আমরা অবশ্যই আমাদের শাসক হিসেবে যীশু খ্রীষ্টের কাছে আসব এবং নিজেদের তাঁর কাছে সমর্পণ করব (২৯ পদ)। 'আমার জোয়াল তুমি নাও।' পূর্বোক্ত কথার সাথে এর মিল রয়েছে, কারণ খ্রীষ্ট রাজা ও পরিত্রাণকর্তা– উভয় হিসেবে পদোন্নত হয়েছেন। তিনি একজন পুরোহিত, যিনি তাঁর সিংহাসনে বসে আছেন। তাঁর প্রতিজ্ঞাত বিশ্রাম পাপের শ্রম থেকে মুক্তি দেয় কিন্তু ঈশ্বরের কাজ থেকে নয়। বরং বাধ্যতায় আমাদের বাঁধে যেন আমরা তাঁর প্রতি কর্তব্য পালনে দায়বদ্ধ থাকি। মনে রাখুন, আমাদের গলার জন্য খ্রীষ্টের একটি জোয়াল আছে, যা আমাদের মাথার মুকুটসদৃশ এবং এই জোয়াল যেন আমরা তুলে নিই এবং তা বহন করি– এটাই তাঁর ইচ্ছা। যারা উদ্বিগ্ন এবং বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে তাদের বোঝামুক্ত হবার আহ্বান জানিয়ে খ্রীষ্ট যে তাদের নতুন জোয়াল দিতে চাইছেন তা দেখে মনে হতে পারে– দুঃখভোগীর প্রতি আরও দুঃখভোগ। কিন্তু এর পার্থক্য তাঁর কথাতেই ফুটে ওঠে, 'তোমরা যে জোয়াল বহন করছ তা ভারী, তা ফেলে দাও আমারটা গ্রহণ কর, তা হালকা। তা তোমার কাজকে সহজ করবে।' দাসকে জোয়ালের অধীন হতে (১ তীমথিয় ৬:১); এবং এর সাথে একীভূত হতে (১ রাজাবলি ১২:১০) বলা হল। নিজেদের ওপর খ্রীষ্টের জোয়াল তুলে নিতে তাঁর কাছে নিজেদের সেবাকারী এবং অধীন করে সমর্পণ করতে হবে এবং তারপর আমরা সেভাবেই পরিচালিত হব– তাঁর নির্দেশের প্রতি বাধ্যতায় এবং তাঁর অধীনতার প্রতি উজ্জীবিত সমর্পণে। খ্রীষ্টের সুসমাচারের প্রতি বাধ্যতা প্রদর্শনের উপায় হচ্ছে নিজেদের প্রভুর কাছে ছেড়ে দেওয়া। এ-ই হচ্ছে খ্রীষ্টের জোয়াল; যে জোয়াল গ্রহণ করতে তিনি নির্দেশ করেছেন, যে জোয়াল তিনি

আমাদের সামনে রেখেছেন। আমাদের দুর্বলতা দূর করার জন্যই তিনি বাধ্যতার বিষয়ে শিখেছিলেন (রোমীয় ৮:২৬)। নিশ্চিতভাবেই জোয়াল বহন করাটা কঠিন, কিন্তু ব্যক্তি যদি চলতে শুরু করে তবে এই জোয়ালই তাকে সাহায্য করবে। খ্রীষ্টের আদেশগুলো আমাদের সুবিধার জন্যই প্রবর্তিত হয়েছে, তাই আমরা অবশ্যই তাঁর জোয়াল তুলে নেব। কাজের স্বার্থে আমরা তা বহন করব এবং এই অগ্রগমন আমাদের গৌরবান্বিত করবে। আমরা তা বহন করব নিজেদের নিবেদনের জন্য এবং সে কারণেই আমরা হব বিনম্র ও সহিষ্ণু। একত্রে চলার জন্য আমরা সহবিশ্বাসীরা একসাথে তা বহন করব এবং সে কারণেই আমরা অন্যদের সাথে সহভাগিতা অক্ষুণ্ন রাখব। যারা এভাবে জোয়াল বহন করে জ্ঞানদায়ী বাক্য তাদের অনুপ্রাণিত করে। এখন, আমরা আমাদের পাঠের সবচেয়ে কঠিন অংশে এসে উপনীত হয়েছি।

নিঃসন্দেহে তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ (৩০ পদ)– 'আমার জোয়াল সহজ এবং এর বোঝা হালকা; তোমাদের এ বিষয়ে ভীত হওয়ার অবকাশ নেই।'

(ক) খ্রীষ্টের আদেশের যে জোয়াল তা বহন করা সহজ, তা খ্রীষ্টের এবং তা কেবল সহজই নয় উপরন্তু তা আশীর্বাদে পূর্ণ। তাঁর একথা জোয়ালের মিষ্টতা এবং সন্তুষ্টির দিকটি চিত্রিত করে। এর মধ্যে এমন কিছু নেই যা গলার কোমলতাকে বিরক্ত করে। আমাদের জন্য এতে ক্ষতিকর কিছু নেই। উপরন্তু তা আমাদের সতেজ করে। এই জোয়াল ভালবাসার শাসনে বাঁধা। খ্রীষ্টের আদেশগুলোর প্রকৃতি এমনই, তাই এগুলো বহনযোগ্য। তা আমাদের জন্য উপকারী, কারণ এর সহজবোধ্য সারকথা আমাদের ঈশ্বরের দিকে পরিচালিত করে। খ্রীষ্ট আমাদের যে সহায়তা দেন– তা অনেক শক্তিশালী, উৎসাহদায়ক এবং তা গঠনমূলক পরামর্শ দেয়। তা পাওয়া যাবে কাজের পথে, যেন আমরা সত্যিই বলতে পারি, 'এটা সন্তুষ্টির জোয়াল'। এটা নতুন প্রকৃতির কাছে সহজ– 'যে বোঝে তার কাছে খুবই সহজ' (হিতোপদেশ ১৪:৬)। প্রথম দিকে একে একটু কঠিন মনে হতে পারে কিন্তু পরবর্তীতে তা সহজ হয়ে যায়; ঈশ্বরের ভালবাসা এবং স্বর্গের আশা একে সহজ করে।

(খ) খ্রীষ্টের ক্রুশের বোঝা বহন করা হচ্ছে সহজ। খ্রীষ্টের কারণে মানুষ হিসেবে আমাদের উপর যে দুঃখভোগ নেমে আসে তা পরে অর্থবহ হয়ে উঠে। বাহ্যত একে আনন্দদায়ী নয় উপরন্তু কষ্টকর ব্যাপার বলেই মনে হয় তথাপি যেহেতু তা খ্রীষ্টের তাই তা হালকা। যে কারও চেয়ে পৌল এ সম্পর্কে অনেক বেশি জানতেন এবং তিনি একে বলেছেন হালকা দুঃখভোগ (২ করিন্থীয় ৪:১৭)। ঈশ্বরের উপস্থিতি (যিশাইয় ৪৩:২), খ্রীষ্টের সহমর্মিতা (যিশাইয় ৭৩:৯, দানি ৩:২৫) এবং বিশেষত আত্মার সাহায্য এবং সান্ত্বনা (২ করিন্থীয় ১:৫) খ্রীষ্টের জন্য করা দুঃখভোগকে হালকা ও সহজ করে তোলে। যেহেতু দুঃখভোগ বেড়ে গেলে পরামর্শদানও বৃদ্ধি পায় এবং তা চলতে থাকে। সে কারণেই বিপর্যয়ের সাথে লড়াইয়ের জন্য তা আমাদের গঠন দেয়, নিরুৎসাহের বিরুদ্ধে উৎসাহ দেয়। আমরা কাজের ক্ষেত্রে এবং দুঃভোগের সময় উভয়ের সাথে মিলিত হতে পারি; যদি আমরা খ্রীষ্টের কারণে 'হারিয়েও' যাই তবু তাঁর কাছে আমরা হারাব না।

(৩) আমরা অবশ্যই খ্রীষ্টের কাছে আসব; এবং তাঁকে শিক্ষক মেনে তাঁর কাছে শেখার জন্য সমর্পিত হব (২৯ পদ)। খ্রীষ্ট একটি অসাধারণ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং আমাদের তা থেকে শিক্ষা নেবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। আমরা অবশ্যই তাঁর জ্ঞানের সাহচর্য

নেব। আত্মা এবং বাক্যের দ্বারা যে নির্দেশনা তিনি আমাদের প্রতিদিন দিচ্ছেন তা মেনে চলতে আমাদের আগ্রহী হতে হবে। তিনি যা বলেন তা নিয়ে আমরা বেশি কথা বলব এবং তা সব উপলক্ষে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকব; আমরা অবশ্যই তিনি যা করেছিলেন তা মেনে চলব এবং তাঁর পদক্ষেপ অনুসরণ করব (১ পিতর ২:২১)। কেউ কেউ নিচের এই কথাগুলোকে নির্দিষ্ট করে খ্রীষ্টের জীবন থেকে আমাদের জন্য অনুপম শিক্ষা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন– কারণ আমার স্বভাব নরম ও নম্র। আমরা অবশ্যই কী করে স্বভাবে নরম ও নম্র হতে হয় তা তাঁর কাছ থেকে শিখব (ইফিষীয় ৪:২০); কারণ তিনি নিজেই শিক্ষক এবং শিক্ষা, পথপ্রদর্শক ও পথ– সবকিছুই।

এখানে দু'টো কারণ দেয়া হয়েছে যে কেন আমরা খ্রীষ্টের জীবন থেকে শিখব।

(ক) 'আমার স্বভাব নরম ও নম্র এবং সে কারণেই তা তোমাদের শিক্ষা দেবার জন্য আদর্শ।'

প্রথমত, তিনি নম্র এবং অবজ্ঞার প্রতি সহানুভূতি পোষণ করতে পারেন; যা দেখে অন্যরা করতে আগ্রহী হবে। অনেক সমর্থ শিক্ষকেরা দ্রুতই উত্তেজিত হয়ে যান, যা দুর্বল এবং ধীরগতির ছাত্রদের জন্য নিরুৎসাহের কারণ হয়; কিন্তু খ্রীষ্ট জানেন কী করে এরকম অবস্থা মোকাবিলা করতে হয় এবং তাদের কী করে বোঝাতে হয়। তিনি যেভাবে তাঁর শিষ্যদের পরিচালনা করেছেন– তা এখানে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে। তিনি ছিলেন তাদের প্রতি দয়ালু এবং ভদ্র এবং তাদের জন্য সবচেয়ে ভালটাই করেছেন; যদিও তারা ছিলেন অমনোযোগী এবং বিস্মৃতিপরায়ণ। কিন্তু তিনি চরমভাবে তাদের দুর্বলতাকে আঘাত করেন নি।

দ্বিতীয়ত, তাঁর স্বভাব নরম। দুর্বল ছাত্রদের প্রতি তিনি ছিলেন সহমর্মী, শিক্ষানবীশদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নিজেকে নিচু করেছিলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের কোর্ট থেকে বেছে নেননি কিংবা কোন বিদ্যালয় থেকেও নয়; কিন্তু তাদের সাগরের পার থেকে বেছে নিয়েছিলেন। প্রথমে তিনি তাদের মূলনীতিগুলো শিক্ষা দিয়েছিলেন এএভাবে যেভাবে শিশুদের হালকা খাবার দেওয়া হয়। তিনি তাদের ধারণক্ষমতার সীমাবদ্ধতা জেনে সেই অনুযায়ী নরম হয়েছিলেন। 'তিনি ইফ্রোয়িমকে যেতে শিক্ষা দেন' (হোশেয় ১১:৩)। তাঁর মতো আর কে শিক্ষা দেয়? এটা আমাদের জন্য পরম উৎসাহের যে, আমরা এরকম প্রকৃত স্কুল ও একজন আদর্শ শিক্ষক পেয়েছি। এই বিনম্রতা এবং নম্রতা তাঁকে শিক্ষক হবার জন্য যোগ্য করেছে। তাই যারা তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করতে চায় তাদের ক্ষেত্রে নম্র ও বিনম্র হওয়াটাই প্রধান যোগ্যতা হওয়া উচিত, যেহেতু তিনি বিচারে নম্রদের পথ দেখাবেন (গীত ২৫:৯)।

(খ) 'তোমরা দিলে বিশ্রাম পাবে।' এই প্রতিজ্ঞাটি ধার করা হয়েছে যিরমিয় ৬:১৬ পদ থেকে; কারণ খ্রীষ্ট ভাববাদীদের ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করতে পছন্দ করতেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি নতুন ও পুরাতন নিয়মের ঐক্যকে তুলে ধরতেন। মনে রাখুন, দিলের বিশ্রাম হচ্ছে সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত; যেন তার মধ্যে অনায়াসে বাস করতে পারে। দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্টের চরণে নিজেকে সমর্পণ করে তাঁর বাক্য শোনা– অন্তরে বিশ্রাম পাবার একমাত্র পথ। কাজের পথই হচ্ছে বিশ্রামের পথ। 'সুবুদ্ধি' ঈশ্বরের জ্ঞান এবং যীশু খ্রীষ্টে বিশ্রামের অর্থ খুঁজে পায়। সুসমাচারে জ্ঞান খোঁজায় আসলেই তা পূর্ণ সন্তুষ্টি এনে দেয়– যে জ্ঞানের পূর্বাপর কেউ জানে না (ইয়োব ২৮:১২)। খ্রীষ্ট আমাদের যে সত্য শিক্ষা দিয়েছেন আমরা

যেন তা দিয়ে আমাদের মনকে পূর্ণ করি; কারণ তাঁর শিক্ষার প্রতি আমাদের আকর্ষণের কারণে আমরা ঈশ্বরের ভালবাসায় এবং খ্রীষ্টে বিশ্রাম খুঁজে পাই। এর মধ্য দিয়েই তাদের সাথে একীভূত হওয়া সম্ভব। এই নিশ্চয়তাই আমাদের পুরো সন্তুষ্টি, চিরস্থায়ী শান্তি এনে দেয়। পৃথিবীর মতো এই সন্তুষ্টি স্বর্গের চিরস্থায়ী হবে– যেখানে আমরা ঈশ্বরকে কাছ থেকে দেখব, তাঁর স্বরূপ অভিজ্ঞতা করব এবং তাঁকে নিয়ে উৎসবে মেতে উঠব। খ্রীষ্টের জোয়াল তুলে নিতে এই ভাবনাটিই কি যথেষ্ট নয়? যারা খ্রীষ্ট সম্পর্কে জানে তারাই তাঁর এই বি-শ্রামের ভাগী হবে।

এই হচ্ছে সুসমাচারের সারমর্ম এবং মূল বিষয়– আহ্বান, সুসমাচার গ্রহণের প্রস্তাব: যা এখানে আমাদের অল্প কথায় বলা হয়েছে– আমাদের জীবনে খ্রীষ্টের কী প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তিনি আমাদের কাছ থেকে কী চান। এখন, খ্রীষ্ট সম্পর্কে ঈশ্বরের সেই উক্তিটি আরেকবার দেখে নেওয়া যাক, 'ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, যাঁর উপর আমি প্রীত; তোমরা তাঁর কথা শোনো।'

মথি লিখিত সুসমাচার
অধ্যায় ১২

এই অধ্যায়ে,

(১) বিশ্রামবার সম্পর্কিত মোশির ব্যবস্থার চতুর্থ আদেশের প্রায়োগিক দিক নিয়ে যিহূদী ধর্ম -শিক্ষকদের মাঝে যে ভ্রান্ত সংস্কার ছিল খ্রীষ্ট তা ভেঙে দিলেন। 'বিশ্রামবারের পবিত্রতা রক্ষার স্বার্থে এদিন কোন কাজই করা যাবে না'– ধর্ম-শিক্ষকদের দেওয়া এই ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে খ্রীষ্ট যুক্তি দিয়ে দেখালেন যে, দয়া ও বাধ্যতার কাজ বিশ্রামবারে করা যাবে (১-১৩ পদ)।

(২) চিহ্ন-কাজের ক্ষেত্রে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রচারবিমুখতা, বিচক্ষণতা ও বিনম্রতা প্রদর্শন (১৪-২১ পদ)।

(৩) 'যীশু মন্দ-আত্মাদের রাজার ক্ষমতায় মন্দ-আত্মাগ্রস্তদর সুস্থ করেন'– ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকদের ঈশ্বরনিন্দাসূচক এই মিথ্যে অপবাদের বিপরীতে খ্রীষ্টের উত্তর (২২-৩৭ পদ)।

(৪) খ্রীষ্ট স্বর্গীয় চিহ্ন দেখতে চেয়ে ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকদের করা চ্যালেঞ্জের প্রত্যুত্তর করলেন (৩৮-৪৫ পদ)। (৫) আত্মীয়-পরিজনদের বিষয়ে খ্রীষ্টের বিচার (৪৬-৫০ পদ)।

মথি ১২:১-১৩

যিহূদী ধর্মতাত্ত্বিকেরা ব্যবস্থার আদেশগুলোর গভীরে প্রবেশ না করে অস্পষ্ট ধারণা নিয়েই সেগুলো অনুবাদ করেছিলেন। ফলে তাতে অনেক ভ্রান্তি ঢুকে গিয়েছিল। ধর্ম-শিক্ষকদের এই অসতর্কতায় ব্যবস্থা তার মূল শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। খ্রীষ্ট তাঁর পাহাড়ে দেওয়া শিক্ষায় এই ভুলটি ধরিয়ে দিয়ে তা সংশোধন করে দিয়েছিলেন (৫ অধ্যায়) । কিন্তু ব্যবস্থার চতুর্থ আদেশের ক্ষেত্রে তাদের এই ভুল আর সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। তারা একে আক্ষরিকভাবে অনুবাদ করেছিলেন। মনে রাখুন, মানুষের দোষী অন্তর স্বভাবতই তার নৈতিক অবক্ষয়কে ঢাকতে ধর্মীয় প্রথা তথা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে ব্যবহার করে। ঈশ্বরের বাক্যের কোন অংশ যারা বাদ দেয় তাদের মতো যারা তাঁর আইন-কানুনে নিজেদের ভ্রান্ত সংস্কার যোগ করে তারাও অভিশপ্ত বলে গণ্য হবে (প্রকাশিত বাক্য ২২:১৬, ১৯; হিতোপদেশ ৩০:৬)।

বিশ্রামবার সম্বন্ধে ধর্ম-শিক্ষকদের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষা– 'এ-দিন কোন কাজ করা যাবে না'– যিহূদীদের দরকারি ও দয়ার কাজ থেকেও নিবৃত্ত করেছিল। খ্রীষ্ট এখানে বি-শ্রামবারে দরকারি ও দয়ার কাজকে 'আইনসিদ্ধ' বলে তাদের সেই দ্বিধার উত্তর দিলেন। ব্যবস্থার চতুর্থ আদেশের ব্যাখ্যাদানে খ্রীষ্টের আন্তরিকতা, শ্রমক্ষেপণ বিশ্রামবার হিসেবে সপ্তাহের একটি দিনে ধর্মীয় পর্যবেক্ষণের প্রতি ধারাবাহিক বাধ্যতার কথা প্রকাশ করে। এই সময়ের পরে যে ব্যবস্থা তার উপযোগিতা হারাতে যাচ্ছে তা ব্যাখ্যা করাটা খ্রীষ্টের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না; কিন্তু এর সঠিক ব্যবহারিক দিকটি উন্মোচন করে তিনি তাঁর মণ্ডলীর জন্য ঈশ্বরের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন বাধ্যতার শিক্ষণীয় দিকটি তুলে ধরলেন। এর মধ্য দিয়ে

আমরা 'খ্রীষ্টীয় সাব্বাথ' সম্বন্ধে শিক্ষা পাই। যদিও তা চতুর্থ ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে এসেছে কিন্তু তা যিহূদী ধর্ম-শিক্ষকদের সংস্কারযুক্ত নিয়মের মতো নয়।

বিশ্রামবার সম্পর্কিত এই শিক্ষা নিঃসন্দেহে খ্রীষ্টের সর্বযুগের মণ্ডলীর জন্য অনুসরণীয় হয়ে থাকবে। সাধারণত ঘটনার কার্যকারণ বিবেচনায় ব্যবস্থার অর্থ দাঁড় করাবার একটা চেষ্টা চলে। এখানে সেভাবেই এই নিয়মের অর্থ করা হয়েছে। মূল বিষয়ের প্রতি সাযুজ্য রেখে এখানে কিছু সময়ের ব্যবধানে ঘটা দু'টো ভিন্ন ঘটনা একত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায় ঘটনাদ্বয় ভিন্ন হলেও উভয়ই কিন্তু অভিন্ন শিক্ষার প্রতি নির্দেশ করে।

ক. খ্রীষ্ট বিশ্রামবারে তাঁর শিষ্যদের গমের শীষ ছেঁড়াকে সম্মতি দিয়ে দেখালেন যে, এদিন দরকারি কাজ করা যাবে এবং তা আইনসিদ্ধ। এখন, এখানে লক্ষ্য করুন,

১. শিষ্যেরা কী করেছিলেন। এক বিশ্রামবারে তারা তাদের প্রভুকে অনুসরণ করে গমক্ষেত ধরে যাচ্ছিলেন; সম্ভবত তারা সমাজ-গৃহের দিকে যাচ্ছিলেন (৯ পদ), কারণ বিশ্রামবারহেতু শিষ্যেরা অলস হাঁটাহাঁটি করছিলেন না, উপরন্তু তারা ছিলেন ক্ষুধার্ত। তবে এ নিয়ে আমাদের প্রভুর সংগঠনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে বসবেন না। কিন্তু আমরা ধারণা করতে পারি যে, তারা বিশ্রামবারের কাজকর্মে অধিক মনোনিবেশ করায় খাবার খেতে ভুলে গিয়েছিলেন এবং সকালের উপাসনায় তারা অনেক সময় ব্যয় করেছেন, যে-কারণেই তারা সকালের নাশতা করারও সময় পান নি; কিন্তু উপবাস সহকারে বেরিয়ে আসেন; কারণ তা না হলে সমাজ-ঘরে উপাসনায় যোগ দিতে দেরি হয়ে যাবে। শাস্ত্রের বর্ণনা মতো তারা গমক্ষেতের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং সেখানেই তারা খাবার গ্রহণ করলেন। মনে রাখুন, ঈশ্বর উপযুক্ত সময়ে বিভিন্নভাবে তাঁর লোকদের প্রয়োজন যুগিয়ে দেন। তিনি তাদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন যখন তারা তাঁর উপাসনা কাজে যোগ দিতে অগ্রসর হয়; যেভাবে আগেকার লোকেরা উপাসনায় যোগ দিতে যিরূশালেমে যাবার পথে শক্তি পেত (গীত ৮৪:৬, ৭)। 'তাদের ব্যবহারের জন্য বৃষ্টির জলে চৌবাচ্চা ভরাট হয়': 'যিহোবা যিরির' কাজে ব্যস্ত থাকাকালে নিজের 'প্রয়োজন' নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার কোন যৌক্তিকতা নেই। তাই কেবল ঈশ্বরকেই নিজের প্রয়োজনের কথা বলুন। গমক্ষেত ধরে যাবার সময় তারা গমের শীষ ছিঁড়তে লাগলেন; ঈশ্বরের আদেশ এতে সম্মতি দেয় (দ্বিতীয় বিবরণ ২৩:২৫)। মূলত যেসব কাজ অন্যের উপকারে আসে তা করতে আদেশের কঠোরতা ছিল না, যেমন: বি-শ্রামবারে প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্বপালন, সম্পদের তুচ্ছ বিষয়ে ব্যস্ত না হওয়া। খ্রীষ্ট ও তাঁর শিষ্যদের কাজে এই প্রতিবিধানটি তুচ্ছ বলে প্রতিভাত হয় নি বরং তারা এর প্রতি উপযুক্তভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং এতে তাদের সেরাটাই দিয়েছিলেন। এই অভ্যস্ততার বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে সুবিখ্যাত মি. বল, অফ হোয়াইটমোর বলেন, সাব্বাথ ডিনারে তার দু'টি গ্লাসের একটিতে থাকত গরম দুধ এবং অন্যটিতে ঠান্ডা, আর তাতেই তার পর্যাপ্ত আহার হয়ে যেত।

২. ফরীশীরা এতে যে দোষ খুঁজে পেলেন। যদিও নাশতা হিসেবে তা ছিল শুকনো তবুও ফরীশরীরা তাদের তা শান্তিতে খেতে দিলেন না। অন্যের ক্ষেত থেকে গম তোলার জন্য তারা তাদের সাথে তর্ক করেন নি (তারা বিচারের ক্ষেত্রে মৌলবাদী ছিলেন না), কিন্তু তা তারা বিশ্রামবারে কেন করলেন– এই ছিল তাদের প্রশ্ন; কারণ বিশ্রামবারে গম ছেঁড়া বা তোলাটা ধর্ম-শিক্ষকদের প্রথায় নিষিদ্ধ ছিল। অর্থাৎ শিষ্যদের এই কাজ ছিল একপ্রকার শস্য কর্তন।

মনে রাখুন, খ্রীষ্টের অনুসারীদের নিরীহ, নির্দোষ কাজকেও মন্দ বলে দোষারোপ করা এবং এর ওপর ব্যবস্থাভঙ্গের দায় চাপিয়ে দেয়াটা নতুন কিছু নয়, বিশেষত তাদের দ্বারা যারা নিজেদের প্রতারণা ও প্রকৃতিহেতু ঈর্ষাপরায়ণ। ফরীশীরা শিষ্যদের এই কাজের বিষয়ে তাদের প্রভুর কাছে অভিযোগ উত্থাপন করলেন যে, তা আইনসঙ্গত নয়। মনে রাখুন, তারা খ্রীষ্ট ও তাঁর শিষ্যদের বন্ধু নয়, যারা ঈশ্বর যাকে আইনসিদ্ধ করেছেন তাকে বেআইনি বলে অভিহিত করে।

৩. ফরীশীদের এই অভিযোগের প্রত্যুত্তরে খ্রীষ্ট যা বললেন। শিষ্যেরা আত্মপক্ষ সমর্থন করে কিছু বলতে পারতেন। কিন্তু যারা তাদের সাথে ঝগড়া করছিল তারা নিজেদের দিক থেকে সাব্বাথের পবিত্রতা রক্ষা করতে আন্তরিক ছিল, ফলে সেদিক থেকে তাদের ভুল করার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর অনুসারীদের মুক্ত করতে আসলেন, তা কেবল ফরীশীদের অনিয়ম থেকে নয় উপরন্তু তাদের পুস্তক-বহির্ভূত প্রতারণা থেকে। সে কারণেই খ্রীষ্ট তাদের পক্ষ হয়ে বলতে পেরেছিলেন এবং তারা যা করেছিলেন তা সিদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যদিও তা ছিল নিয়মের লঙ্ঘন।

(১) তিনি তাদের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সিদ্ধ করলেন, যাকে ফরীশীরা নিজেরা ভাল বলে মনে করতো।

(ক) তিনি দায়ূদের একটি পুরানো ঘটনা টানলেন, তিনি ঘটনাচক্রে সেই কাজটি করতে বাধ্য হয়েছিলেন– যা অন্য কোন সময় হলে করতেন না (৩, ৪ পদ), 'আপনারা কি সেই ঘটনাটি পড়েননি (১ শমূয়েল ২১:৬) দায়ূদ ও তার সঙ্গীরা উপাসনা গৃহের পবিত্র রুটি খেয়েছিলেন কিন্তু আইন অনুযায়ী তা কেবল পুরোহিতেরা খেতে পারতেন?' (লেবীয় ২৪:৫ -৯)। তা ছিল হারোণ এবং তাঁর ছেলেদের কাছে খুবই পবিত্র এবং (যাত্রা ২৯:৩৩) বাইরের কেউ তা থেকে খেতে পারতো না; তবুও পুরোহিতেরা তা দায়ূদ এবং তাঁর লোকদের খেতে দিয়েছিলেন; কারণ যদিও প্রয়োজনের নিরিখে ঘটনার ব্যতিক্রমের কথা প্রকাশ করা হয় নি তবুও তা এভাবে সেই ক্ষেত্রে এবং সব প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক ধর্মচর্চায় প্রয়োগ হয়েছিল। দায়ূদ যে সেই পবিত্র রুটি খেয়েছিলেন তা কিন্তু তাঁর সম্মান থেকে নয়, কিন্তু কারণ এই, তিনি ছিলেন ক্ষুধার্ত (উষিয় তার মনের অহংকারহেতু সদাপ্রভুর ঘরের পবিত্রতা নষ্ট করেছিলেন, যদিও তিনি একজন রাজা ছিলেন তবুও এর দরুন তিনি কু'রোগে আক্রান্ত হলেন (২ বংশাবলি ২৬:১৬)। মহৎ মানুষেরা তাদের লালসাকে প্রশ্রয় দেন না, কিন্তু যারা ক্ষুদ্র তারা তাদের চাওয়াগুলোকে বিবেচনা করে। ক্ষুধা হচ্ছে স্বাভাবিক মানবীয় প্রবৃত্তি– যা অবদমন করা সম্ভব হয় না কিন্তু তা মেটাতে হয় এবং তা খাবার ছাড়া আর কিছু দিয়ে সম্ভব নয়, সে কারণেই আমরা বলি– ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়। এখন, প্রভুর দেহই হচ্ছে সেই রুটি– যা তিনি আমাদের জন্য উৎসর্গ করতে সম্মত হলেন। ধর্ম-শিক্ষকদের প্রথায় একাত্ম হওয়ার চেয়ে এরকম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হওয়াটা অনেক কঠিন ছিল। মনে রাখুন, যা ঘটনাচক্রে নিরুপায় হয়ে করা হয় তা পুনর্বার করার কোন উপায় নেই। প্রয়োজনের ওপর কোন নিয়ম না থাকলেও এটা কিন্তু অলিখিত নিয়মে দাঁড়িয়ে যায়। 'ক্ষুধার তাড়নায় অতি'হয়ে যে চুরি করে লোকে তাকে ঘৃণার চোখে দেখে না' (হিতোপদেশ ৬:৩০ পদ)।

(খ) তিনি পুরোহিতদের প্রাত্যহিক কাজের প্রসঙ্গ টানলেন– যা করতে ব্যবস্থা নির্দেশ দেয় এবং সেইমতে তার ব্যবহার বিশ্রামবারেও অভিন্ন ছিল (৫ পদ)। পুরোহিতেরা বি-

শ্রামবারে সমাজ-ঘরে তাদের ওপর অর্পিত মহাদায়িত্ব পালন করতেন। উৎসর্গের পশু জবাই করা, ছাল ছাড়ানো, তা পোড়ানো– যা অন্যত্র স্বাভাবিক অবস্থায় বিশ্রামবারের বিরুদ্ধাচরণ বলে গণ্য হচ্ছে; এবং তারপরও একে চতুর্থ আদেশের ব্যত্যয় বলে অভিযুক্ত করা হয় নি, কারণ উপাসনা গৃহের দায়িত্ব একে অনুমোদন এবং বৈধতা দিয়েছিল। তা প্রকাশ করে যে, যে-কাজগুলো আবশ্যকীয় সেসব পরিশ্রমের কাজ বিশ্রামবারে করা যাবে; তবে তা কেবল জীবনধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজই নয়, উপরন্তু এদিনের জন্য নির্ধারিত কাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য– উপাসনায় যোগদানের জন্য মণ্ডলীর ঘণ্টা বাজানো, মণ্ডলীতে যাওয়া ইত্যাদি। সাব্বাথের বিশ্রাম কেবল বসে থাকার জন্য নয় কিন্তু উপাসনাকেন্দ্রিক হওয়ার জন্য।

(২) তিনি তিনটি অব্যর্থ যুক্তি উত্থাপন করে তাঁর শিষ্যদের কাজকে বৈধতা দিলেন:

(ক) এই স্থানে এমন একজন আছেন যিনি মন্দিরের চেয়েও মহান (৬ পদ)। যদি উপাসনা গৃহের দায়িত্ব পুরোহিতদের কাজকে স্বীকৃতি দেয় তবে খ্রীষ্টের দেওয়া দায়িত্ব তাদের কাজকে আরও কত না বেশি বৈধতা দেয়– যা তারা তাঁর সাক্ষাতে করছিলেন। মন্দিরের জন্য যিহূদীদের অন্ধভক্তি ছিল; যে স্থান 'সোনাকে পবিত্রীকৃত করে' সেই স্থানেই স্তিফানকে ঈশ্বরনিন্দার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল (প্রেরিত ৬:১৩); কিন্তু খ্রীষ্ট, যিনি এখন গমক্ষেতে দাঁড়ানো, তিনি ছিলেন মন্দিরের চেয়েও মহান, কারণ তাঁর মধ্যে যে কেবল ঈশ্বরের উপস্থিতি প্রতীকীভাবে ছিল তা নয় উপরন্তু স্বভাবেও তিনি পূর্ণরূপে ঈশ্বর ছিলেন। মনে রাখুন, আমরা যা-ই করি না কেন, যদি তা খ্রীষ্টের নামে করি এবং তাঁর জন্যে করি তা ঈশ্বর প্রাচুর্যপূর্ণভাবে গ্রহণ করেন, সেটা মানুষের দৃষ্টিতে যতই নিয়মের বিরুদ্ধ মনে হোক কিংবা যতই অভিযোগ করুক না কেন।

(খ) ঈশ্বর উৎসর্গ নয় দয়াতে সন্তুষ্ট হন (৭ পদ)। ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতাকে অবশ্যই নৈতিক এবং স্বাভাবিক পথে পরিচালিত করতে হবে, ধর্মীয় পর্যবেক্ষণের নিরিখে সেখানে ভালবাসার অভিজাত আইন এবং আত্মসংবরণের জায়গা থাকা উচিত। একথা উদ্ধৃত হয়েছে হোশেয় ৬:৬ পদ থেকে। মানুষের আত্মার জন্য দয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বোঝাতে ইতোপূর্বে খ্রীষ্ট ৯:১৩ পদে তা উল্লেখ করেছিলেন। আর এখানে তিনি দেহের জন্য দয়ার কথা বোঝাতে তা প্রয়োগ করলেন। সাব্বাথের বিশ্রামকে স্থাপন করা হয়েছিল মানুষের ভাল করার জন্য, তাদের দেহের আনুকূল্যে (দ্বিতীয় বিবরণ ৫:১৪)। কোন নিয়মকে এএভাবে অনুবাদ করা ঠিক নয়– যা কিনা নিজেই নিজেকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। 'আপনারা যদি এই কথার অর্থ বুঝতেন তবে এর দয়াপূর্ণ অবস্থানের বিষয়টিও জানতেন, তবে আপনারা দুঃখ প্রকাশ করতেন যে, তারা তাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য গমের শীষ ছিঁড়তে বাধ্য হয়েছেন। ফলে এভাবে নির্দোষকে অভিযুক্ত করতে পারতেন না। মনে রাখুন, প্রথমত অজ্ঞতা থেকেই আমরা আমাদের ভাইদের কঠিন এবং নির্দয়ভাবে অভিযুক্ত করি। দ্বিতীয়ত, কেবল শাস্ত্র জানাটাই যথেষ্ট নয়; কিন্তু আমাদের অবশ্যই এর অর্থ জানার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। 'যে পড়ে সে বুঝুক'। তৃতীয়ত, শাস্ত্র অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকাটা খুবই লজ্জাজনক বিশেষত তাদের ক্ষেত্রে যারা তা অন্যদের শিক্ষা দেয়।

(গ) মনুষ্যপুত্র এমনকি বিশ্রামবারেরও মনিব (৮ পদ)। বাকি আদেশগুলোর মতো এই আদেশও খ্রীষ্টের হাতে ন্যস্ত হয়েছে, তিনি যেমন ভাল মনে করেন তেমনি তার বিকল্প দাঁড় করাতে, তা সংশোধন করতে এবং প্রয়োগ করতে পারেন। ইনিই সেই পুত্র যাঁর মাধ্যমে

ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তাঁর দ্বারাই তিনি বিশ্রামবারকে নির্দোষিতায় স্থাপন করেছেন। তাঁর মধ্য দিয়ে তিনি সিনাই পাহাড়ে দশ আদেশ দিয়েছিলেন এবং মধ্যস্থ হিসেবে তাঁকে আদেশ সংগঠনের ভার এবং যে পরিবর্তন তিনি উপযুক্ত বিবেচনা করলেন তা করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। তিনি নির্দিষ্ট করে বললেন, তিনিই ছিলেন বিশ্রামবারের মালিক। ফলে বিশ্রামবারের উদ্দেশ্য ও শিক্ষাকে কক্ষপথে ফেরানোর ক্ষমতা তাঁর ছিল, যেন এর মধ্য দিয়ে তা প্রভুর দিন হয়ে ওঠে– প্রভু খ্রীষ্টের দিন। আর খ্রীষ্ট-ই যদি বিশ্রামবারের মনিব হন তবে এই দিনটি এবং এই দিনে করা সব কাজ তাঁর উদ্দেশ্যেই নিবেদন করা হয়। এই ক্ষমতার বলে খ্রীষ্ট এখানে দরকারি কাজকে আইনসিদ্ধ করলেন, যদি তারা প্রকৃতই এরকমটা করে থাকে এবং তা যদি অমূলক অভিনয় কিংবা মেকি না হয়, তবে তা করাটা বিশ্রামবারে আইনসিদ্ধ এবং আদেশের এই ব্যাখ্যা সাধারণভাবে দেখায় যে, তা হবে ধারাবাহিক। ব্যতিক্রম নিয়মকে সিদ্ধ করে।

খ্রীষ্ট এভাবে ফরীশীদের থামিয়ে দিয়েছিলেন এবং তা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন (৯ পদ)– 'তিনি সেই স্থান ত্যাগ করে তাদের সমাজ-ঘরে গেলেন।' এই সমাজগৃহ ছিল ফরীশীদের, যেখানে তাদেরই আধিপত্য ছিল এবং তিনি সেই সময় সেখানে গেলেন যখন তারা তাঁর সাথে একটি বাগযুদ্ধ সম্পন্ন করল। মনে রাখুন, প্রথমত, যা আমাদের পবিত্র নির্দেশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় অথবা আমাদের মন অন্যদিকে নিয়ে যেতে প্ররোচিত করে এবং তাতে উপস্থিত হতে দেরি করিয়ে দেয় তা আমাদের এড়িয়ে চলা উচিত। তাই আসুন আমরা আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করি এবং তাতে শয়তানের কোন কৌশলকে প্রবেশ করতে না দিই, তাতে থমকে না যাই, কারণ শয়তান মানুষের দূষিত অন্তঃকরণের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাতে দ্বন্দ্ব ঢুকিয়ে দিয়ে এবং আরো অনেক ভাবে তাদের বিরক্ত, অশান্ত করে তুলতে চায়। দ্বিতীয়ত, আমরা অবশ্যই ব্যক্তিগত কারণ বা দ্বন্দ্বের জন্য উপাসনায় যোগ দেওয়া থেকে নিবৃত্ত হব না। যদিও ফরীশীরা এরকম নির্দয়ভাবে খ্রীষ্টকে অভিযুক্ত করেছিল তবুও তিনি তাদের সমাজ-ঘরে গেলেন। ভাইদের মাঝে বিভেদ-দ্বন্দ্ব ঢুকিয়ে দিতে পারলে শয়তান সাফল্যের হাসি হাসে। সে তাদের মাঝে এই বিরোধ জিইয়ে রাখতে চায় কিংবা যেকোনও মূল্যে সে মন্দির এবং বিশ্বস্ত সহভাগিতা থেকে তাদের বঞ্চিত করতে চায়।

খ. খ্রীষ্ট এখানে শুকনো-হাতের এক রোগীকে সুস্থ করে দেখালেন যে, বিশ্রামবারে দয়ার কাজ করাটা আইনসঙ্গত, সঠিক। দরকারি কাজটি করেছিলেন শিষ্যেরা এবং তিনি তাদের বৈধতা দিয়েছিলেন; আর এখানে দয়ার কাজটি করলেন তিনি নিজে; আর তাঁর করা দয়ার কাজ তাঁর কাছে ছিল আবশ্যক, দরকারি কাজ; এ কাজ তাঁর কাছে খাবার-পানীয় গ্রহণের মতোই ব্যাপার ছিল। 'আমি প্রচার করব', তিনি বলেন (লূক ৪:৪৩)। এই আরোগ্যকাজ লিপিবদ্ধ হয়েছে মূলত তিনি যে সময়ে সেই কাজটি করেছিলেন তার জন্যে– বিশ্রামবারে।

এখানে, ১. সেই দরিদ্র লোকটি কী প্রকার দুঃখভোগের মাঝে ছিল; তার হাত শুকিয়ে গিয়েছিল। ফলে সে তা দিয়ে কাজ করে খেতে অসমর্থ ছিল। সাধু জেরোম বলেন, মথির লেখা সুসমাচারের হিব্রু সংস্করণে 'নাজারেনাস' এবং 'ইবিয়ুনাটাইস' শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়েছে; তা থেকে বোঝা যায় শুকনো-হাতের সেই লোকটি ছিল একজন রাজমিস্ত্রি। ফলে খ্রীষ্টের কাছে সে নিজেকে সমর্পণ করেছিল এইভাবে, 'প্রভু, আমি একজন রাজমিস্ত্রি এবং

আমি আমার পরিশ্রমে জীবনধারণ করতাম। হে যীশু, আপনার কাছে আমার একটাই চাওয়া– আমাকে আবার কাজ করার জন্য আমার সবল হাত ফিরিয়ে দিন, যেন খাবারের জন্য আমাকে ভিক্ষে করতে না হয়।' এই দরিদ্র লোকটি সমাজ-ঘরে ছিল। মনে রাখুন, সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও যারা পৃথিবীর জন্য অল্প করে কিংবা যারা পৃথিবীর জন্য করার জন্য অল্পই সামর্থ্যবান হয় তারা অবশ্যই তাদের আত্মার জন্য অনেক বেশি করবে– যেভাবে ধনী, বয়স্ক কিংবা দুর্বলরা করে থাকে।

২. ফরীশীরা এই ব্যক্তির আলোকে খ্রীষ্টকে একটি ঘৃণার্হ প্রশ্ন করল। তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'তাকে সুস্থ করাটা কি আইনসিদ্ধ?' আমরা এখানে দেখি না যে সেই লোকটি খ্রীষ্টকে সুস্থতার জন্য কোন সম্বোধন করেছিল; কিন্তু তারা লক্ষ্য করেছিল খ্রীষ্ট তাঁর দিকে দৃষ্টি দিতে শুরু করেছেন এবং তারা জানতো যারা তাঁর কাছে চায় না কিন্তু তাঁকে তাদের প্রয়োজন তাদের খুঁজে পাওয়াটা খ্রীষ্টের কাছে খুবই সাধারণ একটি ব্যাপার। সে কারণেই খারাপ স্বভাবের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তারা তাঁর ভালত্ব দেখতে পাবার বিষয়টি অনুমান করেছিল এবং সেই ভাল কাজের পথকে রুদ্ধ করার চেষ্টায় উদ্যত হল– 'বি-শ্রামবারে কাউকে সুস্থ করা কি আইনসিদ্ধ?' মানে চিকিৎসক সেই দিনে রোগীকে সুস্থ করবেন কিনা সে বিষয়ে তাদের বইতে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া হয় নি; কেউ একে পুরানো সংশয় বলে ভাবতে পারেন যে, 'ভাববাদীদের পক্ষে কাউকে সুস্থ করা আইনসিদ্ধ'। তাঁর জন্য এটা আইনসিদ্ধ যিনি তাঁর সর্বপ্রকার কাজে ভালত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং যিনি নিজেকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলে প্রকাশ করেছেন।

কেউ কি কখনও এমন প্রশ্ন তুলেছে যে, 'ঈশ্বরের পক্ষে কাউকে সুস্থ করাটা, তাঁর কথা দ্বারা কাউকে সুস্থ করা কি আইনসিদ্ধ?' এটা সত্য, খ্রীষ্ট এখন ব্যবস্থার অধীনে রয়েছেন– এর প্রতি স্বেচ্ছাসেবী নিবেদনের মাধ্যমে কিন্তু তিনি কখনও পূর্বপুরুষদের গড়া নিয়মের অধীনে ছিলেন না। 'কাউকে সুস্থ করাটা কি আইনসিদ্ধ?' কোন কাজ সংঘটিত হলে তাতে আইনি সিদ্ধতা কিংবা তাতে বেআইনি কিছু করা হল কি না তা খোঁজাটা স্বাভাবিক। তবে সিদ্ধতা অনুসন্ধানে আমরা খ্রীষ্ট ছাড়া আর কোন কিছুর প্রতিই নিজেদের সমর্পণ করতে পারি না। কিন্তু তারা এখানে তাঁর কাজটি 'আইনসিদ্ধ' কি না জিজ্ঞেস করে বসল; এমন নয় যে, তারা তাঁর কাছ থেকে নির্দেশনা পেয়েছিল কিন্তু যেহেতু তারা তাঁকে দোষী করতে আগ্রহী ছিল সেহেতু এরকম প্রশ্ন উত্থাপন করল। তিনি যদি এ স্থলে বলতেন যে, বি-শ্রামবারে কাউকে সুস্থ করাটা আইনসিদ্ধ তবে তারা তাঁকে অভিযুক্ত করার সুযোগ পেয়ে যেত যে, তিনি এর সাথে দ্বন্দ্ব তৈরি করছেন। বিশ্রামবার প্রসঙ্গে ফরীশীদের ভ্রান্ত সংস্কার এমন চরমে উঠেছিল যে, জীবন যদি মারাত্মক ঝুঁকির মাঝে পড়ে না যায় তবে তারা এদিন কোন প্রকার স্বাস্থ্যসেবাও (মেডিকেল ট্রিটমেন্ট) গ্রহণ করতো না। আবার তিনি যদি বলতেন যে, বিশ্রামবারে কাউকে সুস্থ করা নিয়মবিরুদ্ধ তবে তারা তাঁর শিষ্যদের গমশীষ ছেঁড়ার প্রসঙ্গ এনে তাঁর মাঝে স্ববিরোধিতা রয়েছে এমন অভিযোগ দায়ের করতো।

৩. খ্রীষ্ট এই প্রশ্নের উত্তর করলেন তাদের আবেদনের ধরন দেখে এবং তাদের নিজেদের মতামত এবং চর্চাকে উদ্ধৃত করে (১১, ১২ পদ)। 'যদি দুর্ঘটনাক্রমে একটি ভেড়া বিশ্রামবারে (যদিও একটি তবুও কেউ কি সেটাও হারাতে চায়?) গর্তে পড়ে যায়, তবে কি তাকে বের করে আনবেন না?' সন্দেহ নেই তারা তা করতো, চতুর্থ আদেশ একে সমর্থন করে; তারা অবশ্যই তা করবে কারণ একজন দয়াবান মানুষ তার পশুর জীবনকে

মূল্যবান জ্ঞান করেন এবং তাদের নিজেদের স্বার্থে তারা তা করেন, তা না হলে একটা ভেড়া হারাতে হয় যে! খ্রীষ্ট কি ভেড়ার যত্ন নেন? হ্যাঁ, তিনি তা করেন, তিনি মানুষ এবং পশু উভয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। কিন্তু এখানে তিনি আমাদের বিষয়ে বললেন (১ করিন্থীয় ৯:৯, ১০) এবং এখানে তারই সমর্থন মেলে, 'তাহলে একজন মানুষ একটি ভেড়ার চেয়ে কি অধিক মূল্যবান নয়?' ভেড়া কেবল নরম স্বভাবেরই নয় উপরন্তু উপকারী প্রাণী এবং সেকারণে এর জন্য মনিবের এত দরদ থাকে, তবুও একজন মানুষ তাদের কাছে ভেড়ার চেয়েও কম মূল্যবান ছিল। মনে রাখুন, মানুষের তার নিজ জাতির প্রতি সম্মান থাকাটা খুবই কার্যকর এবং মূল্যবান বলে বিবেচিত হয় আর সেটা পশুজাতীয় প্রাণীর চেয়ে বেশি আকারে; মানুষ হচ্ছে মূল্যবান সৃষ্টি, তার ঈশ্বরকে জানা, বোঝা, ভালবাসা এবং গৌরবান্বিত করার জ্ঞান আছে এবং সে কারণেই সে একটি ভেড়ার চেয়ে মূল্যবান। সে কারণেই একটি ভেড়ার প্রাণ কোনমতেই আত্মার পাপের ক্ষতিপূরণ হতে পারে না। যারা জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত তারা দরিদ্রদের কিংবা হতে পারে তাদের পরিবারের কারও অভাবের দিকে তাকানোর চেয়ে তাদের কুকুর-ঘোড়ার খাবার জোগাতে, তাদের সুরক্ষা দিতে তৎপর থাকেন। এ যে কত বড় মূর্খতা তা তারা বোঝেন না।

এখানে খ্রীষ্ট সত্য প্রকাশ করলেন যা এমনকি প্রথম দর্শনে প্রয়োজনীয় এবং ভাল প্রকৃতির বলে মনে হয় যে, বিশ্রামবারে ভাল কাজ করা যাবে; তারা প্রশ্ন করেছিল, 'কাউকে সুস্থ করা কি আইনসিদ্ধ?' কিন্তু খ্রীষ্ট প্রমাণ করলেন যে, ভাল কাজ করাটা আইনসিদ্ধ এবং এখন কেউ বিচার করুক খ্রীষ্ট যে আরোগ্য কাজ করবেন তা ভাল কাজ কি না। মনে রাখুন, ঈশ্বরের সাথে উপাসনায় সময় কাটানোর কাজের চেয়েও অনেকভাবে বিশ্রামবারে ভাল কাজ করা যায়; রোগীদের নিয়ে আসা, দরিদ্রকে মুক্তি দেওয়া, যারা আকস্মিক সমস্যায় পড়ে গেছে তাদের সাহায্য করা এবং তরিৎ সাহায্যের জন্য বিনতি জানাচ্ছে তাদের সাড়া দেওয়ার মাধ্যমেও এই ভালটা করা যায়: এবং তা অবশ্যই ভালবাসা ও দয়ার মূল নীতি অনুসরণ করে করতে হবে, তার সাথে বিনম্রতা এবং নামসর্বস্বতাহীনতা এবং আত্মার স্বর্গীয় আবরণে করতে হবে এবং এই ভাল কাজ অবশ্যই গৃহীত হবে (আদি ৪:৭)।

৪. খ্রীষ্টের সেই লোকটিকে সুস্থ করা ফরীশীদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে থমকে যায় নি, যদিও খ্রীষ্ট আগে থেকেই ফরীশীরা কী করতে যাচ্ছে সে বিষয়ে জানতেন (১৩ পদ)। যদিও তারা খ্রীষ্টের যুক্তির প্রত্যুত্তর করতে পারে নি তবুও তারা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধাচারণ এবং তাদের বিবেচনায় তাকে অভিযুক্ত করা চালিয়ে যেতে মনস্থ করল; কিন্তু খ্রীষ্ট তা সত্ত্বেও তাঁর কাজ চালিয়ে গেলেন। মনে রাখুন, অভিযুক্ত হবার ভয়ে কোন কাজই ফেলে রাখা কিংবা ভাল কাজের সুযোগকে হেলা করা ঠিক না। এখন এই আরোগ্যকাজের প্রকৃতিটি পর্যবেক্ষণ করুন; তিনি লোকটিকে বললেন, 'যতটা পার তোমার শক্তিমতো হাত বাড়িয়ে দাও' এবং সে ঠিক তাই করেছিল এবং এটাই হচ্ছে মূল কথা। খ্রীষ্টের অন্যান্য আরোগ্যকাজের মতো এটাতেও আত্মিক অর্থবোধকতা রয়েছে।

(১) স্বভাবের কারণে আমাদের হাত শুকনো, আমরা নিজেরা ভাল কিছু করার অযোগ্য।

(২) একমাত্র খ্রীষ্টই তাঁর অনুগ্রহের শক্তিতে আমাদের এই রোগ দূর করতে পারেন; তিনি মৃত আত্মায় জীবন প্রবেশ করিয়ে আমাদের শুকনো হাতকে ভাল কিছু ভাবতে এবং করতে যোগ্য করে তোলেন।

(৩) আরোগ্য করতে তিনি যে নির্দেশ দেন, 'তোমার হাত বাড়িয়ে দাও' তা আমাদের স্বাভাবিক ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় এবং তা আমরা যতটা পারি তা করতে সাহায্য করে, সেগুলোকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে মেলে ধরার মাধ্যমে, তা মেলে ধরে খ্রীষ্টে বিশ্বাসে শক্ত অবস্থান তৈরিতে এবং এই বাড়িয়ে দেওয়া পবিত্র অভিপ্রায় ও কাজের জন্যই। এখন এই মানুষটি নিজে নিজে তার হাত বাড়িয়ে দিতে সক্ষম ছিল না, যেভাবে দুর্বল মানুষ তার খাট তুলে বহন করে নিয়ে যেতে পারে না, লাসার তার কবর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে না, তবুও খ্রীষ্ট তাকে তা করতে বললেন। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ পালনে আমরা নিজেরা যা দুর্বল তা কোন বিমূর্ত, অবাক করা ব্যাপার নয়, কিন্তু সেই শুকনো হাত লোকটির প্রতি তাঁর যে আদেশটি ছিল সেটি সত্যিই বিস্ময়ের, 'তোমার হাত বাড়িয়ে দাও'। কারণ এই আদেশের মাধ্যমে অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি ধ্বনিত হয়েছিল, 'আমার আদেশে কান দিলে আমি তোমার উপর আমার আত্মা ঢেলে দেব' (হিতোপদেশ ১:২৩)। মৃতরা যেমন ক্ষমার উর্ধ্বে চলে যায় তেমনি এই লোকটিও যেত যদি না খ্রীষ্টের কথা শুনে হাত বাড়িয়ে দিত এবং সেভাবে সে সুস্থও হতো না। কিন্তু যারা রক্ষা পেয়েছে তাদের আরোগ্য লাভের ক্ষেত্রে নিজেদের যৎসামান্য অবদানের কথা ভেবে এই লোকটির মতো গর্ব করার কিছু নেই, কারণ তারা কেবল হাতই বাড়িয়ে দিয়েছে কিন্তু খ্রীষ্টের অনুগ্রহের শক্তিই তাদের সুস্থ করেছে। তাই তাদের ঋণী থাকা উচিত খ্রীষ্টের এই অনুগ্রহের ক্ষমতার কাছে যেমনটা তিনি ছিলেন।

মথি ১২:১৪-২১

খ্রীষ্টের মহৎ বিনম্রতার কেন্দ্রে যেভাবে তাঁর মহিমার প্রমাণ রয়েছে সেভাবে তাঁর মহাসম্মানের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর বিনম্রতার প্রমাণ দিলেন এবং যখন তাঁর করা ক্ষমতাপূর্ণ কাজগুলো তাঁর সামনে বিশেষ জন হয়ে ওঠার সুযোগ এনে দিল তখন তিনি নিজেকে দেখালেন এমন একজন হিসেবে যার কোন নাম-যশ নেই, যিনি নিঃস্ব। এখানে আমরা দেখি,

ক. ফরীশীরা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে যে অভিশপ্ত ঘৃণার্হ আচরণ করল (১৪ পদ); খ্রীষ্টের কাজ দেখে এবং তাঁর সাথে যুক্তিতে না পেরে তারা চলে গেল এবং তার বিরুদ্ধে একটি মন্ত্রণাসভা করল যে, কীভাবে তাঁকে মেরে ফেলা যায়। এ থেকে বোঝা যায় তাদের ক্রোধ কতটা চরমে উঠেছিল, কেবল তা-ই নয় তাঁর চিহ্ন-কাজ এবং তাঁর সম্মান তাদের ঔদ্ধত্যকে ঢেকে দিয়েছিল, কিন্তু তিনি যে শিক্ষা দিতেন তা সরাসরি তাদের গর্ব, ভণ্ডামি এবং বৈষয়িকতার বিরুদ্ধে ছিল; তবুও তারা ভান করতে লাগল যে, খ্রীষ্ট বিশ্রামবারের নিয়ম ভাঙায় তারা ক্ষুব্ধ হয়েছে, যা নিয়মের ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের অপরাধ (যাত্রা ৩৫:২ পদ) বলে স্বীকৃত। মনে রাখুন, মিথ্যে ছল-চাতুরি করে জঘন্য কর্মকে আড়াল করে রাখাটা নতুন কিছু নয়। তাদের কৌশলটি লক্ষ্য করুন, তারা এ নিয়ে একটি মন্ত্রণাসভা ডাকল, নিজেদের মাঝে আলোচনা করল যে কীভাবে তা কার্যকর করা যায়, তারা সবাই যূথবদ্ধভাবে এ বিষয়ে এক হয়ে গেল, এই মন্ত্রণাসভাকেও তারা এর জন্যে ব্যবহার করল যেন তারা উভয়ে একে অন্যকে চাপ দিতে এবং সাহায্য করতে পারে। তাদের নির্দয়তার প্রতি লক্ষ্য করুন, তারা মন্ত্রণাসভা ডাকল তাঁকে জেলে দেবার কিংবা নির্বাসিত করার জন্য

নয়, কিন্তু তাঁকে একেবারে মেরে ফেলার জন্য, যিনি আমাদের জীবন দেবার জন্য এসেছেন তাঁকে মেরে ফেলার জন্য! আমাদের প্রভু খ্রীষ্টের ওপর কতটা অসম্মান এখানে লেপন করা হল!

খ. এর প্রেক্ষিতে খ্রীষ্টের আত্মগোপন এবং বিপদকে এড়ানোর জন্য যে আড়াল বেছে নিলেন তবে তা তার কাজ থামিয়ে দেওয়ার জন্য নয়; কারণ তার সময় তখনও আসে নি (১৫ পদ), তিনি নিজেকে সেখান থেকে গুটিয়ে নিলেন। তিনি নিজেকে আশ্চর্য উপায়ে নিরাপদ করতে পারতেন কিন্তু তিনি তা না করে সাধারণ পথে সেখান থেকে চলে গেলেন এবং অবসর নিলেন, কারণ এর মধ্য দিয়ে যেভাবে অন্য কিছুর মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের প্রকৃতির পাপমুক্ত দুর্বলতার কাছে নিজেকে সমর্পণ করলেন। এখানে তিনি নিজেকে বিনম্র করলেন যে, তিনি এসেছিলেন সাধারণের বেশে যারা অসহায় তাদের জন্য; এভাবেও তিনি তার নিজ শিক্ষার একটি উদাহরণ রাখলেন, যখন তোমরা নির্যাতিত হবে তখন অন্যত্র চলে যেয়ো। খ্রীষ্ট ফরীশীদের বোঝানোর জন্য তাঁর কথা ও কাজে এক ছিলেন, তিনি সবটাতেই দৃষ্টান্ত রেখেছেন, যদি কারণ অথবা চিহ্ন কাজ তা করতে পারে; কিন্তু এই নিশ্চয়তায় বিশ্বাস স্থাপনের পরিবর্তে তারা কেবল কঠিনতর ক্ষুব্ধই হতে লাগল এবং সে কারণেই তিনি তাদের নিরাময় অযোগ্য করে ছেড়ে গেলেন (যিরমিয় ৫১:৯)।

খ্রীষ্ট তা তাঁর আরামের জন্য করলেন না, তাঁর কাজ থেকে অব্যাহতি নেওয়ার জন্য কোন অজুহাত দাঁড় করালেন না, তাঁর অবসর ভরে গিয়েছিল কাজের ব্যস্ততায় এবং তিনি তখনও ভাল কাজ করে যাচ্ছিলেন যখন তাকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হল। এভাবে তিনি তাঁর সেবাকারীদের কাছে একটি উদাহরণ স্থাপন করলেন যেন তারা তাদের সাধ্যমতো কাজ করে যায় যখন তারা তাদের প্রয়োজন মতো কাজ করার সুযোগবঞ্চিত হয় এবং শিক্ষাদান চালিয়ে যেতে পারে না এমনকি যখন তারা কোনঠাসা হয়ে পড়ে। যখন ফরীশীরা, দেশের মহান অধিপতি এবং চিকিৎসকেরা সেখান থেকে খ্রীষ্টকে তাঁর কাজ গুটিয়ে নিতে বাধ্য করল, তখনও সাধারণ লোকেরা খ্রীষ্টের পেছনে ভিড় করে গেল; 'বহু লোক তাঁকে অনুসরণ করে গেল' এবং তাঁকে খুঁজে বের করল। একে অনেকে তাঁর সমালোচনার জন্য ধরেন এবং তাঁকে উচ্ছৃঙ্খল জনসমাজের নেতৃত্বদানকারী বলে অভিহিত করে। কিন্তু আসলে তা ছিল তাঁর জন্য পরম সম্মানের যে, এই লোকেরা যারা নিরপেক্ষভাবে জাগতিক প্রদর্শনীতে অন্ধ না হয়ে আন্তরিকভাবে তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল যে তারা তিনি যেখানে যাবেন সেখানে যেতে উদ্যত হয়েছিল এবং তাঁর সাথে চলতে গিয়ে যা-ই বিপদ আসুক না কেন তা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল; অনুরূপভাবে এটা তাঁর অনুগ্রহের জন্যও ছিল পরম সম্মানের যে দরিদ্ররা তাঁকে গ্রহণ করে মন পরিবর্তন করছিল এবং তিনিও তাদের সবাইকে গ্রহণ করছিলেন, সুস্থ করছিলেন। তারা তাকে অভিযুক্তও করে নি। খ্রীষ্ট পৃথিবীতে এসেছিলেন চিকিৎসকশিরোমণি হয়ে, যেভাবে অনুন্নত বিশ্বে সূর্য দেখা যায়, সেভাবে তার ডানার নিচে সবাই সুস্থ হল। যদিও ফরীশীরা ভাল কাজের জন্য নিপীড়ন করেছিলেন তবুও তিনি তা থামিয়ে দিলেন না এবং লোকদের তাদের শাসকদের খারাপির জন্য শাস্তি দিলেন না। মনে রাখুন, যদিও আমাদের প্রতি কেউ কেউ নির্দয় আচরণ করে তবুও আমরা কাউকে দয়া দেখাতে দ্বিরুক্তি করব না।

খ্রীষ্ট তাঁর কাজের গোপনীয়তা বজায় রাখতে চাইলেন; তিনি তাদের সবাইকে সুস্থ করলেন তবে (১৬ পদ) তাদের সতর্ক করে দিলেন যেন এ বিষয় তারা কাউকে না জানান;

এই কাজকে দেখা যায়,

১. সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে; লোকে যত চিহ্ন-কাজ দেখত তার চেয়ে বেশি রটাতো আর এটাই ফরীশীদের ক্ষেপিয়ে তুলত (২৩, ২৪); সে কারণেই খ্রীষ্ট যদিও ভাল কাজ করা বন্ধ করেন নি তবুও তিনি যতটা সম্ভব গোপনীয়তার মধ্যে করতে চাইলেন, যেন তাদের অভিযোগ এবং তাদের কাছ থেকে আসা বিপদ এড়ানো যায়। মনে রাখুন, ভাল এবং জ্ঞানী জনেরা যদিও ভাল কাজ করতে আকাঙ্ক্ষী হন কিন্তু সেই কাজের প্রচার পেতে উৎসাহ দেখান না; কারণ তা ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্যতা তুলে ধরে, মানুষের করতালি নয় যার দিকে তাদের লক্ষ্য থাকে। দুঃখভোগের সময়ে যদিও আমরা সাহসিকতার সাথে আমাদের কাজ চালিয়ে যাব তবুও আমরা অবশ্যই আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করব যেন তা আয়ত্তের বাইরে চলে না যায়, এর ফলে যারা আমাদের বিরুদ্ধাচরণের সুযোগ খোঁজে তারা যেন সুবিধে করতে না পারে। মনে রাখতে হবে যে, অপ্রয়োজনীয় সাহসিকতা দেখানোটা ভাল ফল বয়ে আনে না। আমাদেরকে এ স্থলে সাপের মতো সতর্ক হতে হবে (১০:১৬)।

২. ফরীশীদের ক্ষেত্রে ধার্মিকতার বিচারের কাজ হিসেবে যেন তা দেখা যায়; যারা তাঁর চিহ্ন-কাজের বিষয়ে ন্যূন কথাও শোনার যোগ্য ছিল না; তারা যা দেখেছিল তা তারা হালকা করে ফেলেছিল। সেই আলো দেখতে না চেয়ে তারা নিজেদের চোখ বন্ধ করে রেখেছিল; তাদের কাছ থেকে এর দরুন উপকৃত হবার সুযোগ ছিনিয়ে নেওয়া হল।

৩. বিনম্রতা ও আত্মসংবরণের কাজ হিসেবে। যদি খ্রীষ্টের চিহ্ন-কাজগুলোর উদ্দেশ্য ছিল নিজেকে খ্রীষ্ট বলে প্রমাণ করা এবং লোকদের কাছে নিজেকে বিশ্বাস্য করে তোলা, সেই নির্দেশ বলে যা তারা অবশ্যই জানবে তবুও কখনও কখনও তিনি লোকদের তাঁর পরিচয় নিয়ে বলার ক্ষেত্রে চুপ করিয়ে রাখলেন, যেন আমাদের জন্য তা বিনম্রতার উদাহরণ হয় এবং আমরা আমাদের ভাল বিষয়গুলো এবং তার কার্যকারিতার কথা ঘোষণা না করি অথবা তা সবাই জানবে এই প্রত্যাশাও না করি সেই শিক্ষা লাভ করি। খ্রীষ্ট চান তাঁর অনুসারীরা সেই সমস্ত লোকদের চেয়ে সম্পূর্ণ বিপরীতে হাঁটুক যারা লোকের প্রশংসা পাবার জন্য কাজ করে।

গ. এর মধ্য দিয়ে শাস্ত্রের কথা পূর্ণতা পেল (১৭ পদ)। খ্রীষ্ট অবসর নিয়ে নির্জনে-আড়ালে চলে গেলেন। এতে করে যদিও তিনি নিভৃতে চলে গেলেন তবুও এর মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের বাক্য পূর্ণ হল এবং তা অনেক গৌরবের সাথে বর্ণাঢ্যভাবে, যার মধ্যে তাঁর মন পড়ে ছিল। এখানে শাস্ত্রের যে অংশের উদ্ধৃতি টানা হয়েছে তা আছে যিশাইয় ৪২:১-৪ পদে, যা এখানে ১৮-২১ পদে বড় পরিসরে উদ্ধৃত হয়েছে। এই সুযোগ দেখায় যে, তা কতটা দয়ায় ও নীরবে সফল হল, আমাদের প্রভু যীশু তাঁর কাজ ও ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা যা আগের প্যাসেজে দেখি তা সফল হল। লক্ষ্য করুন,

১. পিতার সাথে খ্রীষ্টের কতটা ঘনিষ্ঠ তা রয়েছে (১৮ পদ), 'দেখ, আমার সেবাকারী যাঁকে আমি মনোনীত করেছি, তিনিই আমার প্রিয়জন যাঁর উপর আমি আমার আত্মা ঢেলে দেব। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি,

(১) আমাদের ত্রাণকর্তা ছিলেন ঈশ্বরের সেবাকারী– যিনি আমাদের পুনরুদ্ধারের মহান কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি নিজেকে পিতার ইচ্ছার অধীন করেছেন (ইব্রীয় ১০:৭) এবং নিজেকে তাঁর পিতার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজে ব্যাপৃত করেছিলেন; তাঁকে গৌরবান্বিত করার জন্য তিনি নিজেকে তাঁর অনুগ্রহের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিবেদন

করেছিলেন। মানুষের পাপের কারণে যে সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল তা পুনঃস্থাপনে তিনি নিজেকে এর অধীন করলেন। সেবাকারী হিসেবে তাঁকে মহান কাজের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁর প্রতি গভীর আস্থা স্থাপন করা হয়েছিল। এটা তাঁর বিনম্রতার একটি অংশ– যদিও তিনি ঈশ্বরের সমান হওয়াকে চুরি বলে ভাবেননি, তবুও আমাদের পরিত্রাণদানের কাজে তিনি সেবাকারী হলেন, একটি নিয়ম গ্রহণ করলেন এবং সেই চুক্তির অধীনে কাজ করতে আসলেন। যদিও তিনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন তবুও তিনি বাধ্যতা শিখলেন (ইব্রীয় ৫:৮ পদ)। এই রাজপুত্রের মূল সুরই যেন ছিল 'আমি সেবা দিই'।

(২) যীশু খ্রীষ্ট ছিল ঈশ্বরের মনোনীত জন, আমাদের সাথে তাঁর সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের ব্যবস্থাপনায় সবচেয়ে যোগ্য ও সঠিক লোক। তিনি আমার সেবাকারী যাকে আমি মনোনীত করেছি, সমান কাজের ভার দিয়ে। আর কেউ নয় কেবল তিনিই সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের কাজে যোগ্য ছিলেন অথবা পুনরুদ্ধারকারীর ব্যাজ পরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি। তিনি লোকদের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া একজন (গীত ৮৯:১৯), তাকে বেছে নেওয়া হয়েছে অসীম জ্ঞান দ্বারা সেই কাজের পর্বের এবং সম্মানের জন্য, কারণ এ কাজে কোন মানুষ কিংবা স্বর্গদূত যোগ্য ছিল না, কেউই নয় কেবল খ্রীষ্টই সবদিক দিয়ে উচ্চ যোগ্যতা সম্পন্ন ছিলেন। খ্রীষ্ট নিজেকে এই কাজের জন্য আহ্বান করেন নি কিন্তু তাকে এর জন্য যথার্থতার সাথে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল। ঈশ্বরের মনোনীত জন হিসেবে অন্যদের বেছে নেবার জন্য খ্রীষ্ট নির্বাচন কমিশনার হলেন, কারণ আমারা তাঁরই বেছে নেওয়া লোক (ইফিষীয় ১:৪)।

(৩) যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের প্রিয়ভাজন, তাঁর প্রিয়তম পুত্র; ঈশ্বর হিসেবে তিনি শুরু থেকেই তাঁর সঙ্গে ছিলেন (যোহন ১:১৮); তিনি ছিলেন তাঁর প্রতিদিনের হাসি (হিতোপদেশ ৮:৩০); পিতা ও পুত্রের মাঝে সবসময়ের জন্য অচিন্তনীয় আন্তঃযোগাযোগ ভালবাসার বিনিময় ছিল এবং এভাবে তিনি সৃষ্টির শুরু থেকেই তাঁর সান্নিধ্যে আছেন (হিতোপদেশ ৮:২২)। মধ্যস্থ হিসেবে পিতা তাঁকে ভালবাসেন, পিতার ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি প্রাণ দিলেন এবং সে কারণেই পিতা তাঁকে ভালবাসেন (যোহন ১০:১৭)।

(৪) যীশু খ্রীষ্ট এমন একজন যাঁর ওপর পিতা খুবই সন্তুষ্ট, যাঁর উপর তাঁর আত্মা সন্তুষ্ট যা সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সন্তুষ্টির কথাই প্রকাশ করে। ঈশ্বর স্বর্গ থেকে আওয়াজের মাধ্যমে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি ছিলেন তাঁর প্রিয়তম পুত্র যাঁর ওপর তিনি খুবই প্রীত, খুবই সন্তুষ্ট কারণ তিনি ঈশ্বরের জন্য সেই কাজটি করতে প্রস্তুত ছিলেন যে কাজের জন্য তাঁর মন পড়ে ছিল এবং তিনি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন কারণ তিনি আমাদের প্রিয়ভাজন করে গ্রহণ করেছেন (ইফিষীয় ১:৬)। পতিত মানুষ ঈশ্বরের কাছে যত দাবি আকাঙ্ক্ষা জানাতে পারে তা তাঁর প্রিয়ভাজন যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে সম্পূর্ণতা পেতে যাচ্ছে; কারণ তাঁর মধ্য দিয়ে না গেলে কেউ পিতার কাছে যেতে পারে না (যোহন ১৪:৬)।

২. দু'টি বিষয়ে তাঁর পিতার প্রতিশ্রুতি।

(১) তিনি সবক্ষেত্রেই যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়ায় পিতা তাঁর ভেতর তাঁর আত্মা ঢেলে দেবেন, 'আমি তাঁর মধ্যে আমার আত্মা ঢেলে দেব'; সেই আত্মা হচ্ছে বিজ্ঞতা এবং পরামর্শের আত্মা (যিশাইয় ১১:২, ৩)। ঈশ্বর যাদের কোন কাজের জন্য আহ্বান করেন তখন বুঝতে হবে তিনি সেই কাজের জন্য যোগ্য এবং উপযুক্ত এবং এর মধ্য দিয়ে দেখা যাবে যে তিনি তাদের এর প্রতি আহ্বান জানান, মোশির মতো (যাত্রা ৪:১২)। খ্রীষ্ট ঈশ্বর

হিসেবে পিতার সমান ক্ষমতা ও গৌরবের অধিকারী ছিলেন; মধ্যস্থ হিসেবে তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে ক্ষমতা ও গৌরব গ্রহণ করলেন এবং তিনি তা গ্রহণ করলেন যেন তা দিতে পারেন এবং পিতা তাকে সব কিছুর উপর যে ক্ষমতা দিয়েছিলেন তা তাঁর কর্মভারের যোগ্যতা প্রকাশ করে, তা এখানেই সারকথা হিসেবে প্রকাশিত হল, তিনি তাঁর ওপর তাঁর আত্মা ঢেলে দিলেন; এটা হচ্ছে আনন্দের তেল যা তিনি তাঁর ওপর তাঁর সঙ্গীদের চেয়ে অনেক বেশি করে ঢেলে দিলেন (ইব্রীয় ১:৯)। তিনি আত্মা গ্রহণ করলেন তা মেপে নয়, বরং কোন পরিমাপ ছাড়াই (যোহন ৩:৩৪)। মনে রাখুন, খ্রীষ্টকে যারাই গ্রহণ করবেন, ঈশ্বর যাকে বেছে নিয়েছেন, যাঁর উপর তিনি সন্তুষ্ট হন তিনি নিশ্চিতভাবেই তাঁর আত্মা তাদের উপর ঢেলে দেবেন। তিনি যেখানে তাঁর ভালবাসা প্রকাশ করেন সেখানে তাঁর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে।

(২) তিনি তাঁর বিবেচনায় অভাবনীয় সাফল্য লাভ করবেন। ঈশ্বর যাদের পাঠান তিনি তাদের নিজের করে নেন। অনেক আগে আমাদের প্রভুর কাছে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, তাঁর দ্বারাই সদাপ্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ হবে (যিশাইয় ৫৩:১০)। এখানে আমরা সেই ইচ্ছের উন্নতি সাধিত হতে দেখি।

(ক) তিনি অযিহূদীদের কাছে ন্যায়বিচার তুলে ধরবেন। খ্রীষ্ট ব্যক্তিগতভাবে অবিশ্বাসী রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী মানুষের কাছে প্রচার করেছিলেন (দেখুন মার্ক ৩:৬-৮ পদ) এবং তাঁর শিষ্যেরা তাঁর সুসমাচার প্রচার করেছিলেন, যাকে এখানে বলা হয়েছে ন্যায়বিচার, তা অযিহূদী বিশ্বের কাছে। পরিত্রাণের পথ এবং প্রক্রিয়া, ন্যায়বিচার যা পুত্রের কাছে ন্যাস্ত হয়েছে তা কেবল আমাদের মহাপুরোহিত হিসেবে সম্পন্ন করলেন না উপরন্তু একজন মহান ভাববাদী হিসেবে তা তাঁর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত ও প্রচারিত হল। সুসমাচার, অনুশীলন ও আচরণের নিয়ম হিসেবে, যার প্রত্যক্ষ প্রবণতা হচ্ছে মানুষের জীবন ও হৃদয়কে নতুন রূপ দেয়, ভাল করে তা অযিহূদীদের কাছে প্রচার করা হবে। ঈশ্বরের ন্যায়বিচার যিহূদীদের কাছে অদ্ভুত ঠেকেছিল (গীত ১৪৭:১৯) কিন্তু তা প্রায়ই পুরাতন নিয়মে ভাববাদীদের মুখ দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে সেগুলো অযিহূদীদের কাছে প্রকাশিত হবে; সে কারণেই তা অবিশ্বাসী যিহূদীদের অসন্তুষ্টির কারণ হয়েছিল; এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

(খ) তাঁর নামে অযিহূদীরা আস্থা রাখবে (২১ পদ)। তিনি অযিহূদীদের কাছে ন্যায়বিচার তুলে ধরলে তারা তার প্রতি মনোযোগী হবে এবং তা পর্যবেক্ষণ করবে। ফলে তারা তাতে আশ্বস্ত হয়ে তাঁর প্রতি ফিরবে, নিজেদের তাঁর কাছে নিবেদন করবে এবং সেই ন্যায়বিচারের অধীনে চলবে। মনে রাখুন, সুসমাচারের মহাপরিকল্পনা হচ্ছে লোকদের তাঁর নামে আস্থা রাখতে নিয়ে আসা, তাঁর নামে– যীশু খ্রীষ্টের নামে, একজন পরিত্রাণকর্তা, যে অনন্য নামে তাঁকে অভিহিত করা হয়েছে এবং যাঁর ভেতর ঈশ্বর তাঁর আত্মা ঢেলে দিয়েছেন; তিনি আমাদের ধার্মিকতার প্রভু। সুসমাচারলেখক এখানে সেপ্টুয়াজিন্টকে অনুসরণ করেছেন (কিংবা হতে পারে সেপ্টুয়াজিন্টের সর্বশেষ সংস্করণটি সুসমাচার-লেখককে অনুসরণ করেছে); হিব্রু হচ্ছে (যিশাইয় ৪২:৪), দ্বীপগুলো (আইল) তাঁর আদেশের জন্য অপেক্ষা করবে। অযিহূদীদের দ্বীপগুলোর কথা বলা হয়েছে (আদি ১০:৫) মূলত ইয়াফসের বংশধরদের বিষয়ে; তাঁর বিষয়ে একথা বলা হয়েছিল (আদি ৯:২৭), 'ঈশ্বর এমন করবেন, যেফৎ শেমের তাঁবুতে বাস করছে'। যা এখন পূর্ণ হতে যাচ্ছে, যখন সেই দ্বীপগুলো (ভাববাদীর কথানুযায়ী), অযিহূদীরা (সুসমাচার-লেখকের ভাষ্য) তাঁর

আদেশের জন্য অপেক্ষা করবে এবং তাঁর নামে আস্থা রাখবে: দু'টোকে তুলনা করুন এবং লক্ষ্য করুন যে তারা এবং কেবল তারা আত্মবিশ্বাসের সাথে খ্রীষ্টের নামে আস্থা রাখতে পারবে, যারা স্থিরতার সাথে তাঁর আদেশের জন্য অপেক্ষা করবে যেন এর অধীন হতে পারে। এ ছাড়াও লক্ষ্য করুন, যে আদেশের জন্য আমরা অপেক্ষা করি তা হচ্ছে বিশ্বাসের আদেশ, তাঁর নামে আস্থা রাখার আদেশ। এটা এখন তাঁর মহান আদেশ– আমরা যেন খ্রীষ্টে বিশ্বাস করি (১ যোহন ৩:২৩)।

৩. তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীতে তা বলা হয়েছে এবং তাঁর নম্রতাপূর্ণ শান্ত ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পর্কে (১৯, ২০ পদ)। এটা মূলত এখানে খ্রীষ্ট ফরীশীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যিনি নিভৃতে আড়ালে চলে গেলেন সেই বিষয়ে উদ্ধৃত হয়েছে।

(১) তিনি তাঁর কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবেন কোন আওয়াজ কিংবা প্রদর্শনী ছাড়া, 'তিনি ঝগড়া বা চিৎকার করবেন না। খ্রীষ্ট ও তাঁর রাজ্য জানিয়ে আসে না (লূক ১৭:২০, ২১)। প্রথম-জাতকে যখন পৃথিবীতে পাঠানো হল তখন তাকে ভূসম্পত্তি কিংবা আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে পাঠানো হয় নি, জনসমাগমের মধ্য দিয়ে তাঁকে প্রবেশ করতে হয় নি, কোন অগ্রদূতও তার বিষয়ে ঘোষণা করে বলেনি যে, রাজা আসছেন। 'তিনি পৃথিবীতে ছিলেন কিন্তু পৃথিবী তাকে চিনল না'। যারা তাঁকে স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার নিমিত্তে একজন পরিত্রাণকর্তা হিসেবে কামনা করেছিল তারা বড় ভুল করেছিল। রাস্তায় তাঁর গলা শোনা গেল না; 'এই যে, খ্রীষ্ট এখানে' অথবা 'খ্রীষ্ট ওখানে'। তিনি এখনও হালকা স্বরে কথা বলে যাচ্ছেন যা অন্যকে আকর্ষণ করতে সক্ষম ছিল, কিন্তু কাউকে ভীত করে তোলেনি। তিনি সোরগোল করলেন না কিন্তু শিশিরের মতো নীরবে নেমে এলেন। তিনি অনুমিত সর্বোচ্চ বিনম্রতা এবং আত্মসংবরণের উদাহরণ রাখলেন– তাঁর কথায় ও কাজে। তাঁর রাজ্য ছিল আত্মিক এবং সে কারণেই শক্তি কিংবা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলেন না কিংবা বড় দাবি নিয়েও এগুলেন না। না, ঈশ্বরের রাজ্য বাক্যে নয়, কিন্তু ক্ষমতায়।

(২) তিনি তাঁর কাজে কঠোর হবেন না (২০ পদ), 'তিনি থেঁতলে যাওয়া নল ভাঙবেন না। কেউ কেউ এর অর্থ করেন যে, তা পাপীদের বহন করার ক্ষেত্রে তাঁর ধৈর্য প্রকাশ করে; তিনি এই ফরীশীদের থেতলে যাওয়া নলের মতো সহজেই ভেঙে ফেলতে পারতেন এবং মিট মিট করে জ্বলতে থাকা সলতে নিভিয়ে ফেলতে পারতেন কিন্তু তিনি তা বিচারদিনের আগে করবেন না, যখন তাঁর সব শত্রুই তাঁর পা রাখবার জায়গা হবে। অন্যরা যা বোঝেন তা আরও পরিষ্কার যে, এখানে দুর্বলদের বহন করার ক্ষেত্রে তাঁর ক্ষমতা এবং অনুগ্রহের বিষয়টি প্রকাশ পায়। সাধারণভাবে তাঁর সুসমাচারের পরিকল্পনা হচ্ছে পরিত্রাণের জন্য এমন একটি প্রক্রিয়া স্থাপন করা যা সবাইকে এর প্রতি আকাঙ্ক্ষী হতে উৎসাহী করবে, যদিও সেখানে অনেক দুর্বলতা ছিল। লক্ষ্য করুন,

(ক) সেই ঘটনাটি এখানে কীভাবে বর্ণিত হল, তারা হচ্ছে থেতলানো নলের মতো এবং মিটমিট করে জ্বলতে থাকা সলতের মতো। ধর্মীয় কাজে যারা তরুণ তারা থেতলানো নলের মতো দুর্বল এবং তাদের দুর্বলতা প্রকাশ পায় মিটমিট করে জ্বলতে থাকা সলতের মাধ্যমে, তাদের মাঝে জীবনের অল্পই অবশিষ্ট থাকে কিন্তু তা থেতলে যাওয়া নলের মতো, যাতে অল্প তাপ থাকে কিন্তু তা মিট মিট করে জ্বলা সলতের মতো। খ্রীষ্টের অনুসারীরা ছিলেন এরকম দুর্বল এবং এমন অনেকে তাঁর পরিবারে ছিল। তাদের মাঝে থাকা অনুগ্রহ এবং ভালত্ব ছিল এরকম থেতলানো নলের মতো, দুর্নীতি এবং খারাপি তাদের মাঝে

মিটমিট করে জ্বলছিল, সলতের দুর্বলতার জন্য যে মোমবাতি মিটমিট করে জ্বলছিল।

(খ) তাদের ক্ষেত্রে খ্রীষ্ট কী সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন? তিনি তাদের নিরুৎসাহিত করেন নি, তাদের বাতিল করেন নি কিংবা তাদের দলচ্যুত করেন নি এবং যে নল থেতলে গিয়েছিল তা তিনি ভাঙলেন না বা ধ্বংস করলেন না, কিন্তু তাদের সাহায্য করলেন এবং তাদের পামগাছের মতো শক্ত করে গড়ে তুললেন। মোমবাতিটি নতুন আলো দিচ্ছে, যদিও তা কেবল ধোয়া দিচ্ছে কিন্তু আলো দিচ্ছে না, তবুও তা নিভিয়ে ফেলা হবে না কিন্তু জাগিয়ে তোলা হবে। ছোট জিনিসের দিন পরিণত হবে মূল্যবান জিনিসে এবং সে কারণেই তিনি একে হেলা করলেন না, কিন্তু একে মহান জিনিসের দিনে রূপ দিলেন (সখরিয় ৪:১০)। মনে রাখুন, আমাদের প্রভু যীশু যারা প্রকৃত অনুগ্রহ পেয়েছে তাদের সাথে কোমল আচরণ করেন, যদিও তারা তাতে দুর্বল (যিশাইয় ৪):১১; ইব্রীয় ৫:২)। আমরা যে কেবল ধুলি তা তিনি মনে করেন না বরং আমরা রক্তমাংসের মানুষ।

(গ) এর সাফল্য এবং সঠিক প্রয়োগ, এর সাথে রয়েছে, ন্যায়বিচারকে জয়ী না করা পর্যন্ত। সেই ন্যায়বিচার যা তিনি অযিহূদীদের কাছে তুলে ধরেছেন তা বিজয়ী হবে, তিনি বিজয়ীর বেশে জয় করতে যাবেন (প্রকাশিত বাক্য ৬:২)। পৃথিবীতে সুসমাচারের প্রচার এবং হৃদয়ে সুসমাচারের কাজ উভয়েই বিজয়ী হবে। অনুগ্রহ অনিয়মের বিরুদ্ধে জয়ী হবে এবং তা পূর্ণতার সাথে গৌরবান্বিত হবে। খ্রীষ্টের ন্যায়বিচার বিজয়ী হবে, কারণ তিনি তাঁর বিচারে জয়যুক্ত হন। তিনি ন্যায়বিচারকে সত্যে নিয়ে আসবেন; তাই এমনটা বলা হয়েছে (আশা ৪২:৩)। সত্য এবং বিজয় একই ব্যাপার; কারণ সত্য হচ্ছে মহান এবং তা-ই জয়ী হবে।

মথি ১২:২২-৩৭

এখানে আমরা দেখি,

ক. শয়তানের ওপর খ্রীষ্টের গৌরবান্বিত বিজয়, তা এমন এক লোককে সুস্থ করার মধ্য দিয়ে আসল যাকে শয়তান স্বর্গীয়-অনুমতি সাপেক্ষে তার ক্ষমতায় অধিগ্রহণ করেছিল (২২ পদ)। এখানে দেখুন,

১. মানুষটির অবস্থা ছিল খুবই করুণ; সে ভূতাশ্রিত ছিল। অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে খ্রীষ্টের সময় এ ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি ছিল যেন খ্রীষ্টের ক্ষমতা আরও বেশি করে চিত্রিত হয় এবং তাঁর উদ্দেশ্য প্রকাশ পায়, আর তা শয়তানকে বাধা দেওয়া এবং তাড়ানোর মাধ্যমে এবং এর ফলে তা আরও প্রমাণসাপেক্ষে দেখা যাবে যে, তিনি শয়তানের কাজকে ধ্বংস করতে এসেছেন। এই ভূতগ্রস্ত লোকটি ছিল অন্ধ এবং বোবা; যা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক একটি ব্যাপার! সে নিজেকে সাহায্য করতে কিছু দেখতে পেত না কিংবা সাহায্যের জন্য কাউকে বলতেও পারতো না। শয়তান যাকে দখল করে তার ক্ষমতার অধীন করে রাখে সে ঈশ্বরের বিষয়গুলো দেখতে পারে না, এক্ষেত্রে সে অন্ধ বনে যায় এবং অনুগ্রহের সিংহাসনের সামনেও সে বোবা হয়ে যায়; তার সমস্যা সে দেখতে পারে না এবং সাহায্যের জন্য মুখ খুলতে পারে না। শয়তান বিশ্বাসের চোখ অন্ধ করে দেয় এবং প্রার্থনার ঠোঁটে তালা এঁটে দেয়।

২. তার আরোগ্য লাভের কাজটি ছিল খুবই অদ্ভুত কিংবা ততোধিক অভাবনীয়, কারণ

হঠাৎই তিনি তাকে সুস্থ করলেন। মনে রাখুন, আত্মার সুস্থতার মাধ্যমেই শয়তানকে পরাজিত করা হয় এবং দূরীভূত করা হয়। সেই লোকটি তখনই শয়তানের প্রভাবমুক্ত হল; বোবাত্ব ঘুচে সে কথা বলতে এবং অন্ধত্ব ঘুচে সে দেখতে শুরু করল। মনে রাখুন, খ্রীষ্টের দয়া সরাসরি শয়তানের ঘৃণার বিরোধিতা করে; তাঁর আনুকূল্য শয়তানের ক্ষতির কারণ। যখন আত্মায় শয়তানের ক্ষমতা চূর্ণ হয় তখন সেই আত্মার চোখ খুলে যায়, সে ঈশ্বরের ভাল বিষয়গুলো দেখতে পায় এবং তাঁর প্রশংসা করতে শুরু করে।

খ. তাঁর কাজ দেখে লোকদের কী প্রতিক্রিয়া হল– তারা সবাই বিস্মিত হল। খ্রীষ্ট আগেও এ ধরনের বিভিন্ন চিহ্ন-কাজ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সব কাজই ছিল বিস্ময় জাগানো, ফলে তাদের অভিব্যক্তিতে সেটাই পুনঃদৃশ্যায়িত হল। তারা এই বলে বিস্ময় প্রকাশ করল, 'ইনিই কি দায়ূদ সন্তান নন? প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট, যিনি দায়ূদের বংশে আসবেন বলে বলা হয়েছে? ইনিই কি সেই খ্রীষ্ট নন যার আসবার কথা আছে?' আমরা এভাবে বিষ-য়টিকে,

১. একটি অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন হিসেবে নিতে পারি; তারা জিজ্ঞেস করল, 'তিনি কি দায়ূদ সন্তান নন?' কিন্তু তারা এর উত্তরের জন্য বসে রইল না; তাদের বিস্ময় খাঁটি হলেও তা স্থায়ী ছিল না। তারা একটি ভাল প্রশ্ন করতে শুরু করেছিল, কিন্তু দেখা গেল শীঘ্রই তা হারিয়ে গেল এবং তা কার্যকর হল না। কেউ যদি প্রকৃতই তার ভাবনাকে বিশ্লেষণ করতে সমর্থ হয় তবে তা তার হৃদয়ে স্থান করে নিতে সমর্থ হয়, তা নিশ্চয়তা পায়। অথবা,

২. সমর্থসূচক প্রশ্ন, 'তিনি কি দায়ূদ সন্তান নন?' 'হ্যাঁ, তিনি ঠিক তাই আর কেউ তা হতে পারে না, তাঁর মতো এ রকম চিহ্ন-কাজও আর কেউ করতে পারে নি; তাঁর এই কাজগুলোই খ্রীষ্টের রাজ্য যে স্থাপিত হতে চলেছে সে বিষয়ে বলে।' এবং তারা ছিল সাধারণ লোকজন, নিচু শ্রেণীর মানুষজন যারা তাঁর প্রত্যাশায় ছিল তারা খ্রীষ্টের চিহ্ন-কাজ দেখে এই অভিমত ব্যক্ত করল। নাস্তিকেরা অবশ্য ভিন্ন কথা বলবে, 'তারা এমন অভিমত ব্যক্ত করেছিল কারণ তারা ফরীশীদের চেয়ে অনগ্রসর ছিল'। না, এই ঘটনার কার্যকারণ ছিল পরিষ্কার এবং তাতে বেশি অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই; কিন্তু এর কারণ ছিল এই, তারা জাগতিক বিষয়ে অত বেশি জড়িয়ে পড়েনি এবং তার রাহুমুক্ত ছিল। যীশু যে পৃথিবীর খ্রীষ্ট এবং পরিত্রাণকর্তা সেই মহাসত্য প্রকাশে খুবই সরল এবং সহজ উপায় বেছে নেয়া হল, তা সাধারণ লোকদের চোখ এড়িয়ে যায় নি, 'অসাড়-বিবেক লোকেরা সেই পথ দিয়ে যাবে না' (৩৫:৮ পদ)। অর্থাৎ যারা তা দেখতে পাবে তারাই সেই পথ দিয়ে যাবে। অভাগাদের প্রতি স্বর্গীয় অনুগ্রহের এটি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ যে, যা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে তা শিশুর মতো লোকদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে। পৃথিবী তার জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে জানেনি এবং জ্ঞানীরা বোকামিকে আকড়ে ধরে এক্ষেত্রে মূর্খতার পরিচয় দেয়।

গ. ফরীশীরা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে যে ঈশ্বরনিন্দার অভিযোগ আনল। ফরীশীরা ছিল এমন ধরনের লোক যারা ভান করতো যে তারা অনেক জ্ঞান ধারণ করে এবং সেজন্য তারা অন্যদের চেয়ে স্বর্গীয় আদেশের বিষয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষী ছিল, তবুও তারা খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যদের মতবাদের কঠিন সমালোচক ছিল। লোকদের উপর তাদের অবস্থান নিয়ে তারা অনেক গর্বিত ছিল; তা তাদের খাবার জোগাতো, তাদের ক্ষমতায়ন করেছিল এবং তাদের পকেট ভর্তি করে দিত; এবং যখন তারা লোকদের বলা একথা শুনল, 'ইনিই কি দায়ূদের

সন্তান নন?' তখন তারা তাঁর চিহ্ন-কাজের বিস্ময়ের চেয়েও অতিমাত্রায় ক্ষুব্ধ হল; এবং তা তাদের খ্রীষ্টের প্রতি ঈর্ষান্বিত করে তুলল এবং এই ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল যে, তার পক্ষে জনসমর্থন বেড়েই চলেছে, এতে করে তারা তো আড়ালে পড়ে যাবে, তাদের সম্মান ও গৌরব তো ঢেকে যাবে এবং সে কারণেই তারা তাঁকে ঈর্ষা করতে লাগল, যেমনটা শৌল তাঁর জামাতা দায়ূদের প্রতি করেছিলেন; কারণ মহিলারা তাকে নিয়ে গান বেঁধেছিল (১ শমূয়েল ১৮:৭, ৮)। মনে রাখুন, যারা মানুষের হাততালি, প্রশংসায় সুখ পায়, তারা অন্যদের বিষয়ে ভাল কিছু শুনলে অস্বস্তিতে ভোগে। সম্মানের ছায়া খ্রীষ্টকে অনুসরণ করেছিল, যারা এর জন্য লালায়িত তাদের ছেড়ে, ফরীশীদের ছেড়ে তা খ্রীষ্টের পিছু নিয়েছিল। তারা বলল, 'ও তো শুধু মন্দ-আত্মাদের রাজা বেলসবুলের সহায়তায় ভূত ছাড়ায় এবং সে কারণেই সে দায়ূদের সন্তান নয়।' লক্ষ্য করুন,

১. কতটা উপেক্ষার সাথে তারা খ্রীষ্টের বিষয়ে বলেছিল, 'ও'; যেন তাঁর অনন্য নামটি যা স্বর্গীয় নিয়োগের কথা বলে তা মুখে আনতে তাদের ঠোঁটে বাধছিল। এটা তাদের গর্ব এবং উপেক্ষার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এবং তাদের পাশবিক ঈর্ষার প্রকাশ, যেখানে অনেক লোক খ্রীষ্টকে চিহ্নিত করেছিল সেখানে সবচেয়ে পরিশ্রমীরা তাঁকে অভিযুক্ত করল। গরীব বলে ভাল লোকদের উপেক্ষা করা বা তাদের বিষয়ে মন্দ কিছু বলাটা খারাপ উদাহরণ।

২. তারা তাঁর চিহ্ন-কাজের বিষয়ে কতটা ঈশ্বরনিন্দাসূচক কথা বলল; তারা এই ঘটনাকে এড়িয়ে যেতে পারে নি; কারণ তা ছিল দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে, খ্রীষ্টের কথায় ভূত লোকটিকে ছেড়ে চলে গেছে; আবার তারা একে অস্বীকারও করতে পারছিল না কারণ তা ছিল প্রকৃতই অসাধারণ একটি ঘটনা এবং অলৌকিক। ফলে এভাবে তারা তা মেনে নিতে বাধ্য হল কিন্তু তাদের এর উপসংহারে পৌছানো থেকে মুক্তি পেতে আর কোন পথ ছিল না যে, খ্রীষ্ট দায়ূদের পুত্র; ফলে তারা বলল, খ্রীষ্ট মন্দ-আত্মাদের রাজার সাহায্যে ভূত ছাড়ান। এর মধ্য দিয়ে তারা বোঝাতে চাইলো যে, খ্রীষ্ট এবং শয়তানের মাঝে সম্পর্ক আছে; এটাই বোঝাতে যে, ভূত বের হয়ে যায় নি, কিন্তু কেবল স্বেচ্ছায় ঘাপটি মেরে আছে এবং পরিকল্পনা ও অনুমতির নিরিখে তা আবার দেখা দেবে; অথবা, মন্দ-আত্মাদের সাথে চুক্তি অনুযায়ী তিনি হীনম্মন্য মন্দ-আত্মাদের ছাড়ানোর ক্ষমতা পেয়েছেন। আর কোন অনুমানই এর মতো উদ্যোগী মিথ্যে এবং ভ্রান্ত হতে পারে না যে, যিনি নিজে সত্য তাঁর সাথে মিথ্যের পিতার সম্পর্ক আছে, আর তা পৃথিবীকে ধোঁকা দেবার জন্য! এটা ছিল শেষ আশ্রয়, ফন্দি অথবা পরিকল্পিত প্রতারণা যা পরিষ্কার নিশ্চয়তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। লক্ষ্য করুন, মন্দ-আত্মাদের মাঝে একজন রাজা আছে, ঈশ্বরের পক্ষত্যাগী নেতা যে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল; কিন্তু এই রাজা অর্থাৎ বেলসবুল মাছিদের ঈশ্বর বলে পরিচিত ছিল অথবা গোবর-কাদার ঈশ্বর। লুসিফার কত নিচে নেমে গেছে! আলোর দরুন ক্ষুব্ধ হয়ে সে মাছিদের প্রভুতে পরিণত হয়েছে! তবুও সে ভূতদেরও রাজা, নরকের আত্মার গ্যাংলিডার।

ঘ. এই বাঁকা কথার জবাবে খ্রীষ্ট যা বললেন (২৫-৩০ পদ)। যীশু তাদের চিন্তা জানতেন। মনে রাখুন, আমরা যখন যা ভাবি সবই যীশু খ্রীষ্ট জানেন; কার ভেতরে কী রয়েছে তা তিনি জানেন; তিনি বহুদূরের চিন্তার বিষয়েও জানেন। এটা প্রকাশ করে যে ফরীশীরা একথা বলার জন্য যে লজ্জিত হবে না তা তিনি জানতেন, কিন্তু তাদের মন এতে নিবিষ্ট থাকবে; তারা লোকদের তাদের কথায় প্রভাবিত করতে পারবে না; তারা সে কারণেই তাদের নিজেদের মনকে বুঝ দেওয়ার জন্য একথা উত্থাপন করবে। মনে রাখুন,

স্বীকার করলে লজ্জা পেতে হবে ভেবে অনেকেই তাদের দায়িত্ব থেকে দূরে সরে থাকে, কিন্তু তা খ্রীষ্টের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা যায় না: তবুও এটা অনুমিত যে ফরীশীরা তাদের কানে কানে নিজেদের ভাবনার কথা বলাবলি করছিল যেন অন্যকে এর ভেতর উদ্বুদ্ধ করা যায়, কিন্তু খ্রীষ্টের উত্তর তাদের চিন্তাকে খণ্ডন করল, তাতে তাদের চিন্তা প্রকাশ পেয়ে গেল। কারণ তিনি তাদের মনের খবর জানতেন এবং কোন দৃষ্টিকোণ থেকে তারা এরকম কথা বলেছে তা তিনি জানতেন। যা তারা নিজেদের মাঝে বলেনি কিন্তু এটা ছিল গভীর বিদ্বেষ থেকে উৎসারিত। তাদের এই উক্তির প্রেক্ষিতে তার জবাবটি ছিল যথোপযুক্ত এবং কার্যকর যেকারণে প্রতিটি মুখ বন্ধ হয়ে গেল, যেভাবে তা গন্ধক ও আগুনের সামনে বন্ধ করে দেবে। এখানে খ্রীষ্ট তিনটি যুক্তি উত্থাপন করলেন যা দ্বারা তিনি তাদের মন্তব্যকে অর্থহীন বলে সাব্যস্ত করলেন।

(ক) এটা খুবই অদ্ভুত ব্যাপার হবে যদি শয়তান তার নিজের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করে, ভূত ছাড়াতে বসে, কারণ তাহলে তো শয়তানের রাজ্য নিজের বিরুদ্ধে ভাগ হয়ে যাবে। যা, তার চাতুরির বিষয়ে বলে, শয়তান এমন কাজ কক্ষনো করবে না (২৫, ২৬ পদ)।

(১) এখানে একটি জানা নিয়ম সন্নিবেশিত হয়েছে, কোন সমাজে বিভেদ ঢুকে গেলে তা তার ধ্বংস ডেকে আনে: যে রাজ্য নিজের বিরুদ্ধে ভাগ হয়ে যায় তা টিকে থাকতে পারে না; এবং সেকথা পরিবারের ক্ষেত্রেও খাটে: কী জন্যে পরিবারের বাঁধন এত শক্ত? কোন্ সমাজ এত নিরেট, যেমন শত্রুতা এবং বিরোধিতায় বিপর্যস্ত হয় না? বিভাজন স্বাভাবিকভাবেই হতাশায় শেষ পরিণতি পায়; যদি আমরা বিবাদে লিপ্ত হই তবে আমরা ভঙ্গুর হই, যদি আমরা একজন থেকে আরেকজনকে ভাগ করি তবে আমরা সাধারণ শত্রুতা তৈরি করি, এর চেয়েও বেশি করে, যদি আমরা একে অন্যের সাথে ঈর্ষা ও বিবাদে জড়িয়ে পড়ি তবে নিজেদের ধ্বংস করি (গালা ৫:১৫)। মণ্ডলী এবং জাতিগুলো দুঃখজনক অ-ভজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এ বিষয়টি শিখেছে।

(খ) এখানে সেই কাজের ফলটা বলা হল (২৬ পদ), যদি শয়তান নিজেকে ছাড়াত, যদি মন্দ-আত্মাদের রাজা হীন মন্দ-আত্মাদের সাথে দ্বন্দ্ব তৈরি করে তুলত তবে শীঘ্রই গোটা রাজ্য ভেঙে পড়ত; উপরন্তু যদি শয়তান খ্রীষ্টের সাথে যোগসাজসে এই কাজ করতো তবে তা নিজেকেই নিজে ধ্বংস করার অন্য নাম; কারণ খ্রীষ্টের প্রচার এবং চিহ্ন-কাজের পরিকল্পনা ও নকশা শয়তানের রাজ্যকে জয় করার জন্যই এগিয়ে যায়, তা অন্ধকারের রাজ্য, খারাপি এবং ঈশ্বরের শত্রুরাজ্যকে পরাজিত করে এবং তা নিজেকে এর ধ্বংসের উপর স্থাপন করে– আলোর রাজ্য, পবিত্রতা এবং ভালবাসার রাজ্য। মন্দ-আত্মাদের কাজ ঈশ্বরের বিরোধিতা করে এবং তা মানুষের আত্মার উপর আধিপত্য করে, আর যেখানে তা খ্রীষ্টের হাতে ধ্বংস হল সেখানে এরকমটা ভাবা সত্যিই বিস্ময়ের যে এই পরিকল্পনার সাথে বেলসবুলও একমত হয়েছে অথবা তার সাহায্যে এগিয়ে এসেছে; যদি সে খ্রীষ্টের হাতে পতন ডেকে আনতে আগ্রহী হয়, তবে কী করে তার রাজ্য টিকে থাকবে? সে কি তাঁর বিজয়যাত্রাকে রুখে দিতেই সচেষ্ট থাকবে না? মনে রাখুন, শয়তানের একটি রাজ্য রয়েছে, একটি সাধারণ আগ্রহ, আর তা হচ্ছে ঈশ্বর এবং খ্রীষ্টের বিরোধিতা করা, যা করতে সে তার ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করে, সে কারণেই সে তা করতেই উদ্যোগী থাকবে কিন্তু খ্রীষ্টের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না; সে অবশ্যই খ্রীষ্টের হাতে চূর্ণ হবে এবং সে কারণেই

সে নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ করবে না। আলো ও অন্ধকারের মাঝে কি কোন ঐক্য হতে পারে? ঠিক তেমনি খ্রীষ্ট ও বেলসবুলের মাঝে? খ্রীষ্ট মন্দ-আত্মাদের রাজ্যকে ধ্বংস করবেন কিন্তু সে জন্য তার বেলসবুলের সাথে ঐক্য করে তার ক্ষমতা ধার নেওয়ার প্রয়োজন নেই; না, এই বিজয় অবশ্যই অভিজাত প্রক্রিয়ায় আসবে। মন্দ-আত্মাদের রাজা তার শক্তিকে যতই পুঞ্জীভূত করুক না কেন, তাকে তার সব ক্ষমতা এবং কূটনীতি এবং তার ঈশ্বরবিরোধিতা কাজ চালিয়ে যাক, তবুও খ্রীষ্ট তাকে পরাজিত করবেন, তার কাছে মন্দ-আত্মাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা হালে জল পারে না। তিনি তা জয় করবেন, ফলে শয়তানের রাজ শেষাবধি টিকবে না।

(২) এর মাঝে সবটাই অবিশ্বাস্য কিংবা অসম্ভব ছিল না যে, ঈশ্বরের আত্মায় ভূত বেরিয়ে যাবে, কারণ

(ক) তাহলে আপনাদের লোকেরা কী করে ভূত ছাড়ায়? যিহূদীদের মাঝে কেউ কেউ ছিল যারা ঈশ্বরের নামে, অব্রাহামের ঈশ্বরের নামে, ইসহাক ও যাকোবের ঈশ্বরের নামে কখনও কখনও ভূত ছাড়াতো। যোসেফাস তার সময়ে এরকম কিছু ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন; আমরা যিহূদী ভূতের ওঝার বিষয়ে শাস্ত্রে দেখতে পাই (প্রেরিত ১৯:১৩) এবং কাউকে কাউকে খ্রীষ্টের নামেও ভূত ছাড়াতে দেখি, যদিও তারা তাঁকে অনুসরণ করতো না (মার্ক ৯:৩৮) বা তাঁর প্রতি বিশ্বস্তও ছিল না (৭:২২)। খ্রীষ্ট ফরীশীদের অভিযুক্ত করার জন্য এসব বললেন না বরং ঈশ্বরের আত্মার বিরুদ্ধে তারা যে পাপ করেছিল তার নিন্দা করলেন এবং এর দ্বারাই তাদের দেশ এবং তাদের মূল্যায়ন করলেন। সে কারণেই খ্রীষ্টের চিহ্ন-কাজকে তারা তাদের ঈর্ষা এবং ঘৃণা থেকে অভিযুক্ত করেছিল যেখানে তাদের নিজেদের লোক ভূত ছাড়ালে তা ঈশ্বরের শক্তিতে করা হয়েছে বলে তারা স্বীকার করতো সেখানে সেই একই কাজ যখন খ্রীষ্ট করলেন তখন তারা এর মাঝে বেলসবুলের সম্পৃক্ততা খুঁজে পেল।

মনে রাখুন, বিদ্বেষপরায়ণ লোকদের পথ এমনই, বিশেষত খ্রীষ্ট এবং তাঁর লোকদের নির্যাতনকারীদের পথ, তারা সেইসব বিষয়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে যা তারা প্রকৃতই ঘৃণা করে, যা তারা প্রমাণ করে এবং আনন্দিত হয় সেইসবে যার জন্যে তাদের দয়া থাকে; ঈর্ষার বিচার কোন বস্তু নয় বরং মানুষের দ্বারাই হয়, কোন কারণ দ্বারা নয় কিন্তু নিচু মানসিকতা থেকে। কিন্তু যারা মোশির আসনে বসার জন্য অযোগ্য ছিল, যারা মুখ চিনত এবং ন্যায়বিচারের বিষয়ে জানতো না; সে কারণেই তারা তোমাদের বিচারক হবেন। 'তোমাদের নিজেদের এই দ্বন্দ্ব বিচারে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে সেই মহান দিনে এবং তা তোমাকে দোষী করবে।' মনে রাখুন, শেষ বিচারে কেবল প্রতিটি পাপই নয় কিন্তু এর প্রতিটি কাজ হিসেবে আনা হবে এবং আমাদের ভাল এবং সঠিক দর্শন আমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে উঠে আসবে, তা আমাদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনবে।

(খ) ভুত ছাড়ানোর এই ঘটনাটি ঈশ্বরের রাজ্যের দৃশ্যমানতা এবং তার এসে পড়ার কথা বলে (২৮ পদ)। 'কিন্তু যদি আমি ঈশ্বরের সহায়তায় ভূত ছাড়াই যেমনটা আমি নিশ্চিতভাবেই তা করেছি তাহলে তো আপনাদের সব চিন্তাভাবনার অবসান ঘটা উচিত, যদিও আপনারা একে গ্রহণ করতে আন্তরিক নন তবুও খ্রীষ্টের রাজ্য এখন আপনাদের মাঝে এসে গেছে'। অন্যান্য চিহ্ন-কাজের দ্বারা তিনি নিজেকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলে প্রমাণ করেছিলেন, কিন্তু একে তিনি নিজেকে ঈশ্বরপ্রেরিত শয়তানের রাজ্য ও কাজ ধ্বংসকারী

হিসেবে প্রমাণ করলেন। এখন সেই মহান প্রতিজ্ঞাটি প্রমাণসহকারে পূর্ণ হল যে, নারীর বংশধর সাপের মাথা চূর্ণ করবে (আদি ৩:১৫)। 'সে কারণেই ঈশ্বরের রাজ্যের গৌরবান্বিত প্রতিষ্ঠা যা বহুকাল ধরে প্রতীক্ষিত ছিল তার কাজ এখন শুরু হয়েছে; আপনাদের হুমকি যাঁকে অবজ্ঞার পাত্র করেছে'। মনে রাখুন,

(১) ঈশ্বরের আত্মার দ্বারাই শয়তানের ক্ষমতার ধ্বংস হবে; যে আত্মা বিশ্বাসের বাধ্যতায় কাজ করে তা সেই আত্মার কাজকে ফেলে দেবে যা অবিশ্বাস এবং অবাধ্যতার সন্তানদের মাঝে কাজ করে।

(২) ভূত ছাড়ানোর ঘটনাটি নিশ্চিতভাবে ঈশ্বরের রাজ্যের সূচনার কথা বলে। আত্মায় মন্দ-আত্মাদের যে কার্যক্রম যে কেবল বাহ্যিকভাবে থামানো হবে, পায়ে বেড়ি পরানো হবে তা নয় উপরন্তু তা ঈশ্বরের আত্মায় চূর্ণ এবং ডুবিয়ে ফেলা হয়েছে, যেভাবে তিনি একজন পবিত্রকারী, কোন সন্দেহ নেই যে ঈশ্বরের রাজ্য সেই আত্মার কাছে আসে, সেই অনুগ্রহের রাজ্য, গৌরবের রাজ্যের অনুগ্রহধন্য।

৩. খ্রীষ্টের চিহ্ন-কাজের তুলনা, নির্দিষ্টভাবে এই মন্দ-আত্মাগ্রস্তক আরোগ্য করার ঘটনাটি তার মতবাদের সাথে এবং তাঁর পবিত্র ধর্মের প্রবণতা ও পরিকল্পনার সাথে, সেই প্রমাণসহ যে তিনি শয়তানের সাথে যোগসাজস থেকে অনেক দূরে, যে তিনি ছিলেন শয়তানের প্রকাশ্য শত্রু (২৯ পদ)। কীভাবে কেউ একজন শক্তিশালী মানুষের বাড়িতে যেতে পারে এবং তার সম্পদ চুরি করতে পারে এবং তা নিয়ে নির্বিঘ্নে চলে যেতে পারে যদি না তাকে বেঁধে রাখা হয়? এবং তখন সে তার জিনিস নিয়ে যা খুশি তা করতে পারে। পৃথিবী যা অন্ধকারে ডুবে আছে এবং খারাপিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে তা ছিল শয়তানের আয়ত্তে এবং তার ক্ষমতার অধীনে, যেভাবে একটি বাড়িতে শক্তিশালী লোক থাকে সেভাবে সে তার ক্ষমতা দ্বারা তা করায়ত্ত করে রেখেছিল; তাই সেই আত্মার সামনে কোন আশা ছিল না; শয়তান স্থায়ীভাবে সেই আত্মাকে শাসন করে আসছে।

এখন (১) খ্রীষ্টের সুসমাচারের পরিকল্পনা ছিল শয়তানের বাড়িকে ধ্বংস করা সেই শাক্তিশালী লোকের মতো সে পৃথিবীতে যা করে আসছিল, তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসলেন; পাপ থেকে পবিত্রতায়, এই পৃথিবী থেকে আরেক পৃথিবীতে, শয়তানের ক্ষমতা থেকে ঈশ্বরের ক্ষমতায় (প্রেরিত ২৬:১৮); সেই আত্মার মাঝে পরিবর্তন সাধনের জন্য।

(২) এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিনি সেই শক্তিশালী লোককে বাঁধলেন যখন তিনি তাঁর কথায় মন্দ আত্মাকে তাড়ালেন; এভাবে তিনি শয়তানের হাত থেকে তলোয়ারটি কেড়ে নিলেন, যেন তিনি রাজদণ্ডটি আদায় করলেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি সব বিশ্বাসীকে উৎসাহিত করেন তাতে বিশ্বাস করতে, যে শয়তান যতভাবেই মানুষের মনকে করায়ত্ত করার চেষ্টা করুক না কেন, যত ক্ষমতাই সে প্রয়োগ করুক না কেন খ্রীষ্ট তাঁর অনুগ্রহে তা ভেঙে ফেলেন; তিনি তাকে ধ্বংস করবেন কারণ আমরা দেখেছি তিনি তাকে বেঁধে রাখতে পারেন। যখন জাতিরা মূর্তিপূজা থেকে ঈশ্বরের কাজে ফিরল, যখন কোন কোনও জঘন্য পাপীরাও পবিত্রীকৃত এবং সিদ্ধ হল এবং ভাল সাধুতে পরিণত হল তখন খ্রীষ্ট শয়তানের আবাসকে ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং তিনি আরও বেশি করে তা ধ্বংস করবেন।

৪. এখানে সেই পবিত্র যুদ্ধ যা খ্রীষ্ট তেজের সাথে শয়তান ও তার রাজ্যের বিরুদ্ধে বহন করছিলেন তখন মাঝখানে থাকার কোন সুযোগ নেই (৩০ পদ), যে আমার সাথে

কুড়ায় না, সে ছড়ায়। খ্রীষ্টের শিষ্যদের মাঝে একটি সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব উপনীত হতে পারে যে আমরা শিক্ষা পেয়েছি দ্বন্দ্ব কমানোর জন্য এবং শান্তির অন্বেষণের জন্য, তাদের প্রসঙ্গে সেই শিক্ষার মাধ্যমে যারা আমাদের বিপক্ষে নয় তারা আমাদের পক্ষে আছে (লূক ৯:৫০); কিন্তু খ্রীষ্ট এবং শয়তানের মাঝের মহাযুদ্ধে কোন শান্তির প্রত্যাশা করা যায় না, কিংবা কোন আনুকূল্য, সহমর্মিতা, সাদা পতাকা দেখানোর এখানে সুযোগ নেই; যে খ্রীষ্টের জন্য আন্তরিক নয়, তাকে তাঁর বিরোধী বলে গণ্য করা হবে।

খ্রীষ্টের রাজ্যে খ্রীষ্ট এবং বিলিয়ালের মাঝে কোন সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপার নেই; বৈশিষ্ট্যগত কারণেই তারা একে অপরের বিপরীত, তাই শয়তানের রাজ্যের বিরুদ্ধে এই জয় হবে চিরকালীন এবং সে কারণেই এই জায়গায় এখানে গিলিয়দ কিংবা আশেরের মতো অবস্থান নেওয়ার সুযোগ নেই (বিচারকর্তৃকগণ ৪:১৬, ১৭), আমরা অবশ্যই চিরকালীনভাবে, বিশ্বস্ততার সাথে এবং স্থিরতার সাথে খ্রীষ্টের পক্ষে থাকব; এটা প্রকৃতই সঠিক পক্ষ এবং শেষ পর্যন্ত তা জয়ী হবে (যাত্রা ৩২:২৬)।

বাক্যের পরের অংশটিও অভিন্ন কথা বলছে: 'যে আমার সাথে কুড়ায় না, সে ছড়ায়।' মনে রাখুন,

(১) খ্রীষ্টের এই পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বর যাদের তাঁকে দিয়েছেন তাদের জমা করা (যোহন ১১:৫২; ইফিষীয় ১:১০)।

(২) যারা খ্রীষ্টের সাথে আছে তাদের কাছ থেকে তিনি প্রত্যাশা করেন যে তারা তাঁর সাথে কুড়াবে; তারা যে কেবল নিজেদের খ্রীষ্টের কাছে সমর্পণ করবে তা নয় উপরন্তু অন্যদেরও তাঁর কাছে নিয়ে আসবে এবং এভাবে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করবে।

(৩) যারা খ্রীষ্টের ইচ্ছে অনুযায়ী কাজ করবে না, আবার খ্রীষ্টের রাজ্যের বিরোধিতাকারীর মতো বাধাও দেবে না তাদের অবস্থান যে স্বচ্ছ নয় তা খ্রীষ্টের এই কথাতেই স্পষ্ট: 'যে আমার সাথে কুড়ায় না, সে ছড়ায়।' অর্থাৎ আমরা যদি তাঁর সাথে না কুড়াই তবে ছড়াই। তাই আমাদের কেবল খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকলেই চলবে না বরং ভাল কাজও করতে হবে। শয়তানের সাথে খ্রীষ্টের এরূপ দূরত্ব এটাই প্রমাণ করে যে, ফরীশীদের কথামতো তাঁর সাথে শয়তানের কোন সম্বন্ধ ছিল না।

ঙ. এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি জিহ্বার পাপের কথা উল্লেখ করলেন; 'সেজন্য আমি আপনাদের বলছি'। এখানে তাঁকে ফরীশীদের প্রসঙ্গ ছেড়ে লোকদের দিকে ফিরতে দেখা গেল; তর্ক ছেড়ে তিনি নির্দেশনায় ফিরলেন এবং ফরীশীদের পাপ থেকে তিনি লোকদের তিন ধরনের পাপর বিষয়ে সাবধান করে দিলেন; যেন অন্যদের 'পরিণতি' আমাদের জন্য সতর্কবার্তা হয়।

১. পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কথা বলাটা জঘন্য পাপ এবং তা অমার্জনীয় (৩১,৩২)।

(১) সুসমাচারের শর্তে এখানে সর্বপ্রকার পাপের ক্ষমা পাবার বিষয়ে অমূল্য নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। খ্রীষ্ট তা আমাদের বলেন এবং এটা আমাদের উৎসাহ দেয় যে, পাপের ভয়াবহতা ঈশ্বর ও আমাদের মাঝে সম্পর্ক স্থাপনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, যদি আমরা সত্যিকারভাবে অনুতাপ করি এবং সুসমাচারে বিশ্বাস করি। 'মানুষের সব পাপ ও ঈশ্বর-নিন্দা ক্ষমা করা হবে'। যদিও পাপ টকটকে লাল হয়েছে (যিশাইয় ১: ১৮), যদিও এর প্রকৃতি জঘন্য, এর প্রকৃতি মানুষকে বারবার তা করতে প্ররোচিত করে, পাপ আগ্রাসী অবস্থান নিয়েছে, যদিও তা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছেছে, তবুও প্রভু তাঁর ক্ষমার গুণে, যা আকাশও

অতিক্রম করে যায়, তাদের ক্ষমা করবেন। এই ক্ষমার সীমানা এমনকি ঈশ্বর-নিন্দা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, ঈশ্বর-নিন্দা হচ্ছে যে পাপ ঈশ্বরের নাম এবং সম্মানকে স্পর্শ করে। পৌল এই ক্ষমা পেয়েছিলেন যিনি ঈশ্বর-নিন্দা করেছিলেন (১ তীমথিয় ১:১৩)। ঠিক তাই আমরা বলতে পারি, 'পাপ ক্ষমা করায় তোমার মতো ঈশ্বর আর কে আছে?' এমনকি মনুষ্যপুত্রের বিরুদ্ধে যে কথা বলা হয় তাও ক্ষমা করা হবে; যেভাবে সেখানকার লোকেরা যারা তাঁর মৃত্যুতে ঘৃণা প্রকাশ করেছিল, যাদের অনেকে অনুতাপ করে ক্ষমা পেয়েছিল। খ্রীষ্ট এখানে মানুষের সব সন্তানের জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন যেন তারা তাদের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে তা ক্ষমা করে দিতে প্রস্তুত থাকে: আমি, একজন বধিরের মতো কিছু শুনতে পান নি। লক্ষ্য করুন, মানুষের সব পাপ ক্ষমা করা হবে কিন্তু মন্দ-আত্মাদের নয়; এটা হচ্ছে গোটা পৃথিবীর মানবজাতির প্রতি ভালবসার বহিঃপ্রকাশ, তা পতিত স্বর্গদূতদের ছাপিয়ে যায়, তাদের সব পাপই ক্ষমাযোগ্য।

(২) এখানে একটি ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়, 'পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে ঈশ্বর-নিন্দা করলে' যা এখানে একমাত্র অমার্জনীয় পাপ বলে বিবৃত হয়েছে। দেখুন,

(ক) এটি কেমন পাপ, পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কিছু বলা। দেখুন এই পাপর মাঝে কত গর্হিত পাপ রয়েছে যা অবশ্য অর্মাজনীয়ও। কিন্তু তাদের চিন্তার বিষয়ে জানতেন (২৫ পদ) । এটা পবিত্র আত্মার কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বলা সব কথা নয় অথবা তার কোন কাজের বিরুদ্ধে নয় অথবা কেবল পাপীদের নিজের ভেতরে পবিত্র আত্মার কাজে বাধা দান করা নয়, এখানে যেটা বলা হয়েছে 'কারণ তাহলে কে রক্ষা পাবে?' এটা আমাদের আদেশে মীমাংসা করা হয়েছে যে রক্ষার কাজ সর্বদা সেই অনুগ্রহের আনুকূল্য দ্বারা।

সুসমাচার হচ্ছে ক্ষতিপূরণের কাজ, কেউ এখানে নাম বা ব্যাখ্যা দ্বারা বাদ পড়ে না, কিন্তু যারা কেবল পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে ঈশ্বর-নিন্দা করে তারা বাদ পড়বে; যা সেই কারণেই নেতিবাচক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা হবে; ক্ষতিপূরণের শর্ত দ্বারা সব অহংকারী পাপী কার্যকরভাবে বাদ পড়ে যাবে। এই ঈশ্বর-নিন্দার ক্ষমা না পাওয়াটা খ্রীষ্টে মূল্য বা ঈশ্বরের ক্ষমার ভুলের কারণে নয় কিন্তু কারণ তা অপরিহার্যভাবে পাপীদের অঅনুতপ্ততা এবং অবিশ্বস্ততার কারণে হবে। আমাদের এটা ভাবার অবকাশ আছে যে কেউ এই পাপের দায়ে পড়ে না, যারা ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে এবং নির্দ্বিধায় তাঁর কাছ থেকে সেই ক্ষমা পাওয়ার প্রত্যাশা করে এবং তারা তা নিশ্চয়ই পাবে।

প্রাজ্ঞ ড. হুইটবি গভীর পর্যবেক্ষণে বলেন যে, খ্রীষ্ট যা, যারা সেই বিষয়ে বলে না (মার্ক ৩:২৮; লূক ১২:১০); তাদের সেই ঈশ্বর-নিন্দা ক্ষমা করা হবে। খ্রীষ্ট যখন পৃথিবীতে ছিলেন তখন যারা তার বিরুদ্ধে ঈশ্বর-নিন্দা করেছিল এবং তাঁকে বলেছিল মদখোর, প্রবঞ্চক, কাফের এবং এরকম আরো অনেক অজুহাত ছিল, কারণ তাঁর দৃশ্যমানতার স্বার্থপরতা এবং তাঁর বিরুদ্ধে জাতির অবজ্ঞা এবং তাঁর স্বর্গীয় মিশনের প্রমাণ, তাঁর স্বর্গে আরোহণের আগ পর্যন্ত পূর্ণমাত্রায় পৌঁছেনি এবং সে কারণেই তাদের অনুতাপের ভিত্তিতে তারা ক্ষমা পাবে।

(খ) যেভাবে বাক্যটি শেষ করা হল: তা ক্ষমা করা হবে না, এই পৃথিবীতেও না কিংবা আগামী পৃথিবীতেও না। যেমনটা ছিল তখনকার যিহূদী সিনাগগের অবস্থা, যেখানে আত্মার উদ্ধতভাবে পাপ করে যাওয়ার প্রায়শ্চিত্তের উৎসর্গ ছিল না; তা সুসমাচারের অনুগ্রহের অধীনেও নেই যাকে প্রায়ই শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে পৃথিবী আসছে, যেখানে চুক্তির রক্তকে

পদদলিত করার ক্ষমা কিংবা অনুগ্রহের আত্মাকে অবজ্ঞা করার ক্ষমা থাকবে না। সেখানে সরাসরি কোন প্রতিষেধকের বিপরীতে পাপের আরোগ্য হবে না। এটা ছিল আমাদের পুরাতন নিয়মের একটি আদেশ, পবিত্র স্থানে অপবিত্রের জায়গা নেই অথবা তা এখনও ক্ষমা করা হবে না, পাপীর নিজের বিবেকে, কিংবা সেই মহানদিনেও, যখন ক্ষমা প্রকাশিত হবে। অথবা এটা হচ্ছে একটা পাপ যা পাপীকে ক্ষণস্থায়ী এবং স্থায়ী শাস্তির জন্য দাঁড় করায়, যে ধ্বংস বর্তমানের এবং যে ধ্বংস আসছে।

২. খ্রীষ্ট এখানে অন্য খারাপ কথার বিষয়ে বললেন, যা হৃদয়ে মন্দতার রাজত্বের ফসল এবং তা সেখান থেকে বেরিয়ে আসে (৩৩-৩৫); এটা বলা হয়েছে, (২৫ পদ) যে যীশু তাদের চিন্তার বিষয়ে জানতেন এবং এখানে তিনি তাদের দিকে চোখ রেখে বললেন, দেখিয়ে দিলেন যে এটা কোন আশ্চর্য ব্যাপার নয় যে তারা বাজে কথা বলে, যখন তাদের হৃদয় মন্দ জিনিসে পূর্ণ হয়ে আছে; যাকে তারা এরপরও আড়াল হিসেবে রাখার চেষ্টা করতো, নিজেদেরকে কেবল মানুষ জ্ঞান করে। আমাদের প্রভু যীশু সে কারণেই তিনি তাদের গোড়ার কথা বললেন এবং তাদের হেদায়েত করলেন; তাই হৃদয় পবিত্রীকৃত হোক এবং তা থেকে ভাল কথাই বেরিয়ে আসুক।

(১) হৃদয় হচ্ছে শেকড়, ভাষা হচ্ছে ফল (৩৩ পদ); যদি গাছের প্রকৃতি ভাল হয় তবে তা সেভাবেই ভাল ফল দেবে। যেখানে অনুগ্রহ হৃদয়ের মূল শাসক তবে তার ভাষা হবে কনানের ভাষা এবং বিপরীতে তাতে যদি মাংসিক অভিলাষ রাজত্ব করে তবে তা বেরিয়ে আসবে; রোগাক্রান্ত ফুসফুস শ্বাসপ্রশ্বাসে সমস্যা করে: মানুষের ভাষা বলে দেয় সে কোন দেশের, তাই এভাবে কোন প্রকার আত্মা তারা ধারণ করে; 'যদি গাছ ভাল হয় তবে ফলও ভাল হবে'। তাই হৃদয়কে খাঁটি করুন, তাহলে আপনি খাঁটি ঠোঁট এবং খাঁটি জীবন পাবেন; অথবা 'আবার গাছ খারাপ হলে তার ফলও খারাপ হবে।' আপনি ভাল গাছ হবার জন্য কলম করতে পারেন এবং তা যদি একীভূত হয়ে যায়, তবে তা ভাল ফল দেবে কিন্তু যদি তা বিচ্ছিন্ন আচরণ করে তবে যে জল খান যে জায়গাতেই তা লাগান না কেন তা খারাপ ফলই দেবে। মনে রাখুন, হৃদয় যতক্ষণ না পরিবর্তিত হয়ে নতুন কাঠামো হয় ততক্ষণপর্যন্ত জীবন পূর্ণরূপে সংস্কার হবে না। এই ফরীশীরা খ্রীষ্টের বিষয়ে খারাপ চিন্তা করে লজ্জায় পড়ে গিয়েছিল কিন্তু খ্রীষ্ট এখানে দেখালেন যে তাদের জন্য এটা কতটা অর্থহীন যে তারা তাদের শিকড় ভুলে যেতে চায়, তা ঢাকবার চেষ্টা করে, যখন তারা কখনও একে নির্জীব করার বিষয়ে ভাবেনি তার তিক্ততা এবং জ্বালাতন তারা বহন করছে। মনে রাখুন, ভাল হবার জন্য আমাদের অনেক বেশি যত্নবান হতে হবে যতটা বাহ্যিকভাবে দেখা যায় তার চেয়ে অনেক বেশি করে।

(২) হৃদয় হচ্ছে আধার, কথা হচ্ছে তার প্রবাহ (৩৪ পদ); হৃদয় যা দিয়ে পূর্ণ মুখ দিয়ে সেটাই বেরিয়ে আসে, যেভাবে বর্ষায় তার জল বেড়ে গিয়ে উপচে পড়ে। খারাপ আত্মাকে এখানে বলা হয়েছে খারাপিকে পাঠায় যেভাবে আধার তার জলকে গ্রহণ করে (যিরমিয় ৬:৭)। সমস্যাপূর্ণ আধার এবং একটি দূষিত গোড়া যেভাবে শলোমন বলেছিলেন (হিতোপদেশ ২৫:২৬) তা অবশ্যই নোংরা এবং অসন্তোষজনক ঢেউ উসকে দেয়। মন্দ কথা হচ্ছে মন্দ হৃদয়ের প্রকৃত উৎপাদন এবং স্বাভাবিক ফল। অনুগ্রহের লবণ ছাড়া আর কিছুই গোড়ায় ঢেলে না দিলে জলকে ঠাণ্ডা করতে পারে না, কথার মৌসম এবং তা খারাপ যোগাযোগকে খাঁটি করে। এটা তারা চেয়েছিল তারা ছিল মন্দ এবং মন্দ কীভাবে ভাল কথা

বলতে পারে? তারা ছিল সাপের বংশধর; বাপ্তিস্মদাতা যোহন তাদের এভাবেই অভিহিত করেছিলেন (৩:৭)। তাদের সেই বৈশিষ্ট্য এ পর্যন্ত এতটুকু বদলায়নি; কারণ একজন ইথিপীয় কি তার চামড়া বদলে ফেলতে পারে? লোকেরা ফরীশীদের ঈশ্বরভক্তের বংশধর বলে ভাবত কিন্তু খ্রীষ্ট তাদের সাপের বংশধর বলে অভিহিত করলেন; যার ভেতরে খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুসমাচারের বিরোধিতা ছিল। এখন সাপের বংশধরদের কাছ থেকে কী আশা করা যেতে পারে, ক্ষতিকর বিষ ছাড়া? সাপ কি তার বিষ ছেড়ে দিতে পারে? মনে রাখুন, খারাপ আচরণ খারাপ লোকদের কাছ থেকেই প্রত্যাশা করা যায়, যেভাবে প্রাচীন প্রবাদে রয়েছে, 'খারাপি খারাপ থেকে চলতে থাকে (১ শমূয়েল ২৪:১৩)। মন্দ লোক মন্দভাবেই কথা বলবে (যিশাইয় ৩২:৬)। যারা নিজেরা মন্দ তারা ভাল কথা বলতে দক্ষ হয়ে উঠতে কিংবা ভাল কথা বলতেও পারে না, যেভাবে তারা বলে। খ্রীষ্ট চান তার শিষ্যেরা জানুক যে তাদের কী প্রকার লোকদের মাঝে বাস করতে হবে, যেন তারা জানতে পারে তাদের কোন দিকে তাকাতে হবে। তারা হচ্ছে স্করপিয়নের মাঝে হেজকিলের মতো ((যিহিষ্কেল ২:৬) এবং তারা একে অদ্ভুত ভাববেন না যদি তা তাদের কাটে, দংশন করে।

(৩) হৃদয় হচ্ছে কোষাগার, কথা হচ্ছে যা সেখানে জমা করা হয় (৩৫ পদ); এবং তা থেকেই মানুষের চরিত্র চিত্রণ করা যাবে এবং বিচারও।

(ক) ভাল মানুষের চরিত্র হচ্ছে তার হৃদয়ের ভাল সম্পদ এবং যেখান থেকে উপলক্ষ মতো ভাল জিনিসই বেরিয়ে আসে। অনুগ্রহ, সান্ত্বনা, অভিজ্ঞতা, ভাল জ্ঞান, ভাল আকর্ষণ, ভাল আচরণ এসবই হৃদয়ের মূল্যবান সম্পদ; ঈশ্বরের বাক্য সেখানে লুকিয়ে আছে, ঈশ্বরের আইন সেখানে লেখা আছে, স্বর্গীয় সত্য তাকে পরিচালিত করছে, তা প্রকৃতই সম্পদ মূল্যবান, প্রয়োজনীয়, তা আছে নিরাপদে এবং গোপনে, যেভাবে পণ্য গুদামে জমা করে রাখা হয়। কিন্তু দরকারমতো তা ব্যবহার করতে বের করে আনতে সবসময়ের জন্য প্রস্তুত থাকে। একজন ভাল মানুষ এভাবেই নিজেকে গড়ে তোলেন, প্রয়োজনে তা থেকে ব্যবহার করেন যেভাবে যোষেফ তার সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে করেছিলেন। ঈশ্বরের গৌরবের জন্য ভাল বলেন ও করেন এবং অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন (হিতোপদেশ ১০: ১১, ১৩, ১৪, ২০, ২১, ৩১, ৩২)। এটা ভাল জিনিস বের করে আনে। কেউ কেউ ভাল কাজ করার ভান করেন যদিও তার কোষাগারে তা নেই এবং তা শীঘ্রই ধরা পড়ে যায়, কেউ কেউ ভাব দেখায় যে তারা কোষাগারে অনেক কিছু আছে কিন্তু তার কোন প্রমাণ দেখাতে পারেন না। তারা আশা করে তা তাদের মাঝে আছে এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়, তাদের কাজ ও কথা যাই হোক না কেন, তাদের ভাল হৃদয় আছে কিন্তু কাজ ছাড়া বিশ্বাস মৃত বলে প্রতিপন্ন হয়; এবং কারও কারও জ্ঞান ও বিজ্ঞতার ভাল সঞ্চয় থাকে কিন্তু তারা এর প্রয়োগ জানেন না ফলে তা বেরিয়ে আসে না। তাদের প্রতিভা আছে কিন্তু তা কী করে কাজে লাগাতে হয় তা তারা জানে না। এর মাঝে পূর্ণাঙ্গ খ্রীষ্টানরা ঈশ্বরের চিত্র বহন করেন, যার কথা ও কাজ উভয়ই ভাল।

(খ) পক্ষান্তরে খারাপ মানুষের বৈশিষ্ট্য এমন, তার হৃদয়ে রয়েছে খারাপি এবং এ থেকে কেবল খারাপ জিনিসই বেরিয়ে আসে। লালসা এবং খারাপি এই হৃদয়কে পরিচালিত করে, এ থেকেই সব খারাপ কথা ও কাজ বেরিয়ে আসে যা ঈশ্বরকে অসম্মানিত করে এবং অন্যদের আহত করে (দেখুন আদি ৬:৫, ১২; মথি ১৫:১৮-২০; যাকোব ১:১৫)। কিন্তু খারাপির কোষাগার (হিতোপদেশ ১০:২) ক্রোধের পাত্রে পরিণত হবে।

(৩) খ্রীষ্ট এখানে নিষ্ক্রীয় কথার বিষয়ে বললেন এবং দেখালেন তাদের মাঝেও মন্দতা রয়েছে (৩৬, ৩৭ পদ)। এরকম বহু খারাপ কথা ফরীশীরা বলত। এটা আমাদের ভাবতে বলে বিচারের দিনের বিষয়ে, সেদিন আমাদের কথা যাচাই করে দেখা হবে এবং তাই বিবেচনা করুন,

(১) মুখ দিয়ে করা পাপ কতটা নির্দিষ্ট করে হিসেব নেওয়া হবে সেই দিনে; এমনকি প্রতিটি নিষ্ক্রিয় কথার ক্ষেত্রেও অথবা আলোচনার জন্য, যে মানুষ কথা বলে তারা এর অন্তর্ভুক্ত হবে। এটা প্রকাশ করে যে,

(ক) আমরা যা বলি তার প্রতিটি কথা ঈশ্বর লক্ষ্য করেন, এমনকি যেসব কথা আমরা নিজেরাও লক্ষ্য করি না (গীত ১৩৯:৪)। 'মুখে আনার আগেই আমার কথা তুমি জেনে যাও'। যদিও পরিকল্পনা ও না ভেবেই তা বলা হয় তবুও ঈশ্বর এর প্রতি লক্ষ্য রাখেন।

(খ) সেই অর্থহীন, নিষ্ক্রিয়, অপ্রয়োজনীয় কথা ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করে, যা কোন ভাল উদ্দেশ্য থেকে করা হয় না, তা ভাল প্রয়োগে ব্যবহৃত হয় না, এটা হচ্ছে অর্থহীন এবং তুচ্ছ হৃদয়ের উৎপাদন। এইসব নিষ্ক্রিয় কথা সেই বোকার মতো কথা এবং তামাশা করার মতো যা নিষেধ করা হয়েছে (ইফিষীয় ৫:৪)। এটা হচ্ছে সেই পাপ যা কদাচিত কথার ফুলঝুরি ছিটাতে এবং অলাভজনক কথায় মেতে উঠতে চায় (ইয়োব ১৫:৩)।

(গ) আমরা অবশ্যই তাড়াতাড়ি নিষ্ক্রিয় কথার বিষয়ে সাবধান হব, তা না হলে তা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, আমাদের অকর্মণ্য সেবাকারী হিসেবে প্রমাণ করবে যে, আমাদের মাঝে যে দান দেওয়া হয়েছে তার ফল দেখাতে হবে, তা বাড়াতে হবে। যদি আমরা আমাদের নিষ্ক্রিয় কথার জন্য অনুতাপ না করি এবং খ্রীষ্টের রক্তে সেজন্যে আমাদের হিসেব সমান সমান না হয় তবে আমরা অকৃতকার্য হই।

(২) এর ভিত্তিতে যে বিচার হবে তা কতটা কঠিন হবে (৩৭ পদ); 'আপনার কথার দ্বারাই নির্ধারণ করা হবে আপনি দোষী না নির্দোষ; মানুষের বিচারের একটি সাধারণ নিয়ম এবং তা এখানে ঈশ্বরের নিয়মের ক্ষেত্রেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মনে রাখুন, আমাদের আলোচনার স্বাভাবিক গতি, তা মূল্যবান না মূল্যবান নয়, তা আমাদের জন্য সাক্ষ্য দেবে অথবা বিরুদ্ধে, সেই মহান দিনে। যাদের ধার্মিক বলে দেখা যায় কিন্তু তাদের জিহ্বায় লাগাম পরায় না তাদের সেই জিহবাই সেদিন তাদের ধোঁকা দেবে, তাদের অর্থহীন ধর্মচর্চাকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসবে (যাকোব ১:২৬)। কেউ কেউ মনে করেন যে, খ্রীষ্ট এখানে সেই ইলীফসের দিকে নির্দেশ করেছেন (ইয়োব ১৫:৬), 'তোমার কথা তোমার বিরুদ্ধে বলবে এবং আমি নই অথবা শলোমনের লেখায় আরও পরিষ্কার হয়, মৃত্যু এবং জীবন হচ্ছে জিহবার ক্ষমতার মধ্যে (হিতোপদেশ ১৮:২১)।

মথি ১২:৩৮-৪৫

খ্রীষ্টের সাথে এখানে কথোপকথনরত ফরীশীরা সম্ভবত সেই দলে ছিল না যারা তাঁকে অভিযুক্ত করেছিল (২৪ পদ) এবং তারা তিনি যেসব চিহ্ন দেখিয়েছিলেন তার কৃতিত্ব তাঁকে দিতে চায় নি; কিন্তু এখানে তাদেরই আরেক দল যারা সেগুলোর নিন্দা করার কোন কারণ খুঁজে পায় নি কিন্তু তিনি যে চিহ্ন দেখিয়েছিলেন তাতে সন্তুষ্ট হতে চায় নি, কিংবা সেগুলোকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতে চায় নি যতক্ষণ না তিনি তাদের চাহিদা মতো নতুন

কোন চিহ্ন দেখান। এখানে,

ক. তাঁর প্রতি তাদের সম্বোধন (৩৮ পদ)। তারা তাঁকে 'প্রভু' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিল, ভান করেছিল যে, তাঁর জন্য তাদের মধ্যে শ্রদ্ধা আছে, যখন তারা তাঁকে নির্যাতন করতে মনস্থ করেছিল; যারা তাঁকে প্রভু বলে তারা সবাই তাঁর প্রকৃত সেবাকারী নয়। তাদের অনুরোধ ছিল যেন তিনি আরেকটি চিহ্ন-কাজ দেখিয়ে তাঁর স্বর্গীয় মিশন প্রমাণ করেন (যাত্রা ৪:৮, ৯)। তিনি একটি ধর্মের আদর্শ নিয়ে এসেছিলেন যা চিহ্ন-কাজের উপর স্থাপিত হয়েছিল এবং সে কারণেই তিনি সেইসব কাজ করেছিলেন, কিন্তু এখন একটি চিহ্ন দেখার দাবি ছিল পুরোপুরি অযৌক্তিক যখন তিনি ইতোমধ্যে অনেকগুলো চিহ্ন দেখিয়ে নিজেকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলে প্রমাণ করেছেন। মনে রাখুন, ঈশ্বরকে প্রস্তাব দিয়ে গর্বিত হওয়াটা মানুষের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক এবং তখন তা মূলত না করার জন্যই কারণ তৈরি করা হয়; কিন্তু মানুষের আক্রমণ তার রক্ষণ হয় না।

খ. তাদের এই সম্বোধন ও চাওয়ার প্রেক্ষিতে তিনি যে উত্তর দিলেন,

(ক) তিনি তাদের চাওয়াকে অভিযুক্ত করলেন, তিনি তাদের বিশ্বাসঘাতক ও দুষ্ট লোক বলে অভিহিত করলেন (৩৯ পদ)। তিনি কেবল ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকদেরই অভিযুক্ত করলেন না কিন্তু যিহূদীদের সবাইকেও অভিযুক্ত করলেন; তাদের সবাই ছিল নেতার মতো, মন্দকর্ম সম্পাদনকারীর বীজ এবং সাফল্য; তারা ছিল মন্দ প্রজন্ম, তা কেবল খ্রীষ্টের চিহ্ন-কাজ দেখে মন কঠিন করে রাখার জন্য নয়, কিন্তু নিজেদের তাঁকে নির্যাতন করতে স্থাপন করার জন্য এবং তাঁর চিহ্ন-কাজগুলোকে অভিযুক্ত করার জন্য। তারা ছিল বিশ্বাসঘাতক প্রজন্ম।

(১) বে বিশ্বাস সন্তান হিসেবে তারা তাদের পূর্বসুরীদের বিশ্বাস ও বাধ্যতা থেকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে সরে গেছে, অব্রাহাম এবং ইস্রায়েল তাদের সিদ্ধ করেন নি (দেখুন ইশা ৫৭:৩)।

অথবা (২) বিশ্বাসঘাতক স্ত্রী হিসেবে তারা ঈশ্বরকে ছেড়ে গেছে, যারা চুক্তির দ্বারা তাঁর পত্নী হয়েছিল; তারা মূর্তিপূজার দ্বারা অসতী হয় নি যেভাবে তারা দাসত্বের সময়ে ছিল, কিন্তু তারা অবিশ্বস্ততার দরুন দোষী হয়েছে এবং সব খারাপি এবং অসতীও হয়েছে। তারা তাদের নিজেদের তৈরি দেবতার দিকে তাকায়নি, কিন্তু তারা উদ্ভাবনের জন্য চিহ্নের খোঁজ করেছিল এবং এটা ছিল মূর্তিপূজা।

২. তিনি তাদের ইতোমধ্যে যেসব চিহ্ন দেখিয়েছেন তার বাইরে আর কোন চিহ্ন দেখাবেন না বলে জানালেন, তবে কেবল ভাববাদী যোনার চিহ্নই দেখাবেন। মনে রাখুন, যদিও খ্রীষ্ট পবিত্র বাসনা ও অনুরোধ শোনার এবং তাঁর উত্তর দেবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকেন, তবুও তিনি খারাপ কামনা এবং তামাশাকে জয়ী হতে দেন না। যারা ভুল জিনিস চায়, তারা তা পায় না। চিহ্নগুলো তাদের কাছে গৃহীত হয়েছিল যারা তাদের বিশ্বাসের নিশ্চয়তার জন্য তা প্রত্যাশা করেছিল, যেভাবে অব্রাহাম এবং গিদিয়ন দেখেছিলেন; কিন্তু তা তাদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল যারা তাদের অবিশ্বাসের জন্য একে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করাতে সচেষ্ট ছিল।

সেটাই খ্রীষ্ট কেবল বললেন, তারা কখনও আর কোন চিহ্ন-কাজ দেখবে না; কিন্তু তাঁর বিস্ময়কর ভালত্ব দেখবে।

(১) তাদের জন্য সেই চিহ্ন-কাজগুলো পুনরায় ঘটতে দেখবে, কারণ অন্যদের

উপকারের জন্য এবং পর্যাপ্ত বিশ্বাসের জন্য।

(২) তারা একটি চিহ্ন পাবে যা সবচাইতে আলাদা এবং তা হচ্ছে তাঁর মৃত্যু থেকে নিজের শক্তিতে পুনরুত্থান, তাঁকেই এখানে যোনার চিহ্নের সাথে তুলনা করা হয়েছে, এটা তাদের নিশ্চয়তার জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং তা খ্রীষ্টের নিজের মহিমা প্রকাশের বড় প্রমাণ হিসেবে; কারণ এর দ্বারা তাকে ক্ষমতার সাথে ঈশ্বরের পুত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে (রোমীয় ১:৪)। এটা ছিল বাকি সবগুলোকে ছাপিয়ে যাওয়ার মতো চিহ্ন, তা সবগুলোকে সম্পন্ন করবে এবং তাদের পুরস্কৃত করবে, 'তারা যদি আগের চিহ্ন বিশ্বাস না করে তবে এটাতে বিশ্বাস করবে (যাত্রা ৪:৯) এবং যদি তা তাদের সন্তুষ্ট করতে না পারে তবে আর কিছুই পারবে না।' এবং তবুও যিহূদীদের অবিশ্বাস একে এড়িয়ে যেতেও পিছপা হয় নি, তারা বলেছিল, তার শিষ্যেরা এসে চুরি করে তার মৃতদেহ নিয়ে গেছে। কারণ তাদের মতো আর কেউ অনিরাময়যোগ্য অন্ধ নয় যারা আর দেখবে না বলে মনস্থ করেছে।

এখন ভাববাদী যোনার চিহ্নটি এখানে তিনি মোটামুটি বিশদে বললেন (৪০ পদ), যেভাবে যোনা তিন দিন এবং তিন রাত মাছের পেটে ছিলেন এবং এরপর নিরাপদে ভালভাবে বেরিয়ে এলেন, এভাবে খ্রীষ্টও কবর থেকে উত্থিত হবেন।

(ক) সেভাবে খ্রীষ্টের জন্য ছিল কবর, যেভাবে যোনার জন্য ছিল মাছ। সেদিন তাঁকে সমুদ্রে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল, অনেকের প্রাণ বাঁচানোর জন্য তিনি ঝড়ের মধ্যে ঝাঁপ দিতে তৈরি ছিলেন, তিনি সেখানে থাকলেন মাছের পেটের মধ্যে (যোনা ২:২) এবং দৃশ্যত তিনি প্রভুর দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন।

(খ) যোনা যতক্ষণ মাছের পেটে ছিলেন যীশুর ততক্ষণই কবরে থাকলেন, তিন দিন এবং তিন রাত; তা পুরো তিন দিন এবং রাত ছিল না; এটা অনুমিত, যোনা তিমির পেটে বেশি সময় ছিলেন না কিন্তু তিনটি প্রাকৃতিক দিনের অংশে (গ্রীকরা একে বলে নাইখথেমারিয়াই); তাঁকে দুপুরে কবর দেওয়া হয়েছিল সপ্তাহের ষষ্ঠ দিনে এবং প্রথম দিনে তিনি উত্থিত হলেন, এটা বলার সাধারণ ধরন (দেখুন ১ রাজাবলি ২০:২৯; ইষ্টের ৪:১৬; ৫:১; লূক ২:২১)। যোনা বন্দি হয়েছিলেন তার নিজের পাপর জন্য কিন্তু খ্রীষ্ট আমাদের পাপর জন্য কবরপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

(গ) যোনা যেভাবে তিমির পেটে সেই আশ্বাসে যেভাবে নিজেকে শান্ত করেছিলেন যে, তিনি আবার ঈশ্বরের পবিত্র মন্দির দেখতে পাবেন (যোনা ২:৪), সেভাবে খ্রীষ্ট যখন কবরে গেলেন তিনি এই আশা নিয়ে গেলেন এমন একজনের মতো নিঃসন্দেহ হয়ে যিনি খারাপি দেখবেন না (প্রেরিত ২:২৬, ২৭)।

(ঘ) যেভাবে যোনা তৃতীয় দিনে তাঁর কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং জীবনে ফিরে এলেন মৃত্যুর প্রার্থনা থেকে (কারণ মৃত জিনিসগুলোকে বলা হয় জলের নিচের অবয়ব হিসেবে, ইয়োব ২৬:৫), সেভাবে খ্রীষ্টও তৃতীয় দিনে জীবনে ফিরে আসবেন এবং অযিহূদীদের কাছে সুসমাচার পাঠাতে কবর থেকে উত্থিত হবেন।

৩. খ্রীষ্ট এ থেকে সেকালের লোকদের দুঃখজনক চরিত্র এবং তাদের পরিস্থিতিকে উপস্থাপন করলেন যাদের মাঝে তিনি বাস করতেন, সেকালের লোকেরা যারা নতুন হয়ে উঠবে না এবং সে কারণেই তারা ধ্বংস হবে এবং তিনি তাদের চরিত্র দিলেন, যেভাবে তা সেই বিচারের দিনেও বলবৎ থাকবে, সেদিনের পূর্ণ আবিষ্কার এবং চূড়ান্ত বাক্য দ্বারা। লোকদের এবং জিনিসগুলোকে এখন মিথ্যে রঙে দেখা যাচ্ছে, চরিত্র এবং অবস্থা এখনও

বদলে ফেলা যায়; যদি সে কারণেই আমরা একটি সঠিক হিসেব করি, তবে সেদিনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে পারব, জিনিসগুলো প্রকৃতই যা অনন্তকালীন।

এখন খ্রীষ্ট যিহূদীদের প্রসঙ্গ আনলেন,

(১) এমন একটি প্রজন্ম হিসেবে যাদের বিরুদ্ধে নীনবীর লোকেরা উঠে সাক্ষ্য দেবে, যারা যোনার প্রচার শুনে অনুতাপ করেছিল তারা বিচারের দিনে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে (৪১ পদ)। তাদের কাছে যোনার চিহ্নটি ছিল খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের বিষয়ে, কিন্তু তা যিহূদীদের উপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয় নি, যেভাবে যোনার কথায় নীনবীর লোকেরা কান দিয়েছিল; তারা তা শুনে অনুতাপ করে তাদের ওপর নেমে আসা ধ্বংসকে প্রতিরোধ করতে পেরেছিল, কিন্তু যিহূদীরা তারপরও তাদের অবিশ্বাসের দরুন শক্ত হয়ে থাকল যা তাদের ধ্বংসই ডেকে আনছে; এবং সেদিন নীনবীর লোকদের অনুতাপ তাদের পাপকে গুরুতর করে তুলবে এবং যারা খ্রীষ্টের শিক্ষায় কান দেয় নি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে এবং তাদের বিরুদ্ধেও যাদের কাছে খ্রীষ্ট এখন প্রচার করছেন; কারণ এইজন্যেই যে, খ্রীষ্ট যোনার চেয়েও মহান।

(১) যোনা কেবল মানুষ ছিলেন, মানুষের মতোই অনুভূতি এবং পাপের স্বভাব তাঁর ছিল, যেমন আমরা। কিন্তু খ্রীষ্ট হচ্ছে ঈশ্বরের পুত্র।

(২) যোনা ছিলেন নিনেভেতে একজন পরদেশি, তিনি এমন একজন হিসেবে তাদের কাছে গিয়েছিলেন যে তাদের দেশের ধ্বংসের বিষয়ে বলছে; কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর নিজের জায়গায় এসেছিলেন, তবুও যতটা না তিনি যিহূদীদের কাছে প্রচার করছিলেন তার চেয়েও বেশি তিনি প্রচারিত হয়েছেন খ্রীষ্টানদের কাছে যারা তাঁর নামেই পরিচিতি পেয়েছে।

(৩) যোনা একটি সংক্ষিপ্ত বাণী প্রচার করেছিলেন এবং তাঁর সাথে মহান গাম্ভীর্যপূর্ণ বিষয় ছিল না, কিন্তু যেভাবে তিনি একাকী পথ পার হলেন, খ্রীষ্ট তাঁর আহ্বানকে নতুনীকরণ করলেন, তা স্থাপন করলেন, বললেন এবং শিক্ষা দিলেন সমাজগৃহগুলোতে।

(৪) যোনা তাদের কাছে ধ্বংস এবং ক্রোধের কথা ছাড়া আর কিছুই বলেন নি, তাদের কোন নির্দেশনা, পরিচালনা কিংবা অনুতাপ করতে উৎসাহ দেন নি; কিন্তু খ্রীষ্ট আমাদের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়ার পাশাপাশি দেখালেন কীভাবে অনুতাপ করতে হবে এবং আমাদের নিশ্চিত করলেন যে আমাদের অনুতাপ গৃহীত হয়েছে, কারণ স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট।

(৫) যোনা তার সাক্ষ্যের সত্যতা প্রমাণে কোন চিহ্ন-কাজ করেন নি, নীনবীর প্রতি কোন ভাল অভিপ্রায় দেখান নি কিন্তু খ্রীষ্ট অনেক চিহ্ন-কাজ করলেন এবং সবই ছিল ক্ষমার চিহ্ন-কাজ; তবুও নীনবীর লোকেরা যোনার প্রচার শুনে মন ফিরিয়েছিল, কিন্তু যিহূদীরা খ্রীষ্টের প্রচারে কান দিল না। মনে রাখুন, অল্পজনের ভালত্ব, যারা তাদের কাজে অল্পই সাহায্য করে এবং অগ্রগামিতা পায় তা অনেকের খারাপিকে দোষী করবে। যারা গোধূলিতে তাদের শান্তিদায়ক জিনিসগুলো খুঁজে পায় তারা তাদের লজ্জা দেবে যারা দুপুর বেলায়ও হাতড়ে ফেরে।

(খ) এমন প্রজন্ম হিসেবে যাদের দক্ষিণ দেশের রাণী, শিবার রাণী দোষী করবেন (৪২ পদ)। নিনেভে তাদের অভিযুক্ত করবে, কারণ তারা অনুতাপ করে নি, কিন্তু শিবার রাণী তাদের অভিযুক্ত করবেন যে, কেন তারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে নি। তিনি দূর দেশ থেকে শলোমনের বিজ্ঞতা চাক্ষুস করতে এসেছিলেন; তবুও লোকেরা খ্রীষ্টের বিজ্ঞতা শুনেও

চাক্ষুস করতে আসল না, যদিও সবদিক থেকেই তিনি শলোমনের চেয়েও মহান ছিলেন।

(১) সেবার রাণী আমন্ত্রণ ছাড়াই শলোমনের কাছে এসেছিলেন এবং তাতে স্বাগত জানাবার কোন প্রতিশ্রুতিও ছিল না; কিন্তু আমরা খ্রীষ্টে তাঁর পায়ের নিচে বসে তাঁর কথা শোনার জন্য আমন্ত্রিত।

(২) শলোমন ছিলেন জ্ঞানী, কিন্তু যীশু নিজেই ছিলেন জ্ঞান, যাঁর ভেতরে সব জ্ঞান লুকানো আছে।

(৩) শিবার রাণীকে শলোমনের কাছে আসতে অনেক প্রতিবন্ধকতা পার হয়ে আসতে হয়েছিল, তিনি ছিলেন একজন নারী, ভ্রমণের জন্য মানানসই ছিলেন না, সেই যাত্রাপথ ছিল দীর্ঘ এবং বিপদের ভয়ও তাতে ছিল; তিনি ছিলেন একজন রাণী এবং তিনি রাজ্য ছেড়ে গেলে তা কে সামলাবে? কিন্তু আমাদের সামনে কোন বাধা নেই।

(৪) তিনি নিশ্চিত ছিলেন না যে তার এই যাত্রা কতটা ফল নিয়ে আসবে; বাড়িয়ে বলাটা তো লোকের স্বভাব। হতে পারে তিনি তার নিজ দেশেই সেই জ্ঞানীদের পেতেন যারা তাকে উপযুক্ত পরামর্শ দিতে সক্ষম ছিল; তবুও শলোমনের খ্যাতি শুনে তিনি তাকে দেখতে এলেন। কিন্তু আমরা এরকম অনিশ্চয়তার মাঝে খ্রীষ্টের কাছে আসি না।

(৫) তিনি আসলেন পৃথিবীর দূর প্রান্ত থেকে; কিন্তু খ্রীষ্টকে আমরা আমাদের মাঝেই পাই এবং তাঁর বাক্য আমাদের কাছে রয়েছে: দেখ তিনি দ্বারে দাঁড়িয়ে আঘাত করছেন।

(৬) দৃশ্যত সেবা দেশের রাণী এসেছিলেন দর্শন, রাজনীতি বিষয়ক জ্ঞানের জন্য; কিন্তু যা প্রকৃত জ্ঞান যা আমাদের লাভ করা উচিত তা খ্রীষ্টের কাছে রয়েছে, পরিত্রাণের জ্ঞান।

(৭) তিনি কেবল শলোমনের কাছ থেকে জ্ঞানের কথা শুনতে পারতেন; শলোমন তাকে জ্ঞান দিতে পারতেন না; কিন্তু খ্রীষ্ট যারা তাঁর কাছে আসে তাদের জ্ঞান দেবেন, উপরন্তু তিনি নিজে ঈশ্বরের দেওয়া জ্ঞান হবেন। তাই এসবের নিরিখে আমরা যদি খ্রীষ্টের জ্ঞানের কথা না শুনি তবে শলোমনের জ্ঞানের কথা শোনার জন্য সেবা দেশের রাণীর অগ্রসরতা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে; কারণ যীশু খ্রীষ্ট শলোমনের চেয়েও মহান।

(গ) এমন প্রজন্ম হিসেবে যারা শয়তানের ক্ষমতার অধীনে থাকতে নিবেদিতপ্রাণ ছিল, ফলে যে প্রক্রিয়ার দ্বারা তার রাহুমুক্ত হওয়া যায় তা তারা প্রয়োগ করে নি। তাদের এখানে এমন একজনের সাথে তুলনা করা হয়েছে যার মধ্য থেকে ভূত বেরিয়ে গেছে কিন্তু দ্বিগুণ ক্ষমতায় ফিরে এসে পুনরায় তার মধ্যে বাস করতে শুরু করেছে (৪৩-৪৫)। ভূতকে এখানে বলা হয়েছে অশুচি আত্মা; কারণ সে তার খাঁটি স্বভাবের পুরোটাই হারিয়েছে এবং মানুষের মাঝে সব প্রকারের খারাপি প্রবেশ করিয়ে এবং তাতে স্থির থেকে সে আনন্দিত হয়। এখন,

(ক) দৃষ্টান্তটি মানুষের দেহকে সে কীভাবে নিজের করে নেয় সে কথা তুলে ধরে। খ্রীষ্ট মাত্রই একটি ভূত ছাড়িয়েছেন এবং তারা বলেছে তিনি একজন ভূত, তিনি তাদের এর সূত্র ধরে এর মধ্য দিয়ে দেখালেন যে, তারা শয়তানের কতটা ক্ষমতার অধীনে রয়েছে। এটা আরও প্রমাণ যে, খ্রীষ্ট কখনোই শয়তানি ক্ষমতায় ভূত ছাড়াননি। কারণ তা না হলে সেই ব্যক্তিটির মাঝে পুনরায় ভূত এসে উপস্থিত হতো। কিন্তু খ্রীষ্ট তাকে চূড়ান্তভাবে তাড়িয়েছিলেন; এবং সেখানে পুনর্বার প্রবেশের কোন সুযোগ ছিল না; আমরা তাকে দেখি তিনি মন্দ-আত্মাকে বেরিয়ে যেতে বলেছেন এবং তা আর ফিরে আসে নি (মার্ক ৯:২৫)।

সম্ভবত ভূতেরা এভাবে কখনও কখনও অধিকৃত ব্যক্তির সাথে খেলায় মেতে উঠতে অভ্যস্ত ছিল; সে বেরিয়ে যেত এবং তারপর আরও ক্ষোভের সাথে পুনরায় জায়গা দখল করতো; তা থেকে দেখা যায় ব্যক্তিটির অবস্থা আরও খারাপ হতো। যখন ভূত বেরিয়ে যায়, সে অস্থিরবোধ করে, কারণ সে মন্দকাজ ছাড়া ঘুমোতে পারে না (হিতোপদেশ ৪:১৬), সে শুষ্ক স্থান দিয়ে হাঁটে, দুঃখিত জনের মতো, সে বিশ্রাম খোঁজে কিন্তু কোথাও পায় না, যতক্ষণ না সে পুনরায় সাবেক জায়গায় ফিরে আসে। যখন খ্রীষ্ট লোকের মধ্য থেকে বাহিনী ভূতকে তাড়ালেন তখন তারা শুকরের পালে প্রবেশ করার অনুমতি চাইছিল, সেখানে তারা বেশিক্ষণ শুকনো জায়গায় থাকে না, কিন্তু জলে পড়ে গিয়েছিল।

(খ) খ্রীষ্ট দৃষ্টান্তটি টেনেছিলেন যিহূদী জাতি এবং তাদের উপাসনা গৃহের অবস্থা তুলে ধরার জন্য; তাই তারা হবে সেই খারাপ প্রজন্ম, যারা এখন সুসমাচারকে বাধা দিচ্ছে কিন্তু চূড়ান্তভাবে তা প্রত্যাখ্যান করবে। ভূত, যাদের খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যেরা অনেক যিহূদীদের মাঝ থেকে ছাড়িয়েছিলেন, দৃশ্যত বাকি কাজ অযিহূদীদের জন্য, যার লোকদের এবং মন্দির থেকে খ্রীষ্টানরা তাকে বিতাড়ন করবে; তাই ড. হুইটবি বলেন: অথবা কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না অবিশ্বাসী পৃথিবীতে এরকম তৃপ্তিদায়ক, প্রত্যাশাব্যঞ্জক বাসগৃহ, তার সন্তুষ্টিমতো, যেমনটা এখানে যিহূদীদের মাঝে আছে। তাই ড. হ্যামন্ড বলেন: সে কারণেই সে তাদের ভেতরে পুনরায় প্রবেশ করে; কারণ খ্রীষ্ট তাদের ভেতর প্রবেশপথ পান নি; এবং তারা তাদের একগুঁয়ে অবিশ্বাস এবং উত্তরোত্তর খারাপির জন্য ভূতকে গ্রহণ করতেই তৈরি, খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার চেয়ে এবং এরপর সে কঠিনভাবে সেখানে বসবে এবং এই লোকদের রাজ্য নিঃসন্দেহে অভিশপ্ত হয়ে উঠবে (ড. হ্যামন্ডের মতে) খ্রীষ্ট তাদের মাঝে আসার আগে যেমন ছিল অথবা যদি তাদের মধ্য থেকে শয়তানকে বের করা না হতো।

সেই জাতির দেহের কথাই এখানে বলা হয়েছে। প্রথমত, ধর্মত্যাগী লোকের মতো। বাবিলের বন্দিদশার পর তারা সংস্কার শুরু করে, তারা তাদের মূর্তি ত্যাগ করে এবং ধর্মের দিকে মন দেয়; কিন্তু তারা শীঘ্রই নিজেদের আবার কলুষিত করে তুলল। যদিও তারা মূর্তিপূজার দিকে ঝুঁকে পড়েনি, তবুও তারা সব ধরনের ধর্মবহির্ভূত কাজ তথা পাপের দিকে ফেরে। নীচতা বাড়তে থাকে এবং তা পূর্ণতা পেল খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুসমাচারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবার মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত, ধ্বংসের জন্য নির্ধারিত লোক হিসেবে। একটি নতুন কমিশন তাদেরকে অতিক্রম করে সেই ভণ্ডামিপূর্ণ জাতিকে চিহ্নিত করে ঈশ্বরের ক্রোধের জন্য চিহ্নিত করল (যিশাইয় ১০:৬) এবং রোমীয়দের হাতে তাদের আসন্ন আর সব কিছুকে ছাড়িয়ে যাবে, যেভাবে তাদের পাপ একেবারে উন্মুক্ত হয়ে পড়েছিল। এরপর সেই ক্রোধ তাদের উপর আসল চরমভাবে (১ থিষলনীকীয় ২:১৫, ১৬)। একে তাই সব জাতি এবং মণ্ডলীর জন্য সতর্কবার্তা হোক, যেন তারা তাদের পুরানো ভালবাসাকে ত্যাগ করতে মনোযোগী হয়, তাদের মাঝে ভাল কাজের যে সংস্কার শুরু হয়েছে তা চলমান থাকুক এবং যা তাদের ত্যাগ করে গেছে সেই খারাপিকে আমন্ত্রণ করে না আনে; কারণ প্রথম দশা থেকে শেষ দশা আরও খারাপ হয়ে ওঠে।

মথি ১২:৪৬-৫০

বিভিন্ন প্রেক্ষিতে আমাদের প্রভু যীশুর মুখ থেকে চমৎকার, প্রয়োজনীয় সব কথা

বেরিয়ে এসেছে; এমনকি তিনি যখন মূল প্রসঙ্গ থেকে সরে আসলেন তখনও তা গঠনমূলক হয়ে দেখা দিয়েছে; যেমনটা এখানে আমরা দেখতে পাই,

লক্ষ্য করুন, ক. খ্রীষ্টের কথা তখনও চলছিল এমন সময় তাঁর মা ও ভাইয়েরা যারা তার সাথে কথা বলবার জন্য বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন তারা তাঁর কথা বলায় বাধ সাধলেন (৪৬, ৪৭); তাদের প্রত্যাশা লোকদের ভিড় ঠেলে তাঁর কাছে পৌঁছল। তাঁর সেই ভাইয়েরা কারা যারা তাদের মায়ের সাথে দাঁড়িয়েছিলেন তা খোঁজার প্রয়োজন নেই (হতে পারে তারা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন নি, যোহন ৭:৫)। অথবা তাদের কী প্রয়োজন ছিল, হতে পারে তাঁকে থামানোটাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য, কারণ তারা শংকিত ছিলেন তাঁর ক্লান্তির ব্যাপারে অথবা তারা তাঁকে সতর্ক করে দিতে চাইছিলেন যেন তিনি তাঁর আলোচনায় ফরীশীদের ব্যাপারে কড়া কথা না বলেন এবং নিজেকে বিপদের সাথে জড়িয়ে না ফেলেন, যেন এ বিষয়ে তাঁকে জ্ঞান দেবার প্রয়োজন আছে!

১. তিনি লোকদের সাথে কথা বলছিলেন। মনে রাখুন, খ্রীষ্ট কথা বলার মতো করে প্রচার করতেন, আর তা ছিল সরল, সহজ এবং সুবোধ্য এবং তাদের ধারণক্ষমতা এবং ঘটনা অনুযায়ী। খ্রীষ্টকে অভিযুক্ত করার পরও তিনি তাঁর প্রচার চালিয়ে গেলেন। মনে রাখুন, আমরা আমাদের কাজ দিয়ে মোকাবিলা করি, তাই তা থেকে নিজেদের সরিয়ে নেওয়াটা উচিত নয়। তিনি ফরীশীদের সাথে কথা বলা থামিয়ে দিলেন কারণ তিনি দেখলেন যে, তাদের মাঝে তিনি ভাল কিছু করতে পারবেন না, কিন্তু সাধারণ লোকদের সাথে কথা বলা চালিয়ে গেলেন, যারা ফরীশীদের মতো জ্ঞানের জন্য গর্বিত ছিল না, তারা তাঁর কাছ থেকে শিখতে আন্তরিক ছিল।

২. তাঁর মা ও ভাইয়েরা তাঁর সাথে কথা বলার আগ্রহ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, যখন তারা এর মাঝে থাকলে তাঁর কথা শুনতে আগ্রহী হতেন। তাদের একটি অগ্রগামিতা ছিল যে তারা তাঁর কথা সবসময় শুনতে পেত এবং সে কারণেই তারা লোকদের কাছে খ্রীষ্টের প্রচার শুনতে অতটা আগ্রহী ছিল না। মনে রাখুন, যারা বিনা আয়াসে অনুগ্রহ এবং জ্ঞানের কাছে থাকে তাদের ভেতর একে অবহেলা করার প্রবণতা দেখা যায়। প্রশ্রয়ের ঘনিষ্ঠ তা এবং সহজগম্যতায় অপছন্দ বাড়ে। আমরা অবশ্যই একে উপেক্ষা করব, যা আমরা চিন্তা করি আমরা পাব আরেক দিন, এটা ভুলে গিয়ে যে এটা হচ্ছে বর্তমান সময়ের, আগামীকালের নয়। তা সেই সাধারণ প্রবাদেও সত্য 'মণ্ডলীর কাছে ঈশ্বরের দূরে'। যদি তাই হয় তবে তা হবে চরম লজ্জার।

৩. তারা যে কেবল নিজেরাই শুনতে চায় নি তা নয় বরং তারা অন্যদের শোনাতেও বাধ সেঁধেছিল। শয়তান ছিল আমাদের পরিত্রাণকর্তার প্রচারের প্রকাশ্য শত্রু। সে ফরীশীদের অযৌক্তিক অভিযোগ দ্বারা খ্রীষ্টের আলোচনাকে বিফল করে দিতে চেয়েছিল এবং যখন সে তার পথে সফল হতে পারল না তখন সে সম্পর্কের অনাবশ্যক আবির্ভাব দ্বারা তা ভেস্তে দিতে চাইলো। মনে রাখুন, প্রায়ই আমরা আমাদের কাজে বাধা এবং প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হই আমাদের সেসব বন্ধুদের দ্বারা, যারা আমাদের সম্মান করে কেবল সামাজিক আদান-প্রদানের সম্পর্কের কারণেই। আমাদের আত্মিক কাজ সম্পর্কে তারা ন্যূনতমই আন্তরিক থাকে। যারা প্রকৃতই আমাদের এবং আমাদের কাজের ভাল চায়, কখনও কখনও তাদের অমনোযোগ পিছনের বন্ধু হয়ে ওঠে এবং আমাদের কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

খ্রীষ্ট একদা তাঁর মাকে বলেছিলেন, 'কেন তোমরা আমাকে খুঁজছিলে, তোমরা কি জানতে না আমি আমার পিতার বাড়িতে থাকব? এবং এটা তখন তিনি তাঁর হৃদয়ে গেঁথে রেখেছিলেন (লূক ২:২৯); কিন্তু যদি তিনি এখন সেকথা স্মরণ করতেন তবে তিনি এখন তাঁর কাজে বাধা দিতেন না।

২. কীভাবে তিনি এই বাধাদানকে অপছন্দ করলেন (৪৮-৫০)।

১. তিনি এই ডাকে কর্ণপাত করলেন না; তিনি বরং তাঁর কাজেই আবার মন দিলেন, যা করা থেকে কোন সামাজিক সৌজন্যবোধ বিরত রাখতে পারে নি। 'কে আমার মা, আর কারাইবা আমার ভাই?' তার মানে এই নয় যে, তিনি স্বাভাবিক সম্পর্ক অস্বীকার করলেন অথবা ধর্মের ছলে আমরা আমাদের পিতামাতাকে অশ্রদ্ধা করব কিংবা তাদের সম্পর্কের প্রতি নির্দয় হব; কিন্তু প্রতিটি কাজের একটা সময় আছে এবং যখন মহান কাজ চলছে তখন গৌণ কাজগুলো অপেক্ষায় থাকুক। অর্থাৎ খ্রীষ্টের চেয়ে সেই সম্পর্ককে বড় করে দেখব না। পাশাপাশি আমাদের ওপর অর্পিত স্বর্গীয় দায়িত্বকে গুরুত্ব দেব। খ্রীষ্ট এখানে এ বিষয়ে আমাদের জন্য একটি উদাহরণ রাখলেন; ঈশ্বরের ঘরের প্রতি আগ্রহ তাঁকে তাঁর দায়িত্বের প্রতি ক্ষুধার্ত করে তুলেছিল। তিনি যে কেবল নিজের কথা ভুলে গিয়েছিলেন তা নয় উপরন্তু তিনি তাঁর কাছের সম্পর্কগুলোর কথাও ভুলে গেলেন।

২. তিনি এই উপলক্ষে তার শিষ্যদের প্রাধান্য দিলেন যারা ছিল তার আত্মিক পরিবারের সদস্য, এভাবে তাঁর জাগতিক সম্পর্কের সামনে; যা ছিল প্রকৃতই চমৎকার কারণ যে, কেন তিনি তাঁর ভাইদের ডাকে সাড়া দিয়ে প্রচার থামিয়ে দিলেন না। তিনি তাঁর সম্পর্ককে সুবিধা পেতে দেওয়ার চেয়ে তাঁর শিষ্যদের লাভবান করতে চাইলেন। লক্ষ্য করুন,

(১) খ্রীষ্টের শিষ্যদের বর্ণনা। তাঁরা ছিলেন এইরকম লোক যারা পিতার ইচ্ছা পালন করে; তাঁরা কেবল তা শুধু শোনা, জানা এবং এ বিষয়ে বলার কাজই করেন না, কিন্তু সেই মত কাজও করেন। কারণ শিষ্যত্বের প্রস্তুতিতে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করাটাই মোক্ষম বিষয় (যোহন ৭:১৭)। তাঁরা আমাদের তাঁর শিষ্য আখ্যা দেন। খ্রীষ্ট বললেন না, 'যেই আমার ইচ্ছা পালন করে'। কারণ তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা ও নিজের ইচ্ছার পার্থক্য খুঁজতে বা করতে আসেন নি: তাঁর এবং তাঁর পিতার ইচ্ছা একই, কিন্তু তিনি আমাদের তাঁর পিতার ইচ্ছা পালন করতে নির্দেশ করেছেন; কারণ তাঁর বর্তমান অবস্থা এবং কাজকে তিনি এর প্রতি নিবেদন করেছিলেন (যোহন ৬:৩৮)।

(২) খ্রীষ্টের শিষ্যদের সম্মান। তারাই আমার ভাই, বোন ও মা। তাঁর শিষ্যরা যারা সব কিছু ছেড়ে তাঁকে অনুসরণ করেছিল এবং তাঁর মতবাদ গ্রহণ করেছিল, তারা ছিলেন তাঁর প্রিয়ভাজন, জাগতিক সব সম্পর্কের চেয়ে বেশি কিছু। তারা তাদের সম্পর্কের উর্ধ্বে খ্রীষ্টকে রেখেছিলেন (৪:২২; ১০:৩৭)। এখন এখানে খ্রীষ্ট তাদের দেখালেন যে তারা কোন ভালবাসা হারায়নি, তিনি তাদের তাঁর সম্পর্কের উপরে তাদের রাখলেন। এর মধ্য দিয়ে (সম্মান) কি তারা একশত গুণ লাভ করল না? (১৯:২৯)। খ্রীষ্টের কাছ থেকে এই কথা শোনাটা খুবই আবেদন এবং উদ্দীপক হিসেবে ছিল, কে আমার মা এবং আমার ভাইয়েরা; এটা কেবল তাদের একার সম্মান ছিল না, এই সম্মান সব ঈশ্বরভক্তের জন্য। মনে রাখুন, সব বাধ্য বিশ্বাসীই খ্রীষ্টের কাছে আসেন। তারা তাঁর নাম গায়ে চাপান, তাঁর চিত্র বহন করেন, তাঁর স্বভাব ধারণ করেন, তারা তাঁর পরিবারের লোক। তিনি তাদের ভালবাসেন,

তাদের সাথে আত্মীয়ের মতো মুক্তভাবে কথা বলেন। তিনি তাদের তাঁর টেবিলে স্বাগত জানান, তাদের যত্ন নেন, তাদের প্রয়োজন যোগান, তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন যে তাদের কোন প্রয়োজন আছে কি না: যখন তিনি মারা গেলেন তখন তিনি তাদের জন্য অমূল্য সম্পদ রেখে গেলেন, এখন তিনি স্বর্গ থেকে তাদের সাথে যোগাযোগ রাখছেন এবং তা সবার সাথে শেষ পর্যন্ত অটুট থাকবে এবং আত্মীয়ের দায়িত্ব পালন করতে তিনি ব্যর্থ হবেন না (রূত ৩:১৩); কিংবা তার দরিদ্র সম্পর্কের জন্য লজ্জিতও হন না কিন্তু তিনি তাদেরকে মানুষের সামনে, স্বর্গদূতদের এবং পিতার সামনে স্বীকার করবেন ।